প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৭তম পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক ইতিহাস **স্নাতক স্তর (সাবসিডিয়ারি)**

পাঠক্রম—পর্যায়

S.H.I. : 01 : 1 - 4

	রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1 ❑	অধ্যাপিকা মল্লিকা ব্যানার্জী	অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী
	অধ্যাপিকা নূপুর দাশগুপ্ত	
	অধ্যাপিকা রচনা চক্রবর্তী	অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
পর্যায় 2 ❑	শ্রীমতী চিত্ররেখা গুপ্ত	
	শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	
	অধ্যাপক জি. সুব্বাইয়া	
	(অনুসৃজন : অধ্যাপক অলক ঘোষ)	
	অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
	অধ্যাপিকা পর্ণশবরী ভট্টাচার্য	অধ্যাপক চন্দন বসু
	অধ্যাপিকা মল্লার মিত্র	
পর্যায় 3 ❑	অধ্যাপিকা ঈশিতা চক্রবর্তী	অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়
	অধ্যাপিকা দিব্যেন্দু বিকাশ হোতা	
	অধ্যাপক রাধামাধব সাহা	
	অধ্যাপিকা স্বপ্না সেন	অধ্যাপক হিমাদ্রী ব্যানার্জী
পর্যায় 4 ❑	অধ্যাপক রঞ্জিত সেন	অধ্যাপক হিমাদ্রী ব্যানার্জী
	অধ্যাপিকা সুহিতা সিন্হা রায়	অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়
	অধ্যাপিকা রত্নাবলী চ্যাটার্জী	পরিমার্জন, বিন্যাস, সম্পাদনা

ড: চন্দন বসু
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সস

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SHI - 1

(স্নাতক পাঠক্রম - সাবসিডিয়ারি ইতিহাস)

পর্যায় 1

একক **1**	❑	প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস	9 – 32
একক **2**ক	❑	সিন্ধু সভ্যতা / হরপ্পীয় সভ্যতা	33 – 57
একক **2**খ	❑	বৈদিক যুগ	58 – 81
একক **2**গ	❑	বৈদিক যুগের ধর্ম-চেতনা, বিশ্বাস ও প্রক্রিয়া	82 – 90
একক **3**ক	❑	খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে মহাজনপদগুলির অবস্থা ও মগধের উত্থান (নন্দ বংশ পর্যন্ত)	91 – 107
একক **3**খ	❑	মৌর্য সাম্রাজ্য : সম্প্রসারণ, বিস্তৃতি, শাসনব্যবস্থা ও পতন	108 – 146
একক **4**ক	❑	ভারতে বিদেশি শক্তির উন্মেষ—কুষাণ, গ্রীক, শক ও পার্থিয়দের ইতিহাস; দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের উদ্ভব	147 – 186
একক **4**খ	❑	উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, সম্প্রসারণ, অবনতি ও পতন; দক্ষিণ ভারতে বকাটক সাম্রাজ্যের ইতিহাস	187 – 238

পর্যায় 2

একক **1**ক	❑	আদি ও মধ্যযুগের উত্তর ভারত (৬০০-১০০০ খ্রিঃ) (হর্ষবর্ধন)	241 – 260
একক **1**খ	❑	আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলা (৬০০-১২০৫ খ্রিঃ)	261 – 302
একক **1**গ	❑	সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজবংশসমূহ	303 – 313

একক **2** ❑ প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ 314 – 331

একক **3** ❑ প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির কৃষি-অতিরিক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ 332 – 344

একক **4** ❑ সামাজিক জীবন 345 – 357

পর্যায় 3

একক **1**ক ❑ ভারতে ইসলামের অভিঘাত ও রাজনৈতিক পরিবর্তন—দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা 361 – 371

একক **1**খ ❑ দিল্লি-সুলতানির বিকাশ : আইবক থেকে বলবন 372 – 380

একক **2**ক ❑ খলজি বিপ্লব ও তুঘলক শাসন 381 – 408

একক **2**খ ❑ বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব ও বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান 409 – 433

একক **3**ক ❑ সুলতানি শাসনে কৃষি ও বাণিজ্য 434 – 446

একক **3**খ ❑ ভারতীয় সমাজের উপর ইসলামের প্রভাব—সুফিবাদ—ভক্তি-আন্দোলন—ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য শৈলীর ভূমিকা 447 – 461

একক **4**ক ❑ সুলতানি শাসনের পতন এবং মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—বাবর—মোঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শেরশাহ 462 – 474

একক **4**খ ❑ আকবরের নেতৃত্বে সুসংহত মোঘল সাম্রাজ্য 475 – 488

পর্যায় 4

একক **1**ক ❑ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের মোঘল শাসকশ্রেণির সুদৃঢ়করণ 491 – 510

একক **1**খ ❑ ঔরংজেবের ইতিহাস—দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক সম্প্রসারণ—মোঘল-মারাঠা দ্বন্দ্ব—রাষ্ট্র ও ধর্ম 511 – 544

একক **2** ❑ মোঘল সাম্রাজ্যের পতন 545 – 558

একক **3** ❑ মনসবদারি ব্যবস্থা—মোঘল রাজস্বনীতি ও কৃষি 559 – 571

একক **4** ❑ ধর্মীয় সমন্বয়বাদী—ভক্তি সংস্কৃতি—মোঘল ভারতে শিল্প-স্থাপত্য 572 – 584

পর্যায়-১

একক ১ ❑ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ঐতিহাসিক উৎস ঃ লিখিত ও অলিখিত

১.৩ প্রত্নতত্ত্ব

১.৩.১ লেখমালা

১.৩.২ মুদ্রা

১.৩.৩ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ

১.৪ সাহিত্যগত তথ্যসূত্র

১.৪.১ পুরাণ

১.৪.২ মহাকাব্য

১.৪.৩ আইন ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

১.৪.৪ জীবনী গ্রন্থ

১.৪.৫ বিদেশী সাহিত্য

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- ইতিহাসের তথ্যের উৎস
- ইতিহাস রচনার লিখিত এবং অলিখিত উপাদান
- ঐতিহাসিক তথ্যের উৎসগুলির শ্রেণীবিন্যাস এবং তথ্য ব্যবহার পদ্ধতি

১.১ প্রস্তাবনা

ভারত-ইতিহাস অধ্যয়নের প্রথম পর্যায়ের এই এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে—ইতিহাস রচনায় কোন্ কোন্ উপাদান আহরণ করা হয়ে থাকে, সেগুলির সহজলভ্যতা বা দুষ্প্রাপ্যতা; সেসব উৎসের একটি শ্রেণীবিন্যাসও করা হবে এই এককে, যার ফলে বোঝা যাবে—একাধিক উৎস ও তথ্যের ব্যবহার কীভাবে হয়। অধ্যাপক

মেইটল্যান্ডের বিখ্যাত সংজ্ঞা অনুসারে মানব জীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি যা কিছু ঘটেছে তা সবই ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের শুরু থেকে তো নয়ই, এমনকী, তার পরের বহু সহস্রাধিক বছরের কোন লিখিত ইতিহাস আমাদের কাছে অনুপস্থিত, যার ফলে মানব ইতিহাসের বহু দিগন্ত পরিবর্তনকারী ঘটনার সাল-তারিখ-স্থান-কারণ ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত তথ্যের অভাবের ফলেই প্রাচীন মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। এই ব্যাপারে আমাদের সমস্ত আলোচনাই অনেক ক্ষেত্রে অনুমান-নির্ভর হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস কাহিনী-গল্পকথার অংশমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে তফাত করা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

সুতরাং যে সকল তথ্য থেকে সত্য আহরণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব তা-ই ইতিহাসের তথ্য এবং এই বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সমাবেশকে মোটামুটিভাবে ইতিহাসের উৎস বলে বর্ণনা করা যায়। যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা তথ্যকে বিশ্লেষণ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তার দ্বারা মানবিক জ্ঞানের জগতে নতুন আলোকপাত করা সম্ভব, তাদের ইতিহাসের উৎস বলা হয়। যত প্রাচীন দিকে যাই ততই তথ্যের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায় এবং প্রাচীন কাল থেকে যত আধুনিক যুগের দিকে আসি ততই তথ্যের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই বক্তব্য পৃথিবীর সব দেশ সম্পর্কেই সত্য বলে মনে করা যায়; কিন্তু তার সময়সীমা বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে বিভিন্ন রকম হতে পারে। উৎসের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, মতবাদ, দেশ-কাল ভেদের বিভিন্নতার জন্যে পৃথক হতে পারে। এর ফলে ইতিহাস বিষয়টির উপর আকর্ষণ অনেক অংশে বেড়ে যায়।

উপযুক্ত উৎসের অভাব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। একাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত আরবী পণ্ডিত আল-বিরুনী প্রকাশ্যে হিন্দুদের অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকেরা যেমন এলফিনস্টোন, ফ্লীট, স্মিথ নানা তিক্ত মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (ক) ভারতীয়দের অদৃষ্টবাদ এবং (খ) হেরোডোটাস, থুকিডাইডিসের মতো ঐতিহাসিকদের অনুপস্থিতিকেই প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস বিমুখতার জন্যে দায়ী করেছেন। এই অপবাদগুলিকে স্বীকার করে নিয়েও আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে প্রাচীন ভারতের মানুষ ইতিহাস রচনার জন্যে কোন তথ্যই রেখে যাননি—এ ধারণা যথার্থই অমূলক। যে সমস্ত বিষয় তাঁদের কাছে অর্থবহ ও রক্ষণযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলি তাঁরা অবশ্যই সংরক্ষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয়দের অতীত চর্চার নানা সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে "ইতিহাস" শব্দটিই তাঁরা তৈরি করেছিলেন। "ইতি-হ-আস" (অর্থাৎ অতীতে এমনটিই ঘটেছিল)—ইতিহাস শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছিলেন। গ্রীক "ইস্তোরিয়া" বা জার্মান "গেশিস্টে"র থেকে "ইতিহাস"-এর ধারণা ভিন্ন ও বোধ হয় ব্যাপকতরও বটে। এক্ষেত্রে তথ্যের অভাবকে সমালোচনা না করে, প্রাপ্ত তথ্যগুলি, তা যতই অপ্রতুল হোক না কেন—তাদের গুণগত মানের সমালোচনা করা দরকার। বস্তুতপক্ষে অপ্রতুল এবং আপাত-অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ঐতিহাসিকেরা বহু নতুন দিক নির্ণয় করতে পেরেছেন।

ঐতিহাসিক উৎস সব সময় লিখিত না হতেও পারে। রাজা এবং শাসকদের প্রশাসন পরিচালনা করার জন্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিভিন্ন উপাদানগুলি—যেমন লেখ ও মুদ্রা, সর্বসাধারণের ব্যবহৃত তৈজসপত্রাদি, ঘর-বাড়ি, মূর্তি ইত্যাদি যা বর্তমানে লুপ্ত হয়ে মাটির তলায় আশ্রয় নিয়েছে, তাদের উদ্ধার এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন

তথ্যের অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যা সম্ভব। এই বিদ্যা আধুনিককালে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার মর্যাদায় অভিষিক্ত। এই বিষয়টি বর্তমানকালে "প্রত্নতত্ত্ব" নামে চিহ্নিত।

১.২ ঐতিহাসিক উৎস ঃ লিখিত ও অলিখিত

ঐতিহাসিক উৎসকে আমরা দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। (ক) অলিখিত উৎস, এবং (খ) লিখিত উৎস। সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসকে অলিখিত উৎসের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও ঐতিহ্য, চিত্রকলা এবং অধুনা আবিষ্কৃত কার্বন-১৪ (C^{14}) পদ্ধতিকে অলিখিত উৎসের মধ্যে ধরা হয়। এ ছাড়াও, অতি প্রাচীন কাল থেকে নানারকম কিংবদন্তী, লোককথা, গল্প, সাধারণ লোকদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়—সেগুলিকেও অবহেলা না করে আজকাল "মৌখিক ইতিহাস" বলা হয়। অতীতে জনগণের বিনোদনের জন্য হয় এইসব গল্পকে অতিরঞ্জিত করে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হত অথবা এর গল্পের দিকটি বজায় রেখে অন্যান্য বস্তুগত সত্যতাকে এড়িয়ে যাওয়া হত। কিন্তু এখানে কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করার কোন দায় গল্পকারের থাকত না।

অনুরূপভাবে লিখিত উৎসেরও নানারকম শ্রেণীবিভাজন সম্ভব। সমস্ত ঐতিহাসিক উৎসকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

১.৩ প্রত্নতত্ত্ব

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অনুসন্ধান ও খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত এবং মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত বস্তু, যার সঙ্গে অতীত ইতিহাসের যোগাযোগ আছে—এইরকম সমস্ত বিষয়বস্তু হল প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ হল প্রত্নবস্তু থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে অতীতের ধারণা গড়ে তোলা। ঐতিহাসিক এইসব মতামতের সাহায্য গ্রহণ করে ইতিহাসের সূত্র গড়ে তোলেন। প্রাচীন কালের মানুষ এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি জানবার অন্যতম চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে প্রত্নতত্ত্বকে ব্যবহার করা হয়।

প্রত্নবস্তুর বিভাজন অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে আমরা লেখমালাকে বিবেচনা করতে পারি। স্থায়ী কোন বস্তু যেমন পাথর, ধাতবখণ্ড, পোড়ামাটি, কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদির উপর বিশেষ প্রক্রিয়ায় লিখন-পদ্ধতিকে লেখমালা বলা যেতে পারে।

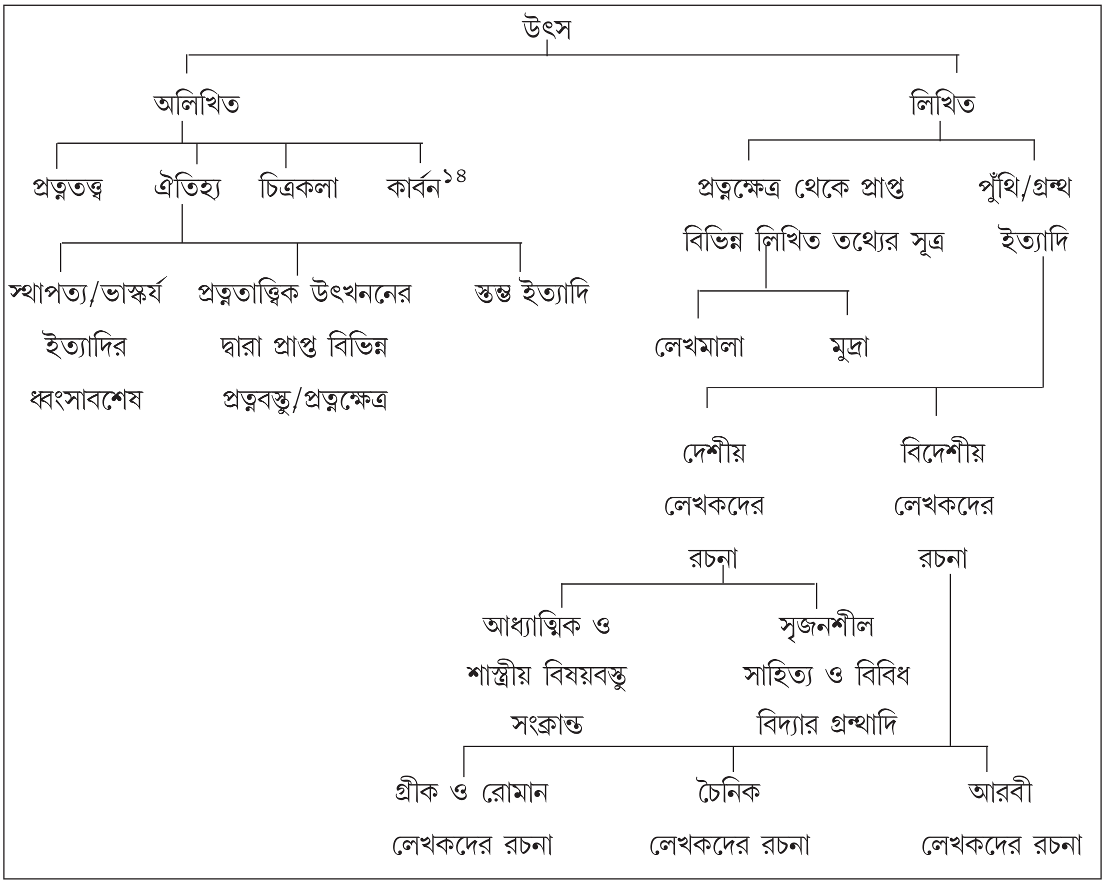

১.৩.১ লেখমালা

লেখমালার ক্রমাগত আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই। অতীত সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণায় লেখমালা একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করে। রাজারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিগ্বিজয়, ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা, শাসন পরিচালনা এবং অন্যান্য তথ্য লেখমালার মাধ্যমে জনসাধারণকে সরবরাহ করতেন; অপরদিকে লেখমালাতে সাধারণ লোকেরাও অনুপস্থিত নন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এখন অবধি প্রায় ৭০,০০০ লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ, নেপাল এবং বহির্ভারতেও এদের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়। জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী তৎকালীন সমস্ত প্রচলিত ভাষায় এগুলি লেখা হত, যেমন সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা যেমন তামিল, তেলেগু, কানাড়া, বৈদেশিক ভাষা যেমন গ্রীক ও আরামীয় (অ্যারামাইক) ব্যবহৃত হত। বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখমালা শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নয়, সমকালীন ভারতীয় ভাষা অনুধাবনের ক্ষেত্রেও অন্যতম সহায়ক।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও অবধি প্রায় ৭০,০০০ লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশাল লেখমালার এই

ভাণ্ডার স্বভাবতই একই শ্রেণীর হতে পারে না। চরিত্র অনুযায়ী লেখমালাসমূহকে আমরা প্রধান কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাজন করতে পারি।

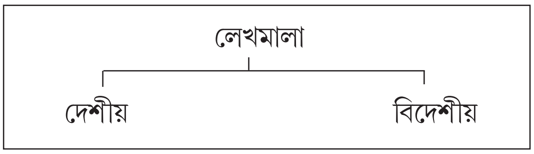

দেশীয় লেখমালা বলতে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত লেখমালাকেই বুঝব; বিদেশীয় লেখমালা বলতে আমরা বিদেশে প্রাপ্ত সেইসব লেখমালাকে বুঝব যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, লেখামালাকে বিভাজন করা সম্ভব।

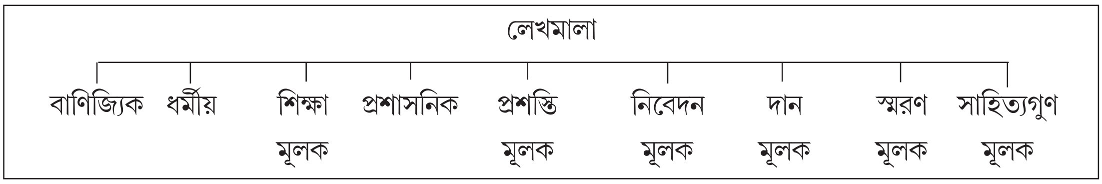

সিন্ধুসভ্যতার সিলমোহরগুলির মধ্যে অনেকগুলিকেই বাণিজ্যিক পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির সিলমোহরগুলি ব্যক্তির নাম এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতির লেখমালাগুলি বাণিজ্যিক পণ্যের নাম এবং কোথায় পাঠানো হচ্ছে তা নির্দেশ করত। হরপ্পীয় সিলমোহরে ধর্মভাবনার চিত্রও আভাসিত। তবে বাণিজ্যিক দলিল হিসাবে তাদের প্রাথমিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেহেতু হরপ্পা সভ্যতার লিপি এখনও অপঠিত তাই খুব জোরের সঙ্গে সিলমোহরগুলিকে কেবলমাত্র বাণিজ্যিক লেখ বলা যাবে না। প্রাচীন যুগের বাণিজ্য নিগমগুলির নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার এবং বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নিজস্ব সিলমোহর ছিল। এদের অধিকাংশই অধুনালুপ্ত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আর্যদের আদি বাসস্থানের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আধুনিক ইরাক বা প্রাচীন ব্যাবিলনীয়ায় ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের যে সকল লেখমালা পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাচীন ক্যাশাইটরা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার সময় ভারত বিষয়ক এইসব লেখমালাকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

প্রশস্তিমূলক লিপিগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে রাজা এবং তার রাজনৈতিক কার্যাবলী জড়িত থাকে। সে দিক দিয়ে দেখলে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় এদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু প্রশস্তি রচয়িতারা রাজ-অনুগৃহীত বলে নিরপেক্ষ সৎ ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। দৃষ্টান্ত হিসাবে কলিঙ্গের রাজা খারবেলের “হাতিগুম্ফা লেখমালা”, সমুদ্রগুপ্তের “এলাহাবাদ প্রশস্তি” ইত্যাদিকে উপস্থিত করা যেতে পারে। সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং তার সামরিক কৃতিত্ব বর্ণনা করায় লেখক এত মনোযোগী যে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির তিনি আলোচনাই করেননি। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবনী ও কৃতিত্ব অনুধাবন করার প্রধান নির্ভরযোগ্য উপাদান এলাহাবাদ প্রশস্তি ও এরাণ লেখ। রাজা ভোজের “গোয়ালিয়র প্রশস্তি”-কে অপর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করা চলে। অপর এক ধরনের প্রশস্তিমূলক লিপি পাওয়া যায় যেখানে রাজস্তুতি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা থাকে—যেমন শক রাজা উষ্যদন্ডের “নাসিক গুহালিপি”, সাতবাহন

বংশীয়া রানী গৌতমী বলশ্রীর "নাসিক প্রশস্তি" ইত্যাদি। উসবদাত শক রাজা নন, তিনি শক ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা মাত্র—নিজে কখনও শাসন করেননি। স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, নাসিক প্রশস্তির মাধ্যমেই সাতবাহনবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির রাজত্বের সবচেয়ে বিশদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়।

নিবেদনমূলক লিপি বলতে আমরা সেই সব লিপিকে বুঝব যেখানে দাতা উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু দান করছেন এবং ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের স্মরণের জন্য তিনি লেখমালা রচনার দ্বারা তাকে স্থায়ী করতে চান। "পিপ্‌রাওয়া লেখমালা"তে দেখা যায় যে ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস দান করা হচ্ছে এবং দাতা এই ঘটনাটিকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। গ্রীক নাগরিক "হেলিওডোরাসের" বেসনগর গরুড় স্তম্ভলিপি এই ধরনের লিপির অপর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যেতে পারে।

দানমূলক লিপির দৃষ্টান্ত অজস্র এবং অফুরন্ত। জমিদানের ক্ষেত্রে প্রায় সব পরিস্থিতিতেই এই লিপির ব্যবহার দেখা যায়। দানের বিষয়টিকে স্মরণীয় এবং বোধ হয় আইনগ্রাহ্য করার জন্যে এই লিপির ব্যবহার জরুরি ছিল। এ কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই লিপির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে লেখমালাকে আর একভাবে বিভাজন করা যায়—সরকারি লেখমালা এবং বেসরকারি লেখমালা। বেসরকারি লেখমালার প্রধান উৎস হচ্ছে এই দানমূলক লিপি।

জন্ম, মৃত্যু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্যে যে লেখ ব্যবহার করা হয় তাকে স্মরণমূলক লেখ-এর উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শন করার স্মারক হিসাবে সম্রাট অশোক এই লেখ উৎকীর্ণ করান।

অনুরূপভাবে কিছু কিছু লেখমালাকে আমরা সাহিত্য কীর্তির জন্যে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—আধুনিক উত্তরপ্রদেশের "মহানির্বাণস্তূপ" থেকে একটি তাম্রলিপি উদ্ধার করা গেছে, যার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের *উদানসূত্র* বিবৃত আছে।

মানব জাতির ইতিহাস কোন একটি বিশেষ জাতির দ্বারা বিশেষ সময়ে গড়ে ওঠে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি তাদের বিশেষ অবদানের দ্বারা মানব সভ্যতা গড়ার কাজে সাহায্য করেছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার, ধর্মানন্দ কোশাম্ভবী এবং অন্যান্যরা মনে করেন যে, মানব সভ্যতায় ভারতের প্রাচীন যুগের অবদান অন্যান্য যুগের তুলনায় অনেক বেশী। অথচ এই যুগের কালানুক্রমিক কোন লিখিত ইতিহাস নেই। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ এই যুগ সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের অলিখিত বিভিন্ন উৎসের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি করে আসে লেখমালার উপর।

লেখমালার বিবরণ স্বতঃস্ফূর্ত ও সমসাময়িক। বিশেষ প্রয়োজনে স্থায়ী বস্তুর উপরে লেখা হয় বলে এর মধ্যে পরবর্তীকালে লেখকেরা হস্তক্ষেপ করতে পারেন না এবং প্রয়োজনে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করতে পারেন না। যদিও অনেক ক্ষেত্রে সন, তারিখের উল্লেখ থাকে না কিন্তু ব্রাহ্মী বা অন্যান্য ব্যবহৃত লিপির সময় নির্ণয়ের জন্য পুরালেখবিদ্যার (প্যালিওগ্রাফি) সাহায্যে বিশেষজ্ঞরা লেখ-তে ব্যবহৃত হরফের ভিত্তিতে লেখটির সময় নির্ণয় করতে পারেন। এদিক থেকে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে লেখমালা লিখিত পুঁথি/গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরজনক; কারণ লিখিত সাহিত্যের রচয়িতারাও অনেক ক্ষেত্রে সময় সম্বন্ধে মনোযোগী নন এবং বহু ক্ষেত্রেই মূল রচনাকে একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু এই কারণে যদি আমরা ভাবি যে লেখমালা

এবং লিখিত সাহিত্য পরস্পরের প্রতিপক্ষ তাহলে আমাদের চিন্তাকে অসম্পূর্ণ মনে করতে হবে। পক্ষান্তরে লেখমালা এবং সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং সাহায্যকারী। লিখিত বিবরণের তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ-সহযোগে দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়, অন্যথায় প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণের লিখিত সমর্থন পাওয়া গেলে ইতিহাসের তথ্যকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ—হরপ্পা সভ্যতার শিলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাদের অনুসন্ধানকে যাচাই করতে পারেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিন্ধুসভ্যতা-সম্পর্কে নানারকম বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে; কিন্তু কোনরকম লিখিত প্রমাণের অভাবে তাদের চূড়ান্ত বলে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার বৈদিক সাহিত্যকে সাহিত্য থেকে ইতিহাসে উত্তীর্ণ করতে গেলে তা প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব বলে মনে হয়। চিত্রিত ধূসর পাত্রের অবস্থানের সাহায্যে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তৃতি নির্ণয় করা যায়। অন্যথায় ঋগ্বেদ-প্রমুখ গ্রন্থে ধাতব বস্তু ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন প্রত্নক্ষেত্রে ঋগ্‌বৈদিক যুগে ব্যবহৃত ধাতুর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

লেখমালার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রসঙ্গটি আরও ভালভাবে বোঝা যাবে যখন ইতিহাসের পুনর্গঠন প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হবে। ইতিহাসের ঘটনাসমূহ স্থায়ী এবং তা অপরিবর্তনশীল। মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া ঘটনাকে পরির্তন করা যায় না। কিন্তু ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। দেশ, কাল, যুগ পরিবর্তনের ফলে মানুষের মন ও তার চিন্তা-ভাবনা সততই পরিবর্তিত হচ্ছে। উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সততই পরিবর্তন হয়; প্রতিটি যুগের ঐতিহাসিকেরা পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসকে নতুন করে লেখেন অর্থাৎ নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। চেতনার এই পরিবর্তনের ফলেই আমরা পুরাতন সমস্যাকে নতুন করে দেখতে এবং ভাবতে শিখি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার বহু উদাহরণ সহযোগে এই বিষয়টিকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করতে পারি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্তও পণ্ডিত মহলে ধারণা ছিল যে, রাজকীয় গুপ্ত বংশ (ইম্পিরিয়াল গুপ্ত) স্কন্দগুপ্তের পরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৮ সালে মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় এরাণ অঞ্চলে একটি ধ্বজস্তম্ভ পাওয়া গেল যেখানে ১৬৫ গুপ্ত অব্দে (অর্থাৎ ৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ) বুধগুপ্ত নামে বৃহৎ রাজার অধীনস্থ দু'জন ক্ষুদ্র রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৯৪ সালে ১৭৫ গুপ্ত অব্দে (৪৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে) বুধগুপ্ত প্রচলিত কিছু মুদ্রা পাওয়া গেল; দ্বিতীয় আবিষ্কারটি বুধগুপ্তের সময় এবং এলাকাকে প্রসারিত করল; ১৯১৪-১৫ সালে বারাণসীর নিকট সারনাথে দু'টি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেল; মূর্তি দু'টির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা গেল যে, ঐ মূর্তি দু'টি ১৫৭ গুপ্ত অব্দে (৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজা বুধগুপ্তের রাজত্বকালে স্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় আবিষ্কারটির দ্বারা প্রমাণ করা গেল যে, বুধগুপ্তের রাজ্যের সীমা পশ্চিমে মালব থেকে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং লেখমালা থেকে তার দীর্ঘ রাজত্বকালের কথা (৪৭৬-৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) জানা গেল। এখনও অবধি এই রাজার কোনও পরিচয় জানা সম্ভব হচ্ছিল না। এত বৃহৎ রাজ্যসীমার ফলে পণ্ডিতেরা তাকে গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছিলেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে তা করা যাচ্ছিল না। তৃতীয় দফায়, ১৯১৯ সালে অধুনা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর অঞ্চলের দু'টি তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হল। এই জমি ক্রয়/বিক্রয় সংক্রান্ত লিপিতে বুধগুপ্তের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। নর্মদা থেকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অবধি বিশাল অঞ্চল কোন স্থানীয় রাজার হওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

পণ্ডিতেরা তখন হিউ-য়েন-সাং উল্লিখিত "বুদ্ধগুপ্তে"র উল্লেখের কথা চিন্তা করে বুঝতে পারলেন যে, বুদ্ধগুপ্তকে শক্রাদিত্যের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বুদ্ধগুপ্ত/বুধগুপ্ত এক এবং অভিন্ন হতে পারেন, যেমন পারেন কুমারগুপ্ত/মহেন্দ্রগুপ্ত/শক্রাদিত্যের সঙ্গে। ১৯৪৩ সালে নালন্দাতে একটি ভগ্ন মৃত্তিকালিপি পাওয়া গেল যেখানে পরিষ্কারভাবে বুধগুপ্তকে গুপ্তরাজবংশের রাজা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং সমুদ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে অন্যান্য গুপ্ত রাজার সঙ্গে তাঁকে গুপ্ত বংশানুক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে। গুপ্তবংশের ইতিহাসে বুধগুপ্তের সংযোজনা প্রায় এককভাবে লেখমালার সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল; অন্যথায় লিখিত বিবরণীতে এই রাজার কোন উল্লেখ নেই; স্কন্দগুপ্তের পরেও গুপ্ত রাজবংশ দীর্ঘদিন সগৌরবে অব্যাহত ছিল এ কথা প্রমাণিত হওয়ার ফলে গুপ্ত রাজবংশের পতনের ইতিহাস সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু করা যেতে পারে। ঠিক এইরকমভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্রবংশের ইতিহাস লেখমালার সাহায্যেই ধীরে ধীরে পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে। চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের বিশাল সামরিক কৃতিত্বের বিবরণ শুধুমাত্র লেখমালার সাহায্যে জানা সম্ভব। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযান সম্বন্ধে জানা যায়, যাদের সম্বন্ধে সমসাময়িক লিখিত বিবরণ একেবারেই নীরব।

এতদ্‌সত্ত্বেও লেখমালাকে আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠন করার সময় সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারি না, কারণ অধিকাংশ প্রশস্তিই আতিশয্য দোষে দুষ্ট এবং পরিমিত বোধহীন। কোন উপহার প্রেরণকে তারা অনেক সময় কর-প্রেরণের সঙ্গে এক করে দেখেন এবং বিদেশী রাজার সামান্যতম যোগাযোগ-প্রচেষ্টাকে বশ্যতা স্বীকার বলে মনে হয়। কোন রাজা বা রাজবংশ সামান্যতম প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই তার পূর্বপরিচয় বিস্মৃত হয়ে তাকে সূর্য বা চন্দ্র বংশের থেকে উদ্ভূত বলে দাবী করা হতে থাকে। তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তির কৃতিত্ব বর্ণনা করার সময় অতিরিক্ত আলংকারিক ও রূপক ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায় বা অনেক ক্ষেত্রেই মূল বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

স্থান ও কালকে ইতিহাসের দু'টি চোখ বলে বর্ণনা করা হয়। লেখমালায় প্রাপ্ত তারিখের সাহায্যে যেমন সময় নির্ণয় করা সম্ভব, সেই রকম লেখমালার প্রাপ্তিস্থান থেকে প্রাচীন স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। লেখমালার সাহায্যেই প্রাচীন লুম্বিনীগ্রাম, কপিলাবস্তু, পুণ্ড্রবর্ধন, কৌশাম্ভবী, শ্রাবস্তী, কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি স্থানের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান জানা সম্ভব হয়েছে। পিপরাওয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং প্রাপ্ত শিলমোহরের সাহায্যে কপিলাবস্তু সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সংশয় দূর হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের অদূরে রক্তমৃত্তিকায় প্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় যে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠেই এই বৌদ্ধবিহারটি অবস্থিত ছিল। এর ফলে সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-য়েন-সাং বর্ণিত কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ সঠিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্য দিকগুলিও লেখমালার সাহায্যে আলোকিত হতে পারে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটি মূলত লেখমালার দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব। লেখমালার আলোকে গোষ্ঠীগুলি যথা শ্রেণী, গণ, সংঘ, নিকায় প্রভৃতির আর্থ-সামাজিক কার্যাবলী সম্পর্কেও তথ্য আহরণ সম্ভব। প্রাচীনকালে কারিগর শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিত। রাজন্যবর্গ সহ বিভিন্ন সমাজ স্তরের ব্যক্তিরা এদের থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদের বিনিময়ে অর্থ গচ্ছিত রাখতে পারতেন।

লেখ থেকে জানা যায় কারিগর পেশাদার গোষ্ঠীগুলি (‘শ্রেণী’ গণ’, ‘সংঘ’ ‘নিকায়’ প্রভৃতি—এগুলি বণিক সংগঠন নয়) রাজন্যবর্গ সহ বিবিধ ব্যক্তির কাছ থেকে চিরকালীন আমানত নিত ও তার উপর নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক সুদও (‘বৃদ্ধি’) দিত।

বণিক সংগঠনগুলির এই আধুনিক কার্যের বিবরণ নাসিক এবং মথুরা লেখমালা থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখও লেখমালায় আছে যেমন ‘শ্রেণী গম্ভুভক দ্রম্ম’ (শ্রেণী গম্ভুভকের প্রচলিত মুদ্রা); ‘আদি বরাহ দ্রম্ম’ (প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের প্রচারিত রৌপ্য মুদ্রা)।

প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অজস্র বিবরণ লেখমালার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লেখমালাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত বিবরণের বক্তব্যকে সমর্থন করে। অশোকের লিপি থেকে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সামাজিক নেতৃত্ব, বর্ণবৈষম্য, গ্রীক অধ্যুষিত অঞ্চলে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের অনুপস্থিতি বিশদভাবে আলোচিত। অশোকের লেখ এবং মৈত্রক রাজার লেখ থেকে কায়িক পরিশ্রমরত ভৃত্য ও দাসদের বিবরণ পাই। ব্রাহ্মণ সাতবাহণ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নাসিক প্রশস্তিতে বর্ণসংকর ব্যবস্থা রোধ করার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টাকে সরবে প্রচার করেছেন এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্যে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন। লেখমালার মধ্যে রাজন্যবর্গের এই স্ববিরোধিতার উদাহরণ আরও মিলবে—যেমন শকদের সঙ্গে বিজয়পুরীর ইক্ষাকু পরিবারের সম্পর্ক অথবা ব্রাহ্মণ বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে অব্রাহ্মণ গুপ্ত রাজকন্যার বিবাহকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে। লেখমালা থেকে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় যা প্রাচীন সমাজব্যবস্থার একটি নতুন দিককে আলোকপাত করে। সেই বিষয়টি হল বিদেশীদের ভারতীয়করণ। পুণা-নাসিক অঞ্চলের শক শাসনকর্তা নহপানের জামাতা ঋষভ দত্ত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের অকাতরে অর্থদান করতেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণদের জন্য আশ্রয়-নিবাস নির্মাণ করেছিলেন। নগর গরুড়স্তম্ভলিপিতে তক্ষশিলার গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস নিজেকে “পরম ভাগবত” বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও সমাজব্যবস্থার অন্যান্য দিক যেমন ধর্ম, শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের জন্যে লেখমালার সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতীয় লেখমালাকে ঐতিহাসিকরা প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস বংশাবলীয় ইতিহাস শাসকদের পৌর্বাপর্য নির্ণয় ইত্যাদির জন্যেই বহুল ব্যবহার করতেন। ইদানীং লেখ-এর তথ্যগুলিকে প্রশাসনিক, আর্থসামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যেও নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে আদিমধ্যকালীন তাম্রশাসনগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাম্রশাসনগুলি মূলত জমি দানের দলিল। কোন্ শাসকের আমলে কোন্ অঞ্চল থেকে এগুলি জারী করা হয়েছিল এবং কোন্ এলাকায় প্রদত্ত জমি অবস্থিত ছিল, তার বিচার করলে ঐ শাসকের অধীনস্থ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক এলাকা অনুমান করা যায়। তাম্রশাসনের ভূমিকায় শাসক ও তাঁর পূর্বপুরুষদের বিবিধ রাজনৈতিক কীর্তি-কাহিনীর দ্বারস্থ রাজনৈতিক ইতিহাসের পুনর্গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তাম্রশাসনের মুখ্য অংশ—যেখানে জমি দানের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ হয়—দান গ্রহীতার পরিচয়, কোন্ ধর্মচারণের জন্যে ঐ ভূমিসম্পদ প্রাপ্ত, প্রদত্ত সীমাবর্ণনা, রাজপুরুষদের তালিকা, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উল্লেখ (যাঁদের ভূমিকা প্রায় সাক্ষীর মতো) বিবিধ করের তালিকা ইত্যাদি দেওয়া থাকে। প্রাচীন যুগের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অনুধাবনের জন্য এই তথ্যগুলির তাৎপর্য অপরীসীম। বহু ক্ষেত্রেই তথ্য বাস্তব অবস্থার ইঙ্গিতবহ। সেই কারণে কাব্যিক বর্ণনার তুলনায় তাম্রশাসনের তথ্য অনেক

ঐতিহাসিকের কাছে অধিকতর গ্রাহ্য। লেখমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আচার-আচরণকে অনুসরণ করে না। ভারতীয় সমাজ যে কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা চালিত ও পরিবর্তন-বিহীন অনড়-অটল ছিল না তার যথেষ্ট প্রমাণ লেখমালায় পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিকই, লেখমালায় প্রতিভাত সমাজে প্রধানত শাসকগোষ্ঠী উচ্চকোটির ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের কথাই বেশি থাকে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি এই তথ্যসূত্রে যৎসামান্যই থাকে।

১.৩.২ মুদ্রা

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে লেখমালার পরেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মুদ্রা; কিন্তু অধ্যাপক পি. এল. গুপ্ত বোধহয় তা মানতে রাজী নন। কারণ তার মতে—মানব সভ্যতা শুরুর সময় থেকেই পণ্য-বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা হিসাবে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছে বলে মনে করতে হবে। ধাতব খণ্ডকে মূল্যমানের একক হিসাবে ব্যবহার করা ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রিঃপূঃ সপ্তম-ষষ্ঠ শতকের আগে নেই। হরপ্পীয় সভ্যতায় শস্যকে বোধহয় মুদ্রার বিকল্প হিসাবে মনে করা হত। তবে কেউ কেউ ছোট ছোট শিলমোহরগুলিকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন। ঋগ্বৈদিক যুগের পশুচারণ পরিবেশে গোরু ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের তুলনায় (ক) গোরুর স্থায়িত্ব অনেক বেশি, (খ) সহজেই নষ্ট হয়ে যায় না, (গ) খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করা যায়, (ঘ) সর্বোপরি অন্যান্য সম্পদের মতো গোরুর সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্রয়-বিক্রয়ে এবং দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ে গোরু অচল, তাই পরবর্তী বৈদিক যুগেই "নিষ্ক" নামে এক অলংকারের কথা শোনা যায়। নিষ্ক শব্দটি বহু পরবর্তীকালে স্বর্ণমুদ্রার সমার্থক হলেও পরবর্তী বৈদিক আমলেও ঐ অর্থই বোঝাত কিনা, সন্দেহ আছে। কারণ ঐ আমলের মুদ্রার কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে এখনও অজানা। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য 'কৃষ্মল' (১.৮ গ্রেণ) নামক এক তৌলরীতির উল্লেখ আছে। একশ'টি কৃষ্মলের সমান ছিল 'শতমান' (অর্থাৎ ১.৮ x ১০০ = ১৮০ গ্রেণ-এর একটি তৌলরীতি)। এই তৌলরীতি কিছুকাল পর থেকে ধাতবমুদ্রা নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখা যায়। নিশ্চিত পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় প্রাচীনতম ভারতীয় মুদ্রাভাণ্ডার পাওয়া যায় তক্ষশিলা ও কাবুলের নিকটস্থ চমা-ই-হুজুরী থেকে। এই দুই মুদ্রাভাণ্ডারের প্রাচীনত্ব খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতকের আগে স্থাপন করা দুরূহ। (এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য—ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, টাকাকড়ি আবির্ভাবের যুগ)। সুতরাং ১৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৮০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণা, নানা স্তরের লোকদের নানারকম অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। অধ্যাপক গুপ্তের মতে, প্রাচ্য দেশের চীন এবং পশ্চিমের লিবিয়ার চেয়ে অন্তত এক শতাব্দী পূর্বে ভারতে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রথমেই প্রাচীন মুদ্রাকে দেশীয় ও বিদেশীয় এই দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। আবার ধাতব খণ্ড হিসাবে ভাগ করে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার প্রাপ্তিস্থানের বিস্তৃতি এবং প্রাপ্ত মুদ্রার ধারাবাহিকতা জানবার জন্যে আমরা মুদ্রাগুলিকে যুগ অনুযায়ী ভাগ করতে পারি। এছাড়াও প্রাচীন যুগের মুদ্রাকে প্রধানত দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) গুপ্তপূর্ব যুগের চিহ্ন অঙ্কিত মুদ্রা এবং (খ) গুপ্ত সম্রাটদের প্রচলিত মুদ্রা। গুপ্ত উত্তর যুগের মুদ্রাকে অঞ্চলভিত্তিক ভাবে (ক) সৌরাষ্ট্র ও মালবের মুদ্রা (খ) দক্ষিণাপথের প্রাচীন মুদ্রা (গ) উত্তরাপথের মধ্যযুগের মুদ্রা এবং (ঘ) পশ্চিম

সীমান্ত ও মধ্যদেশ ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। বিদেশীয় মুদ্রাকে প্রধানত (ক) গ্রীক রাজগণের মুদ্রা (খ) শক রাজগণের মুদ্রা (গ) কুষাণ বংশীয় রাজাদের মুদ্রা (ঘ) জনপদ ও গুণসমূহের মুদ্রা—এই ভাগ করা যেতে পারে। ভারতীয় মুদ্রাকে আবার (ক) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে প্রচলিত মুদ্রা (খ) বেসরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা মুদ্রা—এ ভাবেও ভাগ করা যায়।

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রচলিত বলে মুদ্রা রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা সত্ত্বেও খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর আগের কোন মুদ্রা প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা পাওয়া যায়নি, যদিও সাহিত্যে আমরা খ্রিঃপূঃ সপ্তম শতাব্দী থেকেই মুদ্রার উল্লেখ পাচ্ছি; দ্বিতীয়ত উল্লিখিত সময়ের কোন স্বর্ণমুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে চতুষ্কোণ ও গোলাকার প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলিই বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত কাহাপণ বা কার্ষাপণ। এই মুদ্রায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়; কোন নাম বা তারিখ উল্লেখ থাকে না বলে কে কবে মুদ্রাটির প্রচলন করেছেন তা বোঝা যায় না। বহুদিন পর্যন্ত ধারণা করা হত যে এই মুদ্রাগুলি বোধহয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচলিত হত, কিন্তু এখন মগধের সম্রাটগণের প্রচলিত মুদ্রাগুলির সঙ্গে ক্ষুদ্র জনপদের শাসকদের প্রচলিত মুদ্রার পার্থক্য করা সম্ভব। গ্রীক জাতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয় রাজারা মুদ্রায় নানারকম পরিবর্তন করেন। খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতকের গোড়ায় ব্যাকট্রীয় গ্রীক রাজাদের মুদ্রাতেই সর্বপ্রথম রাজার মূর্তি ও নাম সম্বলিত মুদ্রা ভারতে পাওয়া যায়।

লেখমালার মতো মুদ্রার সাহায্যেও ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইন্দো-গ্রীক রাজাদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হলে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইন্দো-গ্রীকদের সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। শুধুমাত্র মুদ্রার সাহায্যেই ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব। যেমন মুদ্রার সাহায্যে জানা যায় যে রাজা ডিমিট্রিয়াস হচ্ছেন প্রথম গ্রীক শাসক যিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য তিনি দ্বিভাষিক মুদ্রার প্রচলন করেন; রাজা মিনান্দারের মুদ্রার বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন স্থানে তার প্রাপ্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সমস্ত ভারতীয় গ্রীক রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শক্তিশালী। শুধুমাত্র মুদ্রার সাহয্যে আটত্রিশ জন ভারতীয়-গ্রীক রাজা এবং দু'জন রানীর নাম জানা সম্ভব হচ্ছে; এদের মধ্যে মাত্র দু'জনের নাম লেখমালায় এবং সাত জনের নাম সাহিত্যিক বিবরণীতে আছে। মুদ্রার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা সম্ভব যে হেলিওক্লেস শেষ ভারতীয়-গ্রীক রাজা এবং তার পরেই ভারতে গ্রীক রাজ্য বিলপ্ত হয়ে যায়।

ঠিক অনুরূপভাবে শক-পহ্লব বংশের পঞ্চাশ জন শাসকদের একটি কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা মুদ্রার সাহায্যে করা সম্ভব। উজ্জয়িনীতে চষ্টন প্রতিষ্ঠিত শকবংশ প্রায় তিন শত বৎসর রাজত্ব করেছিল। এদের বংশানুক্রমিক এবং কালানুক্রমিক তালিকা তৈরি করার ব্যাপারে মুদ্রার সাহায্য আবশ্যকীয়। কারণ মুদ্রাগুলিতে রাজার নাম, তারিখ এবং কোন কোন সময় রাজার পিতার নাম এবং তাঁর অভিধাও বর্ণনা করা আছে। সিংহাসন নিয়ে কহল, দ্বন্দ্ব এবং ফলস্বরূপ একজন বহিরাগতের সিংহাসন অধিকার—সমস্তই মুদ্রার সাহায্যে জানা যায়। কুষাণ মুদ্রার আলোচনা বাদ দিলে কুষাণ বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। রাজনৈতিক ইতিহাসের পুনর্গঠন মুদ্রার সাক্ষ্য কতটা জরুরী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নাসিকের নিকটস্থ জোগলথেম্বীর মুদ্রাভাণ্ডার। এই মুদ্রাভাণ্ডারে

বহুল পরিমাণে শক ক্ষত্রপ নহপানের মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু নহপান এর মুদ্রার উপর গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির নাম, নকশা, ও প্রতীক পুনর্মুদ্রিত হয়। এর দ্বারা গৌতমীপুত্রের হাতে নহপানের পরাজয়ের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল— যে ঘটনা লেখামালার সাক্ষ্যেও সমর্থিত হয়।

দেশীয় রাজাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর স্বল্প পরিচিতি মিত্র বংশের নাম করতে পারি। পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এরা রাজত্ব করতেন; মাত্র দু'টি বা তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তাদের ইতিহাস মুদ্রা ছাড়া অপর কোন উৎস থেকে জানা সম্ভব নয়। গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে লিচ্ছবীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন; কুমারদেবী এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্তের যৌথমুদ্রা বোধহয় সেই ইঙ্গিত বহন করে। মুদ্রা ছাড়া অপর কোন উৎস থেকে আমরা এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না।

ঐতিহাসিকরা মুদ্রার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলেছেন যে কুমারদেবী কি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় মেরীর মতো প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাথে যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করতেন? কাশ্মীরেও রাজা ক্ষেমগুপ্ত ও রানী দিদ্দার নামে প্রচারিত যৌথ মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক কলহণ এই ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দিতে চাননি; কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে রানী দিদ্দা নিজের নামে মুদ্রা প্রচার করছেন; পরবর্তীকালে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছেন। গুপ্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবর্তন করলে দেখতে পাব যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক শক শাসনের উচ্ছেদ, বিক্রমাদিত্য কিংবদন্তী সমস্তই সম্রাট কর্তৃক প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে বোঝা যায়। সুতরাং গুপ্ত প্রশাসনিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও মুদ্রাকে কাজে লাগানো যায়। ৩৯৭ খ্রিস্টাব্দের পরে পশ্চিম ভারতে কোন শক মুদ্রা পাওয়া যায়নি যা শক শাসনের পতনের দিকে আঙুল নির্দেশ করে।

মুদ্রাতত্ত্ববিদ্দের মতে, কাশ্মীরই বোধহয় ভারতের একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে দু'টি-একটি বিক্ষিপ্ত সময় ছাড়া প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে বারো শত বৎসরের মুদ্রার ইতিহাস জানা যায়। কাশ্মীরের মুদ্রা উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলেও অনেক সংখ্যায় পাওয়া গেছে যার দ্বারা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কথা জানতে পারি।

প্রাচীন ভারতের অরাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্বও মুদ্রার সাহায্যে জানা যায়। কোন কোন স্থানে "যৌধেয় গণম্য" অথবা "মালবগণস্যজয়" ইত্যাদি লেখা মুদ্রা দেখতে পাওয়া যায়। "অর্জুনায়ন", "বৃষ্ণী" এবং অন্যান্য মুদ্রা সুনিশ্চিতভাবে প্রজাতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এদের মুদ্রা থেকে বোঝা যায় যে রাজকীয় সার্বভৌমত্ব কোন একটি ব্যক্তির উপর নয়; সামগ্রিক সংগঠনের উপর অর্পিত হত। তক্ষশীলা অঞ্চলে প্রাপ্ত "নিগম" ধরনের মুদ্রা থেকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শহরগুলি বিশেষ ধরনের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ভোগ করত বলে মনে হয়। সাংবিধানিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে শক-কুষাণ মুদ্রাগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রশাসনের স্তরে রাজা এবং তার পরিবারের লোকেরা যুক্ত থাকতেন। উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত শক-মুদ্রা থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে রাজপুত্রেরা ক্ষত্রপ হিসাবে মহাক্ষত্রপদের অধীনে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন এবং তারা মহাক্ষত্রপ নিযুক্ত হলে পুত্রদের ক্ষত্রপ পদে নিযুক্ত করতেন।

রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়াও অর্থনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের কাজে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম। মুদ্রা প্রধানত ও প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট তৌলরীতিতে নির্মিত ও ধাতুগত বিশুদ্ধি-সমন্বিত ধাতব বিনিময় মাধ্যম। অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এখনও অবধি মুদ্রাকে

উৎস হিসাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। কারণ মুদ্রা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং অনুমানমূলক। খুব সাধারণভাবে দেখলে মুদ্রার ব্যাপক উপস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং অপরদিকে মুদ্রার অনুপস্থিতি অর্থনৈতিক স্থবিরতার পরিচায়ক। সুতরাং সাধারণভাবে দেখলে মুদ্রা থেকে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক মান নির্ণয় করা সম্ভব। নন্দদের ও মৌর্য দ্বারা প্রচলিত চিহ্ন অঙ্কিত মুদ্রাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়; আফগানিস্তান অবধি তাদের গতি বৈদেশিক বাণিজ্যে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ভারতের অর্থনীতিতে মুদ্রা-অর্থনীতি প্রচলনের কৃতিত্ব মৌর্যদের প্রাপ্য বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। মৌর্যদের পতনের পরে আফগানিস্তানের উপর ভারতীয়দের কর্তৃত্ব লুপ্ত হয়ে গেলে ভারতে রূপার যোগানের ঘাটতি দেখা যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে রৌপ্য মুদ্রার প্রাচুর্য দেখা যাবার পর পরবর্তীকালে এর যোগানে কিছুটা মন্দা থেকে যায়। কুষাণরা একাধিক উৎকৃষ্ট স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছেন; যা তারা ভারত-রোম বাণিজ্য বা মধ্য এশিয়া বা ভারতের অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করতেন। কুষাণ মুদ্রা ইথিওপিয়াতে পাওয়া গিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে কুষাণ মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত দেয়। ভারত-রোম বাণিজ্যের অন্যতম অংশীদার দক্ষিণ ভারতের সাতবাহনরা সমৃদ্ধশালী শক্তি হয়ে উঠেছিনেল। নাসিক লেখমালায় বিদেশী মুদ্রার উপস্থিতি এবং দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়যোগ্যতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ ভারত থেকে রোমিক মুদ্রার আবিষ্কার রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের দূর পাল্লার বাণিজ্যের স্পষ্ট পরিচায়ক। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনদের সময় রোমান মুদ্রা দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি অর্থনীতিতে বিরাজ করত। ভারতে রোম বাণিজ্য যতদিন অব্যাহত ছিল ততদিন পর্যন্ত ভারতের স্বর্ণমুদ্রার যোগানে বোধহয় কোন সমস্যা হয়নি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে ভাটা পড়ে। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা গুপ্ত যুগে ভারত-চীন বাণিজ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চীন ভারত থেকে সুতিবস্ত্র, শর্করা (চিনি) এবং অন্যান্য জিনিসের আমদানি করত এবং এর বিনিময়ে ভারতের স্বর্ণের যোগান সম্ভব হত। ভারত-রোম বাণিজ্যের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যেত সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এইসব জিনিসের উৎপাদন নিজেরা শিখে নিল, ভারতের উপর তাদের নির্ভরশীলতা কমে গেল; ফলস্বরূপ ভারতের স্বর্ণমুদ্রা আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। গুপ্ত উত্তরকালে ভারতে মুদ্রার সঙ্কট এবং একটি সীমাবদ্ধ সংকুচিত অর্থনীতির সৃষ্টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গুপ্ত উত্তরকালে পাল ও রাষ্ট্রকূটদের পক্ষেও কোন স্বর্ণমুদ্রা প্রচার করা সম্ভব হয়নি। অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বিচার করতে মুদ্রার অসীম সম্ভাবনা আছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। মুদ্রা নির্মাণে নির্দিষ্ট তৌলরীতির ব্যাপক পরিবর্তন এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার খাদের পরিমাণ বিচার করে ঐতিহাসিকরা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক (বিশেষত বাণিজ্যিক) উন্নতি বা মন্দার চিত্র দেখাতে সক্ষম।

মুদ্রায় বহুক্ষেত্রেই মুখ্য দিকে শাসকেরা প্রতিকৃতি (রাজকীয় উপাধিসহ) থাকে, গৌণ দিকে বিবিধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত থাকে। মুদ্রার মাধ্যমে, বিশেষত কুষাণ ও গুপ্ত আমলে, রাজার প্রতাপ ও প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রচার করা হত। কুষাণ আমল থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত মুদ্রা জারি করা শাসকদের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করা চলে।

এ ছাড়াও মূর্তি চর্চা এবং শিল্প চর্চার ক্ষেত্রেও মুদ্রাকে ব্যবহার করা হয়। প্রথম দিকের ভারতীয় মুদ্রায়

মনুষ্যমূর্তির নির্মাণে কোন দক্ষতা বা রুচির ছাপ পাওয়া যায় না। ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের মুদ্রায় খোদিত মনুষ্যমূর্তিকে আমরা প্রাচীন যুগের শিল্পের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলতে পারি। অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও শুধুমাত্র মূর্তির ছবি দ্বারা তাদের পারিবারিক রক্তের সম্পর্ক অনুমান করা সম্ভব। শক-পহ্লবদের মুদ্রায় এই উন্নত শিল্পকৌশল অনুপস্থিত, কিন্তু পরবর্তীকালের কুষাণ মুদ্রায় উন্নত শিল্প নমুনা দেখা যায়। বাস্তবিক, কুষাণরা বহু দেবদেবীকে মানবী মূর্তিরূপে উপস্থিত করেছেন। গুপ্তরা বিদেশীয় শৈলীকে আত্মস্থ করে মুদ্রা নির্মাণ শিল্পের সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক পি. এল. গুপ্ত., গুপ্ত মুদ্রাকে কুষাণ মুদ্রার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। মৌলিকত্বের বিচারে গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার তুলনা মেলা ভার।

১.৩.৩ স্থাপত্য/ভাস্কর্য ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ

স্থাপত্য/ভাস্কর্য এবং মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষকে আমরা বাস্তবভিত্তিক উপাদান বলতে পারি। এখানে কোন কৃত্রিমতা নেই, কোন জালিয়াতির অবকাশ নেই। প্রত্নবস্তুকে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা বিশেষজ্ঞের কাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত এই সব কাজ প্রায় অনভিজ্ঞ অথচ উৎসাহী সংগ্রাহকরা করতেন। ১৮৬১ সালে স্যার আলেকজেন্ডার কানিংহাম ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রত্নবস্তু উদ্ধারের কাজ শুরু হয়।

১৯০২ সালে স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে প্রত্নবস্তু উদ্ধার এবং তা বিশ্লেষণের কাজে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সাঁচী, তক্ষশীলা, সারনাথ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ স্তম্ভ, ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বাস্তব দিকটি সভ্যজগতের কাছে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পীয় সভ্যতা আবিষ্কারকে বিবেচনা করতে পারি। ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথম একটি নাগরিক সভ্যতা আবিষ্কৃত হল। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব বেশ কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেল। স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা হরপ্পীয় সংস্কৃতিকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত করল। অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ বোধহয় খ্রিঃপূঃ নবম থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাপ্ত ধূসর রঙের চিত্রিত মৃৎপাত্রগুলি। এই মৃৎপাত্রগুলির আবিষ্কার ভারতবর্ষে লৌহ যুগ এবং আর্যদের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সংস্কৃতি বিস্তারের মধ্যে এক সমীকরণ ঘটাতে সম্ভব করেছে। প্রত্নতত্ত্ব ও প্রত্নবস্তু নিয়ে আলোচনার শেষ নেই এবং স্বল্প পরিসরে প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এইটুকু বলা যেতে পারে যে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আধুনিককালে যে আলোচনাই হোক না কেন তাতে পুরাস্তু প্রমাণ ও উল্লেখ প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে।

পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত কার্বন^{১৪} পদ্ধতি নিজে উৎস নয়, কিন্তু উৎসকে পরীক্ষা করার জন্যে আধুনিককালে প্রায় অপরিহার্য। যে কোন জৈব পদার্থে কার্বন পরমাণুর অবস্থিতির দ্বারা কুড়ি হাজার বছরের নির্মিত পদার্থের তারিখ এবং বয়ঃসীমা নির্ণয় করা সম্ভব। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় কার্বন^{১৪}-এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে; আবার উদ্ভিদ জীব-জন্তুর খাদ্য। সুতরাং খাদ্য হিসেবে প্রাণীরা যখন এই উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন পরোক্ষভাবে কার্বন^{১৪}-এর পরমাণুগুলি প্রাণীদেহে প্রবেশ করে।

জীবজন্তু ও মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন তাদের দেহ থেকে কার্বন^{১৪} নির্গত হতে থাকে। নানা গবেষণার

পর বিজ্ঞানীরা মৃত প্রাণীর দেহ থেকে কত পরিমাণ কার্বন^{১৪} নির্গত হয় কত অবশিষ্ট থাকে তা হিসাব করতে সমর্থ হয়েছেন।

মৃত বস্তুর দেহে অবস্থিত কার্বন^{১৪} পরমাণুর পরিমাণ থেকে জানা যায় বস্তুটি কত পুরাতন। এই কার্বন^{১৪} পদ্ধতির সাহায্যে পূর্ব শতাব্দীর যে কোন বস্তুর তারিখ নির্ধারণ করা যাবে; সেইজন্যে বলা হয়ে থাকে "Carbon^{14} is called the measuring rod of antiquity"—যে কোন জৈববস্তুর প্রাচীনত্ব নির্ণয় করার মানদণ্ডস্বরূপ।

১.৩.৪ পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখনন

পুরাতত্ত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, যেসব যুগে ইতিহাসের লিখিত উপাদান নেই বা অতি সামান্য (তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক/প্রায় ঐতিহাসিক যুগ), সেই সব সময়ের কথা জানার জন্যই ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎখনিত "পাথুরে প্রমাণ" বিশেষভাবে উপযোগী। এই ধারণা এখন অনেকটাই ভিন্নতর। যে আমলে লিখিত তথ্যসূত্র নেই সেই আমলের জন্যে তো বটেই, কিন্তু যে যুগে লিখিত তথ্যসূত্র উপস্থিত সেই সময়ের ইতিহাস বোঝার জন্যও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদির গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে খ্রিঃপূঃ ৬০০ থেকে খ্রিঃ ৩০০ পর্যন্ত নগরজীবনে যে প্রাণবন্ত সম্প্রসারণশীল চরিত্র দেখা যায়, তার জন্যে কেবলমাত্র লিখিত বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান ও উৎখননের দ্বারা নগরজীবনের চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। নগরের আয়তন, প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার আয়তন, নগরের বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, জলনিকাশী ব্যবস্থা, ইঁটের মাপ, নানাবিধ মৃৎপাত্র সহ নগরবাসীর ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নগরের যে অনুপুঙ্খ আলোচনা করা চলে, প্রথাগত সাহিত্যিক বর্ণনায় (এই উপাদানের গুরুত্বও কম নয়) তা সব সময়ে ধরা পড়ে না। নগরের বিকাশ ও অবক্ষয় দুই বুঝতেই পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ বিশেষভাবে সহায়ক।

১.৪ সাহিত্যগত তথ্যসূত্র

ঐতিহাসিক বিচারে লিখিত উৎসকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। এখানে লেখক সচেতনভাবে তার বক্তব্যকে উপস্থিত করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের উপস্থিতির জন্যে গ্রীক ও রোমের ইতিহাস লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা সম্ভব, কিন্তু লিখিত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা বোধহয় নিরাপদ নয়।

অলিখিত উৎসের মতো লিখিত উৎসকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

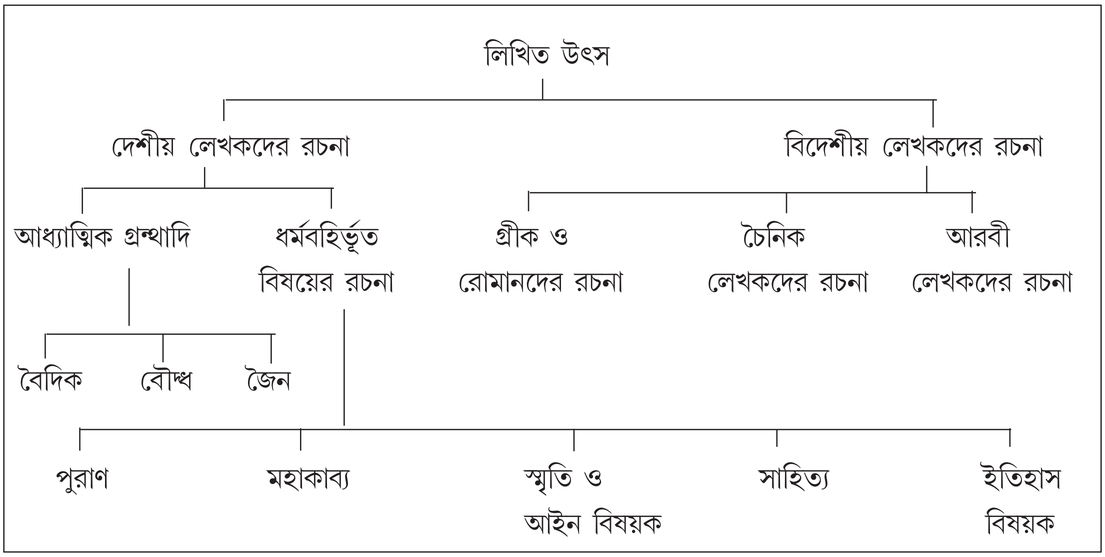

আর্যদের থেকে সাহিত্যগত বিবরণের সূচনা বলা যায়। আর্যদের সম্বন্ধে জানবার প্রধান উৎস চতুর্বেদ। আর্যরা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃপূঃ ভারতে আসেন এবং ১৪০০ খ্রিঃপূঃ থেকে বেদ রচনা শুরু হয়। ১৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃপূঃ অবধি প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উৎস হল বৈদিক সাহিত্য। *ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব* এই চারটি বৈদিক সংহিতা এবং প্রাচীনতম হল ঋগ্বেদ। এখানে প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের তথ্য খোঁজা বৃথা; কিন্তু পরোক্ষভাবে কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদগ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে আর্যদের অভিপ্রয়োজনের কোন উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য বহু দূর অবস্থিত একটি বাসভূমির কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করার উল্লেখ এখানে নেই। কিন্তু বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য বহু দূর অবস্থিত একটি বাসভূমির কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই উল্লেখ পরোক্ষভাবে অভিপ্রয়াণের তত্ত্বকে সমর্থন করে। এ ছাড়া অপর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ হল "দশরাজার যুদ্ধ"। এই যুদ্ধ আন্তঃ উপজাতীয় সংঘর্ষের একটি নমুনা। উদাহরণকে বহু দূরে বিস্তৃত না করে আর একটি উদাহরণ *শতপথ ব্রাহ্মণ* থেকে দেওয়া যায়। সেটি হল বিদেঘ মাঠরের অগ্নিবৈশ্বানরকে অনুসরণ করে সরস্বতী নদীর তীর থেকে (বর্তমান হরিয়ানা) পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া। এটি কি পরিষ্কারভাবে আর্য সভ্যতার পূর্বদিকে প্রসারের উল্লেখ নয়? সর্বোপরি বৈদিক সাহিত্যের ধারাবাহিকতা থেকেই প্রায় এক হাজার বছরের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে পুনর্গঠন করতে হবে, কারণ এই যুগ পূর্ববর্তী হরপ্পীয় সভ্যতার মতো প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ নয়। *অথর্ববেদ*-এ একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সুস্পষ্ট উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। জাতিভেদ প্রথা আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা। বৈদিক আর্যদের সৃষ্ট সমাজব্যবস্থায় এই সমস্যা প্রতিপালিত হয়েছে এবং দেশ, কাল, সময় অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই মনে করেন যে সমসাময়িক অন্যান্য লিখিত উৎস থেকে তথ্যকে সরাসরি গ্রহণ না করে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তথ্যগুলিকে গ্রহণ করা উচিত। সমসাময়িক অন্যান্য

গ্রন্থের তুলনায় বেদের ঐতিহাসিকতা তাঁর মতে অনেক বেশি। ভারতীয় দর্শনের বিবর্তনে বৈদিক সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য নিয়ে পূর্বে বহু আলোচনা করা হয়েছে এবং এখনও হয়। কিন্তু সব কিছু বলা সত্ত্বেও বৈদিক সাহিত্য রচয়িতাদের ইতিহাস-দর্শনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে পারা যায় না। বহু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা (যেমন আর্য ও অনার্যদের সংঘর্ষ এবং পরিণামে আর্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল) তাঁরা উপেক্ষা করেছেন বা এড়িয়ে গেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই সময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখতে গেলে বহু অনিশ্চয়তা ও ফাঁক এসে পড়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের আলোকে আমাদের বৈদিক যুগ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব; কিন্তু স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং নির্দিষ্ট সামাজিক আচরণকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অব্যাহত রাখা তাদের অন্যতম কৃতিত্ব। বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিক ভারতীয়রা প্রাচীন ভারতীয় যুগের সঙ্গে যোগ রাখতে পারেন, যে যোগসূত্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনুপস্থিত।

বৈদিক সাহিত্যের ভাণ্ডার যেখানে শেষ হয়, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য সেখান থেকে শুরু হয়েছে বলে মনে করতে হবে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাহিত্য রচয়িতারা বৈদিক সাহিত্যকারদের চেয়ে পার্থিব বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বৌদ্ধসাহিত্য অনেক বেশি সমাজ-সচেতন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সাহিত্যেই খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ষোড়শমহাজন পদের বর্ণনা আছে যা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় অন্যতম সহায়ক। অবশ্য কোন বৌদ্ধ গ্রন্থই বুদ্ধের সমকালীন নয়। জৈন গ্রন্থগুলি আরও পরে রচিত, কিন্তু পরবর্তী আমলের রচনা হলেও খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের স্মৃতি এই সাহিত্যে বিবৃত বলে পণ্ডিতদের ধারণা। *দীর্ঘনিকায়* এবং *অঙ্গুত্তর নিকায়* গ্রন্থে মগধের রাজনৈতিক উত্থানের বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থ *গভবতী* সূত্রতে খ্রিঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর ষোড়শমহাজনপদের একটি বিকল্প তালিকা খুঁজে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রর লেখা *পারশির্ষ পার্বণ* মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। ভদ্রবাহু রচিত *জৈনকল্পসূত্র* গ্রন্থে জৈনধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

১.৪.১ পুরাণ

পূর্বেকার ব্রিটিশ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা পুরাণকে ভারতীয় ইতিহাসের উৎসরূপে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছেন। পুরাণকে তারা কতকগুলি অবিশ্বাস্য গল্পকথার সংকলন বলে মনে করতেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। রাজবংশের ইতিবৃত্তের বাইরে ঐতিহাসিকেরা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের আকর তথ্য হিসাবে পুরাণের উপযোগিতা স্বীকার করেন। বিশেষত আদি মধ্যযুগে (খ্রিঃ ৬০০-১৩০০) ভক্তিবাদ আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ ধর্মসম্প্রদায়গুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্থানীয় ও কালগত বৈচিত্র্য, দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিভিন্ন আদর্শ ও মূর্তিতত্ত্বের আলোচনার জন্যে পুরাণের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এখন পুরাণকে পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যগত সূত্র বলে দাবী করা হয়।

পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। পুরাণের মধ্যে রাজাদের বংশ তালিকা, তাদের কার্যাবলী, রাজাদের নাম পাওয়া যায়; সেইদিক থেকে দেখলে পুরাণকে ক্ষত্রিয়দের প্রতিনিধিমূলক সাহিত্য বলা যায়। পুরাণের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণের বক্তব্য বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এমন কী, প্রত্নতাত্ত্বিক বক্তব্যের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। পারজিটার প্রথম পুরাণের বিভিন্ন বক্তব্যগুলিকে সুসংহত করে ইতিহাসের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি এবং তার পরবর্তী

গবেষকরা এই কাজে বিশেষ সফল হননি; আবার অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক সাহিত্যের বক্তব্যের সঙ্গে পুরাণের বক্তব্যের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখা যায়; মতবিরোধ ঘটলে অধ্যাপক রমেশ মজুমদারের মতে পুরাণের বক্তব্যকে বৈদিক সাহিত্যের আলোকে বিচার করা উচিত।

১.৪.২ মহাকাব্য

দেশীয় সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দু'টি মহাকাব্য। সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারের জন্য এদের অবদান অনস্বীকার্য। দু'টি গ্রন্থতেই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনাকে বিশাল এক চালচিত্রের মধ্যে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চালচিত্রের পরিধি এত বড় যে প্রকৃত কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এর পশ্চাতে না থাকলে এই বই শুধুমাত্র কল্পনার ভিত্তিতে লেখা সম্ভব নয়। রামায়ণ-এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামের রাজ্য জয় এবং সুশাসনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আর্য সভ্যতা বিস্তার এবং সংহতকরণের একটি ছবি ফুটে ওঠে। মহাভারত রামায়ণ-এর চেয়েও বহু বিতর্কিত একটি গ্রন্থ। বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু "মহাভারতের যুদ্ধের" কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা; যদি এই মূল্য প্রমাণিত হয় তাহলে মহাভারতকে আর ধর্মীয় গ্রন্থ বলা যাবে না এবং এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে আরো গবেষণা করা সম্ভব।

প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হয় যুদ্ধটিকে কেন্দ্র করে। বৈদিক সাহিত্য রচয়িতারা মহাভারত-এ কথিত বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন কুরু, পঞ্চাল, ভরত ইত্যাদি নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র স্থানটিকে তারা পুণ্যক্ষেত্রবলে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু কোথাও এখানে যুদ্ধ হয়েছিল বা এই গোষ্ঠীর লোকেরা রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল তার উল্লেখ নেই। তাহলে খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃপূঃ ৬০০ অব্দের মধ্যে কোন্ সময় যুদ্ধ ঘটেছিল? কিন্তু মহাভারত-এর ঐতিহ্য ভারতীয় জনমানসে এত গভীরভাবে দৃঢ়বদ্ধ যে পরবর্তীকালে বহু লেখক তাদের গ্রন্থে মহাভারত-এর যুদ্ধের কথা বার বার বলেছেন। মহাভারত-এর সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক উল্লেখ (খ্রিঃপূঃ ৬৩৭) আইহোল লিপিতে পাওয়া যায়, যেখানে লেখক নিজস্ব গণনার পদ্ধতিতে বলেছেন, মহাভারত যুদ্ধের পর ৩৭৩৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আরও পুরাতন উৎস *কথাপুরাণ*-এ পরীক্ষিতের জন্মের তারিখের সঙ্গে মহাপদ্ম নন্দের সিংহাসন আরোহণের ব্যবধান নির্ণয় করা হয়েছে। যেহেতু তারিখটির পাঠনির্ণয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে তাই হিসাব অনুসারে মহাভারতের তারিখ ১৯০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ১৪৫০ খ্রিঃপূর্বাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, মহাভারতের সভ্যতার কোন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত না হওয়ার ফলে এক ধরনের বিভ্রান্তি থেকেই যায়। ১৯৫০-৫২ সালে হস্তিনাপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহ্য অনুসারে পরীক্ষিতের বংশের প্রধান শাখা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতে থাকেন এবং পরীক্ষিতের বংশের ষষ্ঠতম উত্তর পুরুষ ছিলেন নিক্ষাকশু। পুরাণের বক্তব্য অনুসারে নিক্ষাকশুর রাজত্বকালে হস্তিনাপুরে মহাবিপর্যয় ঘটে। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এও মহামারী ও শস্য ধ্বংসের কথা লেখা আছে। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এক মহাপ্লাবন যা হস্তিনাপুরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিক্ষাকশু হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করে কোশাম্বীতে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

হস্তিনাপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা মাটির তলে পাঁচটি স্তর পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে একটি মহাপ্লাবনের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং এই প্লাবনের পরই যে শহরটি পরিত্যক্ত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট নয়। মহাভারত-এর ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্য আমাদের আরও প্রত্নবস্তু এবং আরও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

১.৪.৩ আইন ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

স্মৃতি ও আইন বিষয়ক গ্রন্থগুলি সমসাময়িক যুগের সামাজিক ইতিহাস রচনার কাজে বিশেষ সহায়ক। এই পর্যায়ের আইন ও রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*। *অর্থশাস্ত্রকে* কেন্দ্র করে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা থাকলেও এ থেকে মৌর্যদের কেন্দ্রাভিগ আমলাতন্ত্রের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। কৌটিল্লীয় *অর্থশাস্ত্র*-এ প্রশাসন চালাবার জন্যে উপদেশগুলি মৌর্য আমলে বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে এই শাস্ত্রের বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। রাষ্ট্রপরিচালন ক্ষমতা দখল ও সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে অর্থনীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—এইগুলি *অর্থশাস্ত্র*-এর বিষয়। প্রাচীন ভারতীয়রা কেবলমাত্র পারলৌকিক বিষয়ের চিন্তা করতেন, সযত্নে লালিত এই ধারণা *অর্থশাস্ত্র*-এর ভিত্তিতে বাতিল করা যায়। অপর দু'টি গ্রন্থ হল পাণিনীর *অষ্টাধ্যায়* এবং পতঞ্জলির *মহাভাষ্য* ব্যাকরণ গ্রন্থ আলোচনা করবার সময় পাণিনী সর্বদা বাস্তবজীবন থেকে উদাহরণ দিয়েছেন যা পাঠককে সমসাময়িক যুগের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অবহিত করে। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য* খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা। সমাজসচেতন লেখক ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের ভারত আক্রমণের সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করেছেন।

প্রাচীন ভারতে ধর্ম আধুনিক 'রিলিজিয়ন' অর্থে ব্যবহৃত নয়। ধর্ম বলতে চিরাচরিত রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-বিচার, নিয়ম, বিধিনিষেধ এগুলিকেই বোঝায়। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয় যেমন আছে, তেমন আছে বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, পারিবারিক জীবন ও বিবাহ, উত্তরাধিকার, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য উপদেশাত্মক এবং বেদবিহিত ঐতিহ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্রের আদর্শ সর্বদা অবিকৃতভাবে এই বিশাল উপমহাদেশের সর্বত্র সমানভাবে পালিত হত কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু আদর্শ রীতিনীতির পরিচয় এই তথ্যসূত্রে নিশ্চয়ই বিধৃত।

ধর্মশাস্ত্র—মনুর ধর্মশাস্ত্রকে ভিত্তি করে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। গুপ্ত যুগের বিখ্যাত আইন গ্রন্থগুলির রচয়িতারা ছিলেন নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন। কাত্যায়ন আইন ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রাজা ছিলেন আইনের উৎস। বিচারের কাজে রাজাকে অন্যেরা সাহায্য করতেন। রাজা ছাড়া বিচার করবার অধিকার ছিল সমবায় সংঘ ও গ্রামসভাগুলির। বিচারের ভিত্তি ছিল আইনগ্রন্থ, প্রচলিত প্রথা ও রাজার আদেশ। কাত্যায়ন নিজে বর্ণগত শাস্তির সমর্থক ছিলেন কিন্তু সবক্ষেত্রে তা করা হত কিনা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ আছে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সুতরাং প্রাচীনকালের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা দেখতে পাই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থতেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাই। বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* কাব্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও চাণক্য কর্তৃক নন্দবংশের উচ্ছেদ এবং চন্দ্রগুপ্তের মগধের সিংহাসন আরোহণের উল্লেখ আছে। *দেবী চন্দ্রগুপ্তম্* বিশাখদত্তেরই রচনা। এই নাটকে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের ছবি পাওয়া যায়। কালিদাসের *রঘুবংশম্* কাব্যে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয়ের আভাস পাওয়া যায়।

১.৪.৪ জীবনীগ্রন্থ

গুপ্ত পরবর্তী যুগের সাহিত্য উপাদানের মধ্যে দু'ধরনের উপাদানকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উৎস সন্ধানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। প্রথম ধরনের লেখা হল জীবনীগ্রন্থ, দ্বিতীয় ধরনের লেখা হল

স্থানীয় উপাখ্যান। বাণভট্টের লিখিত *হর্ষচরিত* গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থটিকে লেখক (ক) হর্ষবর্ধনের পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত এবং (খ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যর প্রথম দিকের রাজনৈতিক বিবরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হওয়ার জন্যে বইটির মর্যাদা হানি হয়েছে কোন সন্দেহ নেই। বাক্পতিরাজ *গৌড়বজে* কাব্যে কনৌজের যশোবর্মনের গৌরবগাথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এত যান্ত্রিকতার উপস্থাপন পদ্ধতি যে তার বিষয়বস্তুর সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা প্রশ্ন তুলেছেন। অনুরূপভাবে বিলহন লিখিত *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* কাব্যে চালুক্য রাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের গৌরব বর্ণনা হয়েছে; কিন্তু কবির বর্ণনা বাস্তবানুগ নয়। জীবনী কাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্যে পাওয়া যায়। এটি কৈবর্ত বিদ্রোহের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ; কিন্তু কাব্যটি রামপালের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এবং বিরোধী পক্ষের কোন বক্তব্য স্থান পায়নি। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোকই দ্ব্যর্থক। এক অর্থে একটি রামচন্দ্রের কাহিনী, অপরদিকে সম্রাট রামপালের কাহিনী। অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের মধ্যে আছে জয়সিংহের *কুমারপালচরিত*, পদ্মগুপ্তের *নবসাহসাঙ্কচরিত*, ন্যায়চন্দ্রের *হাসির* কাব্য। এইসব গ্রন্থের সাহায্যে অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠন করা যায় না। পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এইসব গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিকদের দূরদৃষ্টি অনুপস্থিত।

ভারতবর্ষের সুবিপুল লিখিত সাহিত্যের সম্ভারে একমাত্র একটি পুস্তককে যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায়—সেটি হল কলহণের *রাজতরঙ্গিণী*। লেখক অতিপ্রাচীনকাল থেকে তার সময় পর্যন্ত কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন। পূর্বের লেখকদের লেখা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন। ১১৪৮ খ্রিঃ অব্দে কলহণ তার কাজ শুরু করেন এবং পরের কয়েক বছরে তা শেষ করেন। গ্রন্থ-এর প্রথম অংশে উপাখ্যান কিংবদন্তী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা আছে। খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতাব্দী থেকে তার আলোচনা অনেকটা ইতিহাসকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। রাজতরঙ্গিণীর ঐতিহ্য কাশ্মীরে মধ্যযুগেও অনুসৃত হয়েছিল, বেশ কয়েকটি বই ঐ নামে লেখা হয়; যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মধ্য যুগ অবধি কাশ্মীরের বিবরণ লেখা আছে।

গুজরাটের চালুক্য রাজাদের প্রশংসা করে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল এবং রাজা ছাড়াও চালুক্য রাজমন্ত্রী তেজঃপাল ও বাস্তুপালের জীবনী পাওয়া যায়। মন্ত্রীর জীবনীকারেরা প্রশাসনিক ইতিহাসের প্রতি জোর দিয়েছেন। গুজরাটের বিদগ্ধ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের লিখিত *দ্ব্যয়াশ্রু কাব্য* গ্রন্থে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। প্রথম শ্রেণীর ব্যাকরণবিদ্ হিসাবে তার লিখিত *সিদ্ধ-হেম-শব্দ-অনুশাসন*-ই যথেষ্ট ছিল। *দ্রব্যশাস্ত্র মহাকাব্য*-তে তিনি চালুক্যদের ইতিহাস ও ব্যাকরণ রচনা একই সঙ্গে করায় ইতিহাস রচনা তার যথার্থ মানে গিয়ে পৌঁছায়নি। এই সমস্ত রচনার মধ্যে লিখিত ইতিহাসের ঐতিহ্য প্রবহমান এবং ঐতিহ্যের এই ধারা সতত প্রবহমান, কিন্তু সর্বত্র একই রকমভাবে গতিশীল নয়।

১.৪.৫ বিদেশী সাহিত্য

দেশীয় সাহিত্যের বিবরণের পরই বৈদেশিক সাহিত্যের কথা আলোচনা করা দরকার। বৈদেশিক সাহিত্যের বিবরণীর দু'রকম ভাগ হতে পারে (১) যেসব বিদেশী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদের বিবরণ লিখেছেন (২) ভারতবর্ষে নিজেরা আসেননি কিন্তু অপরের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে তাদের বিবরণ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রচয়িতাদের মধ্যে হেরোডেটাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পারসিকদের অধীনস্থ ছিল এবং পারসিক যুদ্ধের সময় বহু ভারতীয় পারসিক সম্রাটের পক্ষ গ্রীসের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশ নিয়েছিল। বোধহয় এই সময় থেকেই গ্রীক লেখকদের ভারত সম্পর্কে কৌতূহল শুরু হয়। হেরোডেটাস ভারত সম্বন্ধে যে নানারকম তথ্য পরিবেশন করেছেন তার সবটাই হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সেই সুপ্রাচীনকালেও তিনি ভারত সম্পর্কে একটি সঠিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা জনবহুল। খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর আর একজন গ্রীক লেখক টিসিয়াস (৪১৬-৩৯৮ খ্রিঃপূঃ) ভারত সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখেছেন কিন্তু তার সমস্ত বিবরণই অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ।

আলেকজান্ডার তাঁর অভিযানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অনুসন্ধানের জন্য কয়েকজন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ্‌কে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আলেকজান্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস সিন্ধু নদীর মোহানা থেকে পারস্য উপসাগর অবধি পরিভ্রমণের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লেখেন, যদিও মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। কিন্তু অ্যারিয়ান তাঁর বই ইন্ডিকা লেখার সময় নিয়ারকাসের বই-এর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অ্যারিয়ানের লেখা থেকে নিয়ারকাসের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে। নিয়ারকাসের অপর সাথী অ্যানিমিক্রিটাসও সমুদ্র অভিযানের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটিও অতিশোয়ক্তি দোষে দুষ্ট। অ্যারিস্টোবুলাস ছিলেন ভূগোলবিদ্; অ্যারিয়ন আলেকজান্ডারের বিবরণ লেখার সময় অ্যারিস্টোবুলাসকে ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টোবুলাস অতি বৃদ্ধ, প্রায় আশি বছর বয়সে তার লেখা শুরু করেছিলেন। সুতরাং স্মৃতিভ্রষ্টতাবশতঃ হয়তো তিনি অনেক কথা ভুল লিখতে পারেন। এই সমস্ত কারণের জন্যে খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা পুস্তকে। কিন্তু এখানেও মূল বইটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বট্রাবো, অ্যারিয়ান, জাস্টিন, ডায়াডোয়াস ইত্যাদি পরবর্তী লেখকেরা মেগাস্থিনিস থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন; মেগাস্থিনিসের রচনার সংক্ষিপ্তসার করেছেন। এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে মেগাস্থিনিসের মূল বক্তব্য খুঁজে বার করতে হবে। তাঁর লেখায় (ক) ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের বর্ণনা (গ) ভারতে দাস প্রথার অনুপস্থিতি (ঘ) সাতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ভারতীয় সমাজ, ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়। ধ্রুপদী অন্যান্য গ্রীক লেখকদের মধ্যে আমরা খ্রিঃপূঃ প্রথম শতাব্দীর অ্যারিবান, ডায়াডোয়াস, সিকুলাস ইত্যাদির নাম করতে পারি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক *পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী* বই লিখেছিলেন। বইটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং সকলের থেকে স্বতন্ত্র। লেখক বহুবার বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসেছেন; ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, তার বৈদেশিক বাণিজ্য, নগর বন্দরের এক বিশ্বস্ত চিত্র তার লেখাতে খুঁজে পাওয়া যায়। টলেমি ছিলেন অতীতের প্রথিতযশা ভূগোলবিদ্। তার ভূগোল বই-এ ভারত সম্বন্ধে পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। ক্লডিয়াস টলেমি আলেকজান্ড্রিয়ায় বসে তাঁর ভূগোল রচনা করেন। আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে রচিত এই গ্রন্থে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ সহ বহু ভারতীয় এলাকার উল্লেখ আছে। কিন্তু মানচিত্রে নানা ত্রুটির জন্যে ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক আকার সম্পূর্ণ

বিকৃত হয়ে গিয়েছে। ত্রিকোণাকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশ টলেমির ভূগোলে প্রায় আয়তাকার। টলেমির মতো পেরিপ্লাসের লেখা দেখে বোঝা যায় যে তার ভূগোল বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল; ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মরুভূমি, পাহাড় ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বর্ণনা বাস্তবানুগ। ভৃগুকচ্চ থেকে কন্যাকুমারী অবধি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের এক নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষে টিয়ানার অ্যাপোলোনিয়াস ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। ২১৭ খ্রিঃ তার জীবনী লেখেন ফিলোবেট্রটাস। অ্যাপোলোনিয়াসের সঙ্গী নাবিক ভামিস একটি বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছিলেন; তার উপর নির্ভর করে জীবনী লেখা হয়। দু'জনের মধ্যে ভামিসের বিবরণ গ্রহণযোগ্য, কারণ অনেকক্ষেত্রে তিনি নিজে যা দেখেছিলেন তার বিবরণ লিখেছেন। ভারত-রোম বাণিজ্যের যুগে বেশ কয়েকজন রোমান ঐতিহাসিক ভারতের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। এঁরা হলেন প্লুটাক, স্ট্রাবো এবং প্লিনী। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ভারতীয় সভ্যতার এক নির্ভরযোগ্য বাস্তব বিবরণ গ্রীক-রোমান লেখকদের কাছে পাওয়া যায়। বহু বিষয়, যার সম্বন্ধে সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য একেবারেই নীরব—গ্রীক-রোমান লেখকরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন; কিন্তু তাদের লেখার দু'একটি ত্রুটি দেখা যায়। যেমন, তারা ভারতীয় ভাষা, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়ার দরুন ভারতীয় সমাজকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন, ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়; ফলে তাদের বিচার-বিবেচনা সর্বত্র সঠিক হয়েছে একথা বলা যাবে না।

গ্রীক-রোমান লেখকদের ভারত-রোম বাণিজ্য সম্পর্কের অবনতির পর ভারত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা করতে দেখা যায় না। কিন্তু এশীয় মহাদেশের অপর এক প্রান্ত থেকে ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার শুরু হওয়ার পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক ভারত পরিভ্রমণে এসেছেন। এদের মধ্যে অনেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বিশেষভাবে গুপ্ত যুগে আগত ফা-হিয়েনের (৪০৫-১২ খ্রিঃ) নাম করতে পারি। এ ছাড়া, ৫১৮-৫২২ খ্রিঃ মগধের রাজসভায় সং-ইউনের দৌত এবং তার বিবরণ এবং সর্বোপরি হিউ-য়েন-সাং-এর বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এঁরা কেউ কেউ সরাসরিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেমন—ই-ৎ সিং শ্রী গুপ্তের কথা, হিউ-য়েন-সাং হর্ষবর্ধন এবং সমসাময়িক অন্যান্য রাজাদের কথা উল্লেখ করেছেন। সমস্ত চৈনিক পরিব্রাজকের মধ্যে আমরা হিউ-য়েন-সাং-কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে পারি; কারণ তিনি ভারতে দীর্ঘ দিন ছিলেন (৬২৯-৬৪৫ খ্রিঃ), ভারতীয় বিভিন্ন মহাবিহারে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং উত্তর ভারতের থানেশ্বর থেকে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী পর্যন্ত পর্যটন করেছেন; তাই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় তিনি অপরিহার্য। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অপর একজন পরিব্রাজক হলেন হুই-চাও (৭২৭ খ্রিঃপূঃ)। তাঁর লেখায় কনৌজের যশোবর্মন এবং কাশ্মীরের মুক্তাপীড় সম্বন্ধে জানতে পারি।

চৈনিক পরিব্রাজকদের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একটা কথা বলা যেতে পারে। তাদের কাছে ভারতের মূল্য ছিল তীর্থস্থান হিসাবে। তাঁরা বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করেছেন, বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করেছেন; সমসাময়িক ভারতের রাজনীতি নিয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত কম। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মোহাবিষ্ট হওয়ার জন্যে হিউ-য়েন-সাং-এর মতো প্রাজ্ঞ লেখক শশাঙ্ক সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারেননি।

মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধুপ্রদেশ জয়ের সঙ্গে (৭১২ খ্রিঃ) আরব দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটে।

আরবীয় ও তুর্কী লেখকদের পার্থিব দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ এবং ইতিহাস সচেতনতা সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে এক নতুন আলোকপাত করে যা পূর্ব যুগের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়নি। ৮৫১ খ্রিঃ সুলেমান বণিক হিসাবে ভারত পর্যটন করতে এলে তিনি ভারতের রাজনৈতিক বিভাজন এবং প্রধান প্রধান রাজবংশের উল্লেখ করেন। ৯১৬ খ্রিঃ ইবন-খুরদাবিদের লেখায় ভারতের জাতিভেদের উল্লেখ দেখা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত আল ইদ্রিসির বিবরণে পশ্চিম সমুদ্র উপকূলের বন্দর ও শহরগুলির বিবরণ পাই। মূলতান এবং মনশুরা সম্বন্ধে তার বক্তব্য সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে। আবুল কাশিম লিখিত তবকাত্-উল-উমাস্ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার এক বিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, শাহরিয়ার (৯০০ খ্রিঃ), ইবন রুস্তা (৯০২-৯০৩ খ্রিঃ), ইবন্-নাজিম (৯৯৫ খ্রিঃ), আবদুল করিম শাহরিস্তানি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সমকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। ভারতীয় ভূখণ্ড ও ভারতের নানা শহর বন্দর রাজ্য প্রভৃতির বিশ্বস্ত পরিচয় পাওয়া যাবে অজ্ঞাত লেখকের পারসিক গ্রন্থ *হুডুড-অল-আলম*-এ (৯৮২ খ্রিঃ)।

সর্বোৎকৃষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় আল-বিরুনীর *কিতাব-উল-হিন্দ* গ্রন্থে। গজনীর সুলতান মাহমুদের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, মাহমুদ যখন ভারতবিজয়ে ব্যস্ত তিনি সেই অবসরে ভারতবর্ষের ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত, জ্যোতিষ, দর্শন, ধর্মচর্চা এবং অধ্যয়নে রত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিবরণ লেখার সময় তিনি পূর্বেকার লেখকদের চেয়ে ভারতবর্ষের সমস্যার প্রতি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তাঁর গ্রন্থকে বিন্যস্ত করেছেন। ভারতীয়দের ইতিহাস চর্চার প্রতি অনীহার দৃষ্টিভঙ্গিটি তিনি লক্ষ্য করেন এবং তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

আল বিরুনী ছাড়াও আরো অনেক লেখককে আমরা পাই কিন্তু তালিকা দীর্ঘতর করার কোন প্রয়োজন নেই কারণ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপন অবদান রেখেছেন এবং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ সহজতর হয়েছে।

১.৫ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। লেখমালা ও মুদ্রার সাহায্যে কীভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠন করা যায় উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করুন।

২। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস এবং লিখিত উৎসের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনায় প্রত্নতত্ত্বের অপরিহার্যতা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কার্বন[১৪] পদ্ধতি কাকে বলে? এই পদ্ধতি ইতিহাসকে কীভাবে সাহায্য করে আলোচনা করুন।

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় গ্রীক রোমান লেখকদের অবদানের বিবরণ দিন।

৩. প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় মুদ্রাকে কীভাবে ব্যবহার করবেন?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করুন।

২। ঐতিহাসিক উৎসের শ্রেণীবিভাজন করুন।

৩। হিউ-য়েন-সাংকে কেন শ্রেষ্ঠ বৈদেশিক পর্যটক বলা হয়?

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। ডি. সি. সরকার—*ইনস্ক্রিপশনস্ অফ্ এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া* (১৯৮৩)

২। আর. এস. শর্মা—*পারস্পেকটিভস্ ইন সোশ্যাল এ্যান্ড ইক্নমিক্ হিস্ট্রী অফ্ আর্লি ইন্ডিয়া* (১৯৮১)

৩। আর. সি. মজুমদার—*দি বেদিক এজ্*

৪। পি. এল. গুপ্ত—*ইন্ডিয়ান কয়েনস্*

৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—*প্রাচীন মুদ্রা* (মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখবন্ধ) (১৯৮৮)

৬। ভারত সরকার প্রকাশিত—*গেজেটিয়ারস্ অফ্ ইন্ডিয়া*

একক ২ক ❑ সিন্ধু সভ্যতা/হরপ্পীয় সভ্যতা

গঠন

২ক.০ উদ্দেশ্য

২ক.১ কালপর্ব ও নামকরণ

২ক.১.১ হরপ্পীয় সভ্যতার সূত্রপাত

২ক.১.২ মেহেরগড় উৎখনন ও প্রাপ্ত নিদর্শসমূহ

২ক.২ হরপ্পীয় সভ্যতার বিস্তার

২ক.২.১ সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবন

২ক.২.২ গ্রাম-শহরের সংযোগ

২ক.৩ বাণিজ্য

২ক.৩.১ বাণিজ্যিক পথ

২ক.৪ সমাজ ও ধর্মীয় জীবন

২ক.৪.১ অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস

২ক.৪.২ ধর্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা বিভাজক

২ক.৫ সভ্যতার পতন

২ক.৫.১ বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়

২ক.৫.২ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন

২ক.৫.৩ বাণিজ্যমুখী অর্থনীতির ভূমিকা

২ক.৫.৪ অভিনবত্ব সৃজনের অভাব

২ক.৫.৫ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান

২ক.৬ অনুশীলন

২ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে হয়েছিল বলে মনে করা হয়; শুরু থেকেই আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্যে মানুষ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করত; তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে, এবং শুধুমাত্র এদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানব জাতির ইতিহাসের আদিমতম এবং প্রায় অন্ধকারতম যুগের উপর কিছু আলোকপাত করা সম্ভব। আলোচনার সুবিধার

জন্যে পণ্ডিতেরা মানব-ইতিহাসের এই সময়কে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে এই যুগ পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই যুগে মানব-ইতিহাসের বহু বৈপ্লবিক এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। বিবর্তনের গতি অনুসরণ করে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। মানব-ইতিহাসের পর্যায়ে একটি নতুনতম ধারা যুক্ত হল যাকে তাম্র-প্রস্তর যুগ বলে অভিহিত করা যায়। তাম্র-প্রস্তর যুগের মানুষেরা নৃতত্ত্বের পৃষ্ঠা অতিক্রম করে ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু এদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং উৎকৃষ্টতম নমুনা হল হরপ্পীয় সভ্যতা।

২ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন

- হরপ্পীয় সভ্যতার উৎস ও বিস্তার
- হরপ্পীয় সভ্যতার বিজ্ঞানসম্মত ও সুচিন্তিত নগর-ব্যবস্থা
- হরপ্পীয় সভ্যতার সমাজ-জীবন, ধর্ম ইত্যাদি

২ক.১ কালপর্ব ও নামকরণ

সময় অনুসারে যদি ইতিহাসের ভাগ হয় তাহলে দু'টি প্রধান ভাগ আমাদের সামনে এসে পড়ে—(ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগ (খ) ঐতিহাসিক যুগ। পূর্বকালে হরপ্পীয় সভ্যতাকে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার অন্তর্গত বলে মনে করা হত; কিন্তু আধুনিককালে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও আমরা যখন ভারতীয় ইতিহাসকে কালানুসারে (ক) প্রাচীন যুগ (খ) মধ্য যুগ (গ) আধুনিক যুগ এইভাবে ভাগ করি, তখনও কিন্তু হরপ্পা সভ্যতাকে আমরা প্রাচীন যুগের অন্তর্গত করতে পারি না; কারণ হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন যুগেও প্রাচীনতম পর্যায়ে অবস্থিত; অর্থাৎ, হরপ্পা সভ্যতা ভারতীয় ইতিহাসের আদিমতম এবং প্রথমতম উল্লেখযোগ্য ধারা।

এই সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, হরপ্পীয় সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক এবং এই জ্ঞানের পরিধি অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ের মতোই ক্রমবর্ধমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পূর্বে আলোচনাকে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা এই দু'টি শহরের মধ্যেই সীমিত রাখা হত। কিন্তু বর্তমানে প্রাক্-হরপ্পা, হরপ্পা এবং হরপ্পা-উত্তর সভ্যতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, হরপ্পা সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে প্রাচীন বিশ্বের সমকালীন নদীমাতৃক সভ্যতার সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড় করিয়েছে এবং হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় এবং মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের গভীর গবেষণার বিষয়। তৃতীয়ত, হরপ্পীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার কালানুক্রমিক ধারাকে প্রসারিত করেছে। পূর্বে আর্য সভ্যতা থেকে ভারতীয় সভ্যতার শুরু ধরা হত; কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পর বোঝা গেল যে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্রাধিক বছর বা তারও পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে এক জনগোষ্ঠী ছিল যারা কৃষি, হস্তশিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

এছাড়াও, হরপ্পা সভ্যতার নামকরণ সম্বন্ধে দু'টি একটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বে এই সভ্যতাকে "সিন্ধু সভ্যতা" বলা হত; কারণ এই সভ্যতার দু'টি প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত বলেই প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা একে "সিন্ধু সভ্যতা" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ ইরাবতী (রাভি) নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত প্রাচীন হরপ্পা শহরটি প্রাচীনত্ব, কৃষি ও সংস্কৃতির বিচারে সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত অন্যান্য শহর অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভস্থিত খননকার্যের ফলে হরপ্পা অঞ্চলে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, যেমন তামার তৈরি অস্ত্র, তৈজসপত্রাদি, পোড়ামাটির জিনিস ইত্যাদি, সেগুলি দেখে মনে হয় নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসীরা হরপ্পাবাসীদের অনুকরণ করত; এই অনুকরণকে সহজেই সংস্কৃতির চিহ্ন বলে মনে করা যায়। দ্বিতীয়ত, উৎখননের দ্বারা প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণ করা যায় যে, হরপ্পা সভ্যতা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার থেকে অনেক প্রাচীন। আধুনিক খননকার্যের ফলে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, রফিক মুঘল প্রমাণ করেছেন যে হরপ্পার সর্ব নিম্নতলে একটি প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার অবস্থিতি রয়েছে। প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার উপস্থিতি নিরবচ্ছিন্নতার কথা প্রমাণ করে যা অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, প্রত্নতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে কোন প্রত্নবস্তু প্রথম কোন স্থানে পাওয়া গেলে সেই এলাকার সভ্যতার নাম প্রথম স্থানটির নামানুসারে করা হয়ে থাকে। প্রথম আলেকজান্ডার কানিংহাম হরপ্পা থেকে কতকগুলি সিলমোহর পান; ১৮৮৩-৭৩ সালের মধ্যে তিনি কয়েকবার ঐ স্থানটি পরিভ্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেন; এরও পূর্বে ১৮২৬ সালে চার্লস ম্যাসন হরপ্পা টিবির কথা প্রথম পণ্ডিতমহলের গোচরে আনেন। কানিংহাম, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ঐসকল প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব বোধহয় যথাযথ অনুধাবন করতে পারেননি; পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত সিলমোহরের সঙ্গো কানিংহাম প্রাপ্ত পূর্বের সিলমোহরের মিল দেখা গেলে হরপ্পায় অনুরূপ সভ্যতার অবস্থান থাকতে পারে এই অনুমানে হরপ্পায় খননকার্য চালানো হয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সিন্ধু সভ্যতার নাম পরিবর্তন করে বর্তমানকালে এই নতুন নামকরণ করা হয়েছে।

২ক.১.১ হরপ্পীয় সভ্যতার সূত্রপাত

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এক সুউন্নত, পরিশীলিত, পরিণত প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। এই সভ্যতার পরিণত রূপ প্রথম থেকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ভাবিয়ে তুলেছে শুরুতে এই সভ্যতা কী রকম ছিল? কোথা থেকে এর সূত্রপাত হল তা নিয়ে তারা চিন্তা করতে শুরু করলেন। তখন কোন প্রমাণ সামনে না থাকা সত্ত্বেও মার্শাল সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সিন্ধুসভ্যতার এক বিরাট পূর্ব বৃত্তান্ত আছে। মার্শালের অনুমান সঠিক প্রমাণ করে ননীগোপাল মজুমদার সিন্ধুপ্রদেশে প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল অনুসন্ধান করবার সময় এমন কতকগুলি প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন যে, তার ভিত্তিতে অনুমান করা সম্ভব হল যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর চেয়েও পুরাতন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল। আম্রিতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর অনুরূপ বস্তু গাজী শাহতে পাওয়া গেলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমানের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল। পরে স্যার মার্টিমুর হুইলার হরপ্পার বিশেষ একটি স্থানে, যাকে AB ঢিপি বলা হয়, তার তলায় কতকগুলি মৃৎপাত্র পেলেন যার ভিত্তিতে প্রাক্-হরপ্পা যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল।

স্বাধীনতাউত্তরকালে ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের চেষ্টায় অনুসন্ধানের ব্যাপারে বেশ কিছু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল। ১৯৫৫-৫৭ সালে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এফ. এ. খান সিন্ধু প্রদেশের খয়েরপুর জেলার কোটাডিজিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। এই প্রথম প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতা যুগের প্রাকারবিশিষ্ট একটি জনবসতির আবিষ্কার করা সম্ভব হয়; দেখা গেল যে কিছু মৃৎপাত্রের আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য পরবর্তী সিন্ধুসভ্যতার যুগেও অনুসৃত হয়েছিল; অর্থাৎ প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতা যুগের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতা যুগের একটি ধারাবাহিকতা ছিল। ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ জে. এল. ক্যাসালের নেতৃত্বে সিন্ধুপ্রদেশের আম্রিতে এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বি. বি. লাল এবং বি. কে. থাপার ১৯৬০-এর দশকে অধুনা শুষ্ক ঘাঘর নদীর খাতে কালিবঙ্গানে অনুসন্ধান চালিয়ে একই রকম ফল লাভ করলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হল।

কিলি-গুল-মহম্মদ অঞ্চলে যোয়ার সার্ভিস প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতার বেশ কয়েকটি স্তর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কয়েকটি সাংস্কৃতিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর কার্বন[১৪] পদ্ধতি অনুসারে সময়ানুক্রম নির্ণয় করা সম্ভভব হয়েছে। প্রথম স্তরটির সূচনাকাল আনুমানিক ৩৬৮৮ খ্রিঃপূঃ। পশুচারণের জীবনের ছাপ এই পর্যায়ে স্পষ্ট। ভেড়া, বলদ, ছাগল, গৃহপালিত পশু পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে তারা কাদামাটির তৈরি ইট দিয়ে ঘর বানাতে পারত। পাথর এবং হাড়ের তৈরি জিনিস পাওয়া গেছে কিন্তু কোন ধাতব বা মাটির জিনিস নয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে একটু উন্নত পর্যায়ের গৃহনির্মাণ কৌশল দেখা গেল; অপরিপক্ব স্থূল ধরনের মাটির বাসন এবং পূর্বের মতো প্রায় একই ধরনের বস্তুগত জীবনের ছাপ দেখা যায়; চতুর্থ পর্যায়ে এসে প্রথম তামার জিনিস দেখা গেল এবং মৃৎপাত্র নির্মাণের কৌশলেরও অনেক উন্নতি ঘটেছিল; কুমোরের চাকার তৈরি মৃৎপাত্র এবং হাতে তৈরি মৃৎপাত্র উভয় ধরনের পাত্রতে লাল এবং কালো রঙে রং করা এবং নানা ধরনের জ্যামিতিক নকশা দেখা দিল যা পরবর্তীকালের সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়।

কিলি-গুল-মহম্মদ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়েরসঙ্গে সমগোত্রীয় আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্র উত্তর এবং মধ্য বেলুচিস্তানে পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর বেলুচিস্তানের লোরালাই উপত্যকার রানা ঘুণ্ডাই প্রত্নক্ষেত্রের নাম করা যায়। উত্তর এবং মধ্য বেলুচিস্তানে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষে পরিবর্তনের হাওয়া আসতে শুরু করে। অলচিন দম্পতি "মুন্ডিগক" প্রত্নক্ষেত্রটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে চতুর্থ পর্যায়ে গ্রাম থেকে শহরে পরিণত হবার চিহ্ন দেখা যায়—চতুর্দিকে প্রাকার বেষ্টিত শহর, বৃহৎ একটি বাড়ি যাকে প্রায় প্রাসাদ বলা যায়, প্রচুর লাল/কালো রঙের মৃৎপাত্রের সমন্বয়—সম্পূর্ণভাবে এই পর্যায়টি হরপ্পীয় যুগের সঙ্গে তুলনীয়। অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ডাজ এফ্ ডেলস (১৯৬৫) এবং যোয়ায় গর্ভিসা (১৯৬৭) পৃথক পৃথকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে। কোট ডিজি, মুন্ডিগক প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে উত্তরণ ঘটে; প্রাকারযুক্ত দুর্গ, ঘন জনবসতি ইত্যাদি শহরের ইঙ্গিত বহন করে এবং চূড়ান্ত পর্যায় যাকে ডলস্‌ফেজ্ এফ বলে উল্লেখ করেছেন তা সিন্ধু সভ্যতার সমগোত্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়।

সুতরাং প্রায় প্রত্যেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্, বিশেষ করে অলচিন দম্পতি, অমলানন্দ ঘোষ পরিষ্কারভাবে "প্রাক্-হরপ্পা যুগে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা" লক্ষ্য করলেন। হরপ্পীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতি

থেকে গৃহীত হয়েছে এবং সেইজন্যেই প্রাক্-হরপ্পীয় যুগকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অধ্যাপক এস. সি. মালিক তার বই *ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*-এ প্রাক্ হরপ্পীয় যুগকে হরপ্পীয় যুগের 'পূর্ব প্রস্তুতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রাক-হরপ্পার গ্রামীণ জনবসতির স্তর থেকে হরপ্পার নাগরিক স্তরে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব হল? এই উত্তরটির ব্যাখ্যা নানা পণ্ডিতেরা নানাভাবে করার চেষ্টা করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্যে এদের দু'টি দলে ভাগ করা যায়; প্রথম দলের পণ্ডিতেরা হরপ্পার পরিবর্তনের জন্যে বৈদেশিক প্রভাবকে দায়ী করছেন।

২ক.১.২ মেহেরগড় উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ

প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা পর্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র মেহেরগড়। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *ভারতীয় সভ্যতার জন্ম* বইটিতে অলচিন দম্পতি খুব জোরের সঙ্গে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার একটি যোগসূত্রর কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; তার সূত্রপাত প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে সভ্যতা সম্বন্ধে ক্রমাগত গবেষণা তাদের ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। মেহেরগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মধ্য দিয়ে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা কীভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতায় পৌঁছাল তার প্রামাণ্য চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

মেহেরগড় কচ্ছ উপত্যকায় বোলান নদীর উৎসস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন এই প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত প্রত্নক্ষেত্রটি সিন্ধুসভ্যতার সাম্প্রতিকতম গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে অসীম গুরুত্বের অধিকারী। সাতটি পর্যায়ে মেহেরগড়কে বিভক্ত করা সম্ভব। প্রথম তিনটি পর্যায় নব্য প্রস্তর যুগের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনতম পর্যায়ে খুব সম্ভবত বোলান নদীর উঁচু পারে একদল ভ্রাম্যমাণ পশুচারণকারীর বসবাস ছিল। ক্রমশ স্থায়ী জনবসতি ঐ এলাকায় গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণস্বরূপ কাদামাটির ইঁটের তৈরি ঘরবাড়ি এবং ব্যবহৃত জিনিসের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। খ্রিঃপূঃ ছয় সহস্রাব্দে আবিষ্কৃত (অর্থাৎ ৫১০০ খ্রিঃপূঃ) কাদা-মাটির ইঁটের তৈরি বেশ কিছু বাড়ি পাওয়া গেছে; এইসব কাদামাটির ইঁটগুলি বিশেষ কায়দার তৈরি; অর্থাৎ ইঁটগুলির কোণগুলি গোলাকার এবং নির্মাতাদের আঙুলের ছাপ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় বসবাসের বাড়ি ছাড়াও ছয় কক্ষ এবং নয় কক্ষ বিশিষ্ট শস্যাগার পাওয়া গেছে।

মেহেরগড়ে এই পর্যায়ে আবিষ্কারের মধ্যে খ্রিঃপূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের একটি সমাধিস্থল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাতিষ্ঠানিক সমাধিক্ষেত্রগুলির মধ্যে এটি অন্যতম সমাধিক্ষেত্র। সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম পুঁতি পাওয়া গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় একটি তামার পুঁতি। এই পুঁতিটি তামার নির্মিত জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম এবং বোধহয় প্রথমতম। প্রলেপ দেওয়া ঝুড়ি পাওয়া গেছে; এগুলিকে বোধহয় মাটির পাত্রের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হত; অর্থাৎ কুমোরের চাকা থেকে তৈরি মৃৎপাত্র তখনও অজানা ছিল। শান দেওয়া পাথরের জিনিস অনেক দেখা গেছে। বেশ কয়েকটি পাথরের কুঠার পাওয়া গেছে যার মধ্যে বিশেষ কারিগরী কৌশল রয়েছে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই এই বিশেষ ধরনের পাথরের কুঠার নির্মাণের কায়দা এই এলাকার লোকেরা আয়ত্ত করেছিল।

সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার বোধহয় টার্কয়েজের তৈরি একটি পুঁতি। এটিও সমাধিক্ষেত্র থেকে পাওয়া গেছে। এটি স্থানীয় জিনিস নয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই মূল্যবান এবং অপেক্ষাকৃত

কম মূল্যবান পাথর দূর দেশ থেকে আমদানি করা হত; অনুমান করা যেতে পারে যে, মেহেরগড়ের লোকেরা তুর্কমেনিয়া থেকে এগুলি আমদানি করতেন। তাহলে বাণিজ্যের জন্যে হরপ্পা সভ্যতার যে বিশিষ্টতা তা বহু পূর্বেই মেহেরগড়ে লক্ষ্য করা যায়। খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ সহস্রাব্দতেই তারা বিলাস এবং প্রসাধন দ্রব্যের এবং হয়তো আরও অনেক জিনিসের দূরপাল্লার বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন একতা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। পরবর্তীকালে রহমান ঢেরী এবং লি-ওয়ানের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বাণিজ্যের তত্ত্বকে আরও জোরদার করে।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায় সরাসরি প্রথম পর্যায় থেকে উদ্ভূত; এই পর্যায়ের শেষের দিকে মৃৎপাত্রের আবির্ভাব ঘটে এবং কোন কোন সময়ে সেগুলিকে চিত্রিত করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মৃৎপাত্রগুলির সঙ্গে কিলি-গুল-মুহম্মদ (প্রথম পর্যায়) এবং মুণ্ডিগক (প্রথম পর্যায়) প্রত্নক্ষেত্রে মৃৎপাত্রগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পাথরের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন ও নির্মাণ পূর্বের মতোই অব্যাহত ছিল। দূরপাল্লার বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন ধরনের শঙ্খ এবং টার্কয়েজ পাথরের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাপ্ত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ছিদ্রযুক্ত দস্তার তৈরি একটি টুকরোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; বোধহয় এটিও ব্যবসার সূত্র ধরে এখানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, দস্তার টুকরোটি হরপ্পা সভ্যতার আগে একমাত্র দস্তা ধাতুর নিদর্শন। বাদখ্‌শান থেকে ল্যাপিস-লাজুলীও ব্যবসাসূত্র আনা হত বলে মনে করা হয়।

মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে মৃৎশিল্প মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নিয়মিত প্রথামাফিক কৃষিকার্য জনজীবনের একটি অঙ্গে পরিণত হয়েছে। প্রাক্-ষষ্ঠ সহস্রাব্দ পূর্বেই লোকেরা বার্লি, গম এবং খেজুর নিয়মিতভাবে উৎপাদন করতেন। বহু বন্য পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছিল এবং তাদের কৃষিকাজেও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃষিজ বস্তু হল দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদন। দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদন খাদ্য অভ্যাসকে পরিবর্তিত করেছে সন্দেহ নেই। এরই ফলে বোধহয় প্রস্তর-ব্যবহারকারী মৃৎশিল্পের সঙ্গে অপরিচিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারকম আকর্ষণীয় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। আরও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বোধ হয় তুলো চাষের কৃৎকৌশল আয়ত্ত করা। হরপ্পীয় সভ্যতার আবিষ্কারের প্রায় দু'হাজার বছর আগে তুলোর চাষ এবং সুতিবস্ত্র নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব্ভ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। হরপ্পীয় সভ্যতার কৃষির ঐতিহ্য প্রায় হরপ্পার চেয়ে দুই সহস্র বছরের প্রাচীন মেহেরগড় থেকে এসেছে বলা যেতে পারে। মেহেরগড় চতুর্থ থেকে সপ্তম পর্যায় স্পষ্টভাবে বিবর্তনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। জনবসতি আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়। মেহেরগড়ের দক্ষিণে ঘনজনবসতির প্রমাণ মেলে। আমরী, ডাম্ব-সাদাত ইত্যাাদি স্থানের প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সঙ্গে মেহেরগড়ে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা একটি কালানুক্রমিক সময়পঞ্জী নির্মাণ করা যায়। বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হচ্ছে পোড়ামাটির তৈরি একটি স্ত্রী-মূর্তি। এটির সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির স্ত্রী-মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কুমোরের চাকা থেকে নির্মিত মৃৎপাত্র সর্বত্র প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এই প্রথম পাথরের এবং হাড়ের তৈরি সিলমোহর পাওয়া গেল যা পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির তৈরি চার খোপ বিশিষ্ট সিলমোহরটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। একটি বিরাট কাদা-মাটির ইঁটে তৈরি চাতাল পাওয়া গেছে। মাটির তৈরি জিনিসের মধ্যে অশ্বত্থ পাতা এবং মাছের নমুনা বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাথর দিয়ে পাতার

মতো দেখতে তীরের ফলা বেশ কয়েকটি পাওয়া গেছে। দামী এবং কমদামী পাথর, বিশেষ করে ল্যাপিস-লাজুলী দূরপাল্লার বাণিজ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে সপ্তম এবং চূড়ান্ত পর্যায় সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। রোদে পোড়া ইঁটের তৈরি বাড়ি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হত। একটি বিশেষ বাড়ির কথা বলা হচ্ছে যেটি মনে হয় শুধু শিল্পকাজের জন্যেই ব্যবহৃত হত। মৃৎশিল্পের ধারা অব্যাহত থাকছে এবং সেখানে নানারকম উন্নতি বিধান করা হচ্ছে। শত শত মাটির পুতুল পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে কয়েকটির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতাপূর্ণ। পোড়া মাটির সিলমোহর আরও বেশি করে তৈরি করা হচ্ছে। শান দেওয়া পাথরের তৈরি জিনিস শেষ অবধি উৎপাদন করা হচ্ছে।

সুতরাং মেহেরগড়কে প্রাক্-নাগরিক প্রাথমিক পর্যায়ের সিন্ধুসভ্যতার পূর্বসূরি বলে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। নব্য প্রস্তর যুগের স্তর থেকে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার প্রায় সবকটি স্তরই মেহেরগড় সভ্যতায় ধরা পড়ে। ধারাবাহিক প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন খুঁজতে গেলে আমাদের মেহেরগড়কে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করতে হবে।

অভারতীয় উভয়বিধ পণ্ডিতদেরই যুক্ত করতে পারি। ১৯৫৬ সালে আর. হাইনে জেলর্ডান (১৯৫৬) সিন্ধুসভ্যতার শহরগুলিকে ঔপনিবেশিক কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করলেন। ১৯৫৮ সালে ডি. এইচ. গর্ডন অনুমান করলেন যে এলাম এবং মেসোপটেমিয়া থেকে জনবসতির অভিপ্রায় সিন্ধু অঞ্চলে এসেছিল এবং তারাই হরপ্পীয় সভ্যতার পরিবর্তন সম্ভব করেছে। মার্টিমুর হুইলার বৈদেশিক প্রভুত্বের কথা গভীরভাবে ভেবেছেন। ১৯৭২ সালে সি. সি. ল্যানবার্গ কার্লভস্কি বৈদেশিক বাণিজ্যকে সিন্ধু সভ্যতার নগরায়ণের জন্য দায়ী করলেন। শিরীন রত্নাগর (১৯৮১) বাণিজ্যকে নব ঔপনিবেশকতার একটি পর্যায় বলে মনে করলেন। হরপ্পা অঞ্চলের লোকেরা পশ্চিমের দেশগুলিতে পণ্য-সরবরাহ করত এবং তাদের চাহিদা পূরণ করত। ফ্লাম (১৯৮৪) মেসোপটেমিয়া এবং এলামের সঙ্গে আম্রি-নাল-কোটদিহি এই অঞ্চলের সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন এবং তিনি 'এলামের বহির্ভাগ' বলে একটি অঞ্চলের কথা কল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে দক্ষিণ বেলুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ-কোহিস্তানকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অন্যদিকে, স্টুয়ার্ট, পিগট বহির্ভারতের প্রভাবে সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এই সম্ভাবনাকে মানতে রাজী নন। ফেয়ার সার্ভিসের কোন স্থির মত নেই; একদিকে তিনি বলছেন এই সভ্যতার বিশিষ্ট রূপগুলি দেশীয় উৎস থেকে উঠে এসেছিল কিন্তু বিস্তারিত দিকগুলি বৈদেশিক প্রভাবে ঘটেছে। অলচিন দম্পতি এবং অমলানন্দ ঘোষ প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা থেকে স্বাভাবিকভাবে নিয়ম অনুসারে হরপ্পীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করেন, যদিও অলচিন দম্পতি *দি বার্থ অফ্ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*-এ প্রাক্-হরপ্পা পর্যায়ের মুন্ডিগক প্রত্নক্ষেত্রটি আলোচনা করবার সময় ইরানের কাছাকাছি অবস্থানের জন্য পরিবর্তনগুলি সম্ভব হয়েছিল কি না এই নিয়ে মৃদু প্রশ্ন তুলেছেন। রফিক মুঘলের কাজ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ফেয়ার সার্ভিসেস-এর সঙ্গে একমত হয়ে মন্তব্য করেছেন যে সিন্ধুসভ্যতার বিকাশের জন্যে কোন বহিরাগত প্রভাব দায়ী ছিল না। ডি. পি. আগরওয়াল (১৯৮২) হরপ্পা সংস্কৃতিকে সুমের থেকে উৎপাটিত করে আনা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে যেহেতু সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার থেকে বহু বছরের পুরাতন, তাই বাণিজ্যিক বিনিময় বা অন্যান্য কোন মাধ্যমের

দ্বারা যোগাযোগের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মুঘল অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এইসব তত্ত্বকে বাতিল করে প্রাক্-হরপ্পা যুগকেই হরপ্পীয় সভ্যতার ভিত্তি বলে মনে করেছেন এবং তার মতের স্বপক্ষে সুচিন্তিত যুক্তি উপস্থিত করেছেন। অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী তাঁর *দি আর্কিওলজি অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সিটিস*-এ সমস্ত অধ্যাপকদের যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবার পর তার নিজস্ব মতামত উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে খুব সাধারণ মানে (ক) জলসেচ ব্যবস্থা, (খ) হস্তশিল্পের ক্রমাগত বিশেষীকরণ, (গ) তামাকে গলিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করবার দক্ষতা, ইত্যাদি উপাদানগুলি প্রাক্-হরপ্পা থেকে হরপ্পীয় সভ্যতায় উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু লিখিত বিবরণের অনুপস্থিতির জন্যে এই তথ্যগুলিকে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিতে এখনও অনেক দ্বিধার মধ্যে পড়তে হয়।

২ক.২. হরপ্পীয় সভ্যতার বিস্তার

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম দুটি শহর হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ভৌগোলিক অবস্থান প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্মিত করে। কারণ শহর দুটি চারশো মাইল দূরে অবস্থিত হলেও একই সংস্কৃতির অন্তর্গত। সুতরাং সহজেই মনে করা যেতে পারে যে এই সভ্যতা কোনমতেই স্থানীয় বা আঞ্চলিক নয়, এমনকী ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তীকালের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পুরাতন মতামতগুলি পরিত্যক্ত হচ্ছে এবং নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

এখন পর্যন্ত প্রায় দুশো পঞ্চাশটি নতুন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হরপ্পীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশের অবিভক্ত পাঞ্জাবপ্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, গুজরাট, রাজস্থান এবং আধুনিক উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সামান্য অংশ, উত্তরের জম্মুপ্রদেশ থেকে দক্ষিণের নর্মদা নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃতও; পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকারন উপকূল থেকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মরুট পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিভূজাকৃতি এই এলাকা প্রায় ৯৯,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রসারিত এবং আধুনিক পাকিস্তানের চেয়ে আয়তনে বড়। নিশ্চিতভাবেই এটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের থেকে অনেক বৃহৎ আকারের সভ্যতা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় সহস্রাব্দে এত বড় সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সিন্ধুপ্রদেশে প্রয়াত ননীগোপাল মজুমদারের অনুসন্ধানের ফলে নতুন হরপ্পার সংস্কৃতি-বিশিষ্ট কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। ফলে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) থেকে উত্তরে জ্যাকোবাবাদ অবধি সিন্ধু নদীকে অনুসরণ করে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের অধিকাংশই সিন্ধু বা তার উপনদীগুলির ধারে অবস্থিত এবং সামান্য কয়েকটি শহর বাদ দিয়ে অধিকাংশ ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্র। মহেঞ্জোদারোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চানহু-দারো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং প্রায় একই দূরত্বে আম্রি প্রত্নক্ষেত্রটি অবস্থিত। প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির আলোচনায় আম্রি এক উজ্জ্বল নাম।

এ ছাড়াও, আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বে অক্ষু নদীর উপত্যকায় শর্তুগাই পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার একটি কেন্দ্র এবং শর্তুগাইকে ধরা হলে হরপ্পীয় সভ্যতার সীমা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমা

অতিক্রম করে আরও বহুদূর বিস্তৃত হয়। স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন হরপ্পীয় অঞ্চলটিকে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী মূল সভ্যতার মধ্যে না ধরে একটি "বাণিজ্যিক উপনিবেশ" বলে গণ্য করতে ইচ্ছুক।

স্বাধীনতার উত্তরকালে নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে পশ্চিম উপকূলে হরপ্পীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে প্রায় ৮০০ মাইল সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে সিন্ধু এলাকার মধ্যে যুক্ত হয়েছে; সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াওয়ার) থেকে কাম্বে উপসাগর অবধি প্রায় ৪০টি কেন্দ্র আবিষ্কার করা গেছে। কিম প্রণালীর উপর গেট্রভ মহেঞ্জোদারো থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সিন্ধুসভ্যতার দক্ষিণতম প্রসারণ। এই অঞ্চলকে মার্টিমুর হুইলার সৌরাষ্ট্র প্রদেশ বলে অভিহিত করেছেন। এই অঞ্চল মূল সভ্যতার কেন্দ্র থেকে এতদূরে অবস্থিত হয়েও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

গুজরাট ব্যতীত, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে হরপ্পীয় সভ্যতার চিহ্নযুক্ত অঞ্চল পাওয়া যায়। পূর্বে কোশাম্বী প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমিতে সিন্ধুসভ্যতা কেন প্রবেশ করেনি তার নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মেরুট জেলায় আলমগীরপুরে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হলে গাঙ্গেয় ভূমিতে অনুপস্থিতির ব্যাখ্যাগুলি ভুল বলে প্রমাণিত হল। আলমগীরপুরের পূর্বে আর কোনও হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্র নেই। ফলে হরপ্পা সভ্যতা গাঙ্গেয় উপত্যকার সামান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্গত ভৌগোলিক অঞ্চলে শহরের লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধ্যাপিকা নয়নজ্যোতি লাহিড়ীর মতে, প্রত্যেকটি শহরের অবস্থানগত গুরুত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাবে অবস্থিত হরপ্পা, সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো। হুইলারের মতে, এই দুটি শহর বোধহয় যৌথভাবে রাজধানীর কাজ করত। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে পরবর্তী ইতিহাস থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর চানহু-দারো বোধহয় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চতুর্থ শহর লোথাল কাম্বে উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি নৌবন্দর। উত্তর রাজস্থানে অবস্থিত কালিবঙ্গান পঞ্চম শহর। হরিয়ানা প্রদেশের হিসার জেলায় অবস্থিত বানওয়ালী চার্চ গুরুত্বপূর্ণ শহর। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত এবং সমৃদ্ধতম রূপ এই ছয়টি শহরে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, উপকূলবর্তী শহর ঘুটকাজেনডব এবং ঘুরকেটাডাতে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতা লক্ষ্য করা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তারের আলোচনার পর পরবর্তী যে সমস্যা আমাদের ভাবিত করে তা হল এর সময়। দুটি দিক থেকে সমস্যাটিকে দেখা দরকার। প্রথম দিকটি হল সময়ের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্বনিম্ন সময় এবং সর্বোচ্চ সময়; বলা বাহুল্য এই দুটি সময়কাল আনুমানিক, যথার্থ ঐতিহাসিক সময় নয়। দ্বিতীয় দিকটি হল পদ্ধতিগত দিক, অর্থাৎ কোন্ পদ্ধতি অনুসারে সময় নির্ণয় করা যাবে। এখানেও বিভিন্ন ভাবনার অবকাশ আছে।

হরপ্পীয় সভ্যতার কোন কেন্দ্রেই লোহা পাওয়া যায়নি, সুনিশ্চিতভাবে এটি লৌহপূর্ব যুগের সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সর্বত্র খ্রিস্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের মাঝামাঝি লোহার প্রচলন হয়; তাহলে ঐ সময়ের কিছু আগে বা পরে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই সময়টি আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিঃপূঃ বলে ধরা যেতে পারে। উচ্চতর সময়সীমাটিও এইরকম আনুমানিক। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে মহেঞ্জোদারোর সাতটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। সাতটি স্তরের বিকাশের জন্য এক হাজার বৎসর নির্দিষ্ট করলে

উপরের সীমা ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গিয়ে দাঁড়ায়, যদিও এই সময়সীমাকে আরও পেছিয়ে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে অনেকে নিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত দুটি দিক থেকে পদ্ধতিগত বিষয়টি আলোচনা করা যায়। প্রথমটি হল আধুনিক রেডিও কার্বন পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হল তুলনামূলক পদ্ধতি। বিভিন্ন কারণে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তুলনামূলক পদ্ধতিকে বেশি পছন্দ করেন। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে মেসোপটেমিয়া, সুমের ও এলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ২৬০০ খ্রিঃপূঃ সিন্ধু এলাকায় তৈরি কার্নেলিয়ানের পুঁতি মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া গেল। সুতরাং ২৬০০ খ্রিঃপূঃ বা তার কিছু আগে থেকেই সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব পাওয়া গেল। সুতরাং সেই দিক থেকে ২৭০০/২৮০০ খ্রিঃপূঃ বা তারও সামান্য আগে সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্পীয় সভ্যতার তারিখ নির্ণয় করেছেন। মার্শাল ৩২৫০-২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতার সময়কে সীমাবদ্ধ করেছেন; অন্যদিকে ম্যাকের মতে এই সময়সীমা খ্রিঃপূঃ ২৮০০-২৫০০। উভয়ের মতামতকেই আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা সমালোচনা করেছেন। হুইলারের মতে হরপ্পীয় সভ্যতা ২৫০০-১৫০০ খ্রিঃপূঃ অবধি স্থায়ী ছিল এবং আধুনিক রেডিও-কার্বন পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করে ডি. পি. আগরওয়াল প্রায় একই মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, হরপ্পা সভ্যতার স্থায়িত্বকাল ২৩০০-১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সুতরাং এইসব বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রক্ষিতে একথা সহজেই বলা চলে যে হরপ্পীয় সভ্যতার ভৌগোলিক সীমানাা এবং সময়ের পরিধি উভয়ই অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২ক.২.১ সিন্ধু সভ্যতায় নাগরিক জীবন

আয়তন, বৈচিত্র্য এবং প্রত্নবস্তুর বিশিষ্টতার দিক দিয়ে বিচার করলে সমস্ত হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলির মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো এবং আধুনিক রাভি নদীর বাম তীরে হরপ্পা অবস্থিত। যদিও কোন লিখিত প্রমাণ নেই তবুও প্রত্নতাত্ত্বিকরা হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোকে বিশাল হরপ্পীয় সাম্রাজ্যের যুগ্ম রাজধানী বলে বর্ণনা করেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহুবার এই শহর দুটিতে উৎখননের কাজ চালিয়েছেন কিন্তু নানারকম ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক অসুবিধার জন্যে সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও বিশাল হরপ্পীয় এলাকায় এক ধরনের সহমত এবং সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রায় একই ধরনের স্থাপত্য এবং নগর পরিকল্পনা, একইরকম ওজন ও মাপ, লিখন পদ্ধতি, সমস্ত হরপ্পা জুড়ে স্বাধীন বাণিজ্য, সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কেন্দ্রিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই কেন্দ্রিকতা কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং পুরুষানুক্রমে তা কীভাবে স্থায়ী হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এক অপার বিস্ময়। হরপ্পীয় সভ্যতার নাগরিক জীবনে কেন্দ্রিকতা ও রক্ষণশীলতার ছাপ স্পষ্ট। সমস্ত হরপ্পীয় সভ্যতার নগর-পরিকল্পনা, একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ছোট ও বড় প্রত্যেকটি নগর উঁচু ও নিচু দুটি এলাকার দ্বারা বিভক্ত ছিল। উঁচু এলাকাকে প্রায় সবাই মার্শালকে অনুসরণ করে সিটাডেল বা দুর্গ এলাকা বলছেন। আয়তক্ষেত্রাকার, প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত এই দুর্গগুলি প্রায়শই নগরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্যে সুউচ্চ তোরণ এবং পরিখার ব্যবহার দেখা যায়।

হরপ্পীয় সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় খানিকটা নিয়মমাফিক ছক আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এই নগর পরিকল্পনার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। যেমন কালিবঙ্গানের উঁচু এলাকা দুটি ভাগে বিভক্ত। এই ব্যবস্থা

অন্য কোথাও নেই অন্যদিকে অধুনা আবিষ্কৃত ধোলাবিরাতে নগর তিনভাগে বিভক্ত (১) উঁচু শহর (২) মাঝের শহর ও (৩) নীচের শহর। মাঝের শহর নগরীর আর কোথাও নেই। গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত লোথাল একটি বন্দর-নগরের ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে; ফলে এই নগরের পরিকল্পনা অন্যান্য হরপ্পীয় নগরের থেকে পৃথক। হরপ্পীয় শহরগুলির স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জ্যাকমেন কিছুটা সংশোধন করেছেন। তিনি স্বীকার করছেন, এই নগর স্থাপত্যের পিছনে প্রতিভা ও মার্জিত রুচির ছাপ পাওয়া যায় কিন্তু পরিকল্পনার মূল ভিত্তি বোধহয় গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। একেই তিনি "Cosmological principles" বলতে চান। সুরক্ষিত এই সিটাডেল এলাকাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্মগুলি যেমন 'বিরাট স্নানাগার', 'বিশাল শস্যাগার', 'শাসকের প্রাসাদ' দেখতে পাওয়া যায়। নিচু এলাকা অপেক্ষাকৃত ঘনবসতিপূর্ণ এবং সাধারণ অবস্থার লোকেরা বাস করতেন। স্থাপত্যকর্মই হরপ্পীয় সমাজের শ্রেণীবিভাজনের কথা বুঝিয়ে দেয়।

নিকটবর্তী এলাকায় পাথরের ঘাটতির জন্যেই বোধহয় সমস্ত হরপ্পীয় এলাকায় ইঁটের ব্যবহার দেখা যায়। কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইঁটের ভঙ্গুরতা, জলে ধুয়ে যাবার প্রবণতা রোধ করবার জন্যেই বোধহয় পরবর্তীকালে আগুনে পোড়া ইঁটের শুরু হয়েছিল। অলচিন দম্পতি যে 'সাংস্কৃতিক ঐক্য' বা স্টুয়ার্ট পিগট যে 'কেন্দ্রিকতা'-র উল্লেখ করেছেন ইঁট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা বোঝা যায়। জলনিকাশী নালা বা যেকোন স্থায়ী বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পোড়া ইঁট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাপ ১১ ইঞ্চি লম্ববা, ৫$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি চওড়া ও ২$^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি পুরু।

সাধারণের বসতি এলাকাতে বর্গাকৃতি উঠান ছিল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উঠানকে কেন্দ্র করে ছোটবড় বিভিন্ন কামরাবিশিষ্ট ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার ইত্যাদি। আন্না সারকিনা মহেঞ্জোদারোর সাধারণের ঘরগুলি পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের উঠানের খোঁজ পেয়েছেন এবং তার বিভিন্ন ব্যবহারও লক্ষ্য করেছেন। যেমন কোনো ক্ষেত্রে উঠানগুলি বাস্তুবাড়ির প্রয়োজনে, কোথাও হাতের কাজ করবার জন্যে, কোথাও বা উভয়বিধ কাজ করবার জন্যে ব্যবহৃত হত।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার কাজে জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই কি বাস্তুবাড়িগুলিতে জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যে কুয়োর ব্যবস্থা ছিল? কোথাও বাড়ির নিজস্ব কুয়ো অথবা দুটি বাড়ির মাঝে কুয়োগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়; বহু লোক যে কুয়ো ব্যবহার করতেন, সেখানে বসবার জায়গা আলাদা করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। জ্যানসেন হরপ্পীয় শহরের কুয়োগুলির ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের প্রশংসা করেছেন। মহেঞ্জোদারোতে প্রতি তিনটি পরিবার পিছু একটি কুয়ো দেখা যায়, যা সমসাময়িক মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে বিরল। কিন্তু কালিবঙ্গানে কাছাকাছি নদীর অবস্থান থাকার জন্যে কুয়োর ব্যবহার বিরল।

মহেঞ্জোদারোতে স্নানাগার শৌচাদি কাজের জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। স্নানাগারগুলি নির্মাণের বিশেষ পদ্ধতি এবং উঁচু তলা থেকে জল বের করবার জন্যে মাটির নল ব্যবহার করা—সবই সুচিন্তিত পরিকল্পনার পরিচায়ক। মহেঞ্জোদারোতে স্নানাগার, কুয়ো ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপক থাকার জন্যে ম্যাকে মার্শাল এর পিছনে ধর্মীয় ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন।

উন্নত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহেঞ্জোদারো এবং লোথালে উন্নত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বাড়ির পরিত্যক্ত জল নালার মাধ্যমে বড় রাস্তায় বৃহৎ নর্দমায় এসে পড়ত।

মহেঞ্জোদারোতে বড় রাস্তায় তো বটেই—এমনকী, ছোট ছোট রাস্তাতেও নর্দমা ছিল। ইঁটের তৈরি পাথর দিয়ে ঢাকা এই নর্দমাগুলি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হত; নর্দমার মাঝে মাঝে চৌবাচ্চা তৈরির প্রক্রিয়া থেকে তা বোঝা যায়। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলনিকাশী ব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকেই স্টুয়ার্ট পিগট একটি "পৌরকর্তৃপক্ষের" কথা চিন্তা করেছেন যাদের হাতে বেশ কিছু কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা ছিল। এই "পৌরকর্তৃপক্ষ" বোধহয় কালিবঙ্গানে ছিল না, কারণ সেখানে জনসাধারণের ব্যবহৃত জলনিকাশী ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

নাগরিক সভ্যতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা হরপ্পার রাস্তাগুলির মধ্যে খুঁজে পাব। একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে শহরগুলিতে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি শহরের উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ছিল; এই রাস্তাগুলি শহরকে কয়েকটি প্রধান আয়তক্ষেত্রকার ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। স্টুয়ার্ড পিগট মনে করেছেন যে যদি এই ছক মহেঞ্জোদারোতে সর্বত্র অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে বারোটি বড় বড় বাড়ি তিন সারি রাস্তার চারটি ভাগের মধ্যে পড়েছে এবং পশ্চিমদিকের কেন্দ্র রয়েছে সিটাডেল বা দুর্গ এলাকা। মহেঞ্জোদারোতে এইচ. আর. এলাকার ৩০ ফুট চওড়া রাস্তাগুলি কয়েক সারি চাকাওয়ালা যানবাহনের জন্যে উপযুক্ত ছিল। সমস্ত রাস্তা অত চওড়া ছিল না; লোথাল ও কালিবঙ্গানে মহেঞ্জোদারোর মতো চওড়া রাস্তা দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিটি রাস্তা সোজাসুজি তৈরি করবার প্রবণতা দেখা যায়। বড় চওড়া রাস্তার পাশে সরু অপ্রশস্ত গলি এবং সেখানে ছিল বাড়িগুলির সদর দরজা। সোজা রাস্তা এবং দক্ষিণ দিকে বাঁক নেওয়ার প্রবণতা হরপ্পার নগর-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একটা জিনিস ভাবতে অবাক লাগে যে এত চওড়া রাস্তা কিন্তু পথচারীদের চলবার জন্যে ফুটপাথের কথা ভাবা হয়নি; শুধু মহেঞ্জোদারোতে ডি. কে. এলাকাতে এবং কালিবঙ্গানে সামান্য ইঙ্গিত মেলে।

নগর পরিকল্পনা করার সময় পরিকল্পনা রচয়িতারা সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনীয়তার কথা বেশি করে ভেবেছেন। যেমন জনস্বাস্থ্য বা সমবেতভাবে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে মহেঞ্জোদারোতে একটি স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। কৃত্রিম এই জলাশয়টি শহরের উঁচু এলাকায় অবস্থিত; আয়তক্ষেত্রাকার এই জলাশয়টি একটি প্রশস্ত আঙ্গিনার মাঝখানে অবস্থিত এবং লম্ভবা ও চওড়ায় ৩৯ ফুট × ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট। ওঠাবার ও নামবার সিঁড়ি; চারপাশে ছোট ছোট ঘর, উৎকৃষ্ট ইঁটের কাজ, কৃত্রিমভাবে জল ভরবার এবং বের করে দেবার পদ্ধতি সবই এই স্থাপত্যকর্মটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কী উদ্দেশ্যে এই স্নানাগারটি ব্যবহার করা হত তা নিয়ে সবাই একমত নন। এটা ঠিক যে স্নানাগারটি এতবড় যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মার্শাল মনে করছেন যে, "জল-চিকিৎসার" জন্যে ব্যবহার করা সম্ভব; কোশাম্বী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছেন; হুইলারও জলাশয়টিকে পুরোহিত তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন।

বৃহৎ জলাশয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি স্নানাগার আবিষ্কার করা গেছে। ক্ষুদ্র পরিসর দ্বারা বিভক্ত এই স্নানাগারগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গোপনীয়তা। ডাঃ ম্যাকে মনে করেন উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতেরা এই স্নানাগারটিকে ব্যবহার করতেন এবং বৃহৎ জলাশয়টি ছিল সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি হল বৃহৎ শস্যাগার। শস্যাগারটির স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যে মজবুতভাবে নির্মিত; ভেতরের বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা; এবং শস্য ওঠানো ও নামানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা পূর্ব চিন্তার ফলাফল।

হরপ্পাতেও অনুরূপ একটি শস্যাগার দেখতে পাওয়া যায়। এখানে শস্যাগার সংলগ্ন এলাকায় ফসল ঝাড়াই-বাছাই, মাড়াই করা হত এবং একই স্থানে দুই সারি ছোট ছোট ঘরের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বসবাস করতেন। শস্যাগার দুটির ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়; মহেঞ্জোদারোর শস্যাগারটির আয়তন হরপ্পার সমবেত শস্যাগারগুলির আয়তনের সমান। শহরের জনগণকে শস্য সরবরাহ ছাড়াও মুদ্রা-অর্থনীতির অনুপস্থিতির যুগে এটিকে কোষাগার ব্যবহার করার সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ম্যাকে অপর কয়েকটি বৃহৎ বাড়ির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহেঞ্জোদারোর সাধারণ মাপের বাড়িগুলির মধ্যে একটি ২৫০ ফুট দীর্ঘ প্রাসাদ পাওয়া গেছে; এর কেন্দ্রে দুটি প্রশস্ত আঙিনা এবং চারপাশে ছোট ছোট ঘরগুলি বসতবাড়ি নয়। প্রধান শাসক বা প্রধান পুরোহিত, যদি সেরকম কেউ থেকে থাকেন, তাহলে এই বৃহৎ প্রাসাদ তার বাসগৃহ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে লিখিত প্রমাণের অপেক্ষা করতে হবে।

মহেঞ্জোদারো শহরের পশ্চিম এলাকায় ম্যাকে একটি স্থাপত্য বস্তুকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন। বৃহৎ আকৃতির এই বাড়িটিকে তিনি 'কলেজবাড়ি' নাম দিয়েছেন, এমনকী এর দক্ষিণ দিকে ছাত্রদের প্রবেশগৃহ ছিল বলে তিনি মনে করেন। মার্শালকে অনুসরণে মহেঞ্জোদারোর অপর একটি উল্লেখযোগ্য বাড়িকে 'সভাগৃহ' বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। ফেয়ারসার্ভিস এই বাড়িটিকে মহেঞ্জোদারোর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকীর্তি বলতে ইচ্ছুক। বিরাট এই হলঘরটিতে ২০টি স্তম্ভ রয়েছে। ৫ ফুট × ৩ ফুট মাপের আয়তাকার স্তম্ভগুলি বাড়ির ছাতকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে; চারটি সারিতে পাঁচটি করে স্তম্ভ সাজানো আছে। ম্যাকে এই বিশাল হলঘরটি বণিকদের জন্যে ব্যবহৃত বলে মনে করেন।

সুচিন্তিত নগর পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা সমস্ত কিছুই একটি প্রগতিশীল পৌর ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে। রাতের বেলায় জনপথে আলোর ব্যবস্থা, গভীর রাতের তদারকি ব্যবস্থা, দূরাগত বণিকশ্রেণীর বিশ্রামাগার, সাধারণের জন্য শস্যাগার, সাধারণ নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছিল। নগরের বাইরে বিরাট গর্তে নাগরিকদের ব্যবহৃত মাটির ভাঙা জিনিস অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্য ফেলে আসতে হত। বিভিন্ন বেষ্টনীতে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী স্তরে পৌর শাসনের শিথিলতা জনকল্যাণমূলক অবস্থার অবনতি ঘটায়। পরিকল্পনা ছাড়াই বাড়ি নির্মাণ হতে শুরু করে; নাগরিকদের ব্যবহৃত রাস্তা আটক করে ফেলা হয়, কুমোররা শহরে এসে জড়ো হয়। মার্টিমুর হুইলার এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা করে বলেছেন যে শহরগুলি তাদের সৌন্দর্য ও সুষমা হারিয়ে ফেলেছে।

২ক.২.২ গ্রাম-শহরের সংযোগ

নগর ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হলেও এই সভ্যতায় গ্রাম ও কৃষি ব্যবস্থার ভূমিকা গৌণ সেকথা ভাবলে চলবে না। সেই যুগে গ্রাম শহরে খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা না থাকলে নাগরিক সভ্যতা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নাগরিক জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির আলোচনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রামের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য নগরাঞ্চলে খাদ্য অনুৎপাদক সম্প্রদায়ের কাছে যোগান দেওয়া যে-কোন নগরাশ্রয়ী অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক প্রধান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া।" (রণবীর চক্রবর্তী)

রামশরণ শর্মার মতে নীলনদ যেমন মিশরকে সৃষ্টি করেছে এবং মিশরবাসীর খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেছে সেইরকম সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশ সৃষ্টি করে সিন্ধু জনগণের অশেষ উপকার সাধন করেছে। ব্যাপক হারে খাদ্য উৎপাদন করবার ক্ষমতা, সিন্ধুর মতো বৃহৎ নদী যার নদী যার সাহায্য পরিবহন, জলসেচ, বাণিজ্য এই ত্রিবিধ কাজ সমাধান করা যায়। এর ফলেই আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে নয়—সিন্ধুনদের সমভূমিতে এই বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

কৃষির ক্ষেত্রে আর একটি কথা স্মর্তব্য এই যে সিন্ধু সভ্যতায় প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব থেকেই কৃষির ঐতিহ্য রয়েছে। দুরকম গমের চাষ হত; লোথালে ধানচাষ করা হত মনে হয়। দেশীয় কার্পাস থেকে তুলা এবং সুতিবস্ত্র উৎপাদন করা হত। হরপ্পা সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে কলা, তিল, সর্ষের দানা ও বীজ আবিষ্কৃত হয়েছে। অলচিন দম্পতি কলাই চাষের জমির বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে বাণিজ্যের ফল হিসাবেই হরপ্পীয় সংস্কৃতি এলাকায় কলাই চাষের প্রবর্তন ঘটেছিল। চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সিন্ধুবাসীরা লাঙলের দ্বারা চাষ করতে জানত কিনা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। কালিবঙ্গানের উৎখনন থেকে প্রাক্-হরপ্পা পর্বের একটি কৃষিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে হলকর্ষণের দাগ স্পষ্ট। একই সঙ্গে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি লাঙ্গল চালনার রেখা দেখা যায়। অর্থাৎ লাঙলের ব্যবহার প্রাক্-হরপ্পা আমলেই জানা ছিল। অলচিন দম্পতি মনে করছেন যে লাঙলের ব্যবহার মানে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার; এর ফলে উৎপাদনকে বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। খাদ্য উৎপাদানের এই নতুন পর্যায়কে তারা 'কৃষি বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর ও অন্যান্য শহরের শস্যাগারে এই উদ্বৃত্ত ফসল গুদামজাত করা হত এবং সেটি নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে করবার জন্যে একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। হরপ্পীয় সভ্যতার পরিণত স্তরে কৃষি সংগঠন এবং কৃষি ব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল নিয়মিত ঘটনা।

২ক.৩ বাণিজ্য

অধ্যাপিকা শিরীন রত্নাগর এনকাউনটার দি ওয়েস্টার্লি ট্রেড দি হরপ্পা সিভিলাইজেশন বইতে 'বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকা'-র ভৌগোলিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করার দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। প্রথমত, উক্ত এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের চেয়ে মেসোপটেমিয়া এবং সুমেরু অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর মিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের কয়েকটি সীমিত এলাকাকে বাদ দিলে ধাতুর উৎস বিশেষ ক্ষীণ। কিন্তু হরপ্পীয় কারিগরেরা ধাতুর ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন এবং যেসব ধাতু হরপ্পীয় সভ্যতার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পাওয়া যেত না তাদের বাণিজ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হত। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যই হরপ্পার নাগরিকেরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন এবং পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার 'বাণিজ্য' ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা বাণিজ্যের বহু উপাদান আফগানিস্তানের থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এমনকী, সুদূর ক্রীট, সিরিয়া ও মিশরেও হরপ্পীয় সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। উপাদানগুলির পরিমাণ এবং প্রাপ্ত বস্তুর ধারাবাহিকতা থেকে বাণিজ্য ছাড়া আর কোন সম্ভাবনার

কথা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মনে হয়নি। বস্তুত, বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে হরপ্পীয় সভ্যতাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত শোর্টুগাই খ্রিঃপূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে এক প্রান্তবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার বহু বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, বিশেষ করে "ল্যাপিস লাজুলী", এখান থেকে সংগ্রহ করে পরে দূরবর্তী দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। বাদখ্‌শনের ল্যাপিস লাজুলী খনির অবস্থান এবং এখান থেকে শোর্টুগাই-এর নৈকট্য ইত্যাদির কারণে শোর্টুগাইকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হত। দক্ষিণ তুর্কমেনিয়াতে হরপ্পীয় যুগের হাতির দাঁতের খেলবার জিনিস, তামার তৈরি জিনিস, সিলমোহর, মাটির পাত্র এবং বিভিন্ন ধরনের পুঁতি পাওয়া গেছে। দক্ষিণ তুর্কমেনিয়াতে তামা বিরল ধাতু, তাই মনে হয় তাম্রনির্মিত জিনিসগুলি সিন্ধু সভ্যতার এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং অধ্যাপক কোহ্ল-এর মতে এই যোগাযোগ ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে হয়েছিল। উত্তর ইরানে হিসার, শাহটেপি, মারলিক ইত্যাদি স্থানে হরপ্পীয় প্রত্নবস্তুর দেখা পাওয়া যায়। শাহবাদে প্রাপ্ত পুঁতিগুলি হরপ্পীয় কারিগরীর নমুনায় তৈরি এবং হরপ্পা থেকে এগুলির আমদানি করা হয়েছে। এ ছাড়াও বৃহৎ স্থাপত্য কীর্তি হিসাবে আক্কাদীয় সভ্যতার আমলে নির্মিত স্থাপত্য নমুনার সঙ্গে হরপ্পীয় শস্যাগারের মিল দেখা যায়। পারস্য উপসাগরের উপকূল অঞ্চলের বহু স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন ওজনের নমুনা। আকৃতি এবং ওজনের দিক থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে হরপ্পীয় এলাকার ওজনের অনুরূপ। বাহরিনের প্রথম বাণিজ্য যোগাযোগ সিন্ধু সভ্যতার মাধ্যমে হয়েছিল এবং বাহরিনের কাছে মেসোপটেমিয়ার চেয়ে হরপ্পীয় বণিকরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যাপক সিন্ধুদেশের ওজনের ব্যবহার এই প্রবণতার দিকেই ইঙ্গিত করে।

মেসোপটেমিয়াতে বিভিন্ন ধরনের হরপ্পীয় প্রত্নবস্তুর সমাবেশ দেখা যায়। এইসব কারণে স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ হরপ্পা-মেসোপোটেমিয়া বাণিজ্যিক যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মেসোপটেমিয়ার কিশ অঞ্চলে ১৯২৩ সালে প্রথম সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত সিলমোহর পাওয়া যায়। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে হরপ্পীয় সিলমোহর আবিষ্কার হচ্ছে। সি. জে গাড মেসোপটেমিয়ার উর প্রত্নক্ষেত্র থেকে ১৮টি সিলমোহর আবিষ্কার করেন। এর সঙ্গে হরপ্পীয় সিল সাযুজ্য নিয়ে বহু আলোচনা করা হয়েছে এবং শিলমোহরগুলি যে সিন্ধু-পারস্য উপসাগরীয় এলাকা— মেসোপটেমিয়াতে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া কার্নেলিয়ান পাথরে নির্মিত এবং কার্নেলিয়ান ছাড়াও ল্যাপিস লাজুলী, চ্যালসিডনি, অ্যাগেট ইত্যাদি পাথরের তৈরি পুঁতি সংগ্রহ মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এই পুঁতিগুলি ভারতে তৈরি এবং ব্যবসার জন্যে প্রেরিত হয়েছিল এটা ভাববার যথেষ্ট যুক্তি আছে। মেসোপটেমিয়ার টেল আসমার, উব ইত্যাদি স্থানে ভারতীয় পাশা খেলা বোধহয় খুব জনপ্রিয় ছিল; কারণ এইসব স্থানে ভারতীয় ধাঁচে নির্মিত পাশা খেলার গুটি পাওয়া গেছে। এই দৃষ্টান্তকে বাণিজ্য থেকে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি দৃষ্টান্ত বলে ধরতে পারি। আই. ই. ম্যাক, এস. আর. রাও, দিলীপ চক্রবর্তী বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সিরিয়া, মিশর, ক্রীট ইত্যাদি অঞ্চলেও হরপ্পীয় সভ্যতার যোগাযোগ ছিল।

পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যদি হরপ্পীয় প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, তাহলে হরপ্পা অঞ্চলে পশ্চিম এশিয় প্রত্নবস্তু পাওয়া দরকার, সেক্ষেত্রেই বাণিজ্য বস্তুর বিনিময় যোগ্যতা প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু হরপ্পীয় এলাকায় বিদেশীয় প্রত্নবস্তুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। শিরীন রত্নাগর সমস্যাটির সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। তার মতে মেসোপটেমিয়া ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করত এবং কৃষির দিক থেকে দুর্বল দেশগুলির কাছ থেকে অন্য পণ্যের বেশী করে দাবি করত। (*এনকাউন্টার,* পৃঃ ৩-৪)

কিছু সিলমোহর এবং অন্যান্য কিছু বিদেশীয় প্রত্নবস্তুর উপস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গোলাকার বেশ কয়েকটি সিলমোহর এবং অন্যান্য কিছু বিদেশীয় প্রত্নবস্তুর উপস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গোলাকার বেশ কয়েকটি সিলমোহর হরপ্পীয় এলাকায় অনুপ্রবেশকারী সিলমোহর বলা যেতে পারে; এই সিলমোহরগুলি মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চানহুদারো, বাহারিন, ফাইলকা অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে। দিলীপ চক্রবর্তী মনে করছেন যে এইগুলি সিন্ধু-পারস্য উপসাগর; মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহার করা হত (চক্রবর্তী ঃ *দি এক্স্টারনাল ট্রেড অফ্ দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন,* পৃঃ ৪৫)। বহু পূর্বে প্রায় ১৯৩১ সালে মার্শাল হাতির দাঁতের নির্মিত চোঙ-আকৃতির পাঁচটি সিলমোহরের উল্লেখ করেছেন।

মার্শালের অভিমত এই যে সুমাতে প্রাপ্ত সিলমোহরগুলির সঙ্গেই এদের মিল বেশি। বি. বি. লাল কালিবঙ্গানে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চোঙ আকৃতি সিলমোহরের কথা উল্লেখ করেছেন। বিদেশী আকৃতির এই সিলমোহরটিতে কেন দেবতার কাছে নারীবলির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে? উদ্দেশ্যটি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। পারস্য উপসাগরে নির্মিত সিলমোহর লোথালে পাওয়া যায়, এদের প্রত্যেকটির গায়ে যেসব ছবি আঁকা আছে তা হরপ্পীয় বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। শুধু লোথালে নয়, এরকম সিলমোহর হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতেও খুঁজে পাওয়া যায়। নাগপুর মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি সিলমোহরের কথা আলাদা করে বলা যায়; কারণ এই সিলমোহরটির তারিখ ২০০০ খ্রিঃপূঃ বলে নির্ণয় করা সম্ভভব হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এটি ভারতে প্রবেশ করল তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ফ্রাব্রি ১৯৩৭ সালে মহেঞ্জোদারোতে একটি সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় লেখমালা খুঁজে পেয়েছেন; আধুনিক পন্ডিতেরা মনে করেছেন যে এর সঙ্কেতলিপিগুলি হরপ্পীয় সঙ্কেতলিপির সঙ্গে এককরম নয়; সিলমোহর ছাড়া অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে ডাবারকেটে প্রাপ্ত একটি একটি পাথরের নির্মিত পুরুষ-মস্তক, লোথালে প্রাপ্ত বেশ কিছু মৃৎপাত্রের কথা আলোচনা করা দরকার। লোথালের মৃৎপাত্রগুলি স্পষ্টতই স্থানীয় নির্মাণ নয় এবং যেখানে পাওয়া গেছে সেটি ছিল বণিকদের আবাসস্থল। সুতরাং সমুদ্র বাণিজ্যের সূত্র ধরেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এ ছাড়া, মেহেরগড় (দক্ষিণ সমাধিস্থল), সিগ্রি এবং কোয়টা সমাধিক্ষেত্র থেকে বেশ কিছু হরপ্পা-বহির্ভূত প্রত্নবস্তুর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

২ক.৩.১ বাণিজ্যিক পথ

বাণিজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেলে পরের প্রশ্ন হচ্ছে বাণিজ্যিক পথ কী কী ছিল। দিলীপ চক্রবর্তী ও নয়নজ্যোতি লাহিড়ী বিস্তৃতভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। অধ্যাপিকা লাহিড়ী স্থলপথ ও জলপথ উভয় দিকের রাস্তা সম্বন্ধে গবেষণা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছেন। তিনি উত্তর দিকে আফগানিস্তান-উত্তর ইরান-তুর্কমেনিয়া-মেসোপটেমিয়া অক্ষকে চিহ্নিত করেছেন। আফগানিস্তান থেকে মেসোপটেমিয়ার পথে কার্নেলিয়ান পাথরের পুঁতি, সিন্ধু সভ্যতার চিহ্নিত বিশিষ্ট সিলমোহর পাওয়া গেছে। অক্ষরেখার মধ্যে

শটুগাই, টেপিহিসার, শাহটেপি, কিশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়ার মরুভুমির পশ্চিম দিক ধরে যাত্রা করলে এটি ছিল তুলনামুলকভাবে সোজা রাস্তা। দক্ষিণদিকে স্থলপথে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগ রক্ষাকারী বিকল্প একটি পথের কথা অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেছেন—টেপিইয়াহিয়া-জালালাবাদ-কালেনিশার-সুশা-উর। এখানকার প্রতিটি স্থানেই সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। আবার নরম পাথরের (যেমন ষ্টিটাইট/ক্লোরাইট) তৈরি পাত্র প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, পারস্য উপসাগর এলাকা, ইরানে অনেক পাওয়া যায়; এই পাথরের পাত্র তৈরির অন্যতম কেন্দ্র ছিল টেপি ইয়াহিয়া; মহেঞ্জোদারোতেও এরকম নমুনার একটি পাত্র আবিষ্কার করা গেছে। পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় গুজরাট-সিন্ধু উপকূল ধরে তৃতীয় একটি জলপথের রাস্তা ছিল। ডিলমুন থেকে হরপ্পার মধ্যে কয়েকটি হরপ্পীয় উপকূল এলাকার কথা জানা যায়। এদের মধ্যে মাকারন উপকূলের ঘুটকাজেন-দর এবং সোটকা-খো বেশ বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী এলাকা ছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতা মেসোপটেমিয়া/ইরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল কিনা তা নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। এখন আলোচনা করা যেতে পারে যে বহির্বাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী কী কী ছিল। লোথাল এবং সিন্ধু সিলমোহর থেকে এবং গজ মাপার দণ্ড থেকে এটা মনে হয় যে সুতিবস্ত্র রপ্তানির দ্রব্য ছিল। দিলীপ চক্রবর্তী এবং রত্নাগর দুজনেই মনে করেন যে, হাতির দাঁতের প্রস্তুত জিনিস ব্যাপকভাবে রপ্তানি হত। রত্নাগর ল্যাপিস লাজুলী পাথরের বিনিময় যোগ্যতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন; চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন যে বাদখ্‌শান থেকে ল্যাপিস সংগ্রহ করে সেগুলি কি পুনরায় মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে রপ্তানি করা হত কিনা। প্রশ্নটির উত্তর সহজ নয়। জর্জিনা হেরম্যান জানাচ্ছেন যে, সিন্ধু অঞ্চল থেকে ল্যাপিস রপ্তানী হত ঠিকই কিন্তু দুটি ল্যাপিসের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের মেসোপটেমিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে জানা সম্ভব নয় যে, সিন্ধু অঞ্চল থেকে কোন ধাতু বা ধাতব দ্রব্য রপ্তানি করা হত কিনা। প্রশ্নটি জরুরি, কারণ ব্রোঞ্জ যুগে যন্ত্র এবং অস্ত্র তামা ও টিন দিয়ে তৈরি হত; সমস্ত কারিগরী বিদ্যা ব্রোঞ্জ ও টিনের সংগ্রহের উপর নির্ভর করত। হরপ্পীয়রা ওমান থেকে তামা সংগ্রহ করত।

রাজস্থান ও গুজরাটে, বিশেষ করে, রাজস্থানের তাম্র খনিগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হত। গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য কাজে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ভাল কাঠ পাওয়া যেত না। তাই প্রাচীন মেসোপটেমিয়া লেখমালায় দিলমান, মগন, মেলুহার বিভিন্ন কাঠের কথা উল্লেখ করা আছে। বাস্তবিক, দামী কাঠই বোধহয় ছিল হরপ্পা ও মেলুহার প্রাথমিক বাণিজ্যিক বিনিময় বস্তু। এ ছাড়াও, শিরীন রত্নাগর সোনা, রূপা এবং মূল্যবান পাথরের বাণিজ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য হরপ্পার অর্থনীতির সমৃদ্ধির পক্ষে কত জরুরি ছিল।

হরপ্পীয় মেসোপটেমিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে তিনটি অঞ্চলের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে, তারা হল টিলমুন/ডিলমুন, মগন ও মেলুহা। ডিলমুন-এর অবস্থান নিয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিককালের বাহরিন ছিল সেকালের ডিলমুন। মগন ও মেলুহা-র আধুনিক ভৌগোলিক অবস্থান কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন স্থানের নির্দেশ করেছেন কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক সরবার্জার মনে করছেন যে মগন ও মেলুহা মেসোপটেমিয়া থেকে অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চল নয়; এটি এমন স্থানে অবস্থিত যেখান থেকে সামরিক অভিযান এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয় বজায় রাখা যায়। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মেলুহাকে

সিন্ধু প্রদেশের সঙ্গো অভিন্ন করে দেখেছেন। মেসোপটেমিয়ার বাণমুখলিপিতে লিখিত নথিতে মেলুহা ভাষার দোভাষীর উল্লেখও পাওয়া যায়। এটি নিম্ন সিন্ধু এলাকার সঙ্গো মেসোপটেমিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের স্পষ্ট প্রমাণ। 'মাগান'কে আগে মাকারাস উপকূলের সঙ্গো সনাক্ত করা হত। সম্প্রতি পুরাবিদ্‌রা 'মাগান'কে ওমান উপকূলের সঙ্গো অভিন্ন বলে মনে করেন। কারণ হিসাবে তারা বলেছেন যে লেখমালায় মেলুহা থেকে আগত বস্তুগুলি অধিকাংশই সিন্ধু অঞ্চলের নিজস্ব জিনিস। মেলুহার ময়ূর মেসোপটেমিয়ার রাজপ্রাসাদে শোভা পেত এবং কালো জাতের বিশেষ মেলুহার মুরগীর কথা বারবার বলা হয়েছে যাদের হাড় হরপ্পীয় অঞ্চলের রূপারে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, মেলুহার কৃষ্মাঙ্গ জনগণের কথাও তাঁরা লিখেছেন। তৃতীয়ত, মেলুহার নৌকা, মূল্যবান ও কম মূল্যবান পাথর, বিভিন্ন ধরনের পাথর ইত্যাদির উল্লেখ প্রাচীন মেসোপটেমিয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে— এই সমস্ত জিনিসই ছিল সিন্ধু এলাকার নিজস্ব জিনিস। সমুদ্রপথে ২৩৩৪-২২৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মেলুহার সঙ্গো সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এবং এই যোগাযোগ পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল; সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এখন এটা বলা যাবে যে সিন্ধু উপত্যকাকে প্রাচীন মেসোপটেমিয় লেখতে মেলুহা বলে উল্লেখ করা হত।

বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে বাণিজ্যের প্রকৃতি কী ছিল তা জানা দরদকার। বাণিজ্য শুধু এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানে বিতরণ নয়। এর মধ্যে পণ্যদ্রব্যগুলির উৎপাদন এবং ভোগ করাকে যুক্ত করতে হবে।

২ক.৪ সমাজ ও ধর্মীয় জীবন

হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের কারণ বিশ্লেষণের আগে তাদের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন আছে বলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

সিলমোহরগুলি অপঠিত থাকা সত্ত্বেও প্রত্নবস্তুর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হরপ্পীয় জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। যদিও কোনো প্রথাগত মন্দির পাওয়া যায়নি তবুও মহেঞ্জোদারোতে দুর্গ এলাকায় এবং নীচের তলার শহরের বেশ কয়েকটি বাড়িকে মন্দির বলে ভাবা যেতে পারে, কারণ বহু ধর্মীয় মূর্তি এইসব বাড়িগুলি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মার্শাল হরপ্পীয় সভ্যতার ধর্ম আলোচনার সময় কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। পোড়া মাটির নির্মিত স্ত্রীমূর্তিগুলিকে তিনি মাতৃকা শক্তির আধাররূপে কল্পনা করেছেন। মার্শালই প্রথম বিশেষ একটি মূর্তিকে শিব-মূর্তি বলে দাবী করেছেন কারণ তাঁর মতে, পরবর্তীকালে শিবের বৈদিক ধারণার সাথে এই মূর্তির আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যোগাসনে উপবিষ্ট এবং বিভিন্ন পশু দ্বারা বেষ্টিত; মস্তকে মহিষের শিং শোভিত এই মূর্তিকে শিব ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায়নি। পাথরের লিঙ্গ মূর্তি এবং যেসব বাড়িতে এই লিঙ্গ মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে তা বোধহয় এই দেবতাকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল।

২ক.৪.১ অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস

তাবিজ এবং সিলমোহরে অন্য আর এক ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে যার মধ্যে একরকমের অতিপ্রাকৃতিক ধারণা লক্ষ্য করা যায়। এই মূর্তিগুলির মাথায় শিং এবং পশ্চাদ্দেশে একটি লেজ আছে এবং কোন কোন

সময় এই মূর্তিগুলির পা-গুলি খুরবিশিষ্ট। এ ছাড়াও তাবিজ, সিলমোহরের তামার ফলকে নানা ধরনের মূর্তি পাওয়া যায় যা বিশেষ ধরনের দৈবী বিশ্বাসের ইঙ্গিত করে, যেমন—একটি সিলমোহরে সর্প পরিবেষ্টিত যোগী চেহারার মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিটিকে দেবমূর্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। সিন্ধু অধিবাসীদের কল্পনায় বৃক্ষদেবতাও উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন মূর্তিতে মেসোপটেমিয়ার পুরাণে উল্লিখিত গিলগামেশের ছাপ পাওয়া যায়; এই ছাপে দেখা যায় যে একজন মানুষ দুহাতে দুটি বাঘকে ধরে আছেন; আবার শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি মানুষ পাওয়া গেছে যার পা এবং লেজ ঠিক বলদের মতো যাকে মেসোপটেমিয়াতে এনকিডু নামে পশু মানুষ ভাবে কল্পনা করা হয়েছে। কোন কোন সময় ষাঁড় বা বাইসনের মাথা থেকে একটি গাছের সৃষ্টির কথা কল্পনা করা হয়েছে। ষাঁড় এবং গরুকে দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনার সময় নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিমূর্ত ধর্মীয় কল্পনার মধ্যে স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে যার ধারাবাহিকতা আজকের ভারতীয় হিন্দুধর্মে অব্যাহত।

কালিবঙ্গানে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন হরপ্পীয় সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসে একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। এখানে মন্দিরের ধারণা সম্বলিত বেশ কয়েকটি বাড়ি পাওয়া গেছে। ইঁটের গাঁথুনি বেশ কয়েক সারি উঁচুতে উঠে গেছে এবং উঁচু চাতালটিতে অগ্নিবেদী, কূপ, স্নান করবার স্থান পাওয়া যাচ্ছে এবং ইঁটের তৈরি একটি গর্ত শুধুমাত্র ছাই এবং পশুর হাড়ে ভর্তি। এই এলাকাটি নিশ্চিতভাবে সমবেত দেবার্চনার স্থান ছিল—যেখানে পশুবলি, পূণ্যস্থান, অগ্নি উপাসনা নিয়মিতভাবে করা হত। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে দুর্গ এলাকা ছাড়াও নীচের তলার বাড়িগুলিতে একটি স্থান অগ্নিসংরক্ষণের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই কক্ষটিকে অগ্নিশালা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রথাটি গৃহস্থদের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়।

অন্য জায়গায় অগ্নিবেদী আবিষ্কার করা হয়েছে; পাশাপাশি ছাই-এর গর্তও পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আর কিছু নয় কেন? অলচিন দম্পতি মনে করেন যে নীচের তলার লোকেরা শহর এলাকার লোকেদের চেয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিত।

সংক্ষিপ্তভাবে এটা বলা যেতে পারে যে—পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার ধর্মীয় ধারণায় নানারকম স্রোত এসে মিশেছে। একটি স্রোত অবশ্যই প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা থেকে উপস্থিত হয়েছে এবং তাকে বেগবান করেছে; কিন্তু বৈদিক সভ্যতার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যখন হরপ্পার সভ্যতায় লক্ষ্য করি তখনই জটিলতার সৃষ্টি হয়। অগ্নি-উপাসনা সুনিশ্চিতভাবে ইন্দো-আর্যদের উপাসনা পদ্ধতি। অগ্নিশালা পূজা-বেদির দ্বারা আমরা কি প্রমাণ করতে পারি যে, আর্যরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূব্দাদের বহু পূর্বে ভারতে উপস্থিত হয়েছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে আরও অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ এই প্রশ্নটির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার পতনের কারণ-সম্পর্কিত সমস্যাটি বিশেষভাবে জড়িত আছে।

২ক.৪.২ ধর্মবিশ্বাস ও ক্ষমতাবিভাজন

ব্রিজেট অলচিন সম্পাদিত—*সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি* পুস্তকে ইলডিকো পুস্‌কাস্ সিন্ধুসভ্যতার ধর্মসম্বন্ধে নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, সিন্ধুসভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী বিকাশ এবং পতনের সঙ্গে সিন্ধু অধিবাসীদের ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাঁর মতে, কোনও একজন ব্যক্তি নয়, পুরোহিতগোষ্ঠী সমবেতভাবে

সিন্ধুসভ্যতার রাষ্ট্রব্যবস্থা, উৎপাদন, বিপণন এবং দূরপাল্লার বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অধ্যাপিকা পুস্কাসের কথা ঠিক হলে আমরা কোশাম্বীর কথা মেনে নেব যে এই পুরোহিতগোষ্ঠী পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করত—কারণ পরিবর্তন তাদের কাছে লাভজনক নয়; এর ফলে যে অচল অবস্থা ও স্থাণুত্ব দেখা যায় তা সিন্ধুসভ্যতার পতনকে ডেকে আনে। পুরোহিতগোষ্ঠী, বণিক-সম্প্রদায়, কারিগর এবং বোধ হয়, গ্রামের প্রধান যারা (গ্রামণী) ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী জনগণের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই শহর ও গ্রাম এবং ক্ষমতাহীন এবং ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বিরাজ করত এবং এর থেকেই কি পরে আর্যদের বর্ণব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল? এই দ্বন্দ্বকে সমাধান করবার ব্যর্থতাই পরবর্তীকালে হয়তো পুরাহিততন্ত্র-পরিচালিত সিন্ধু রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ডেকে এনেছিল।

এ ছাড়াও, অধ্যাপিকা পুস্কাস্ সিন্ধুসভ্যতার দেব-দেবীকে দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগে লোকায়তদের দেবীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি; মাতৃকাশক্তি, লিঙ্গ পূজাকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়; আর একটি ভাগকে হরপ্পীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে ভাবা যেতে পারে। চতুর্মুখবিশিষ্ট দেবতা—যিনি সৃষ্টি এবং ধ্বংসের প্রতীক, তিনি সাম্রাজ্যবাদী সিন্ধুবাসীদেরও দেবতা ছিলেন বলে মনে করা যায়। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে এইসব দেবতারা হিন্দুধর্মে স্থান করে নিয়েছিলেন তা গভীর গবেষণার বিষয়। সিন্ধুসভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর বোধহয় এইসব দেবতারা তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। কীভাবে এবং কেন? তার উত্তর ভবিষ্যৎ-গবেষকদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। স্বাভাবিকভাবে এই কাজে সমাজের একাধিক শ্রেণী যুক্ত থাকে। শ্রেণীগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উপর বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

সাম্প্রতিককালে হরপ্পার বাণিজ্য নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং হরপ্পীয় বাণিজ্য নিয়ে তারা নানারকম মতামত প্রকাশ করেছেন। হরপ্পীয় সভ্যতার ভূমিকায় বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে শিরীণ রত্নাগর হরপ্পাকে মেসোপটেমিয়ার উপনিবেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হরপ্পার শ্রমজীবী জনগণ মেসোপটেমিয়ার মন্দির এবং বণিকশ্রেণীর চাহিদা মেটাবার জন্যে উৎপাদন করত। অধ্যাপক বি. এম. পাণ্ডে এবং অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অধ্যাপক চক্রবর্তী হরপ্পীয় বাণিজ্যের সংগঠিত এবং অসংগঠিত দুটি চরিত্র ছিল বলে মনে করেন। হরপ্পা এবং মেসোপটেমিয়ার অন্তর্বর্তী উপজাতীয় গোষ্ঠীরা বাণিজ্য-প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, খ্রিস্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের মধ্যে এই বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যায়।

২.৫ সভ্যতার পতন

এখানে সভ্যতার উত্থানের মতো তার পতনও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের বিস্মিত করে। কীভাবে সহস্রাধিক বছরকাল স্থায়ী হবার পর কোনরকম উত্তরসূরি না রেখে হরপ্পীয় সভ্যতার বিলোপ ঘটল? কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনা এর পিছনে দায়ী? কীভাবে এই পতনকে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ভারতীয় সভ্যতার পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে হরপ্পীয় সভ্যতার প্রভাব আছে কি? এ সমস্ত এবং আরো অনেক প্রশ্ন ঐতিহাসিক এবং

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের আলোড়িত করে। এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তরের মধ্য দিয়েই কোন একটি সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের জন্যে নানারকম কারণ নির্দেশ করা হলেও দুটি প্রধান কারণের কথা প্রায় সকলেই আলোচনা করেছেন। (এক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (দুই) হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। হুইলার মনে করছেন, এই সভ্যতার শেষও শুরুর মতো কম আকর্ষণীয় নয়। দ্বিতীয়ত, হরপ্পীয় সভ্যতা বহুদূর বিস্তৃত; প্রত্যেক স্থানে একই রকম কারণের জন্য পতন আসেনি। আধুনিককালের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা সেই কথাই প্রমাণ করে।

২ক.৫.১ বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়

নীলনদের বন্যার মতো সিন্ধুনদের বন্যা ছিল প্রতি বৎসরের এক স্বাভাবিক ব্যাপার। এই বন্যার ফলে জমির উর্বরতা বাড়ত এবং অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হত। কিন্তু অস্বাভাবিক এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা মহেঞ্জোদারো শহরের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। খননকার্যের ফলে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে কমপক্ষে তিনবার ব্যাপক হারে বন্যা দেখা দেয় যার হাত থেকে শহরকে রক্ষা করা সম্ভভব হয়নি। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাড়িগুলি কাঁচা ইঁটের বদলে পাকা ইঁট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। বন্যার জল যাতে নগরদুর্গকে ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য প্রায় ৪৫ ফুট চওড়া একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। উঁচু পাটাতনের উপর বাড়িগুলি তৈরি করা হত। লোথালের কাছে কোলহ নামে একটি জায়গায় জমাট পলিমাটির অবস্থিতির দরুন এটা অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে এই জায়গাটি বন্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এস. আর. রাও মনে করেন যে লোথাল, দোলপারা, রংপুর বন্যার ফলে ধ্বংস হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠগত ভয়াবহ পরিবর্তনের ফলে এরকম বন্যা সম্ভব হয়েছিল। বন্যার ফলে শহর পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে দেখা গেছে। অধ্যাপক ফেয়ারসার্ভিস বন্যার আর একটি দিকের কথা আলোচনা করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু মহেঞ্জোদারোর নগরীয় আয়তন বোধহয় প্রসারিত হয়নি; তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা তাগিদ ছিল বন্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি বাস করার; বিশেষ করে কৃষিজীবী জনগণের মধ্যে এই চাহিদা বেশি হওয়া সম্ভব; অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে নগরীয় পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

২ক.৫.২ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন

আকর্ষণীয় আর একটি সমস্যা হল হরপ্পার খাদ্য-উৎপাদন। হরপ্পীয় সভ্যতার প্রায় সমস্ত অঞ্চল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল গম-উৎপাদক অঞ্চল। গুজরাট, আলমগীরপুর, তাপ্তী নদীর উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে বোধহয় পরবর্তীকালে চাল উৎপাদনের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে হরপ্পীয় কৃষকেরা গম উৎপাদক-এলাকার বাইরে কোন বসতি করেনি; কারণ সেখানে তাদের কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। গম থেকে চালের উৎপাদনে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে—গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং দাক্ষিণাত্যের উপকূল এবং মালভূমি এলাকা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। হরপ্পীয় অঞ্চল পরিত্যাগ করে নতুন এলাকায় জনবসতি স্থাপন করার পক্ষে কোন বাধা রইল না। যদিও এটি অনুমান কিন্তু এটি সত্য যে, আর্যরা আসবার আগে প্রাক্-আর্য জনগণ মধ্যগাঙ্গেয় এবং নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় ধান চাষ করতে পারত। এই প্রাক্-আর্য কারা ছিলেন?

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অপর একটি কারণ বোধহয় বৃক্ষচ্ছেদন; গৃহস্থালীর প্রয়োজনে, শিল্পের প্রয়োজনে,

বিশেষ করে, লক্ষ লক্ষ ইঁট তৈরির কাজে অসংখ্য গাছ উৎপাটিত করতে হয়েছিল। এর ফলে, সবুজ বনানী শুষ্ক মরুপ্রায় এলাকায় পর্যবসিত হয়েছিল। এ ছাড়াও, একই জমি বারংবার চাষ করা, জলসেচের নালাগুলির অবহেলা ইত্যাদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ উপকরণ বলে ধরা হবে।

হরপ্পা সভ্যতার নগরায়ণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পৌর-কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের কথা বারংবার বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হয় এরা ক্ষমতাবিহীন হয়েছিলেন অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে তাদের কিছু করার ছিল না। মহেঞ্জোদারোতে পরবর্তী পর্যায়ে নগর-স্থাপত্যের ক্রম-অবনতির ছাপ স্পষ্ট। পুরোনো ইঁট ব্যবহার করে নতুন বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে; জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তা অবরোধ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে শহরটির প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

আবার আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কৃষির পশ্চাৎপদতা নিয়ে আলোচনা করেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি-অর্থনীতি প্রসারিত না হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনে জড়ত্ব দেখা দিয়েছিল। কোশাম্বী মনে করেন যে, লৌহজাত উপকরণের সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকার ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে ব্যাপক পরিমাণে কৃষি উৎপাদন ঘটানো সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পক্ষান্তরে যখন আমরা লক্ষ্য করব যে সুমেরীয় এলামাইটদের তুলনায় হরপ্পীয়দের ধাতুবিদ্যার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং সাধারণ মানের, তখন বুঝতে হবে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় তারা সমসাময়িক সভ্য জাতিদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। ল্যামবার্গ কার্লোভস্কির মতে, হরপ্পা সভ্যতার প্রথম থেকে শেষ অবধি কারিগরী বিদ্যা—বিশেষ করে, ধাতব বিদ্যার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, প্রতিরক্ষার অস্ত্র যেমন কুঠার, ছোরা ইত্যাদির ঢালাই-ছাঁচ অতি সাধারণ মানের। হরপ্পীয় প্রত্নবস্তুর মধ্যে কৃষিতে ব্যবহৃত উপাদানগুলির অতি সামান্যই ব্রোঞ্জ নির্মিত; অতিশয় রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার ফলে বোধহয় কৃষিতে ধাতুর ব্যবহার সীমিত। কাস্তে, লাঙল, নিড়ানিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় পাথর বা শক্ত কাঠের তৈরি। কৃষিতে তামা-ব্রোঞ্জ ইত্যাদির ব্যবহার সীমিত, কিন্তু প্রস্তর-শিল্পে, হাতির-দাঁতের জিনিস নির্মাণের সময় নানা ধরনের তামা-ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন? মুষ্টিমেয় জনগণের শৌখিনতা মেটাবার প্রয়োজনে উন্নত কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ হচ্ছে অথচ বৃহত্তর জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের সময় রক্ষণশীলতা, এটা কি সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার পরিচায়ক নয়?

২ক.৫.৩ বাণিজ্যমুখী অর্থনীতির ভূমিকা

শিরীন রত্নাগর প্রমাণ করেছেন যে হরপ্পীয় নাগরিক সভ্যতার অস্তিত্বের জন্যে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রয়োজন ছিল। শিল্পের প্রয়োজনে বহু জিনিস ব্যবহার করতেন যা স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা যেত না। হরপ্পীয় নাগরিক সভ্যতা বজায় রাখবার জন্যে দূরপাল্লার বাণিজ্য একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। বিপরীতক্রমে—দূরপাল্লার বাণিজ্য ছিল বলেই বোধহয় হরপ্পীয় নাগরিক সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল। পাঁচশত বছরের অধিক এই বাণিজ্য-সম্পর্ক টিকে ছিল এবং এর ফলে, রত্নাগরের মতে হরপ্পীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং তার কেন্দ্রাতীত ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বাণিজ্যের ফলে পরিশীলিত নাগরিক সভ্যতা, বণিকশ্রেণী গড়ে উঠে। যদি এই বৈদেশিক বাজার, হরপ্পীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বণিকশ্রেণী হাতছাড়া হয়ে যায়, নিশ্চিতভাবে তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া হরপ্পা সভ্যতার উপর পড়বে। রাষ্ট্রের সম্পদ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল; সামগ্রিক উৎপাদন-

ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছিল—যার ফল গ্রামীণ জনতাকেও ভোগ করতে হয়েছিল। কর্মহীন শহরবাসীগণ নগর পরিত্যাগ করে গ্রামের দিকে যাত্রা করলে সনাতনগ্রামীণ জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতায় আঘাত করে। এই অবস্থায় হরপ্পীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সভ্যতার পতন ঘটবে কোন সন্দেহ নেই।

২ক.৫.৪ অভিনবত্ব-সৃজনের অভাব

হরপ্পীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অভিনবত্বের সুযোগ ছিল অল্প। পুরাতন প্রথার দুর্বলতাকে দূর করে তাকে যুগোপযোগী করে নেওয়ার মানসিকতা তাদের ছিল না। অধ্যাপক কোশাম্বী এই পরিবর্তনহীনতাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা হিসাবে তিনি ধর্মের প্রাধান্যের কথা চিন্তা করেছেন। সামাজিক জীবনের স্থাণুত্বের জন্যে ধর্মকে দায়ী করা যায়। কয়েক সহস্রাধিক বছর ধরে হরপ্পীয় সভ্যতায় অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কোন পরিবর্তন নয়। মেসোপটেমিয়া এবং সুমেরীয় শহরগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার পর নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর শহর বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর একইভাবে তৈরি করা হয়, মৃৎপাত্র নির্মাণের কৌশল এবং আকৃতি প্রথম থেকে শেষ অবধি একই থাকে, ব্রোঞ্জের যন্ত্রগুলি একই রকম দেখতে এবং একই রকম তাদের উপযোগিতা। সবচেয়ে বড় কথা, লিখিত বর্ণমালার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই হরপ্পীয় লিপিতে কোন বৈচিত্র্য নেই; স্থায়ী বিষয়বস্তুতে দীর্ঘস্থায়ী কোন বক্তব্য উপস্থিত করার প্রবণতা দেখা যায় না। হরপ্পীয় সংস্কৃতির এই অস্বাভাবিকতাকে কোশাম্বী ব্যাখ্যা করেছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। সমাজের সমস্ত সুযোগসুবিধা যদি মুষ্টিমেয় শ্রেণী ভোগ করে তাহলে পরিবর্তন তাদের কাছে লাভজনক নয়; অপর শ্রেণীর কাছে পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু অলচিন দম্পতি তাদের সাম্প্রতিক *দি অরিজিন অফ্ দি ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন* বইতে এই সমস্যা আর একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমগ্র হরপ্পীয় সভ্যতায় কোন পরিবর্তন হয়নি তা তারা মানতে চান না; কারণ তাহলে (ক) হরপ্পীয় সভ্যতাকে প্রাক্-হরপ্পীয় এবং পরিণত হরপ্পীয়—এই দুই পর্যায়ে ভাগ করার কোনো দরকার হত না; (খ) তাদের মতে আনুমানিক ২৬০০ খ্রিঃপূঃ সময় থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। পরিবর্তনের ক্ষেত্র হিসেবে কয়েকটি দিককে তারা ধরেছেন, একটি হল ঃ (১) লিখিত লিপির উদ্ভব, (২) শিল্প ও কলাবিদ্যার কয়েকটি দিকে বিশেষীকরণ, (৩) বাণিজ্য। কিন্তু অলচিন দম্পতির বক্তব্য দ্বারা কোশাম্বীর বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যাঁরা ক্ষমতা ভোগ করেছেন পরিবর্তনের সুযোগ তাঁরাই নিয়েছেন।

২ক.৫.৫ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান

হুইলার অনুমানভিত্তিক এসব কারণকে এড়িয়ে প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক কারণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তার বক্তব্য এই যে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের দ্বারা এই সভ্যতা যখন জরাজীর্ণ তখন বৈদেশিক আক্রমণ চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত থেকে অন্তত ছ'টি নমুনা তিনি তুলে ধরেছেন যেখানে অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। ডি. কে. এলাকাতে চারিটি কঙ্কাল নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যাচ্ছে তাদের মৃত্যু হত্যা থেকে হয়েছে। এইচ. আর. এলাকায় পাঁচ নম্বর বাড়িতে তেরো জন বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ এবং একজন শিশুর কঙ্কাল দেখা যায়; মনে হয় এদের একই সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে। এদের মধ্যে কোন একটি কঙ্কালের মাথায় ১৪৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ক্ষতচিহ্নের দাগ আছে। জীবিত অবস্থায় কোন ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করার ফলে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালের আরও কয়েকটি

কঙ্কালের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কোনরকম রীতি না মেনেই মৃতদেহগুলিকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। কুয়োর ধারে শায়িত অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল—সমস্ত কিছুই আক্রমণ ও বিপদের দিকে আঙুল নির্দেশ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আক্রমণকারী কারা? এরা আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের পাহাড়ী এলাকা থেকে আগত উপজাতি হতে পারে অথবা, মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্যজাতিও হতে পারে। হুইলার যেখানে দুটি বিকল্পের কথা ভেবেছেন। কোশাম্ভবী কিন্তু স্থির নিশ্চিত যে আক্রমণকারীরা আর্য। *ঋগ্‌বেদ*-এ প্রায়শঃ "অশ্মময়ী নগরী" ও "পুর" ধ্বংস করার কথা বলা হয়। পুর ধ্বংস কারণ বলে আর্যদেবতা ইন্দ্রকে "পুরন্দর" বলে অভিহিত করা হয়। যতদিন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রাচীর-বিশিষ্ট দুর্গগুলি আবিষ্কৃত হয়নি ততদিন এই শ্লোকগুলিকে কল্পনা বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু এখন এইসব বক্তব্যের পিছনে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে ভাবা যেতে পারে, বিশেষ করে হরপ্পীয় সভ্যতা এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত যাকে আর্যরা "সপ্তসিন্ধবঃ" বলে উল্লেখ করেছেন।

আর. এ. ই. কানিংহাম *আর্কিওলজি অফ্ আর্লি হিস্টরিক্ সাউথ এশিয়া* বইটিতে এই ব্যাপারটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৭০০ অব্দ পর্যন্ত হরপ্পা-সভ্যতা একটি পর্যায়ে উন্নীত হয় যাকে নাগরিক সভ্যতার পরবর্তী পর্যায় বলা যায়; এই পর্যায়ে শিল্পায়ন এবং বর্ণমালা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ ছাড়া, পশ্চিম এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেখানকার জনগণের উন্নততর দক্ষিণ এলাকায় গমন করার প্রবণতা থাকতে পারে। চানহুদারো, ঝুকার, আম্রি প্রভৃতি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা বহিরাগতদের আগমনের তত্ত্ব ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। চানহুদারোতে এই পর্যায়ে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়া যাচ্ছে তা হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের কারিগরী ও শৈলী থেকে পৃথক। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই পর্যায়ে চানহুদারোতে কোন হরপ্পীয় সিলমোহর পাওয়া যায়নি। পাথর, ধাতু ইত্যাদি নির্মিত যেসব সিলমোহর পাওয়া গেছে তা পশ্চিম থেকে আগত বিদেশীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে; কারণ অনুরূপ সিলমোহর পূর্ব ইরান, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়াতে পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও কয়েক ধরনের তামার যন্ত্র এবং পিচের কথাও বলা দরকার যারা কোনক্রমেই স্থানীয় নয়, বিদেশী কারিগরদের হাতের তৈরি। হরপ্পীয় সিলমোহরের অনুপস্থিতি কি হরপ্পীয় রাষ্ট্র-ক্ষমতার অনুপস্থিতি বলে ধরে নেওয়া যাবে? শুধু চানহুদারো, ঝুকার নয়, মেহেরগড়ের সাম্প্রতিকতম পর্যায়ে, কোয়েটা এবং তার নিকটবর্তী পিয়ক অঞ্চলের সর্বত্র হরপ্পা-বহির্ভূত এক ঐতিহ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পাতে "সিমেট্রি এইচ."-এ এক বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছিল। হরপ্পার দুর্গ এলাকার এ. বি. টিবিতেও অনুরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। "সিমেট্রি এইচ."-এর মৃৎপাত্রগুলি পরীক্ষা করে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুমোর-সমাজ পুরোনো কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে নতুন খরিদ্দারের চাহিদা মিটাবার জন্যে নতুন ভঙ্গি অনুসরণ করছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভাট এই নবাগতদের ইন্দো-আর্য বলে অভিহিত করেছেন। শুধু মৃৎপাত্র নয়, এরা নতুন ধরনের ছিদ্রযুক্ত শিল, নতুন ধরনের কুঠার ব্যবহার করেছেন যা পূর্বে কখনোই ব্যবহৃত হত না। আরও পূর্ব দিকে কালিবঙ্গানে উপস্থিত বলে দেখতে পাওয়া যাবে—একেবারে উপরের দিকে এক ধরনের পাত্র যা ইন্দো-আর্যরা অগ্নি উপাসনার সময় ব্যবহার করতেন এবং এই চিহ্নটি যদি ঠিক হয় তাহলে হরপ্পীয় সভ্যতার মাঝেই আর্যদের উপস্থিতি ঘটেছিল এরকম ভাবা যেতে পারে। "সিমেট্রি এইচ."-এর বহিরাগতরা জনগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাদের শিল্প-কৌশল করায়ত্ত করে নতুন ব্যবস্থা তাদের জমির উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে—যার স্পষ্ট প্রমাণ বোঝা যায় সমাধিস্থলে পরিবর্তিত নিয়মের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্গত যে বিশাল সাম্রাজ্য তাকে কি আর্যরা এককভাবে ধ্বংস করতে পেরেছিল? সমগ্র হরপ্পীয় অঞ্চলের পতনের জন্য কোন একটি কারণকে দায়ী করা যাবে না, আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের সঙ্গে অন্যান্য কারণগুলি বিভিন্ন সময়ে কম-বেশি যোগ দিয়ে এই সভ্যতার পতনকে ডেকে এনেছিল বলে মনে হয়।

২ক.৬ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রাক্-হরপ্পা স্তর থেকে পরিণত হরপ্পা-সভ্যতায় বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করুন।

২। হরপ্পীয় সংস্কৃতির বৈদেশিক বাণিজ্য কীভাবে পরিচালিত হত? বাণিজ্যের সংগঠন, বিষয়বস্তু, বাণিজ্যপথ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতামত ও পরস্পর বিরোধিতার উল্লেখ করুন।

৩। আর্যরা বা কোন বৈদেশিক জাতি হরপ্পীয় সভ্যতা ধ্বংস করেছিল—প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে কীভাবে তা প্রমাণ করা যায়?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। হরপ্পীয় সভ্যতার বিস্তার কীভাবে হরপ্পীয় সভ্যতা সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করে?

২। হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের জন্যে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়কে কীভাবে দায়ী করা যায়?

৩। সিন্ধুসভ্যতার বদলে আধুনিক কালে কেন হরপ্পা-সভ্যতা বলা হয়?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

১। মহেঞ্জোদারোর স্নানাগারটির আয়তন কত ছিল?

২। লাপিস-লাজুলী কোথায় পাওয়া যেত?

৩। ডিলমান, মগন, মেলুহার কোথায় অবস্থিত বলে অনুমান করা হয়?

২ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। দিলীপ চক্রবর্তী ঃ *দ্য আর্কিওলজি অফ্ এনসেন্ট ইন্ডিয়ান সিটিস্*

২। দিলীপ চক্রবর্তী ঃ *দ্য এক্সটারনাল ট্রেড অফ্ দ্য ইন্ডাস সিভিলাইজেশন*

৩। শিরীন রত্নাগর ঃ *এন্‌কাউন্টার*

৪। অলচিন এন্ড এফ. আর. অলচিন্ ঃ *দ্য অরিজিন অফ্ দ্য ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন্ (১৯৯৭)*

৫। ওয়াল্টার এ. ফেয়ার সার্ভিসেস (জুনিয়র) ঃ *দ্য রুটস্ অফ্ এনসেন্ট ইন্ডিয়া* (১৯৭১)

৬। বি. কে. থাপার ঃ *রিসেন্ট আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারীস্ ইন্ ইন্ডিয়া।*

একক ২খ ❑ বৈদিক যুগ

গঠন

২খ.০ উদ্দেশ্য

২খ.১ বৈদিক যুগের সমাজ

২খ.১.১ গোষ্ঠীবদ্ধতা

২খ.১.২ সমাজে শ্রেণীবিভাজন

২খ.১.৩ বিবাহ ঃ এক প্রতিষ্ঠান ও নারীর ভূমিকা

২খ.১.৪ সমাজে নারীর স্থান ও তার অবনমন

২খ.২ বর্ণবৈষম্য

২খ.৩ খাদ্যাভ্যাস

২খ.৪ বৈদিক যুগের অর্থনীতি

২খ.৪.১ কৃষির প্রসার

২খ.৪.২ পশুপালন

২খ.৪.৩ উৎপাদন প্রযুক্তি ও শস্যসম্ভার

২খ.৫ শিল্প প্রয়াস

২খ.৬ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি

২খ.৬.১ বাণিজ্যপথ

২খ.৬.২ বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার

২খ.৭ সম্পদের মালিকানা

২খ.৮ বৈদিক যুগের রাজনৈতিক সংগঠন

২খ.৮.১ গণরাষ্ট্র

২খ.৮.২ সভা ও সমিতি

২খ.৮.৩ রাজশক্তির প্রাধান্য

২খ.৯ অনুশীলনী

২খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন

- বৈদিক যুগের সমাজ, বিবাহ-প্রথা, বর্ণবৈষম্য কেমন ছিল
- বৈদিক যুগের অর্থনীতি, খাদ্যাভ্যাস, কৃষি, পশুপালন, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি
- বৈদিক যুগের বাণিজ্য, সম্পদের মালিকানা এবং রাজনৈতিক সংগঠন

২খ.১ বৈদিক যুগের সমাজ

ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা বৈদিক সাহিত্য। এই বৈদিক সাহিত্য শুধু ভারতীয় নয় সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীরও সবচেয়ে পুরাতন সাহিত্যসৃষ্টি। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত ছাড়াও ইরানীয়, গ্রীক, লাতিন, জার্মানিক, স্লাভিক ভাষায় বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা তথা আর্যভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর এক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উপস্থিতির কথা জানা যায়। বৈদিক সাহিত্য এই আর্যভাষী জনগোষ্ঠীসৃষ্ট রচনা। বিগত কয়েক শতাব্দীর ভাষাগত গবেষণার ফলে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান সংক্রান্ত নানা বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই বিতর্কের অবসান আজও ঘটেনি। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে এই আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও *অথর্ব,* এই চারটি সংহিতা ও তৎসহ এই রচনার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি নিয়েই বৈদিক সাহিত্য গঠিত। এই সাহিত্য-রচনাগুলি যে সমাজজীবনের ছবি তুলে ধরেছে তাকে বৈদিক যুগের সমাজ বলা হয়। কালসীমার ধারণা করতে গেলে ভাষাগত দিক থেকে বিচার করে আধুনিক গবেষকদের মতামত এই যে, বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদ আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সংহিতা ও সমস্ত *ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ* সাহিত্য-সম্বলিত উত্তর-বৈদিক বা পরবর্তী-বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল এর পরে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে পড়ে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর যে শাখা ভারতে আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, বা তারও কিছু পূর্বে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ পৌঁছেছিল তারা ইরানের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছিল। সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পূর্বে তারা কিছুকাল ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল। গবেষকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ থেকেই বহু ক্ষুদ্র উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে। এ ছাড়া, অন্য একদল ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী খাইবার গিরিপথ ধরে কাবুল উপত্যকায় উপস্থিত হয়। অন্য আর একটি দলও কিছুকাল পরে হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে বালখ্ এলাকায় প্রবেশ করে। বৈদিক আর্যরা এর যে-কোন একটির বা সম্মিলিত শাখার উত্তরসূরি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদে যে সমাজের বিবরণ পাওয়া যা তা মূলত যাযাবর পশুচারণ-ভিত্তিক জীবনের ছবি। ইন্দো-ইউরোপীয়দের বিচরণশীলতার চিত্রটি উপরের আলোচনাতেও প্রমাণিত।

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ঘোড়ার ব্যবহার জানত এবং সম্ভবত, সর্বপ্রথম বন্য ঘোড়াকে পালনের আওতায় নিয়ে আসে। এ প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়েছিল পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় এবং এর সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের কিছু পূর্বে। এই কারণে এবং ভাষাগত দিক থেকে বিচার করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি সম্পর্কে গবেষকরা নানা তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করেছেন। গবেষকদের মতানুযায়ী ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসভূমি হাঙ্গেরীর নিচু সমতল ভূমিতেই হোক অথবা পূর্বতন সেভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণাংশের তৃণভূমি অঞ্চলেই হোক, পশুচারণই ছিল এদের প্রধান জীবিকা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পরও তা বর্তমান ছিল। এঁরা যাযাবর এবং গোষ্ঠীবন্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ইরানীয় পার্বত্য অঞ্চল ধরে পূর্বে অগ্রসর হয়ে একসময়ে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তাঁরা আফগানিস্তানে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে কিছুকাল বসতি স্থাপন করেন। ঋগ্বেদ-এর বর্ণনায় এই চিত্রটি পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ-এ যে ভৌগোলিক বিবরণ রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই আর্যভাষা ব্যবহারকারী যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠীগুলি ক্রমু অর্থাৎ আধুনিক কুররম, কুভা অর্থাৎ আধুনিক কাবুল, রসা ও অনিতভা নামক সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকের উপনদী এবং মেহৎনু নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থান করেছিল। এই নদীগুলি প্রধানত আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এর পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যগণ আরও পূর্বাভিমুখী হয়েছিলেন তার প্রমাণ *ঋগ্বেদ*-এ মেলে। *ঋগ্বেদ*-এর অন্তর্গত সবথেকে পরবর্তীকালের রচনা দশম মণ্ডলের নদীসূক্তে যে নদীগুলির বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে আর্যদের এই ক্রমশ পূর্বে অগ্রসর হওয়ার চিত্রটি ফুটে ওঠে। পাঞ্জাবের পঞ্চনদের মধ্যে শতদ্রু বা সাটলেজ, পরুষ্মী বা ইরাবতী অর্থাৎ রাভী, অসিক্লী অর্থাৎ চন্দ্রভাগা বা চেনাব, আর্জিকিয়া বা বিপাশা ও সুষোমা বা সিন্ধুর কথাও বলা হয়েছে। বিতস্তা বা ঝিলমেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং একই সঙ্গে গঙ্গা ও যমুনার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ দশম মণ্ডলের রচনাকালে পঞ্চনদ অঞ্চল থেকে বৈদিক আর্যরা গঙ্গার নিকট অবধি অগ্রসর হয়েছিলেন বা গঙ্গার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

তবে আফগানিস্তানের নদীর উপত্যকা থেকে প্রথমে বৈদিক আর্যরা সিন্ধু অঞ্চল ও পূর্বে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ ও সরস্বতীর পূর্বতন অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে তাঁরা আরো পূর্বে অগ্রসর হয়ে যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গে পরিচিত হন। এই পঞ্চনদ ও সরস্বতী অববাহিকা অঞ্চলে বসতিকালেই স্থায়ী বসবাস ও কৃষির সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। *ঋগ্বেদ*-এ সপ্তসিন্ধুর অর্থাৎ সিন্ধু, সরস্বতী ও পাঞ্জাবের পঞ্চনদ অঞ্চলকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রথম বৈদিক আর্যগণ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেন ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক জীবন বিকশিত হয়। যে সময়ে তাঁরা এই পাঞ্জাব ও নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে এলেন সে সময় সেই স্থানে প্রাক্-বৈদিক হরপ্পীয়দের উত্তরসূরি কিছু সংস্কৃতির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এ ছাড়া, অন্যান্য তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতিরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এই স্থানে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। বৈদিক আর্যরা এই সংস্কৃতিগুলির সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথমত, মহেঞ্জোদারোয় হরপ্পীয় সংস্কৃতির অন্তিম পর্বে আর্যদের আগমন ঘটে থাকতে পারে, এমন অভিমত কোনও কোনও ঐতিহাসিক পোষণ করেন। এ ছাড়া, সামাজিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য অনার্য সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানরূপে আফগানিস্তানে প্রাপ্ত গান্ধার সমাধি সংস্কৃতি রাজস্থান, হরিয়ানা ও পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশে প্রাপ্ত গৈরিক মৃৎপাত্র ও এর সামান্য পরবর্তী কালের চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতিগুলির উপস্থিতি

ও পরিচিতি বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক এই দুই উপাদানের ভিত্তিতে বলা যায় যে পশ্চিমে সিন্ধুনদ অঞ্চল থেকে পূর্বের শতদ্রুর অববাহিকা অঞ্চল ও উত্তর আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ-রাজস্থানের উত্তরাংশ অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে মানব সমাজে পরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর সূচিত হয়। সামাজিক বিবর্তনের যে প্রাথমিক ধারা হরপ্পীয় সভ্যতার বিকাশে লক্ষণীয় হয়েছিল এই নতুন ধারাটি তার থেকে বহুলাংশে পৃথক হলেও হরপ্পীয় সংস্কৃতির সার্বিক প্রভাবে এই নূতন সভ্যতার বিকাশে উপলব্ধ।

২খ.১.১ গোষ্ঠীবদ্ধতা

মধ্যএশিয়া তথা ইরান থেকে আগত যাযাবর পশুপালক এই আর্যভাষী মানুষেরা গবাদি পশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দীর্ঘ সময় ধরে একস্থান থেকে আরেক স্থানে নিরন্তর যাতায়াত করতেন। এ সময় বৈদিক আর্যদের সামাজিক পরিচয় পশুধন ও পশুধনের যৌথ অধিকারী এক-একটি গোষ্ঠীর দ্বারা নির্মিত ছিল। ধীরে ধীরে সমাজ স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হলে এই গোষ্ঠীগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে উপজাতীয় স্তরে। *ঋগ্বেদ*-এ কয়েকটি উপজাতির প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরু, যদু, দ্রুহ্য, তুর্বশ, অনু, ভরত ইত্যাদি উপজাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্রও পাওয়া যায়। আর্য উপজাতিগুলির মধ্যে কখনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কখনো মৈত্রীবন্ধনের উল্লেখও রয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্রমবিকাশের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর জনজাতিতে পরিণত হয়। রোমিলা থাপার মনে করেন যে এই ধরনের সামাজিক প্রসারের একটি নিদর্শন পাঞ্চাল উপজাতি যা সম্ভবত পাঁচটি গোষ্ঠী-সংবদ্ধ একটি উপজাতীয় সংগঠন।

বৈদিক সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল সবথেকে ক্ষুদ্র সামাজিক একক, পরিবার। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে পরিবারের অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। এই পরিবারের অভিভাবক ছিলেন পিতা বা কর্তা। এক-একটি পরিবারের আয়তন ছিল বৃহৎ কারণ দুই-তিন পুরুষ ধরে পরিবারের সদস্যরা যৌথভাবে একই সাথে বসবাস করতেন। এই পরিবারের উদ্ভব কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কৃষির সূচনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এইরূপ একই বৃহদায়তন যৌথ পরিবারের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে গঠিত হয়েছিল এক-একটি কুল। এই কুলের শীর্ষে অধিষ্ঠিত ছিলেন কুলপতি। পরিবারের অভিভাবকরূপে গৃহপতি বা পিতা, সন্তান ও স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করতেন। সন্তানের সঙ্গে পিতার সুমধুর সম্পর্কের কথা *ঋগ্বেদ*-এ জানা যায়। তবে এও দেখা যায় যে পিতা একশোটি ভেড়া মারার অপরাধে পুত্রকে অন্ধ করে দিয়েছেন। *ঋগ্বেদ*-এ রচনার গোড়ার দিকে পরিবার ও কুলগুলি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্মিলিত ছিল এবং গোষ্ঠীগুলি কৌম সংগঠনে রূপায়িত ছিল।

ঋগ্বেদ-এ সাধারণ জীবনের বর্ণময় চিত্র পাওয়া যায়। এই রচনাতে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত। একদিকে যেমন এতে নিসর্গ সম্ভবন্ধে সূক্ষ্ম বোধ লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে, দৈনন্দিন জীবনের ছবিতে জুয়াড়ির খেদ ও আত্মগ্লানি, যুদ্ধজয়ের আনন্দ, গাভীচুরির বর্ণনা, নববধূর প্রতি আশীর্বাদ ইত্যাদির উল্লেখ থেকে সজীব সমাজের চরিত্র অনুধাবন করা যায়। উপমাগুলি থেকে যে সমাজের কথা জানা যায় তা কঠোর নীতিনিষ্ঠ জীবনের থেকেও একটি স্বতঃস্ফূর্ত, সজীব জীবনীমুখী অস্তিত্বের কথাই বলে।

ঋগ্বৈদিক যুগের গোড়ায় ভারতে সদ্য আগত বৈদিক আর্যদের অন্যান্য গোষ্ঠী এবং এমনকী আর্যদের নিজেদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরন্তর লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এরই সাথে চলেছিল নিরন্তর নূতন স্থানে পরিক্রমা ও ধন

আহরণের প্রচেষ্টা। ধন বলতে বৈদিক আর্যদের প্রধান সম্বল ছিল গবাদি পশু ও ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব জীবনের অঙ্গ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাগার্য কৃষিচারী উপজাতিগুলির প্রভাবে বৈদিক আর্যরা ক্রমশ পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর পর ক্রমশ কৃষি, অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত অর্থনীতি, শ্রেণী ও বর্ণ বিভেদের পটভূমি রচনা করেছিল। পশুপালন অর্থনীতিতে ‘ধন’-এর ধারণা কৃষি-অর্থনীতিতে ‘সম্পদ’-এ পরিণত হয় ও সম্পদকে কেন্দ্র করে পরিবার কুল তথা গোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকার গুরুত্ব লাভ করে। প্রথমে উপজাতিগুলি গণতান্ত্রিক সমবায়িক হলেও ঋগ্বেদের যুগেই ক্রমশ সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল, ‘বিশ’ বা সাধারণ মানুষ ও ‘রাজন্য’বর্গের মধ্যে। ধনী ও নির্ধন, সমাজে ক্ষতাশীল ও সাধারণের মধ্যে বিভেদ—শুধু সম্পদ নয়, জাতি ও পরিস্থিতিগত দিক থেকেও ঘটেছিল। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত হয়েছে ‘দাস’-এর কথা। কোন কোন বর্ণনায় দাসদের কৃষ্ম-গাত্রবর্ণের বর্ণনা রয়েছে[১২] যা থেকে দাসদের কিছু অংশ অনার্য উপজাতির মানুষ বলে মনে করা যেতে পারে। যুদ্ধে বিজিত বা পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে আর্য অথবা অনার্য মানুষও দাসে পরিণত হয়ে থাকতে পারেন। অন্যদিকে অবশ্য দাসগণ ‘পুর’ বা শহরের অধিবাসী এবং ধনশালী বলেও বর্ণিত। লুডভিগ, জিমার ও মেয়ার এর মতে *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত দাস বলতে অনার্য শত্রুদের কথা বলা হয়েছে। হিলেব্রান্ড্ট্ এর মতে ‘দস্যু’ বা ‘আসুর’ বলতেও ঋগ্বেদে অনার্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই অনার্যদের প্রতি বৈদিক আর্যদের ঘৃণার মনোভাবটি বারবার ব্যক্ত হয়েছে। এই আচরণকে সমর্থন করার জন্য স্বভাবতই দৈবী স্বীকৃতি প্রমাণ করার প্রয়াস রয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে—ইন্দ্রই দাসদের সমাজে নিচু স্থান দিয়েছেন।

২খ.১.২ সমাজে শ্রেণীবিভাজন

আর্য ও অনার্য উপজাতির মধ্যে বিভেদ ছাড়াও ধনী-নির্ধনের বিভেদের কথা আরো জানা যায় দারিদ্র্যের বর্ণনায়। দারিদ্র্য নিবারণ করবার জন্য ভক্ত দেবতার দ্বারস্থ হচ্ছে এমনও দেখা যায়। বামদেব অভাবে পড়ে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছিলেন। গরিব ছুতোর পরিশ্রমে ও ক্লান্তিতে হাই তুলছে এ বর্ণনাও পাওয়া যায়। জুয়াড়ি সর্বস্বান্ত হয়ে অনুতাপ করছে তাও জানা যায়। চুরির নজিরও বহু পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এ। সুতরাং অভাব ও অভাবজনিত অপরাধ দুইই বর্তমান ছিল। অন্যদিকে ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞাদিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই স্বচ্ছল ছিল বলে জানা যায়। ধনী ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীপতির বর্ণনাও রয়েছে। এমনকী ধনার্থী বণিকের কথাও বলা হয়েছে যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ধনলাভের জন্য সমুদ্রে গমন করবেন বলে সমুদ্রকে স্তুতি করেন বলে জানা যায়।

একদিকে এই শ্রেণীবিভাজন ঘটেছিল, অন্যদিকে *ঋগ্বেদ*-এরই পুরুষ সূক্তে বর্ণভেদের প্রথম স্পষ্ট বিন্যাস দেখা যায়। এই সূক্তে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা পুরুষ অথবা ব্রহ্মের মুখ থেকে, রাজন্য বাহু থেকে, বৈশ্য উরু থেকে এবং শূদ্র পা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের রচনাকাল পরবর্তী সময়ের বলে ধরা হয়। তাই এই বর্ণনায়. যে পরিচ্ছন্ন বর্ণ-বিভাজনের ইঙ্গিত রয়েছে তা *ঋগ্বেদ*-এর গোড়ার যুগে ততটা প্রকট ছিল না বলে মনে করা হয়।

ঋগ্বেদ-এ দেখা যাচ্ছে এক কবির পিতা, উপার্জনক্ষম, অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাঁর মাতা ধান পেষাই করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্ভবত গোড়ায় জীবিকা বর্ণভিত্তিক এবং বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠেনি, তবে ‘দাস’-

এর উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ বারংবার এসেছে এবং সম্ভবত গাত্রবর্ণের জন্য বর্ণবিভেদের প্রথম সূচনা, বিশেষত প্রথম তিনটি বর্ণের বিন্যাস হয়েছিল। রোমিলা থাপারের মতে বর্ণ-বিভাজন বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট একটি তাত্ত্বিক কাঠামো—সে যুগে প্রচলিত সমস্ত জীবিকাকেই এক আকৃতির মধ্যে সাজাতে চেয়েছিলেন। এরই মধ্যে যে যে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার উদ্ভব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সেগুলিও মিশ্র-বর্ণরূপে সাজিয়ে পরিবেশিত হল।

এই বিভাজন ধীরে ধীরে ঘটে এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে শ্রেণীবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্য দুইই পরিণতি লাভ করে। দরিদ্র শ্রেণী, অনার্য এবং মিশ্র জাতির মানুষেরা চতুর্থ বর্ণভুক্ত হন। এই শূদ্রদের সঙ্গে সম্ভবত ঋগ্বেদের বর্ণিত 'দাস'-এরাও যুক্ত হন।

২খ.১.৩ বিবাহ ঃ একটি প্রতিষ্ঠান ও নারীর ভূমিকা

পরিবার ও কুলের সংগঠনকে দৃঢ় করতে বিবাহের প্রতিষ্ঠানটি বৈদিক সমাজে গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিবাহের উপযোগিতা সম্পর্কে যথেষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তবে অবিবাহিতা নারীর উল্লেখও পাওয়া যা যাঁদের 'অমার্জ' ও 'জরযন্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিবাহিত দম্পতি গৃহের কর্তৃত্ব ভোগ করে নিতেন। নারী-পুরুষের বৈবাহিক চুক্তির আভাস সীতা-সাবিত্রী উপাখ্যানে পাওয়া যায়—যিনি সোমকে কতকগুলি চুক্তির পরিবর্তে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন। উর্বশীও পুরুরাজার সাথে চুক্তিবন্ধ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহে কন্যাপণের কথা পাওয়া যায়, যেমন উষার ক্ষেত্রে। অন্যদিকে উপমায় দেখা যায়—ইন্দ্র আর অগ্নি ভক্তকে ধন দেন। আবাঞ্ছিত জামাতা, প্রচুর ধন দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের প্রীতিভাজন হতে সচেষ্ট হয়। নারীহরণের উল্লেখও পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এ।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বা শিশু-বিবাহের কথা *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায় না। নারীর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তবেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেন এবং কন্যা ও বরের পারস্পরিক গুণাগুণ বিবাহের ক্ষেত্রে বিচার্য ছিল। নারী নিজেই জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে বিবাহ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে অনুমেয় যে বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরের ঈপ্সিত প্রীতিপূর্ণ সংযোগ ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। নারী-পুরুষের বিবাহ কাম্য ছিল, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল না। ঋগ্বেদের যুগে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের প্রচলিত ধারা এবং অবিবাহিত থাকার রীতি নারীর শিক্ষার সুযোগের ইঙ্গিত বহন করে। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা ইত্যাদি ঋষিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা জ্ঞানে ঋষিপদ অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববারা শুধু শ্লোক রচনাই করেননি—ঋত্বিকরূপে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার অধিকারীও ছিলেন। শিক্ষিতা নারীর মধ্যে প্রকারভেদ ছিল। ছাত্রীরা দু-প্রকারের ছিলেন ঃ ব্রহ্মবাদিনী নারীরা শাস্ত্র ও দর্শন চর্চায় রত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শ্লোক রচনা করেছেন। ব্রহ্মবাদিনীদের অনেকেই শাস্ত্র অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং ঋগ্বেদে আচার্যা'র উল্লেখও রয়েছে। অন্যদিকে ছিলেন সদ্যোদ্বাহ নারী যাঁরা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যয়নে রত থাকতেন। এ যুগের নারী জনসভায় অংশগ্রহণ করতেন। বিশেষ করে 'বিদথ' নামক সভায় পরিবারের প্রাপ্য রসদের অংশটুকু তিনি সংগ্রহ করতেন। এ ছাড়াও, ঋগ্বেদের নারীকে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বীরনারী বিস্পলা যুদ্ধে তাঁর পা হারিয়েছিলেন। মুদ্‌গলানী ইন্দ্রের তীরের ন্যায় তীব্র গতিতে রথ চালনা করে যুদ্ধে জয় ও ধন আহরণ করেন।

বিবাহিতা নারী গৃহে সম্মানিত ছিলেন। বিবাহিতা স্ত্রী কল্যাণী ও পবিত্র 'শিবতমা'। তিনি গৃহের সম্রাজ্ঞী। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর সতী হওয়ার কোন নির্দেশ বৈদিক সাহিত্যে নেই। বিধবা নারীর কুল বা জ্ঞাতির মধ্যেই

পুনর্বিবাহ হওয়ার রীতি ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে দেখা যাচ্ছে বিধবা নারী যখন মৃত স্বামীর পাশে শুয়ে আছেন তখন দেবর এসে তাঁকে আহ্বান করবেন মৃতলোক থেকে জীবলোকে। সুতরাং সহমরণ এমনকী কঠোর বৈধব্যযাপন কোনটাই ঋগ্বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী কালে অথর্ববেদ-এর জীবিত নারীকে মৃতের বধূ হতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং একটি নারী পতিলোকে যাচ্ছে প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে—একথাও বলা হয়েছে। সুতরাং বৈদিক সমাজে নয় সম্ভভবত তারও পূর্বে বর্তমান কোন সমাজের এই রীতি ছিল, বৈদিক সাহিত্যে তারই ছবি রয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও বিধবা নারীর জীবিতাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। *অথর্ববেদ*-য়েই রয়েছে নারীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা। আবার এ কথাও রয়েছে যে, কোন নারীর দশটি পতি থাকলেও ব্রাহ্মণ-পতিই অগ্রাধিকার পাবেন কারণ সে ক্ষেত্রে রাজন্য বা বৈশ্য পতিদের কোন অধিকার থাকে না। এ থেকে নারীর বহুবিবাহ ও সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারের কথা জানা যায়। পুরুষের বহুবিবাহের কথাও বৈদিক সাহিত্যে গোড়া থেকেই পাওয়া যায়। নারীর সপত্নী-যন্ত্রণার কথাও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা-তে কোন নারীকে প্রার্থনা করতে দেখা যায় তিনি যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা হন। তবে নারীর বহুবিবাহ সম্ভবত ক্রমশ সমাজে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। সে সম্ভাবনা *অথর্ববেদ*-য়েই দেখা যায়—যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন সামাজিক এবং শাস্ত্রীয় মতে পঞ্চৌদন অজ দান করলে তাতে কোন অন্যায় হয় না। এই দানের গ্রহীতা স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ এবং ধীরে ধীরে সমাজে নারীর বহুবিবাহ নিয়ম-বহির্ভূত দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা হয়েছে *অথর্ববেদ*-এ।

২খ.১.৪ সমাজে নারীর স্থান ও তার অবনমন

ঋগ্বেদ-এ নারী সমাজে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের নারী সে স্থান থেকে বিচ্যুত। সুকুমারী ভট্টাচার্য পরবর্তী বৈদিক সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন যা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই সামাজিক জটিলতার শিকার হলেন নারী ও শূদ্র বর্ণের মানুষেরা। সম্পদের উপর অধিকার জ্ঞাপনের একটি মাধ্যম হল শ্রমিকের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাই বর্ণ-ব্যবস্থা প্রকট হয়েছে। শ্রমজীবি বৈশ্য ও বিশেষত শূদ্রের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন বৃদ্ধি পেলে পারিবারিক পরিধি ক্রমশ সুসংগঠিত হতে থাকল। প্রজননের মাধ্যমরূপে নারীর ভূমিকা চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন নারীকে পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার প্রয়াস বৃদ্ধি পেল। এ ছাড়া কৃষির প্রসারে বলদ ও লাঙলের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় শারীরিক কারণে নারী কৃষি উৎপাদন থেকেও অপসারিত হলেন। বস্ত্রবয়ন ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনেও নারীর ভূমিকা ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী বৈদিক যুগে বহু অনার্য নারী আর্য-পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আর্য সমাজে প্রবেশ করলেন। কিন্তু এই নারীদের আর্য সমাজে যথার্থ স্বীকৃতি ছিল না। এর জন্য সামগ্রিকভাবে সমস্ত নারীর অবমূল্যায়ন ঘটে গেল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর গতিবিধি, বৈবাহিক ও ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল পরিবার ও প্রজননের স্বার্থে। নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ হল *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য়। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহের প্রথাটি বজায় থাকল। *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-এ মনুর দশটি ও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে। রাজার বহুপত্নীত্বের কথাও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এবং এঁদের নানা নামে অভিহিত

করা হয়েছে, যথা—মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তি ইত্যাদি। নারী এযুগে কুলনারীতে রূপান্তরিত এবং গৃহের বাইরে তাঁর ভূমিকা নগণ্য হয়ে পড়েছিল। বেদ অধ্যয়নের অধিকার তিনি হারিয়েছেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী ও শাশ্বতীর মতো বিদুষী নারীর কথা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গেলেও তা ব্যতিক্রম মাত্র। শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর বক্তব্য যে তাঁরা নারী হয়েও পুরুষ। এই মন্তব্যে নারীর যথার্থ ভূমিকা সম্বন্ধে বৈদিক সমাজের মনোভাব সুস্পষ্ট। কন্যাসন্তান যে জন্মকাল থেকেই পুত্রসন্তানের থেকে আকৃষ্ট বলে গণ্য তা *ঋগ্বেদ*-এও লক্ষ্য করা যায়। *অথর্ববেদ*-এ এই মনোভাব আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। নানা যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে এই সংহিতায় যার মাধ্যমে কন্যাসন্তানের পরিবর্তে পুত্রের জন্ম হবে বলে মনে করা হয়েছে। অবশ্য *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ একটি যজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে যা অনুষ্ঠিত হত বিদুষী কন্যাসন্তানের কামনা করে। কিন্তু এটি সামগ্রিক চিত্র নয়। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ কন্যাকে অভিশাপ বলে মনে করা হয়েছে। সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে মাটিতে ফেলে রেখে পুত্রকে কোলে তুলে নেওয়ার রীতির বিবরণ পাওয়া যাবে *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য়। এই চিত্রই নারীর প্রতি পরবর্তী বৈদিকে সমাজের মনোভাব সঠিক নির্দেশ করে। এ যুগে নারীকে পুরুষের ভোগ্যরূপেই দেখা হয়েছে। নারীকে বলপূর্বক দমন করার নির্দেশ রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণ ও *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ। সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠা নারীও অধমতম পুরুষের থেকে হীন বলে গণ্য ছিলেন।

২খ.২ বর্ণবৈষম্য

এই বৈষম্য-বৃদ্ধির প্রতিফলনস্বরূপ দেখা যায় যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে শূদ্রকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সৃষ্ট নিয়মাবলী; শূদ্র অপরের দ্বারা পীড়িত হওয়াই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। শূদ্রকে সহজেই জমি থেকে উৎখাত করা যায় এবং শূদ্রকে হত্যাও খুব ভয়ংকর অপরাধরূপে গণ্য হত না। যাগযজ্ঞাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলে বর্ণবৈষম্যও বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি সমাজে শ্রেণী-বৈষম্যের পটভূমি রচনা করে।

যজুর্বেদ-এ বর্ণ-বিভেদের পূর্ণ রূপ বিকশিত। এছাড়া অনার্য-উপজাতিগুলির সঙ্গে বৈদিক আর্যদের বৈবাহিক সংমিশ্রণ বৃদ্ধির ফলে প্রধান চারটি বর্ণ ছাড়াও নূতন বর্ণের সৃষ্টি হয়। নতুন নতুন কর্মভিত্তিক শ্রেণীগুলিও প্রায়শই বর্ণে রূপান্তরিত হয়। *বাজসনেয়ী সংহিতা*-য় কারিগরী শিল্প ও শিল্পীর তালিকাটি থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ রয়েছে যে শিল্পকর্মীদের যাঁরা বর্ণজাতিতে পরিণত হয়েছেন—কৌলাল বা কুমোর, কামার, রজক, চর্মকার, শৈলুষ বা অভিনেতা, গোপালক বা পশুপালক, সূত বা নট, ইত্যাদি। এ থেকে সমাজে বিবিধ জীবিকার রূপটি পাওয়া যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণবৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে বৈশ্য ও বিশেষত শূদ্র বর্ণের মানুষের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের পারস্পরিক তারতম্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সমাজের শীর্ষে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যুগপৎ অধিষ্ঠানে যে আরো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে, "ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি সমস্ত মানব সমাজের প্রভু, তিনি সর্বসাধারণকে ভোগ করবেন এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করবেন। সুতরাং বিশ্ অথবা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের

মানুষরা রাজন্যের আনন্দবর্ধন করবেন এ কথা ধরেই নেওয়া হয়েছে। *অথর্ববেদ*-য়েও দেখা যায়—রাজা "বিশমত্তা", অর্থাৎ প্রজাগণকে তিনি ভক্ষণ করতে সক্ষম। বিশে'র অন্তর্গত বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ একদিকে এবং রাজন্যবর্গ আরেকদিকে সমাজকে দ্বিস্তরে বিভক্ত করে। ব্রাহ্মণরা এই স্তরীভূত সমাজের আধ্যাত্মিক পরিচালনার ভারই শুধু নেননি, রাজন্যবর্গের ক্ষমতা প্রসারে তত্ত্বের উপস্থাপনা করে রাজনৈতিক গুরুত্বও লাভ করেছিলেন। পরবর্তী বৈদিক যুগের জীবনে পূজা, যাগযজ্ঞের গুরুত্ব ও বাহুল্য বেড়েছিল। এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বর্ণের সাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া এ সময়ে রাষ্ট্র ও রাজশক্তির উত্থান এক স্তরীভূত সমাজের সৃষ্টি করে যেখানে, একদিকে ক্ষমতাশীল রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত এবং অপরদিকে বিশ্ বা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মধ্যের দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২খ.৩ খাদ্যাভ্যাস

সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাসের চিত্রও বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান। সব্জী, ফল, দুগ্ধ, যবচূর্ণের পিণ্ড, দুগ্ধজাত ঘি বা দধি এবং মাংস ঋগ্বেদের যুগেও আর্যদের খাদ্যতালিকার অন্তর্গত ছিল। এছাড়া সোমরস অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হত। সাধারণত উৎসবেই সোমরস পান করা হত এবং সুরা জাতীয় পানীয়র নিত্য সেবনও প্রচলিত ছিল। দৈনন্দিন জীবনে প্রমোদের অনুষঙ্গ ছিল পাশা খেলা, জুয়া খেলা, রথচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি। নৃত্যগীতাদিও অনুষ্ঠিত হত। অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে সভাগৃহের উল্লেখ করা হয়েছে বারবার। ঋগ্বেদের যুগে নারী-পুরুষের বেশভূষারও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁরা নিম্নাঙ্গে নীবি ও ঊর্ধ্বাঙ্গে বাস পরিধান করতেন। এর উপর অনেকে ঊর্ধ্বাঙ্গে অধিবাসও পরতেন। পোশাকের ক্ষেত্রে বহুলাংশে পশমের ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। তবে *ঋগ্বেদ*-এ কৌষেয় (রেশম) বস্ত্রের কথাও বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষির প্রসারের ফলে খাদ্যের তালিকা দীর্ঘ হয়। গোধূম ও ধান্য নতুন শস্যরূপে সংযোজিত হল। ফল ও সব্জীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যেরও বৃদ্ধি হয়। মাংসভক্ষণ প্রচলিত ছিল, তবে গোমাংস ভক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নির্দেশ দেখা যায়। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও বাজসনেয়ী সংহিতা*-য় দেখা যায় গোহননকারী বা গোঘাতককে গোহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। গোভক্ষণ নিন্দিত হয়েছে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ এবং গাভীকে 'অঘ্না' অর্থাৎ অবধ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে গোভক্ষণ পরবর্তী বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল ও সোমযাগে বন্ধ্যা গাভী বলি দেওয়ার রীতি ছিল।

২খ.৪ বৈদিক যুগের অর্থনীতি

ঋগ্বেদ-এর বিবরণ থেকে অর্থনৈতিক জীবন ও বৃত্তির যে কথা জানা যায় তা প্রধানত পশুপালন-নির্ভর। ঋগ্বৈদিক আর্যদের যাযাবর জীবনযাপন ও কৌমগোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যে দেখা যায় এই গোষ্ঠীগুলির স্বীকৃত সম্পদ ছিল পালিত পশু, অর্থাৎ প্রধানত অশ্ব, গাভী ও বলদ ইত্যাদি। *ঋগ্বেদ*-এ দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত প্রায় অধিকাংশ প্রার্থনায় দেবতাদের কাছে এই পশুধন কামনা করা হয়েছে। গোমাতাকে সুরভীরূপে কল্পনা পশুপালন অর্থনীতিরই পরিচায়ক।

পশুচারণ ও পশুনির্ভর অর্থনীতির গুরুত্ব *ঋগ্বেদ*-এর শ্লোকে ফুটে ওঠে—"হে সোম! তুমি সুবর্ণ ও ধন,

জন বিতরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব আনয়ন কর"। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে গোমাতাকে খাদ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গোমাতাকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পরবর্তীকালে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ। গোসম্পদের গুরুত্ব গোষ্ঠী সংগঠনের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। ঋগ্বৈদিক যুগের জীবনযাত্রায় গোসম্পদই মূলধন যা আহরণ করার জন্য লুণ্ঠন ও যুদ্ধ প্রত্যহ জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়েছিল।

যা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় ও জীবনধারণের আধার তাকেই ঋগ্বৈদিক আর্যগণ তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের কেন্দ্রবস্তুতে রূপান্তরিত করতেন। পশুসম্পদ বৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বৈদিক আর্যরা প্রথমে পূষণ ও পরে রুদ্রকে গোসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দেবতারূপে কল্পনা করেছেন। পুষা বা পূষন্, আদিত্য অথবা সূর্যেরই আদি রূপকল্প; পূষণকে 'অঘৃণি' অর্থাৎ 'জ্বলন্ত' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন দুর্গভূমিতে পথভ্রষ্ট গোসম্পদের পুনরুদ্ধার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুরূহ কাজে পূষণ্ অর্থাৎ সূর্যের কিরণ পথ আলোকিত করবে। *ঋগ্বেদ*-এর ষষ্ঠ মণ্ডলে পূষণ্-দেবতাকে হারানো গোসম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্যে আবাহন করা হয়েছে। এমনকী, একশ্রেণীর বিশেষ গোপালকের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে যাঁরা পশু পুনরুদ্ধার করার কাজে পারদর্শী ছিলেন। পশুচারণের জন্য বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন ছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে পূষণের কল্পনা প্রাক্‌বৈদিক পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি রথের পরিবর্তে ছাগবাহন, তাঁর চুল বেণীবদ্ধ, 'করম্ভ' অর্থাৎ যবচূর্ণমিশ্র তাঁর খাদ্য। এতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পথে আর্যরা খুব সম্ভবত মোঙ্গোলিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন এসেছিলেন। সেই সময় মোঙ্গোলিয় আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যভ্যাসযুক্ত বিশিষ্ট কোনো দেবতার কল্পনা তাঁরা পথে সংগ্রহ করেছিলেন। "....কালক্রমে তিনি পথিক মানুষ ও বিচরণশীল পশুর পথপ্রদর্শক দেবতার ভূমিকাও গ্রহণ করেন...."।

গোধন ছাড়া অন্য যে পশুটি বৈদিক আর্যদের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা হল অশ্ব। ভারতীয় উপমহাদেশে অশ্বের প্রচলন সম্ভবত বৈদিক আর্যরাই প্রথম করেছিলেন। ঘোড়ার ব্যবহার বৈদিক সভ্যতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন বলশালী এই পশুটি তার ব্যবহারকারী মানুষকে দিয়েছিল গতি ও শক্তি যা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা দুই ক্ষেত্রেই বিপুল সহায়তা করেছে। এ ছাড়া, গোচারণ বা গো-আহরণের কাজেও ঘোড়ার ব্যবহার সুবিধা দিয়েছিল। বৈদিক সভ্যতায় অশ্বের গুরুত্ব আর্যদের অনুষ্ঠিত নানা যাগযজ্ঞে ও মন্ত্রপাঠে প্রতিফলিত হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈদিক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। রাজনৈতিক বিজয়লাভের প্রতীকী ঘোষণার জন্য এই যজ্ঞে রাজপ্রতিভূরূপে অশ্বের ব্যবহার এই কথাই নির্দেশ করে, অশ্বকে পশুদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বলে মনে করা হয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এর সফল ব্যবহার আর্যদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। অশ্বের উপস্থিতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে অস্থি পাওয়া গেছে ইরান ও আফগানিস্তানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশে ও বেলুচিস্তানের পিরাকে এবং গান্ধার সমাধি সংস্কৃতিতে পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকায় এবং গুজরাটের সুরকোটাডাতে অস্থি ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গেছে যা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের কিছু পরে প্রাপ্ত। হরপ্পীয় সভ্যতার পরবর্তী স্তরেও অশ্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, রূপার ও লোথালে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অশ্বের নিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বৈদিক সাহিত্যে গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যায় এবং চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র-সংস্কৃতির প্রত্নক্ষেত্র হস্তিনাপুর, অত্রঞ্জিখেড়া, ভগবানপুরা ইত্যাদি স্থানে অশ্বের উপস্থিতি বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সংস্কৃতির সম্পর্কের সম্ভাবনা তুলে ধরে।

গাভী ও অশ্ব ছাড়া অন্যান্য যে সব পালিত পসুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে তা হল, অজা অর্থাৎ ছাগল, অবি বা ভেড়া, অশ্বেতর বা গাধা ইত্যাদি। হরপ্পীয় পশুপালন অর্থনীতিতেও গাভী ও এই পশুদের বহুল ব্যবহার ছিল। পূর্বের অর্থনীতিতে গোসম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে গোভক্ষণ অশুদ্ধ ছিল না। বরং *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-র একটি অংশে এই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে যে বৈশ্যদের মতোই গবাদি পশুও প্রজাপতির দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের ভক্ষণ করা স্বাভাবিক, কারণ খাদ্য হিসাবে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যই তাদের প্রজাপতি সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই তারা সংখ্যায় এত গরিষ্ঠ। এই সংহিতারই অপর অংশে দেখা যাচ্ছে যে নবচন্দ্রিকার দিনে মিত্র এবং বরুণের আবাহনে গাভী বলি দেওয়া হচ্ছে। সোমযজ্ঞেও মিত্র ও বরুণের পূজায় বন্ধ্যা গাভী বলি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী বৈদিক জীবনযাত্রায় গোভক্ষণ একটি প্রাত্যহিক ও স্বাভাবিক রীতি ছিল। কিন্তু অর্থনীতির বিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষির বিকাশের সঙ্গে গবাদিপশু খাদ্য ছাড়াও কৃষিকর্মে বিকল্প ব্যবহার হতে শুরু হল। শুধু তাই নয়—বিকল্প খাদ্যও এই কৃষিই মানুষের জীবনে এনে দিল। ফলে ধীরে ধীরে গোভক্ষণ একটি বিরুদ্ধচারণে পরিণত হল, গোধন অবধ্য বলে নির্দেশিত হয়। গোধন বর্ণিত হয় অঘ্না বলে; যদিও গোভক্ষণের রীতিটি সম্ভবত তখনো চালু ছিল।

২খ.৪.১ কৃষির প্রসার

কৃষির সূচনায় ইঙ্গিত *ঋগ্বেদ*-য়েই পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত নদী ও তার অববাহিকা থেকে খোদিত প্রণালীকে গাভীমাতা ও গোবৎসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণদাত্রী নদী ও তার প্রণালী কৃষিক্ষেত্রের নিকটে প্রবাহিত হয়ে ক্ষেত্রে জল প্রদান করে। কর্ষিত জমিকে ক্ষেত্র বলা হয়েছে। স্থান-বিশেষে জমির স্তরভাগ করা হয়েছে, যথা উর্বরা ও অর্তন। ফসল প্রধানত দু'বার ফলানো হত সারা বৎসরে। সাধারণত যব ও ধান্য এই দুই শস্যের কথা *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায়। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণে গোধূম, প্রিয়ঙ্গু, মুদ্গ, মাষ, মসুর ইত্যাদি শস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যে অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা সামগ্রিকভাবে একটি জনজাতির ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিবর্তন ধাপে ধাপে সাধিত। *ঋগ্বেদ*-এ যে কৃষি, যব শস্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা পরবর্তীকালে বহুলাকার ধারণ করেছে। মনে রাখতে হবে যে বৈদিক আর্যদের মধ্যে কৃষির বিকাশে ঋগ্বৈদিক যুগের সমসাময়িক, পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি ও অন্যান্য তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিগুলির ভূমিকা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে উত্তর ভারতের রাজস্থানে গৈরিক বর্ণ-মৃৎপাত্র ব্যবহারকারী সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাম্রভাণ্ডারগুলির চিহ্নও স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে ঋগ্বৈদিক সংস্কৃতি জড়িত বলেও কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। সুতরাং কৃষি-অর্থনীতি বা কারিগরী শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। বৈদিক সভ্যতা দ্বীপের মতো নির্জনে, বিচ্ছিন্ন ধারায় বৃদ্ধি পায়নি। হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী ধারা ও অন্যান্য তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতিগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়া থেকেই পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটের কিছু অঞ্চলে বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে নগরসভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষীণ হয়ে পড়লেও জীবনধারণের প্রধান উপজীবিকাগুলি বজায় ছিল। এই জনগোষ্ঠীগুলি ধান, গম, যব, মসুর, কলাই, তুলা ও তৈলবীজের চাষ করতেন। মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গবাদিপশু ইত্যাদিও পালন করতেন। এদের মধ্যে মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প,

দারুশিল্পও প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত জীবিকা ও বৃত্তিগুলি বৈদিক সমাজেও প্রচলিত হল। তবে হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহার বৈদিক আর্যরা সম্ভবত ভারতে আসার পূর্বেও করেছেন।

ঋগ্বেদ-এ যবের উল্লেখ বারংবার করা হয়েছে। এযুগের প্রধান শস্য ছিল যব। 'ধান্য' শব্দটিও পাওয়া যায়। সম্ভবত এ সময়ে 'ধান্য' শব্দটি সাধারণভাবে খাদ্যশস্য বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে অবশ্য ধান্য ও গোধূম, দুটি পৃথক খাদ্যশস্যের উল্লেখ রয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ 'কৃষি', 'কর্ষক', বা 'কৃষ্টি' শব্দগুলি পাওয়া যায়। কৃষককে বলা হত কৃষ্টি এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজীবি মানুষ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এই শব্দটি সমগ্র জনসমষ্টি সম্পর্কে প্রয়োগ করা হত। শব্দের এই প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে বৈদিক সমাজে প্রধান জীবিকারূপে কৃষির বিকাশ ও সম্প্রসারণের চিত্রটি পরিস্ফুট। ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনের পরে যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে বৈদিক সভ্যতার সর্বপ্রথম উন্মেষ ঘটে, তা নির্ধারণ করা যায় *ঋগ্বেদ*-এ উল্লিখিত নদীগুলির বিবরণ থেকে। ক্রুম বা কুর্‌রম, কুভা বা কাবুল, সিন্ধু, মেইৎনু ইত্যাদি নদীগুলি আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এর সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে গোমতী বা গোমাল, সরস্বতী, বিতস্তা (ঝিলম), বিপাশা (বিয়স), অসিক্নী (চন্দ্রাভাগা বা চেনাব), পরুষ্মী বা ইরাবতী (রাভি) ও শতদ্রু (সাটলেজ) নদীর। এই নদীগুলি পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং বৈদিক আর্যরা যে ধীরে ধীরে ঋগ্বৈদিক যুগেই পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তা প্রমাণিত। কিন্তু গঙ্গা বা যমুনার কথা শুধু একবারই *ঋগ্বেদ*-এর প্রক্ষিপ্ত দশম মণ্ডলে উল্লিখিত। ঋগ্বেদিক আর্যদের জীবনযাত্রা সম্ভভবত পাকিস্তানের সিন্ধু নদী ও তার অন্যান্য উল্লিখিত উপনদীগুলির অববাহিকা অঞ্চলে অর্থাৎ আফগানিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ ছিল।

কৃষির দিক থেকে দেখা যায় যে এই নদীমাতৃক অঞ্চল পূর্বের অধ্যুষিত ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্তান অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় ও সুজলা। এরই সঙ্গে এই অঞ্চলে অবস্থিত পরবর্তী হরপ্পীয় ও অন্যান্য তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বৈদিক আর্যরা নতুন নতুন শস্য ও উন্নত কৃষিপদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়। *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম মণ্ডলে আমরা লাঙলের ব্যবহার ও শস্য রোপণের উল্লেখ পাচ্ছি। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চলগুলি প্রধানত যব, খেসারি ও শণ চাষের উপযুক্ত। ঋগ্বেদের গোড়ার দিকে তাই যবের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কিন্তু কৃষিকর্মে গোড়া থেকেই আর্যরা সরাসরি যুক্ত ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যাযাবর পশুচারক এই আদি আর্যদের কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাটা সম্ভবপর নয়। কিন্তু *ঋগ্বেদ*-এর রচনার কাল যদি আমরা খ্রিঃপূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃপূঃ ১২০০ বলে ধরে নিই তবে এই প্রায় তিনশো বছরের শেষের দিকে তাঁদের কৃষিকর্মে প্রবেশ ও অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে তাঁরা প্রাগার্য ও সমকালীন অন্যান্য কৃষিনির্ভর সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে না। *ঋগ্বেদ*-এর একটি শ্লোকে সম্ভবত কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অরণ্য পরিষ্কার করে ভূমিসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে দেবতারা স্বধিতি হস্তে (কুঠার) সঙ্গী পরিবৃত হয়ে কাঠ কাটতে কাটতে অগ্রসর হচ্ছেন। সেই কাঠ অগ্নিতে নিক্ষেপিত হচ্ছে। গ্রিফিথ তাঁর অনুবাদে এই স্তবকে কৃষি সম্প্রসারণের ইঙ্গিত বলে লক্ষ্য করেছেন এবং লুডভ্বিও এই শ্লোকে কৃষির বিকাশ বর্ণিত হচ্ছে বলে মনে করেন এ কথা গ্রিফিথ উল্লেখ করছেন।

২খ.৪.২ পশুপালন

ঋগ্বৈদিক ধর্মে দেবগণের মধ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। এঁরা গবাদি পশুর সংরক্ষণ ও কৃষিকার্যের হিতসাধন করেন বলে বৈদিক আর্যদের বিশ্বাস। অশ্বিনীদ্বয় যব রোপণ করে ও লাঙ্গলে অধিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে প্রশংসিত হয়েছেন। ইন্দ্রেরও আরাধনা হয়েছে কৃষিকাজে মঙ্গলসাধনের জন্য। ইন্দ্রকে লাঙ্গলের সিরার উপর অধিষ্ঠান করার জন্য আবাহন করা হয়েছে। পূষণের প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তিনি লাঙ্গলের সিরাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কৃষিক্ষেত্রকে ব্যক্তিবিশেষরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং সাংবাৎসরিক ভাবে কৃষিক্ষেত্রের জল নিষ্কাশনের রীতিও বর্ণিত হয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলে ষণ্ড-চালিত লাঙ্গলের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণের চিত্রটি পাওয়া যায়। এই লাঙ্গলের ফলা গোড়ার দিক উদুম্বর বা ডুমুর এবং খরিদ বা খয়েরের মতো কঠিন কাষ্ঠনির্মিত। লোহার প্রচলন তখনো হয়নি। লাঙ্গল, সিরা, কর্ষিত রেখা বা সীতা ইত্যাদির পূজা ও ব্যক্তি-কল্পনা *ঋগ্বেদ*-এর বহু অংশে বর্ণিত হয়েছে। সৃণী বা কাস্তে দিয়ে শস্য কাটার কথাও রয়েছে। কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত বহু ধর্মীয় রীতি, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের সূচনা *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায় যা থেকে ক্রমশ কৃষির প্রসারণের ছবি ফুটে ওঠে।

২খ.৪.৩ উৎপাদন-প্রযুক্তি ও শস্যসম্ভভার

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ খদির কাষ্ঠ নির্মিত লাঙ্গালকে অস্থির ন্যায় কঠিন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। লাঙলের সিরাটি একটি দণ্ড বা ঈষার সঙ্গে যুক্ত এবং তার সঙ্গে একটি যূপ সংযুক্ত থাকত যা ষণ্ড-পৃষ্ঠে ন্যস্ত হত। সেই সময় সম্ভবত বহুসংখ্যক ষণ্ডের ব্যবহার হত লাঙল দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণের জন্য। *অথর্ববেদ*-এর বর্ণনায় চার, ছয়, আট, বারো—এমনকী, চব্বিশটি পর্যন্ত ষণ্ড যুত লাঙলের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে যা বাস্তবে সম্ভবপর ছিল না বলেই মনে করা যায়, তবে দুটি বা চারটি ষণ্ডের ব্যবহার হওয়া সম্ভব এবং এই লাঙল নিশ্চয় অত্যন্ত ভারী ও মজবুত ছিল। লাঙল নির্মাণে খরিদ বা উদুম্বর (খয়ের এবং ডুমুর) কাষ্ঠের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে জানা গেলেও পরবর্তীকালে লাঙলের সিরাটি ধাতু নির্মিত ছিল, যাকে পবিরবৎ বা সুতীক্ষ্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-য়েও লাঙলের ফলায় ধাতুর ব্যবহার উল্লিখিত হয়েছে। রামশরণ শর্মা মনে করেন, পরবর্তী বৈদিক যুগে লাঙলের ফলায় লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সারের ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়—‘সকৃৎ’ বা গোময় এবং ‘করীষ’ বা শুষ্ক গোময়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈদিক আর্যদের পূর্ব-অভিমুখী অভিযানের কথা রয়েছে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে বৈদিক আর্যরা এই সময়ে শতদ্রু ও গঙ্গা-বিভাজিত অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও পূর্বে গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিযানের পিছনে কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, গাঙ্গেয় সমভূমি সুজলা ও নদীতীরবর্তী অঞ্চল অত্যন্ত সুফলা। কিন্তু নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলি গভীর শিকড়বিশিষ্ট বৃক্ষ সমৃদ্ধ হওয়ায় চাষের জন্য উপযোগী ছিল না। এই ঘন মৌসুমী অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রয়োজন ছিল লোহার ব্যবহার। পরবর্তী বৈদিক যুগে, অন্ততপক্ষে খ্রিঃপূঃ সপ্তম শতাব্দীর আগে সাধারণ জীবনে ও কৃষিকর্মে লোহার নিত্যপ্রচলন শুরু হয়নি। সুতরাং বিদেঘ মাধব তাঁর পুরোহিত গৌতম রাহুগণের সঙ্গে সরস্বতী নদীর তীর থেকে পূর্ব অভিমুখে যে অগ্রসর হয়েছিলেন সদানীরা নদীর তীর অবধি,

তা সম্ভব হয়েছিল বৃক্ষরাজিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে। বন পুড়িয়ে কৃষির জন্য পরিসর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার রীতিটি রপ্ত হয়েছিল। এই বন কেটে এবং পুড়িয়ে চাষের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তত করা 'ঝুম' চাষের পদ্ধতিটি খুবই প্রাচীন এবং পূর্ব হিমালয়ের প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। সুতরাং *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বৈদিক আর্যদের কৃষি সম্প্রসারণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শস্যতালিকাও দীর্ঘায়িত হল। যব ও তিল এবং সম্ভবত ধানের সঙ্গে যুক্ত হল গোধূম যা পূর্বে উল্লিখিত ছিল না। এ ছাড়া, মাষ কলাই, মুদ্গ, খল্ব ইত্যাদি ডাল জাতীয় শস্য কৃষির আওতায় এল। প্রিয়ঙ্গু নামে একপ্রকার শস্যেরও নাম পাওয়া যায় যা সম্ভবত অত্যন্ত ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট কোন জাতের বাজরা। ইক্ষুর ফলন ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় *অথর্ববেদ*-এ। যব ও ধান্যর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শস্যের চাষ হতে দেখা যায়। গোভিধূক নামে একপ্রকার যবের কথা বলা হচ্ছে যা গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য উত্তম বলে বর্ণিত[৯৩]। উপবক ও ইন্দ্রযব নামে আরও দুই প্রকার যবের উল্লেখ রয়েছে।

ধানের মধ্যেও প্রকারভেদ হল। 'কৃষ্ণব্রীহি' ও 'শুক্লব্রীহি', অর্থাৎ যার বর্ণ কৃষ্ণাভ তা কৃষ্ণব্রীহি এবং বর্ণ শুক্ল হলে শুক্লব্রীহি। 'হয়েন' ধান সম্পূর্ণ এক বছর লাগত পাকতে। 'নিবার' ধান নিচু জলাভূমি অঞ্চলে ভাল ফলত। মহাব্রীহিকে ব্রীহির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা 'সম্রাট' বলা হচ্ছে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন জাতির ডাল, সব্জী ও তৈলবীজের উল্লেখ, প্রকারান্তরে একটি মিশ্র কৃষিব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং দেখা যায় পরবর্তী বৈদিক যুগে বিভিন্ন সময়ের উপযোগী, বিভিন্ন রকম চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতের শস্যের নির্বাচন, বাছাই ও ফলন ঘটেছে। অর্থাৎ একটি সুপরিকল্পিত কৃষিব্যবস্থার বিকাশ ঘটছে। এক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। 'রোধ' অর্থাৎ বাঁধের ব্যবহার সম্ভবত কৃষিক্ষেত্র সিঞ্চনের জন্য নদীর খাতে তৈরি করা হত।

সকল প্রকার কৃত্রিম সেচব্যবস্থাকেই 'খনিত্রী' বলে অভিহিত করা হচ্ছে, যেমন কুয়ো, হ্রদ, নালা ইত্যাদি। হ্রদ বেসান্ত, বেসান্তি বিভিন্ন আয়তনের জলাধার বা জলাশয় যা ক্ষেত্রসিঞ্চনে ব্যবহৃত হত। *অথর্ববেদ*-এ বলা হয়েছে কৃত্রিম নালা বা 'কুল্য'র কথা, যা জলাশয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকত। এই 'কুল্য'গুলি কৃষিক্ষেত্রে জল সঞ্চারের কাজে লাগত। বন ও জলাভূমি সংস্কারের কথা আগেই দেখা গেছে। ধাতু-নির্মিত লাঙলের ব্যবহার ও কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সূচনা এবং একই সঙ্গে বহু উপজাতির শস্যের ফলন কৃষি-অর্থনীতির অগ্রসরকে চিহ্নিত করে।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকারূপে হস্তশিল্পের উল্লেখও ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই পাওয়া যায়। পশম ও কৌষেয় বস্ত্র ও পরে সুতি বস্ত্র বুননের বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে বারবার পাওয়া যায়। মৃৎপাত্র, দারুনির্মিত আসবাব ও পরিবহন, বংশনির্মিত বস্তু, তেল, চর্মজাত দ্রব্য, সুরা ও ধাতব যন্ত্রপাতি এবং হাতিয়ারের উল্লেখ বৈদিক সমাজে ক্রমবর্ধমান হস্তশিল্পের চিত্র তুলে ধরে। *ঋগ্বেদ*-য়েই এর সূচনা দেখা যায়। ঋভুগণকে সুচারু কারুশিল্পীরূপে প্রশংসা করা হয়েছে। ভৃগুগণ প্রশংসাধন্য ছিলেন রথনির্মাণে দক্ষতার জন্য। ভেড়ার পশম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র বুননের কথাও জানা যায়। বস্ত্র প্রস্তুতকারক 'বায়' বলে অভিহিত হতেন। তবে বস্ত্র বুননের ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পীর কথাই বেশি বলা হয়েছে। দারুশিল্পের কথাও পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এ। তষ্টৃ বা তক্ষকারগণ কাষ্ঠনির্মিত রথ, চাকা, নৌকা ও পাত্র প্রস্তুত করতেন। রথকার ও তক্ষকারগণ বৈদিক সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা পেতেন। তাঁরা রত্নিন-রূপে নব অভিষিক্ত রাজার দ্বারা সমাদৃত হতেন।

২খ.৫ শিল্প প্রয়াস

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শিল্পের তালিকা শস্যের মতোই আরও দীর্ঘ হল। *রাজসনেয়ী সংহিতা*-এ একটি সম্পৃক্ত তালিকা পাওয়া যায় যা হস্তশিল্প সম্প্রসারণের পরিচায়ক। এতে কৌলাল বা মৃৎশিল্পী, কর্মার বা ধাতুশিল্পী, মনিকার, ইষকার (তীর নির্মাণ), ধনুকার রজ্জুকার (দড়ি নির্মাতা), জ্যাকার (ধনুকের ছিলা প্রস্তুতকারী), সুরাকার, বাস, পল্পূলী বা রজক, রজ্জয়িত্রী (কাপড় রঙ করে যে নারী), চর্ম্মন্ন (চর্মকার), হিরণকার (স্বর্ণকার) ইত্যাদি হস্তশিল্পী বা কারিগর ও কারিগরী বৃত্তির কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়কার যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে, বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশে, তা এ ধরনের হস্তশিল্প বিকাশেরই পরিচায়ক, অর্থাৎ উত্তর ভারতে সমসাময়িক প্রায় সব সংস্কৃতির সমাজের এই ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল—বৈদিক সভ্যতায় পৃথকভাবে কিছুর উদ্ভাবন ঘটেনি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লোহার প্রথম উদ্ভব, বিকাশ ও লোহা ব্যবহারের প্রসার। সংস্কৃত ভাষায় লোহার প্রতিশব্দ 'অয়স'। *ঋগ্বেদ*-এ যদিও 'অয়স' শব্দটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এই 'অয়স' ধাতু বলতে যা ব্যবহৃত হত তাকেই বোঝাত, পৃথকভাবে লোহাকে নয়। লোহার ব্যবহার খ্রিঃপূঃ ১৫০০ শতাব্দীতে সূচিত হয়নি। সর্বপ্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে লোহা পাওয়া যায় খ্রিঃ পূঃ ১০০০ শতাব্দীতে—রাজস্থানের তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতির অহর-এ এবং চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির নোহ্-তে। এছাড়া, কর্ণাটকের হাল্লুর-এও লোহার ব্যবহার সূচিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যে দেখা যায় পৃথকভাবে ধাতুর নামকরণ—লোহিত বা তামা, কৃষ্ণায়স বা শ্যামায়স (লোহা), হিরণ্য বা স্বর্ণ, রজত বা রূপা, কাংস বা কাঁসা, ত্রপু বা টিন ও সীসা—অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত ধাতুসংকর পদ্ধতিও শুরু হয়েছিল। ইতিপূর্বে লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণ সংঘটিত হয়েছে হরপ্পীয় সভ্যতার কারিগরদের হাতে। লোহা অন্যান্য ধাতুর সাথে সংযুক্ত হলে জীবনে এক নতুন মাত্রা এল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। *অথর্ববেদ* ও *রাজসনেয়ী সংহিতা*-এ নিশ্চিতরূপে লোহার ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়। লোহা কৃষ্ণায়স বা শ্যামায়স নামে সূচিত হল। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে যে অশ্বমেধ যজ্ঞে বধ্য অশ্বটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পশু লোহার অস্ত্রে বলি দেওয়া হত। অর্থাৎ যেহেতু লোহা সাধারণ কৃষকের ব্যবহৃত ধাতু তাই অশ্বমেধের অশ্বটি, যা রাজশক্তির প্রতিভূ, তাকে লোহার অস্ত্রে বধ করা যাবে না। এই উল্লেখ থেকে দুটি ধারণা স্পষ্ট যে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর রচনাকালে কৃষিকর্মে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এবং সাধারণ কৃষক অন্যান্য ধাতব ও প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে লোহার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার যে পরবর্তী বৈদিক শিল্প তথা সমগ্র অর্থনীতিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল তা অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরাই স্বীকার করেন। লোহা ব্যবহারের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বিশেষ করে পরবর্তী উত্তর ভারতের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া গেছে যা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে লোহার ব্যাপকতর প্রচলন নির্দিষ্ট করে।

২খ.৬ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঋগ্বেদ-এ বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে, যদিও এই জীবিকাটি সম্পর্কে গোড়ায় বৈদিক আর্যদের অনুদার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই সংহিতায় 'পণি'দের উল্লেখ রয়েছে যাঁদের বাণিজ্যে পারদর্শী ও চতুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত এই পণিরা অনার্য জাতির লোক ছিলেন। এঁরা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বদেহ, খর্বনাসা, স্থূলভাষী বলে বর্ণিত। ঋগ্বেদিক আর্যরা সর্বদাই এঁদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার শংকায় ভুগতেন। বৈদিক আর্যরা পণিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়েছে *ঋগ্বেদ*-এ, যাতে পণিরা ধ্বংস হয়। বাণিজ্যের প্রতি এই ঘৃণার মনোভাব অবশ্য পরে অপসারিত হয়েছিল। *ঋগ্বেদ*-য়েই তার প্রমাণ রয়েছে। সামগ্রী বিনিময়ের মূল্যরূপে শুল্কর উল্লেখ রয়েছে। ইন্দ্রের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি বিক্রয়ের কথা জানা যায়। *ঋগ্বেদ*-এ হিরণ্যচূর্ণ থলিতে মাটির জালায় ভরে রাখার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, সুবর্ণপিণ্ড বা হিরণ্যপিণ্ড জমা করার কথাও রয়েছে। 'নিষ্ক' শব্দটি সম্ভবত এই হিরণ্যপিণ্ডগুলিকেই বোঝাত। তবে বিনিময়ের মূল্য হিসাবে সুবর্ণ-খণ্ডের ব্যবহার এ যুগের বৈদিক আর্যরা জানতেন না। চলাচলের জন্য ষণ্ডবাহী 'অনস' অর্থাৎ শকটের কথাও বলা হয়েছে। তবে *ঋগ্বেদ*-এ বাণিজ্যের যে উল্লেখ রয়েছে তা প্রধানত 'পণি' ও 'অসুর'দের সম্বন্ধে। এই 'পণি' বা 'অসুর'গণ অনার্য—হরপ্পীয় সভ্যতার পরবর্তী সংস্কৃতির মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্কৃতিগুলিতে পূর্বের হরপ্পীয়দের ন্যায় না হলেও অন্তত কিছু পরিমাণ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে স্থলপথে এবং জলপথে, পূর্বের তুলনায় সীমিতভাবে চালিত ছিল। পণিদের দুঃসাহসিক অভিযান, অর্থলোভ ও বাণিজ্যিক চাতুর্য সম্ভবন্ধে *ঋগ্বেদ*-য়ের বিবরণ উন্নত অনার্য উপজাতিগুলির বাণিজ্যিক পারদর্শিতাই নির্দেশ করে।

২খ.৬.১ বাণিজ্যপথ

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'বণিজ্' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। *যজুর্বেদ*-এ বণিজ্ কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বণিক্ এবং 'বাণিজ' অর্থাৎ বণিকের পুত্ররূপে। এই বণিকেরা আর্য বর্ণভিত্তিক সমাজের অংশ বলে বর্ণিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বাণিজ্য জীবিকাটি বৈদিক সমাজের অঙ্গ হয়ে পড়ছে এবং বণিকগোষ্ঠী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হচ্ছেন। এঁরা বৈশ্যবর্ণের অংশরূপে পরিচিতি পেলেন। স্থলপথ ও জলপথ দু'ভাবেই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। পূর্বের হরপ্পীয় সভ্যতার যুগে যে সব বাণিজ্য চালিত ছিল সেগুলি ছাড়াও পূর্ব অভিমুখী নানা নতুন পথে পণ্য চলাচল শুরু হল। 'পথিকৃৎ' কথাটি *ঋগ্বেদ* ও *অথর্ববেদ*-এ পাওয়া যায় যা নতুন পথের দিশারীকে চিহ্নিত করে। স্থলপথে বাণিজ্য গোচালিত শকটেই বেশি হত। *ঋগ্বেদ*-এ জলপথে বাণিজ্যেরও উল্লেখ রয়েছে, অবশ্য এক্ষেত্রে 'পণি'দের কথাই বলা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে অনার্য হরপ্পীয়দের উত্তরসূরি 'পণি'রা পূর্বের হরপ্পীয়দের মতো না হলেও আংশিকভাবে অন্তত জলপথে বাণিজ্যের ধারাটি বজায় রেখেছিল। তবে এই জলপথ 'সমুদ্র' ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ বর্তমান। সমসাময়িক কালের নৌ-ব্যবস্থায় সমুদ্র-বাণিজ্যের সম্ভাবনাটি ক্ষীণ। অবশ্য পরবর্তী বৈদিক যুগে সমুদ্র-উপকূল ধরে নৌবাণিজ্য সূচিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

২খ.৬.২ বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার

বিনিময়-প্রথার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের পরিমাপ করার প্রচলন ঋগ্বেদিক যুগেই শুরু হয়েছিল। গোড়ার দিকে সামগ্রিকভাবে পণ্য-বিনিময় থেকে ধীরে ধীরে প্রথমে গোধন ও পরে ধান্য পরিমাপ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল।

পণ্য-বিনিময়ের মূল্য 'শুল্ক' বলে অভিহিত হল এবং গোধনকে মূল্য বা শুল্করূপে স্থির করল। পরে কৃষি-অর্থনীতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শস্য শুল্করূপে গোধনের স্থান অধিকার করল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য কয়েকটি শব্দ ও তার বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে সম্ভবত ধাতব মুদ্রাও শুল্ক বা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কোন কোন ঐতিহাসিক 'নিষ্ক', 'কৃষ্ণল' বা শতমান শব্দগুলিকে মূল্যনির্ধারক ধাতবখণ্ডরূপে গণ্য করেন এবং কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'কৃষ্ণল' বা শতমান একেকটি পরিমাপের মুদ্রা ছিল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য শতমান একটি বিশেষ তৌলরীতির মুদ্রারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বৈদিক যুগে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিনিময় প্রথায় বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা যায়। যার ফলে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি মুদ্রার প্রচলন নিঃসন্দেহে নজরে আসে।

২খ.৭ সম্পদের মালিকানা

কৃষি ও শিল্প উৎপাদন এবং বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পরবর্তী বৈদিক সমাজের রূপান্তর ঘটে। পূর্ববর্তী কৌমগোষ্ঠী ও যৌথ মালিকানার সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে তাদের গুরুত্ব হারায়। সমাজে সম্পদ ও বিশেষত উদ্বৃত্তের উদ্ভবের ফলে সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যের সূচনা হয়। সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের অভিভাবক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ ও রাজন্যগণ এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় সব থেকে বেশি লাভবান হন। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ, ধনোৎপাদক বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে একে অপরকে সহায়তা করেন। এর ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করার মাধ্যমরূপে কর ব্যবস্থার প্রচলন হয়। কর ব্যবস্থার তাত্ত্বিক দিকটি ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বের কৌমসমাজে দলপতি বা রাজাকে সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় 'বলি' বা তাঁদের আহরিত বা লুণ্ঠিত ধনের একাংশ উপঢৌকন দিতেন। কিন্তু উদ্বৃত্ত সম্পদ বৃদ্ধি ও সমাজে ধর্মীয় প্রভাব ও রাজশক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে দেয় বলি বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিহৃৎ, অর্থাৎ বলি-আহরণকারী ব্যক্তি বলে অভিহিত হলেন। এ ছাড়া, 'ভাগ ও শুল্ক'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সম্পদের মালিকানা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ জমির মালিকানা সম্ভবন্ধে বলা হয়েছে—ক্ষত্রিয় বা রাজা যদি কৌমের সর্বসম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তিকে জমির অধিকার দেন তবেই জমির উপর স্বত্ব প্রমাণিত হয়। বৈদিক সাহিত্যের উপাদান থেকে ভি. এ. স্মিথ., ই. ডব্লিউ. হপকিন্স, জি. ব্যুলর প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এ যুগে জমির উপর রাজার মালিকানাই প্রচলিত ছিল। তবে অন্যদিকে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতিও বৈদিক সাহিত্যে প্রমাণিত। *ঋগ্বেদ*-এ এর উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া, ক্ষেত্রপতি এবং ক্ষেত্রপত্নী অর্থে জমির মালিক ও তার স্ত্রীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তবে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর রাজাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছিল পরবর্তী বৈদিক সমাজে এবং এর প্রতিফলন ঘটেছিল প্রশাসনিক সংগঠনে। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বিশেষ কর্মচারীপদ সৃষ্ট হয়েছিল—'সংগ্রহীতৃ'। 'রত্নিন'রূপে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই রাজকর্মচারীর উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সমাজে লক্ষণীয় এই পরিবর্তনে উত্তর ভারতে এক সামগ্রিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঐতিহাসিক নগরায়ণের উদ্ভব ঘটে।

২খ.৮ বৈদিক যুগের রাজনৈতিক সংগঠন

বৈদিক অর্থনীতি, কৃষি বা শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সূচনা, সম্পত্তিগত ধারণার জন্ম দেয়। ধন ও ধনোৎপাদনের সঙ্গে ধন নিয়ন্ত্রণের নিবিড় সম্পর্ক। ধন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমরূপে রাজনৈতিক শক্তির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ পূর্বে অর্থাৎ হরপ্পীয় যুগে ঘটে থাকলেও সর্বপ্রথম এর সাহিত্যিক নিদর্শন বৈদিক সাহিত্য থেকেই মেলে। রাজনীতির মতো কৃত্রিম একটি সংগঠন সাহিত্যিক উপাদানের ভিত্তিতেই একমাত্র সম্যকরূপে উপলব্ধ হয়। সুতরাং বৈদিক যুগের রাষ্ট্র বা রাজনীতিগত ভাবনা ভারতে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম চিন্তাধারারূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়। *ঋগ্বেদ*-এ বিভিন্ন 'গোষ্ঠী'র উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া—'কুল', 'বিশ', 'জন', 'গণ' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রত্যেকটিই একটি সমাজভিত্তিক সংগঠনকে নির্দিষ্ট করে যা রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বসূরিরূপে গণ্য হতে পারে। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত যাযাবর জীবনযাত্রায় গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের কথা রয়েছে যা কতকগুলি উপজাতীয় স্তরে সংগঠিত হয়েছিল। রোমিলা থাপার *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত শক্তিশালী দাশরাজ্ঞের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পুরু, দ্রুহ্য, অনু, তুর্বশ এবং যদু ইত্যাদি প্রধান উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি দাশরাজরূপে অভিহিত হয়েছেন। অপর শক্তিশালী গোষ্ঠীভুক্ত ভরতগণ এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। *ঋগ্বেদ*-এ আর্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উল্লেখ বারংবার এসেছে। তবে অপরদিকে আর্য এবং অনার্য উপজাতিগুলির মধ্যেও নিরন্তর সংগ্রাম চলছিল *ঋগ্বেদ*-য়ের যুগে। এই পারস্পরিক সংগ্রামের প্রধান কারণ গোধন সংরক্ষণ ও আহরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। *ঋগ্বেদ*-য়ের প্রথম ও ষষ্ঠ মণ্ডলে রাজা বা গোষ্ঠীপ্রদানের বর্ণনা রয়েছে। গোধন দখলকারী দলপতিরূপে গোধন আহরণের জন্যই যে প্রধানত যুদ্ধ সংঘটিত করত সেই চিত্রটিও উজ্জ্বল। গোধন কাঙ্ক্ষিত বস্তু ও লুণ্ঠনের উপযোগী। *ঋগ্বেদ*-এ যুদ্ধের সমার্থক 'গবিষ্টি' শব্দটি এই দিকেরই ইঙ্গিত করে। *ঋগ্বেদ*-য়ের শাসকের অভিধা নরপতি, মহীপতি বা ভূপতি কোনওটিই না, তিনি 'গোপতি' (গবাদি পশুর অধিকর্তা) বলে আখ্যাত। 'গবিষ্টি' যে বীরের নেতৃত্বে চালিত, তিনি ইন্দ্ররূপে ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত। *ঋগ্বেদ*-এর নবম মণ্ডলে সোমের প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে "হে সোম, তুমি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণপূর্বক বিস্তর গাভী আনয়ন কর"। সোম রাত্রির পথপ্রদর্শক। তিনি পশুধন লুণ্ঠনের উপযুক্ত সহায়ক হবেন। ইন্দ্র বা নেতৃস্থানীয় যোদ্ধাকে তিনি সাহায্য করবেন। ধন আহরণ ও আত্মরক্ষায় নেতৃত্বদান করে দলপতি যোদ্ধা রাজনৈতিক সংগঠনে প্রথম অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠলেন। গৃহের বা পরিবারের অভিভাবক গৃহপতি থেকে কুলের নেতৃত্বে কুলপ বা কুলপতি ও গোষ্ঠীর স্তরে গোষ্ঠীপতির উত্তরণ, স্তরে স্তরে রাজনৈতিক সংগঠনের সোপান রচনা করেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক এককগুলি সময়ের সঙ্গে নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এসে রাজনৈতিক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এ ভাবেই গ্রামণীর অধীনে গ্রাম, বিশপতির অধীনে বিশ্ ও রাজা বা রাজন্যবর্গের অধীনে রাষ্ট্রসংগঠন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শক্তির বিকাশে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায় যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিল তা বৈদিক সাহিত্যে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। সাধারণের কাছে রাজশক্তির মাহাত্ম্য ও দৈবী চরিত্রের ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় স্বীকৃতি দান করে এই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় রাষ্ট্রশক্তির নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

২খ.৮.১ গণরাষ্ট্র

বৈদিক সাহিত্যে উপজাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি ধারার উজ্জ্বল উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। একদিকে পৃথকভাবে 'গণ'রাষ্ট্র বা সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে রাজতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে 'সভা'ও 'সমিতি'র অস্তিত্বে এই ধারার প্রচলন পরিলক্ষিত। গণরাষ্ট্রের উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ ৪৬ বার। *অথর্ববেদ*-এ ৯ বার এবং *ব্রাহ্মণ সাহিত্যে*-এ বহুবার পাওয়া যায়। 'রাজনঃ সমিতাবিবা' কথাটি সম্ভবত সমিতি'তে বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দ বা রাজাদের অধিষ্ঠান করার ছবিটি তুলে ধরেছে। একাধিক রাজার মধ্যে একজন প্রধান রাজা বা 'জ্যেষ্ঠ রাজা'র কথাও বলা হয়েছে। সম্ভবত এই গণরাষ্ট্রে একাধিক রাজা ও গণনায়কের প্রচলন ছিল। রুদ্রের পুত্র মরুদগণের গণসংগঠনের কথা বলা হয়েছে যার সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৯। দেবতাদের গণসংগঠনগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। এর থেকে গণসংগঠনগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। কে.পি. জয়সোয়াল মনে করেন যে, বৈদিক সমাজে রাজতন্ত্রের উত্থান আগে ঘটে এবং তার কিছু পরে গণরাষ্ট্রগুলির উদ্ভব হয়। রামশরণ শর্মার মতানুসারে বৈদিক গণগুলি মুখ্যত আর্যভাষীদের সভ্য সংগঠন ছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে উপজাতীয় চরিত্র বর্তমান ছিল। বৈদিক সাহিত্যর সূত্র থেকে মনে হয়, উপজাতীয় স্তরে গণরাজ্য বা সংগঠনের অস্তিত্ব, রাজশক্তি আত্মপ্রকাশ করার বহু পূর্বেই বর্তমান ছিল। এই সংগঠনগুলির বিভিন্ন নাম ও গঠনের ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় যথা—স্বরাজ্য, যার শীর্ষে নেতৃত্ব করতেন স্বরাট্। তিনি রাজ্যের সমস্ত সদস্যের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করতেন এবং তাঁর নেতৃত্ব দান করতেন। সুতরাং এখানে সমব্যক্তিদের মধ্যে থেকে একজন স্বরাটের নির্বাচনের চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। *শুক্লযজুর্বেদ*-এ উত্তর ভারতে স্বরাটের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। অপর একটি গণসংগঠন 'বৈরাজ্য' নামে অভিহিত হয়েছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ হিমালয়ের উত্তরে বৈরাজ্যের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। কুরু ও উত্তর মদ্রদের উল্লেখ রয়েছে যাঁরা বৈরাজ্য সংগঠন গঠন করেছিলেন। আলতেকার মনে করেন, বৈরাজ্য একটি রাজপদ-বিহীন রাষ্ট্রসংগঠন ছিল। *অথর্ববেদ*-এ গণ ও মহাগণ-এর উল্লেখ রয়েছে যা থেকে বিভিন্ন আকার ও স্তরে গণরাষ্ট্র সংগঠনের বিন্যাস ঘটেছিল বলে মনে হয়।

২খ.৮.২ সভা ও সমিতি

বৈদিক সমাজে রাজতন্ত্র বিকাশের সূচনা *ঋগ্বেদ*-য়েই লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্রের বিকাশে সভা, সমিতি ও বিদথর মতো গণসংগঠনগুলির অস্তিত্ব পূর্বেই উপজাতীয় ধারার প্রচলন নির্দেশ করে। তবে মূল গণরাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব সম্ভবত পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজশক্তির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ হয়ে পড়েছিল। *অথর্ববেদ*-এ 'সভা' ও 'সমিতি'কে প্রজাপতির দুই যমজ কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে, যেমন রাজা তেমনই সভা এবং সমিতিও স্বয়ং প্রজাপতির নিকট অধিকারপ্রাপ্ত। *ঋগ্বেদ*-এর বর্ণনায় সভা ও সমিতির সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়। 'সভমেতি কিতবঃ' কথাটি থেকে সভায় দ্যূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার চিত্রটি পাওয়া যায়। দৈবী সমিতির কথাও জানা যায় *ঋগ্বেদ*-এ। সমিতি সম্ভবত সমস্ত জনগণের বা বিশ'-এর জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সভার সদস্যপদ সম্ভবত সীমিত ছিল। "সভ্যেয়ো বিপ্রো" এবং "রয়ি সভাবান্" এই কথাগুলি থেকে মনে হয়, ব্রাহ্মণ বা বিপ্র ও ধনশালী ব্যক্তিরাই বা মঘবানরাই সভার সদস্যপদে আসীন ছিলেন। রাধাকুমুদ মুখার্জীর মতে সভা ও সমিতি ভারতের আদি ও সুপ্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বৈদিক সাহিত্যে 'সভাপতি' ও 'সভাপাল'-

এর উল্লেখও পাওয়া যায়। জিমারের মতে সভা একটি গ্রামীণ সংস্থা ছিল যার পৌরোহিত্য করতেন গ্রামীণ বা গ্রামপ্রধান। কে.পি. জয়সোয়ালের মতে বৈদিক যুগের সভা প্রতিষ্ঠান এবং সমিতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে ম্যাকডোনেল মনে করেন, বৈদিক যুগে রাজার নিরংকুশক্ষমতার পথে এক বিপুল অন্তরায় ছিল সমিতিতে প্রকাশ্য জনমত। অবশ্য ম্যাকডোনেল এবং কীথ তাঁদের *বৈদিক ইন্ডেক্স* গ্রন্থে এও লিখেছেন যে রাজপদে নির্বাচনের প্রচলনটি বৈদিক সমাজে আদৌ ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বৈদিক যুগের গোড়ায় রাজপদে নির্বাচন প্রচলিত থাকলেও রাজার দৈবী অধিকারের তত্ত্বটি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ক্রমশ প্রকট হয়। এর সঙ্গে জড়িত সভার ক্রমশ-পরিবর্তিত রূপটি। প্রথম থেকেই জনসংগঠনরূপে সভার চরিত্র অনেকটা সংকুচিত ছিল। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায় সভার সংগঠনে। পরবর্তী কালে সভা রাজসভায় পরিণত হয়। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণকে রাজসভায় রাজার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। এ ছাড়া, সামাজিক জীবনে সভা অভিজাত সম্প্রদায়ের আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। পরবর্তী বৈদিক সমাজের রাজনৈতিক পটভূমিতে সভা কেন্দ্রীয় অভিজাত শাসনের অঙ্গ হয়ে পড়ে যার কেন্দ্রে রাজার অবস্থান ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

২খ.৮.৩ রাজশক্তির প্রাধান্য

ঋগ্বৈদিক রাষ্ট্র গঠনে রাজশক্তির অগ্রগণ্য ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়। এই সাহিত্যে রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন ভরতগণের নেতৃত্বে দিবোদাস ও তৎপুত্র সুদাস, অভ্যাবর্তিত চায়মান রুষমদের রাজা ঋণঞ্চয় অগ্নিবেশ, রাজপুত্র ইত্যাদি। রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক ছিল কিনা গোড়ার যুগে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না—তবে একাধিক রাজ-তনয়ের নাম পাওয়া যায়। রাজন্যবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা সুস্পষ্ট। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের সমাজেই বিশ্ অর্থাৎ সাধারণ জনগোষ্ঠী ও রাজন্যবর্গের মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটে গেছে। তবুও 'বিশ'-এর মতামত ও সামাজিক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কারণ জমি ভোগদখলের ক্ষেত্রে রাজাকে বিশেষ সম্মতি গ্রহণ করতে হত। ঋগ্বেদের রাজার সর্বপ্রথম ভূমিকা ছিল নেতৃত্বদান, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল উপজাতি এবং তার সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্বটিও। বিচারকার্যও রাজার দ্বারা পরিচালিত হত। রাজাকে যোদ্ধারূপে ইন্দ্র এবং বিচারকরূপে বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বৈদিক তত্ত্বে রাজার ক্ষমতা ঐশীশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। চার্লস ড্রেকমেয়ার মনে করেন যে বেদে এমন কিছু তথ্য নেই যা এই সমাজে রাজশক্তির ঐশ্বরিক চরিত্র নির্দিষ্ট করে। কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর *হিন্দু পলিটি* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে হিন্দু (বৈদিক) রাজশক্তি একটি চুক্তি বা অঙ্গীকার থেকে উদ্ভূত, যে অঙ্গীকারের মাধ্যমে রাজা সমগ্র জনগণের সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড্রেকমেয়ার এবং জয়সওয়াল দু'জনই বৈদিক রাজশক্তির উদ্ভব জনমত সাপেক্ষ বলে মনে করেন। এরই অপরদিকে ইউ. এন. ঘোষালের মতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে রাজশক্তির উত্থান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাভূত। তিনি এক্ষেত্রে অবশ্য অনেক পরবর্তীকালে *ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য*-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। পি.ভি. কানের মতে ঘোষালের ধারণা সঠিক নয়। রাজশক্তির ঐশ্বরিক ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সূচনা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু *অথর্ববেদ*-এর সময়কাল অবধি বৈদিক রাজনৈতিক জীবনে জনগোষ্ঠী ও গণ প্রতিষ্ঠান, যথা সভা বা সমিতির গুরুত্ব যথেষ্টরূপে বজায় ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর প্রার্থনা করা হচ্ছে ""বিশা-স্ত্বা সর্বাবাঞ্ছন্ত' অর্থাৎ সর্বজন যেন রাজাকে

আকাঙ্ক্ষা করেন। ঐ সংহিতাতেই আবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে রাজার শাসন শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন হয়, যাতে প্রজাগণ রাজাকে স্বেচ্ছায় বলি অর্পণ করেন এবং রাজার সার্বভৌমত্ব প্রসারে সহযোগিতা করে তাঁকে শত্রুমুক্ত করেন। *অথর্ববেদ*-এ রাজার পক্ষ থেকে সমস্ত বর্ণের প্রজাদের সম্মতি ও বিশ্বস্ততা কামনা করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই শ্লোকেই রাজা অনুরোধ করেছেন প্রজাদের, তাঁরা যেন তাঁকে ত্যাগ না করেন, যেন তাঁরা স্বপক্ষে স্থির থাকেন এবং তাঁর কর্মে তৃপ্ত হন। নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন, এই সমাজে রাজার দৈবশক্তির দাবি বা অধিকার স্থাপন সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে গোড়া থেকেই এর বিপরীতমুখী ধারাটি বিদ্যমান। রাজার দৈবী অধিকারের তত্ত্বটি বহুবার আলোচিত হয়েছে এই সাহিত্যে। এই দুই বিপরীতমুখী তত্ত্বের উপস্থিতি বহুমুখী রাজনীতি বা রাজনৈতিক ভাবনার প্রচলন ইঙ্গিত করে। *ঋগ্বেদ*-এ রাজা ত্রসদস্যু নিজেকে সর্বশক্তিমান, বিশ্বজগতের প্রভু, ইন্দ্র ও বরুণের ন্যায় মানবের রাজা অদিতির পুত্র পৃথিবী ও আকাশ বলে ঘোষণা করেছেন। এই ধারার প্রতিফলন পরবর্তী কালে *অথর্ববেদ*-য়েও বর্তমান। রাজশক্তির সাফল্য কামনা করে বলা হচ্ছে ঃ রাজা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করুন, ধনপতি হন, বিশ্‌পতিরূপে বিরাজ করুন। তিনি ইন্দ্রের প্রিয়, ওষধি ও গবাদি পশুর প্রিয়, জনগণের একমাত্র প্রভু এবং মনুর বংশজাত উত্তম রাজা, তিনি সিংহ-প্রতীক এবং সমস্ত প্রজাগণকে (বিশ) ভক্ষণ করতে সক্ষম। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ রাজসূয় যজ্ঞের রাজাকে পুরোহিতগণ সবিতা, বরুণ এবং ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতরাং একাধারে সর্বজননির্বাচিত রাজা ও দৈবশক্তিজাত রাজার দ্বৈত বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যের গোড়ার যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল যা পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার দৈব অধিকারের পটভূমি রচনা করেছে এবং এরই সঙ্গে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রেরও উদ্ভব হয়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দৈবী রাজশক্তির তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছে। ডি.ডি. কোশাম্বী *তৈত্তিরীয় সংহিতা* এবং *ব্রাহ্মণ* গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন ধরনের, যথা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, ঐন্দ্রমহাভিষেক, ইত্যাদি, অভিষেক ও তৎসংশ্লিষ্ট যাগযজ্ঞের মাধ্যমে রাজা বা দলপতিকে উপজাতীয় গণতান্ত্রিক গণ্ডির পাশ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন। উপজাতীয় সভার উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে নেই বললেই চলে। বর্ণভিত্তিক সমাজের পূর্ণ বিকাশ ও প্রসার ঘটে যায় এই যুগে। যার ফলে একটি শ্রেণীভিত্তিক সমাজের উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী ও বর্ণে বিভক্ত সমাজের শীর্ষে রাজশক্তির স্থান আরও সুদৃঢ় হয়। রাজশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজের অভিজাত বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষের সম্মতি ও সহায়তার দিকটিও বৈদিক সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তি নয় বরং উচ্চকোটির মানুষের প্রাধান্যই প্রকাশ পায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজসূয় যজ্ঞের উপাঙ্গরূপে রত্নহিবংসি অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। নবাভিষিক্ত রাজা রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে একাদশ 'রত্নিন'-এর গমনপূর্বক তাঁদের উপঢৌকন অর্পণ করবেন। বিভিন্ন সাহিত্যগুলিতে রত্নিন'দের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা হলেন, ব্রাহ্মণ-পুরেহিত, মহিষী, বাবাতা, রাজন্য, গ্রামণী ভাগদুঘ, সংগ্রহীতৃ, সেনানী, সূত, ক্ষতৃ, তক্ষণ, রথকার, অক্ষবাপ ও গোবিকর্তন। এঁদের উল্লেখ প্রায় সব রচনাগুলিতেই বর্তমান। রাজন্য ও পরিবৃক্তি'র উল্লেখ দশম ও একাদশ রত্নিনরূপে *শতপথ* ব্রাহ্মণ ছাড়া সব রচনাতে বর্তমান। কিছু রচনায় বাবাত, তক্ষণ ও রথকারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ যজ্ঞের হোতাকে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছেন গোবিকর্তন ও পালাগল। কে.পি. জয়সওয়ালের মতে এই রত্নিনগণ ঋগ্বৈদিক

পূর্বের সমিতির অংশ ছিলেন। এঁরাই পরবর্তীকালে রাজাকৃতরূপে, রাজতন্ত্রের প্রসারে সহায়তা করেছেন। পরবর্তী বৈদিক যুগের রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এই রত্নিনগণ উচ্চপদে আসীন। সম্ভবত এই রাজন্য, গ্রামীণ, তক্ষণ, রথকারগণ তাঁদের নিজস্ব বর্ণ বা কৌমের প্রতিনিধিরূপে রাজ-অভিষেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজ অভিষেকে 'রত্নিন'দের এই উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ধারার সংকোচন ও ক্রমশ অবলুপ্তির দিকটি নির্দেশ করে। ক্রমশ সমাজে একটি স্তরীভূত ক্ষমতার বিন্যাস প্রকাশ পায়। স্তরবিভক্ত সমাজের শীর্ষে আসীন রাজশক্তি ও তার সহায়ক পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাদের আসন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারও বৃদ্ধি পায় ও এর দ্বারা রাজশক্তির উত্থান আরও সহজ হয়ে পড়ে। উদ্বৃত্ত ফসল ও প্রসারিত কৃষিক্ষেত্র সমাজে সম্পদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভব ঘটায়। সম্পদ-রক্ষকের ভূমিকায় রাজশক্তির আত্মপ্রকাশ পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রথম ধাপ সৃষ্টি করে। উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে বাহুবল সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়ায় ক্রমশ রাষ্ট্রশক্তি এবং রাজার জনসাধারণের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর উপর অধিকারও বৃদ্ধি পায়। *ঋগ্বেদ*-এ যে রাজা জনসাধারণের স্বেচ্ছায় দান 'বলি' নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পরিণত হলেন 'বলিহৃৎ' অর্থাৎ বলি আহরণকারী ব্যক্তিরূপে। রাজ্য, রাষ্ট্র ও ক্ষত্র কথাগুলি সমার্থকরূপে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত। তার কারণ, এ যুগে রাষ্ট্রসংগঠনের শীর্ষে ক্ষত্রিয়বর্গ তথা রাজার উপস্থিতি একটি অতি প্রচলিত স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজশক্তির প্রতি তাত্ত্বিক নেতৃবর্গ বা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতবর্গের পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের একে অপরের সঙ্গে ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রাধান্য রক্ষায় সাহায্য করে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ নানা যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে যা রাজার পক্ষ থেকে জনসাধারণের নিকট গুরুত্বের জন্য অনুষ্ঠিত। রাজার সার্বভৌমত্বের কথা অশ্বমেধ, বাজপেয় বা ঐন্দ্রমহাভিষেক যজ্ঞের মাধ্যমে প্রচারিত। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে "বৃষা পৃথিব্যা অয়ম্ বৃষা বিশ্বস্য ভূতস্য ককুন-মনুষ্যানাম্ একবৃষো ভব"। অর্থাৎ রাজা সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অধিকারী। তিনি মানবসমাজের অধিপতি। এই ধরনের অনুষ্ঠান ও শ্লোকরচনার মাধ্যমে রাজাধিকারের পরিধি প্রসারিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে এই রাজার নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংগঠনের বিকাশ পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বাভাস দেয়।

২খ.৯ অনুশীলনী

১। ঋগ্বৈদিক যুগের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিবরণ দিন।

২। পরবর্তী বৈদিক সমাজের পরিবর্তনের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে নারীর ভূমিকায় কী রূপান্তর ঘটেছিল?

৩। ঋগ্বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪। পরবর্তী বৈদিক সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্রটি আলোচনা করুন।

৫। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আরব্ধ উপজাতীয় সমাজ থেকে রাষ্ট্রসমাজের বিবর্তনের ধারাটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। বৈদিক সাহিত্যে রাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচিত তত্ত্বের বিবরণ দিন।

৭। বৈদিক 'সভা' ও 'সমিতিক্ষ' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

২খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ *ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা (১৯৯৫)*

২। পিটার গাইলস ঃ *দ্য এরিয়ানস্, কেমব্রিজ হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া, ভলিউম-১ (১৯২২)*

৩। ও. শ্রোভার ঃ *দ্য প্রিহিস্টরিক অ্যান্টিকুইটিস অফ দ্যা এরিয়ান পিপল, বাই জেভন্স্ (অনূদিত) (১৮৯৮)*

৪। মর্টিমার হুইলার ঃ *দ্য ইন্ডাস সিভিলাইজেশন সাপ্লিমেন্ট টু, দ্য কেমব্রিজ হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া (১৯৬০)*

৫। ডি.ডি. কোশাম্বী ঃ *এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী (১৯৯১)*

৬। কে. মিনাক্ষী ঃ *"লিঙ্গুয়িস্টিক এ্যান্ড দ্য স্টাডি অফ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী", রিসেন্ট পার্সপেক্টিভ্স অফ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী*, রোমিলা থাপার (সম্পা.) *ফ্রম লিনিয়েজ টু স্টেট*

৭। রোমিলা থাপার ঃ *ফ্রম লিনেজ টু স্টেট (১৯৯০)*

৮। অবিনাশ চন্দ্র দাস ঃ *রিগ্ ভেদিক্ কালচার (১৯২৫)*

৯। সুকুমারী ভট্টাচার্য ঃ *বৈদিক সমাজে নারীর স্থান, প্রাচীন ভারতে সমাজ ও সাহিত্য (১৩৯৪)*

১০। এ. এস. অলটেকার ঃ *দ্য পোজিশান অফ উম্যান ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন (১৯৫৯)*
স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৭২)
জার্নাল অফ্ দি নিউমিসম্যাটিক্ সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া, পঞ্চদশ খণ্ড
ভেদিক ইনডেস্ক, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮)

১১। এ. এ. ম্যাকডোনেল ও এ. বি. কেটে ঃ *ভেদিক ইনডেক্স অফ নেমস এ্যান্ড সাবজেক্টস দ্বিতীয় খণ্ড ২*

১২। জে. এম. কেনোয়ার (সম্পা.) ঃ *ওল্ড প্রবলেমস্ অ্যান্ড নিউ পার্সপেক্টিভস্ ইন দ্যা আর্কিওলজি অফ্ সাউথ এশিয়া*

১৩। এ. পারপোলা ঃ *দ্যা কামিং অফ্ দি এরিয়ানস্*

১৪। এ. ঘোষ (সম্পা.) ঃ *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি*

১৫। ডি. পি. আগরওয়াল ঃ *দ্য আর্কিওলজি অফ ইন্ডিয়া (১৯৮২)*

১৬। রণবীর চক্রবর্তী ঃ *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (১৩৯৮)*

১৭। ডি. এ. স্মিথ ঃ *আর্লি হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া (১৯৪২)*

১৮। ই. ডব্লিউ. হপকিনস ঃ *ইন্ডিয়া ওল্ড এ্যান্ড নিউ (১৯০১)*
১৯। এস. ভুলার (সম্পা) ঃ *স্যাক্রেড বুক্স অফ দ্য ইস্ট, খণ্ড ২৪*
২০। কে. পি জয়সোয়াল ঃ হিন্দু পলিটি (১৯৪৩)
২১। আর. কে. মুখার্জী ঃ হিন্দু সিভিলাইজেশন (১৯৬৩)
২২। হরিপদ চক্রবর্তী ঃ *ভেদিক ইন্ডিয়া, পলিটিক্যাল এ্যান্ড লিগ্যাল ইনস্টিটিউশন ইন বেদিক লিটারেচার (১৯৮১)*
২৩। এ. ম্যাকডোনাল ঃ *এ হিস্ট্রী অফ সানস্ক্রিট লিটারেচার (১৯৫২)*
২৪। ইউ. এন. ঘোষাল ঃ *হিন্দু পলিটিক্যাল থিওরিস (১৯২৭)*
২৫। পি. ডি. কানে ঃ *হিস্ট্রীস অফ্ ধর্মশাস্ত্র (১৯৩০-৪৬)*

একক ২গ ❑ বৈদিক যুগের ধর্ম-চেতনা, বিশ্বাস ও প্রক্রিয়া

গঠন

২গ.০ উদ্দেশ্য

২গ.১ বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবী

২গ.২ ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানের প্রাধান্য

২গ.৩ ধর্ম দর্শন

২গ.৪ অনুশীলনী

২গ.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২গ.০ উদ্দেশ্য

বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবী, ধর্ম-চেতনা, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানদের প্রাধান্য সম্বন্ধে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

২গ.১ বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবী

বৈদিক সাহিত্যে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল ধর্ম। সংহিতা-সাহিত্যগুলি মুখ্যত দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রার্থনার সংকলন। *ঋগ্বেদ সংহিতা*-এ মূলতঃ তিন প্রকার রচনা বিষয় পাওয়া যায় ঃ দেবতার রূপবর্ণনা, দেবতার আপ্যায়ন ও প্রার্থনা। *যজুর্বেদ সংহিতা* ও *ব্রাহ্মণ সাহিত্যে* যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও নির্দেশমালা পাওয়া যায়। কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত *অথর্ববেদ সংহিতা*-এ সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠান এবং শত্রু বিনাশের জন্য অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও প্রক্রিয়া নির্দেশিত হয়েছে। বৈদিক সমাজ বা রাজনীতি সংক্রান্ত তথ্য বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ হলেও প্রধানত ধর্ম-বিষয়ক ভাবনারই প্রতিফলন এই সাহিত্যে রয়েছে। আর্যভাষীদের এই ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছিল। বিবিধ ধর্ম চিন্তা, আদিম বিশ্বাস, দেব-রূপকল্প—এমনকী, যাদু ও ঐন্দ্রজালিক বা অতিপ্রাকৃত অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস ইত্যাদির পরিচয়ও এই ধর্ম ভাবনায় মেলে যার মধ্যে থেকে বৈদিক অধ্যাত্ম চিন্তা ধীরে ধীরে পরিণত লাভ করেছে।

আর্যেরা প্রধানত সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র বা সবিতৃ, পূষণ, অগ্নি, সোম, রুদ্র, অশ্বিনীদ্বয় ও মরুদ্‌গণ ইত্যাদি দেবতার বর্ণনা রয়েছে। পুরুষপ্রধান বৈদিক ধর্মে বিশেষ কয়েকটি দেবরূপেরও উপস্থাপনা করা হয়েছে, যথা পৃথিবী, অদিতি, ঊষা, রাত্রি, নির্ঋিতি, গায়ত্রী, যমী, বাক্, সরস্বতী ইত্যাদি। বৈদিক দেবীরা অবশ্য দেবতাদের তুলনায় গৌণ ছিলেন।

ধর্মীয় বিশ্বাসের আদিমতম রূপটি *ঋগ্বেদ*-এ প্রাপ্ত। এই ধর্ম-চেতনায় ও দেবরূপকল্পে প্রকৃতি-পূজার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্র পর্জন্য বলে অভিহিত। বজ্র তাঁর অস্ত্র এবং তিনি বৃষ্টিপাত ঘটান। পূষণ্ বা সবিতৃ পৃথিবী আলোকিত

করে পথ দেখান। মরুদ্‌গণ সদা সঞ্চরমাণ বায়ু, রুদ্রের সহচর। সরস্বতীর কল্পনায় প্রাণদায়িনী নদীরূপে সূচিত এবং পরে দেবীরূপে পরিণত। এই প্রকৃতি-পূজার স্তর থেকে ক্রমশ অতিলৌকিক ঐশী শক্তির কল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল। সমস্ত আদি ধর্মবিশ্বাসের মূলে আকাশ ও স্বর্গলোকের একটি দৈবী রূপ ও উৎপত্তি কল্পনা করা হয়। *ঋগ্বেদ*-এর 'দ্যৌ বা 'দ্যায়ুস্' প্রথম অন্তরীক্ষের দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন। তার পরে অনাদি আকাশের দেবতা বরুণের রূপ সৃষ্ট হয়েছে। বরুণ এবং মিত্র'র কল্পনায় পুরাতন ইন্দো-ইরাণীয় সংস্কৃতির ছায়া লক্ষ্য করা যায়। ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ *আবেস্তা*-এ বর্ণিত আহুরা-মাজ্‌দা'র অপর নাম—'বরণ'। 'বোখাজ-কোঈ লেখ'-তেও এই দেবতার উল্লেখ রয়েছে। মিত্র'র দৈবী রূপটিও ইরাণীয় সংস্কৃতির সাথে জড়িত। *ঋগ্বেদ*-এর বরুণ দেবতাদের সম্রাট। তিনি উজ্জ্বল সুবর্ণ বেশ পরিধান করেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রের অধিপতি। বরুণ নীতিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর বহু চক্ষু, তাই তিনি 'উরুচক্ষস্'। এর সঙ্গেই জড়িত সর্বোচ্চ ধর্মযাজকরূপে বরুণের কল্পনা। বৈদিক সমাজে রাজশক্তির উত্থানে রাজার ধর্মযাজকরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার বরুণের কল্পনা থেকে উদ্ভূত।

রাজশক্তির অপর দিকটি, অর্থাৎ যুদ্ধবৃত্তির দিকটি 'ইন্দ্র' কল্পনায় পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ সমগ্র দেবতার মধ্যে সর্বপ্রধান ও জনপ্রিয় দেবতা ইন্দ্র। সব থেকে বেশি উল্লিখিত এই ইন্দ্রের স্বরূপটি মানবসত্তার সঙ্গে জড়িত। তিনি সুগঠিত মুখায়বসম্পন্ন প্রকল্প শক্তিমান মানবরূপে বর্ণিত। তিনি সাহসী এবং দিব্যকান্তি। তিনি শক্তিশালী অশ্ববাহিত যানে চলাফেরা করেন। তিনি শত্রুর গাভী জয় করে এনে তার উপাসকদের দান করেন। তিনিই সমস্ত পৃথিবীর খাদ্য পূর্ণ করেছেন। ইন্দ্র রাজা সুদসকে দাশরাজের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বরুণ এ কার্যে তাঁকে সহায়তা করেছেন। সার্বভৌমত্বের প্রতীক বরুণ ও যুদ্ধ ও শক্তির দেবতা ইন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক সমাজে প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইন্দ্রের বর্ণনায় ঋগ্বৈদিক আর্যদের যুদ্ধের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু চিত্র পাওয়া যায়। আর্যভাষী কৌম বা গোষ্ঠীদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ইন্দ্র প্রায়শই পূজিত হচ্ছেন যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য। শুধু রাজা সুদাস নয়, ইন্দ্র নামি'কেও রক্ষা করেছেন নামুচি দানবের হাত থেকে। তিনি একশত নগরী জয় করেছেন। ইন্দ্র দ্যোতনের পক্ষে যুদ্ধ করে বেতসু দশোনি, তুগ্র, ইভ এবং তুতুজিকে বশ করেছেন। ধুনি যে জলের প্রবাহ রোধ করেছিলেন ইন্দ্র তা মুক্ত করেছেন এবং তুর্বশ ও যদু সম্পর্কে সমুদ্র পার হতে সাহায্য করেছেন। ইন্দ্রর যুদ্ধ-বৃত্তির পটভূমিটি ঐতিহাসিক বলে ধরে নেওয়া যায়। এই বর্ণনাগুলিতে ঋগ্বৈদিক আর্যগোষ্ঠীরও কিছু কিছু নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া, প্রাগার্য হরপ্পীয় সভ্যতার কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে। যেমন, একস্থানে বর্ণনা রয়েছে ইন্দ্র যখন বরশিখ নামক অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যাত্রা করে বৃচীবৎকে হত্যা করেছিলেন তখন তাঁর বজ্রের দারুণ নির্ঘোষে হরিয়ূপীয়া নগরীর অপর প্রান্তে বরশিখের এক পুত্রের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিকগণ এই হরিয়ূপীয়া নগরীটিকে হরপ্পা নগরীরূপে চিহ্নিত করেন। ইন্দ্রর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল অসুর নিধন এবং এ ক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। শুষ্ম ও পিপ্রু নামক অসুরদের ইন্দ্র মায়াজালে হত্যা করেছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এ বহুবার বলা হয়েছে, ইন্দ্র অহিকে বধ করে জলের ধারা বা সপ্তনদী মুক্ত করেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে 'অহি' একটি সর্পরূপ এবং ঋগ্বৈদিক সাহিত্যে অহি'র অর্থ সম্ভবত বাঁধ বা পাশ। ইন্দ্র এই পাশ বা বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। সম্ভবত অহি বা বৃত্র নামে উল্লিখিত অহি এবং বৃত্র আসলে হরপ্পীয় যুগে নির্মিত জলবাঁধ। ডি ডি কোশাম্বীর মতে ইন্দ্র যে বৃত্রের কবল থেকে নদীগুলিকে মুক্ত করেছিলেন সেই বৃত্রের যথার্থ অর্থ বাঁধ। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত হয়েছে—যখন বৃত্রকে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করলেন তখন

ধরিত্রী কেঁপে উঠল, রথের চাকার ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়ল এবং বৃত্রাসুরের ভূপাতিত নিষ্প্রাণ দেহের উপর দিয়ে জলের ধারা বয়ে গেল। এই বর্ণনায় একটি বাঁধ ভেঙে পড়ার ছবি পাওয়া যায়। এইভাবে ইন্দ্রর রূপকল্পে দেখা যাচ্ছে মানবশক্তি ও ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের সমন্বয়। ঋগ্বৈদিক যুগে, যখন আর্যরা নিরন্তর তাঁদের আর্থসামাজিক ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন, তখন ইন্দ্রর মতো একটি দৈবী মানবের কল্পনার প্রয়োজন ছিল আত্মবিশ্বাস গঠনের জন্য।

ঋগ্বেদ-এর অপর মুখ্য দেবতা অগ্নি। আর্য-গার্হস্থ্যজীবনের কেন্দ্রে অগ্নির অবস্থান। তিনি গৃহদেবতা প্রাগ্‌ঋগ্বৈদিক যুগের আভাস পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এর আপ্রীসূক্তে। অগ্নিকে এখানে বিভিন্ন নামে ও ভূমিকায় আহ্বান করা হয়েছে। যেমন—*ঋগ্বেদ*-এর প্রথম মণ্ডলে অগ্নিকে বার্তাবাহী, পথপ্রদর্শক ও সমস্ত সম্পদের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নিকে এখানে 'নরাশংস' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরেকটি অভিধা পাওয়া যায়—'তনূনপাৎ'। 'তনূনপাৎ' রূপে অগ্নি সোমরসকে পবিত্র করেন। জাজ্বল্যমান অগ্নির উজ্জ্বল সুন্দর রূপের বর্ণনা রয়েছে *ঋগ্বেদ*-এর আপ্রীসূক্তে। অগ্নি এখানে অতন্দ্র ও দীপ্যমান প্রহরী। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে আদিম যুগের মানুষের জীবনে আগুনের ব্যবহার যে নিরাপত্তা ও সুবিধা দিয়েছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল মানব সমাজে। *ঋগ্বেদ*--এর এই অংশগুলিতে অগ্নির আরাধনায় আদি মানুষের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাই প্রকাশিত। পরবর্তী বৈদিক ধর্মভাবনায় অগ্নির ভূমিকা যজ্ঞাগ্নির মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছিল। *ঋগ্বেদ*-এর অন্য অংশেও অগ্নির উল্লেখ বারংবার হয়েছে। তিনি সূর্যাকে অশ্বিনীদ্বয়ের হাতে কন্যাদান করেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি বরুণ ও যমের সঙ্গে একসাথে উল্লিখিত। সোম হলেন অপর দেবতা যিনি *ঋগ্বেদ*-এ অগ্নির মতো মাহাত্ম্যশালী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ধর্মীয় ভাবনার সোমদেবরূপে গৌণ, যদিও সোমযজ্ঞের মাহাত্ম্য তখনো বর্তমান। *ঋগ্বেদ*-এর সমগ্র নবম মণ্ডল সোমদেবতার প্রতি নিবেদিত। সোমদেবতার রূপকল্প সোমরসও তার মাদক শক্তি থেকে উৎপন্ন। এই পানীয়ের উত্তেজক ও বলবর্ধক শক্তি ঋগ্বৈদিক মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল। দীর্ঘায়ু লাভের জন্যও এই পানীয় ব্যবহার করা হত। এই ভাবনায় ইরাণীয় ও ব্যাবিলনীয় কিংবদন্তীর ছায়া রয়েছে। আবেস্তায় 'হত্তম' পানীয় ও ব্যাবিলনীয় প্রত্নকথার দীর্ঘায়ুপ্রদ যাদুলতা সোমরসের সঙ্গে তুলনীয়।

সবক্ষেত্রেই ঐন্দ্রজালিক বা দৈব শক্তির উল্লেখ রয়েছে। সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধু, যবচূর্ণ ইত্যাদি মিশিয়ে তার মাদকতা-শক্তিকে বর্ধিত করা হত। সোমরস আনুষ্ঠানিক ভাবে যজ্ঞের মাধ্যমে প্রস্তুত হত এবং এই যজ্ঞ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঋগ্বৈদিক জীবনে। এর সঙ্গে ইন্দ্রজাল ও রহস্যের সংযোজন ঘটলে এই উদ্ভিজ্জ পানীয়টি দৈব্য সত্তায় পরিণত হল—'সোমদেব', 'রাজা', 'সম্রাট' ইত্যাদি রূপে।

সোম সর্বস্তর অধিকারী এবং সর্বজতের রাজা। সোমরসের বলবর্ধক ক্ষমতা সম্বন্ধে নবম মণ্ডলে বলা হয়েছে—বৃত্ত সংহারে উদ্যত ইন্দ্রকে সোম পানীয় প্রদান করেছেন। প্রার্থনা করা হয়েছে, রাজকুমার ও রাজন্যবর্গের সবাই যেন এই উজ্জ্বলবর্ণ, শক্তিবর্ধক পানীয় সোমদেবকে অর্জন করেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও দেখা যায় সোমযজ্ঞের গুরুত্ব একই ধারায় বর্তমান। সোমযাগ দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষ ধরে অনুষ্ঠিত হত। অবশ্য সোমরস প্রস্তুত এবং পান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সোমকে বারবার অতিথি ও রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে সোমযাগের জনপ্রিয়তা সম্ভবত হ্রাস পেয়েছিল এর পরবর্তী কালে।

সৌর দেবতাদের মধ্যে বহু কল্পরূপ ও নাম পাওয়া যায় যা একে অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্যের কথা *ঋগ্বেদ*-এ রয়েছে। তিনি হিরণ্য বর্ণ এবং সুবর্ণরথে চলাচল করেন। তিনি আকাশকে ধারণ করে আছেন। সবিতৃর রূপকল্পটি সূর্যের মতোই হিরণ্য-বর্ণ। তবে সূর্যের রূপসৃষ্টিতে প্রাকৃতিক শক্তির যে বস্তুমুখী আভাস রয়েছে, সবিতৃর কল্পনায় তা ভাবনার স্তরে উপনীত। সবিতৃ সুবর্ণ-বাহু ও সুবর্ণ-চক্ষুবিশিষ্ট। তিনি সর্বোচ্চ স্বর্গলোকের অধীশ্বর। তাঁর উপাসক ভক্তগণ এই উচ্চলোকের অধিবাসী হবেন। তিনি প্রশস্ত-বাহু। তাঁর বেশভূষা পীতবর্ণের। তিনি ক্ষিপ্র, রোহিত অশ্ববাহী সুবর্ণরথে চলাচল করেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সকল জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি বাহু প্রসারিত করে নদীগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট পথে বাহিত করেন। জীর্ণ প্রাণকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গৌণ দেবতা মিত্র, ভগ, দক্ষ, অর্যমা, পূষা বা পূষণ ও বিষ্ণু। এর মধ্যে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পরবর্তী সাহিত্যে বৃদ্ধি পায় এবং পূষা/পূষণ ও মিত্র অবলুপ্ত হন। ভগ *ঋগ্বেদ*-এ ও *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-এ উল্লিখিত। দক্ষের কল্পনায় সৃষ্টিকর্তারূপী সূর্যের প্রভাব পাওয়া যায়। মার্তণ্ড, বিবস্বৎ ও অর্যমন আদি সৃষ্টিকর্তা আদিত্য রূপে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত। তবে সৌরমণ্ডলের দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুর ভূমিকা *ঋগ্বেদ*-এ নিতান্তই গৌণ। সমগ্র *ঋগ্বেদ*-এ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত মাত্র তিনটি শ্লোক পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় যে, বিষ্ণুর মধ্যে সূর্যের ত্রিবিধ গতির প্রকাশ ঘটেছে বলে *ঋগ্বেদ*-এ চিন্তা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তা ছাড়া, বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের বর্ণনা *ঋগ্বেদ*-এ বারংবার পাওয়া যায়। তবে বিষ্ণুর বামনাবতারের রূপটি *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায় না। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ বামনরূপী বিষ্ণুর কল্পনায় অনার্য বিশ্বাসের ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া, বিষ্ণুর বরাহ রূপটিও *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ রয়েছে। মীনরূপটি প্রথমে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিষ্ণুর সঙ্গে এর সরাসরি সংযোগ ঘটেনি। বিষ্ণুর রূপটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করেছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আর্য ও অনার্য উপজাতিগুলির মিশ্রণের ফলবশত ধর্মবিশ্বাসের আদানপ্রদানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ও *ব্রাহ্মণ*-এ বারংবার বিষ্ণুকে যজ্ঞের অধিষ্ঠিত দেবতারূপে অভিহিত করা হয়েছে। যজ্ঞ-বিষ্ণু-রূপটি *জৈমিনী ব্রাহ্মণ*-এ পাওয়া যায়।

অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব রুদ্রের কল্পনাতেও রয়েছে। তাম্রবর্ণ, কপর্দিন বা জটাধারী, সুগঠিত চোয়াল-বিশিষ্ট রুদ্র বহুরূপ ধারণ করেন। তিনি শক্তিশালী ও ভয়ানক। *ঋগ্বেদ*-এর রুদ্র দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের রক্ষা করেন। তিনি গবাদিপশু, নারী ও পুরুষের রক্ষাকর্তা। *ঋগ্বেদ*-এর বেশিরভাগ শ্লোকেই তাঁকে গবাদি পশুর দেবতারূপে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রুদ্রের রুদ্ররূপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি রোহিত বা কপিলবর্ণ, নীলকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ এবং হিরণ্যবাহু। তিনি ব্যোমকেশ, বামন এবং বৃদ্ধ বলেও বর্ণিত।

গবাদি পশুর দেবতারূপে রুদ্র পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। গবাদি পশুর মঙ্গলসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত নাভানেদিষ্ঠ যজ্ঞের গ্রহীতারূপে রুদ্রের আবির্ভাব, *তৈত্তিরীয় সংহিতা* এবং *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* রুদ্র পূজার প্রচলনকে নির্দেশ করে। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ রুদ্রকে অগ্নি শিবকৃত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই রূপ ধারণে রুদ্র গবাদি পশুর হিতসাধনে নয়, অমঙ্গল করেন। *ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ*-এ তাই তাঁর প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তিনি যজমানের পশুদের বিনষ্ট না করেন। *ঋগ্বেদ*-এর হিতকারী রুদ্র পরবর্তী *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে বিধ্বংসীরূপে পরিবেশিত। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ তিনি অগ্নিরূপে বর্ণিত, তাঁর ত্রিমুখী অস্ত্র এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তিনি ভয়ঙ্কর। রুদ্রের সঙ্গে শিবের সংযোজনও ঘটে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। এর ফলে—যে রুদ্র *ঋগ্বেদ*-এ একটি গৌণ

ভূমিকায় ছিলেন তিনি রুদ্র-শিব যুগ্মরূপে মহাকাল, তিনি রুদ্র ও ঈশানরূপেও উত্তর-পূর্ব কোণের অধিপতি এবং যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মৃত্যুর দেবতারূপেও স্থান অধিকাল করেছেন। রুদ্র-শিবের বর্ণনায় বহুল পরিমাণে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে যে সব দেবীর কল্পনা পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই কোনো দেবতার সঙ্গে যুগ্মভাবে উপস্থাপিত। যেমন—সবথেকে প্রাচীন দেবী মাতা পৃথিবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি পিতা দ্যৌ অর্থাৎ আকাশের দেবতার সাথে সংযুক্ত। দেবতাদের তুলনায় দেবীর ভূমিকা বৈদিক ধর্মে গৌণ। সকল দেবতা যা থেকে জাত সেই দেবমাতা অদিতি'র উপস্থাপনা প্রয়োজনীয় ছিল; কারণ জন্মগ্রহণের রহস্যটি মাতার উপস্থিতি ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু দেবসন্তানের জন্মদাত্রী ছাড়া দেবীরূপে অদিতির কোনো বিশেষ ভূমিকা নির্ধারিত নেই বৈদিক সাহিত্যে। যেটুকু পরিচয় রয়েছে তা ঋগ্বেদ-এ প্রাপ্ত। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত অদিতি মানুষকে আনন্দ, সুখসমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু দান করেন। কিন্তু আদিত্যদের মাতারূপে অদিতি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনুপস্থিত।

ঋগ্বেদ-এ বর্ণিত ঊষা দেবীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। কুড়িটি শ্লোকে ঊষার উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে। তিনি কখনো সম্পূর্ণ একা এবং কখনো অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে উপস্থাপিত, তিনি আকাশের কন্যা, সুন্দরী যুবতী যিনি—সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করেন, মানবজগতের নিদ্রা মোচন করে খাদ্য ও সম্পদ দান করেন। তিনি বৃদ্ধাও বটে অথচ চিরনবীনা। তিনি স্বসর অর্থাৎ সূর্যের কন্যা,স্ত্রী বা ভগ্নীরূপে বিভিন্ন শ্লোকে বর্ণিত। তবে ঊষার উপস্থাপনা সর্বদাই কোন দেবতার কন্যা, প্রিয়া বা বধূরূপেই হয়েছে। কুমারী রূপটিই *ঋগ্বেদ*-এ সবথেকে বেশি প্রদর্শিত। সৌরমণ্ডলের অপর দেবী সূর্যা গৌণ। মাত্র কয়েকটি শ্লোকেই তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তিনি সূর্যের পুত্রী এবং সোমকে তিনি তাঁর নিজের কেশ দিয়ে পবিত্র করেন। পরবর্তী কালে অশ্বিনীদ্বয়ের সূর্যাকে রথচালনায় জয় করার কাহিনীটি *কৌষাতকি ব্রাহ্মণ*-এ উপস্থিত। এখানে দেবী-মাহাত্ম্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

অপরদিকে, সরস্বতী রূপকল্পটি নদী থেকে দেবীতে পরিণত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। *ঋগ্বেদ*-এ নদীরূপে তিনি ইরা, ভারতী, হোত্রা, বরূত্রি ও ধিষণার সঙ্গে পূজিত হয়েছেন। সম্ভবত ব্যাধিনিয়ামক শক্তির জন্য সরস্বতীকেও অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে। *অথর্ববেদ*-এও তাঁকে শিশুদের রোগ নিরাময় করতে দেখা যায়। তবে নদীরূপে তিনি সমৃদ্ধি, সন্তান ও শক্তিদান করেন। তাঁর উপাসকদের তিনি শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি সর্বপ্রধানা নদী, দেবী ও মাতা। তবুও তিনি বিদ্যুতের কন্যা (পাবিরবি কন্যা) ও বীর পত্নীরূপে উপস্থাপিত। এ ছাড়া, সরস্বতীর স্বামীরূপে সারস্বত নামক এক নতুন দেবতার সৃষ্টি বৈদিক ধর্মে তথা সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের দিকটি তুলে ধরেছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীকে বেদমাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঠিক এই অভিধা বাক্‌দেবীর ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ মানবী সত্তা থেকে দেবীতে রূপান্তরিত। বাক্ অর্থাৎ মুখোদ্‌গত বা মুখনিঃসৃত বাক্য ও চিন্তার অধীশ্বর। *ঋগ্বেদ*-এর পরবর্তী অংশ দশম মণ্ডলেই তাঁর যথার্থ মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি তাঁর নিজের গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন—রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বে দেবগণের সঙ্গে তিনি সহাবস্থান করেন। তিনি মিত্র (সূর্য) ও বরুণ (সমুদ্র), ইন্দ্র (আকাশী), অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করে আছেন। তিনি অধীশ্বরী, তিনি সম্পদ দান করেন। তিনি জ্ঞানের অধিকারিণী এবং তিনিই জ্ঞান বিতরণ করেন। তিনি দেব এবং মানব দুইয়ের দ্বারাই পূজিত। তিনি ব্রাহ্মণ, ঋষি

ও গুণশালী ব্যক্তি—সকল মানুষকেই অপরিসীম শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি রুদ্রের ধনুকে ছিলা প্রসারিত করে তাঁকে শত্রু দমনে সহায়তা করেন। তিনিই বায়ুর ন্যায় শ্বাস প্রক্রিয়ায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে গতিশীল করে তোলেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই অসামান্য শক্তিশালী দেবীর সঙ্গে রূপকল্পে যুক্ত হন সরস্বতী। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বহুবার সরস্বতী ও বাক্-সত্তারূপে পরিবেশিত—"সরস্বীত্য পিন্বস্বেতিঃ বাগ্বৈ সরস্বতী"—অর্থাৎ সরস্বতীতে বহমানা হও, সরস্বতী নিশ্চিতরূপেই বাক্। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এও বাক্ অবিনশ্বর সকল অনুষ্ঠানের অগ্রজা, বেদমাতা এবং অমৃত্যুর কেন্দ্রবিন্দুরূপে বর্ণিত। *যজুর্বেদ*-এও সরস্বতী ও বাক্দেবীকে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু শক্তির মাহাত্ম্যে ও জনপ্রিয়তায় বাক্দেবী বা সরস্বতী, ঊষা বা অদিতির মতোই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে উত্থিত রুদ্র বা বিষ্ণুর তুলনায় গৌণ। তবুও তুলনামূলকভাবে ঋগ্বৈদিক সমাজ থেকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত *ব্রাহ্মণ্য* গুলিতে, দেবী ও মাতৃপূজার উপস্থাপনা অনেক বেশি লক্ষণীয়। *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে নির্ঋাতি, শচী, যমী, অম্বিবকা, রুদ্রাণী, শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীর মাতৃদেবীরূপে পুনরাবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে এই ধারাটি অনার্য সংস্কৃতির প্রভাবের ফসল। দেবী কল্পনায়, বিশেষ করে নিঋতির অন্ধকার রূপটি দেবী মাতৃকার নেতিবাচক ভূমিকাটি তুলে ধরে। নির্ঋতি পৃথিবীর দেবী। তিনি ধ্বংস করেন, তিনি যন্ত্রণাও দেন এবং মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যান। তবে এই শক্তিশালী রূপটি থেকে পরবর্তী বৈদিক সমাজে বাস্তব ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করলে ভুল হবে। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাতৃদেবীদের এই সংযোজন দেবতাদের সঙ্গিনী ও সহধর্মিণীরূপেই। এর দ্বারা দৈবী শক্তি ও বিশ্বাসকে জনপ্রিয়তার স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। আর্য-অনার্য সমাজে সংস্কৃতির মানুষজনের ক্রমবর্ধমান আগমন ও সংযোজনের ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের এই সমন্বয় ও পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

২গ.২ ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানের প্রাধান্য

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির নিরন্তন সমন্বয় ও সংশ্লেষণের চিত্রটি পরিষ্কার। উন্নত কৃষিকার্য ও শিল্পের ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ ও জনসংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। সমাজে সম্পদশালী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে ও শ্রেণী-বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রমবিভাজন এই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। কৃষিকার্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শ্রমদানের ভার বৈশ্য ও শূদ্রের উপর ন্যস্ত হল। অল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এঁরাই রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সমাজের বিত্তশালী, ক্ষমতাবান মানুষেরা যাগযজ্ঞাদি ব্যয়সাপেক্ষ অনুষ্ঠানের সম্পাদনে অংশগ্রহণ করেন। যাগযজ্ঞাদির বাহুল্য ও আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়, দক্ষিণার গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং পুরোহিত-শ্রেণীর ক্রমিক উত্থান ঘটে। সমাজে আধ্যাত্মিক অভিভাবকরূপে এই সম্প্রদায় সমস্ত মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিকেও—এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সুনিয়ন্ত্রিত, সুনির্দিষ্ট ও জটিল করে তোলা হয়। বেদ ও শস্ত্রচর্চা প্রধানত ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় তাঁদের এই কর্তৃত্ব বজায় থাকে। সমাজের অপরদিকে, রাজনৈতিক শক্তির উত্থানেও ব্রাহ্মণ-বর্ণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছিল। *যজুর্বেদ*-এ বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং *অথর্ববেদ*-এ অভিষেক ও যুদ্ধাভিযান বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি, সমাজে রাজশক্তির প্রতিষ্ঠালাভের পিছনে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত-সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক সহায়তাদানের দিকটি সুস্পষ্ট করে তোলে। এই অনুষ্ঠানগুলি জটিলতর, ব্যাপকতর ও গূঢ় অর্থবহ হয়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। সহজবোধ্য না হওয়ার ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণের কাছে রহস্যময় হয়ে ওঠে এবং এগুলি আধিদৈবিক ও ঐন্দ্রজালিক মাত্রা পায়। এর ফলে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীকি দিকটি সহজেই সমাজের সাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ব্যবহার করতে সমর্থ হন। এর সাথে আর এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় অথর্ববেদে। এই সংহিতার বিভিন্ন সূত্রগুলি—সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী ও গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করেছে। এর মধ্যে ব্যাধি নিরাময়, পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি ও গূঢ়বিদ্যাসংক্রান্ত সূক্তগুলিতে ইন্দ্রজাল ও ধর্মের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা, রক্ষাকবচ, প্রলেপ, মায়াজ্ঞান ইত্যাদির ব্যবহার, যাদুর প্রচলন সূচিত করে। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এই যাদুর ব্যবহার পুরোহিতবর্গের ক্ষমতা আরও বর্ধিত করে। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চ শ্রেণী থেকে দরিদ্র, সমস্ত স্তরেই নির্বিশেষে এই স্তরনির্বিশেষে এই যাদু-প্রক্রিয়া ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বিধিমত যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করলে মানুষ প্রকৃতি ও দেবতার দাক্ষিণ্য লাভ করবে। দেবতা এবং যজ্ঞাদি ও তৎসহ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বৈদিক ধর্ম-ভাবনার পরিণতি লক্ষ্য করা যায় এই সাহিত্যে। উল্লেখযোগ্য যে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি 'ব্রহ্মণ' শব্দ থেকে জাত, যার অর্থ হল গূঢ়শক্তিসম্পন্ন শব্দ। মনে করা হত যে, এজাতীয় শব্দে ঐশী ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা রয়েছে। এই শব্দ উচ্চারণে আরোগ্যলাভ ঘটে, শক্তিবৃদ্ধি হয় ও এগুলির দ্বারা সাধারণ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি যিনি উচ্চারণ করবেন তাঁকে বলা হত 'ব্রহ্ম'। প্রধানত প্রবীণ ও সম্মানিত শিক্ষকদের দ্বারাই এগুলি উচ্চারিত হত এবং এঁদের দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হত। এই ব্রাহ্মণগুলির অন্তর্গত ছিল দেবকাহিনী। বিভিন্ন পুরোহিত পরিবার, বংশ-পরম্পরায়, ধারাবাহিক ভাবে, পূর্বকথিত কাহিনী প্রাজ্ঞোক্তি, নীতিজ্ঞান, আপ্তবাক্য এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নির্দেশাবলী, যজ্ঞাদির ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সংগ্রহ ও সূচীবদ্ধ করে তুলেছিল এই ব্রাহ্মণগুলিতে। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ আচার্য সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বৈদিক ধর্ম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষার্ধে এই রচনায় বৈদিক ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে অনার্য-ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির আভাসও সুস্পষ্টরূপে বর্তমান। যেমন *কৌষীতকি ব্রাহ্মণ*-এ ঈশানে মহাদেবের উল্লেখ। ষড়্‌বিংশ *ব্রাহ্মণ*-এ বিনাশাত্মক ইন্দ্রজালের ব্যবহার বা 'স্বাহা'-কে দেবীরূপে গণ্য করার প্রচলনটি দেখা যায়। *শতপথব্রাহ্মণ*-এ বৈশবর্ণের মতো উপদেবতা ও পিশাচযোনির উল্লেখও আর্যদের ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার বর্ণনা—এই পরিবর্তন ও সমন্বয়ের দিকটিকে তুলে ধরে। তবে এই ধারাটি সবথেকে বেশি প্রকট অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ গোপথ-এ। এতে সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ ও পুরাণ-এর অন্তর্ভুক্তি এই দিকেরই নির্দেশ করে। পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে অথর্ববেদে ও গোপথব্রাহ্মণের নিবিড় সম্পর্ক থাকার জন্যই—বাস্তব জীবনে উত্তর-ভারতের সমসাময়িক বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলির সমন্বয় ও সহাবস্থানের চিত্রটি পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত।

২গ.৩ ধর্মদর্শন

বৈদিক ধর্মবিশ্বাসে সর্বেশ্বরবাদ বেশি জনপ্রিয় হলেও এই সাহিত্যে একেশ্বরবাদের উপস্থিতি বৈদিক দর্শনের একটি সুচিন্তিত ধারাকে সূচিত করে। *ঋগ্বেদ*-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে, দশম মণ্ডলে, সৃষ্টিতত্ত্বের উপস্থাপনা রয়েছে। এরই সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার কল্পনা রয়েছে যা একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বৈদিক সংহিতা সাহিত্যের মধ্যেও তুলনা করলে দেখা যায়, *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে অনস্তিত্ব থেকে উত্তরণ এবং তৎপূর্ববর্তী সার্বিক শূন্যতার কল্পনায়, দর্শন ও কাব্যিক উৎকর্ষের যে প্রমাণ মেলে তা গভীর। এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনাতেই পরমশ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রূপকল্পনা রয়েছে যা প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মন্, পুরুষ ও পরমাত্মারূপে উপস্থাপিত। পরমস্রষ্টার বিমূর্ত রূপকল্পনা, সৃষ্টির আদিতে মহাশূন্যের উপস্থাপনা এবং সৃষ্টির আদি কণিকারূপে হিরণ্যগর্ভের উদ্ভাসিত রূপকল্প—এসবের মধ্যেই বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম থেকে দর্শনে উত্তরণের ধারাটি পরিলক্ষিত। এমনকী, *ঋগ্বেদ*-এ পুরুষ-সূত্র—যা থেকে প্রথম বর্ণ-ভেদের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলে সচরাচর মনে করা হয়, তা প্রাথমিক ভাবে এক অদ্বিতীয় পুরুষস্রষ্টার রূপ কল্পনা করে তাকে সমস্ত মনুষ্যজগতের উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দুরূপে প্রদর্শন করেছে। পরমাত্মা বা পরমপুরুষের দেহ থেকে জাত মানবসমাজের, পরমাত্মার সাথে একাত্ম-সংযোগের দর্শনটিও এই সূত্রে নিহিত। কিন্তু অন্যদিকে দেহের বিভিন্নাংশ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বর্ণের বিভেদ বর্ণনায় বাস্তবে বৈদিক সমাজের শ্রেণী-ভেদের দিকটিও এই সূত্রে ফুটে উঠেছে।

ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলে যে দর্শনের উন্মেষ ঘটে তা *আরণ্যক সাহিত্যে*-এও প্রতিধ্বনিত এবং উপনিষদে এই ধারা পরিণতি লাভ করে। আরণ্যক যজ্ঞ প্রক্রিয়া ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় প্রতীকের ব্যবহারে উন্নত চিন্তাধারার প্রকাশ হয়েছে। স্বাধ্যয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বারা *ঋগ্বেদ সংহিতা*-র আবৃত্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান ও সত্যবোধ অর্জনের প্রচেষ্টা, জ্ঞান ও দর্শনের স্তরে উন্নীত। সৃষ্টিতত্ত্ব ও হেতুর অন্বেষণ *আরণ্যক*-এ অব্যাহত থাকে, মানুষ জীবন-মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে ব্যগ্র ছিল। 'প্রাণ'-এর অর্থে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল অধ্যাত্ম-দর্শন বিকাশের ফলে। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ 'প্রাণ' স্রষ্টার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এর আরেকটি কারণ ছিল—*অথর্ববেদ সংহিতা*-র সময় থেকে প্রচলিত শারীরবিদ্যা চর্চার বৃদ্ধি। এরই সঙ্গে যুক্ত মৃত্যু ও মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্ভব। *তৈত্তিরীয়* ও *শাঙ্খায়ন আরণ্যক*-এ এর আলোচনা পাওয়া যায়। *আরণ্যক*-এ নতুন সৃজনশীল প্রক্রিয়ারূপে জ্ঞানার্জন ও তপস্যার তাৎপর্য বৃদ্ধি পায়। যজ্ঞানুষ্ঠানের যে জনপ্রিয়তা *যজুর্বেদ, অথর্ববেদ* এবং *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে প্রতীয়মান, *আরণ্যক*-এ তার পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আরণ্যক-এর পরিবর্তিত এই ধারা *উপনিষদ*-এ পরিণতি লাভ করে। *উপনিষদ*-এ যজ্ঞের উপযোগিতা সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটতে দেখা যায়। জ্ঞানলব্ধ পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে উপনিষদে। এ ছাড়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও অতিলৌকিক অস্তিত্ব, কর্মবাদ ও দেহান্তর গ্রহণ-সম্পর্কেও অধ্যাত্ম-চেতনা ও কৌতূহল লক্ষণীয় *শুক্লযর্জুবেদ*-এর অন্তর্গত *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ প্রাণ, মৃত্যু ও পুরুষের তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। *সামবেদ*-এর অন্তর্গত *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও অধ্যাত্মবাদী বিবরণ রয়েছে। এই উপনিষদেই সেই মহাবাক্যটি উল্লিখিত যা আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিক সেতু রচনা করেছে—'তৎ ত্বম্ অসি'। আরুণি ও শ্বেতকেতুর সংলাপের মাধ্যমে বৈদিক দর্শনের একটি চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এই

সংলাপের মাধ্যমে আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতুকে অস্তিত্বের চরম সত্য ও সৃষ্টির পরম রহস্য সম্বন্ধে পরিচয় দেন যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছয়। *ঐতরের উপরিষদ*-এ সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা, সৃষ্টির পর্যায়ক্রমে ও বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এ পরমসষ্টা ব্রহ্মার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান বর্ণিত। এ ছাড়া—জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিও আলোচিত। উপনিষদের এই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক প্রবণতারই ফসল খৃষ্টপর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সহ বেশ কয়েকটি প্রতিবাদী ধর্মীয় চিন্তাধারার উদ্ভব। সমকালীন সমাজে সাধারণ জীবনে অর্থনীতির প্রসার ও রাজনৈতিক সংগঠনের ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ক্রমে রূপায়িত হচ্ছিল, তারই প্রতিফলন অধ্যাত্ম চেতনায় পরিলক্ষিত।

২গ.৪ অনুশীলনী

১। বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ আলোচনা করুন।

২। পরবর্তী বৈদিক সমাজের ধর্মীয় চিন্তাধারায় সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের রূপটি তুলে ধরুন।

৩। ধর্ম থেকে দর্শন—বিবর্তনের ধারাটি বৈদিক সাহিত্যে কীভাবে পরিলক্ষিত হয়—ব্যাখ্যা করুন।

২গ.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। রমেশ মজুমদার ঃ *দ্যা ভেদিক্ এজ্ (১৯৫১)*

২। অবিনাশ চন্দ্র দাস ঃ *ঋগ্‌ভেদিক্ কালচার (১৯২৫)*

৩। রমেশ শর্মা ঃ *মেটেরিয়াল কালচার এ্যান্ড সোশাল ফরমেশন ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৮৩); অ্যাসপেক্ট অফ্ পলিটিক্যাল আইডিয়াস এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৫৯/১৯৬৮)*

৪। ব্রজদেও প্রসাদ রয় ঃ *লেটার বেদিক ইকোনমি (১৯৮৪)*

৫। রোমিলা থাপার ঃ *ফ্রম লিনিএজ টু স্টেট (১৯৯০)*

৬। রনবীর চক্রবর্তী ঃ *অয়ারফেয়ার ফর ওয়েলথ : আর্লি ইন্ডিয়ান পার্সপেকটিভ (১৯১২)*

৭। এ. এ. ম্যাকডোনাল ও এ. বি. কিথ ঃ *দ্য ভেদিক্ ইনডেক্স্ অফ নেমস এ্যান্ড সাবজেক্টস (১৯১২)*

৮। বি. বরুয়া ঃ *এ হিস্ট্রী অফ্ প্রি বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়ান ফিলোসফি (১৯২১)*

৯। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য ঃ *দ্যা ইন্ডিয়ান থিওগনি (১৯৭৮)*

১০। এন. এন. ভট্টাচার্য্য ঃ *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান রিচুয়ালস্ এ্যান্ড দেয়ার সোশাল কনটেন্টস (১৯৭৫)।*

একক ৩ক ❑ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতে মহাজনপদগুলির অবস্থা ও মগধের উত্থান (নন্দবংশ পর্যন্ত)

গঠন

৩ক.০ উদ্দেশ্য

৩ক.১ প্রস্তাবনা

৩ক.২ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

৩ক.৩ মগধের উত্থান

৩ক.৪ অজাতশত্রু (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩-৪৬২ অব্দ) কুণিক

৩ক.৫ নন্দবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৪-৩২৪ অব্দ)

৩ক.৬ অনুশীলনী

৩ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩ক.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা
- মহাজনপদ হিসাবে মগধের উত্থানের কারণসমূহ
- নন্দবংশ পর্যন্ত মগধের বিভিন্ন বংশের শাসনকালে মগধের অবস্থা

৩ক.১ প্রস্তাবনা

আপনি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী। এই এককে আপনার জন্য আলোচিত হবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল। এই প্রসঙ্গে আপনি জানতে পারবেন তৎকালীন ভারতের প্রধান প্রধান মহাজনপদ কোন্‌গুলি ছিল, তাদের অভ্যুত্থানই বা হল কিভাবে।

মহাজনপদগুলির মধ্যে আবার মগধেই কেন একটি সাম্রাজ্যের অনুকূল পটভূমি প্রস্তুত হল তাও এই এককে আলোচিত হবে। এই এককের পরিধিতে আরো জানতে পারবেন নন্দবংশের শাসনকাল পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্যের ক্রমবিকাশের কাহিনী। প্রথমে হর্যঙ্কবংশীয় রাজা বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকাল, তারপর শৈশুনাগবংশ শেষে মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকালে নন্দবংশ তথা মগধের সম্প্রসারণের ইতিহাস এই এককে আলোচিত হবে।

৩ক.২ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সাধারণভাবে শুরু করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কী ছিল, তা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় না। এজন্য *বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকয়* এবং *জৈন ভাগবতী সূত্ত*-র সাহায্য নিতে হয়। এই দুইটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ভারতে তখন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। একটি অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের পরিবর্তে সেখানে ষোলোটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অথবা মহাজনপদ ছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন দুইটি গ্রন্থেই ষোড়শ মহাজনপদগুলির নামের তালিকা পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থটিতে যে তালিকা আছে, তাতে ভারতের দূরপ্রাচ্য এবং সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের মহাজনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা থেকে মনে হয় যে, এই তালিকা পরবর্তীকালের। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বৌদ্ধ তালিকাকে তাই অধিকতর প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

বৌদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকয়-তে যে ষোলোটি মহাজনপদের উল্লেখ আছে, সেগুলি হল কাশী, অঙ্গ, মগধ, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেনা, অস্মক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ।

এই মহাজনপদগুলির মধ্যে প্রথম দিকে সম্ভবত কাশী ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এর রাজধানী ছিল বারাণসী। বিভিন্ন জাতকে নগরীর শ্রেষ্ঠত্বের এবং এখানকার শাসকদের সাম্রাজ্যলিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়।

কোশল একটি বৃহৎ রাজ্য ছিল। এতে অযোধ্যা, সাকেত এবং শ্রাবস্তী এই তিনটি নগর ছিল। অযোধ্যা ছিল সরযূ নদীর তীরবর্তী একটি শহর। অযোধ্যা এবং সাকেত-কে অনেক সময় অভিন্ন মনে করা হয়। কিন্তু রিস ডেভিডস উল্লেখ করেছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময় দুইটি শহরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেথ-মাহেথ। এর অবস্থান ছিল রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তীরে।

অঙ্গরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল মগধের পূর্বে। চম্পা নদী মগধ এবং অঙ্গের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছিল। চম্পা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত চম্পানগরী এর রাজধানী ছিল। কানিংহামের মতানুসারে ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাপুর এবং চম্পানগর গ্রাম দুইটি এই প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি বহন করছে। অঙ্গ এবং মগধের মধ্যে তখন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সংগ্রাম চলছিল। অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত তাঁর সমসাময়িক মগধের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিম্বিসার এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

মগধ বলতে বর্তমান দক্ষিণ বিহারের পাটনা এবং গয়া জেলাকে বোঝাত। গয়ার নিকটবর্তী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ এর রাজধানী ছিল।

রিস ডেভিডস এবং কানিংহামের মতানুসারে আটটি মৈত্রীবন্ধ গোষ্ঠী (অঠ্ঠকুল) বজ্জির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিদেহগণ, লিচ্ছবিগণ, জ্ঞাতৃকগণ এবং বজ্জি প্রধান। অবশিষ্ট গোষ্ঠীগুলির পরিচয় নিশ্চিত জানা যায় না। সম্ভবত নেপাল সীমান্তে মিথিলা বিদেহীদের রাজধানী ছিল। লিচ্ছবিগণের রাজধানী ছিল মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বৈশালী বা বেসার। মহাবীর জৈন এবং তাঁর পিতা জ্ঞাতৃক কুলজাত ছিলেন। বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডপুর এবং কোল্লগ জ্ঞাতৃকগণের বাসভূমি ছিল। বজ্জি শুধুমাত্র মিত্রসঙ্ঘের নাম ছিল না। মিত্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম গোষ্ঠীর নামও ছিল বজ্জি। লিচ্ছবিদের মত, বজ্জিদের নামও বৈশালী নগরের সঙ্গে জড়িত। তাই বৈশালী শুধু বজ্জিদের নয়, মিলিত অষ্টকুলের রাজধানী ছিল। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিদেহ রাজবংশের

পতনের পর বজ্জি মিত্রসঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল। ড. রায়চৌধুরী এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিবর্তনের দিক থেকে প্রাচীন ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের মতো গ্রীসেও হোমরীয় যুগের রাজতন্ত্রের পর অভিজাত প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

একদা অনেক ঐতিহাসিক লিচ্ছবিদের বিদেশী মনে করতেন। ভিন্‌সেন্ট স্মিথের মতে ওরা ছিল তিব্বতের লোক; ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে, পারস্যের। এই মতবাদগুলি এখন গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এ বিষয়ে একমত যে, লিচ্ছবিগণ ক্ষত্রিয় ছিল। মহাপরিনির্ব্বাণসুত্ত-এ আছে যে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর লিচ্ছবিরা মল্লদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলেছিল যে, বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তারাও তাই। মনুতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। অঙ্গ-র মতো বৈশালীও মগধের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

মল্লদের অধিকৃত অঞ্চল তখন দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশের রাজধানী ছিল কুশিনারা বা কুশীনগর, অপর অংশের, পাবা। কুশীনগরের সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল বলা যায় না। এ বিষয়ে উইলসনের মত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মনে করা যায়। কানিংহামও এই মত সমর্থন করেন। তাঁর মত অনুসারে গোরক্ষপুর জেলার পূর্বে ছোট গণ্ডক নদীর তীরে কাশিয়া-র ধ্বংসাবশেষই ছিল প্রাচীন কুশীনগর। কাশিয়া থেকে সামান্য দূরে প্যাডারাওনা গ্রামকে কানিংহাম পাবা নগরী বলে চিহ্নিত করেছেন। মনু লিচ্ছবিদের সঙ্গে মল্লদেরও 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন। বিদেহ-র মতো মল্লরাষ্ট্রেও প্রথম দিকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে, কিন্তু বিম্বিসারের পূর্বে সেখানে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই মল্লগণ কখনও কখনও লিচ্ছবিদের শত্রু, কখনও বা মিত্ররূপে দেখা দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভদ্দশাল জাতকে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ আছে, আবার জৈন কল্পসূত্র-এ তাদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

সে যুগে যে ক'টি রাজ্য কুরুরাজ্যকে ঘিরে ছিল, যমুনার নিকবর্তী চেদিরাজ্য ছিল তাদের অন্যতম। অনেকে মনে করেন, চেদিগণের দুইটি বসতি ছিল—একটি নেপালের পর্বতে, অন্যটি বর্তমান বুন্দেলখণ্ডে। জাতক অনুসারে এর রাজধানী ছিল শোথথিবতী, মহাভারত অনুসারে, শুক্তিমতী। সম্ভবত এই নাম দুটি অভিন্ন। ভারতের প্রাচীনতম উপজাতিদের মধ্যে চেদিগণ ছিল অন্যতম। হাতিগুম্ফা লেখ থেকে জানা যায় যে, পরবর্তীকালে চেদিগণের একটি শাখা কলিঙ্গে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বৎসরাজ্যটি আর্থিক দিক থেকে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল কার্পাস শিল্প। এলাহাবাদের নিকটবর্তী কৌশাম্ববী (বর্তমান কোশম গ্রাম) এর রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের রাজা উদয়ন বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। উদয়নের সঙ্গে অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের কলহের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্তা*, হর্ষবর্ধনের *রত্নাবলী* এবং *প্রিয়দর্শিকা*—এই তিনটি নাটকের নায়ক উদয়ন। *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে তাঁর দ্বিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। প্রথম দিকে বৌদ্ধধর্মবিরোধী হলেও পরে তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে তাঁর পুত্র বোধি সুমসুমার গিরিতে বাস করত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার ভগ্‌গ রাজ্যটি বৎসরাজ্যের অধীন ছিল।

জাতক অনুসারে কুরুরাজবংশ যুধিষ্ঠিরের পরিবারভুক্ত ছিল। বুদ্ধের সময় এই রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিশেষ ছিল না। এর রাজধানী ছিল দিল্লীর নিকটবর্তী ইন্দ্রপত্ত হবা ইন্দ্রপত্তন বা ইন্দ্রপ্রস্থ। অপর একটি উল্লেখযোগ্য শহর ছিল হস্তিনাপুর। এ ছাড়া কয়েকটি ছোট ছোট শহরের কথাও জানা যায়। যাদব, ভোজ এবং পাঞ্চালনগরের

সঙ্গে কুরুর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কুরুরাজ্যের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং সেখানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র বা সঙ্ঘশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এখান থেকে অনেকে বৎসরাজ্যে চলে যায় এবং সেখানে রাজতন্ত্র বজায় রাখে।

পাঞ্চাল বলতে বুন্দেলখণ্ড এবং মধ্য-দোয়াবের অংশবিশেষকে, (অন্যভাবে বুদাউন, ফরাক্কাবাদ এবং তার সংলগ্ন উত্তর প্রদেশের জেলাগুলিকে) বোঝায়। জাতক, মহাভারত এবং দিব্যবদান অনুসারে ভাগীরথী নদী এই রাজ্যটিকে উত্তর-পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ-পাঞ্চাল, এই দুইটি অংশে বিভক্ত করেছিল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র, অর্থাৎ বর্তমান বেরিলী জেলার রামনগর। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল ফরাক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত কাম্পিল্য বা কাম্পিল। বিখ্যাত নগর, কান্যকুব্জ বা কনৌজ, পাঞ্চালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম দিকে এই রাজ্যে রাজতন্ত্র বলবৎ থাকলেও পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে, এখানে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

মৎস্য বলতে বর্তমান জয়পুর বোঝায়। এখানকার আলোয়ারের সবটা এবং ভরতপুরের অংশবিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিরাটের নামানুসারে এর রাজধানীর নাম ছিল বিরাটনগর বা বৈরাট। বিম্বিসারের পূর্ববর্তী সময়ে মৎসরাজ্যের কাহিনী জানা যায় না। *অর্থশাস্ত্র*-এ সঙ্ঘশাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৎসের উল্লেখ নেই। সম্ভবত স্বাধীনতা হারানোর পূর্ব পর্যন্ত এই রাজ্যে রাজতন্ত্র বলবৎ ছিল। মৎস্য প্রথমে চেদিরাজ্যের এবং পরে মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। *মহাভারত*-এ চেদিরাজ সহজকে মৎসদেশের শাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অশোকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখ বৈরাটে পাওয়া গেছে।

যমুনাতীরে অবস্থিত মথুরা সুরসেনের রাজধানী ছিল। বৈদিক সাহিত্যে সুরসেন এবং মথুরার উল্লেখ নেই। গ্রীক লেখকগণ 'সৌরসেনয়' এবং 'মেথোরা'-র উল্লেখ করেছেন। *মহাভারত*-এ এবং পুরাণ-এ আছে যে যদুবংশ এখানে রাজত্ব করত। সুরসেনের রাজা অবন্তীপুত্র বুদ্ধের *অবশাল্ম* প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁর সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম মথুরা অঞ্চলে প্রসারলাভ করে। অবন্তীপুত্র নাম থেকে মনে হয় যে, সুরসেন অবশ্যই মৌর্যসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছিল। তিনি মথুরাকে কৃষ্ণ (হেরাক্লেস) উপাসনার কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন।

'অস্মক'-এর অবস্থিতি সম্পর্কে সামান্য অনিশ্চয়তা আছে। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে এই রাজ্যটি গোদাবরীতীরে অবস্থিত ছিল। *অর্থশাস্ত্র*-র টীকাকার ভট্টস্বামিন একে মহারাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছেন। পাণিনিও অস্মকগণের উল্লেখ করেছেন। তিনি দাক্ষিণাত্য এবং কলিঙ্গের উল্লেখ করায় তাঁর 'অস্মক' দাক্ষিণাত্যের 'অশ্বক' হতে পারে। কারও কারও মতে অস্মক বলতে হয়তো গ্রীক লেখকদের উল্লিখিত, উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'আস্সাকেনয়' রাজ্যটি বোঝাত। ডঃ রায়চৌধুরী এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 'অস্মক' শব্দটির অর্থ যদি প্রস্তরময় অঞ্চল হয় তাহলে এই নামটি কিছুতেই 'আস্সাকেনয়' রাজ্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না। কেননা, কেম্‌ব্রিজের ভারত ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে যে, 'আস্কেনয়' নামের সঙ্গে সংস্কৃত 'অশ্ব'-র বা ইরানীয় 'আস্প'-র যোগ আছে। তা যদি হয় তাহলে প্রস্তরময় অঞ্চল 'অস্মক'-কে অশ্ববহুল অস্সাকেনয় বা 'অশ্বক' থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। সুতরাং পাণিনির সূত্রে যে 'অস্মক'-এর উল্লেখ আছে, তার অবস্থান দাক্ষিণাত্যে ছিল মনে করতে হবে; এর রাজধানী ছিল পোতালি। হয়তো ইক্ষাকুবংশের নৃপতিগণ এই রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। প্রাচীন পালি সাহিত্যে অস্মক-কে উত্তরে

মূলক এবং অন্যদিকে কলিঙ্গ থেকে পৃথক করা হলেও, ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, পরবর্তীকালে হয়তো দুইটি ‘অস্মক’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। একটি *জাতক*-এ অস্মককে অবন্তীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই সংশ্লেষ সম্ভব হত না, যদি না মূলক অস্মক-এর অন্তর্ভুক্ত হত, অর্থাৎ অস্মক এবং অবন্তীর মধ্যবর্তী সীমারেখা এক না হত।

অবন্তী ছিল পশ্চিম ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, অবন্তী বলতে বর্তমান মালব, নিমার এবং মধ্যপ্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চল বোঝাত। সম্ভবত বেত্রবতী নদী এই রাজ্যকে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুইটি অংশে বিভক্ত করেছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, উত্তর অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং অবন্তী দক্ষিণাপথের রাজধানী ছিল নর্মদাতীরের মাহীষ্মতী বা মান্ধাতা। এই দুইটি নগরই রাজগৃহ থেকে দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রসারিত রাজপথের উপর স্থাপিত হয়েছিল।

পুরাণ অনুসারে অবন্তীরাজ্যের প্রথম রাজবংশের নাম ছিল হৈহয়। এখানকার রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর সময় এই রাজ্য, প্রতিবেশী রাজ্য বৎস, মগধ এবং কোশলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অবন্তী মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গান্ধার বলতে পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি জেলা দুইটি বোঝায়। *জাতক* অনুসারে কাশ্মীর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রীক লেখক হেকাটায়স (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৯-৪৮৬ অব্দ) কাশ্মীরকে ‘গাণ্ডারীর নগর’ বলে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা ও বাণিজ্যকেন্দ্র তক্ষশিলা এর রাজধানী ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গান্ধারের রাজা পুককুসাতী বিম্বিসারের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মগধে বন্ধুত্বের প্রতীকস্বরূপ দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু অবন্তীরাজ প্রদ্যোতকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পারস্যসম্রাট গান্ধার জয় করেছিলেন। দারযবৌষের বেহিস্থান লেখতে (খ্রিস্টপূর্ব ৫২০-৫১৮ অব্দ) গান্ধারগণকে আকসেনীয় সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কম্বোজ ‘উত্তরাপথের’ অর্থাৎ ভারতে দূর-উত্তর অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন সাহিত্য এবং অশোকের লেখতে গান্ধার এবং কম্বোজের নাম সর্বদা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই কম্বোজ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধারের নিকটবর্তী ছিল, মনে করা হয়। হাজারা জেলা এর অন্তর্গত এবং পশ্চিমে এর সীমা কাফিরিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। *মহাভারত*-এ রাজপুরকে কম্বোজের রাজধানী বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিকযুগে কম্বোজে হয়তো ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার প্রচলন ছিল। কিন্তু আরও পরে এখানে অনার্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। *জাতক*-এ তার উল্লেখ আছে। *মহাভারত*-এ কম্বোজে রাজতন্ত্রশাসনের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু পরে এখানে সঙ্ঘশাসনের প্রবর্তন হয়েছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এ তার উল্লেখ আছে।

উপরে ষোড়শ মহাজনপদের যে বিবরণ দেওয়া হল নানা কারণে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ভূগোলের দিক থেকে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ থেকে আমরা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিত্রের আভাস পাই। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য একেবারেই ছিল না। ভারত অনেকগুলি খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এবং তারা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হত। ষোলোটি মহাজনপদের অধিকাংশই ছিল বিহারে, উত্তরপ্রদেশে এবং মধ্যভারতে। আসাম, বঙ্গদেশ, ওড়িশা, গুজরাট, সিন্ধু এবং দূর-দক্ষিণ অঞ্চলে কোন মহাজনপদ ছিল না। দক্ষিণ ভারতে একটিমাত্র মহাজনপদ ছিল অস্মক।

সমগ্র পাঞ্জাবে মহাজনপদ ছিল দুইটি, গান্ধার ও কুরু। মধ্য পাঞ্জাবে একটিও ছিল না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তখন গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই ছিল রাজনৈতিক অভিকর্ষের কেন্দ্রবিন্দু। তখন প্রচলিত শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্র হলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে অনেকগুলি গণরাজ্য ছিল। বজ্জি ও মল্লরাষ্ট্র ছাড়াও, বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কপিলাবস্তুর শাক্য, রামগামের কলিয়, সুমসুমার গিরির ভাগ্গ, অল্লকপপার বুলি, কেশপুত্তুর কালামা এবং পিপ্পলিবনের মোরিয়া প্রভৃতি উপজাতিগণের মধ্যে প্রজাতন্ত্র প্রচলন ছিল। কপিলাবস্তু ছিল নেপালের তরাই অঞ্চলে, বস্তি জেলায়। কলিয়গণ ছিল কপিলাবস্তুর শাক্যদের পূর্বদিকের প্রতিবেশী। কেশপুত্র ছিল কোশলে, আর পিপ্পলিবন ছিল কুশীনগরের অদূরবর্তী। অন্য উপজাতিগুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভাগ্গগণ যে বৎসরাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেছিল, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই স্বয়ংশাসিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ন্যায় প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছিল। ডঃ মজুমদার তাই প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে স্বাধীন চিন্তার অনুকূল, এই ঘটনায় তা আরেকবার প্রমাণিত হয়।

৩ক.৩ মগধের উত্থান

ঋগ্বেদ-এ 'রাজা বিশ্বজনীনের' কল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এমন কয়েকজন শাসকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে দিগ্বিদিক জয় করেছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যজয় স্থায়ী হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাজনপদগুলির গৌরব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনীতিতে নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতে তখন কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি ক্রমশ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি গ্রাস করে। পরিশেষে এই রাজ্যগুলির মধ্যে একটি রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্য (মগধ) অন্য রাজ্যগুলি জয় করে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন ভারতের রাজনীতিতে গণরাজ্যগুলির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তাদের কোন বৃহৎ ভূমিকা ছিল না। সেই ভূমিকা ছিল, কোশল, বৎস, অবন্তী এবং মগধ—এই চারটি রাজ্যের।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় মগধে একটি রাজবংশ শাসন করত। পুরাণ অনুসারে এই বংশের প্রথম রাজা শিশুনাগের নাম অনুসারে এই বংশের নাম শৈশুনাগবংশ। বৌদ্ধ লেখকগণের মতে প্রথম শাসকবংশের নাম হর্যঙ্ক দ্বিতীয় শাসকবংশের নাম শৈশুনাগ। পুরাণ অনুসারে বিম্বিসার শৈশুনাগ বংশের নৃপতি ছিলেন। অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত গ্রন্থে বিম্বিসারকে শৈশুনাগবংশীয় বলেননি, হর্যঙ্ক কুলজাত বলেছেন। *মহাবংশ*-এ বলা হয়েছে যে, শিশুনাগ বিম্বিসারবংশীয়দের পর পৃথক একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার পুরাণে বলা হয়েছে যে, শিশুনাগ প্রদ্যোতগণের গর্ব হরণ করেছিলেন। অন্যান্য উপাদান থেকে জানা যায় যে, এই প্রদ্যোতগণ বিম্বিসারবংশীয়দের সমসাময়িক ছিলেন। পুরাণের এই বক্তব্য যদি সত্য হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, শিশুনাগ প্রথম প্রদ্যোতের, অর্থাৎ প্রদ্যোৎ মহাসেন-এর পরবর্তী ছিলেন। পালি গ্রন্থসমূহ এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে জানা যায় যে, প্রদ্যোত মহাসেন বিম্বিসার এবং তাঁর পুত্রের, অর্থাৎ অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং শিশুনাগ নিশ্চিতভাবে এই সব রাজাদের পরবর্তী ছিলেন। পুরাণে শিশুনাগকে বিম্বিসারের পূর্বসুরি এবং বিম্বিসারবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে সত্য। কিন্তু অন্য কোন উপাদানে পৌরাণিক বিবরণের এই অংশের সমর্থন পাওয়া যায় না। বারাণসী এবং বৈশালী শিশুনাগের রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর পরবর্তী ছিলেন, কেননা তাঁরাই প্রথম এই অঞ্চলে মগধের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাছাড়া, বৈশালীতে একটি রাজকীয় বাসস্থান ছিল এবং এই বৈশালীকেই তিনি পরে তাঁর রাজধানীতে পরিণত করেছিলেন। তখন থেকে রাজগৃহ তার রাজকীয় মর্যাদা হারিয়েছিল এবং পরে আর তা ফিরে পায়নি। সুতরাং বলা যায় যে, রাজগৃহের গৌরব অপগত হওয়ার পর শিশুনাগ এসেছিলেন। বিম্বিসার-অজাতশত্রুর রাজত্বকালই ছিল রাজগৃহের গৌরবের যুগ। সুতরাং মগধের ইতিহাসে শিশুনাগের স্থান অবশ্যই তাঁদের পরে।

বিম্বিসার (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫-৪৯২) ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষণ 'শেনিয়' বা 'শ্রেণিক' থেকে ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, সিংহাসন আরোহণের পূর্বে তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু এই মত *মহাবংশ*-এর বিরোধী। *মহাবংশ* অনুসারে মাত্র পনেরো বৎসর তিনি তাঁর পিতা (ভক্তিয় বা মহাপদ্ম) কর্তৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এ থেকে বিম্বিসার সম্পর্কে দুইটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। এক, তিনি পূর্বে সেনাপতি ছিলেন না, এবং দুই তিনি হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাও করেন নি। ডাঃ ভাণ্ডারকর আরও মনে করেন যে, শিশুনাগ ছিলেন ছোট নাগবংশের এবং বিম্বিসার ছিলেন বড় নাগবংশের। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত অনুসারে বিম্বিসার ছিলেন বড় নাগবংশের। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* অনুসারে বিম্বিসার ছিলেন হর্যঙ্ক বংশজাত তরুণ।

বিম্বিসারের রাজ্যাভিষেকের সঠিক সময় জানা যায় না। সিংহল দেশের ঐতিহ্য অনুসারে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের ষাট বৎসর পূর্বে এই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিনির্বাণের আনুমানিক তারিখ খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দ। এই হিসাবে বিম্বিসারের রাজত্বের সূচনা খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৫ অব্দে হয়েছিল বলা যায়।

বিম্বিসারের রাজত্ব থেকে মগধের অগ্রগতির ইতিহাস আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর অঙ্গ জয়ের মধ্য দিয়ে ভারত ইতিহাসে যে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, কয়েক শতাব্দী ধরে মগধই ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। সূর্যকে ঘিরে সৌরজগতের মত, মগধকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে মগধের এই উত্থান ইতিহাসে একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর পিছনে ব্যক্তিবিশেষের অবদান ছাড়াও কয়েকটি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক কারণ ছিল।

ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষই সব, এই ধারণা যেমন ভ্রান্ত, তেমনই অন্যদিকে, ব্যক্তি কিছু নয়, বাস্তব সব নির্ধারণ করে, এই ধারণাও সত্য নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগে, রাজতন্ত্র শাসিত রাজ্যে, ব্যক্তির অবদান বোধহয় কোনোমতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। অনেকে বলেন, বাস্তব অবস্থা যখন পরিণতি লাভ করে, তখন যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটে। সে যাই হোক, ইতিহাসে দেখা যায় যে উভয়ের যোগাযোগের ফলেই একটি রাজ্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়। মগধের ক্ষেত্রে বিম্বিসারের সময় থেকে কয়েক শতাব্দী ধরে এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—বাস্তব অবস্থা শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে সমাজ ও অর্থনীতি প্রস্তুত করে না, বিদেশী আক্রমণ বা সেই আক্রমণের আশঙ্কা অভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থাকে পরিণত রূপ দেয়, মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে সূচীমুখ করে তোলে। প্রাচীন ভারতে মগধকে কেন্দ্র করে দু'বার বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তার প্রথমটির নেপথ্যে ছিল আলেকজান্ডারের আক্রমণ এবং তৎপরবর্তী গ্রীক আক্রমণের আশঙ্কা, আর দ্বিতীয়টির প্রেক্ষাপটে ছিল ভারতের বৃহৎ অংশ জুড়ে বিদেশী শক-কুষাণদের উপস্থিতি।

ব্যক্তিত্ব বড়, না বাস্তব অবস্থা বড়, সেই কূটতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, মগধে এই কয় শতাব্দী ধরে ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটেনি। একথা ঠিক যে বিম্বিসার থেকে শুরু করে অশোক পর্যন্ত সকলেই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী নৃপতিদের সংখ্যাও খুব কম নয়। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, মহাপদ্মনন্দ এবং পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোক—অন্তত এই কয়টি নাম যথার্থই স্মরণযোগ্য। এঁদের কৃতিত্ব ক্রমশ আলোচ্য। এ প্রসঙ্গে মগধের ইতিহাসে দুইজন মন্ত্রীর অবদানও বিশেষ স্মরণীয়। একজন, ম্যাকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনীয়, অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্‌সাকর, অন্যজন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এবং অংশত বিন্দুসারের মন্ত্রী, মৌর্য সাম্রাজ্যের নেপথ্য নায়ক, কৌটিল্য বা চাণক্য।

ব্যক্তিত্ব ছাড়াও মগধের নিজস্ব যোগ্যতা খুব কম ছিল না। মগধ ছিল একটি ঘনবিন্যস্ত রাজ্য। প্রকৃতি এই রাজ্যকে নদী এবং পাহাড় দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। নদী-পাহাড়ের এই বেড়ার মধ্যে মগধ তার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেয়েছিল। মগধের রাজধানী রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় এবং একটি প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকায়, তার নিরাপত্তা ছিল আরও বেশি। নদীমাতৃক অঞ্চলের পলিমাটির প্রসাদে মগধের জমি উর্বর ছিল। তখনকার দিনেই এই জমিতেই বছরে দু'বার ফসল ফলানো যেত। এ ছাড়া 'হিরণ্যবাহ' শোন নদী মগধের সম্পদ ও সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল। পরবর্তীকালের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীও প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গঙ্গা এবং তার দু'টি শাখা নদী, শোন ও গণ্ডক একদিকে যেমন মগধের আত্মরক্ষার সহায়ক হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে উত্তর ভারত ও সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগাযোগও সহজ করেছিল। মগধ তার হস্তিবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মগধের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য এবং অগ্রগতি সম্ভব হত না যদি না ভারতের সদ্যোজাত লৌহযুগে, শক্তির প্রকৃত উৎস, লৌহ ও তাম্রের উপর তার প্রায় একচেটিয়া অধিকার থাকত। গয়া জেলার বারাবার পাহাড়ে, ধারওয়ারে লৌহখনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। লৌহ ও তাম্রখনি সম্পদে ধলভূম ও সিংভূম জেলা ছিল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৌটিল্য এই সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন "রাজকোষ খনির উপর নির্ভর করে এবং সেনাবাহিনী, রাজকোষের উপর। খনিই হচ্ছ যুদ্ধদ্রব্যের গর্ভাশয়।"

মগধের খনিজ সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাণিজ্য। মগধের বাণিজ্য সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে হলে, তার ভৌগোলিক অবস্থান পুনরায় স্মরণ করা প্রয়োজন। একমাত্র দক্ষিণ দিক ভিন্ন মগধের অন্য তিন দিকই নদী বেষ্টিত। মগধের দক্ষিণে ছিল ছোটনাগপুরের পাহাড়, উত্তরে গঙ্গা, পূর্বে চম্পা এবং পশ্চিমে শোন। এ-যুগের বাণিজ্যে পণ্য চলাচলের জন্য রেলপথের যে ভূমিকা, প্রাচীন ভারতে নদীগুলির সেই ভূমিকা ছিল। সুতরাং নৌ-বাণিজ্যের জন্য মগধের অবস্থান বিশেষ অনুকূল ছিল। স্থলবাণিজ্যেও মগধের গুরুত্ব খুব কম ছিল না, কেননা ওড়িশা এবং উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যপথ মগধের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল।

অন্য এক দিক থেকেও মগধের অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। মগধ ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যভাগে। তার অবস্থিতি ছিল দু'টি সংস্কৃতির মধ্যস্থলে। তার একদিকে ছিল আর্যসংস্কৃতির দুর্গবিশেষ পাঞ্জাব, অন্যদিকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের অনার্য সংস্কৃতি। মগধে দু'টি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটায় সে লাভবান হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রকারেরা মগধের মানুষকে "মিশ্র" বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায় যে সংস্কৃতির এই মিশ্রণ প্রায়ই মানুষের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ উন্নত করে। মগধের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মিশ্র সংস্কৃতির এই মগধ যেমন একদিকে

গৌতমকে বুদ্ধে পরিণত করেছিল, তেমনই অন্যদিকে তার রাজাদের একের পর এক রাজ্যজয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাছাড়া, মগধ দীর্ঘকাল আর্য আক্রমণ সীমার বাইরে থাকায়, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রসূত সামাজিক বিধিনিষেধের বন্ধন এখানে বিশেষ ছিল না। একদিকে এই শৈথিল্য, অন্যদিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সর্বজনীন আবেদন মগধের মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রসারিত করে মগধকে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র হতে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগের ভারতের দিল্লির যে স্থান, প্রাচীন ভারতে মগধ সেই স্থান গ্রহণ করেছিল।

মগধের সম্প্রসারণের পিছনে আদর্শের প্রেরণাকে বোধ হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন ভারতের দু'টি বিপরীতমুখী চিন্তাধারা পাশাপাশি কাজ করে যেত। একটি স্থানীয় স্বাধীনতার চিন্তা, যা বিভিন্ন জনপদ এবং স্বয়ং গ্রামপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাচীন গ্রীসেও অনুরূপ চিন্তা স্বাধীন নগররাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতে উচ্চতর একটি আদর্শ ছিল, যা প্রাচীন গ্রীসে ছিল না। সে আদর্শটি হল সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার আদর্শ। তাই প্রাচীন গ্রীসে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস কখনও পরীক্ষার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই প্রয়াস একাধিকবার সফল হয়েছে। এই প্রয়াসের সঙ্গে আরও একটি ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়েছিল। এই আকাঙ্ক্ষা ছিল মহাপুরুষের জন্য। ধর্মের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষা বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবকে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে মগধ সাম্রাজ্যের উত্থানকে সম্ভব করেছিল।

সর্বশেষে বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর খণ্ড, ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত ভারতে মগধের এই উত্থানকে সম্ভব করেছিল। তখন ভারতের অবস্থা ছিল অষ্টাদশ শতকের অবস্থার মতো। ভারতে সর্বব্যাপী এই অনৈক্যের পিছনে প্রধানত দুইটি কারণ ছিল। একটি গভীর অরণ্যসঙ্কুল বিন্ধ্য পর্বতমালা, অন্যটি ভারতে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির অস্তিত্ব। এর ফলে ভারতে সমাজ-সংহতি একেবারেই ছিল না। মগধের শাসকেরা এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। তাঁরা সফল হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের কাজ খুব সহজ ছিল না। কেননা, মগধের সাম্রাজ্যবাদকে বারবার প্রজাতন্ত্রবাদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

বিম্বিসার হর্যঙ্ক বংশের প্রথম শাসক ছিলেন না, কিন্তু তিনিই প্রথম এই বংশের গৌরবের কারণ হয়েছিলেন। মার্ক অফ্ ব্রান্ডেনবার্গের ইতিহাসে গ্রেট ইলেকটরের যে স্থান, মগধের ইতিহাসে তাঁর স্থানও সেখানে। মগধের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর পদক্ষেপই প্রথম। তাঁর রাজত্বকালে আরও একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য। গৌতম এই সময়েই বোধি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব তখনই হয়েছিল।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণে বিম্বিসারের সামনে যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, তিনি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। অংশত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং অংশত যুদ্ধের সাহায্যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছিলেন। কোশল, লিচ্ছবি, বিদেহ এবং মদ্রর (মধ্য পাঞ্জাব) সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগ্নীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহের ফলে কাশীগ্রাম তিনি যৌতুক হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী লিচ্ছবি নরপতি চেতকের কন্যা। এই বিবাহের ফলে তাঁর রাজ্যসীমা নেপাল পর্যন্ত প্রসারের পথ সুগম হয়েছিল। বৈদেহী বাসবী ছিলেন তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী। মদ্র রাজকন্যা খেমাও তাঁর অন্যতম পত্নী ছিলেন।

এই বিবাহসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করে এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবার

পর বিম্বিসার প্রতিবেশী অঙ্গ আক্রমণ করেন। অনেকে মনে করেন যে অঙ্গের রাজা ব্রহ্মদত্ত বিম্বিসারের পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সুতরাং অঙ্গ-র বিরুদ্ধে বিম্বিসারের এই যুদ্ধকে প্রতিহিংসার যুদ্ধ বলা যায়। চরম গৌরবের দিনে বঙ্গদেশ অঙ্গ-র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর রাজধানী ছিল চম্পা। অঙ্গজয়ের ফলে, পূর্ব-বিহার মগধ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই জয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখন চম্পা ছিল একটি নদী-বন্দর। এই বন্দর থেকে বাণিজ্যতরী গঙ্গা দিয়ে এবং উপকূল রেখা ধরে দক্ষিণ ভারতে যেত এবং সেখান থেকে মসলা এবং মণিমুক্তা উত্তর ভারতে নিয়ে আসত। অঙ্গ শুধু বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত না, গঙ্গা ব-দ্বীপের সমুদ্রবন্দরগুলিতে পৌঁছানোর পথও নিয়ন্ত্রণ করত। এই বন্দরগুলির সঙ্গে ব্রহ্মদেশের উপকূলের বাণিজ্য সম্পর্ক থাকায়, অঙ্গজয়ের ফলে অন্তর্বাণিজ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্য যুক্ত হয়েছিল।

বিম্বিসার দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। গান্ধারের পুককুসতি তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন। সুদূর মদ্রের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যেও এই নীতি পরিস্ফুট হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত নিকটে, অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে প্রদ্যোতের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল ৩০০ লিগ (১ লিগ ৩১২ মাইল)। তাঁর রাজত্বকালে মগধ একটি বর্ধিষ্ণু রাজ্য ছিল। গিরিব্রজ-র নিকটে রাজগৃহ তিনি নির্মাণ করেন। মহাবীর জৈন এবং গৌতম বুদ্ধ উভয়েই তাঁর রাজত্বকালে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করেন। বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্মমত গ্রহণ করলেও, জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এর পিছনে হয়তো তাঁর লিচ্ছবিবংশীয়া স্ত্রী চেল্লনার প্রভাব ছিল।

বিম্বিসার অঙ্গ ভিন্ন অপর কোন রাজ্য জয় করেন নি। আগেই বলা হয়েছে যে এই জয়ের পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেছিল। সুতরাং তাঁকে যুদ্ধার্থী বলা যায় না। বরং তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং একজন উত্তম সংগঠক। আযোগ্য কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তিনি গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে মিলিত হতেন, রাজ্যপরিদর্শন করতেন। তাছাড়া, তিনি পথঘাট, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

কিংবদন্তী অনুসারে চেল্লনার গর্ভজাত পুত্র অজাতশত্রুর হাতে তিনি নিহত হন। অবশ্য জৈন তথ্যাদিতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

৩ক.৪ অজাতশত্রু (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৩-৪৬২ অব্দ) কুণিক

সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে অজাতশত্রু চম্পার শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হর্যঙ্ক বংশের গৌরব উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছিল। তিনি শুধু কোশলকে পর্যুদস্ত করে স্থায়ীভাবে কাশী দখল করেছিলেন তাই নয়, তিনি বৈশালীকে কুক্ষিগত করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কোশলের স্থান ঠিক অঙ্গ-র মতো ছিল না। তার একটি সম্মানজনক স্থান ছিল। গৌতম বুদ্ধ কোশলের অধিবাসী ছিলেন। দুইটি মহাকাব্যের একটি, *রামায়ণ*-এর কাহিনী কোশলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। একসময় মনে হয়েছিল যে ভারতের ইতিহাসে যে ভূমিকা মগধ গ্রহণ করেছিল, সেই ভূমিকা কোশল গ্রহণ করবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কোশল ও মগধের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অজাতশত্রুর

রাজত্বকালে এই প্রচ্ছন্ন শত্রুতা প্রকাশ্য যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। কোশলের অংশবিশেষ, কাশীগ্রাম, ইতিপূর্বে বিম্বিসারকে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল।

মগধের সঙ্গে কোশলের এই যুদ্ধের আশু কারণ ছিল অজাতশত্রু কর্তৃক বিম্বিসারকে হত্যা করা। এর ফলে কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী বিধবা হয়ে স্বামীর শোকে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। প্রসেনজিৎ তখন কাশী সম্পর্কে পূর্ব ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন। এর ফলে যে যুদ্ধ শুরু হয় তাতে ফলাফল প্রথম দিকে অনিশ্চিত হলেও, তা শেষ পর্যন্ত অজাতশত্রুর অনুকূলে যায়। প্রসেনজিৎ তাঁর কন্যা বাজিরাকে অজাতশত্রুকে সমর্পণ এবং তাঁকে কাশী প্রত্যর্পণ করেন। প্রসেনজিৎ এইভাবে অজাতশত্রুর হাতে নিগৃহীত হন, কিন্তু অজাতশত্রু তাঁকে ধ্বংস করেন নি।

মগধ ও কোশলের মধ্যে এই মীমাংসাকে সাময়িক বলা যায়। কেননা, দ্রুত এই বিরোধ ব্যাপকতর আকার ধারণ করে এবং বৃহত্তর রাজনীতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অজাতশত্রুর নামটা তাঁর পক্ষে ছিল নেহাৎ বেমানান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক। পূর্ব ভারতের ছত্রিশটি গণরাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মিত্রসঙ্ঘ গঠন করছিল। সুতরাং প্রতিপক্ষ প্রবল ছিল। কাশী-কোশল এই সঙ্ঘে যোগদান করায় তা আরও প্রবলতর হয়েছিল। এই মিত্রসঙ্ঘের নেতা ছিলেন লিচ্ছবি বংশীয় নরপতি চেতক।

মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে মগধের এই বিরোধের অব্যবহিত কারণ সম্পর্কে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। জৈন সাহিত্য অনুসারে বিম্বিসার বৈশালীর রাজা চেতকের কন্যা চেল্লনার দুই পুত্রকে যে মণিমুক্তা ও হস্তী দান করেন, সিংহাসন আরোহণের পর অজাতশত্রু সেই দান প্রত্যাহার করতে চাইলে এই বিরোধের সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে লিচ্ছবিগণ খনি সম্পর্কিত একটি চুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করলে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের এই সংগ্রামে গৌতম বুদ্ধের সহানুভূতি লিচ্ছবিদের পক্ষে ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে মগধের সঙ্গে কোশলের যুদ্ধ হয়তো দুইটি পৃথক ঘটনা ছিল না। সম্ভবত তারা ছিল মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের বিরুদ্ধে একই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দুইটি দিক।

এই যুদ্ধে সামরিক শক্তির যে ভূমিকা ছিল, যুদ্ধের কূটনীতির ভূমিকা তার চেয়ে কম ছিল না। এই কূটনীতির কেন্দ্রে ছিলেন অজাতশত্রুর মন্ত্রী বস্‌সাকর। তাঁর পরমার্শ অনুসারে মগধের গুপ্তচরেরা মিত্রসঙ্ঘের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য বৈশালীর লিচ্ছবিদের মধ্যে তিন বৎসর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিল।

এই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে অজাতশত্রু আরও একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। লিচ্ছবি গণরাজ্যটি ছিল গঙ্গা নদীর অপর তীরে। মগধের রাজধানী রাজগৃহ গঙ্গা থেকে অনেক দূরে অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত হওয়ায়, সেখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা সুবিধাজনক ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অজাতশত্রু গঙ্গাতীরে সুবিধাজনক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এইভাবে ভবিষ্যৎ পাটলিপুত্র নগরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। দুর্গনির্মাণে দুই বৎসর এবং মিত্রসঙ্ঘের ঐক্য বিনাশের জন্য তিন বৎসর লেগেছিল।

মিত্রসঙ্ঘ এমনিতেই খুব শক্তিশালী ছিল। দলনেতা চেতক, সিন্ধু-সৌবীর, বৎস এবং অবন্তী রাজ্যের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা সেই শক্তি আরও বৃদ্ধি করেছিলেন। সুতরাং দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে (খ্রিস্টপূর্ব

৪৮৪-৪৬৮ অব্দ) এই যুদ্ধ চলেছিল। মগধের সেনাবাহিনী এই যুদ্ধে দুইটি গোপন এবং মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। এই অস্ত্র দুটি হল মহাশিলাকণ্টক এবং রথমুসল। প্রথমটির সাহায্যে প্রবল বেগে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যেত, আর দ্বিতীয়টিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ট্যাঙ্কের পূর্বসূরী বলা যায়।

বাসাম ১৯৫১ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে গঠিত একটি প্রবন্ধে "লিচ্ছবিদের সঙ্গো অজাতশত্রুর যুদ্ধকে' তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন। এই আলোচনায় তিনি বিষয়টিকে শুধু গভীরতা দান করেছেন তাই নয়, তাকে একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, লিচ্ছবি মিত্রসঙ্ঘের সঙ্গো অজাতশত্রুর যুদ্ধ তৎকালীন ভারতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন বিবরণে তারতম্য আছে। তবে মূল কয়েকটি বিষয়ে দুইটি বিবরণ একই ধরনের।

তিনি বলেন যে, অজাতশত্রু প্রথম দিকে এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি যখন যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য বস্‌সাকরকে বুদ্ধের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন এ বিষয়ে তাঁর মনে অনিশ্চয়তা ছিল। গঙ্গা তীরে তিনি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল আত্মরক্ষার জন্য, আক্রমণের জন্য নয়। *মহাপরিনিব্বাণ* সুত্ত-এর সংস্কৃত ভাষান্তর থেকে জানা যায় যে, বজ্জিদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অজাতশত্রু তাদের সম্পর্কে "ব্যসনম" (অর্থাৎ ধ্বংস) এবং "ঋদ্ধমশ্চ স্ফীতম" (অর্থাৎ ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী) শব্দগুলি প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং এই যুদ্ধ অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

জৈন গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে যে নয় জন লিচ্ছবি, নয় জন মল্লকি এবং আঠারো জন কাশী-কোশলের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে গঠিত মিত্রসঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। নয় জন লিচ্ছবি নরপতি এবং নয় জন মল্লকি (অর্থাৎ মল্ল) সম্পর্কে বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু কাশী-কোশলের আঠারো জন উপজাতীয় নরপতি কোথা থেকে এলেন, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা, বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মগধের সঙ্গো কোশলের যুদ্ধ শেষ হলে প্রসেনজিতের পুত্র বীরূবাহ রাজা হয়েছিলেন এবং বজ্জিদের সঙ্গো যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই প্রসেনজিতের মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং এই যুদ্ধের আগে কাশী-কোশল প্রসেনজিতের অধিকারে ছিল। তাহলে আঠারো জন উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ কখন কাশী-কোশল শাসন করলেন? বাসাম তাঁদের আবির্ভাবের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, কাশী-কোশলের এই আঠারো জন গণরাজার সঙ্গো বীরূবাহ কর্তৃক শাক্যদের ধ্বংসসাধন এবং তার অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়তো জড়িত। বীরূবাহ তাঁর রাজ্যের উত্তরে এবং পূর্বে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য শাক্যদের আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর এই আক্রমণ স্বাভাবিকভাবেই, অন্য যে সকল উপজাতি কোশলকে কর দিত, তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। মল্লগণ সেই উপজাতিদের অন্যতম ছিল। এমনও হতে পারে যে, বীরূবাহের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে, সেই অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী গণরাজ্যের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এটি ছিল বৈশালীর বজ্জি অথবা লিচ্ছবি গণরাজ্য। কাশী-কোশলের এই আঠারো জন উপজাতীয় নৃপতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপজাতির নেতা ছিলেন। প্রথম দিকে তাঁরা কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইভাবে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বিভিন্ন উপজাতি কোশল এবং মগধের নতুন শাসকদের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যলিপ্সায় শঙ্কিত এবং তাদের স্বতন্ত্র সংবিধান এবং জীবনযাপন পদ্ধতি রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে, একটি বৃহৎ মিত্রসঙ্ঘ গঠন করেছিল।

বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু তাঁদের সমগ্র রাজত্বকালে গঙ্গার উপর যতদূর সম্ভব আধিপত্য বিস্তারের যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের যুদ্ধ তারই একটি অংশ বলা যায়। বাসাম বলেছেন যে, পরবর্তীকালে সমুদ্রগুপ্ত, শশাঙ্ক এবং ধর্মপালের রাজ্যজয়ের পিছনেও একই উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। বিম্বিসার ইতিপূর্বে সমৃদ্ধ নদীবন্দর চম্পা সহ সমগ্র অঙ্গ রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। পালি গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে চম্পার ব্যাপক বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ ভারতের মণিমুক্তা এবং মসলা চম্পা বন্দর হয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে যেত। বাসাম বলেছেন যে, এই অঙ্গ-জয়কে মগধের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। চম্পার বাণিজ্য সম্পদ একদিকে বিম্বিসারের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি বিধান এবং অন্যদিকে অজাতশত্রুর আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে সম্ভব করেছিল। কোসল যুদ্ধের ফলে গঙ্গার বিস্তৃত অঞ্চলে এবং লিচ্ছবি যুদ্ধের ফলে গঙ্গার উত্তর তীরে মগধের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে গঙ্গার উভয় তীর অজাতশত্রু মগধের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। বৌদ্ধ কাহিনী অনুসারে একটি নদী-বন্দর সম্পর্কিত বিতর্ককে কেন্দ্র করে মগধের সঙ্গে লিচ্ছবিদের যুদ্ধ হয়েছিল। বাসাম মনে করেন যে, এই কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ।

বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মগধ ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রচিন্তাকে অতিক্রম করেছিল। বাসাম মনে করেন যে, এর পিছনে হয়তো পাশ্চাত্যের প্রেরণা ছিল। বিম্বিসার যখন তরুণ, তখন পারস্য সম্রাট কাইরাস (কুরু) পৃথিবীতে বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অজাতশত্রু সিংহাসন আরোহণের পূর্বে পারসিকগণ সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং হয়তো তক্ষশিলা অধিকার করেছিল। তক্ষশিলার শাসক পুক্কুসতির সঙ্গে বিম্বিসার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মগধ থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ ছিল। গঙ্গা উপত্যকা থেকে উচ্চবর্ণের মানুষ তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য তক্ষশিলায় যেতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু অবশ্যই সচেতন ছিলেন। নূতন সম্পদের অধিকারী হয়ে, তাঁরা হয়তো পারস্যের দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

লিচ্ছবিদের সঙ্গে যুদ্ধে অজাতশত্রু জয়ী হয়েছিলেন। এর ফলে সমগ্র উত্তর বিহার মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সমগ্র পূর্বভারতে অজাতশত্রুর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈশালীর নগর-রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা হারায়। অবশ্য লিচ্ছবিদের পৃথক অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

অজাতশত্রুর এই সাফল্য অবন্তীরাজ প্রদ্যোত প্রসন্ন মনে নিতে পারেন নি। তিনি রাজগৃহ আক্রমণ করবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যায়। অজাতশত্রু তাই রাজগৃহের রক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করেন। অবশ্য প্রদ্যোতের এই মনোভাব কার্যত কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। অজাতশত্রু কোশলকে পর্যুদস্ত করে এবং কাশী ও বৈশালী অধিকার করে তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন। এইভাবে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাসাম বলেছেন যে, বিম্বিসার এবং অজাতশত্রু একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সেই নীতিটি ছিল গঙ্গার গতিপথের যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁরা দুজনেই একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের কথা ভেবেছিলেন। অজাতশত্রু যত বড় সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন, তখন পর্যন্ত অপর কোন শাসক তা করেছিলেন বলে জানা নেই। বারাণসী থেকে বঙ্গদেশের সীমান্ত পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তীর তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বিম্বিসারের মতো অজাতশত্রু সম্পর্কেও জৈন এবং বৌদ্ধগণ একই দাবি করেছেন। বুদ্ধের সঙ্গে অজাতশত্রুর প্রথমে বৈরী সম্পর্ক থাকলেও, পরে সেই সম্পর্ক বিশেষ আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছিল। তিনি বুদ্ধ সন্দর্শনে

গিয়েছিলেন। ভারহুতে অন্যতম ভাস্কর্যে সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। রাজধানীর চারদিকে তিনি ধানুচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহে অনেকগুলি মহাবিহার সংস্কার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অজাতশত্রুর পর চার জন রাজা উদয়ভদ্র বা উদয়িন, অনুরুদ্ধ, মন্দ্র এবং নাগদশক, একের পর এক মগধের সিংহাসনে বসেন। সমষ্টিগতভাবে তাঁদের রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৬২ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ অব্দ পর্যন্ত। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারী ছিলেন দর্শক। কিন্তু এই ধারনা ভ্রান্ত মনে হয়। কেননা, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এ-বিষয়ে একমত যে অজাতশত্রুর উত্তরাধিকারী ছিলেন উদয়িন। *স্বপ্নবাসবদত্তা*-য় দর্শকের উল্লেখ আছে। ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে এই দর্শক ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের শেষ প্রতিনিধি, নাগদশক।

মগধের রাজ্যসীমা ইতিমধ্যে বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ বিহারের সঙ্গে উত্তর বিহার যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করে অজাতশত্রু এই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে কলকাতা নগরীর মতো পাটলিগ্রামের সেই দুর্গের ছায়ায় পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠা তাই উদয়িনের জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি।

উদয়িন যখন সিংহাসনে আসেন, তার আগেই অঙ্গ, কোশল এবং বজ্জি মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উত্তর ভারতে বাকি ছিল শুধু অবন্তী। অবন্তীর রাজা প্রদ্যোতের রাজগৃহ আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করতে বাধ্য হন। উদয়িনের সময় অবন্তীর রাজা ছিলেন প্রদ্যোতের পুত্র পালক। ইতিমধ্যে অবন্তী পূর্ব ভারতের সবকটি রাজ্য ও গণরাজ্য জয় করে নেওয়ায়, তার শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *কথাসরিৎসাগর* অনুসারে কৌশাম্বী রাজ্যটিও পালক অবন্তী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এইভাবে মগধ ও অবন্তী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে দুইটি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত অজাতশত্রুর রাজত্বকালেই ঘটেছিল। উদয়িনের সময় এই সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল, এই পর্যন্ত। কিংবা বলা যায় যে, এতদিন যে বিরোধ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, উদয়িনের রাজত্বকালেই তা প্রকাশ্য যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। অবন্তী অন্তর্বিপ্লবের ফলে জীর্ণ ও দুর্বল হওয়ার প্রথম দিকে এই যুদ্ধের ফলাফল মগধের অনুকূলে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা উদয়িনের রাজত্বকালে হয়নি। জৈন ঐতিহ্য থেকে মনে হয় যে শিশুনাগ অথবা মহাপদ্মনন্দের সময় এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল।

উদয়িন ছিলেন একজন একনিষ্ঠ জৈন। পাটলিপুত্র নগরীর কেন্দ্রস্থলে তিনি একটি জৈন চৈত্যগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

উদয়িনের বংশধরেরা সকলেই দুর্বল ছিলেন। তাছাড়া, সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন পিতৃঘাতী, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাই তাঁদের শাসনকালে সাময়িকভাবে মগধের অবনতি ঘটেছিল। অবশ্য মগধের এই দুর্গতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। শাসকদের চরিত্র এবং ব্যর্থতা গণমানসে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় অমাত্য শিশুনাগ সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যহার করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে মগধের হর্যঙ্ক বংশের উচ্ছেদ এবং শৈশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

শিশুনাগ এবং তাঁর পুত্র কালাশোক (অথবা কাকবর্ণ) শৈশুনাগ বংশের দুইজন শাসক। মিলিতভাবে তাঁর রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০-৩৬৪ অব্দ পর্যন্ত।

মহাবংশটীকা অনুসারে শিশুনাগের পিতা ছিলেন বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের জনৈক রাজা, আর মা ছিলেন একজন নগরশোভিনী। পুরাণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি অবন্তীর প্রদ্যোত রাজবংশের গৌরব হরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এমন মনে করবার কারণ আছে যে অবন্তীরাজ নালকের সময় যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে বিশাখা এবং আর্যক-এর সময়ও তার অবসান হয়নি। অবন্তীর এই দুর্বলতা নিঃসন্দেহে শিশুনাগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছিল। শিশুনাগ মগধের রাজধানী সাময়িকভাবে গিরিব্রজে এবং পরে পাকাপাকিভাবে বৈশালীতে স্থানান্তরিত করেন। মনে হয় অবন্তীর বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই তিনি গিরিব্রজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বৈশালী সম্পর্কে তাঁর মানসিক দুর্বলতার কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে।

শিশুনাগের পর যিনি মগধের সিংহাসনে বসেন বৌদ্ধ সাহিত্যে তিনি কালাশোক এবং পুরাণে কাকবর্ণ নামে পরিচিত। তাঁর রাজত্বকালের দুইটি ঘটনা স্মরণীয়। প্রথমত, তিনি মগধের রাজধানী পুনরায় পাটলিপুত্রে নিয়ে আসেন এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর রাজত্বকালে বৈশালীতে বৌদ্ধ সঙ্গীতির দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হয়। বাণভট্ট এবং কার্টিয়াসের রচনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিহত হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ। এইভাবে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে শিশুনাগ বংশের সূচনা এবং অবসান হয়েছিল। স্বার্থের সমাপ্তি ঘটেছিল অপঘাতে।

৩ক.৫ নন্দবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৪-৩২৪ অব্দ)

পুরাণ অনুসারে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাপদ্ম, *মহাবংশটিকা* অনুসারে উগ্রসেনা। এই দ্বিতীয় নামটি মনে রাখলে, নন্দবংশের শেষ শাসক ধননন্দকে গ্রীক লেখকগণ কেন আগ্রামেস নামে অভিহিত করেছেন, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ধননন্দ উগ্রসেনার পুত্র, সেই হেতু, তিনি ঔগ্রসৈন্য। গ্রীক লেখকদের কাছে ঔগ্রসৈনের বিকৃত রূপ আগ্রামস।

মহাপদ্মনন্দের বংশপরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতা ছিলেন শৈশুনাগ বংশের শেষ শাসক এবং মাতা জনৈকা শূদ্রা রমণী। জৈন *পরিশিষ্ঠপর্বণ* অনুসারে, নাপিতের ঔরসে কুলটা রমণীর গর্ভে তাঁর জন্ম। কার্টিয়াসের রচনায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় যাই হোক না কেন, তিনি যে হীন বংশজাত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মহাপদ্মের এই হীন জন্ম ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে চিরাচরিত ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সমাপ্তি সূচিত হয়েছিল। বলা যায় যে প্রতিবাদী মনোভাব ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সৃষ্টি করেছিল, সেই একই মনোভাব মহাপদ্মের পক্ষে মগধের সিংহাসন লাভ সম্ভব করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে ধর্ম ও রাজনীতি তখন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলছিল।

ঐতিহ্য অনুসারে নন্দবংশীয় রাজাদের সংখ্যা ছিল নয়। পুরাণ অনুসারে মহাপদ্ম ছিলেন পিতা, আর অন্য

আটজন তাঁর পুত্র। বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসারে এঁরা ছিলেন ভাই। এই নবনন্দ-এর মধ্যে শুধু প্রথম মহাপদ্ম এবং শেষ ধননন্দের কথা জানা যায়।

হীন বংশোদ্ভূত হলেও মহাপদ্ম অশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। পুরাণে তাঁকে 'দ্বিতীয় পরশুরাম', 'সর্বক্ষত্রান্তক' এবং 'একরাট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তিনি যে ক্ষত্রিয় বংশগুলির উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, সেগুলি ছিল ইক্ষবাকু, পাঞ্চাল, কাশী, হৈহয়, কলিঙ্গ অস্মক, কুরু, মৈথিল, সুরসেন এবং বিতিহোত্র। ঐতিহাসিক অন্য উপাদান থেকেও পৌরাণিক বক্তব্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। *কথাসরিৎসাগর*-এ কোশলের অন্তর্গত অযোধ্যায় মহাপদ্মের সামরিক ছাউনির উল্লেখ আছে। এ থেকে মনে হয় যে কোশলের ইক্ষবাকু অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখতে একটি কৃত্রিম জলপ্রণালী প্রসঙ্গে নন্দরাজের নামোল্লেখ আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে মহাপদ্ম কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী তীরে "নব নন্দ ডেহরা" আবিষ্কার থেকে মনে হয় যে দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মহীশূরের একটি লেখ, কুন্তলের (বোম্ভবাই প্রদেশের দক্ষিণ এবং মহীশূরের উত্তর-পশ্চিম অংশ) উপর তাঁর প্রভুত্বের আভাস দেয়। কিন্তু এই লেখ অনেক পরবর্তীকালে হওয়ায়, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, কলিঙ্গ জয়ের পর তিনি যে অস্মক এবং আরও দক্ষিণস্থ অঞ্চল জয় করেন নি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সর্বোপরি প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় পুরাণের বক্তব্য সমর্থিত হয়। তাঁরা লিখেছেন যে আলেকজান্ডার যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন, তখন বিপাশা নদীর অপর তীরের শক্তিশালী মানুষেরা এমন একজন রাজার অধীনে বাস করত, যাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। এই রাজা অবশ্যই ছিলেন নন্দবংশের শাসক ধননন্দ। মহাপদ্মনন্দের এই বিস্তৃত রাজ্যজয় স্মরণে রেখে ডঃ রায়চৌধুরী তাঁকে ঐতিহাসিক যুগে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।

ধননন্দ আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক লেখকদের কাছে তিনি ছিলেন 'আগ্রামেস'। তিনি শক্তিশালী শাসক ছিলেন। গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে তাঁর ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০০ পদাতিক, ২০০০ রথ এবং ৩০০০ হাতি ছিল। গঙ্গাহৃদি এবং প্রাসি (Gangaridae and Prasi) তাঁর শাসনাধীন ছিল। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে 'গঙ্গাহৃদি' বলতে গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপস্থ অধিবাসীদের বোঝাত এবং 'প্রাসী' বলতে প্রাচ্যগণ অর্থাৎ পঞ্চাল, সুরসেনা কোশল-কাশী ও বিদেহ'র অধিবাসীবৃন্দদের বোঝাত। বিপুল সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁকে অত্যধিক কর আদায় করতে হত। সাধারণের প্রতি তার ব্যবহারও মোটেই ভাল ছিল না। এর ফলে জনগণমনে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তক্ষশিলার ব্রাহ্মণ কৌটিল্যের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

নন্দরাজগণ একটি বৃহৎ মগধরাজ্য অধিকারের পর বিভিন্ন দিকে এর সীমা সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। গ্রীকদের লেখায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্ডার তাঁর রাজ্যজয়ে পাঞ্জাব অতিক্রম না করায় তাঁরা এই সৈন্যদলকে বিদেশীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ পাননি। তবুও অনুমান করা যায় যে, বিদেশীদের আক্রমণ তাঁদের রাজ্যের সংহতিসাধনে সহায়তা করেছিল।

তাঁদের রাজত্বকালে ভূমিকর রাজস্বের একটি প্রধান উৎস রূপে পরিগণিত হয়েছিল। তখন জমি খুব উর্বর থাকায় এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ খুব বেশি হওয়ায়, ভূমিকরের হার খুব উচ্চ ছিল। নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে এই কর আদায় করা, তাঁদের শাসনব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে রাজকোষে প্রচুর অর্থাগম হত। নন্দদের ধনসম্পদ তাই প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। জলসেচের জন্য খাল খনন করে তাঁরা কৃষির উন্নতি বিধানে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। প্রধানত কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল একটি সাম্রাজ্য গঠনের চিন্তা তখন ভারতীয় মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্য নন্দ রাজাদের এই চিন্তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। মৌর্যযুগে এই সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এ দিক দিয়ে বিচার করলে মৌর্যবংশকে নন্দবংশের উত্তরসাধক বলা যায়।

৩ক.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। মহাজনপদ কাকে বলে ও তার অবস্থান কোথায় ছিল?

২। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রধান প্রধান মহাজনপদগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৩। মগধে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। মগধে সাম্রাজ্য বিকাশের পিছনে অজাতশত্রু ও মহাপদ্মনন্দের অবদান আলোচনা করুন।

৩ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। এইচ. সি. রায়চৌধুরী : *পলিটিকাল হিস্ট্রী অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৭২)*

২। রোমিলা থাপার : *এ হিস্ট্রী অফ্ ইন্ডিয়া (১৯৬৮)*

৩। ডি. এন. ঝাঁ : *এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ইন হিসটোরিক্যাল আউটলাইন (১৯৯৭)*

৪। বিজয় কুমার ঠাকুর : *আরবানাইজেশন ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৬১)*

একক ৩খ ❑ মৌর্য সাম্রাজ্য ঃ সম্প্রসারণ, বিস্তৃতি, শাসনব্যবস্থা ও পতন

গঠন

৩খ.০ উদ্দেশ্য

৩খ.১ প্রস্তাবনা

৩খ.২ মৌর্যযুগ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার

৩খ.২.১ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিস

৩খ.২.২ চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ঃ অর্থশাস্ত্র

৩খ.২.৩ ভূমি রাজস্ব এবং রাজস্ব ব্যবস্থা

৩খ.৩ বিন্দুসার (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২৭৩ অব্দ)

৩খ.৪ অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ)

৩খ.৪.১ কলিঙ্গ যুদ্ধ

৩খ.৪.২ অশোকের রাজ্যসীমা

৩খ.৪.৩ অশোকের শাসনব্যবস্থা

৩খ.৪.৪ অশোকের ধম্ম

৩খ.৫ অশোকের পরবর্তী মৌর্যগণ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

৩খ.৫.১ মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

৩খ.৬ অনুশীলনী

৩খ.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩খ.১ প্রস্তাবনা

এই এককের জন্য আলোচিত হবে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এই প্রসঙ্গে আরও জানতে পারবেন চন্দ্রগুপ্তের আমলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও তার শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বিবরণ থেকে মৌর্য শাসনব্যবস্থার সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা পাওয়া যায় তাও এই এককের মাধ্যমে জানতে পারবেন।

বিন্দুসারের রাজত্বকালের পর মৌর্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন মৌর্য তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক

বিখ্যাত সম্রাট—অশোক। কলিঙ্গ বিজয়ের পর তিনি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে নতুন এক ধর্মে দীক্ষিত হন। অশোকের এই ধর্মীয় পরিবর্তন তাঁর রাষ্ট্রনীতি এবং অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে আপনি আরও জানতে পারবেন অশোকের ধম্ম কবে এবং কেন প্রচারিত হয়েছিল, আর তার স্বরূপই বা কী ছিল, এবং এই বৌদ্ধধর্মের সমার্থক বলা যায় কি না।

সবশেষে আপনি জানবেন অশোকের পরবর্তী মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের নানা কারণ।

৩খ.২ মৌর্য যুগ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে, মৌর্যদের আবির্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

চন্দ্রগুপ্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪-৩০০ অব্দ) এক যুগসন্ধিক্ষণে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। তাঁর পূর্বে নন্দরাজগণ দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একদিকে ছিল জনগণের অসন্তোষ এবং অন্যদিকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে বিদেশীদের অধিকার বিস্তার। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দায়িত্ব ছিল বৃহৎ এবং বিবিধ। প্রথমত, জায়মান মগধ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা ও তার সম্প্রসারণ ঘটানো। দ্বিতীয়ত, কার্যকরভাবে বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করা। তৃতীয়ত, বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে, ভারতের রাজনীতিতে রাজচক্রবর্তী আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। চতুর্থত, বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে অজস্র চরিতার্থতা লাভের জন্য ভারতীয়দের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করা এবং পঞ্চমত সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত এবং বহির্জগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তখন ভারতের ইতিহাসে একজন বীরপুরুষের প্রয়োজন ছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সেই আকাঙ্ক্ষিত বীর।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনে আরোহণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে। সাধারণত চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের যে তারিখটি পাওয়া যায়, সেটি খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫-৩২৪ অব্দ।

ভারতীয় লেখকগণ চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেন নি। তাই এটিও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বংশের নাম যে মৌর্য এ বিষয়ে সকলে একমত। বৌদ্ধ লেখকগণ ‘মৌর্য’ শব্দটি একটি গোষ্ঠীর নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এবং এই গোষ্ঠী বুদ্ধের সময় থেকে ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত ছিল। *মহাপরিনিব্বাসুত্ত*-এ এর অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর যেসব গোষ্ঠী তাঁর দেহাবশেষ সংগ্রহের জন্য এসেছিল তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় মোরিয়গণও ছিল। তারা ছিল গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত পিপ্পালিবনের একটি ক্ষুদ্র গণরাজ্যের শাসক। ঐতিহাসিকেরা এখন এ বিষয়ে একমত যে, এই মোরিয়গণই মৌর্যদের পূর্বসূরী।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্য ঐতিহাসিক উপাদান বহু এবং বিচিত্র। এই উপাদান প্রধানত সাহিত্য হলেও, অশোকের লেখ ছাড়াও মহীশূরলেখ এবং শক ক্ষত্রপ রুদ্রমানদের জুনাগড় স্তম্ভলেখ চন্দ্রগুপ্তের জন্য প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদানরূপে স্বীকৃত।

চন্দ্রগুপ্তের জন্য আমরা বিদেশী সাহিত্যের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই সাহিত্য না থাকলে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা অস্পষ্ট থেকে যেত। ভারতের ইতিহাসে কালানুক্রমিক বিবরণের সূচনা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণের তারিখ থেকে। এই তারিখটির সন্ধান বিদেশীদের লেখায় পাওয়া গেছে। সুতরাং বলা যায় যে, তাঁরাই আমাদের কালানুক্রমিক ইতিহাসের সূচনা করেছেন।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে আলেকজান্ডারের তিনজন সঙ্গীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন নিয়ারকাস্ ওনেসিক্রিটাস ও এরিসটোবুলাস।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিসের রচনাকে এঁদের লেখার পরিপূরক বলা যায়। মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থ *ইন্ডিকা* পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক লেখকের রচনায় মেগাস্থিনিস থেকে বহুল উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এই লেখকদের মধ্যে স্ট্রাবো, ডায়োডোরাস, প্লিনি, এ্যারিয়ান, প্লুটার্ক এবং জাস্টিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী সাহিত্য ছাড়া, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য চন্দ্রগুপ্তের জীবন ও সময়কে আলোকিত করে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য বলতে প্রধানত পুরাণ, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র,* বিশাখাদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* এবং অংশত সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* এবং ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জরী* বোঝায়। বৌদ্ধ সাহিত্য হল প্রধানত *দীপবংশ, মহাবংশ, মহাবংশটিকা* এবং *মহাবোধিবংশ*। জৈন গ্রন্থাদির মধ্যে ভদ্রবাহু রচিত *জৈন কল্পসূত্র* এবং হেমচন্দ্র রচিত *জৈনপরিশিষ্ট পর্বণ* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তামিল সাহিত্যের কথাও স্মরণীয়। প্রাচীন তামিল লেখক মামুলনারের রচনায় বারংবার মৌর্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের জুন মাসে। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আবস্থা তখন কোন সাহসী, দুরদৃষ্টি ও সংগঠন শক্তিসম্পন্ন নেতার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল।

গাঙ্গেয় অঞ্চল তখন দুটি সুনির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত ছিল। সমসাময়িক গ্রীক লেখকেরা এই দুটি অংশের নাম দিয়েছিলেন প্রাসি এবং গঙ্গাহৃদি। প্রাসি বলতে বোঝাত বর্তমান বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং হয়তো গঙ্গার দক্ষিণস্থ কিছু অঞ্চল। গঙ্গাহৃদি বলতে বোঝাত গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে এই দুইটি অঞ্চল নন্দদের একচ্ছত্র শাসনাধীনে ছিল। অর্থাৎ উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ অংশের উপর নন্দরাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নন্দরাজগণ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। প্লুটার্ক লিখেছেন যে পুরুর সৈন্যদলের দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ম্যাসিডনের সেনাবাহিনীর মনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল এবং আগ্রামেসের দুর্ধর্ষ সৈন্যদলের কথা শুনে তারা আর অগ্রসর হতে সাহস পায়নি। এই আপাত জাঁকজমকের অন্তরালে নন্দ সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল বিশেষ দুর্বল। এর পিছনে জনগণের প্রকৃত সমর্থন ও আনুগত্য ছিল না। গ্রীক লেখকগণ লিখেছেন যে, আগ্রামেসের উদ্ধত আচরণ, অতিরিক্ত করভার এবং হীন জন্ম মানুষের মনে এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। কোন উচ্চাভিলাষী এবং দুঃসাহসিক ব্যক্তি সেই বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারত।

আলেকজান্ডারের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত বা উত্তরাপথ অনেকগুলি রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘর্ষের জন্য, তাদের পক্ষে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে

মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ আলেকজান্ডারকে সাহায্য করেছিল। আলেকজান্ডার যে সহজেই উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করতে পেরেছিলেন, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা এইখানে। আলেকজান্ডার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি জয় করেছিলেন এবং তাদের পরিবর্তে কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের জটিলতা দূর হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের অঞ্চলসমূহের পুনর্বণ্টনও তিনি করেছিলেন। ঝিলাম নদীর পূর্বদিকের পাঞ্জাব দিয়েছিলেন পুরুকে। সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্তী ভূভাগ শাসনের ভার পেয়েছিলেন তক্ষশিলার অম্ভি, মোটামুটিভাবে উত্তর পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন আবিসারেস। সিন্ধুদেশে নদীগুলির সঙ্গমস্থলের নিচের অংশের দায়িত্ব পেয়েছিলেন পেইথন। পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন ফিলিপ্পস। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দের অক্টোবরে আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে ভাড়াটে গ্রীক সৈন্যদের হাতে ফিলিপ্পস নিহত হন এবং তাঁর জায়গায় আসেন ইউডামাস। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দের জুন মাসে আলেকজান্ডারও মারা যান।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌঁছানো মাত্র এখানে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং ভারতীয়গণ তাঁদের পূর্ব প্রতিপত্তি ও গৌরব দ্রুত ফিরে পেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং অল্পকাল পরে সেখানে ক্ষমতার শূন্যতার সৃষ্টি করে আলেকজান্ডার সেখানে মৌর্য সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এদিকে লক্ষ্য রেখে ডঃ রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন যে, যদি উগ্রসেন মহাপদ্মকে পূর্ব ভারতে মৌর্যসাম্রাজ্যের অগ্রদূত বলা যায়, তাহলে আলেকজান্ডার ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে সেই সাম্রাজ্যের পূর্বসূরী। নন্দবংশ মানুষের মনে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ সৃষ্টি করে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ের পথ প্রস্তুত করেছিল এবং বিস্তৃত মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মৌর্য সাম্রাজ্যের আংশিক খসড়া রচনা করেছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন সিংহাসনে বসেছিলেন, তখন কী উত্তরাপথে, কী মধ্যদেশে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে তাঁর অনুকূলে ছিল। তাঁর কাজ কঠিন ছিল, কিন্তু বোধহয় অসম্ভব ছিল না।

চন্দ্রগুপ্ত কীভাবে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, তার কোন সমসাময়িক বিবরণ পাওয়া যায়নি। এজন্য আমাদের পরবর্তীকালের উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন লেখকেরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। মিলিন্দ পঞ্‌হ-তে এই ঘটনাকে মৌর্যদের সঙ্গে নন্দদের যুদ্ধরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জাস্টিনের রচনায় যেমন চাণক্যের গৌরবের কাছে চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব ম্লান হয়ে গেছে, মিলিন্দ পঞ্‌হ-তে তা হয়নি। কিন্তু পুরাণে, সিংহলী ইতিবৃত্তে এবং কামন্দকের *নীতিশাস্ত্র*-এ ব্রাহ্মণ চাণক্যকে সকল গৌরবের অধিকারী করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ (অথবা নবম) শতাব্দীর নাটক *মুদ্রারাক্ষস*-এও তাই।

নন্দবংশের শাসন দুই দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছিল। একদিকে এই রাজবংশ জনগণের সদিচ্ছা লাভ করতে পারেনি, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা অথবা নীতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। তাই এই বংশের উচ্ছেদকে মগধের এবং ভারতের ইতিহাসে একটি বাঞ্ছিত পদক্ষেপ বলা চলে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের পরাজিত করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় কৃতিত্ব। এ বিষয়ে জাস্টিন লিখেছেন যে, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিদের

হত্যা করে স্বাধীনতার সৃষ্টি করেছিলেন স্যানড্রাকোটাস বা চন্দ্রগুপ্ত। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠিক কখন শুরু ও শেষ হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মনে হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩১৭ অব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ শেষ হয়নি।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের শেষভাগে সেলুকাসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সেলুকাস ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের সেনাপতি এ্যান্টিওকসের পুত্র। তিনি প্রথম দিকে আলেকজান্ডারের সেনাপতি ছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পূর্ব সাম্রাজ্য শাসনের অধিকার লাভ করেন। পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাবিলন এবং ব্যাকট্রিয়া জয় করেন এবং পরে ভারতে আলেকজান্ডারের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ভারত আক্রমণ করেন। এ্যাপ্পিয়ানের লেখা থেকে মনে হয় যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের সংঘর্ষের পূর্বে সিন্ধুনদ উভয়ের রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল।

প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই এই যুদ্ধ কবে আরম্ভ হয়েছিল। এবং কত দিন চলেছিল, সবই অনিশ্চিত। এ্যাপ্পিয়ান লিখেছেন যে উভয়ের মধ্যে সন্ধি এবং বিবাহ সম্পর্কিত চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলেছিল। অনেকে মনে করেন সেলুকাস খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে সিন্ধুতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। জাসিনটন লিখেছেন যে, আন্তিগোনাসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আগে সেলুকাস এই সন্ধি স্বাক্ষর করেন।

ভারতের অন্যত্র চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ এবং রাজ্যজয় সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রাচীন গ্রীক লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না। শুধু প্লুটার্কের একটি অস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সমগ্র ভারত বিধ্বস্ত ও পদানত করেছিলেন। শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় স্তম্ভলেখ থেকে চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র জয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই লেখতে চন্দ্রগুপ্তের "রাষ্ট্রীয়" (উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী) পুষ্যগুপ্তের উল্লেখ আছে, যিনি সেখানে বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। ভৌগোলিক দিক থেকে অবন্তী জয় না করে সৌরাষ্ট্রে প্রবেশ সম্ভব ছিল না। সুতরাং মনে হয়, তিনি অবন্তীও জয় করেছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে মগধ সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পর্কে নিশ্চিত ও সরাসরিভাবে কিছু বলা যায় না। এই বিষয় জানতে হলে আমাদের পরবর্তীকালে তথ্যসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এই বিস্তৃতির জন্য অশোকের কোন কৃতিত্ব ছিল না। এদিকে কলিঙ্গ বিজয়ই তাঁর একমাত্র কীর্তি, সুতরাং এই বিস্তারে লাভ অশোকের পূর্ববর্তী কোন রাজার সময় ঘটেছিল। যতদূর জানা যায়, বিন্দুসার কোন নতুন রাজ্য জয় করেন নি। তিনি কয়েকটি বিদ্রোহ দমন করেছিলেন মাত্র। সুতরাং এই বিস্তৃতি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় হয়েছিল। মহীশূর লেখতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কয়েকটি লেখতে বলা হয়েছে মহীশূরের অংশবিশেষ চন্দ্রগুপ্তের রক্ষণাধীনে ছিল। কিন্তু এই সাক্ষ্য পরবর্তীকালের হওয়ায় এর উপর নির্ভর করা যায় না। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের কিছুসংখ্যক তামিল লেখক লিখেছেন যে, "ভম্বা মোরিয়"-গণ বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করেছিল। এই "ভম্বা" শব্দটির অর্থ "ভুঁইফোড়"। বিন্দুসার অথবা অশোক সম্পর্কে এই শব্দটি প্রযোজ্য ছিল না। একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কেই এটি ব্যবহৃত হতে পারত। সুতরাং কোন নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও, বিপুল ও সুদৃঢ় ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে, দক্ষিণ ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রসারলাভের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের নাম অনায়াসে জড়িত করা যায়। বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত থানা জেলায় সুর্পারক অথবা সোপারায় অশোকের একটি লেখ পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয়, এই অঞ্চলটিও চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। অনেক পরবর্তীকালে জৈন ঐতিহ্য অনুসারে তিনি শেষ জীবনে সংসার ত্যাগ করেন, ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে জৈন অভিপ্রয়াণে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণ-বেলগোলায় এসেছিলেন। সেখানে তৎকালীন প্রচলিত জৈন রীতি অনুসারে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ)।

জৈন ঐতিহ্য অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু মেগাস্থিনিসের বর্ণনা এ বিষয়ে সন্দেহ উদ্রেক করে। তাঁর বর্ণনা থেকে চন্দ্রগুপ্তকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে হয়। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে চন্দ্রগুপ্ত অন্তঃপুরে রণরঙ্গিণী দেহরক্ষিণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের দিন তিনি বাইরে আসতেন। প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ আরও লিখেছেন যে, অন্যান্য রাজাদের মতো চন্দ্রগুপ্তও পূজাবেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

৩খ.২.১ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা ঃ মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রধানত মেগাস্থিনিসের রচনা এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এর উপর নির্ভর করতে হয়। অশোকের লেখগুলিও আংশিকভাবে আমাদের সাহায্য করে। অশোকের লেখ থেকে তৎকালীন শাসনব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে, অশোক এ বিষয়ে যে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অংশ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে মোটামুটিভাবে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা বলা যায়। শক ক্ষত্র্যা রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ, পরবর্তীকালের হলেও, চন্দ্রগুপ্তের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার উপর আলোকপাত করে। এছাড়া *দিব্যবদান, মুদ্রারাক্ষস* এবং জৈন *পরিশিষ্ট পর্বণ,* যথাক্রমে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন ঐতিহ্যের ধারক এই তিনটি গ্রন্থকেও চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গৌণ উপাদান বলা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, মেগাস্থিনিসের মূল রচনা *ইন্ডিকা* পাওয়া যায় নি, কিন্তু পরবর্তীকালের অনেক লেখক তাঁদের গ্রন্থসমূহে মেগাস্থিনিস থেকে বহু উদ্ধৃতি সঙ্কলন ও সম্পাদনা করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মেগাস্থিনিস সম্পর্কিত আলোচনায় সোয়ানবেকের মতামত তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জার্মান ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ভ্যাকক্রিডল।

এরিয়্যান, স্ট্রাবো এবং প্লিনির লেখা থেকে জানা যায় মেগাস্থিনিস সেলুকাসের প্রতিনিধি হয়ে প্রথমে এ্যারাকেসিয়ার শাসক সিবিরটায়সের কাছে এসেছিলেন। পরে তিনি সেখান থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে আসেন। তিনি ঠিক কখন এসেছিলেন এবং এদেশে কতদিন ছিলেন, তা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলুকাসের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তিনি এসেছিলেন। কারও কারও মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০২-২৮৮ অব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়, আবার অনেকের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০২ অব্দের আগে তিনি এদেশে এসেছিলেন। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, মেগাস্থিনিস একাধিকবার ভারতে এসেছিলেন। সোয়ানবেক এই মত মেনে নিতে রাজি নন। তিনি মনে করেন যে, মেগাস্থিনিস দীর্ঘকাল পাটলিপুত্রে ছিলেন, তাই এদেশ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

সোয়ানবেক বলেছেন যে, দোষত্রুটি সত্ত্বেও মেগাস্থিনিসের রচনায় প্রাচীন ভারত সম্পর্কে গ্রীকদের জ্ঞান সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। তাঁর রচনার গুরুত্ব শুধু তার নিজস্ব গুণের নয়, পরবর্তী লেখকেরা তার বহুল ব্যবহার করায়, এই রচনা গ্রীক ও ল্যাটিন জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই জন্যও। বিভান বলেছেন

যে, কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য জগৎ যে ভারতকে জানত, তা আলেকজান্ডারের সঙ্গীদের এবং মেগাস্থিনিসের বর্ণিত ভারত। অন্যান্য উপাদান থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় অনেক সময় মেগাস্থিনিসের রচনায় তার সমর্থন মেলে এবং এইভাবে জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হয়। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাঁর কালসীমা স্পষ্ট হওয়ায়, তিনি একটি নির্দিষ্ট যুগের ভারত চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, বলা যায়। *অর্থশাস্ত্র*-এর সঙ্গে তুলনায়, ইতিহাসের উপাদান হিসাবে, মেগাস্থিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে।

মেগাস্থিনিস গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিপুত্রকে ভারতের বৃহত্তম নগর বলে উল্লেখ করেছেন। এই নগরের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থ পৌনে দুই মাইল। দুই শত ফুট চওড়া এবং ষাট ফুট গভীর জলপূর্ণ পরিখা দ্বারা এটি বেষ্টিত ছিল। এই পরিখার সঙ্গে সমান্তরাল একটি কাঠের বেষ্টনী এই নগরকে ঘিরে ছিল। এতে ৫৭০টি দুর্গ এবং ৬৪টি তোরণ ছিল। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, ভারতে ১১৮টি শহর ছিল। নদী অথবা সমুদ্রের নিকটবর্তী শহরগুলি ছিল কাঠের তৈরি, আর দূরবর্তী অথবা উচ্চস্থানে অবস্থিতি ছিল ইটের তৈরি।

মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, পাটলিপুত্র নগরীতে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ গ্রীকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁদের মতে সুসা অথবা একবাটানার পারস্য রাজপ্রাসাদ এর তুলনায় ম্লান ছিল। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে পোষা ময়ূর, ছায়ানিবিড় কুঞ্জ এবং বৃক্ষের দ্বারা আকীর্ণ চারণক্ষেত্র ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত এই প্রাসাদের অভ্যন্তরে রণরঙ্গিনী নারী দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। স্ট্রাবো লিখেছেন যে, তিনি শুধু যুদ্ধের সময় বিচারসভায় বিচারকের স্থান গ্রহণের জন্য, যজ্ঞে আহুতি দানের প্রয়োজনে এবং মৃগয়ার জন্য বাইরে আসতেন। কিন্তু হত্যার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হত বলে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। শাসনব্যবস্থায় তিনি সর্বোচ্চ অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামরিক, বিচারবিষয়ক, শাসন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সব দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হত। সারাদিন তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে, তাঁর দিবা-নিদ্রার সুযোগ ছিল না। তিনি সারাদিন রাজসভায় থাকতেন, বিচার ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজের দেখাশুনা করতেন। দেহচর্চার সময় হলেও তাঁর এই কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হত না। তিনি যখন কেশচর্চা, অথবা পোশাক পরিধান করতেন, তখনও রাষ্ট্রের কাজ থেকে তাঁর অব্যাহতি ছিল না। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করার জন্য একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। মেগাস্থিনিস ভারতীয় জনসমষ্টিকে সাতটি জাতিতে ভাগ করেছিলেন। তার এই তালিকায় সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে উপদেষ্টা এবং মূল্য অথবা রাজস্ব নিরূপকদের (কাউন্সিলরস্ ও এ্যাসেসরস্)। এরাই রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য করতেন। সংখ্যায় কম হলেও, তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। তাঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌবাহিনীর অধিনায়ক, বিচারক এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্বাচন করতেন। মেগাস্থিনিসের তালিকায় ষষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে উপদর্শকদের (ওভারসিয়ারস) এই উপদর্শকদের প্রকৃত কার্য কী ছিল, স্পষ্ট জানা যায় না। বাসাম মনে করেন যে, মেগাস্থিনিস যাঁদের "উপদর্শক" বলেছেন, *অর্থশাস্ত্র*-এ তাঁদেরই "অধ্যক্ষ" বলা হয়েছে। কোশাম্বি বলেছেন যে, এই উপদর্শকগণ রাজাকে সব কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত রাখতেন। তাঁর মত সত্য হলে, এই উপদর্শকগণ গুপ্তচর বিভাগের অঙ্গ ছিলেন। মেগাস্থিনিস অবশ্য এঁদের ছাড়া অন্য গুপ্তচরের

(এপিস্‌কোপই) উল্লেখ করেছেন। তারা কখনও রাজার কাছে এবং গণতন্ত্রশাসিত অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করত। অশোকের লেখতে যে প্রতিবেদকের উল্লেখ আছে, তারা এই গুপ্তচরদের নামান্তর। এমনকি গুপ্তচরবৃত্তিতে গণিকাদেরও কাজে লাগানো হত, তার দ্বিধাহীন উল্লেখ তিনি করেছেন।

মেগাস্থিনিস জেলা শাসনের উপর আলোকপাত করেছেন। এই শাসনের ভারপ্রাপ্ত বেসামরিক কর্মচারীদের তিনি "এ্যাগ্রোনময়" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁদের যে কর্ম-তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে আছে ঃ (১) নদীর তত্ত্বাবধান, (২) জলকপাট পরিদর্শন, (৩) জমির পরিমাপ (অশোকের সময় রজজুকদের এটি অন্যতম কর্তব্য ছিল), (৪) শিকারীদের ভারগ্রহণ, প্রয়োজনমতো তাদের পুরস্কার প্রদান অথবা শাস্তি বিধান, (৫) কর সংগ্রহ, (৬) জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রধর কর্মকার, খনিশ্রমিক ইত্যাদির কাজের তত্ত্বাবধান এবং (৭) পথ ও স্তম্ভ নির্মাণ ও পথে দূরত্বজ্ঞাপক চিহ্ন স্থাপন। মেগাস্থিনিস এইভাবে যে ব্যাপক বেতনভুক্ত আমলাতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, *অর্থশাস্ত্র* -এর বর্ণনার সঙ্গে তার বিশেষ মিল দেখা যায়। এই আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। মেগাস্থিনিস এ্যাগ্রোনময়ের যে কর্ম-তালিকা দিয়েছেন, তার সঙ্গে *অর্থশাস্ত্র*-র সমহত্রীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে পৌর শাসনব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 'অস্টিনময়' বলে উল্লেখ করেছেন। এরা ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতিটি সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ। প্রতিটি সমিতি পৃথকভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভার পেত। সমিতিগুলি যথাক্রমে যে বিষয়গুলির ভার পেত, সেগুলি হল (১) শ্রম-শিল্প, (২) বৈদেশিকগণ (৩) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব, (৪) খুচরা ব্যবসায়, ওজন ও মাপ, (৫) শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং (৬) বিভিন্ন দ্রব্যের বিক্রীত মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসেবে আদায়। ছয় সমিতি সমষ্টিগতভাবে, সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির (যেমন সাধারণের প্রয়োজনে নির্মিত অট্টালিকাসমূহের সংস্কার, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বাজার, শ্রমিক ও মন্দিরে তত্ত্বাবধান ইত্যাদি) দায়িত্ব গ্রহণ করত।

মেগাস্থিনিস পৌর শাসনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, অন্য কোথাও তার সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই অনেকে এই বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে এই বিবরণকে যথার্থ মনে করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পৌর শাসনের এই রেখাচিত্র আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বাসাম এই পৌর শাসন সম্পর্কে ততটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন, পাটলিপুত্রে যেভাবে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা হত এবং বিদেশীদের গতিবিধির উপর যেভাবে কড়া নজর রাখা হত, তাতে পাটলিপুত্রের তৎকালীন অবস্থার সঙ্গে আধুনিক পুলিশ রাষ্ট্রের অবস্থার তুলনা করা যায়।

মেগাস্থিনিস, এ্যাগ্রোনময় এবং অস্টিনময় ভিন্ন তৃতীয় একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর উল্লেখ করেছেন। এঁরা সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কৌটিল্য বর্ণিত বলাধ্যক্ষের সঙ্গে এঁদের মিল পাওয়া যায়। অস্টিনমির মতো এঁরাও ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতি সমিতিতে পাঁচজন সদস্য থাকত। ছয়টি সমিতি যথাক্রমে নৌবহর, সৈন্যদলের রসদ সরবরাহ ও যানবাহন, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ এবং হস্তী, এই ছয়টি বিভাগের দায়িত্ব পেত। তার এই বর্ণনা কতটা সত্য ছিল, এ সম্পর্কে বাসাম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মেগাস্থিনিস এখানে পৌর সংগঠন কাঠামোরই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মেগাস্থিনিস স্থায়ী সৈন্যদলের উল্লেখ করেছেন। প্লুকার্ট লিখেছেন, সৈন্যসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। মেগাস্থিনিস

লিখেছেন, সংখ্যার দিক থেকে, কৃষকদের পরেই সৈন্যদের স্থান ছিল। এ্যারিয়ান লিখেছেন, ভারতীয় ধনুক ছিল ছয় ফুট লম্বা। মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ভারতীয় তীরন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করবার সাধ্য কারও ছিল না। তাদের লম্বা তীর যুগপৎ ঢাল এবং বক্ষবর্ম ভেদ করে যেত। মেগাস্থিনিস আরও লিখেছেন যে, আশেপাশে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চললেও কৃষকেরা নির্বিঘ্নে জমি চাষ করতে পারত। বাসাম এই উক্তিকে অতিরঞ্জিত মনে করেন।

মেগাস্থিনিস সৈন্যদল প্রসঙ্গে ঘোড়া ও হাতির জন্য রাজকীয় আস্তাবল এবং রাজকীয় অস্ত্রাগারের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ঘোড়া, হাতি বা অস্ত্র, কোনকিছুই সৈনিকের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না। ওগুলি ছিল রাজার সম্পত্তি। যুদ্ধ শেষ হলে, ঘোড়া বা হাতি আস্তাবলে এবং অস্ত্রাদি রাজকীয় অস্ত্রাগারে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

৩খ.২.২ চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ঃ অর্থশাস্ত্র

অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ভারতবাসীর কোন পরিচয় ছিল না। ১৯০৫ সালে, মহীশূরের পণ্ডিত, ডঃ শাম শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন। ১৯০৯ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত এই গ্রন্থের রচয়িতা। লেখক এই গ্রন্থে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করেন নি। তিনি রাষ্ট্রের তত্ত্ব ও নীতি আলোচনা করেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি অক্ষত অবস্থায় প্রকাশিত হয়নি। মূল গ্রন্থের শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ অংশ হারিয়ে গেছে। কোন একটি অধ্যায়ে পুরোপুরিভাবে নয়, সব অধ্যায়েরই কিছু কিছু অংশ, পুনরায় নকল ককরার সময় বাদ পড়ে গেছে।

অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পরবর্তীকালে হলেও, এটি চন্দ্রগুপ্ত বিষয়ক গ্রন্থ। তাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করার আগে *অর্থশাস্ত্র*-এ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয়েছে, তার স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য কী ছিল, জানা প্রয়োজন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সব রাষ্ট্রেই একটি শ্রেণীগত ভিত্তি থাকে। যেমন বলা যায় যে, যজ্ঞপ্রধান ব্রাহ্মণদের উপজাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল ক্ষত্রিয় শ্রেণী, মধ্যযুগের ভারতে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভিত্তি ছিল জমিদার শ্রেণী। *অর্থশাস্ত্র*-এ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করা হয়েছে, তার ভিত্তি দুর্বল, কেননা তার পিছনে কোন স্বাভাবিক এবং ব্যাপক শ্রেণী সমর্থন ছিল না।

অর্থশাস্ত্র-এর নীতিসমূহ যখন রচিত হয়েছিল, ভারতে আর্য উপজাতিদের ধ্বংসসাধন তখনও শেষ হয়নি, যদিও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লাভের ফলে তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ভারতে বিস্তৃত এবং গভীর অরণ্য অঞ্চল পরিষ্কার করার কাজ তখনও বাকি ছিল। কৌটিল্যের রাষ্ট্রকে তাই এই কাজে প্রধানত আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। এই রাষ্ট্রই ছিল বৃহত্তম জমিদার, ভারি শিল্পের শ্রেষ্ঠ মালিক, প্রধান পণ্য-উৎপাদক। রাষ্ট্রের এই বিবিধ ভূমিকার প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছিল একটি বৃহৎ শাসকগোষ্ঠী। বিভিন্ন স্তরের আমলাতন্ত্র পাঁচ লক্ষ সৈন্যের একটি স্থায়ী বাহিনী এবং বিরাট গুপ্তচর শ্রেণী, এরাই এই নতুন রাষ্ট্রের প্রধান সমর্থক ছিল। যে গৃহপতি-কৃষক-বণিক শ্রেণী এই গাঙ্গেয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্ভব করেছিল, তার শাসন পরিচালনায় তাদের কোন স্থান ছিল না। যে ব্যাপক গুপ্তচর ব্যবস্থা যুবরাজ থেকে শুরু করে হীনতম গ্রামবাসীর উপর কড়া নজর রাখত, সেই ব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, আমলাতন্ত্রের বাইরে এই রাষ্ট্রের কোন শ্রেণীসমর্থন ছিল না।

অর্থশাস্ত্র-র রাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী এবং সর্বোচ্চ একচেটিয়া অধিকার ভোগী। এই অধিকার প্রয়োগের পক্ষে যে উপজাতীয় প্রথাগুলি অন্তরায়, এতে সেগুলি ধ্বংস করার সুস্পষ্ট বিধান ছিল। কিন্তু তবুও এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা বলবান মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে এ তা ছিল না। কেননা, এর অভ্যন্তরে দুর্বলতা বীজ নিহিত ছিল। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন স্থান ছিল না। রাষ্ট্র সব কিছু নিয়ন্ত্রণ এবং সব কিছু থেকে লাভ করত। একজন বেসরকারী ব্যবসায়ীকে "কণ্টক" জ্ঞান করা হত। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে *অর্থশাস্ত্র*-র রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল। *অর্থশাস্ত্র*-র অর্থনীতি ক্রমবর্ধমান যা বাণিজ্য এবং উৎপাদনের বলেই কেবল কার্যকর হতে পারত। তাই পরে লাভজনক এলাকায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের যখন অবসান ঘটল, তখন এই অর্থনীতির ব্যর্থতাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। সব চেয়ে বড় কথা, এই রাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি মৌলিক স্ববিরোধিত ছিল। এই নীতি অনুসারে সমাজের একদিকে ছিল সাধারণ মানুষ, যাদের জন্য আইন-শৃঙ্খলার বিষয়গুলি চরম সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হত, যারা নৈতিক এবং আইনানুগ জীবন যাপন করত, আর অন্যদিকে ছিলেন অনৈতিক রাজা, যাঁর পক্ষে, প্রজা এবং প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যেকোন রকম অপরাধ করায় নীতিগত কোন বাধা ছিল না অশোক তাঁর সংস্কারের দ্বারা এই স্ববিরোধিতা দূর করেছিলেন।

হিন্দু রাষ্ট্রব্যবস্থা কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তর শাসনব্যবস্থায় সেই নীতি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল মনে হয় না। এই নীতি অনুসারে রাজা জনগণের কল্যাণের জন্য দায়ী থাকতেন এবং তাঁকে বর্ণাশ্রম সমর্থন করতে হত। হিন্দুরা রাষ্ট্রকে একটি অবয়ব হিসেবে দেখত। এই অবয়বের যে সাতটি অঙ্গ ছিল তা হল (১) স্বামী (সর্বোচ্চ শাসক), (২) অমাত্য (মন্ত্রী), (৩) পুর (শহরাঞ্চল), (৪) রাষ্ট্র (গ্রামাঞ্চল), (৫) কোষ (কোষাগার), (৬) দণ্ড (শাস্তি বিধায়ক) এবং (৭) মিত্র। এদের সকলকে নিয়ে একটি মণ্ডল বা চক্র গঠিত হত। রাজাকে তাই 'চক্রবর্তী' বলা হত। তিনি এই চক্রের কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করতেন।

প্রাচীন ভারতে মনে করা হত যে মাৎস্যন্যায় দূর করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান অঙ্গ ছিল চারটি : রাজা, সচিব অথবা অমাত্য, মন্ত্রিপরিষদ এবং অধ্যক্ষ। রাজার উপাধি ছিল রাজন্। এই রাজন শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে দুই প্রকার মত প্রচলিত আছে। কেননা সংস্কৃতে রঞ্জন শব্দের, যা থেকে রাজন শব্দের উৎপত্তি, দুইটি অর্থ। একটি আলো দান করা অন্যটি আনন্দ দান করা। সুতরাং রাজন, আলো অথবা আনন্দের উৎসরূপে বিবেচিত হতেন বলা যায়।

তাঁর অপর একটি উপাধি ছিল, "দেবানাং পিয়"। সমসাময়িক সিরিয়ার রাজা এ্যান্টিওকাসের উপাধি ছিল "থিয়স" অর্থাৎ দেবতা। কিন্তু পাটলিপুত্রে দেবতা নয়, "দেবতাদের প্রিয়", শাসন করতেন। রাজার সঙ্গে সাধারণ মানুষের তৎকালীন সম্পর্ক নির্ধারণ তিনটি দলিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশোকের ষষ্ঠ শিলালেখতে এবং জুনাগড় শিলালেখতে 'আঋণ্য' অর্থাৎ ঋণ থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। জনসাধারণের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে, তিনি এই ঋণ শোধ করতে পারতেন। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল, এক্ষেত্রে উত্তমর্ণের সঙ্গে অধমর্ণের, অর্থাৎ দেনাপাওনার। সাধারণ মানুষ রাজাকে তাদের উৎপন্ন ফসলের 'ষড়ভাগ', অর্থাৎ এক-ষষ্ঠাংশ কর দিত। বিনিময়ে, তিনি তাদের রক্ষা করতেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত, এমনকি হত্যা করা যেত। প্রজার সঙ্গে রাজার পিতৃত্বের সম্পর্কও ছিল। অশোকের লেখতে সে কথা জানা যায়।

রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রকাশ ও প্রতীক। তাঁর ক্ষমতার উপর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ তেমন কিছু ছিল না। তবে রাজকীয় কর্তৃত্ব সৃষ্টির পূর্ব থেকে কিছু বিধান প্রচলিত ছিল, যেগুলিকে 'পোরান পকিতি' বলা হত। পরম শক্তিশালী রাজাও এগুলিকে মর্যাদা দিতেন। জনগণের প্রতি তাঁর নৈতিক দায়িত্ববোধ তাঁকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিত না। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ রাজশক্তিকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করত। এসব সত্ত্বেও চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থাকে "উদার স্বেচ্ছাতন্ত্র" ভিন্ন অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় না।

অর্থশাস্ত্র-এ যে রাজার কথা বলা হয়েছে, তাঁকে অসাধারণ গুণের হতে হত। সেখানে আছে যে, তিনি হবেন তেজোময় এবং সদা-জাগ্রত। তিনি প্রতিদিনের কিছু অংশ অধ্যয়নে এবং চিন্তায় ব্যয় করবেন। রাজ্যের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কর্মব্যস্ত মানুষ। দিবারাত্রির প্রতিটি প্রহরে তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন। কার্যনির্বাহী বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল রাজার। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করতেন, সাধারণ মানুষ এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য অনুশাসনগুলি প্রচার করতেন। চন্দ্রগুপ্ত সঞ্চারদের মতো গূঢ় পুরুষের সাহায্যে এবং অশোক ভ্রাম্যমাণ বিচারকদের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতেন। বিস্তৃত পথ এবং স্থানে স্থানে নির্মিত দুর্গ তাঁদের একাজে সাহায্য করত। *অর্থশাস্ত্র*-এ প্রহরী মোতায়েন করা, আয়ব্যয়ের হিসাব দেখা, শহর ও গ্রামের মানুষের বিভিন্ন ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য রাখা,অধ্যক্ষনিয়োগ করা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ও গুপ্তচরদের নিকট থেকে গোপন সংবাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি, তাঁর কার্যনির্বাহী ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাজা যে শুধুমাত্র কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান ছিলেন, তাই নয়। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সর্বোচ্চ বিচারক এবং ধর্মপ্রবর্তক (আইন প্রণেতা)। সর্বাধিনায়করূপে তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকবাহিনীর তত্ত্বাবধান এবং প্রধান সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ-পরিকল্পনা আলোচনা করতেন। কখনও বা রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের শীর্ষে। শুধু নীতিগতভাবে নয়, কার্যত তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। মেগাস্থিনিসের বিবরণে (পূর্বে আলোচিত) এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। *অর্থশাস্ত্র*-এ রাজার বিচার বিষয়ক দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, রাজদরবারে বিচারপ্রার্থী হয়ে কাউকে যেন দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে না হয়।

রাজা আইন পরিবর্তন করতে না পারলেও তা সংশোধন করতে পারতেন। অশোকের সময় ফৌজদারী আইন বিশেষভাবে সংশোধিত হয়েছিল। তাছাড়া প্রথাগত আইন সম্পর্কে রাজার অধিকার ছিল অনেক ব্যাপার। তিনি প্রথাগত আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, অথবা নাকচ করতে পারতেন। এই বিধানগুলিকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হত এবং রাজকীয় কর্মচারীরা সেগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করতেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ "রাজশাসন" অর্থাৎ রাজকীয় অনুশাসনকে অন্যতম উৎস বলা হয়েছে এবং রাজাকে 'ধর্মপ্রবর্তক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অশোকের অনুশাসনগুলি রাজার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার নিদর্শন হয়ে গেছে।

কৌটিল্য বলেছেন যে, একমাত্র অন্যের সাহায্যে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং তিনি সচিবদের নিযুক্ত করবেন এবং তাদের মতামত শুনবেন। কৌটিল্যের এই "সচিব" অথবা "আমাত্য"-দের সঙ্গে মেগাস্থিনিস তাঁর বর্ণনায় যাদের সপ্তম স্থান দিয়েছেন, সেই "উপদেষ্টা এবং রাজস্বনিরূপক"দের বিশেষ মিল দেখা যায়। সংখ্যায় কম হলেও এই শ্রেণীর প্রভাব কম ছিল না।

এই সচিব অথবা অমাত্যদের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের বলা হত মন্ত্রিণ। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, এই মন্ত্রিণগণের সঙ্গে অশোকের সময়ের 'মহামাত্র'দের বিশেষ মিল আছে। অমাত্যগণের মধ্যে যাঁরা প্রলোভনের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাদের মধ্যে থেকে মন্ত্রিণগণ হতেন। তাঁরা সর্বোচ্চ বেতন, বাৎসরিক ৪৮,০০০ পাণ (রৌপ্য মুদ্রা) পেতেন। শাসনসম্পর্কিত যে-কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে, রাজা তিন-চারজন মন্ত্রিণের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে, মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে মন্ত্রিণগণও আহূত হতেন। যুবরাজদের উপর তাঁদের আংশিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাঁরা রাজার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। কৌটিল্য অবশ্যই অন্যতম মন্ত্রিণ ছিলেন। মন্ত্রিণদের সংখ্যা যে একাধিক ছিল, *অর্থশাস্ত্র*-এ "মন্ত্রিণঃ" শব্দের ব্যবহার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মন্ত্রিণগণ ছাড়া একটি "মন্ত্রিপরিষদ" ছিল। অশোকের লেখতে যে "পরিষদ"-এর উল্লেখ আছে, তা মন্ত্রিপরিষদ। এই মন্ত্রিপরিষদের মৌর্যদের সংবিধানে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্যই 'মন্ত্রিণ' ছিলেন, এমন নয়। *অর্থশাস্ত্র*-এ "মন্ত্রিপরিষদম্ দ্বাদশামাত্যান কুর্বিতা" এই কথাগুলি আছে। এ থেকে মনে হয় যে, শুধু মন্ত্রিণগণদের তুলনায়, মন্ত্রিপরিষদের স্থান ছিল নিচে। এই পরিষদের সদস্যদের বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র ১২,০০০ পণ। তাছাড়া স্বাভাবিক সময়ে তাঁদের ডাকা হত না। শুধুমাত্র জরুরী অবস্থায় তাঁরা মন্ত্রিণগণের সঙ্গে আহূত হতেন। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ঠিক কত ছিল, বলা যায় না : কৌটিল্য "ক্ষুদ্র পরিষদ"কে নিন্দা এবং "অক্ষুদ্র পরিষদ" বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মনে হয় কৌটিল্য পরিষদের সদস্য সংখ্যা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করে, বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষপাতী ছিলেন।

সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই মন্ত্রিণগণের এবং মন্ত্রিপরিষদের সামনে উপস্থিত করা হত। পরিষদের সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের মতামতও জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই পরিষদের অস্তিত্ব থেকে মনে হয় যে, নিরঙ্কুশ সৈরতন্ত্র সম্ভব ছিল না। তাছাড়া রাজা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করতেন, এমন ইঙ্গিতও *অর্থশাস্ত্রে* পাওয়া যায়।

পূর্বে বর্ণিত দুই শ্রেণীর অমাত্য ছাড়াও তৃতীয় একশ্রেণীর অমাত্য ছিলেন, যাঁরা শাসন ও বিচারবিভাগের পদগুলিতে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তাঁদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং যথোচিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। *অর্থশাস্ত্র*-এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। যে অমাত্যগণ ধর্মীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন তাঁদের দেওয়ানি এবং ফৌজদারী বিচারালয়ে নিয়োগ করা হত। যাঁরা অর্থ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁদের সামাহর্ত্রী (রাজস্ব আদায়ের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত) এবং সন্নিধাত্রী (কোষাগারের ভারপ্রাপ্ত) পদে নিযুক্ত করা হত। অনুরূপভাবে যাঁরা প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁদের প্রমোদ-উদ্যানে এবং যাঁরা সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাঁদের তাৎক্ষণিক কাজে নিযুক্ত করা হত। যাঁরা অনুত্তীর্ণ হতেন, তাঁদের খনি, কারখানা, হস্তী-অধ্যুষিত অরণ্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত করা হত। অপরীক্ষিত অমাত্যগণ সাধারণ বিভাগে কাজ করতেন। অমাত্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি লেখক (চিঠিপত্র বিভাগে মন্ত্রী) রাজদূত অথবা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হতে পারতেন।

মৌর্যযুগের অমাত্যগণ সর্বপ্রথম সরকারী কর্মচারী হিসাবে একটি পৃথক জাতি বলে গণ্য হতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'অমাত্যকুল' শব্দটির উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিসও তাঁদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে পুরোহিতের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তিনি রাজার ধর্মীয় উপদেষ্টা

ছিলেন। কিন্তু প্রজাদের ধর্মীয় জীবনের উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। তিনি কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে চরম শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হত না। পুরোহিতের পরে স্থান ছিল যুবরাজের। তিনি কার্যনির্বাহী বিভাগের অন্তর্গত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, না সাধারণভাবে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করতেন, তা সঠিক বলা যায় না। সেনাপতি সেনাবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেও কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। তিনি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, না যুদ্ধ-মন্ত্রী ছিলেন, বলা কঠিন। রাজদ্বারের, সুতরাং রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন প্রতিহার। অন্তরবংশিক রাজ-অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধান করতেন।

এঁরা ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষগণ ছিলেন। খনি বিভাগের অকরাধ্যক্ষ, সামরিক এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন বিভগের গো-অধ্যক্ষ, হস্তী-অধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, রথাধ্যক্ষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জলদস্যু দমন, বন্যাপীড়িত মানুষের উদ্ধার, সামুদ্রিক শুল্ক আদায় ইত্যাদি নৌ-অধ্যক্ষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য অধ্যক্ষদের মধ্যে সুতাধ্যক্ষ (কৃষি বিভাগ), সূত্রাধ্যক্ষ (বয়ন শিল্প) শুল্কাধ্যক্ষ (শুল্ক বিভাগ), মদিরাধ্যক্ষ, গণিকাধ্যক্ষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরকারি কর্মচারীদের এই বিস্তৃত তালিকা থেকে সে যুগে জনজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর ব্যাপক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে যুগে প্রতিটি সরকারি কর্মচারীকে তাঁর বেতন নগদ অর্থে দেওয়া হত। সর্বোচ্চ বেতন, বার্ষিক ৪৮,০০০ পাণ পেতেন মন্ত্রিণ, প্রধান পুরোহিত, প্রধানা মহিষী, রাজমাতা, যুবরাজ এবং সেনাপতি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত নিম্নতম শ্রমিকের বেতন ছিল বার্ষিক ৬০ পাণ। সূত্রধন এবং কারিগরেরা পেত বার্ষিক ১২০ পাণ। ভারী অস্ত্রবাহী কোন সৈন্য, সামরিক শিক্ষালাভের পর পেত ৫০০ পাণ। হিসাবরক্ষকের বেতনও অনুরূপ ছিল। খনি বিশেষজ্ঞ এবং স্থপতি বৎসরে ১,০০০ পাণ পেতেন। উত্তম গুপ্তচর যে নানা ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত, সেও একই পরিমাণ অর্থ পেত। নিম্নস্তরের গুপ্তচরদের বেতন ছিল এর অর্ধেক। কার্যরত অবস্থায় পঙ্গু হলে অথবা মৃত্যু হলে নিয়মিত বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল।

তৎকালীন এই ব্যাপক বেতন ও ভাতা দান সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কখনও এমন কিছু দেওয়া হত না, যাতে স্থায়ীভাবে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। কোন কারণে নগদ অর্থের ঘাটতি দেখা দিলে রাজা তাঁর ভাণ্ডার থেকে যেকোন দ্রব্য দান হিসাবে দিতে পারতেন, কিন্তু জমি অথবা সমগ্র গ্রাম দান করার অধিকার তাঁর ছিল না।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পারস্য সীমান্ত থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বৃহৎ সাম্রাজ্য, তৎকালীন অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য, রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে শাসন করা সম্ভব ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাই আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুকরণে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রাদেশিক শাসনকে তাই কেন্দ্রীয় শাসনের অবিকল প্রতিরূপ বলা যায়। দেবানাং পিয় কেন্দ্রে শাসন করতেন, আর যিনি রাজার প্রিয়, তিনি প্রদেশে শাসন করতেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় এই প্রদেশগুলির সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় না। তবে অশোকের সময় মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তরাপথ, অবন্তীপথ, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ ও প্রাচ্য এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এদের রাজধানী

যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি, তোসালী এবং পাটলিপুত্র। এই প্রদেশগুলির মধ্যে কলিঙ্গ অবশ্যই চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দক্ষিণাপথ সম্পর্কে সামান্য অনিশ্চয়তা থাকলেও ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন, এটি সম্ভবত অন্যতম প্রদেশ ছিল। সীমান্তবর্তী প্রদেশের শাসনভার সাধারণত কোন যুবরাজকে দেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ তক্ষশিলার কথা বলা যায়। সেলুকিড বংশ শাসিত যোন রাজ্যের বিরুদ্ধে এখানে সতর্ক দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দক্ষিণে সুবর্ণগিরির শাসনভার "আর্যপুত্রের" উপর ছিল। সাধারণত "আর্যপুত্র" এবং যুবরাজ সমার্থক মনে করা হয়। ডঃ রায়চৌধুরী তা মনে করেন না, ভাসের একটি নাটকে "আর্যপুত্র" শব্দটি "কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান" এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ডঃ রায়চৌধুরী এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচ্য প্রদেশটি সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল।

এই প্রদেশগুলি ছাড়া মৌর্য ভারতে এমন কয়েকটি অঞ্চল ছিল, যেগুলি কতকাংশে স্বাধীনতা ভোগ করত। এ্যারিয়ান স্বয়ংশাসিত জনগোষ্ঠীর এবং গণতন্ত্রশাসিত নগরসমূহের উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য 'সঙ্ঘে'র কথা বলেছেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ কম্বোজ এবং সুরাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালেখতে কম্বোজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। অশোকের পঞ্চম শিলালেখতে (কলসিতে প্রাপ্ত) তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থানকারী যোনগণ, কম্বোজগণ এবং গন্ধারগণের স্পষ্ট উল্লেখের পর, সীমান্তে বসবাসকারী "অন্যান্য"দের সম্পর্কে অস্পষ্ট উচ্চারণ আছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় এই সুরাষ্ট্র তাঁর "রাষ্ট্রীয়" পুষ্যগুপ্তের শাসনাধীন ছিল এবং পুষ্যগুপ্ত বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের তীরে একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। অশোকের লেখতে অথবা *অর্থশাস্ত্র*-এ "রাষ্ট্রীয়" নামধেয় কোন পদের উল্লেখ নেই। তাই "রাষ্ট্রীয়" বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, "রাষ্ট্রীয়" এবং "রাষ্ট্রপাল" হয়তো সমার্থক ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের সময় প্রাদেশিক শাসনের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমত, প্রাদেশিক শাসনসংক্রান্ত পদগুলি বংশানুক্রমিক ছিল না। দ্বিতীয়ত, প্রতি প্রদেশে শাসনকর্তাদের সঙ্গে কয়েকজন মহামাত্র থাকতেন। রাজা কখনও কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এককভাবে কিছু বলতেন না। তিনি সর্বদা তাঁদের এবং মহামাত্রদের যুক্তভাবে আহ্বান জানাতেন। এ থেকে প্রাদেশিক শাসনে মহামাত্রদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ও মহামাত্রদের একটি পরিষদ ছিল। তৃতীয়ত, রাজা গূঢ়পুরুষদের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য অবগত হতেন।

এই গূঢ়পুরুষগণ রাষ্ট্রে ব্যাপক গুপ্তচর ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ ছিল। মেগাস্থিনিস বর্ণিত 'এপিসকপয়' এবং অশোকের লেখ-এ প্রাপ্ত 'প্রতিবেদক' অভিন্ন। স্ট্রাবো এই শ্রেণীর মানুষদের "পরিদর্শক" (এপোরি) আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই এই পদে নিযুক্ত হত। *অর্থশাস্ত্র*-এ এদেরই হয়তো "গূঢ়পুরুষ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্ট্রাবো এবং কৌটিল্য উভয়েই গুপ্তচর বৃত্তিতে বহুসংখ্যক মহিলা নিয়োগের উল্লেখ করেছেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ গুপ্তচরদের সংস্থাঃ এবং সঞ্চারাঃ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট স্থানে থাকত তাদের বলা হয়েছে সংস্থাঃ তাদের মধ্যে গৃহী, ব্যবসায়ী এমনকি সন্ন্যাসীরাও ছিল। আর যারা স্থান থেকে স্থানান্তরে সঞ্চরণ করত তাদের বলা হয়েছে সঞ্চারাঃ। এদের মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে, ভিক্ষুকী, পরিব্রাজিকা এবং গণিকারাও থাকত।

মৌর্য যুগে প্রদেশকে সম্ভবত 'দেশ' বলা হত। 'দেশ' আবার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে এই অংশগুলির নামও বিভিন্ন হত। সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে এগুলিকে বলা হত বিষয় বা অহর। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এর নাম ছিল সম্ভবত প্রদেশ। প্রাদেশিকগণ প্রদেশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কখনও বা এগুলিকে "জনপদ" বলা হত। জনপদ বলতে প্রধানত গ্রামাঞ্চল বোঝাত। এই জনপদগুলিই ছিল মৌর্য শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি। প্রতি জনপদে কয়েকজন মহামাত্র থাকতেন। জনপদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একশ্রেণীর কর্মচারীকে বলা হত রজুক।

শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন এবং ক্ষুদ্রতম একক ছিল গ্রাম। তখন গ্রাম-শাসনের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার স্তরভেদ ছিল। নিম্নতম স্তরে ছিলেন গ্রামিক। তাঁর প্রকৃত অবস্থা কী ছিল বলা কঠিন। *অর্থশাস্ত্র*-এ রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারীদের যে তালিকা আছে, তাতে গ্রামিকের উল্লেখ নেই। তাই ডাঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, গ্রামিক ছিলেন গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত কর্মচারী।

গ্রামিক শাসন বিষয়ে সামান্য ক্ষমতা ভোগ করতেন। গ্রামে চুরি-ডাকাতির জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। এর ফলে কোন ক্ষতি হলে, তিনি তা পূরণ করতেন। চোর, ভেজালকারবারী, অন্য দুষ্কৃতিকারীদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করার অধিকার তাঁর ছিল। বিনিময়ে তিনি গ্রামীণ রাজস্বের একাংশ ভোগ করতেন। গ্রামবৃদ্ধগণ গ্রামিককে সাহায্য করতেন।

গ্রামিকের উপরে ছিলেন গোপ। তিনি পাঁচ অথবা দশটি গ্রামের উপরে ছিলেন সমাহর্ত্রী। তাঁর এবং স্থানিকের মধ্যে প্রদেষ্ট্রি ভিন্ন অন্য কোন কর্মচারী ছিল না। এই প্রদেষ্ট্রিগণ ছিলেন সমাহর্ত্রীর ভ্রাম্যমাণ সহকারী। তাঁদের জন্য কোন নির্দিষ্ট এলাকা ছিল না। এইসব স্থানীয় কর্মচারীদের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, সাধারণ তথ্য সংগ্রহ, গুপ্তচরদের নির্দেশ দান, জনসংখ্যা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক বিশেষ তথ্য সংগ্রহ, মদের ব্যবসা ও যাতায়াতের জন্য অনুমতিপত্র প্রদান ইত্যাদি কাজ করতে হত। তাছাড়া সাধারণের ব্যবহার্য পথঘাট, বিশ্রামাগার, জলসেচ প্রণালী এবং মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁদের উপর ছিল।

গ্রামকে তৎকালীন অর্থনীতির একক হিসাবে গণ্য করা হত। প্রতিটি গ্রাম 'ভাগ' এবং 'বলি' এই দুইটি করের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রতিটি গ্রামকে ঘিরে সাধারণের ব্যবহার্য গোচারণ ক্ষেত্র থাকত। অবৈধভাবে এই ক্ষেত্রসীমা লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামবাসীরা নতুন দীঘি খনন, অথবা নষ্ট দীঘি পুনরুদ্ধার করলে তাদের কর মকুব করা হত। কোন কোন গ্রামে উদ্বৃত্ত জমি 'গ্রামভৃতক'গণের সাহায্যে চাষ করা হত। এই 'গ্রামভৃতক' অর্থাৎ গ্রামভৃত্য বলতে ঠিক কী বোঝাত, বলা কঠিন। ডাঃ রায়চৌধুরী এদের সম্মানের আসন দিয়েছেন। তাঁর মতে এঁরা ছিলেন গ্রামে নিযুক্ত সরকারের বেতনভুক কর্মচারী। অনেকে আবার এঁদের গ্রামের গরিব অথবা ক্রীতদাস, এই অর্থে নিয়েছেন।

অনেকাংশে স্বয়ংশাসিত গ্রামের প্রশাসন যোগ্য হয়ে উঠেছিল, সন্দেহ নেই। কেননা, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, কৃষকদের সর্বপ্রকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা হত।

বিচারব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা স্বয়ং। রাজকীয় বিচারালয়ের স্থান সর্বোচ্চ ছিল। রাজা স্বয়ং বিচার করতেন। সুতরাং বিচারব্যবস্থায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু নীতিগতভাবে ছিল না, কার্যত ছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজকীয় বিচারালয় ভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য আরও দুই রকমের বিচারালয় ছিল। শহরে মহামাত্রগণ বিচার করতেন। অশোকের লেখতে এঁদের "নগর ব্যবহারিক" এবং *অর্থশাস্ত্র*-এ, 'পৌর ব্যবহারিক' বলা হয়েছে রজুকগণ গ্রামাঞ্চলে বিচার করতেন। অশোকের লেখতে এঁদের কথা পাওয়া যায়। গ্রীক লেখকেরা বিদেশীদের জন্য পৃথক বিচারকের কথা বলেছেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ ধর্মীয়-দেওয়ানি আদালতের সঙ্গে ফৌজদারি আদালতের পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমটিকে "ধর্মস্থির" এবং দ্বিতীয়টিকে "কণ্টকশোধন" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয়-দেওয়ানি আদালতের ধর্মস্থ এবং অমাত্যগণ বিচার করতেন। কিন্তু ফৌজদারি আদালতে সরকারি কর্মচারী, অমাত্যদেরই প্রাধান্য ছিল।

মেগাস্থিনিস এবং কৌটিল্য উভয়েই ফৌজদারি আইনের বিশেষ কঠোরতার কথা বলেছেন। সামান্য অপরাধে প্রভূত জরিমানা দিতে হত। শাস্তি হিসাবে কারাবাস এবং অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। জঘন্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এই দণ্ডের প্রয়োগপদ্ধতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। অপরাধীকে শূলে চড়ানো হত। কখনও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা হত, কখনও বা তাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হত। অবশ্য জরিমানা হিসাবে প্রচুর অর্থ দিলে, অপরাধীকে অঙ্গচ্ছেদ অথবা মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। সাধারণত ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, তাঁকে এই দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত না। তখন তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, জলে ডুবিয়ে মারা হত। অশোক, তাঁর মানবিকতা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন নি। তবে তিনি ফৌজদারি আইনের কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস করেছিলেন।

মৌর্য রাজস্বের বেশিরভাগ আসত ভূমিকর (সীতা, ভাগ, বলি এবং কর) থেকে। ভূমিকর রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস হলেও, একমাত্র উৎস ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই উৎস ছিল বহুবিধ। দুইটি সাময়িক করের কথা প্রথমেই বলা যায়। একটি সেনাভক্তম, অন্যটি উৎসঙ্গ। প্রথমটি, আগুয়ান সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য দিতে হত। দ্বিতীয়টি, রাজপুত্রের জন্ম হলে উপঢৌকন হিসাবে আসত। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে নানাভাবে কর আদায় করা হত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়কিদের প্রতি রাষ্ট্রের মোটেই সদয় দৃষ্টি ছিল না। *অর্থশাস্ত্র*-এ ব্যবসায়ীদের "অচৌরশ্চোরঃ" (অর্থাৎ নামে না হলেও কার্যত চোর) বলা হয়েছে। আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য করা হত। পণ্যের উপর সাধারণভাবে, যাতায়াতের পথে পণ্যের উপর বিশেষভাবে এবং বিক্রয়ের উপর কর ধার্য করা হত। বৃত্তিজীবী মানুষের উপর, সংঘ বা গিল্ডের সদস্যদের উপর কর চাপানো হত। শিল্প এবং কারিগরেরাও অব্যাহতি পেত না। গণিকা, জুয়ার আড্ডা, পানশালা এবং কষাইখানা রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস ছিল। রাষ্ট্র ঋণ হিসাবে অর্থ দিত। এখানে সুদ থেকেও আয় হত। শহরে যাদের নিজের বাড়ি ছিল, তাদের সেজন্য কর (বাস্তুক) দিতে হত। খেয়া পারাবার, জলসেচ ইত্যাদি থেকে রাজস্ব আসত। বিচারালয়ে ধার্য জরিমানা রাজকোষে জমা হত। কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকলে, তা রাজার হাতে চলে যেত। গুপ্তধন পাওয়া গেলে, তার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। জরুরী অবস্থায় বিশেষ কর আদায় করা হত। রাজকীয় জমি, বন এবং খনি ছিল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। এই খনিই রাজকোষ পূর্ণ করত এবং স্থায়ী সৈন্যদল গঠন সম্ভব করেছিল। লবণ উৎপাদনে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল। আমদানি লবণের উপর সামান্য হারে শুল্ক

ধার্য করা হত। মুদ্রায় খাদ মেশানোর ফলেও রাষ্ট্রের আয় হত। বিষ্টি বা বেগার শ্রমকেও আয়ের অন্যতম উৎস বলা চলে।

সে যুগে রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে ব্যয় করা হত। তারা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করত। পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে কাষ্ঠবেষ্টনীও তারাই নির্মাণ করেছিল। বলাবাহুল্য, এই বেষ্টনী প্রাসাদটিকে সুরক্ষিত করেছিল। পশুপালক এবং শিকারীরা বন্য জন্তু হত্যা করে বিভিন্ন অঞ্চলকে বাসোপযোগী করত। এজন্য তারাও অর্থ পেত। মৌর্যযুগে শিক্ষা সংস্কৃতিকে অবহেলা করা হত না। তাই এর ধারক ও বাহক, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে অর্থ দেওয়া হত। ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ অন্যভাবে রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করতেন। তাঁদের জমি দেওয়া হত। এই জমিকে ব্রহ্মদেও জমি বলা হত। অবশ্য এই ব্রহ্মদেও জমির পত্তন মৌর্য যুগে হয়নি। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে মহাশালগণের উল্লেখ আছে। এঁরা নির্দিষ্ট গ্রামের রাজস্ব ভোগ করতেন। সম্ভবত উপনিষদের যুগে এঁদের উৎপত্তি হয়েছিল। এই মহাশালগণের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ক্ষত্রিয়ও ছিলেন। যাঁরা ব্রহ্মদেও জমি ভোগ করতেন, শুধু তাঁদেরই কাছে এই জমি দান অথবা বিক্রয় করা যেত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এটা যে, যাঁরা শিক্ষাদান ভিন্ন অন্যভবে জীবিকা অর্জন করেন, তাঁদের হাতে যেন এই জমি না যায়। জলসেচ এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হত। জনকল্যাণমূলক কাজ বলতে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, কিছু দূর অন্তর বিশ্রামাগার স্থাপন, মানুষ এবং পশুর জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা, ইত্যাদি বোঝাত। শিল্পসৌধ নির্মাণ এবং সংরক্ষণ, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করা হত। গরিবদুঃখীকে সাহায্য দান, দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশা মোচন, কৃষিতে ভরতুকি প্রদান, হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হলে ক্ষতিপূরণ দান ইত্যাদিও রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য এইসব কাজের পক্ষে কোন শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা ছিল না।

মৌর্য যুগে অব্রাহ্মণদের করভার বহন করতে হত। যুদ্ধ, ধর্মপ্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজে যে অর্থ ব্যয় করা হত, তার বেশিরভাগ আসত বিভিন্ন কর থেকে। সুতরাং করের বোঝা মোটেই হালকা ছিল না। এর সঙ্গে পরবর্তী মৌর্য শাসকদের রাজত্বকালে কর আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচার যুক্ত হয়েছিল। অশোক এবং তার পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তার পিছনে দূষিত করব্যবস্থা অবশ্যই ইন্ধন যুগিয়েছিল।

সাধারণভাবে মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রস্তফজেফের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক জগতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় আমূল কেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি ডেমিট্রায়স অথবা মিনান্দারের চাইতে বেশি আকারে ভারতকে গ্রীক অবয়ব দান করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক জগতের কাছে ঋণী হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঋণ ছিল পারস্যের আকেমিনীয় সাম্রাজ্যের কাছে। মৌর্যশাসন এবং মৌর্যশিল্পের মধ্যে একদিকে খুব মিল ছিল। দুই-ই ছিল বাক্যের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট, কিন্তু ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন অংশের মতো। দুই-ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অগ্রগতির ধারাটিকে ব্যাহত করেছিল। এই শাসনকাঠামোর বহিরাগত উপাদানগুলি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছিল সত্য, কিন্তু সাময়িকভাবে এগুলি বৃহৎ সাফল্য অর্জন করেছিল।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ডঃ রায়চৌধুরীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি।

তিনি বলেছেন, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* আমাদের সামনে একটি ক্ষমাহীন ব্যবস্থা উদ্‌ঘাটিত করে। কৌটিল্য বর্ণিত সম্রাট, সেনাবাহিনী, গুপ্তচরব্যবস্থা প্রভৃতি নির্মমতা ও দুর্লভ নৈপুণ্যের প্রতীক বলে মনে হয়। তবুও একথা স্বীকার্য যে, এই প্রায় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যর অগ্রসর করেছিল, এবং এখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক সহিষ্ণুতা ও ঔদার্যের বৃহত্তম আদর্শের দ্বারা বিধৃত ছিল। অশোকের লেখতে আছে, "সকল মানুষই আমার সন্তান।" কৌটিল্যের নীতি, এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি। রাজা সম্পর্কে কৌটিল্য বলেছেন, "প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণে রাজার কল্যাণ। রাজার যা ভালো লাগে, তিনি তা ভালো মনে করবেন না, প্রজার যা ভালো লাগে, তিনি তাই ভালো মনে করবেন।"

৩খ.৩ বিন্দুসার (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০-২৭৩ অব্দ)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে বসেন। অশোকের অষ্টম শিলালেখ (কালসি ভাষ্য) থেকে জানা যায় যে তিনিও নিজেকে "দেবানাং পিয়" বলে অবিহিত করতেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প,* তারানাথ এবং হেমচন্দ্রের রচনা থেকে জানা যায় যে চাণক্য তাঁর রাজত্বকালেও কয়েক বছর মন্ত্রীপদে ছিলেন। তারানাথ লিখেছেন যে, চাণক্য ষোলোটি শহরের রাজা ও অভিজাতদের ধ্বংস করেছিলেন। এর ফলে পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিন্দুসারের অধিকারে এসেছিল। এ থেকে ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন যে, বিন্দুসার দাক্ষিণাত্য তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই তো মৌর্য সাম্রাজ্য সুরাষ্ট্র থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাই তাঁর মতে তারানাথের বক্তব্যকে সাধারণ বিদ্রোহ দমনের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। *দিব্যবদানে* আছে যে, বিন্দুসারের সময় তক্ষশিলা বিদ্রোহ করেছিল এবং তিনি পুত্র অশোককে সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা অশোকের কাছে বলেছিলেন "দুষ্ট অমাত্যগণ আমাদের অপমান করে।"

বিন্দুসার পাশ্চাত্যে গ্রীক শাসকদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন। স্ট্রাবো লিখেছেন যে, সিরিয়ার রাজা মেগাস্থিনিসের পরে ডাইমাকসকে পাটলিপুত্রে পাঠিয়েছিলেন। প্লিনি লিখেছেন যে, মিশরের সম্রাট টলেমি ফিলাডেলফস (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৭ অব্দ) ডায়োনিসিয়স নামে জনৈক দূতকে পাটলিপুত্রে পাঠিয়েছিলেন। তবে তিনি বিন্দুসারের সময় এসেছিলেন, না অশোকের সময় প্লিনি তা স্পষ্ট বলেন নি। এথেনায়স রাজা সিরিয়ার প্রথম এ্যান্টিওকস এবং বিন্দুসারের মধ্যে পত্র বিনিময়ের কথা বলেছেন। এইসব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিন্দুসার তাঁর সমসাময়িক গ্রীক রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন।

বিন্দুসারের যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রায় সমগ্র উপমহাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভারতের সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কোন প্রয়োজন ছিল না। পূর্বভারতের কলিঙ্গ অঞ্চলই তখন পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করত। অশোক তাই কলিঙ্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

৩খ.৪ অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ)

হুইলার তাঁর *এনসেন্ট ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান* গ্রন্থে অশোক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব দিক থেকে অশোকের রাজত্বেই ভারতীয় মনের প্রথম সুসঙ্গত প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে অনেক শতাব্দী ধরে তাঁর কাজ ভারতীয় চিন্তায় ও শিল্পে অন্তর্লীন হয়েছিল। আজও তার মৃত্যু হয়নি।

অশোকের ইতিহাস আলোচনার জন্য আমাদের সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। সাহিত্য বলতে বিশেষত *দিব্যবদান* এবং *সিংহলী* ইতিবৃত্ত বোঝায়। অশোক-ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই সাহিত্যের স্থান নেহাতই গৌণ।

তুলনায় অশোকের লেখগুলি অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এগুলিতে অশোকের নিজের কথা চিরকালের জন্য বিধৃত হয়ে আছে। যে-সব প্রাচীন ভারতীয় লেখের পাঠোদ্ধার এ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে, অশোকলেখ তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই লেখগুলি প্রকাশ করেছিলেন এমন মনে করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন। অশোকের নামাঙ্কিত না হলেও তাঁর প্রতীক সম্ভবলিত মুদ্রা পাওয়া গেছে এবং অধুনা তাদের সনাক্তকরণও সম্ভব হয়েছে।

অশোকের লেখগুলি গিরিগাত্রে, স্তম্ভের উপর এবং গুহার অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে। তাই এগুলিকে যথাক্রমে শিলালেখ, স্তম্ভলেখ এবং গুহালেখ বলা হয়। শিলালেখ এবং স্তম্ভলেখকে আবার প্রধান ও অপ্রধান, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রধান লেখগুলি বিশদ, অপ্রধান লেখগুলির তুলনায় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং সম্রাট অশোকের লেখ পাঁচ প্রকারের—প্রধান শিলালেখ, অপ্রধান শিলালেখ, প্রধান স্তম্ভলেখ, অপ্রধান স্তম্ভলেখ এবং গুহালেখ।

ভারতের ইতিহাসে অশোকই প্রথম সম্রাট, যিনি তাঁর আদর্শ এবং কৃতিত্ব এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। চিন্তায় ও কার্যে তদানীন্তর ভারতের নিকট প্রতিবেশী পারস্যে অকিমেনীয় বংশের সম্রাট প্রথম দাররবৌষ অনুরূপ লেখ প্রচার করেছিলেন। দুইজনের লেখতেই মুখবন্ধ প্রায় একই রকমের।

৩খ.৪.১ কলিঙ্গ যুদ্ধ

বিন্দুসারের মৃত্যু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ সালে, কিন্তু অশোকের রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল চার বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে। দুইটি ঘটনার মধ্যে এই ব্যবধান কেন ঘটেছিল, তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। *সিংহলী ইতিবৃত্ত* অনুসারে ভ্রাতৃবিরোধের জন্য অশোকের অভিষেক বিলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু অন্য কোন ঐতিহাসিক উপাদানে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না।

অশোকের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কলিঙ্গ জয়। অশোক তাঁর রাজত্বের শুরুতে মৌর্যদের চিরাচরিত সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করেন এবং তাঁর অভিষেকের আট বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে কলিঙ্গ জয় করেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে *সিংহলী ইতিবৃত্ত*-এ এই ঘটনার কোন উল্লেখ নেই।

কলিঙ্গ জয় অশোকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়েছিল কেন? প্লিনি বলেছেন যে কলিঙ্গ নন্দসাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সুতরাং অনুমান করা চলে যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কলিঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তাই অশোকের পক্ষে হয়তো কলিঙ্গ জয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, তিব্বতের বিবরণে এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণের আভাষ পাওয়া যায়। অশোক দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের স্থলপথ এবং সমুদ্রপথ দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কলিঙ্গ তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই অশোকের কলিঙ্গ জয় না করে উপায় ছিল না।

অশোকের পক্ষে কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ হয়নি। ত্রয়োদশ শিলালেখতে এই যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যেই এই সত্য প্রকটিত হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বন্দী হয়েছিল, এক লক্ষ মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছিল এবং এর অনেক গুণ বেশি মানুষ অন্যভাবে প্রাণ দিয়েছিল।

ডাঃ রায়চৌধুরী এই বিরাট ক্ষয়ক্ষতিকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই পঞ্চাশ বৎসরে কলিঙ্গের লোকবল হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিংবা হয়তো হতাহতের সংখ্যা শুধু যোদ্ধারাই নয়, যারা যুদ্ধ করেনি, তারাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ডঃ ভাণ্ডারকর মনে করেন, এটা খুবই সম্ভব যে, কলিঙ্গ এই যুদ্ধে নিঃসঙ্গ ছিল না। চোল এবং পাণ্ড্যগণ হয়তো কলিঙ্গের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাই হতাহতের সংখ্যা কলিঙ্গের সামরিক শক্তির তুলনায় অনেক বেশি হয়েছিল।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর কলিঙ্গের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। কলিঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। এর রাজধানী ছিল তোসালী। অশোক এই যুদ্ধের পর দুইটি বিশেষ কলিঙ্গ-লেখ প্রকাশ করেন। তারই একটিতে তিনি ঘোষণা করেন "সকল মানুষই আমার সন্তান।"

কলিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্যদের ইতিহাসে শেষ বৃহৎ যুদ্ধ। ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, মগধ এবং মধ্য ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধ নতুন পথের নির্দেশক। এর সঙ্গে সঙ্গে মগধের ইতিহাসে বিম্বিসারের অঙ্গ অধিকারের মধ্যে দিয়ে যে সম্প্রসারণ পর্বের সূচনা হয় তার অবসান ঘটে এবং শান্তির, সামাজিক প্রগতির, ধর্মপ্রচারের, রাজনৈতিক নিশ্চলতার এবং সামরিক অযোগ্যতার একটি নতুন যুগের অভ্যুদয় হয়। দিগ্বিজয়ের পর্ব শেষ হয়ে ধর্মবিজয়ের পর্ব শুরু হয়। অনেকে বলেছেন যে, এই যুদ্ধের পরে অশোক আর কোন আক্রমণত্মক যুদ্ধ করেননি, একথা সত্য। কিন্তু এর জন্য অশোক যা দাবি করেছেন তা সত্য নয়। তিনি যুদ্ধ করেননি, তার কারণ এ নয় যে তিনি যুদ্ধকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে বর্জন করেছিলেন, তার কারণ এই যে, এই যুদ্ধের কারণ মৌর্যসাম্রাজ্যের সংহতিসাধন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

আর্থিক দিক থেকে গাঙ্গেয় অঞ্চল তখনও খুব সমৃদ্ধ ছিল সত্য। কিন্তু কোশম্বি বলেন যে, এই সমৃদ্ধি আর আগের মতো নিশ্চিত ছিল না। ধাতুর উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ক্রমশ কমে আসছিল। বিহারের তাম্রখনিগুলি জলসীমা স্পর্শ করেছিল। দাক্ষিণাত্যে লোহার নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। অন্ধ্র এবং মহীশূরের লোহার খনিগুলির ব্যবহার তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মগধের সীতা জমিতে যেভাবে স্থানান্তর থেকে লোক এনে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল, দাক্ষিণাত্যের উৎকৃষ্ট জমি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকায় তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করলে আর্থিক চিত্রটি খুব আকর্ষণীয় ছিল না। ক্রমবর্ধমান বসতি বিস্তারের জন্য স্বাভাবিকভাবে বনাঞ্চল হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন বন্যা বেড়েছিল, তেমনই

অন্যদিকে জমিপিছু উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছিল। চন্দ্রগুপ্তের পরে কোষাগারের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা তৎকালীন মুদ্রায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

কোশাম্বি কলিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তী পরিবর্তনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি পরিবর্তনকে অস্বীকার করেননি। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "অশোক" গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম অশোকের চরিত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। অশোক তাঁর ত্রয়োদশ শিলালেখতে বলেছেন, "কলিঙ্গা জয়ের পরেই দেবানাং পিয় ধর্মের অনুসরণে, ধর্মের প্রেমে এবং বারংবার আবৃত্তি দ্বারা মানুষের মনে ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন।" তাঁর ধর্মমত পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি নিশ্চিতভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম অপ্রধান শিলালেখতে তিনি বলেছেন, "আড়াই বছর, বা তারও বেশিকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন থেকে আমি বুদ্ধ-শাক্য হয়েছি। এক বছর বা তার বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন থেকে আমি সঙ্ঘ পরিদর্শন করেছি এবং উৎসাহ দেখিয়েছি।" এইভাবে দেখা যায় যে কলিঙ্গা জয়ের পরে অশোকের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল এবং এর জন্য তিনি পরিশ্রম করতেও শুরু করেছিলেন। এক বছরেরও বেশি সময় (খ্রিস্টপূর্ব ২৬২-২৬০ অব্দ) কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি প্রথম অপ্রধান স্তম্ভলেখ প্রকাশ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দে তিনি সম্ভবত বুদ্ধগয়া গিয়ে তাঁর ধর্মযাত্রা আরম্ভ করেন। এর পরে তিনি তাঁর চোদ্দোটি প্রধান শিলালেখ প্রকাশ করেন। এই লেখগুলিকে তাঁর ধর্মীয় ঘোষণা অথবা জনগণের কাছে তাঁর বাণী বলা যায়।

এই লেখগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশোকের আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির তাৎপর্য গভীরতর। এগুলি রাষ্ট্রনীতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকে অনেকসময় রোমসম্রাট কাস্টান্টাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কোশাম্বি মনে করেন, এই তুলনা সর্বাংশে সঙ্গত নয়। কেননা, এর ফলে রোমসাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্ম অন্য সব ধর্মের অবসান ঘটিয়েছিল। কিন্তু অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে তেমন কোন অঘটন ভারতে ঘটেনি। কোশাম্বি বলেছেন, মৌলিক রূপান্তর ধর্মের ক্ষেত্রে ততটা নয়, যতটা ঘটেছিল জনগণের প্রতি ভারতীয় প্রথম পরিবর্তিত নীতিতে। অশোক তাঁর রাজকীয় কর্তব্যকে, জনগণের ঋণশোধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মগধের প্রাচীনতম রাষ্ট্রদর্শে রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক। তার পাশে অশোকের নতুন আদর্শ বিস্ময়কর। *অর্থশাস্ত্র*-র রাজার কারও কাছে কোন দায় ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের লাভ এবং চরম লক্ষ্য ছিল যোগ্যতা। তার পাশে অশোকের এই দায়িত্বচেতনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায় এর ফলে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মগধের বিভিন্ন ধর্মের সমাজদর্শন অবশেষে তার রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিদ্ধ করেছিল। আমলাতন্ত্রের দ্বারা এবং আমলাতন্ত্রের জন্য পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান হয়েছিল।

৩খ.৪.২ অশোকের রাজ্যসীমা

কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার পর অশোকের সাম্রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সীমা-নির্ধারণের একটি সহজ উপায় হল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যসীমার সঙ্গে কলিঙ্গরাজ্য যোগ করা। সাধারণভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমে সিরিয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত, উত্তরে কাশ্মীর থেকে পেন্নার নদী পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল।

সাময়িকভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের কথা মনে না রেখে, অশোকের সময়ে ঐতিহাসিক উপাদান থেকে স্বাধীনভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন স্থির করা চলে। এই উপাদান প্রধানত তিনটি ঃ (১) তাঁর শিলা ও স্তম্ভলেখগুলির ভৌগোলিক বণ্টন (২) তাঁর সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন এবং (৩) দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ শিলালেখর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য।

অশোকের বিভিন্ন লেখগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথসমূহের সংযোগস্থলে অথবা সাম্রাজ্যশাসনের নতুন কেন্দ্রগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল। কতকগুলি লেখ বুদ্ধের জীবনের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্রমবর্ধমান বসতি বিস্তারের ফলে যে ভূভাগ অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই উত্তরাপথে। এই লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে সাম্রাজ্যের বৃহৎ আয়তন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। চতুর্দশ শিলালেখতে অশোক তাঁর সাম্রাজ্যকে "বৃহৎ" এবং পঞ্চম শিলালেখতে "সমগ্র পৃথিবী" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এই দাবি খুব অযৌক্তিক ছিল না।

অশোকের সময়ের স্থাপত্যও তাঁর সাম্রাজ্যের বৃহৎ আয়তনের ইঙ্গিত দেয়। কাশ্মীর ও নেপালের স্থাপত্য-ঐতিহ্য থেকে বলা যায় যে এই দুইটি অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কহ্লণ এবং অশোকের রুমমিনদাই ও নিগলিসরাই স্তম্ভলেখ এই ধারণা সমর্থন করেন। হিউয়েন সাঙ যখন এসেছিলেন, তখন তিনি অশোকের তৈরি স্তূপ কপিশ (কাফিরিস্তান), নগর, (জেলালাবাদ) এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্যান নাম স্থানে দেখেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-বর্ণিত তাম্রলিপ্তির অশোক-স্তূপ বঙ্গদেশের উপর তাঁর অধিকারের আভাস দেয়। হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে, সমতটে (ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপে) অশোকের স্তূপের কথা বলেছেন। তবে কামরূপ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। এ ছাড়া পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং কর্ণসুবর্ণে (বর্ধমান, বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) অশোকের স্তূপের উল্লেখ তিনি করেছেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে, চোল এবং দ্রাবিড় অঞ্চলে, অনুরূপ স্তূপের কথাও তাঁর বিবরণে পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যায় যে হিউয়েন সাঙ অশোকের স্তূপবণ্টনের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে অশোকের লেখসমূহের বণ্টন, ভৌগোলিক দিক থেকে অনেকটা মিলে যায় এবং বলা যায় যে, লেখগুলিও অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃত আয়তনের দলিল।

অশোকের দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং ত্রয়োদশ শিলালেখ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এই লেখগুলিতে অশোকের সাম্রাজ্যের কিছুসংখ্যক বহুদূরবর্তী প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের উল্লেখ আছে, যেমন যোনগণ, গান্ধারগণ, নভকনভপংক্তিগণ, রাষ্ট্রিকগণ, ভোজগণ, অন্ধ্রগণ এবং পরিংদগণ।

অশোক 'অন্ত' অর্থাৎ তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তের অব্যবহিত পরবর্তী অঞ্চলের রাজাদের কথা যা বলেছেন তাতেও তার সাম্রাজ্যের বাইরে, কিন্তু ভারতের ভিতরে। কতকগুলি ছিল অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে এবং ভারতেরও বাইরে। প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত রাজ্যগুলি ছিল চোলগণ, পাণ্ড্যগণ, কেরলপুত্র এবং সতিয়পুত্র। এখানে লক্ষণীয় যে কেরলপুত্র এবং সতিয়পুত্রের স্থলে একবচন এবং চোল ও পাণ্ড্যদের স্থলে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য, দুই-ই একাধিক ছিল। এইভাবে বলা যায় যে দক্ষিণ ভারতে অশোকের সাম্রাজ্য পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেননা চোল, পাণ্ড্য ইত্যাদি যে চারটি স্বাধীন তামিল রাজ্যের কথা এখানে বলা হল, সেগুলি সবই ছিল পেন্নার নদীর দক্ষিণে।

ভারতের বাইরে, উত্তর-পশ্চিমে, যে অন্তরাজ্যের সঙ্গে অশোকের সাম্রাজ্যের সাধারণ সীমা ছিল, সেই রাজ্যটি সিরিয়া। অশোকের দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ শিলালেখতে যে সিরিয়ার রাজা অন্তিয়োকের উল্লেখ আছে, তিনি সেলুকাসের পৌত্র দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাস। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাস হেরাতের পূর্বভাগে রাজত্ব করেছিলেন, এমন কথা যখন জানা যায় না, তখন অনুমান করা চলে যে, ইতিপূর্বে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে যে অঞ্চলগুলি দিয়েছিলেন, সেই অঞ্চলগুলি তখনও মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী এবং ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, উত্তর-পশ্চিমে অশোকের সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বত বিস্তৃত ছিল এবং পরেই ছিল সিরিয়ার রাজা এ্যান্টিওকাসের রাজ্য। এইভাবে বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে দাবি করা হয় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ সমগ্র ভারত, কেবল দাক্ষিণাত্যে ১৪ ডিগ্রি অক্ষাংশের দক্ষিণস্থ ছাড়া, অশোক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩খ.৪.৩ অশোকের শাসনব্যবস্থা

অশোকের শাসনব্যবস্থা কয়েকটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নীতিগুলির অন্যতম ছিল কেন্দ্রীকরণের নীতি। অশোকের সময় মৌর্যশাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ছিল না। অর্থাৎ মৌর্যরাষ্ট্র অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমষ্টি ছিল না। একথা সত্য যে কিছুসংখ্যক উপজাতি তখনও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অথবা সীমান্তে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন রক্ষা করেছিল। *অর্থশাস্ত্রে* উপজাতি সঙ্ঘ হিসাবে ব্রিজি, কম্বোজ এবং পাঞ্চালগণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে ডঃ রোমিলা থাপার বলেছেন যে, এই সঙ্ঘগুলি আপন অধিকারে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেনি। শুধুমাত্র মৌর্যরাষ্ট্র সংগঠনের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাদের পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল। মৌর্যসাম্রাজ্য উপজাতি প্রজাতন্ত্রের উপর রাজতন্ত্রের জয় সূচিত করে। রাজা তখন শুধু আইনের রক্ষক ছিলেন না, আইনপ্রণেতাও ছিলেন। *অর্থশাস্ত্রে* এমন কথা বলা হয়েছে যে, চিরাচরিত বিধানের সঙ্গে রাজকীয় আইনের বিরোধ ঘটলে, রাজকীয় আইনই কার্যকর হবে। এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে রাজশক্তি প্রাধান্যের পরিচায়ক। ডঃ থাপার মনে করেন যে, অশোক পুরোহিততন্ত্রকে উপেক্ষা করে রাজশক্তির সঙ্গে দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দেবানাং পিয়' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

আইন ও রাজনীতির দিক থেকে অশোকের শাসনব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, অশোকের রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারের নামান্তর ছিল না। জনগণের সম্পর্কে অশোকের নৈতিক দায়িত্ববোধ তাঁর স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করত। তাছাড়া, তাঁদের মতে অশোক আইনের রক্ষক মাত্র ছিলেন, আইনপ্রণেতা ছিলেন না। কিন্তু এই মত পুরোপুরি সত্য বলে মনে হয় না। অন্তত অশোকের অনুশাসনগুলি এই মতকে খণ্ডন করে।

অশোকের শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পিতৃত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় কলিঙ্গ-লেখতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন, "সকল মানুই আমার সন্তান। আমি যেমন আমার সন্তানদের জন্য ইহলোকে এবং পরলোকে সমৃদ্ধি এবং আনন্দ কামনা করি, সব মানুষের জন্য আমি তাই করি"। এই নৈতিক দায়িত্ববোধ তিনি শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, সকল কর্মীদের মধ্যে তিনি একে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। চতুর্থ স্তম্ভলেখতে তিনি তাঁর কর্মচারীদের দক্ষ ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, বলেছেন, একজন মানুষ যেমন তার শিশুসন্তানকে দক্ষ ধাত্রীর হাতে অর্পণ করে তিনিও তাঁর প্রজাদের তেমনই তাঁর কর্মচারীদের হাতে অর্পণ

করেছেন। অনেকে বলেছেন, এই শাসনব্যবস্থা উপরের দিকে স্বৈরাচারী হলেও, নিচের দিকে তা ছিল না। সেখানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল।

কোশাম্বি অশোকের অনুশাসনগুলিকে সাংবিধানিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি বলেছেন যে, এদের মধ্যে রাজশক্তির উপর প্রথম সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণের, জনগণের প্রথম 'অধিকারের সনদের' আভাস পাওয়া যায়। অশোক তাঁর কর্মচারীদের এই অনুশাসনগুলি বৃহৎ জনসভায় বৎসরে তিনবার যত্ন সহকারে পাঠ ও ব্যাখ্যা করার যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন তা এই ইঙ্গিতই বহন করে।

কোশাম্বি বলেছেন যে, *অর্থশাস্ত্র*-এ রাজকীয় কর্মসূচী অবহেলিত হয়েছিল। অশোক তাকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন এবং ইতিপূর্বে এই অবহেলার ফলে সময়ের দিক থেকে যে ক্ষতি হয়েছিল, কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি তার পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

তিনি তাঁর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের (যেমন যুক্ত, রজুক, প্রাদেশিক ইত্যাদি) প্রতি পাঁচ বছর অথবা তিন বছর অন্তর অনুরূপ রাজ্য প্রদক্ষিণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোশাম্বি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, অশোকের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর ফলে রাজ্যে অর্থের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রজাদের প্রতি অশোকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাণিজ্যপথের ধারে নতুন বিশ্রামাগার ইত্যাদি স্থাপনের ফলে বাণিজ্যস্বার্থের উন্নতি ঘটায় অশোকের সময় মৌর্যরাষ্ট্রের একটি নিশ্চিত শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়েছিল।

অশোকের তৃতীয় এবং ষষ্ঠ শিলালেখতে 'পরিষ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শিলালেখতে বলা হয়েছে যে, রাজার কোন মৌখিক আদেশ অথবা মহামাত্রদের উপর অর্পিত কোন জরুরী দায়িত্ব অর্পণ বিষয়ে পরিষে (অর্থাৎ পরিষদে) কোন বিরোধিতা অথবা বিতর্কের সৃষ্টি হলে, প্রতিবেদকগণ তা তৎক্ষণাৎ রাজাকে জানাবেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো, অশোকের সময়ও এই সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অশোকের লেখতে যুবরাজশাসিত চারটি প্রদেশের উল্লেখ আছে। এই প্রদেশগুলির রাজধানী ছিল যথাক্রমে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসালী এবং সুবর্ণগিরি।

সাধারণভাবে যুবরাজগণ দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শাসক নিযুক্ত হলেও, মাঝে মাঝে এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটত। স্থানীয় নৃপতিগণ এই পদে নিযুক্ত হতেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যগুপ্তের এবং অশোকের রাজত্বকালে যবনরাজ তুসাসফ নিযুক্ত হন। রাজধানীর নিকটবর্তী প্রদেশগুলি, প্রত্যক্ষভাবে সম্রাট কর্তৃক শাসকদের অধীনে থাকত। মনে হয় অশোক এই প্রদেশগুলি স্তম্ভলেখ দ্বারা এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলি শিলালেখ দ্বারা চিহ্নিত করেছিলেন।

সবগুলি প্রদেশের সকল শাসক সমান স্বাধীনতা ভোগ করতেন না। মনে হয় তক্ষশিলা এবং উজ্জয়িনীর শাসকগণ অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করতেন। সে তুলনায় তোসালীর শাসকদের ক্ষমতা অনেক কম ছিল।

তৃতীয় শিলালেখতে অশোক যুক্ত, রজুক এবং প্রাদেশিক—এই তিন শ্রেণীর কর্মচারীর কথা বলেছেন। এই লেখরই শেষাংশে আছে যে যুক্তগণকে মহামাত্র পরিষদের নির্দেশে বিভিন্ন নিয়মাবলী নথিভুক্ত করতে হত। তাই Hultzch-এর মত অনুসারে এই যুক্তগণ মহামাত্রদের দপ্তরে রাজার আদেশ বিধিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত সচিব ছিলেন।

চতুর্থ স্তম্ভলেখতে আছে যে রজুকগণ ছিলেন "অনেক শতসহস্র ব্যক্তির উপরে।" শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রদানের সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের ছিল। বিচার ও দণ্ডের ক্ষেত্রে সাম্য (ব্যবহারসমতা ও দণ্ডসমতা) তাঁদের রক্ষা করতে হত। জনকল্যানমূলক কাজগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁদের উপর ছিল। তাঁর জমি জরিপ, ভূমি ও জলসেচ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। রজুকদের বিভিন্ন কার্যাবলী থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাঁরা ছিলেন মৌর্যশাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। রজুকগণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, সন্দেহ নেই। তাঁদের কাজের বৈচিত্র ও গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে ডঃ রায়চৌধুরী তাঁদের স্ট্রাবোর 'এ্যাগ্রোনময়ের' সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন। ডাঃ ভাণ্ডারকদের মতে অশোক নগর-ব্যবহারক এবং প্রাদেশিকগণের বিচারসংক্রান্ত দায়িত্ব হরণ করে, বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রজুকদের উপর অর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই ধারণা অতিরঞ্জিত মনে হয়। অশোক রজুকদের বিচার বিষয়ে বর্ধিত ক্ষমতা দিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর এই কাজটি সঙ্গত হয়েছিল। তখনকার দিনে বেশিরভাগ মোকদ্দমাই ছিল জমি-সংক্রান্ত। এই ধরনের সব মোকদ্দমাই যদি প্রাদেশিকদের কাছে আনা হত, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বিশেষ চাপের সৃষ্টি হত। অশোক রজুকদের বিচারক্ষমতা বৃদ্ধি করে এই চাপ কমিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজের পিছনে ঝুঁকি ছিল। এর ফলে রজুকগণের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং অশোক এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

তৃতীয় শিলালেখতে প্রাদেশিকগণের উল্লেখ আছে। অনেকে প্রাদেশিকগণকে অর্থশাস্ত্রের "প্রদেষ্ট্রি"-র সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তাঁদের মতে এঁরা কার্যনির্বাহী, রাজস্ব এবং বিচারবিভাগের প্রধান। আবার অনেকের মতে তাঁদের কাজ ছিল প্রদেষ্ট্রিগণের কাজের অনুরূপ। তাঁরা রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। গ্রামাঞ্চলে এবং জেলার শহরগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের উপর ছিল। তৃতীয় শিলালেখতে তিন শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ, ছোট থেকে বড়, এইভাবে করা হয়েছে। তা যদি হয়, তাহলে প্রাদেশিকগণ রজুকদের চেয়ে উচ্চপদস্থ ছিলেন।

প্রথম কলিঙ্গ লেখতে নগরব্যবহারকের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে, এঁরা ছিলেন পৌরশাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

অশোকের দ্বাদশ শিলালেখতে ধম্ম-মহামাত্য, ইতিঋক-মহামাত্য এবং বচভূমিক, এই তিন শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ আছে। ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন, যারা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা, ধর্মমহামাত্রদের প্রধান কর্তব্য ছিল। যবনগণ, কম্বোজগণ, গান্ধারগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে যারা ধার্মিক, তারা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি দিতে হত। তাঁদের দায়িত্ব শুধু ধর্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। পঞ্চম শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁদের শাসন-বিষয়ক দায়িত্ব পালন করতে হত, বিশেষভাবে দিনমজুর, দুঃস্থ এবং বৃদ্ধদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁদের নজর দিতে হত। কয়েদীদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ, অথবা যাদের বড় পরিবার থাকত, মুক্তিমূল্যের বিনিময়ে এঁরা তাদের খালাস করে আনতেন। রাজপরিবারের দানকার্যকে এঁরা উৎসাহ দিতেন এবং দানের বণ্টনে সাহায্য করতেন। অশোক বলেছেন যে, তাঁর নিজের সংসারে, ভাই-বোনের সংসারে, রাজ্যের সর্বত্র তাঁরা ধর্মের জন্য কাজ করতেন। বাসাম বলেছেন যে, অশোক তাঁর বিভিন্ন সংস্কারকে কার্যকর করার জন্য ধর্মমহামাত্র পদের সৃষ্টি করেছিলেন। এঁরা ছিলেন অশোকের কেন্দ্রীকরণ নীতির হাতিয়ার।

ডঃ মুখোপাধ্যায় ইতিঝক-মহামাত্য বা স্ত্রী-অধ্যক্ষ মহামাত্যদের খুব ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন। তাঁর মতে এঁরা নারীস্বার্থ রক্ষা করতেন। Hultzch এঁদের সঙ্গে কৌটিল্যের গণিকাধ্যক্ষের তুলনা করেছেন।

বচভূমিক অথবা ব্রজভূমিকগণ অশোকের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী (কূপ, উদ্যান ইত্যাদি) এবং ধর্মপ্রচারের কাজে নিযুক্ত হতেন। এর পরে অন্তমহামাত্য নামক কর্মচারীদের কথা বলা চলে। অন্তমহামাত্য বলতে সম্ভবত বোঝাত সেই সব কর্মচারী, যাঁরা প্রতিবেশী অঞ্চলে অশোকের ধর্মবিজয়ের অথবা জনকল্যাণের নীতিকে কার্যকর করতেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে যাঁরা অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের বলা হত 'পুরুষ'। ত্রয়োদশ লেখতে উল্লিখিত 'দূত'গণের কাজও ছিল অনেকটা একই ধরনের। অনেকের মতে তাঁরা বৈদেশিক সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। অনেকে বলেন যে, অশোক তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্মবিজয়ের নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এঁদের দূর-বিদেশে পাঠাতেন।

আর দুই শ্রেণীর কর্মচারী, প্রতিবেদক এবং লিপিকারদের উল্লেখ করে এই বিবরণ শেষ করা যায়। প্রতিবেদকগণ ছিলেন সংবাদদাতা। ষষ্ঠ শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, যে-কোন সময় তাঁরা রাজার কাছে যেতে পারতেন। চতুর্দশ শিলালেখতে লিপিকারদের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের প্রধান কাজ ছিল লিপিগুলি লেখা।

অশোকের শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত আলোচনার শেষে তাঁর শাসন-বিষয়ক সংস্কারগুলি পুনরায় একসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনি শাসনব্যবস্থায় নতুন 'পরাক্রমে'র প্রতিষ্ঠা, নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থাকে মানবতাবোধ উদারতা এবং জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সম্রাট, যিনি কল্যাণরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। একটি এককেন্দ্রিক শাসন-কাঠামোর মধ্যে তিনি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতিতে আংশিকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি যে বিচার-বিষয়ে রজুকদের স্বাধীনতাদান করেছিলেন, তা এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে। মন্ত্রিপরিষদের পৃথক অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এই পরিষদের ছিল। এমনকি পরিষদ রাজার বিরোধিতাও করতে পারত। অশোক নিজে রাজ্য প্রদক্ষিণে যেতেন। তাঁর কর্মচারীদেরও যেতে বলতেন। তাঁর আগে এরকম কোন ব্যবস্থার কথা জানা যায়নি। ধর্মমহামাত্র নামক কর্মচারীপদ অশোকই প্রথম সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর এবং প্রতিবেদকগণের মধ্যে দূরত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কোন সম্রাট এ কাজ করেননি। বিচারব্যবস্থায় তিনি দণ্ড ও ব্যবহারে সমতার প্রবর্তন করেছিলেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত অপরাধীদের, দণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগে তিন দিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি এইভাবে ফৌজদারি দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করতে চেয়েছিলেন। বিচারের নামে অবিচার বন্ধ করার জন্য তিনি দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে মহামাত্র পাঠাতেন। প্রতি রাজ্যাভিষেক বার্ষিকীতে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতেন। তাঁর লেখ থেকে জানা যায় যে, ছাব্বিশ বৎসরে পঁচিশবার তিনি এই কাজ করেছিলেন।

আধুনিক দৃষ্টিতে অশোকের শাসনব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখ করা যায়। ঘন ঘন রাজ্য প্রদক্ষিণ এবং গুপ্তচরব্যবস্থার মধ্যে একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের স্বাদ পাওয়া যায়। এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রধানত কেন্দ্রাভিমুখী এবং অংশত স্থানিক। দৈনন্দিন কাজ সবই স্থানীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্তু নীতিনির্ধারণ করত কেন্দ্র। সমগ্র শাসন ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী। ভ্রাম্যমাণ মহামাত্র, প্রতিবেদক রাজপথ, দুর্গ, রাজার রাজ্য পরিদর্শন, এ সবই কেন্দ্রাভিমুখী শাসনব্যবস্থার উপাদান। এই রকম ব্যবস্থায় কোন সময় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হলে,

তার ফলাফল দুর্ভাগ্যজনক হতে বাধ্য। শাসনব্যবস্থার এই অন্তর্লীন, দুর্বলতা অশোকের পরে মৌর্যসাম্রাজ্যের অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। এই ব্যবস্থায় কর্মচারীদের আনুগত্য ছিল একান্তভাবে রাজার প্রতি। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের কোন আনুগত্য ছিল না। ফলে তাঁরা রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিল। রাজা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদেরও পরিবর্তন হত। অশোকের পরে ঘন ঘন সিংহাসনে পরিবর্তনের ফলে এই ব্যবস্থা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অশোকের শাসনব্যবস্থা কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিচারবিভাগ এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। এই ব্যবস্থা ছিল মাথাভারি এবং এতে সব ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের কুক্ষিগত ছিল।

৩খ.৪.৪ অশোকের ধম্ম

অশোকের ধম্ম সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। এক, তিনি কখন এবং কেন এই ধম্ম গ্রহণ করেছিলেন, দুই, তাঁর এই ধম্মের স্বরূপ কী ছিল এবং তিন, তাঁর এই ধম্মকে বৌদ্ধধর্মের সমার্থক বলা যায় কিনা।

এটা নিশ্চিত যে অশোক তাঁর প্রজাদের দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মলেখ প্রচারের পূর্বে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সপ্তম স্তম্ভলেখতে তিনি বলেছেন যে, তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রচার করবেন এবং ধর্মশিক্ষা-দানের আদেশ দেবেন, যাতে ধর্মকথা শুনে মানুষ তা মেনে চলে, উন্নত হয় এবং ধর্মের পথে খানিকটা অগ্রসর হতে পারে। অশোক তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে এই লেখগুলি প্রথম প্রকাশ করেন। তৃতীয় শিলালেখতে তিনি যুক্ত, রজুক এবং প্রাদেশিকগণকে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর, তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ধর্মপ্রচারের এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে, পরিক্রমায় বের হওয়ার নির্দেশ দেন। পরের বছর, তিনি ধর্মমহামাত্র পদ সৃষ্টি করেন।

অশোকের ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ হিসাবে সাধারণত কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে দায়ী করা হয়। ত্রয়োদশ শিলালেখতে অশোক তাঁর এই অভিজ্ঞতা এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে কলিঙ্গ জয়ের জন্য তাঁর মনে অনুশোচনা হয়েছিল, কেননা কোন নতুন রাজ্য জয় করতে গেলে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটে, অসংখ্য লোক আহত এবং বন্দী হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক দুঃখ ভোগ করেছিল, তার শত ভাগের, এমনকি সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি ভবিষ্যতে অনুরূপ দুঃখ ভোগ করে, তাহলে তা তাঁর কাছে গভীর দুঃখের কারণ হবে।

এই যুদ্ধের ভয়াবহতা অশোকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল, তাঁর অন্তর পরিবর্তিত হয়েছিল এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখতে এই তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম অপ্রধান শিলালেখর একাংশে তিনি বলেছেন, "বৌদ্ধ সঙ্ঘ সন্দর্শনে যাওয়ার এবং উৎসাহ প্রদর্শনের পর আড়াই বছর কেটে গেছে।" দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখতে অশোক বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা এবং আস্থা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। এই দুইটি লেখ থেকে স্পষ্ট যে, অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অশোক যে নিজেকে বৌদ্ধ মনে করতেন, তা তাঁর নির্মিত স্তূপ এবং প্রচারিত অনুশাসন থেকে নিশ্চিত জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্মমতে অনৈক্য বিষয়ে একটি বিশেষ অনুশাসন তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘের উদ্দেশে প্রচার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অশোক কেন এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার গভীরতর সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা কোশাম্বি এবং ডঃ রোমিলা থাপারের রচনায় পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁদের এই ব্যাখ্যা অভ্রান্ত, এমন কথা বলা যায় না। কোশাম্বির মতে, অশোকের সময় মৌর্যরাষ্ট্রের একটি দৃঢ় শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়েছিল। *অর্থশাস্ত্র*-র লেখককে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি, অশোককে তাই হতে হয়েছিল। এই সমস্যাটি ছিল বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের সংঘর্ষ এড়ানো। এই কাজে নতুন অর্থে এই বিশ্বজনীন ধম্ম অশোকের বিশেষ হাতিয়ার হয়েছিল। এই নতুন উন্নত ধম্মের মধ্যে রাজা এবং নাগরিক উভয়েই তাঁদের সাধারণ মিলনভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন।

ডঃ থাপার তাঁর পূর্ববর্তী অনেকের বক্তব্য অনুসরণ করে এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মৌর্যযুগে আর্যসংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। পূর্বের আর্যসংস্কৃতি ছিল যাযাবর, পশুচারণভিত্তিক। নতুন আর্যসংস্কৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত স্থির, নগরকেন্দ্রিক। এই নতুন নগরসংস্কৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। মৌর্যযুগের সমাজ ছিল আগের তুলনায় অনেক জটিল এবং এই সমাজে বণিকশ্রেণী নতুন স্বীকৃতি লাভ করতে চেয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুসারে জাতিভেদ ব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধি করা ছিল এই সমস্যা সমাধানের উপায়। বৌদ্ধধর্মকে তার ব্যাপকতর সমাজ-সচেতনতা এবং কৃতকর্মের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব সমাধান মনে হয়েছিল। মৌর্যশাসন ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী। এই কেন্দ্রাভিমুখীনতার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি উপাদানই (আমলাতন্ত্র, উন্নত যোগাযোগ এবং শক্তিশালী শাসক) তখন ছিল। অশোক এই প্রবণতাকে পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল। হয় তাঁকে কৌটিল্যের নির্মম নীতি, না হয় একটি নতুন ধর্মমত গ্রহণ করতে হত। এই ব্যবস্থায় অশোক দ্বিতীয় বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলেন। বহু শতাব্দী পরে আকবরও তাই করেছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মমত গ্রহণ করে, অশোক, জনগণের যে অংশ উদার, গোঁড়ামিবর্জিত, তার সমর্থন লাভ করতে চেয়েছিলেন। এই অংশের পিছনে বণিকশ্রেণী থাকায়, এর সমর্থনের মূল্য অশোকের কাছে নেহাৎ কম ছিল না। সাংস্কৃতিক দিক থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বহুতর বৈষম্য ছিল। তাই অশোক নতুন ধর্মমত গ্রহণ ও প্রচারের মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় বন্ধনগ্রন্থি খুঁজে পেয়েছিলেন।

অশোক বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্য ধর্মমতকে বর্জন বা অগ্রাহ্য করেননি। সকল ধর্ম, ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তিনি সমান সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই সহিষ্ণুতার দিকটি Hultzsch বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ইউরোপের দৃষ্টান্ত থেকে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অশোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। Hultzsch বলেছেন যে, হিন্দুরা সব সময়েই অন্য ধর্মের প্রতি চরম উদারতা দেখিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেককে নিজ নিজ উপায়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে দিয়েছেন। তাঁদের ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদী বেদান্ত এবং নিরীশ্বরবাদী সংখ্যা, দুই-ই আছে। সাহিত্য এবং বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় যে, হিন্দু রাজারা অন্য ধর্মের দেবদেবীর জন্য মন্দির নির্মাণ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাহায্যদান, তাঁদের কর্তব্য মনে করতেন। অশোক তাঁর আচরণে একই উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে-কোন ধার্মিক হিন্দু রাজার মতো তিনি জনগণের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন। একই মনোভাব থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, সকল মানুষই তাঁর সন্তান। পঞ্চম শিলালেখতে তিনি ধর্মমহামাত্রদের ব্রাহ্মণ, ইভ (Hultzsch)-এর মতে বৈশ্য, ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের পরে গৃহপতিগণ), সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থদের

নিয়ে ব্যস্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৌদ্ধ, আজীবিক, নির্গ্রন্থ (জৈন) এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। সব সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি তাদের ইচ্ছামত যে-কোন স্থানে বসবাসের অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি উদার এবং ভদ্র আচরণের কথা বলেছিলেন। গুহালেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি আজীবিকদের মূল্যবান গুহা দান করেছিলেন। হুইলার মন্তব্য করেছেন যে, অশোক যে সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করতেন, এই দান তার বাস্তবতার সপ্রশংস সমর্থন। ষষ্ঠ স্তম্ভলেখতে তিনি ঘোষণা করেছেন "রাজা সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।" দ্বাদশ শিলালেখতে তিনি শুধু সব সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দেননি, তাদের নিজেদের স্বার্থে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করার আহ্বান জানিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, যে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্তিবশত অথবা গৌরববৃদ্ধির জন্য নিজের সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে, অথবা অন্য সম্প্রদায়কে দোষ দেয়, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই খুব ক্ষতি করে। তাই সেখানে তিনি সব সম্প্রদায়ের জন্য মৈত্রী এবং বাক-সংযমের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় শিলালেখতে, যেখানে তিনি তাঁর জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা বলেছেন, সেখানেও তাঁর বিশেষভাবে বৌদ্ধ মনোভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর এই ধরনের সব কাজেই ছিল সকলের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন যে, সকলেই সব ধর্মের কথা জানুক এবং এইভাবে তারা 'বহুশ্রুত' হোক।

অশোকের ধর্ম ছিল সরল এবং ব্যবহারিক, জটিল এবং দার্শনিক নয়। বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তিনি জনসাধারণের ধর্মীয় আচরণের উপর বেশি জোর দিতেন। তাঁর একাধিক লেখ থেকে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি ছিল, জানা যায়। একটি লেখতে তিনি বলেছেন, "পিতামাতাকে মান্য করতে হবে। সকল জীবের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা দাবি করতে হবে। সত্য অবশ্যই বলতে হবে।" আবার তৃতীয় শিলালেখতে তিনি বলেছেন, "পিতামাতার কথা শোনা পুণ্য কর্ম। বন্ধু, পরিচিত জন, আত্মীয়, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি উদার আচরণ পুণ্য কর্ম। অল্প ব্যয়, এবং অল্প সঞ্চয় পুণ্য কর্ম।" এইভাবে দেখা যায় যে, অশোক কতকগুলি সাধারণ গুণের অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দ্বিতীয় এবং সপ্তম স্তম্ভলেখতে অশোক তাঁর ধম্মের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গুণাবলী হল, দয়া, দান, সচে (সত্য), শোচয়ে (শুচিতা), মাদবে (ভদ্রতা), বহুকয়াণে (অনেক সৎ কাজ) এবং অপঅশিনব (চারিত্রিক কলুষতা থেকে মুক্তি)। এ ছাড়া চিন্তায় প্রকৃত উন্নতির জন্য আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনের কথাও তিনি বলেছেন। উক্ত গুণাবলীর মধ্যে একমাত্র অপঅশিনব নঞর্থক, অন্যগুলি সদর্থক। তৃতীয় স্তম্ভলেখতে তিনি কোন প্রচণ্ড আবেগের ফলে, অশিনব, অর্থাৎ চারিত্রিক কলুষতার সৃষ্টি হয়, সে কথা বলেছেন। এই আবেগগুলি হল, ক্রোধ, নির্দয়তা, অত্যধিক আত্মগরিমা, হিংসা এবং হিংস্রতা। যাঁরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবেন, তাঁদের কর্তব্যকর্মের নির্দেশও অশোক দিয়েছেন। এগুলি হল, (১) অনারম্ভ প্রাণায়াম (প্রাণীহত্যা না করা), (২) অভিহিংশ ভূতানাম (জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না করা), (৩) পিতরি মাতরি শুশ্রূষা (পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা), (৪) থৈর শুশ্রূষা (বয়স্ক জনের প্রতি শ্রদ্ধা), (৫) গুরুনাম অপচিতি (গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা), (৬) ভৃত্য এবং ক্রীতদাসের প্রতিও ভদ্র আচরণ এবং (৭) অপব্যয়তা, অপভাণ্ডাত্য (অল্প ব্যয় এবং সঞ্চয়)।

অশোক তাঁর ধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার সঙ্গে ধম্মপাদে-বর্ণিত বৌদ্ধনীতিবোধের বিশেষ মিল দেখা যায়। অশোক ধর্মের যে বর্ণনা অথবা সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, ধর্ম তাঁর কাছে ছিল

নৈতিক কর্তব্যের সমষ্টি। তাঁর লেখতে যে ধর্মীয় ভাব এবং ভাষা দেখা যায় তাকে কোনমতেই ব্যক্তিগত চিন্তা এবং বিশ্বাসের প্রকাশ মনে করা চলে না। ধম্মপদের অনুরূপ ভাব এবং ভাষা থেকে, একটিকে অন্যটির পরিপূরক বলে মনে হয়।

অশোক মাসকি লেখতে 'ধম্ম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ব্রহ্মগিরি লেখর দ্বিতীয়াংশে তিনি এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। অন্যান্য অনেক লেখতে তিনি ধম্মকে ব্যাখ্যা করেন। সপ্তম স্তম্ভলেখতে তাঁর এই প্রয়াস চরম পরিণতি লাভ করে। সেখানে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি, দরিদ্র ও দুঃস্থদের প্রতি, এমন কি ভৃত্য এবং ক্রীতদাসদের প্রতিও উদার আচরণের কথা বলেছেন। এই লেখতে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের প্রতি অশোকের সমদৃষ্টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধ গ্রন্থ ধম্মপাদেও অনুরূপ আচরণের কথা বলা হয়েছে।

অবশ্য অশোক তাঁর দুইটি লেখতে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেছেন। নবম শিলালেখতে তিনি, মহিলাগণ বিভিন্ন সময়, যেমন অসুখ হলে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, পুত্রের জন্ম হলে, কিংবা যাত্রারম্ভকালে, যেসব স্থূল আপত্তিজনক অনুষ্ঠানাদি করে থাকেন, তার নিন্দা করেছেন এবং পরিবর্তে, নৈতিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যজ্ঞে পশুবলি সরাসরি নিষিদ্ধ করেছেন। পশুবলির মতো আপত্তিকর সমাজ-অনুষ্ঠানও তিনি নিষিদ্ধ করেন। পরিবর্তে, চতুর্থ শিলালেখতে তিনি মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক দৃশ্যাদি দেখানোর কথা বলেছেন। এই লেখতে অশোক মন্তব্য করেছেন যে, যে ব্যক্তির আচরণ সৎ নয়, তার পক্ষে নৈতিক আচরণ সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর বংশধরদের নীতি এবং সদাচার মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। ধম্মপাদের একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায় ('এখন আমার এই কু-কর্ম চিনতে পারা প্রকৃতই কঠিন')। অশোক তাঁর প্রথম দিকের ঘোষণায় প্রজাদের জন্য উৎসাহ বা পরাক্রমের কথা বলেছেন। ষষ্ঠ শিলালেখতে তিনি সাধারণের কাজের জন্য পরাক্রমের প্রয়োজনের কথা পুনরায় উচ্চারণ করেছেন। উত্থান, পরাক্রম এবং অপ্পমাদের (অপ্রমাদ অর্থাৎ শ্রচম) কথা ধম্মপাদেও আছে। একাদশ শিলালেখতে বলা হয়েছে যে, কোন দানই ধম্মদানের মতো নয়। আবার, সব দানের মধ্যে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ, এই দাবী করেছেন। "চক্ষু" শব্দের এই ব্যবহার ধম্মপাদেও পাওয়া যায়। পরিশেষে অশোক বাহুবলে রাজ্যজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের কথা বলেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে, এই নীতি তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে, এমনকি অরণ্য অঞ্চলে অধিবাসীদের মধ্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অশোকের ধর্মের সঙ্গে ধম্মপাদে-বর্ণিত বৌদ্ধ ধর্মমতের অমিল দেখা যায়। অশোকের লেখতে বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে, ধর্মাচরণের জন্য ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে শান্তি, এই হিন্দু বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। পরলোকে 'সুখের' পরিবর্তে, অশোক অনেক জায়গায় 'স্বর্গ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ধম্মপাদে 'নির্বাণ' এবং স্বর্গের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

অশোকের ধম্মকে *অর্থশাস্ত্র*-র কঠোর রাজনৈতিক তন্ত্রের পরিপূরক বলা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ধম্মকে সমাজ-বিন্যাস-বিধান হিসাবে দেখা মৌর্যভারতে নতুন ছিল না। অর্থাৎ এ ধারণা আগেও ছিল। অশোক এই ধারণাকে মানবিক করে তুলতে চেয়েছিলেন, তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, যা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল সৎ আচরণ। অশোকের ধম্ম ছিল প্রধানত একটি নৈতিক ধারণা এবং এই ধারণা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। এই ধম্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে অশোক ধর্মীয় শিক্ষার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার

সাধন করতে, বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র মানুষের উদার সামাজিক আচরণ সম্পর্কে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কোন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই যাতে তার বিরোধিতা করতে না পারে।

অশোক যে নীতিবোধ প্রচার করেছিলেন, তা শুধু বৌদ্ধধর্মের নয়, সকল ভারতীয় ধর্মেরই সাধারণ লক্ষণ। তাঁর প্রবর্তিত ধম্মে আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কার্যকারণ সম্পর্ক, বুদ্ধের অতি-প্রাকৃত গুণাবলী ইত্যাদির উল্লেখ নেই। এমনকি নির্বাণ চিন্তাও সেখানে অনুপস্থিত। তাই অশোকের ধম্ম প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্ম ছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। রিস ডেভিডস বলতে চেয়েছেন যে, এই ধম্ম কোন ধর্ম ছিল না। প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যা করা উচিত, অশোক তাঁর 'ধম্মে' সেই কথাই বলেছেন। ডঃ ভাণ্ডারকর এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর মতে অশোকের ধম্ম সকল ধর্মের সারবস্তু, অথবা কোন বিশ্বজনীন ধর্ম ছিল না। এটা পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম। অশোকের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের রূপ ততটা প্রকট নয়, কেননা সেগুলির অধিকাংশ সাধারণ মানুষের, গৃহীভক্তদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। দ্বিতীয় অপ্রধান শিলালেখ (অথবা ভাব্রুলেখর) উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। এই লেখতে ধর্মশাস্ত্র-বিষয়ক যে গ্রন্থগুলি তিনি নির্বাচিত করেছেন, সেগুলি হল,—(১) *বিনয় সমুকাশ,* (২) *আলিয় বাস,* (৩) *অনাগত ভয়* (গুলি), (৪) *মুনিগাথা* (গুলি), (৫) *মোনেয় সুত্ত,* (৬) *উপতিস পসিন* এবং (৭) *লাঘুলবাদ*। যেহেতু এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সবই কোন-না-কোন বৌদ্ধ সুত্তরূপে চিহ্নিত হয়েছে, সেইহেতু, ডঃ ভাণ্ডারকরের মতে, অশোকের ধম্ম যে বৌদ্ধধর্মের সমার্থক ছিল, এই সত্য মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, অশোক কখনও তাঁর ধম্ম এবং বুদ্ধের উপদেশকে এক করে দেখেননি। তারা অশোকের লেখগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর লেখ তাদের মতে সাধারণ ঘোষণা এবং অপর শ্রেণী ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মতো। রুমামনদেই লেখ, গিলি সাগর লেখ, সারনাথের ধর্মীয় বিরোধসংক্রান্ত লেখ এবং ভাব্রু লেখ, তাঁদের মতে, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ভাব্রু লেখতে, অশোক যে বৌদ্ধ ছিলেন, সে কথা স্থিরকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এটি একটি ব্যক্তিগত লেখ এবং সাধারণের জন্য রচিত হয়নি। এটি একান্ত ও প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘের জন্য রচিত। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, অশোকের ধম্ম তাঁর রাষ্ট্রনীতির অংশ। সুতরাং তার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য অশোকের ব্যক্তিগত লেখর উপর নির্ভর করা সঙ্গত নয়।

তাঁদের মতে অশোকের ধম্ম ছিল তাঁর স্বকীয় আবিষ্কার। এই ধম্ম হয়তো ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভাবধারার কাছে ঋণী ছিল, কিন্তু মূলত এটি ছিল অশোকের পক্ষে, একটি ব্যবহারিক, সুবিধাজনক এবং নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতি নির্দেশের প্রয়াস। দার্শনিক তত্ত্বালোচনার সময় যাদের ছিল না, তাদের পক্ষে এটি ছিল একটি সুন্দর আপোষ-মীমাংসা। অশোকের ধম্মনীতি যদি শুধু বৌদ্ধনীতির লিপিবদ্ধকরণ হত, তাহলে তিনি সে কথা বলতেন, কেননা বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও সমর্থন তিনি গোপন করেন নি।

তাঁরা অশোকের দ্বৈত সত্তার কথা বলেছেন। একটি ছিল ব্যক্তিসত্তা, অন্যটি শাসকসত্তা। বৌদ্ধধর্ম ছিল ব্যক্তি অশোকের ধর্ম। শাসক হিসাবে অশোক বৌদ্ধধর্মের কয়েকটি দিককে তাঁর ভাবধারা প্রসারের উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধধর্মকে শুধু দর্শন হিসাবে দেখেন নি, তাকে

মানবগোষ্ঠীর পক্ষে সামাজিক এবং বুদ্ধিগত প্রেরণা রূপে দেখেছিলেন। তাঁদের মতে, অশোক এই উভয় সংকটের সমাধানকল্পে তাঁর ধম্মতত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন। এক কথায়, তাঁদের মতে ধর্ম এবং 'ধম্ম' সমার্থক ছিল না। অশোক ধম্ম সম্পর্কে বিশেষ ব্যস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন। শেষদিকে এ তাঁর মনের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে ধম্ম ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাই সামাজিক উত্তেজনা অথবা সাম্প্রদায়িক বিরোধ ধম্ম দূর করতে পারেনি। তবুও অশোকই প্রথম একটি নির্দেশক নীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। তাই তিনি প্রশংসার যোগ্য।

৩খ.৫ অশোক-পরবর্তী মৌর্যগণ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

অশোকের মৃত্যুকে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙনের সঙ্কেত বলা চলে। সপ্তম স্তম্ভলেখতে অশোক দান প্রসঙ্গে "তাঁর পুত্রদের" এবং "অন্যান্য রাণীদের" পুত্রগণের কথা বলেছেন। এলাহাবাদে প্রাপ্ত রাণীর স্তম্ভলেখতে, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী কারুবাকি এবং কারুবাকিপুত্র তিবরের নামোল্লেখ আছে। অশোকের অন্যান্য স্ত্রী এবং পুত্রদের কোন উল্লেখ তাঁর অপর কোন লেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর পুত্রসংখ্যা ছিল চার, মহেন্দ্র (অন্যমতে ভাই), তিবর, ধর্মবিবর্ধণ, অথবা কুণাল এবং জলৌকা। মহেন্দ্র ছিলেন দেবীর পুত্র, তিবর কারুবাকির, এবং কুণাল পদ্মাবতীর। জলৌকার মাতৃপরিচয় এখানে পাওয়া যায় না।

অশোক তাঁর পুত্রদের মধ্যে একমাত্র তিবর-এর নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর তার নাম আর পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে হয় যে, তিবরের অকালমৃত্যু হয়েছিল।

সাহিত্য উপাদানে তিবর ভিন্ন, মহেন্দ্র, কুণাল এবং জলৌকার উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে মহেন্দ্র কখনও সিংহাসনে বসেননি। সুতরাং সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার ছিলেন দুইজন, কুণাল এবং জলৌকা। *রাজতরঙ্গিনী* অনুসারে জলৌকা ছিলেন কাশ্মীরে এবং বৌদ্ধ উপাদান অনুসারে কুণাল ছিলেন পাটলিপুত্রে। *বায়ুপুরাণ* অনুসারে কুণাল আট বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু যেহেতু কুণাল অন্ধ ছিলেন সেইহেতু তাঁর রাজত্বকালে পাটলিপুত্রের প্রকৃত শাসক ছিলেন তাঁর পুত্র সম্প্রতি।

সাহিত্যে এবং লেখতে কুণালের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী তথ্য পাওয়া যায়। উত্তরাধিকারীরূপে বায়ুপুরাণে বন্ধু পলিতের, জৈন-বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে সম্প্রতির এবং তারানাথের রচনায় বিগতাশোকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু লেখতে দশরথের নামোল্লেখ আছে। ডঃ রায়চৌধুরী অনুমান করেন যে, হয়তো দশরথ এবং বন্ধুপলিত অভিন্ন ছিলেন।

কুণালের উত্তরাধিকারী হিসাবে দশরথ এবং সম্প্রতি প্রাধান্যলাভ করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন যে, মৌর্য সাম্রাজ্য তখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছিল। অধ্যাপক টমাসের মতে সম্প্রতির পরে মৌর্য সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই বিভাগের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্প্রতির পরে সালিসুখ পাটলিপুত্র শাসন করেছিলেন। *বিষ্ণুপুরাণ* এবং *গার্গীসংহিতা* থেকে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে এবং পরে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ করেন। *রাজতরঙ্গিণী* অনুসারে জলৌকা কাশ্মীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সৈন্যসহ কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন।

কিন্তু পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করে মৌর্য সাম্রাজ্য তখনও কোনমতে টিকে ছিল। সালিসুখ এবং বৃহদ্রথের মধ্যে কয়েকজন অকিঞ্চিৎকর রাজা রাজত্ব করেন। বৃহদ্রথ ছিলেন মৌর্যবংশের শেষ শাসক। পুরাণে এবং বাণভট্টের *হর্ষচরিত* -এ তাঁর উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে তিনি তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হন। এইভাবে মাত্র ১৩৭ বৎসরেরক মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

৩খ.৫.১ মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছরের মধ্যে গ্রীকগণ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেছিল। এই হিন্দুকুশ পর্বত চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমান্ত রচনা করেছিল। সুতরাং বলা যায় যে মৌর্যদের সে সামরিক শক্তি একদা আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেলুকাসের আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল, তখন আর তা অক্ষুণ্ণ ছিল না। অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটেছিল। এই সাম্রাজ্য তখন পতনের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের এই অবনতি ও পতন কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এজন্য ব্রাহ্মণ বিপ্লবকে দায়ী করেছিলেন। তাঁর মতে এই বিপ্লব সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করেছিল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-সব যুক্তির অবতারণা করেন, ডঃ রায়চৌধুরী একের পর এক সেগুলি খণ্ডন করেছেন।

ব্রাহ্মণ-অসন্তোষের কারণ হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় অশোকের পশুবলিবিরোধী বিধানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই বিধানের লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণশ্রেণী, এবং অশোক শূদ্রবংশজাত হওয়ায় এই শ্রেণীর অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, পশুবলি নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কেননা, অশোকের অনেক আগে ব্রাহ্মণগণ পবিত্র শ্রুতিতে অহিংসার পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। তাছাড়া মৌর্যগণ শূদ্রবংশজাত ছিলেন, এই ধারণাও ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ডঃ রায়চৌধুরী বিষয়টি নতুন করে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে মহাপদ্মনন্দের পরে শূদ্রবংশের রাজারা রাজত্ব করবেন, এমন কথা পুরাণে আছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, মহাপদ্মের পরে সব রাজাই শূদ্র ছিলেন। কণ্ববংশের রাজারা তো ব্রাহ্মণ ছিলেন। *মুদ্রারাক্ষস* নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্র বলা হয়েছে। কিন্তু এই নাটকটি অনেক পরবর্তীকালের রচনা, তাই ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৌদ্ধ উপাদানে *মহাপরিনির্বাণ-সুত্ত*-এ এবং *মহাবংশ*-এ, মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। *দিব্যবদান*-এ আছে যে, বিন্দুসার একটি মেয়েকে বলেছেন, "তুমি নাপিতের মেয়ে আর আমি ক্ষত্রিয় রাজা। তোমার সঙ্গে আমার মিলন কী করে সম্ভব?" অশোক রাণী তিষ্যরক্ষিতাকে বলেছেন "দেবী! আমি ক্ষত্রিয়! আমি কি করে পলাণ্ডু ভক্ষণ করব?" মহীশুরলেখতে, চন্দ্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তার আভাস আছে। 'অভিজাত' রাজার প্রতি কৌটিল্যের ঝোঁক দেখে মনে হয় যে তাঁর প্রভু চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন।

এর পরে পণ্ডিত শাস্ত্রী অশোকের প্রথম অপ্রধান শিলালেখর পঞ্চম অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে, এই অংশের সেনার্টকৃত অনুবাদ গ্রহণ করেছেন। সেনার্টের অনুবাদে অশোক এখানে বলেছেন, এতদিন যাদের ভূদেব মনে করা হত, অশোক তাঁদের মিথ্যা দেবতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেছেন যে, ব্রাহ্মণদের ভূদেব মনে করা হত। সুতরাং অশোক তাঁর এই ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণদের বিশেষ অসুবিধায়

ফেলেছিলেন। শিলালেখর এই অংশে যে শব্দটি বিতর্ক এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে সেটি হল 'অমিসাদেবা'। সেনার্ট 'মিস' শব্দটিকে সংস্কৃত 'মশা' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, এর অর্থ করেছেন মিথ্যা। সিলভাঁ লেভি দেখিয়েছেন যে, এই লেখতে 'মিস' শব্দটি মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'মিশ্র' অর্থে হয়েছে। লেভির ব্যাখ্যা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমগ্র অনুচ্ছেদটির বক্তব্য পরিবর্তিত হয়ে যা দাঁড়ায় তা হল, যারা এতদিন দেবতাদের সঙ্গে অমিশ্রিত ছিল, (অশোকের এক বছরের প্রচারকার্যের ফলে) তিনি তাদের দেবতাদের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়েছিলেন। অশোক এখানে কাউকে অসুবিধায় ফেলতে চাননি। শাস্ত্রীয় সমালোচনা তাই অসংগত মনে হয়।

পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেছেন যে, অশোক ধর্মমহামাত্র পদ সৃষ্টি করে প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্মণদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এই অভিযোগের উত্তরে ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, ধর্মমহামাত্রগণ শুধু ধর্মবিষয়ক দায়িত্ব পালন করতেন না, তাঁদের শাসন-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে হত। ব্রাহ্মণদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া তাঁরা যে শুধু অব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন, এমনও কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য ক্রমে তাঁরা এক ধরনের পুরোহিতে পরিণত হয়ে অশোকের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ করেছিলেন।

অশোকের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ এই যে, তিনি দণ্ডসমতা এবং ব্যবহারসমতার উপর অত্যধিক জোর দিয়ে বিচারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন, যেমন মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি, তাকে সঙ্কুচিত করেন। এ সম্পর্কে ডঃ রায়চৌধুরীর বক্তব্য এই যে, দণ্ডসমতা ও ব্যবহারসমতার প্রশ্নটি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। অশোক বিচারবিষয়ে রজুকদের স্বাধীনতা দান করেছিলেন। এর ফলে বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। এই সম্ভাবনা দূর করার জন্যই তিনি দণ্ডসমতা এবং ব্যবহারসমতার কথা বলেছিলেন। এর দ্বারা রজুকদের অধিকার সঙ্কুচিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণদের হয়নি। তাছাড়া ব্রাহ্মণগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত না, এই ধারণাও যথার্থ নয়। কৌটিল্য লিখেছেন যে, রাজদ্রোহের অপরাধ হলে, ব্রাহ্মণকে জলে ডুবিয়ে মারা হত।

পণ্ডিত শাস্ত্রী বলেছেন যে, অশোকের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণগণ তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিরোধিতা করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, এমন ধারণাও অমূলক। বরং ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক কহ্লণের রচনা থেকে জানা যায় যে, জলৌকার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

পরিশেষে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৃহদ্রথের হত্যার উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে ব্রাহ্মণদের হাত ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, শুঙ্গদের কালে রচিত ভারহুতে স্থাপত্য নিদর্শন থেকে মনে হয় না যে শুঙ্গগণ সংগ্রামী ব্রাহ্মণ্যবাদের নেতা ছিলেন। তাছাড়া পুষ্যমিত্র বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন তার অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, *রাজতরঙ্গিণী,* তারানাথ এবং কালিদাস থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীর, গান্ধার এবং বিদর্ভ, যথাক্রমে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। পলিবায়াস যে সুভগসেনের কথা বলেছেন, তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং, ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতি এবং ভাঙ্গন পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণবিপ্লবের ফলে ঘটেনি। তাহলে কি যবন-আক্রমণের ফলে এই ঘটনা ঘটেছিল? ঐতিহাসিক দিক থেকে

সেকথা বলা যায় না। কেননা এ্যান্টিয়োকাসের নেতৃত্বে প্রথম যবন-আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা আরও আগে হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যাঁরা অশোককে দায়ী করেন, তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তাঁরা বলেন যে, অশোকেগর নীতি বৌদ্ধদের সপক্ষে ছিল এবং তিনি ব্রাহ্মণবিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন যে, অশোকের সাধারণ নীতি বৌদ্ধদের সপক্ষে, অথবা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ছিল না। দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, দূরবর্তী প্রদেশসমূহের অমাত্যগণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। এই অত্যাচারের জন্য বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশিলা বিদ্রোহ করেছিল। অশোকের রাজত্বকালে তক্ষশিলা দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করে। অশোক বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্য কুণালকে সেখানে পাঠান। বিদ্রোহীরা কুণালকে বলে যে, দুষ্ট অমাত্যগণ তাদের উপর অত্যাচার করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, পরবর্তীকালের রচনা *দিব্যবদান*-এ বর্ণিত অমাত্যগণের এই অত্যাচারকাহিনী অশোকের কলিঙ্গ-লেখ দ্বারা সমর্থিত হয়। এই লেখটি কলিঙ্গের রাজধানী তোসালীর মহামাত্রদের উদ্দেশে রচিত। এখানে অশোক বলেছেন, "সকল মানুষই আমার সন্তান। কিন্তু আপনারা এর (অর্থাৎ এই নীতির) সত্যতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন না। ব্যক্তিবিশেষ হয়তো এই নীতি মেনে চলেন, কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণভাবে মানেন না। আপনারা দেখবেন যেন শাসনকার্যে এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।" ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, কুশাসন শুধু কলিঙ্গেই ছিল না, তক্ষশীলা এবং উজ্জয়িনীতেও তা বিস্তৃত হয়েছিল। এই কুশাসনের ফলে বিভিন্ন মানুষের আনুগত্য ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। অশোক প্রদেশ শাসনের এই ত্রুটি দূর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পারেন নি, কেননা একাজে অমাত্যবর্গ তাঁকে সাহায্য করেননি। ডঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীগণ বিন্দুসারের সময় অমাত্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, তারাই প্রথমে মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ডঃ রোমিলা থাপার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে প্রদেশগুলিতে অমাত্যদের অত্যাচার সম্পর্কিত ধারণা *দিব্যবদান*-এর দুইটি কাহিনীর উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হয়েছে। এদের মধ্যে একটি কাহিনী অশোকের রাজত্বকালের পরে অযথা উদ্ভাবিত হয়েছে। তিনি বলেছেন অশোকের সময় অমাত্যদের অত্যাচারের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রথম কলিঙ্গ-লেখ শুধুমাত্র তোসালীর মহামাত্রদের উদ্দেশে রচিত। এবং এখানেও অশোকের সুর যথেষ্ট কর্তৃত্বপূর্ণ। অন্যদিকে বলা যায় যে, তাহলে প্রজাদের অভিযোগ শোনার জন্য বিশেষ কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন কেন হয়েছিল।

অশোকের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে, কলিঙ্গ জয়ের পর তিনি একান্তভাবে শান্তিবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি অহিংসাকে নীতি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে তিনি ধর্মবিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বিহারযাত্রার স্থলে ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সেনাবাহিনী নির্বীর্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজত্বের শেষ ঊনত্রিশ বৎসর তাদের কিছু করণীয় ছিল না। কেননা অশোক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ভেরিঘোষের পরিবর্তে ধম্মঘোষের প্রবর্তন করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন যবন-আক্রমণের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছিল। ভারতের ইতিহাসে তখন প্রয়োজন ছিল পুরুরাজ অথবা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মতো সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী একজন সম্রাটের। অশোকের মধ্যে ভারত একজন স্বপ্নদ্রষ্টাকে পেয়েছিলেন। সামরিক দিক থেকে এর ফল মারাত্মক হয়েছিল।

অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু একই দৃষ্টিকোণ থেকে তা করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে কে. এ. এন. শাস্ত্রীর নামোল্লেখ করা যায়। তাঁর দৃষ্টিকোণ বিশেষ উন্নত। তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধ করলেই একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় না। ঔরঙ্গজেব সারা জীবন যুদ্ধে ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর করতে পারেননি।

অন্যদিকে ডঃ রোমিলা থাপারের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেছেন যে, অশোকের শান্তিবাদী মনোভাবকে অনেক সময় অতিরঞ্জিত করা হয়। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে যতটা হাস্যকরভাবে সরল এবং শান্তিবাদীরূপে চিত্রিত করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ততটা ছিলেন না। ডঃ থাপার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেনঃ (১) অশোক যজ্ঞ এবং খাদ্যের জন্য পশুহত্যা অপছন্দ করতেন, কিন্তু তিনি খাদ্যের জন্য পশুহত্যা বন্ধ করেন নি, (২) তিনি মৃত্যুদণ্ডদান রহিত করেননি, (৩) সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে তিনি অহিংসা নীতিতে নোঙর করেননি। অন্তত তাঁর লেখতে এর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সীমান্তের উপজাতিদের সম্পর্কে তাঁর নীতিতে যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি তাদের নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করতে চাননি। বাসাম বলেছেন পূর্ববর্তী রাজারা তাদের ধ্বংস করার জন্য একের পর এক অভিযান চালিয়েছেন। অশোক তাদের সভ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা শান্তি বিঘ্নিত করলে, তিনি তাদের দমন করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ডঃ থাপার বলেছেন যে, অশোক অস্ত্র হিসাবে যুদ্ধকে বর্জন করেননি। তিনি শুধু বলেছেন যে, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা যে তাঁর ছিল, কলিঙ্গ যুদ্ধেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাসাম বলেছেন, অশোক কলিঙ্গের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিজিত রাজাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেননি। তাঁর মতে, অশোক 'প্রতি ইঞ্চি রাজা' ছিলেন।

ডঃ রায়চৌধুরী অশোকের বিরুদ্ধে আর যে দুইটি অভিযোগ এনেছেন, তাদের যৌক্তিকতা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন যে, অশোক তাঁর ইতস্তত এবং ব্যাপক দানকার্যের দ্বারা মৌর্য-অর্থনীতিকে দুর্বল করেছিলেন। তাছাড়া তিনি রজুকগণকে স্বাধীনতা দান করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অশোকের পরবর্তী শাসকেরা দুর্বল ছিলেন। এই অশুভশক্তিকে দমন করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই তাঁদের ছিল না। অশোকের বংশধরদের মধ্যে একমাত্র দশরথ ভিন্ন অন্য কেউ অশোকের ধম্মের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁদের এই অযোগ্যতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । তাঁরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক বৃহদ্রথের হত্যা, তারই প্রমাণ।

অশোকের অল্পকাল পরে মৌর্য সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে দশরথ রাজত্ব করতেন, পশ্চিমাংশে কুণাল। এই বিভাগের ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ভেঙে যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় পাটলিপুত্র পূর্বাঞ্চলে থাকায় তার কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে প্রাদেশিক রাজধানী তক্ষশীলাকে কেন্দ্র করে প্রায় সাম্রাজ্য-সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছিল। এই অঞ্চল তাই গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় গণবিদ্রোহের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, এই বিদ্রোহ ছিল মৌর্যসম্রাটগণ কর্তৃক বিদেশী ভাবধারা গ্রহণ এবং অত্যধিক করভার আরোপের বিরুদ্ধে।

যারা এই মতের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, মৌর্যযুগে করভার অতিরিক্ত ছিল না। পাটলিপুত্র এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল ছিল সবচেয়ে উর্বর। কিন্তু মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে সেখানে করের পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ। তাছাড়া গণবিদ্রোহের জন্য যে জাতীয় চেতনার প্রয়োজন হয়, মৌর্যযুগে তার অস্তিত্ব ছিল না।

ডি. ডি. কোশাম্বি বলেছেন যে, অশোক-পরবর্তী শাসকদের সময় মৌর্য-অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি দুইটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, *অর্থশাস্ত্র* থেকে জানা যায় যে, তখন অভিনেতা, এমনকি গণিকাদের উপরও কর ধার্য হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তখনকার মুদ্রায় খাদ্যের পরিমাণ খুব বেড়েছিল। ডঃ রোমিলা থাপার একদা এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মৌর্যযুগেই প্রথম করের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। তাই তখন করযোগ্য সব কিছুর উপর কর ধার্য করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া যে দুইটি করের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি স্বাভাবিক কর ছিল, আপৎকালীন কর ছিল না। আর মুদ্রায় অতিরিক্ত খাদ নিয়ন্ত্রণশৈথিল্য অথবা উদ্বৃত্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখার জন্য হতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে, হস্তিনাপুর এবং শিশুপালগড়ের স্থাপত্য-নিদর্শন বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির চিত্র মনে আনে। ভারহুত, সাঁচি, এবং দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্যকে একটি নতুন পরিশ্রমজীবি শ্রেণীর অভিব্যক্তি বলা চলে।

ডঃ রোমিলা থাপার পরে তাঁর মতের পরিবর্তন করেছেন এবং সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণকে বড় করে দেখেছেন। মৌর্য-অর্থনীতির উপর কিছুটা চাপের সৃষ্টি হয়েছিল একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বৃহৎ সৈন্যদল, বেতনভুক কর্মচারী এবং নিত্যনতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য রাজকোষের উপর এই চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। মৌর্যযুগের নগরসমূহে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক-নিদর্শন বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির আভাস দেয় সত্য, কিন্তু একমাত্র একেই নিশ্চিত প্রমাণ বলা যায় না। অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদানের কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় যদিও কৃষি-অর্থনীতি প্রাধান্য লাভ করেছিল, সাম্রাজ্যের সর্বত্র অর্থনীতির রূপরেখা এক ছিল না। রাজস্বের মধ্যেও তারতম্য ছিল। এই বৈষম হয়তো অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছিল। কৃষি এলাকা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব হয়তো সমগ্র সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না।

কোন সাম্রাজ্যের পক্ষে দুইটি বস্তু অপরিহার্য, একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থা, অন্যটি প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক আনুগত্য। মৌর্য-শাসনব্যবস্থা ব্যবহারিক দিক থেকে সুসংগঠিত হলেও, তাতে একটি মারাত্মক ত্রুটি ছিল, যে জন্য তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। তাতে আমলাতন্ত্র ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রাভিমুখী, সকল ক্ষমতার আধার ছিলেন রাজা, প্রজাদের আনুগত্য ছিল ব্যক্তিগতভাবে রাজার প্রতি। রাজা বদল হলে, আনুগত্যেরও পরিবর্তন ঘটত এবং তার চেয়েও খারাপ, রাজ-কর্মচারীগণও পরিবর্তিত হতেন। ইচ্ছামত কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হত। রাজা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করতেন, প্রাদেশিক শাসকগণ তাঁদের অধীনে কর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন। শাসনক্ষমতা এইভাবে একই সামাজিক গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়েছিল। নিযুক্তি স্থানীয়ভাবে হওয়ায়, স্থানীয় দলাদলি স্থানীয় শাসনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। জনমতকে স্থায়িত্ব দান করার মতো প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের অভাব আরও সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। মৌর্যদের গুপ্তচরব্যবস্থা নিশ্চয়ই রাজনীতিতে এবং শাসনকার্যে চাপা উত্তেজনার কারণ হয়েছিল। ডঃ থাপার বলেছেন যে, ভারতে গণরাজ্যগুলির অবনতির সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনা ধীরে ধীরে নেপথ্যে চলে যায়। ধর্মীয় গোঁড়ামির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল রাজতন্ত্রশাসন ক্রমশ রাষ্ট্রচেতনাকে অস্পষ্ট করে তোলে।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে সমাজবন্ধনের প্রতি আনুগত্য গড়ে ওঠে। ডঃ থাপার এই সমাজবন্ধনকে 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ধীরে ধীরে রাষ্ট্রচেতনার স্থান নিয়েছিল এই ধর্ম।

তৎকালীন রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে মূর্ত স্তরে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা এবং সরকার এবং বিমূর্ত স্তরে, ধর্ম। রাজার দায়িত্ব ছিল এই ধর্মকে রক্ষা করা। এই ধর্ম বা সমাজবন্ধন খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হত। তাই এই পরিবর্তন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত এবং এর প্রতি আনুগত্যের কোনপ্রকার শৈথিল্য ঘটত না। এই সমাজবন্ধনের পিছনে দৈব সমর্থন কল্পনা করা হত বলে একে রক্ষা করা পবিত্র কর্তব্য মনে করা হত। স্থানীয় পর্যায়ে সমাজবন্ধনের প্রতি আনুগত্যকে জাতিভেদব্যবস্থার মাধ্যমে সক্রিয় করা হত বলে, কোন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠতে পারত না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের বিভিন্ন কারণ আলোচনা করে বলা যায় যে, অভ্যন্তরীণ কারণে এই সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। যবন-আক্রমণ এই পতনকে ত্বরান্বিত এবং পুষ্যমিত্রের হত্যাকাণ্ড তাকে সম্পূর্ণ করেছিল। প্রাচীন ভারতে প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের পরীক্ষা এইভাবে শেষ হয়েছিল। ভবিষ্যতে অনুরূপ পরীক্ষা আরও হয়েছিল। কিন্তু তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক আগের মতো ছিল না। তখন রাজা এবং প্রজার মধ্যে মধ্যস্থ হিসেবে এসেছিলেন কর্মচারী এবং ভূম্যধিকারীগণ। রাজা তাঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। তাই পূর্বের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশ তখন আর তেমন জোরালো ছিল না। ক্রমশ পতিত-জমি উদ্ধার করার ফলে, অকর্ষিত অঞ্চল সঙ্কুচিত হয়েছিল। বিরাট সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হ্রাস পেয়েছিল। সাম্রাজ্য-বাসনা লুপ্ত হয়নি, কিন্তু প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের পিছনে যে বাধ্যবাধকতা এবং তীব্রতা ছিল, পরে তা ততটা ছিল না।

পরিশেষে বলা যায় যে, মৌর্যযুগে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠেনি। রাষ্ট্রশাসনে জনসাধারণের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। সব কিছু একান্তভাবে রাজার শক্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। অশোকের পরে সেই শক্তির অভাব ঘটেছিল। ব্রাহ্মণদের অসন্তোষও হয়তো মৌর্য সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছিল।

৩খ.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কীভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যবিজয় সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৪। অশোকের 'ধম্মে'-র মূল বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল?

৫। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কি ব্রাহ্মণ্য বিদ্রোহই দায়ী ছিল?

৩খ.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। রণবীর চক্রবর্তী : *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*—আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৩৮ (বঙ্গাব্দ)

২। দি মৌরিয়াজ রিভিজিটেড, ১৯৮৭ : *অশোকা এ্যান্ড দি ডিক্‌লাইন অফ্ দি মৌরিপ্রাস্ (১৯৬৩)*

৩। রোমিলা থাপার (সম্পা) : *রিসেন্ট পার্সপেকটিভ্‌স্ অফ্ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্টরী (১৯৯৫)*

৪। আর. সি. মজুমদার (সম্পা) : *দি এজ্ অফ্ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি (১৯৫১); দি ক্লাশিকাল এ্যাকাউন্টস্ অফ্ ইন্ডিয়া*

৫। আর. পি. বাংগলে : *দি কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, তৃতীয় খণ্ড (১৯৩২)*

৬। টি. ডব্লু. ম্যাকক্রিণ্ডল : *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া এ্যান্ড ডেসক্রাইব্‌ড বাই মেগাস্থিনিস এ্যান্ড আরিয়ান (১৯২৩)*

৭। ভি. আর. আর. দিক্‌সিতার : *মৌরিয়ান পলিটি (১৯৩২)*

৮। কে. এ., এন. শাস্ত্রী : *দি এজ্ অফ্ নন্দাস্ এ্যান্ড মৌরিয়ান (১৯৬২)*

৯। বি. এন. মুখার্জী : *দি ক্যারেকটার অফ্ দি মৌর্য এম্পায়ার (২০০০)*

১০। আর. কে. মুখার্জী : *চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এ্যান্ড হিস্ টাইমস্ (১৯৫২)*

১১। ডি. সি. সরকার : *অশোকান স্টাডিস্ (১৯৭৯)*

১২। এইচ. সি. রায়চৌধুরী : *পলিটিকাল হিস্টরী অফ্ এন্‌সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, (১৯৯৬)।*

একক ৪ক ❑ ভারতে বিদেশী শক্তির উন্মেষ—কুষাণ, গ্রীক, শক ও পার্থিয়দের ইতিহাস। দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের উদ্ভব।

গঠন

৪ক.০ উদ্দেশ্য

৪ক.১ প্রস্তাবনা

৪ক.২ ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ

- ৪ক.২.১ ইউথিডিমস
- ৪ক.২.২ ডেমিট্রিয়স
- ৪ক.২.২ ইউক্রটিডিস
- ৪ক.২.২ হেলিওক্লেস
- ৪ক.২.২ মিনান্দার
- ৪ক.২.২ মিনান্দারের পরে
- ৪ক.২.২ হারমাইয়স

৪ক.৩. শক-পার্থিয়গণ

- ৪ক.৩.১ তক্ষশিলার শক-সম্রাটগণ
- ৪ক.৩.২ মথুরার ক্ষত্রপগণ
- ৪ক.৩.৩ সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ
- ৪ক.৩.৪ পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপগণ

৪ক.৪ কুষাণ সাম্রাজ্য

- ৪ক.৪.১ কুজুল কদফিস
- ৪ক.৪.২ বিম কদফিস
- ৪ক.৪.৩ প্রথম কনিষ্ক
- ৪ক.৪.৪ কনিষ্কের শাসনব্যবস্থা
- ৪ক.৪.৫ কনিষ্কের উত্তরাধিকারীগণ
- ৪ক.৪.৬ কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতি

৪ক.৫ সাতবাহনগণ
৪ক.৫.১ কালসীমা
৪ক.৫.২ সিমুক
৪ক.৫.৩ কৃষ্ণ
৪ক.৫.৪ প্রথম সাতকর্ণি
৪ক.৫.৫ দ্বিতীয় সাতকর্ণি
৪ক.৫.৬ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি
৪ক.৫.৭ পুলুমায়ী
৪ক.৫.৮ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি
৪ক.৫.৯ সাতবাহনদের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা
৪ক.৫.১০ সমাজ ও ধর্ম
৪ক.৬ অনুশীলনী
৪ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪ক.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন : মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরে কীভাবে একের পর এক বিদেশী শক্তিসমূহের ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হবে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পার্থিয়দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিশেষভাবে আলোচিত হবে কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস এবং কণিষ্কের রাজত্বকাল এবং কুষাণদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবদান।

দক্ষিণ-ভারতের মৌর্য পরবর্তী যুগের প্রধান শক্তি সাতবাহনবংশের ইতিহাস। সাতবাহনদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির রাজত্বকাল ও অবদান এবং সাতবাহনদের রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিবৃত্তর এই এককের সার সংকলন।

৪ক.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আলোচিত হবে মৌর্য-পরবর্তী যুগের ভারতের অবস্থা। মৌর্য সাম্রাজ্যে নানাভাবে ভারতের ঐক্য অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের সেই ঐক্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। এর সুযোগ নিয়ে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরে একের পর এক বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। সেলুকাস প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্যাকট্রিয়া নামক প্রদেশটির থেকে আগত ব্যাকট্রিয় গ্রীকরা মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথম উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশ আক্রমণ ও অধিকার করে। সেলুকিড সম্রাটগণ

প্রধানত সিরিয়ার শাসকরূপেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইউথিডিমসের সময় ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল এবং তাঁর পুত্র ডেমিট্রায়সের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকদের সম্প্রসারণ নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছিল। ইন্দো-গ্রীক শাসকদের মধ্যে মিনান্দার ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তিনিই ছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ পঞ্হোর মিলিন্দ। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক মিনান্দার নিজেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মুদ্রার অধিকাংশই রূপোর অথবা তামার যা থেকে অনুমান করা যায় যে তাঁর সাম্রাজ্য যেমন সুবিস্তৃত ছিল, তেমনই তৎকালীন বাণিজ্যের প্রসারও ঘটেছিল।

গ্রীকদের পরে আক্রমণকারীরূপে এসেছিলেন শক ও পার্থিয়গণ। ভারতে শকদের ইতিহাস কেন্দ্রস্থ ছিল তক্ষশিলা, মথুরা, সুরাষ্ট্র এবং মালবে।

পার্থিয়দের পরে এসেছিলেন কুষাণগণ। তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পার্থিয়দের বিতাড়িত করে, উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। কুষাণগণ যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা একদিকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত এবং অন্যদিকে চীন সাম্রাজ্যের প্রান্ত স্পর্শ করেছিল। কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রথম কনিষ্ক শুধু রাজ্য বিজেতা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেন নি, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সঙ্গীতির চতুর্থ অধিবেশনে বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঘটে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়। কুষাণগণ শিল্প ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুষাণদের অনুপ্রেরণায় অসংখ্য চৈত্য, মন্দির, নগর, স্তূপ ও বিহার নির্মিত হয়েছিল এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমের গান্ধার শিল্পরীতি এক স্বতন্ত্র মহিমায় বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ও উৎকর্ষেরও সূচনা হয়েছিল এই যুগেই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় *বুদ্ধচরিত* প্রণেতা অশ্বঘোষের নাম অথবা প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নাগার্জুনের।

মৌর্য-পরবর্তী এবং গুপ্ত-পূর্ববর্তী যুগের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস প্রধানত সাতবাহন বংশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। তাই এই এককের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন যে দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রকে নিয়ে কীভাবে সাতকাহন বংশ একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি নিঃসন্দেহে ছিলেন গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি। গৌতমীপুত্রের মাতা গৌতমী বলশ্রী রচিত নাসিক প্রশস্তি থেকে গৌতমীপুত্রের রাজ্যজয়ের উপাখ্যান যেমন জানা যায়, তেমনিই এর থেকে আরো জানা যায় যে গৌতমীপুত্র মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধার করে সাতবাহন বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। শকদের পরাজিত করে তিনি পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অংশবিশেষ বিদেশী শাসনমুক্ত করেন। গৌতমীপুত্র ও তাঁর পরবর্তী সাতবাহন নৃপতি বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির নেতৃত্বে বৃহৎ সাতবাহন সাম্রাজ্যের একটি উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থারও পত্তন হয়েছিল।

৪ক.২ ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ

মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধুনদ এমনকি হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের সঙ্গে এই অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন। সেলুকাসের সঙ্গে সন্ধিতে তিনি সিন্ধু উপত্যকার কয়েকটি অঞ্চল লাভ করেছিলেন।

অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে মৌর্য অধিকার ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। মৌর্য সাম্রাজ্যের এই ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গ্রীকরা আবার উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-ভারতের বৃহৎ অংশ আক্রমণ ও অধিকার করে। এই গ্রীক আক্রমণকারীরা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে আসেনি। তারা পূর্বাঞ্চলে সেলুকিড (সেলুকাস প্রতিষ্ঠিত) সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ, ব্যাকট্রিয়া থেকে এসেছিল। তাই ইতিহাসে তারা ব্যাকট্রিয় গ্রীক নামে পরিচিত।

এই সেলুকিড সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পূর্বভাগ নিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর যখন তাঁর সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল, তখন সেলুকাস এই অঞ্চল লাভ করেছিলেন। সিরিয়া (ব্যাকট্রিয়া এবং পার্থিয়া) সেলুকিড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিরিয়া ছিল সেলুকিড সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। সেলুকিড সম্রাটগণ তাই প্রধানত সিরিয়ার শাসকরূপে পরিচিত।

খ্রিস্টপূর্ব ২৯৩ অব্দে সেলুকাস তাঁর পুত্র এ্যান্টিওকাসকে যুগ্ম রাজারূপে গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে এই এ্যান্টিওকাস স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি প্রথম এ্যান্টিওকাস নামে পরিচিত। সিরিয়ার পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাসের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৬১-২৪৬ অব্দ) ব্যাকট্রিয়া এবং পার্থিয়া উভয়েই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ব্যাকট্রিয়ায় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন গ্রীক শাসনকর্তা ডায়োডেটাস। পার্থিয়ার বিদ্রোহ ঘটান আরসাকেস। তাঁর আদি পরিচয় জানা যায় না। দুটি বিদ্রোহের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। আরসাকেসের বিদ্রোহের পিছনে জনসমর্থন ছিল। ডায়োডোটাসের পিছনে তা ছিল না। তাঁর বিদ্রোহের পিছনে একান্তভাবে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল।

দ্বিতীয় এ্যান্টিওকাস এবং তাঁর পরবর্তী দুইজন সিরিয়ার শাসক, দ্বিতীয় সেলুকাস (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৬-২২৬ অব্দ) এবং তৃতীয় সেলুকাস (খ্রিস্টপূর্ব ২২৬-২২৩ অব্দ) এই বিদ্রোহ দমন করতে পারেন নি। পরবর্তী শাসক, তৃতীয় এ্যান্টিওকাস, যিনি এন্টিওকাস দ্য গ্রেট নামে পরিচিত, এই প্রদেশ দুইটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করেন, তাতে এই প্রদেশ দুইটির স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়। তখন ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন ইউথিডিমস।

ডায়োডোটাস দীর্ঘকাল ব্যাকট্রিয়া শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন সিরিয়ার সম্রাটের অধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরে, স্বাধীন নৃপতি। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি প্রথম ডায়োডোটাস নামে পরিচিত। জাস্টিন লিখেছেন, পার্থিয়ার আরসাকেসের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। তিনি আরও লিখেছেন যে, অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ডায়োডোটাস সিংহাসনে বসেন। তিনি বৈদেশিক ক্ষেত্রে পিতার নীতির পরিবর্তন করেন। পার্থিয়ার প্রথম রাজা আরসাকেসের সঙ্গে তিনি মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন করেন। তাঁর এই নীতি বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। দ্বিতীয় সেলুকাসের দুরভিসন্ধির হাতে থেকে এই নীতি ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়াকে রক্ষা করেছিল।

দ্বিতীয় ডায়োডেটাস ঠিক কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, বলা কঠিন। পলিবায়াস লিখেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব ২১২ অব্দে যখন তৃতীয় এ্যান্টিওকাস হৃত প্রদেশ দুইটি পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে আসেন, তখন তিনি ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসনে ইউথিডিমসকে দেখেন। এই ইউথিডিমস ছিলেন ম্যাগনেসিয়ার অধিবাসী। তিনি দ্বিতীয় ডায়োডোটাসকে সিংহাসনচ্যুত এবং হয়তো হত্যা করেন।

৪ক.২.১ ইউথিডিমস

ইউথিডিমসের সময় ব্যাকট্রিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ব্যাকট্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ডায়োডোটাস। এই ইউথিডিমস এবং তাঁর পুত্র ডোনট্রায়সের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকদের সম্প্রসারণ নতুন ভাবে আরম্ভ হয়। ইউথিডিমস অবশ্য তৃতীয় এ্যান্টিওকাসের বিরুদ্ধে সামরিক দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যায়নি। তাঁর রাজধানী ব্যাকট্রা অবরুদ্ধ এবং তাঁর নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। কিন্তু কূটনীতিতে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে দূত হিসাবে এ্যান্টিওকাসের কাছে পাঠান এবং শান্তির প্রস্তাব করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে এ্যান্টিওকাস ইউথিডিমসের সঙ্গে সন্ধি করেন, তাছাড়া তিনি তাঁর একটি কন্যার সঙ্গে ডেমিট্রায়সের বিবাহ দিতে সম্মত হন। এর পর তিনি ব্যাকট্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন, কাবুল নদীর উপত্যকা দিয়ে সুভগসেনের রাজ্যে আসেন। এই সুভগসেন হয়তো মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন এবং মৌর্যদের পতনের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তৃতীয় এ্যান্টিওকাস তাঁর বশ্যতা আদায় করে স্বদেশে ফিরে যান। তাঁর এ প্রত্যাবর্তনের পর গ্রীকদের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা রূপায়ণের আর কোন বাধা থাকে না।

ইউথিডিমসের মুদ্রার প্রাচুর্য থেকে মনে হয় যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করেন। তবে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা প্রসারিত করেছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০ অব্দে তিনি মারা যায় ইউথিডিমস ব্যাকট্রিয়াকে দৃঢ় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শক্তির সাহায্যেই ডেমিট্রায়স গ্রীক বাহিনীকে ভারতের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রীকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তাঁর এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি। তবুও তিনিই ভারতের মাটিতে গ্রীক আধিপত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

৪ক.২.২ ডেমিট্রায়স

ডেমিট্রায়স সম্পর্কে আমরা সাহিত্য এবং মুদ্রা থেকে জানতে পারি। সম্ভবত ৩৫ বৎসর বয়সে ডেমিট্রায়স ব্যাকট্রিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রথম থেকেই রাজ্যজয় নীতি গ্রহণ করেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তাঁর পিতা ইউথিডিমস সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক শূন্যতা তাঁর উচ্চাশা পূরণের সহায়ক হয়েছিল। তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন এবং মিত্র এবং অধীন অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়ে সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর অংশবিশেষ জয় করেন। টলেমি বলেছেন যে, সাকল (শিয়ালকোট) তাঁর বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের 'দত্তমিত্র' এবং সিন্ধুনদের নিম্ন উপত্যকায় ডেমিট্রায়সপলিস অভিন্ন ছিল। তাঁর মুদ্রার হস্তিমূর্তি থেকে মনে হয় যে, কপিশ (কাফিরিস্তান) তিনি জয় করেছিলেন। আলেকজান্ডারের মতো তিনি তাঁর পশ্চাৎ অংশ রক্ষা ও শাসন করার জন্য কয়েকটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। স্ট্রাবো পাটলিপুত্র পর্যন্ত যবন অগ্রগতির কথা বলেছেন, কিন্তু ডেমিট্রায়সের নামোল্লেখ করেননি। পতঞ্জলি সাকেত এবং মাধ্যমিকে যবন আক্রমণের এবং পাটলিপুত্রে আতঙ্ক সৃষ্টির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনিও ডেমিট্রায়সের নামোচ্চারণ করেন নি।

ডেমিট্রায়সের রাজ্যজয় সম্পর্কে টার্ন বলেছেন যে, পরিকল্পনা, পদ্ধতি, অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং বিজিত অঞ্চলের দিক থেকে ডেমিট্রায়স প্রথম দারয়বৌষ এবং আলেকজান্ডারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে 'অপরাজেয়'

উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোন রাজা তা করেননি। তিনি দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হতে চেয়েছিলেন। আলেকজান্ডার যেমন খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে পারস্য জয় না করে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র জয় করেন, ডেমিট্রায়সও তেমনি মৌর্য সাম্রাজ্য জয় না করে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা এবং উজ্জয়িনী) দখল করেছিলেন। এর অনিবার্য পরিণতি কী হবে, তিনি জানতেন।

ডঃ নারায়ণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, ডেমিট্রায়সের ভারতে বিস্তৃত জয়ের কাহিনী খুব ক্ষীণ সূত্রের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। একথা সত্য যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের অবনতির সুযোগ তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শক এবং পার্থিয়গণের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল।

অল্পকাল মধ্যে ব্যাকট্রিয়ার উপর ডেমিট্রায়সের অধিকার বিপন্ন হয়েছিল। এই সংকট সৃষ্টি করেছিলেন ইউক্রাটিডিস। তিনি ব্যাকট্রিয়া ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জাস্টিন লিখেছেন যে, তিনি ব্যাকট্রিয়ার বিদ্রোহ ঘটান এবং নিজে ব্যাকট্রিয়ার রাজা হন।

৪ক.২.৩ ইউক্রাটিডিস

ইউক্রাটিডিসের পূর্বজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ডেমিট্রায়সের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাকট্রিয়ার যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন, তাতে সমসাময়িক সম্রাট সেলুকিড ইন্ধন জুগিয়ে ছিলেন। এই বিদ্রোহের ফলে, আনুমানিক সম্রাট ১৭১ অব্দে তিনি ব্যাকট্রিয়ার রাজা হন। এর ফলে তিনি কপিশ, এমনকি পুষ্করাবতী এবং তক্ষশিলা জয় করেন।

৪ক.২.৪ হেলিওক্লেস

ইউক্রাটিডিসির পরে হেলিওক্লেস রাজা হন। জাস্টিন ভিন্ন অন্য কারও রচনায় তাঁর কথা পাওয়া যায় না। তাঁর রকমারি মুদ্রা থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি যে প্রথম শ্রেণীর রৌপ্য মুদ্রা বর্জন করেছিলেন, তা বোঝা যায় যে, তিনি ব্যাকট্রিয়া পরিত্যাগ করে শুধু ভারতীয় অঞ্চলই শাসন করেছিলেন। খুব সম্ভবত তিনিই শেষ গ্রীক শাসক, যিনি অন্তত কিছুকাল ব্যাকট্রিয়া এবং ভারত, দুই-ই শাসন করেছিলেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, শকগণ তাঁকে ব্যাকট্রিয়া থেকে বিতাড়িত করেন। (এই শকরা ইউচিগণ কর্তৃক তাদের বাসস্থান সগডিয়ানা (বোখারা) থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন)। শকদের মুদ্রায় হেলিওক্লেসের মুদ্রার প্রভাব দেখা যায়। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। হেলিওক্লেসের তাম্র মুদ্রায় হাতি এবং ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া গেছে। তা থেকে তিনি কোন্ অঞ্চল শাসন করতেন, অনুমান করা যায়। হাতি থেকে মনে হয়, কপিশ অঞ্চল ও ষাঁড় থেকে গান্ধার অঞ্চল। তিনি যে মুদ্রাগুলির পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন তা থেকে ইউথিডিমসের এবং ইউক্রাটিডিসের বংশের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়। চৈনিক উপাদান থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-১২৪ অব্দের মধ্যে শকগণ ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে।

৪ক.২.৫ মিনান্দর

ইন্দো-গ্রীক শাসকদের মধ্যে মিনান্দার বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। স্ট্রাবো, প্লুটার্ক, জাস্টিন সকলেই তাঁর কথা লিখেছেন। ভারতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ *মিলিন্দ পঞহো*-র মিলিন্দ এবং তিনি অভিন্ন, একথা ইতিহাসের উপাদান

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাঁর স্মৃতি সময়ের সীমা লঙ্ঘন করেছিল। খ্রিষ্ট্রীয় একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র রচিত অবদান কল্পলতায় তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে।

মিলিন্দ পঞহো অনুসারে আলাসান্দা দ্বীপের অন্তর্গত কালাসাইয়ে মিনান্দারের জন্ম হয়। এই স্থানটি সাকল (শিয়ালকোট) থেকে ২০০ যোজন দূরে অবস্থিত ছিল। কালাসাই ঠিক কোথায় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে আলাসান্দা যে ভারতীয় ককেসাসের দক্ষিণে আলেকজান্ডার প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। এই পালি গ্রন্থ অনুসারে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৫০০ বছর পরে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু এই বিবরণে মুদ্রার সমর্থন পাওয়া যায় না। মুদ্রা থেকে মনে হয় তিনি আরও আগের মানুষ ছিলেন। সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ডঃ সরকার তাঁকে আরও কিছুকাল পরে স্থাপন করতে চান। তাঁর মতে খ্রিস্টপূর্ব ১১৫-৯০ অব্দে তিনি রাজত্ব করেন।

মিনান্দারের রাজধানী ছিল সাকল বা শিয়ালকোট। হোয়াইটহেড মনে করেন যে, পাহাড় অঞ্চলে তাঁর অপর একটি গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। তাঁর সময়ে ইন্দোগ্রীক শক্তি সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল। পশ্চিমে কাবুল উপত্যকা থেকে পূর্বে রাবি নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে সোয়াট উপত্যকা থেকে দক্ষিণে আরাকোসিয়া পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজ্যে অনেক উপ-রাজা ছিলেন। টার্ন বলেছেন, বিভিন্ন সামন্ত রাজ্য এবং স্বাধীন জনগণকে নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় মানুষের সদিচ্ছার উপর এই সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল অল্পসংখ্যক গ্রীক শাসিত একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য। কাবুল থেকে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। পেরিপ্লাস-এর লেখক বলেছেন যে, তাঁর সময়ে এ্যাপোলোডোটাসের মুদ্রার সঙ্গে মিনান্দারের মুদ্রাও বারিগাজায় প্রচলিত ছিল। অধীন এবং অনুগত নৃপতিদের সাহায্যে মিনান্দার সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, বিপাশা পরবর্তী অঞ্চলও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এই লেখতে তারও আভাস পাওয়া যায়।

মিনান্দার শুধু বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। *মিলিন্দ পঞহোতে* এমন কথা বলা হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি মুদ্রায় "মহারাজস" (মহারাজের) "ত্রতরস" (ত্রাতার) "মেনাদ্রস" (মিনান্দারের), এই কথাগুলি আছে। কিন্তু কতকগুলি মুদ্রায় ত্রতরস শব্দের পরিবর্তে 'ধার্মিকস (ধার্মিকের) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই রৌপ্য মুদ্রাগুলিতে রাজার যে আবক্ষ মূর্তি আছে, তা একজন বয়স্ক ব্যক্তির। তাই অনেকে মনে করেন যে মেনন্দার বেশি বয়সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই মুদ্রাগুলি *মিলিন্দ পঞহো*-র পরিপূরক। তাঁর মুদ্রায় আটটি পাখি বা অর যুক্ত চক্রকে অনেকে বৌদ্ধচক্র মনে করেন।

মিনান্দার ভিন্ন অন্য কোন ইন্দোগ্রীক শাসকের এত বেশি বিচিত্র রকমের (ত্রিশ রকমেরও বেশি) মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তাঁর মুদ্রার অধিকাংশই রূপোর অথবা তামার। বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী তাঁর এই মুদ্রাগুলি একদিকে যেমন তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত দেয়, তেমনই অন্যদিকে তৎকালীন প্রসারিত বাণিজ্যের পরিচয় বহন করে।

৪ক.২.৬ মিনান্দারের পরে

মিনান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র প্রথম স্ট্রাটোর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর মা এ্যাগাথোক্লিয়া শাসন পরিচালনা করেন। তাঁদের দুজনের যুক্তভাবে প্রচারিত মুদ্রায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে প্রথম স্ট্রাটো কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁর একক মুদ্রাও অনেক পাওয়া গেছে। আরও পরে তিনি তাঁর পৌত্র দ্বিতীয়

স্ট্রাটোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজত্ব চালান এবং তাঁদের যৌথ মুদ্রার প্রচলন করেন। এই তথ্যসমূহ থেকে মনে হয় যে প্রথম স্ট্রাটো দীর্ঘকাল, হয়তো অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল রাজত্ব করেন। এই সময় মিনান্দারের বংশধরেরা অবশ্যই দুর্দিনের সম্মুখীন হন। তাঁদের মুদ্রার নিম্নমান থেকে এই সত্য বিশেষভাবে স্পষ্ট।

৪ক.২.৭ হারমাইয়স

কাবুল উপত্যকায় হারমাইয়স শেষ ইন্দো-গ্রীক শাসক। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি রাজত্ব করেন। তিনি যখন রাজা হন তখন চারিদিকে বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রাজ্যের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে আক্রমণকারীরূপে শকরা উপস্থিত হয়েছিল। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে নতুন শত্রু পার্থিয়দের এবং উত্তরে ইউচিদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইন্দো-গ্রীকদের দুই শাখার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। হারমাইয়সের কতকগুলি মুদ্রায় তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্নী ক্যালিওপির চিত্র পাওয়া গেছে। এই ক্যালিওপির সম্ভবত ইউথিডিমস শাখার রমণী ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তের এই ঐক্য ফলপ্রসূ হয়নি। তা হারমাইয়সের পতনকে প্রতিহত করতে পারেনি।

পার্থিয়গণ হারমাইয়সের পতন ঘটালেও ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের পতনের পিছনে গভীরতর কারণ ছিল। সেই কারণের কথা জাস্টিন উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ব্যাকট্রিয়গণ বিভিন্ন যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে শেষে শুধু তাদের অধিকৃত অঞ্চলই হারায় নি, তাদের স্বাধীনতাও হারিয়েছিল। সগডিয়ানগণ, ড্রাঞ্জিয়ানগণ এবং ভারতীয়গণের সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, তারা যেন, ক্লান্ত অবস্থায়, দুর্বলতর পার্থিয়গণ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল"। এখন যে অঞ্চলকে সমরকন্দ এবং বোখারা বলা হয়, সগডিয়ানগণ সেই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে জাস্টিন 'সগডিয়ানগণ' বলতে শুধু এই অধিবাসীদের বোঝান নি, অন্যান্য উপজাতি (পাসিয়ানি, তোচারি, সাকারাউলি ইত্যাদি) এবং শকদের বুঝিয়েছেন, কেননা স্ট্রাবোর বর্ণনা অনুসারে এরা গ্রীকদের ব্যাকট্রিয়া থেকে বিতাড়িত করেছিল। ড্রাঞ্জিয়াগণ হেরাত, বেলুচিস্তান এবং কান্দাহারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করত। ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের ভারতীয় শত্রুরূপে শুঙ্গ বংশের উল্লেখ করা যায়।

৪ক.৩ শক-পার্থিয়গণ

হেরোডোটাস এবং স্ট্রাবো লিখেছেন যে, মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের নাম ছিল স্কাইথিয়। এই স্কাইথিয়গণের একটি নির্দিষ্ট শাখার নাম ছিল শক। এই শকরাই ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, মধ্য এশিয়া থেকে আগত যাযাবর জাতি ইউচি এবং শকদের আক্রমণে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক আধিপত্য বিনষ্ট হয়েছিল। এই শকরা ব্যাকট্রিয়া সীমান্ত থেকে ইউচিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে গ্রীকদের অনুসরণ করে ভারতে প্রবেশ এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৪ক.৩.১ তক্ষশিলার শক-সম্রাটগণ

ভারতে শকদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল তক্ষশিলা, মথুরা, সুরাষ্ট্র এবং মালব তক্ষশিলায় শক-সম্রাটগণ এবং মথুরায় শক রাজারা শাসন করতেন। সুরাষ্ট্র এবং মালব শক-ক্ষত্রপগণের শাসনাধীন ছিল।

মার্শাল বলেছেন যে, তক্ষশিলার স্তরবিন্যাস থেকে জানা যায় যে তক্ষশিলার প্রথম শক রাজা ছিলেন মাওয়েস

বা মোগ। তিনি খুব সম্ভবত ইস্‌সককোল হ্রদ অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। অনুমান করা হয় যে, তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সিংহাসনে বসেন। তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তক্ষশিলা তাম্রশাসনে লিয়াক কুসুলক নামে তাঁর অধীন এক ক্ষত্রপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে তক্ষশিলার মাওয়েসের পরবর্তী রাজা ছিলেন অজ (Azes)। অজ নামে দুজন রাজা ছিলেন : প্রথম ও দ্বিতীয় অজ। তাঁদের মধ্যস্থলে ছিলেন আজিলিসেস। কোন কোন মুদ্রায় অজ'র নাম গ্রীক অক্ষরে এবং আজিলিসেসের নাম খরোষ্ঠীতে পাওয়া গেছে। আবার কোন কোন মুদ্রায় এর বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, অজ'র পরে রাজা হয়েছিলেন আজিলিসেস এবং তার পরে দ্বিতীয় অজ। মনে হয় আজিলিসেস খুবই অল্প দিন রাজত্ব করেছিলেন। কেননা সিরকাপ নাম স্থানে (তক্ষশিলার শহর এলাকায়) প্রাপ্ত তাঁর মুদ্রার সংখ্যা নগণ্য, কিন্তু অজ'র মুদ্রার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

দ্বিতীয় অজ তাঁর মুদ্রায় মিনান্দারের মতো এথিনা মূর্তি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এ থেকে টার্ন মনে করেন যে দ্বিতীয় অজ মিনান্দারের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল পূর্ব পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব তো মিনান্দারের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল না, কাবুল উপত্যকা ছিল। সুতরাং এই প্রতীকের যদি কোন তাৎপর্য থাকে তাহলে মনে করতে হয় যে দ্বিতীয় অজ কাবুল উপত্যকা জয় করেছিলেন। কিন্তু ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে তা অসম্ভব, কেননা কাবুল কখনও শকদের অধীন ছিল না।

মার্শাল মনে করেন যে বিক্রম সম্ভবৎ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮ অব্দে যার সূচনা) কোনভাবে প্রথম অজ'র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। র‍্যাপসন প্রথম অজকে বিক্রম অব্দের প্রবর্তক মনে করেন। ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে প্রথম অজ'র রাজত্বকালে যে গণনা আরম্ভ হয়, তাই পরবর্তীকালে বিক্রম সম্ভবৎ বলে পরিচিত হয়েছিল।

এই শাসকদের সময় শক সাম্রাজ্য কয়েকটি 'সট্রাপি' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এই প্রদেশসমূহে যে কেন্দ্রগুলির কথা নিশ্চিত জানা যায়, সেগুলি হল কপিশ, আবিসারেস, তক্ষশিলা এবং পুষ্পপুর। এদের মধ্যে পুষ্পপুরের অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল, বলা যায় না।

তক্ষশিলার শক নৃপতিদের বেশিরভাগ মুদ্রাই দ্বিভাষিক। মোগ বা মাওয়েস থেকে শুরু করে দ্বিতীয় অজ পর্যন্ত এই রাজাদের প্রবর্তিত মুদ্রায় মহারাজ, মহৎ রাজরাজ, রাজাতিরাজ ইত্যাদি উচ্চগ্রামী অভিধা ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের এই সব অভিধা গ্রহণের পিছনে ইন্দো-গ্রীকদের দৃষ্টান্ত অবশ্যই কাজ করেছিল। তাঁদের অধিকারভুক্ত বিস্তৃত এবং বিশেষভাবে তাঁদের অভিধার জন্য তক্ষশিলার শক শাসকগণকে 'সম্রাট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তক্ষশিলার শক শাসনের অবসান কীভাবে হয়েছিল ফিলোস্ট্রাটসের রচনায় তার আভাস পাওয়া যায়। (ফিলোস্ট্রাইস) খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তিনি টিয়ানার এ্যাপোলোনিয়াসের জীবনী লিখেছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর এই এ্যাপোলোনিয়াস অঘটন ঘটাতে পারতেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ফিলোস্ট্রাটস লিখেছেন যে, যখন খ্রিস্ট ৪৩-৪৪ অব্দে তক্ষশিলায় যান, তখন তিনি সেখানকার সিংহাসনে ফ্রাওটেস নামক পার্থিয়কে দেখেন। অথচ খ্রিস্ট ৪৫ অব্দের তাখ্‌ত-ই-বাহি লেখতে তক্ষশিলার রাজ্য হিসাবে গন্ডোফারনেসের নাম পাওয়া গেছে।

অনুমান করা হয় ফ্রাওটেসের মৃত্যুর পরে গান্ডোফারনেস তক্ষশিলা অধিকার করেন। মার্শাল লিখেছেন যে, সর্বোত্তম মুহূর্তে শকস্থান (সিস্তান) সিন্দুদেশ, আরাকোসিয়া (কান্দাহার), দক্ষিণ ও পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পেশোয়ারের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে তখৎ-ই-বাহি লেখ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গন্ডোফারনেস শকদের ধরনে মুদ্রার প্রচলন করেন। এর থেকে, তিনি যে পশ্চিমে পাঞ্জাবের শক রাজ্য জয় করেছিলেন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কচ্ছ এবং কাথিয়াবাড় তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। গন্ডোফারনেসের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য সসন, আবদা গাসেথ, পাকোরেস, শতবস্ত্র, সপেদন, প্রহত প্রভৃতি নৃপতি রাজত্ব করেন। এঁরা সকলেই যে রাজ্যের সব অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন, এমন নয়। পেরিপ্লাস-এ বলা হয়েছে যে তখন পার্থিয় নৃপতিগণ সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিতাড়িত করেছিলেন। তৎকালীন মুদ্রায়ও রাজ্যের এই অবক্ষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁরা ভারতে আবির্ভূত হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল।

৪ক.৩.২ মথুরার ক্ষত্রপগণ

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মথুরায় সত্রপালের (ক্ষত্রপের) শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্ষত্রপগণের মধ্যে রাজুল এবং ষোড়শ, এই দুইটি নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ আজিলিসেস ও ক্ষত্রপ রাজুলের মুদ্রায় মথুরার লক্ষ্মীমূর্তি ব্যবহার দেখে ডঃ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, রাজুল আজিলেস-এর ক্ষত্রপ হিসাবে মথুরা জয় করেছিলেন এবং পরে ষোড়শ ইত্যাদি স্থানে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের ছাড়া শিবদত্ত, শিবঘোষ, হুগামাস, হগান প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়। তাঁদের প্রকৃত স্থান রাজুল-ষোড়শের পরে।

মথুরার শক ক্ষত্রপদের জনট সেখানকার সিংহ-শীর্ষ স্তম্ভলেখ প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই লেখটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এতে তৎকালীন ক্ষত্রপ পরিবারের বংশপরিচয়ই পাওয়া যায় না, মথুরার বাইরে, অন্যত্র যে ক্ষত্রপগণ ছিলেন, তাদেরও কারও কারও নাম পাওয়া যায়।

রাজুল যেহেতু প্রথমে ক্ষত্রপ ও পরে মহাক্ষত্রপ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন, সেই হেতু তিনি যখন স্থানীয় রাজাদের কাছ থেকে মথুরা দখল করেন, তখন তিনি কোন শক-পার্থিয় নৃপতির অধীন ছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে রাজুল শুধু মথুরা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে নয়, তক্ষশিলা অঞ্চলে ক্ষত্রপ হিসাবে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তাই মনে হয় যে প্রথমে তিনি তাঁর সমসাময়িক শক-পার্থিয় নৃপতি আজিলিসেসের অধীন থাকলেও পরে বোধহয় তিনি কার্যত স্বাধীন, অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় বোধহয় তক্ষশিলা অঞ্চলে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। অন্ততপক্ষে তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ষোড়াশের অধিকার মথুরা অঞ্চলের বাইরে খুব ছিল বলে জানা যায় না। শুধু রাজুল কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তাই নয়। উজ্জয়িনীর মহাক্ষত্রপগণও অনুরূপভাবে স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা প্রথমদিকে কুষাণদের অধীনে ছিলেন, এই অনুমানের সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তক্ষশিলার শক সম্রাটদের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য স্থানে স্বাধীন শক রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

রাজুলের মুদ্রাগুলি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ট্রাটোর মুদ্রার অনুকরণে রচিত। তাই মনে হয় যে, রাজুল পূর্ব পাঞ্জাব থেকে শুরু করে পরে মথুরা অধিকার করেন। যে যে স্থানে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় যে, পূর্ব পাঞ্জাব এবং মথুরা পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে ষোড়শের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় যে, মথুরা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে তাঁর অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। ষোড়শের পর অল্পসংখ্যক ক্ষত্রপ মথুরা শাসন করেন। এর অল্পকাল পরে কুষাণগণ মথুরা জয় করে।

৪ক.৩.৩ সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ

শক-পার্থিয়দের সময় পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষে ক্ষত্রপ শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রপদের কোন নাম পাওয়া যায়নি। কুষাণদের সময় এই অঞ্চলে ক্ষত্রপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ক্ষত্রপগণ ক্ষহরত এবং কার্দমক, এই দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। ক্ষহরতদের মধ্যে অর্ত, ভূমক এবং নহপাণ, এই তিনজন ক্ষত্রপের কথা জানা যায়। সে তুলনায় চষ্টন প্রতিষ্ঠিত কার্দমক শাখার ক্ষত্রপ সংখ্যা ছিল অনেক।

কখন এবং কীভাবে শকগণ পশ্চিম ভারতে এসেছিল, তা নিশ্চিত বলা যায় না তবে তাদের মুদ্রায় প্রথম থেকে খরোষ্ঠীর ব্যবহার দেখে বলা যায় যে, তারা উত্তর অঞ্চল থেকে এসেছিল।

পশ্চিম ভারতে দুইটি ক্ষত্রপ শাখার মধ্যে ক্ষহরত শাখা খুবই স্বল্পায়ু। এই শাখার সদস্য সংখ্যা মাত্র দুই, ভূমক এবং নহপাণ। ভূমক সম্পর্কে যা কিছু তথ্য, তা শুধু তাঁর মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়। তিনি ক্ষত্রপ হিসাবে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর কোন মুদ্রায় "রাজ্য" অথবা "মহাক্ষত্রপ" অভিধা পাওয়া যায় না। অবশ্য নহপাণের মুদ্রায় "রাজা" অভিধা পাওয়া যায়। অর্ত ও ভূমকের মুদ্রা গুজরাট, কাথিয়াবাড় এবং মালব অঞ্চলে পাওয়া গেছে। ভূমক এবং নহপাণের মুদ্রা তুলনামূলক আলোচনা থেকে র‍্যাপসন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ভূমক নহপাণের পূর্ববর্তী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল, বলা যায় না। তবে সময়ের দিক থেকে দুই জনের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। ভূমকের মুদ্রায় ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী উভয় লিপির ব্যবহার দেখে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে, ভূমক বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করতেন। ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে পরিচিত পশ্চিম রাজপুতানা এবং সিন্ধুও তাঁর শাসনাধীন ছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, অর্ত ও ভূমক খরোষ্ঠী প্রধান অঞ্চল থেকে এসেছিলেন বলে তাঁদের মুদ্রায় ব্রাহ্মী ছাড়াও খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ভূমকের অধিকৃত এলাকার মধ্যে সিন্ধুকে অন্তর্ভুক্ত করা বোধহয় সম্ভব নয়। কেননা পেরিপ্লাস-এ আছে যে, নহপাণের শাসনকালে পার্থিয়গণ সিন্ধুতে যুদ্ধ করছিল।

নহপাণের জন্য তাঁর বহুসংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা, অল্পসংখ্যক তাম্র মুদ্রা, জামাতা উসবদাতের এবং মন্ত্রী অয়ম'র লেখ এবং পেরিপ্লাস-ই প্রধান উপাদান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর মুদ্রায় কোন তারিখের উল্লেখ নেই। তাই তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে এই মতভেদ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে মূল বিষয় সম্পর্কে নয়। নাসিক জেলার অন্তর্গত জোগালথেম্বিতে নহপাণের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। তার দুই-তৃতীয়াংশ (নয় হাজারের বেশি) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত। এ থেকে দুইটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, নহপাণ এবং গৌতমীপুত্র সমসাময়িক ছিলেন এবং দুই, গৌতমীপুত্রের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। উসবদাতের বিভিন্ন লেখতে যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে, নহপাণের শাসন উত্তরে রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কাথিয়াবাড়, দক্ষিণ-গুজরাট, পশ্চিম-মালব, উত্তর-

কঙ্কন এবং নাসিক-পুনা অঞ্চল তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্রের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষহরত শাখার এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। গৌতমী বলশ্রী রচিত নাসিক প্রশস্তি-এ তাঁর পুত্র ক্ষহরতদের উচ্ছেদসাধন করেছিলেন, এমন কথা আছে। গৌতমীপুত্রের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে রচিত নাসিকলেখ থেকে জানা যায় যে, উসবদাতের অধিকারভুক্ত একটি গ্রামের অংশ তিনি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। *পেরিপ্লাস* থেকে জানা যায় যে, নহপাণের রাজধানী ছিল মীননগর। তখন এই নামে দুইটি নগর ছিল। একটি সিন্ধুনদের বদ্বীপে, সিন্ধুতে, অন্যটি বারিগাজার উত্তরে বা উত্তর-পশ্চিমে। মনে হয় দ্বিতীয়টি তাঁর রাজধানী ছিল। অনেকে এর সঙ্গে মীনদলপুর বা মান্দাশের অঞ্চলের একীকরণ করে থাকেন।

নহপাণের সময় যুদ্ধবিগ্রহের কথা বিশেষ জানা যায় না। অয়ন'র লেখতে উসবদাত কর্তৃক 'মলয়দের' পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এটিই তাঁর শাসনকালের একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকেরা তাই অনুমান করেন যে, নহপাণ যে বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করতেন, তার বেশিরভাগ, তাঁর পূর্বে অন্য কেউ জয় করেছিলেন।

পেরিপ্লাসে আছে যে, নহপাণের সময় ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলির বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় বণিকগণ তখন মিশরে যেতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ হয়তো সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। পেট্রি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি বৌদ্ধ প্রস্তর সমাধি আবিষ্কার করেন। মনে হয় এই সমাধির নীচে কোন ভারতীয় বণিক চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। বারিগাজা বন্দর এবং তার পশ্চাৎ প্রদেশ কাথিয়াবাড় নহপাণের অধিকারভুক্ত থাকায় মনে হয় যে, নহপাণ পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। দক্ষিণ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরও তাঁর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ছিল।

পেরিপ্লাসে বারিগাজা বন্দরের আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তালিকা আছে। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে আছে, রাজার জন্য রৌপ্যপাত, গায়ক-গায়িকা, উৎকৃষ্ট মদ এবং প্রসাধন সামগ্রী। এ থেকে বোঝা যায় যে, নহপাণ বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন। এইসব গায়ক-গায়িকার ভারতীয় সমাজে কী স্থান ছিল, বলা যায় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, শক সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা একেবারে অপরিচিত ছিল না। তক্ষশিলায় কনিষ্কের স্তূপ নির্মাতা আগেসিলাওস একজন ক্রীতদাস ছিলেন।

৪৫ অব্দের একটি লেখতে নহপাণকে ক্ষত্রপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে রচিত অময়'র জুন্নার লেখতে তিনি "রাজা মহাক্ষত্রপ স্বামী" বলে অভিহিত হয়েছেন। নহপাণ বিষয়ক এটিই শেষ লেখ। তাই মনে হয় যে, পতনের পূর্বে তিনি এই মহত্তর অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

নহপাণের রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে অয়ম নামে তাঁর একজন মন্ত্রী ছিলেন। উসবদাতের নাসিকলেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ-গুজরাট এবং উত্তর-কোঙ্কনের প্রদেশপালরূপে কাজ করতেন।

গৌতমীপুত্র যেসব মুদ্রা পুনর্মুদিত করেন, তার মধ্যে নহপাণ ভিন্ন অন্য কারও একটি মুদ্রাও পাওয়া যায়নি। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, তিনিই ছিলেন ক্ষহরত শাখার শেষ শাসক।

৪ক.৩.৪ পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপগণ

মালবে চষ্টন যে ক্ষত্রপ শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন, তা কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হয়েছিল। এবং এদেশের রাজনীতি

ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চষ্টন এবং তাঁর বংশধরগণ তাঁদের লেখ এবং মুদ্রায় শকাব্দ (খ্রিস্টপূর্ব ৭৮ অব্দে প্রতিষ্ঠিত) ব্যবহার করেছেন।

সময়ের দিক থেকে নহপাণ এবং চষ্টনের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না। চষ্টনের মুদ্রায় উৎকীর্ণ মস্তকের সঙ্গে নহপাণের মুদ্রায় উৎকীর্ণ মস্তকের বিশেষ মিল আছে। কার্দমক শাখার চষ্টনই একমাত্র শাসক যাঁর মুদ্রায় গ্রীক, খরোষ্ঠী এবং ব্রাহ্মী, ত্রিবিধ লিপির ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য গ্রীক এবং খরোষ্ঠী অচিরেই তাদের গুরুত্ব হারিয়েছিল। চষ্টনের মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপি শুধু তাঁর নাম উৎকীর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর পরে এই রীতিও বিলুপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে শুধুমাত্র অলংকরণ ভিন্ন মুদ্রার অন্যত্র গ্রীক চিহ্ন পাওয়া যায় না। মুদ্রার এই ক্রমবিবর্তন বিদেশীদের ভারতীয়করণের অভ্রান্ত দলিল হয়ে আছে।

চষ্টনের বিভিন্ন মুদ্রা থেকে জানা যায় যে তিনি অন্ধ্র অথবা সাতবাহনের কাছ থেকে কিছু অঞ্চল জয় করেন। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। কচ্ছের অন্তর্গত আন্ধাউ নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর পৌত্র রুদ্রদামনের সঙ্গে যুক্তভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই লেখ থেকে আরও জানা যায় যে, রুদ্রদামন জয়দামনের পুত্র ছিলেন। জয়দামনের মুদ্রায় তাঁকে 'ক্ষত্রপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, মহাক্ষত্রপ আখ্যা দেওয়া হয়নি! তাই অনেকে মনে করেন যে, জয়দামনের শাসনকালে সাতবাহনদের হাতে শকদের বিপর্যয় ঘটেছিল। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখকে এই অনুমানের পরিপোষক মনে হয়। কেননা সেখানে বলা হয়েছে যে রুদ্রদামন স্বয়ং মহাক্ষত্রপ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন (স্বয়মধিগত মহাক্ষত্রপ নাম) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অনুমান সত্য বলে মনে হয় না, কেননা চষ্টনের জীবদ্দশাতেই জয়দমনের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি কখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন নি। তিনি কোন রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেন নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ক্ষত্রপ হিসাবে তিনি অল্পকাল কাজ করেছিলেন।

মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জন্য জুনাগড় লেখ প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান। এই লেখটি আগাগোড়া সংস্কৃত গদ্যে, কিন্তু কাব্যরীতিতে রচিত। পাশাপাশি সাতবাহনদের লেখগুলি কিন্তু সাধারণের ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং বলা চলে যে, পশ্চিম ভারতে শক-ক্ষত্রপদের শাসনকালে সংস্কৃত ধীরে ধীরে প্রাকৃতের স্থান গ্রহণ করেছিল। এই লেখ থেকে রুদ্রদামনের ব্যক্তিগত গুণাবলী, রাজ্যজয় এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়। এই লেখতে রুদ্রদামনের রাজপদে নির্বাচিত হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আন্ধাউ লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি ইতিপূর্বে চষ্টনের সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

জুনাগড় লেখতে রুদ্রদামন যে সকল স্থানের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, অর্থাৎ যে স্থানগুলি তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় যে নামগুলি আছে, সেগুলি হল ঃ পূর্বাপর আকরাবন্তী (পূর্ব এবং পশ্চিম মালব), অনুপনিভৃৎ (মাহিশ্মতি অঞ্চল), সুরাষ্ট্র (জুনাগড়ের চতুষ্পার্শে), কুকুর (উত্তর কাথিয়াবাড়), অপরান্ত (উত্তর কঙ্কন), অনারত্ত (দ্বারকা সংলগ্ন), শ্বভ্র (সবরমতী নদীতীরে) মরু (মারোয়াড়), কচ্ছ, সিন্ধু সৌবীর (নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা) এবং নিষাদ (সরস্বতী এবং পশ্চিম বিন্ধ্য অঞ্চল)।

এই তালিকা থেকে মনে হয়, একদা নহপাণ যে অঞ্চলগুলি শাসন করতেন, রুদ্রদামন তাদের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এমনও হতে পারে যে, নহপাণের অধীন যে নৃপতিগণ গৌতমীপুত্র কর্তৃক অঞ্চলচ্যুত

হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের পুনর্বাসন ঘটিয়েছিলেন। কেননা জুনাগড় লেখতে রুদ্রদামনকে "'ভ্রষ্টরাজ প্রতিষ্ঠাপক" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শুধু যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়েই নয়, জনকল্যাণমূলক কাজেও রুদ্রদামন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যে সুদর্শন হ্রদ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় নির্মিত এবং অশোকের সময় যবনরাজ তুষাস্ফ কর্তৃক সম্প্রসারিত হয়, তাঁর সময়ে প্রচণ্ড ঝড়ে এটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। রুদ্রদামন তাঁর পার্থিয় মন্ত্রী সুবিশাখের সাহায্যে এটির সম্পূর্ণ সংস্কারসাধন করেন। অথচ এজন্য তিনি কোন অতিরিক্ত কর ধার্য করেন নি। এমনকি শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেও তিনি বাধ্য করেন নি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর অধিকার খুব কম ছিল না। জুনাগড় লেখতে বলা হয়েছে যে, শব্দ (ব্যাকরণ), অর্থ (রাজনীতি শাস্ত্র), গন্ধর্ব (সঙ্গীত) এবং ন্যায়ের (তর্কশাস্ত্র) উপর বিশেষ অধিকারের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উজ্জয়িনী নগর তাঁর রাজধানী ছিল।

রুদ্রদামনের পরে মালবের শক-ক্ষত্রপদের ইতিহাসে আকর্ষণীয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর পরবর্তী মহাক্ষত্রপ অথবা ক্ষত্রপগণ যেসব মুদ্রা প্রচলন করেন, সেগুলিতে তাঁদের পিতার নাম এবং সরকারি পদবীর উল্লেখ থাকায় এই সময়ের শাসকদের ক্রমপরম্পরা এবং শাসনকাল অনেকটা নিশ্চিত।

রুদ্রদামনের পরবর্তী শক-ক্ষত্রপদের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ৪৫ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৫-৩৪০ অব্দ) ব্যাপী শক রাজ্যে কোন মহাক্ষত্রপ ছিলেন না। র‍্যাপসন মনে করেন যে, পশ্চিমের ক্ষত্রপগণ কোন বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। এখন জানা গেছে যে, এই সময় শকদের ইরানের স্যাসানীয় বংশের রাজাদের অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছিল।

ব্যাপকতর দৃষ্টিতে বিচার করলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে শকদের অবদান ছিল খুবই বেশি। তাঁরা পারসিক-পার্থিব সংস্কৃতির বাহক হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এদেশে তাঁরা ইন্দো-গ্রীক সংস্কৃতির ধারক হয়েছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদান হওয়ায় ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছিল এবং গতানুগতিকতার শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছিল। এইভাবে এ যুগে যে সংস্কৃতি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাই গুপ্ত যুগের সাফল্যকে সম্ভব করেছিল।

৪ক.৪ কুষাণ সাম্রাজ্য

পার্থিয়দের পতনের সঙ্গে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক আধিপত্যের অবসান ঘটেনি। পার্থিয়দের পরে কুষাণরা এসেছিলেন। তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পার্থিয়দের বিতাড়িত এবং উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। কুষাণগণ যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা একদিকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত এবং অন্যদিকে চীন সাম্রাজ্যের প্রান্ত স্পর্শ করে। কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দীর বেশি এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল, যদিও এর গৌরবময় কাল এক শতাব্দীর বেশি নয়। দীর্ঘকালব্যাপী কুষাণদের কার্যকলাপ ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণগণ ভারতের সীমান্ত পরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এবং ভারতীয়দের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। কুষাণগণ

যেমন একদিকে বিদেশী ভাবধারার বাহকরূপে এদেশে এসেছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তাঁরা ভারতীয় ভাবধারাও অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতিতে কুষাণদের অবদান তাই সমধিক এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কুষাণ সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন কাহিনী বিশেষ আকর্ষণীয়।

শক-পার্থিয়দের তুলনায় কুষাণদের জন্য ইতিহাসের উপাদান পরিমাণে বেশি। দেশীয় এবং বৈদেশিক, বিশেষত চৈনিক সাহিত্য, এক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। চৈনিক সাহিত্য বলতে প্রধানত বোঝায় সু-মা-কিয়েন সংকলিত *সি-চি* (ঐতিহাসিক দলিল), প্যান-কু রচিত *ছিয়েন-হান-সু* (প্রথম হান বংশের ইতিহাস), ফ্যান-ই রচিত *হোউ-হান সু* (পরবর্তী হান বংশের ইতিহাস) এবং মা-তোয়ান-লিন রচিত *বিশ্বকোষ* (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী)। স্ট্যাবো, জাস্টিন, বর্দেসানিস, আস্মিয়ানুস, মার্সেলাইনুস প্রভৃতির গ্রন্থে ইউচিদের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস কিছু জানা যায়। আর্মেনীয় সাহিত্যের কয়েকটি বই, টবরীর গ্রন্থ এবং কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ আমাদের সাহায্য করে। এই গ্রন্থগুলি ছাড়া মুদ্রা, লেখ (প্রধানত প্রাকৃত ও ব্যাকট্রিয় ভাষায় রচিত) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন এ যুগের ইতিহাস রচনার সহায়ক।

সি-চি এবং ছিয়েন-হান-সু'র সাক্ষ্য অনুযায়ী কুষাণ ছিল ইউচি উপজাতির অন্যতম শাখা। ইউচিদের আদি বাসস্থান ছিল টুন-হুয়াং ও ছি-লিয়েন পাহাড়ের (অর্থাৎ বর্তমান চীনের কান-সু অঞ্চলের টুন-হয়াং ও নানলান পাহাড়ের) মধ্যবর্তী অঞ্চলে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫ অব্দ বা তার কাছাকাছি সময় (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৪-১৬০ বা ১৫৮ অব্দের মধ্যে) হিয়ুং-নু (পরবর্তীকালের হুণ উপজাতি) কর্তৃক পরাজিত হয়ে ইউচিগণ পশ্চিম দিকে অভিপ্রয়াণ আরম্ভ করে। ডঃ মুখোপাধ্যায় সি-চি ও ছিয়েন হান-সুতে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-১২৯ অব্দের পূর্বে ইউচিরা তা-হিয়া দখল করেছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, তা-হিয়া বলতে বোঝাত, ওয়াখান, বাদাখসান, চিত্রল, কাফিরিস্থান এবং তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ এক কথায় যে অঞ্চল প্রাচীনকালে পূর্ব ব্যাকট্রিয়া নামে পরিচিত হতে পারত। সুতরাং ইউচিরা গ্রীক বা তাদের সমগোত্রীয়দের কাছ থেকে পূর্ব ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্লীক দেশ দখল করেছিল, এই অনুমানে কোন বাধা নেই। ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে (তা-হিয়া সহ) গ্রীক রাজত্বের সমাপ্তি ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৩০-১২৯ অব্দের মধ্যে।

৪ক.৪.১ কুজুল কদফিস

হোউ-হান শু'র সাক্ষ্য অনুসারে, তা-হিয়া দখলের এবং ইউচিনের পাঁচটি শাখার মধ্যে তা-হিয়া বিভক্ত হওয়ার একশো বছরের কিছু পরে, অর্থাৎ আনুমানিক ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু পরে ছিউ-চিউ-ছুয়ে বা কুজুল কদফিস কুষাণদের নেতা হন। কিন্তু তিনি বোধহয় কুষাণদের প্রথম স্বাধীন নেতা ছিলেন না। মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে, কুষাণদের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে, প্রথম ইউচি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের নাগপাশমুক্ত স্বাধীন কুষাণ ছিলেন মিয়াওস। তিনি কুজুল কদফিসের পূর্বে এবং প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করেছিলেন।

কুষাণদের পরবর্তী জ্ঞাত রাজা হচ্ছেন ছিউ-চিউ-ছুয়ে বা কিউ-সিউ-কিও। একে পুরাতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জ্ঞাত কুষাণ রাজা কুজুল কদফিসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। হৌ-হান-শু থেকে জানা যায় যে তিনি কুষাণ অঞ্চলের নেতা হওয়ার পর তা-হিয়াস্থ অন্যান্য ইউচি শাখাদের অধীন অঞ্চলগুলি জয় করেন এবং নিজেকে তাদের "রাজা" বলে ঘোষণা করেন। হৌন-হান-শু গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, কুজুল কদফিস আন-সি (বা আরসাকেস বংশ শাসিত পার্থিয়া রাজ্য) আক্রমণ করেন এবং কাও-ফু (কাবুল অঞ্চল), পু-ত (পেশোয়ারের

দক্ষিণ-পূর্বে কাবুলের অদূরবর্তী একটি স্থান, অথবা খুব সম্ভবত ব্যাট্রা বা বাল্‌খ্‌ অঞ্চল, অর্থাৎ পশ্চিম ব্যাকট্রিয়ার একাংশ) এবং কি-পিন (কাশ্মীরসহ ভারতীয় উপদেশ-মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগের একটি অঞ্চল) দখল করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পার্থিয় সাম্রাজ্য খ্রিঃ ২২৮ অব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। সুতরাং তিনি সমগ্র পার্থিয় সাম্রাজ্য জয় করেন নি। তিনি এই সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ জয় করেছিলেন। প-ত বা পশ্চিম ব্যাকট্রিয়ার একটি অংশ এই সময় বোধহয় আর্সাকীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং তিনি পু-ত অঞ্চল আর্সাকীয়দের কাছ থেকে জয় করেছিলেন।

কুজুল কদফিস ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তাঁর অধিকার স্থাপন করেন, ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। কি-পিন বা কাশ্মীরসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চলের অন্তত কিছু অংশ তিনি জয় করেছিলেন। এই অংশের মধ্যে প্রাচীন গান্ধার (অর্থাৎ পেশোয়ার জেলা ও তক্ষশিলা অঞ্চল) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অঞ্চল বা অঞ্চলগুলি তিনি জয় করেন ভারতীয় পহ্লব অথবা ইন্দো-পার্থিয় নৃপতি গন্ডোফারনেস বা তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে প্রথম শতকের প্রথম ভাগে।

কুজুলের রাজত্বকাল সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, কেননা, *হৌন-হান-শু*-তে বলা হয়েছে যে, তিনি ৮০ বৎসরেরও বেশি বয়সে মারা যান। তাঁর রাজত্বকালের বেশিরভাগ সময় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অতিবাহিত হয়েছিল মনে করা যায়। চৈনিক তথ্য অনুযায়ী কুজুলের মৃত্যুর পর কুষাণ রাজ্যের সর্বময় কর্তত্ব লাভ করেন বিম কদফিস।

৪ক.৪.২ বিম কদফিস

বিম কদফিস পার্থিয় সম্রাট এবং ইন্দো-পার্থিয়দের পরাজিত করে তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর মুদ্রায় বেদির সামনে উৎসর্গরত রাজার যে চিত্র পাওয়া যায়, তার সঙ্গে পার্থিয় নৃপতি গোটার্জেসের (খ্রিঃ ৩৮-৫১ অব্দ) মুদ্রার হুবহু মিল পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে, তিনি গোটার্জেস, বা তাঁর অববহিত পরবর্তী কোন পার্থিয় রাজার অধিকারভুক্ত এলাকার কিছু অংশ জয় করেছিলেন। মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে ডঃ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, তিনি ইন্দো-পার্থিয়দের কাছ থেকে আরকোসিয়া অর্থাৎ কান্দাহার এলাকা এবং সেন-টু অধিকার করেন। সেন-টু বলতে এতদিন সাধারণভাবে ভারত উপমহাদেশ বোঝাত। এখন এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন জানা গেছে যে, কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বে সেন-টু ছিল একটি নদীর উপর এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকা। সেন-টু এখন কেবল নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা বোঝায়। মথুরায় কুষাণ রাজাদের দেবকুলে প্রাপ্ত বিম কদফিসের মূর্তি এবং তার পাদদেশে উৎকীর্ণ লেখটি ঐ অঞ্চলে কুষাণদের অধিকার বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়।

বিম কুষাণ মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি নতুন ওজন রীতির ভিত্তিতে তাম্রমুদ্রা তৈরি করান। এছাড়া রোমক ওজনরীতি অনুসরণ করে তিনি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। দুই কারণে এই ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, তাঁর আগেকার স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা খুবই বিরল। দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা তাঁর পরবর্তী কুষাণ শাসকগণ, এমনকি গুপ্তগণও অনুসরণ করেন। তাঁর সময়ে রোম থেকে প্রচুর স্বর্ণ আমদানির ফলেই এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মুদ্রা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

তাঁর মুদ্রায় 'মহীশ্বর' (অর্থাৎ মহেশ্বরের ভক্ত) কথাটি পাওয়া যায়। তা থেকে মনে করা হয় যে, তিনি শৈব ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। তাঁর মুদ্রার গৌণ দিকে কেবল শিবের মূর্তি দেখা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসের রাজ্যজয়ের ফলে ভারতের সঙ্গে চীন ও রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থলবাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়। ব্যাকট্রিয়া-কাবুল উপত্যকা পাঞ্জাব যমুনা ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী বিস্তৃত ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য এই বাণিজ্যকে সম্ভব করে। এই বাণিজ্যসীমার এক প্রান্তে ছিল ইউফ্রাটেস নদী এবং অপর প্রান্তে গঙ্গা নদী। রোম এবং পার্থিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত শান্তিচুক্তি (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ অব্দ) এই বাণিজ্যকে সাহায্য করে। ভারতীয় রেশম, মশলা এবং মণিমুক্তার বিনিময়ে রোম থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ভারতে আসে।

৪ক.৪.৩ প্রথম কনিষ্ক

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। ভারতীয় এবং বৈদেশিক সাহিত্যে, এমনকি মুদ্রা এবং লেখতেও এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে মুদ্রাবিশারদগণ মনে করেন যে, কনিষ্ক গোষ্ঠীর রাজারা কদফিস গোষ্ঠীর পরে এসেছিলেন। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, কনিষ্কের সিংহাসন লাভের তারিখ থেকে একটি নতুন অব্দের প্রচলন হয়েছিল।

ডঃ বি. এন. মুখার্জীর মতে দ্বিতীয় কদফিস আরসাকীয় রাজা দ্বিতীয় গোটার্জেসের (৩৮-৫১ খিস্টাব্দ), এক শ্রেণীর মুদ্রার নকসা তাঁর নিজের মুদ্রার মুখ্যদিকে অনুকরণ করেছিলেন। দ্বিতীয় গোটার্জেসের মুদ্রায় অগ্নিকুণ্ডের সামনে রাজার উৎসর্গরত যে চিত্র আছে, দ্বিতীয় কদফিসের মুদ্রায়ও তা পাওয়া গেছে। এবং যেহেতু প্রথম কনিষ্ক দ্বিতীয় কদফিসের পরে রাজা হন, সেইহেতু তাঁকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্বস্থান দেওয়া যায় না। ডঃ বি. এন. মুখার্জী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আনুমানিক খ্রিঃ ২৬২ অব্দে সাসানীয় রাজা প্রথম সাপুর তাঁর নকস-ই-রুস্তম লেখতে কুষাণদের উপর তাঁর আধিপত্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে কুষাণদের চূড়ান্ত পতন হয়েছিল। তা যদি হয় এবং কনিষ্কের রাজত্বের সূচনা ও কুষাণদের পতনের মধ্যে এক শতাব্দীরও বেশি (প্রথম কনিষ্ক থেকে প্রথম বাসুদেব + ৯৮ বৎসর = তৃতীয় কনিষ্ক এবং দ্বিতীয় বাসুদেবের রাজত্বকাল) ব্যবধানের কথা যদি মনে রাখা যায়, তাহলে কণিষ্কের রাজত্বের সূচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের পরে আনা যায় না। তাহলে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ, এই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সময়সীমার মধ্যে কনিষ্কের রাজত্ব শুরু হয়েছিল, বলা যায়। এই অল্প পরিসারের মধ্যে শকাব্দ ভিন্ন যেহেতু অন্য কোন অব্দের কথা জানা যায় না, সেইহেতু কনিষ্কই শেষোক্ত অব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে, কনিষ্কের রাজত্বকালে প্রবর্তিত অব্দ পরে শকাব্দ নামে পরিচিত হয়েছিল। তাই ৭৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্কের শাসন শুরু হয়ে থাকতে পারে। অন্ততপক্ষে ঐ অব্দের সূচনা তাঁর শাসনকালের মধ্যেই হয়েছিল, মনে হয়। তিনি যদি আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ অব্দের প্রতিষ্ঠা নাও করে থাকেন, তাহলেও তাঁর রাজ্য সম্বৎসর অনুযায়ী কাল গণনার রীতি, তাঁর পরেও কুষাণ সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল বলে ধরে নিতে হবে। এই গণনারীতিই পরে নিয়মিত একটি অব্দে পরিণত হয়েছিল। কনিষ্ক ঐ অব্দের অন্তত ২৩ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে প্রথম কনিষ্ক নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমন কথাও বলা হয়েছে যে তাঁর মধ্যে

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধোন্মাদনা এবং অশোকের ধর্মীয় উদ্দীপনার সমাবেশ ঘটেছিল। দ্বিতীয় কদফিসের পরে তিনি সিংহাসনে এসেছিলেন।

কনিষ্ক বিম কদফিসের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও নতুন রাজ্যজয়েরও প্রয়াসী ছিলেন। কুমারলাতের *কল্পনামণ্ডটিকা*-র (আনুমানিক দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে) চৈনিক অনুবাদে কনিষ্ক কর্তৃক টুং-টিয়েন-চু জয় এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা আছে। টুং-টিয়েন-চু বলতে পূর্ব ভারতের অংশবিশেষ বোঝায়। চৈনিক এবং তিব্বতী উপাদানের ব্যাখ্যা থেকে জানা গেছে যে, তিনি সাকেত (অযোধ্যা) এবং পাটলিপুত্রের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পাটলিপুত্র থেকে তিনি অশ্বঘোষকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। সারনাথ এবং সাহেত মাহেত অর্থাৎ শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত তাঁর লেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলগুলি তাঁর অধিকারে এসেছিল। পূর্ব ভারতে পাটলিপুত্র অতিক্রম করে তাঁর তাম্রমুদ্রা পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেচে। ডঃ সরকার, ডঃ বি. এন. মুখার্জী প্রভৃতি মনে করেন যে শুধু এই তথ্যের উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলগুলি যে তাঁর রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা বলা যায় না। অনেকে এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে কনিষ্কের সৈন্যবাহিনী পাটলিপুত্র অতিক্রম করে এইসব অঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এই মুদ্রাগুলি স্থানীয় টাকশালে তৈরি হয়ে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য প্রচারিত হয়েছিল। পেশোয়ার, সুইবিহার, জেডা (উন্দের নিকট) এবং মানিকিয়ালায় (রাওয়ালপিন্ডির নিকট) প্রাপ্ত কনিষ্কের খরোষ্ঠী লেখ থেকে জানা যায় যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, উত্তর সিন্ধুদেশ এবং গান্ধার তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম ভারতের মালব ও সুরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপদের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, নিশ্চিত বলা যায় না। বিশেষত চষ্টনের বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখনও অনিশ্চিত।

আলবেরুনি আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলের উপর তাঁর অধিকার সম্পর্কিত ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। *রাজতরঙ্গিনী* এবং কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থে কনিষ্কের কাশ্মীর শাসনের উল্লেখ আছে। একটি বৌদ্ধগ্রন্থের চৈনিক অনুবাদে পার্থিয়ার সঙ্গে কনিষ্কের যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে পার্থিয় রাজার নামোল্লেখ নেই। কারও কারও মতে এই রাজা ছিলেন পাকোরাস (৭৭-১০৫ খ্রিস্টাব্দ)। অনেকে মনে করেন যে, কনিষ্ক পার্থিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করেন। পার্থিয়ার রাজা পশ্চিম দিকে কনিষ্কের অগ্রগতি রোধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। আবার অনেকের মতে পার্থিয়ার বিরুদ্ধে কনিষ্কের ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক এবং পার্থিয়ার রাজা সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

উত্তরে চীনের সঙ্গে কনিষ্কের সম্পর্ক কি ছিল, এ বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা আছে। অনেকের মতে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন এবং এর ফলে কাসগড়, ইয়ারকন্দ এবং খোটান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার অনেকে এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, চীনের সেনাপতি প্যান চাও ১০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সিনকিয়াং-এর উপর তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুতরাং কনিষ্ক এই অঞ্চলগুলি অধিকার করেছিলেন, তা বলা যায় না। তবে মনে হয় যে কনিষ্ক তাঁর তেইশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের প্রথম দিকে হয়তো এই অঞ্চলে কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় তার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, কনিষ্কের সাম্রাজ্য জুংলিং পর্বতের, অর্থাৎ পামীরের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আরও লিখেছেন যে, পীত নদীর পশ্চিমস্থ অঞ্চলের উপজাতিরা কনিষ্কের কাছে প্রতিভূ পাঠিয়েছিল। তবে চীনের বিরুদ্ধে এই সাফল্য হয়তো স্থায়ী হয়নি।

চৈনিক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, কনিষ্ক বিভিন্ন দিক জয় করেছিলেন, শুধু উত্তরাঞ্চল অপরাজিত ছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে কনিষ্ক একটি বৃহৎ অভিযান পরিচালনা করেন এবং জুলুং গিরিপথ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি অচিরে তাঁর রাজ্যজয় পরিকল্পনা ঘোষণা করায়, জনগণ তাঁকে হত্যা করেন। এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও, এর মধ্যে তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে ক্লান্ত হওয়ায়, তাঁর ব্যর্থতার আভাস আছে, একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না।

সাধারণত বলা যায় যে আক্সাস থেকে গঙ্গা, মধ্য এশিয়ার খোরাসান থেকে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত বেনারস পর্যন্ত বিশাল এলাকা কুষাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। কুষাণগণ ভূতপূর্ব সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য অংশ, আফগানিস্তানের অধিকাংশ, প্রায় সমগ্র পাকিস্তান এবং সমগ্র উত্তর ভারত তাঁদের এক শাসনাধীনে এনেছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল এবং এক নতুন সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছিল।

দীর্ঘকাল ধরে কুষাণ সাম্রাজ্যকে বিদেশীদের দ্বারা শাসিত একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য মনে করা হত। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। ডঃ বি. এন. মুখার্জী ইত্যাদি গবেষকরা মনে করেন যে, ব্যাকট্রিয়াই ছিল কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ প্রসঙ্গে এও মনে রাখা দরকার যে ভারত উপমহাদেশ প্রবেশের পূর্বে মধ্য এশিয়ার উল্লেখযোগ্য অঞ্চল কুষাণদের অধিকারে ছিল। এইসব তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য মনে হয় যে, কুষাণ সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না। মূলত এটি ছিল একটি মধ্য এশীয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ এই মধ্য এশীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাত্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত উপমহাদেশে কুষাণদের রাজ্যজয়ের পিছনে মূল প্রেরণা কী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক। অঞ্চল সম্প্রসারণের স্বাভাবিক উচ্চাশা তাদের রাজ্যজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ধন যুগিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ইয়েনকাও চেন অথবা কদফিস সেন-টু অর্থাৎ নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন। পেরিপ্লাস-এ যে অঞ্চলকে "স্কুথিয়া" বলা হয়েছে, সেন-টু হয়তো তার অন্তর্গত ছিল। অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত পার্থিয়দের কাছ থেকে দ্বিতীয় কদফিস এই অঞ্চল জয় করেন। এর ফলে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার পশ্চিমে এবং হয়তো পূর্বেও কতকাংশে, পার্থিয় অথবা ইন্দো-পার্থিয়দের শাসনের অবসান ঘটে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে এই জয়কে ভারতে ইন্দো-পার্থিয়দের পরিবর্তে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনিবার্য পরিণতি বলে মনে হয়।

কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্য যে সময়ের, সেই সময়ের ভারত-রোম ব্যাপক বাণিজ্যের এবং নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা মনে রাখলে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণের মধ্যে এই সম্প্রসারণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক উচ্চাশার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল মনে হয়।

পেরিপ্লাসে বাণিজ্য তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। হোউ-হান-শু থেকে জানা যায় যে, ইউচি অধিকারের সময় সেন-টুর সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের নিয়মিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। অবশ্য প্লিনির রচনা থেকে জানা যায় যে ৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎও ভারতের মধ্যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং এর ফলে নাবিকেরা সরাসরি পেরিইয়ার নদীর মোহানার কাছাকাছি, মুজিরিস বন্দরে আসতে পারত। কিন্তু পেরিপ্লাস এবং হাউ-হান-শু থেকে জানা যায় যে, এই নতুন জলপথ আবিষ্কারের ফলে রাতারতি নিম্ন সিন্ধু

অঞ্চলের বন্দরগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। তাছাড়া পারস্য উপসাগর থেকে আগত নাবিকদের কাছে এই বন্দরগুলি ছিল প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীগণ এই বন্দরগুলির মাধ্যমে অতি দ্রুত পণ্য পাঠাতে পারত। শুধুমাত্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নয়, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও এই বন্দরগুলি যোগ ছিল। সুতরাং বাণিজ্যের উপর কর ধার্য করে, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার যাঁরা নিয়ন্তা, তাঁরা প্রভূত সম্পদ আহরণ করতে পারতেন। এইজন্যে কুষাণদের এই অঞ্চলের গুরুত্ব উপেক্ষা করার কোন কারণ ছিল না।

ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা দ্বিতীয় কদফিসকে এই অঞ্চল জয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই অঞ্চল জয় করলে তিনি চীনের প্রভাবমুক্ত এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রেশম বাণিজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পথ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কেননা এই পরিবর্তিত অবস্থায় চীন-রোম বাণিজ্যের জন্য ব্যবসায়ীদের খুব বেশি সংখ্যক বন্দর কর দিতে হবে না। তাছাড়া শক্তিশালী সরকার কর্তৃক সুরক্ষিত একটি নিরাপদ পথে তাদের পণ্য যাতায়াত করতে পারবে। মনে হয়, এইসব সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা অতি উচ্চহারে কর দিত এবং তার ফলে কুষাণদের পক্ষে প্রভূত সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয়েছিল। নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তখন একদিকে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের এবং অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম দুনিয়ার অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তাই এই অঞ্চল অধিকারের মধ্য দিয়ে কুষাণগণ এই দ্বিবিধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের এবং তা থেকে লভ্যাংশ আদায়ের সুযোগ পেয়েছিল। হোউ-হান-শু বর্ণিত, সেন-টু জয়ের প্রকৃত তাৎপর্য এইখানে। ব্যাপক আর্থিক সম্ভাবনার কথা স্মরণে রেখে দ্বিতীয় কদফিস এই অঞ্চল জয় করেন এবং এর ফলে কুষাণ সাম্রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ নিঃসন্দেহে দৃঢ়তর হয়।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, ইতিহাসে কনিষ্কের খ্যাতি তাঁর রাজ্যজয়ের জন্য ততটা নয়, যতটা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। কনিষ্ক নিজে কখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে তাঁর মুদ্রা এবং পেশোয়ার সম্পুট লেখর উপর নির্ভর করে বলেছেন যে তিনি যদি পূর্বে নাও হয়, তাহলে অন্তত তাঁর রাজত্বকালের সূচনাতেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার অনেকের ধারণা যে, কয়েক বৎসর রাজত্বের পর তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে পাটলিপুত্র জয়ের পর অশ্বঘোষের প্রভাবে তিনি এই ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁরা মনে করেন যে অশোকের মতো কনিষ্ক যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর নতুন ধর্মমত গ্রহণ করেন। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই ধর্মান্তর গ্রহণের ফল এক হয়নি। অশোক এর পরে আর যুদ্ধ করেন নি। কিন্তু কনিষ্ক আমৃত্যু যুদ্ধ করেছিলেন।

কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনের স্থান সম্পর্কে দুটি ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। একটি ঐতিহ্য অনুসারে স্থানটি ছিল কাশ্মীর কুন্দলবন বিহার, দ্বিতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরের কুবন বিহার। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক প্রথম ঐতিহ্যে আস্থাবান। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্র এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রবল আগ্রহবশত, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরস্পরবিরোধী মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ে এবং সেই মতবাদগুলির একটি সুসম্বদ্ধ ও বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই অধিবেশনের আয়োজন করেন। কনিষ্কের রাজ্যসভার অন্যতম সদস্য, প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ পার্শ্ব এবং প্রখ্যাত লেখক অশ্বঘোষের সহায়তায় এই সঙ্গীতি

প্রায় অসাধ্য সাধন করে। তারানাথ লিখেছেন যে, এই সঙ্গীতি আঠারোটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ দূর করে, ত্রিপিটক-এর অলিখিত অংশের লিখিত প্রথম রূপ দেয় এবং লিখিত অংশের ভুলভ্রান্তি দূর করে। শুধু তাই নয় বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা হিসাবে অসংখ্য টীকা রচনা করা হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই টীকাগুলি বিভাষাশাস্ত্র নামে পরিচিত। তাই বলা যায় যে কেবল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সঙ্কলন ও সম্পাদনের জন্যই নয়, বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যার জন্যও এই সঙ্গীতি বিশেষ স্মরণীয়।

সঙ্গীতির এই অধিবেশনে বৌদ্ধ রূপান্তর ঘটে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম (পরে ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচ্য) জন্মলাভ করে। মনে হয় যে সংস্কৃতকে বৌদ্ধশাস্ত্রের বাহন হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যে যে অভিজাত মনোভাব ছিল, বৌদ্ধধর্মের এই মৌলিক পরিবর্তনের পিছনেও সেই একই মনোভাব কাজ করেছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রত্যেককে 'আত্মদীপ' হতে বলেছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেকের আপন প্রয়াসে মুক্তি অর্জনের কথা বলেছিলেন। মুক্তি অর্জনের এই উপায়কে বৌদ্ধশাস্ত্রে "প্রত্যেক বুদ্ধ যান" বলা হয়েছে। প্রত্যেকের "বুদ্ধত্ব" লাভ ছিল এই যানের একমাত্র লক্ষ্য। পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য এত বৃহৎ ছিল না। এতে একদিকে পাপী মানুষ এবং অন্যদিকে বুদ্ধের মধ্যবর্তী বোধিসত্ত্বের কল্পনা করা হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল যে, এই বোধিসত্ত্বগণ তাঁদের পুণ্যকর্মের দ্বারা সমষ্টির মুক্তি ঘটাতে পারেন। এইভাবে প্রত্যেক মানুষকে তার ব্যক্তিগত, নিরলস প্রয়াসের দ্বারা মুক্তি অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। মনে হয় যে, ধর্মচিন্তায় এইভাবে দায়ভাগ অবতারণার পিছনে অভিজানতমনের সহজ আয়াসবোধ কাজ করেছিল। বোধিসত্ত্বগণের সাহায্যে মুক্তিলাভের এই অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়, অর্থাৎ বোধিসত্ত্বযান, কালক্রমে 'মহাযান' নামে পরিচিত হয়েছিল। সার্বিক মুক্তি আদর্শ হওয়ায় এই যানকে মহাযান আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যক্তির মুক্তি অভিষ্ট হওয়ায় গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মমতকে ঘৃণাভরে হীনযান বলা হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের এই মৌলিক পরিবর্তন বৌদ্ধশিল্পে প্রতিফলিত হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধের আরাধনা মূর্তির মাধ্যমে করা হত না। এজন্য বুদ্ধের পদচিহ্ন, স্তূপ অথবা বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করা হত। কিন্তু এখন বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়। এই বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধধর্মকে প্রধানত আশ্রয় করে ভারতে যে শিল্প গড়ে ওঠে, ইতিহাসে তা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। অন্য উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র ছিল মথুরা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে শিল্প ছিল ভারতীয়, কিন্তু শিল্পরীতির দিক থেকে তা ছিল গ্রীক প্রভাবিত। তাই এই রীতিতে নির্মিত বুদ্ধের মূর্তিকে অনেকাংশে গ্রীক দেবতা এ্যাপোলের মতো দেখাত। গান্ধার শিল্পের এই বিদেশী আঙ্গিক ভারতীয়গণ বেশিদিন প্রসন্ন মনে মেনে নেয়নি। গান্ধার শিল্পের তুলনায় মথুরায় শিল্পরীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের নিকটতর। আর একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বাহ্লীক দেশে।

কনিষ্ক উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এর ফলে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়, যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। ভারতের অভ্যন্তরে এর ফলে রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু পূর্ব ভারতের পাটলিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ারে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু পূর্বের এবং পরের অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যও স্থায়ী হয়নি। সেই তুলনায় বৌদ্ধধর্মে কনিষ্কের অবদানের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। পেশোয়ারে তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন, তা আলবেরুণির সময় পর্যন্ত, যুগপরম্পরায় বিদেশী পর্যটকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর দেবপালের সময়ের

একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, পেশোয়ারে তিনি যে সঙ্ঘারাম নির্মাণ করেন, তা তখনও পর্যন্ত বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। অপরপক্ষে কনিষ্কের সাম্রাজ্যে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বাস্তিবাদী এবং মহাসঙ্ঘিক সম্প্রদায়গণ বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। মধ্য-এশিয়াতে এই ধর্মবিস্তারেও তাঁরা সাহায্য করেন। কনিষ্কের সমসাময়িক কালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের বাইরে, কুষাণ সাম্রাজ্যের নৈকট্য হেতু মধ্য এশিয়ায় এবং দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে, প্রথমে চীনে এবং পরে চীন থেকে কোরিয়ায় এবং জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল। তাই কনিষ্কের রাজ্যজয়ের গুরুত্বকে লঘু না করেও বলা যায় যে, ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপেই তাঁর খ্যাতি সমধিক।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কনিষ্কের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরমতসহিষ্ণুও ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রায় গ্রীক, জোরায়াস্ট্রীয় প্রভৃতি দেবদেবীর অস্তিত্বই তার প্রমাণ। অনেকে মুদ্রায় দেবদেবীর এই বৈচিত্র্য দেখে মনে করেন যে, কনিষ্কের মনে বিভিন্ন ধর্মের সার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল।

৪ক.৪.৪ কনিষ্কের শাসনব্যবস্থা

কনিষ্ক রাজার দৈব অধিকারে বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকে "দেবপুত্র" বলে অভিহিত করেছেন। নীতিগতভাবে তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বৈরাচার নিরঙ্কুশ ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁর রাজকীয় অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, তিনি তাঁর অনেক ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্র ও উপজাতি ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর একটি মন্ত্রিপরিষদ ছিল।

কনিষ্ক তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে শাসন না করে, ক্ষত্রপ এবং মহাক্ষত্রপদের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে তা শাসন করতেন। তাঁর অব্যাহতির পূর্বে শক-পার্থিয়গণও এইভাবে তাঁদের রাজ্য শাসন করতেন। কনিষ্ক এক্ষেত্রে হয়ত পারস্যের সাম্রাজ্যশাসনব্যবস্থা দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে পারস্যসাম্রাজ্যের তুলনায় কুষাণসাম্রাজ্যের ক্ষত্রপ এবং মহাক্ষত্রপগণ অধিকতর অধিকার ভোগ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষত্রপপদ বংশানুক্রমিক হতে পারত। এই ক্ষত্রপগণ কখনও বা 'রাজন' অভিধা গ্রহণ করতেন।

কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্রশাসিত উপজাতিদের মধ্যে ভরতপুরের যৌধেয়গণের, আগ্রার নিকটবর্তী অর্জুনায়নগণের, সুরাষ্ট্রের আভিরগণের এবং রাজস্থান ও মালবের মালবগণের উল্লেখ করা চলে। বাহাওয়ালপুরের নিকটস্থ যৌধেয়গণের বসতি নিশ্চিতভাবে কনিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তাঁর রাজত্বের একাদশ বর্ষের সুই বিহার লেখতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

কনিষ্কের মন্ত্রিপরিষদ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাথর। সূত্রালঙ্কা-এর দেবধর্ম নামে অপর একজন মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কনিষ্কের অন্যান্য পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন, অশ্বঘোষ, চরক এবং সংঘরক্ষা। অশ্বঘোষ ছিলেন কনিষ্কের আধ্যাত্মিক গুরু, চরক চিকিৎসক এবং সংঘরক্ষা পুরোহিত।

কনিষ্কের শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে 'গ্রামিক' বলা হত। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের 'শ্রেণী' অথবা 'গিল্ড' ছিল। এই গিল্ডগুলি বিভিন্ন বৃত্তির এবং ধর্মীয় দান সম্পর্কিত বিষয়ের দেখাশুনা করত। তাঁর অধীনে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী ছিল। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি একদিকে রাজ্যজয় এবং অন্যদিকে

সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ সেনাপতি বা দণ্ডনায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দণ্ডনায়কগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রদেশ-শাসনের কাজে সাহায্য করতেন। মানিকিয়ালা লেখতে লাল নামক একজন দণ্ডনায়কের নাম পাওয়া গেছে। সাম্রাজ্য-শাসনের কাজে তিনি বহুসংখ্যক কুষাণ, শক এবং গ্রীকদের নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের বেশিরভাগ ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আচারে আচরণে 'ভারতীয়' হয়ে গিয়েছিলেন। কনিষ্ক নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও, অন্য ধর্মাবলম্বিগণের পূজা-পার্বণে কোন বাধা ছিল না। তাঁর মুদ্রায় যেমন একদিকে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়, তেমনই অন্যদিকে তাঁর রাজত্বকালে বহুসংখ্যক হিন্দু ও জৈন মন্দির নির্মাণের কথাও জানা যায়।

৪ক.৪.৫ কনিষ্কের উত্তরাধিকারীগণ

কনিষ্কের রাজত্বের শেষভাগে বাসিষ্ক (২০-২৮ অব্দ) সহযোগী সম্রাট ছিলেন। কনিষ্কের পর তিনি সম্রাট হন। তিনি ২০-২৮ অব্দ অর্থাৎ ৯৮-১০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর হুবিষ্ক ২৬-৬০ অব্দ (অর্থাৎ ১৪০-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু চৌত্রিশ বৎসর রাজত্ব করলেও, তাঁর সম্পর্কে তথ্যাদি বিশেষ জানা যায় না। কেননা চৈনিক এবং ভারতীয় দলিলসমূহে তাঁর উল্লেখ খুবই কম পাওয়া যায়। তাঁর কয়েকটি লেখ মথুরা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পূর্ব আফগানিস্তানে পাওয়া গেছে। অবশ্য তাঁর নামাঙ্কিত অসংখ্য স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রা তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সমৃদ্ধ রাজত্বকালের পরিচয় দেয়। কাবুলের প্রায় ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ওয়ারডক নামক স্থানে তাঁর একটি লেখ পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আফগানিস্তান তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে, তিনি কাশ্মীরে হুষ্কপুর নামে একটি নগর নির্মাণ করেন। এই স্থানটি ছিল কাশ্মীর উপত্যকার অভ্যন্তরে, বরমূলা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে। স্টেইন বর্তমান উসকুর গ্রামকে প্রাচীন হুষ্কপুর বলে চিহ্নিত করেছেন। মথুরায় একটি অপূর্ব বিহার ছাড়াও, হুবিষ্ক হয়তো হুষ্কপুরে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

হুবিষ্কের সমকালীন আর একজন রাজা ছিলেন কনিষ্ক। এই দ্বিতীয় কনিষ্ক সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। একমাত্র আরা লেখ ভিন্ন তাঁর অন্য লেখ পাওয়া যায়নি। তাই মনে হয় হুবিষ্কের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

হুবিষ্কের পর প্রথম বাসুদেব রাজা হন। খুব সম্ভবত তিনি হুবিষ্কের পুত্র ছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ ভারতীয় নাম ভাগবত ধর্মের প্রবর্তক, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত। এ থেকে কুষাণগণ কীভাবে ধীরে, কিন্তু অনিবার্যভাবে, 'ভারতীয়' হয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা যায়। মুদ্রায় অঙ্কিত বাসুদেবের অঙ্গে বিদেশী পোশাকের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও, ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একান্তভাবে ভারতীয়। তবে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন শৈব। বলা যায়, তিনি দ্বিতীয় কদফিসের ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর মুদ্রায় বিদেশী দেবদেবীর উপস্থিতি ছিল না, এমন নয়, তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। সে তুলনায় এককভাবে শিবের, অথবা যৌথভাবে শিব ও নন্দির নিদর্শন অনেক বেশি। সুতরাং তিনি যে শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম বাসুদেবের লেখ শুধুমাত্র মথুরা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর কোন লেখ পাওয়া যায়নি। তাই অনেকে মনে করেন যে, তাঁর রাজ্য এই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রথম বাসুদেবের স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে তাম্রমুদ্রার তুলনা করলে, তাঁর সময়ে অবনতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

স্বর্ণমুদ্রায় কোন অবনতির লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর তাম্রমুদ্রা নিশ্চিতভাবে হীন মানের। সেই সময় কুষাণসাম্রাজ্যের অবনতির আভাস অন্যভাবেও পাওয়া যায়। রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখ এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোসন-এর মঘদের উত্থান এবং কুষাণসাম্রাজ্যের অবনতি একই সময়ে ঘটেছিল।

প্রথম বাসুদেবের পরবর্তী কুষাণরাজাদের সম্পর্কে সাহিত্য উপাদান অথবা লেখ বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁদের বেশ কিছুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু তা থেকে এঁদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথম বাসুদেবের পরে তৃতীয় কনিষ্ক এবং দ্বিতীয় বাসুদেব ছিলেন, এই মাত্র জানা যায়।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শক্তির (যেমন যৌধেয়, অর্জুনায়ন প্রভলতি উপজাতিসমূহের) বিদ্রোহের কথা বলে থাকেন। অন্যদিকে সাম্প্রতিক গবেষণার উপর নির্ভর করে এখন নিশ্চিত বলা চলে যে, মোটামুটিভাবে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় পাদে কুষাণসাম্রাজ্যের পতনের জন্য পারস্যের সাসানীয়গণ প্রধানত দায়ী ছিলেন। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুষাণসাম্রাজ্য যখন সাসানীয়গণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখনই এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। কোন কোন ভারতীয় উপজাতি, অথবা স্থানীয় নরপতিগণ হয়তো এই সাম্রাজ্যের শবদেহের উপর প্রেতনৃত্যে মেতেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কুষাণসাম্রাজ্যের মৃত্যু ঘটাননি। তাঁরা শুধুমাত্র এর সমাধির পথকে মসৃণ করেছিলেন।

৪ক.৪.৬ কুষাণদের শিল্প ও সংস্কৃতি

কুষাণযুগ উত্তর ভারতের সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। এই সংস্কৃতির মূল কথা হল স্বাঙ্গীকরণ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার, তেমনই এই স্বাঙ্গীকরণও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলেই বেশি হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের মানুষকে কুষাণদের কল্যাণে একই সাম্রাজ্য-কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছিল। এর ফলে একই ঐতিহ্য ও বন্ধন শুধু সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যেই নয়, রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গেও গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় প্রবণতা রক্ষিত হলেও কুষাণ-সংস্কৃতি প্রধানত বিভিন্ন ঐতিহ্যের সমন্বয়ের উপরই রচিত হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের শেষ দিকে বিভিন্ন ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে, এর চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

কুষাণগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তাঁদের সময় শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শিল্পের মধ্যে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যই প্রধান। স্থাপত্য শিল্প প্রধানত মন্দির এবং বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। কুষাণগণ অসংখ্য চৈত্য, মন্দির, নগর, স্তূপ এবং বিহার নির্মাণ করেছিলেন। মন্দির নির্মাণ ভারতে ইতিপূর্বে অনাদৃত ছিল না। কিন্তু এ যুগে ভারতীয় এবং বৈদেশিক শিল্পীগণ ধর্মীয় প্রয়োজনে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির নতুন সুযোগ লাভ করেছিলেন। প্রথম কনিষ্কের সময় নির্মিত পুরুষপুরের (পেশোয়ার) প্রখ্যাত চৈতের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে ফা-হিয়েন গান্ধার অতিক্রম করার সময় মুক্তকণ্ঠে এই চৈতটির প্রশংসা করেন। সুরখ কোটালে সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে, কুষাণসাম্রাজ্যের পশ্চিম বিভাগের মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। তক্ষশিলায় খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে সেখানকার ধর্মরাজিক বিহারের নির্মাণকার্য দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। তরামেজের কারাটেপেতে খননকার্যের ফলে সমকালীন একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলের বিহার স্থাপত্যের কথা জানা গেছে।

কুষাণযুগে ভাস্কর্য বলতে প্রধানত উত্তর-পশ্চিমের গান্ধার শিল্পরীতি বোঝায়। কিন্তু এই শিল্পরীতি প্রধান

হলেও, একমাত্র ছিল না। এর পাশাপাশি গাঙ্গেয় উপত্যকায় মথুরায়, অন্ধ্রের অমরাবতীতে এবং মধ্য-এশিয়ার ব্যাকট্রিয়ার বিভিন্ন শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধের জীবনকেন্দ্রিক এই শিল্পের উপর গ্রীস, রোম ও মধ্য-এশিয়ার প্রভাবের কথা বলা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশীয় ঐতিহ্য যে এই শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল, তা স্বীকার করা যায় না। এই শিল্পেই প্রথম বুদ্ধকে প্রতীকের পরিবর্তে, মূর্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। অনেকে এই মূর্তির উপর গ্রীক-দেবতা এ্যাপোলোর প্রভাবের কথা বলেছেন। এমনও বলা হয়েছে যে, এখানে ভাস্করের হৃদয় ছিল ভারতীয় কিন্তু তার হাত দুটি গ্রীসের। মধ্য-এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের শিল্পকে গান্ধার শিল্প প্রভাবিত করেছিল।

গান্ধার শিল্পের তুলনায় মথুরায় শিল্পরীতি ছিল বিশেষভাবে মৌলিক। বুদ্ধের মূর্তি ভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ও এই শিল্পের উপজীব্য হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কুষাণ নৃপতিদের মূর্তিও এই শিল্পরীতিতে নির্মিত হয়েছিল। এমনকি বিহার-মন্দিরের ধনী পৃষ্ঠপোষকেরাও এই শিল্পের বিষয়বস্তু হয়েছিলেন। মথুরায় একটি প্রকৃত দেবকুল ছিল। এমনও হতে পারে যে, গান্ধার শিল্পের থেকে স্বতন্ত্রভাবে এবং হয়তো তারও কিছুকাল আগে, মথুরার ভাস্কর্যে, বুদ্ধের উপর নরত্ব আরোপিত হয়েছিল। মথুরার বুদ্ধমূর্তিগুলিকে একই সঙ্গে এই জগতের এবং দূরের বলে মনে হয়।

কুষাণসাম্রাজ্যের বাইরে এই যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল অমরাবতী অঞ্চলে। এখানকার ভাস্কর্যকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপগুলির যথার্থ পরিপূরক বলা যায়। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী এই শিল্পের বিষয়বস্তু। কিন্তু এর সামগ্রিক সুর একান্তভাবে স্থানীয়। মনে হয় এখানকার শিল্পীরা শিল্পসম্পর্কিত যে অনুশাসনে আস্থাবান ছিলেন, তার প্রতি একান্তভাবে অনুগত থেকে এই শিল্পসৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে শিল্পীর প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল না। তবে উত্তর-ভারতের শিল্প-ঐতিহ্য আমরাবতীর শিল্প কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

ভূতপূর্ব সোভিয়েত রাশিয়ার এয়ারতম, খলচয়ন প্রভৃতি স্থান আফগানিস্তানের কয়েকটি জায়গায় ভাস্কর্যের নতুন নিদর্শন পাওয়া গেছে। রীতিগত বৈশিষ্ট্যে এই নিদর্শনগুলি সে যুগের গান্ধার, মথুরায়, এমনকি পার্থিব ও গ্রীক শিল্প থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র। এই নিদর্শনগুলিতে দেখা যায় যে, মূর্তিগুলিকে অনেকটা সামনাসামনি (অর্থাৎ তির্যকভাবে নয়) উপস্থাপিত করা হয়েছে। এদের মুখের আকৃতি ডিমের মতো, চোখ দুটি ঈষৎ স্ফীত, উন্মুক্ত অথবা অর্ধ-নিমীলিত। মাথার চুল হয় অতিশয় কুঞ্চিত, না হয় নিপুণ ও গভীরভাবে দ্বিধাবিভক্ত। ‘ঐতিহাসিকেরা এই শিল্পরীতিকে ‘ব্যাকট্রিয়’ আখ্যা দিয়েছেন। একথা বলা যায় যে, এই স্বতন্ত্র ব্যাকট্রিয় শিল্পরীতির উদ্ভব সাম্প্রতিক কুষাণশিল্প-সম্পর্কিত আলোচনা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়।

কুষাণযুগে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গুপ্তযুগে এই উন্নতি পূর্ণতা লাভ করেছিল। কুষাণযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের এই উৎকর্ষের সঙ্গে কনিষ্ক এবং প্রথম বাসুদেবের নাম বিশেষভাবে জড়িত। দশম খ্রিস্টাব্দের রাজশেখরের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে বাসুদেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি হয়তো এই প্রথম বাসুদেব। তবে এক্ষেত্রে গৌরবের সিংহভাগ প্রথম কনিষ্কের প্রাপ্য। তাঁর সঙ্গে যে নামটি বিশেষভাবে জড়িত, তিনি হলেন একাধারে কবি, নাট্যকার এবং দার্শনিক, অশ্বঘোষ।

সুবর্ণাক্ষীর পুত্র অশ্বঘোষ সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যার অধিবাসী ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। কনিষ্ক তাঁকে পাটলিপুত্র থেকে নিয়ে যান। পুণ্যায়নের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

এর পর তিনি তাঁর সমগ্র কাব্য ও নাট্যপ্রতিভা বৌদ্ধধর্মের সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত *বুদ্ধচরিত*। এ ছাড়া *সৌন্দনন্দ* (সুন্দরী ও নন্দ), ও *সারিপুত্রপ্রকরণ*-ও তাঁর রচনা। অনেকে চৈনিক অনুবাদ এবং ধর্মকীর্ত্তি ও জয়ন্ত ভট্টের রচনায় দুইবার উল্লেখের উপর নির্ভর করে মনে করেন যে, গৌতম বুদ্ধের কাছে রাষ্ট্রপালের ধর্মান্তর গ্রহণ বিষয়ক গীতিনাট্য (রাষ্ট্রপাল নাটক) তাঁর রচনা। এই গ্রন্থে দুঃখ, শূন্যতা, আনাত্মা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে। তাই অনেকে তাঁকে একটি নতুন দর্শনের প্রবর্তক বলে মনে করেন। এই দর্শন তথ্যতা দর্শন নামে পরিচিত। এই দর্শনের মূল কথা হল চমর সত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না, তাকে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান, অথবা স্বজ্ঞার দ্বারা জানতে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর *বজ্রসূচী* গ্রন্থটির কথাও বলা যায়। এখানে তিনি ন্যায়শাস্ত্র সম্মতভাবে, অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও দাবিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে, অশ্বঘোষ শুধু সাহিত্যেই নয়, ধর্ম ও দর্শনেও নতুন ভাবধারায় প্রবর্তন করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম প্রখ্যাত নাম অশ্বঘোষ। বুদ্ধের জীবন অবলম্বন করে তাঁর কাব্য ও নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনব বলা যায়। কেননা তাঁর আগে সংস্কৃত সাহিত্যে কোন নাটক ছিল বলে মনে হয় না। তিনিই এই সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। তাঁর রচনায় মহিলা, সাধারণ ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত (যদিও তা সর্বদা পাণিনি অনুমোদিত নয়) কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। অবশ্য তাঁদের বাচনভঙ্গী এবং প্রণয়রীতি রাজসভার আড়ষ্টতামুক্ত নয়।

চৈনিক এবং তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে সমগ্র বুদ্ধচরিত গ্রন্থটি পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থে অতি সরলভাবে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। ঘটনার নির্বাচনে ও বিন্যাসে অশ্বঘোষ তাঁর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রণয় দৃশ্যের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। মানুষের সাধারণ দুঃখকে কীভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করতে হয়, তা তিনি ভালভাবে জানতেন। বার্ধক্য, মৃত্যুজনিত দুঃখের জীবন্ত চিত্র তিনি *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থে এঁকেছেন। বুদ্ধের কাছে তাঁর জ্ঞাতিভাই নন্দের ধর্মান্তর গ্রহণ, আঠারোটি পর্বে বিভক্ত, সৌন্দরানন্দ-এর বিষয়বস্তু। অশ্বঘোষ নিজেই বলেছেন যে, শান্তি ও মুক্তির জন্য তিনি এই গ্রন্থটি লিখেছেন। এতে একদিকে স্ত্রী সুন্দরীর প্রতি নন্দের প্রেম, অন্যদিকে বুদ্ধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগ ক্লিষ্ট নন্দর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মনে হয় এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অন্য শিল্পীদের অন্যতর শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল। কেননা এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত একটি অনুপম প্রাচীর-চিত্র অজন্তায় পাওয়া গেছে। সারিপুত্র মৌদগল্লায়নের ধর্মান্তর গ্রহণ *সারিপুত্র প্রকরণ* নাটকটির উপজীব্য। এই নাটকের অংশবিশেষ মধ্য-এশিয়ার তুরফানে পাওয়া গেছে। নয়টি অঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটি সমগ্রভাবে ভারতের নাট্যশাস্ত্রে-বর্ণিত প্রকরণ অনুসারে লিখিত। বলা যায় এই নাটকটি রচনা করে তিনি নাটক রচনার একটি মান নির্দিষ্ট করে দেন। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে এটিই প্রচীনতম। অশ্বঘোষের রচনা প্রাচীন ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ই-সিং যখন সপ্তম খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন, তখন তিনি দেখেন যে, এখানকার মানুষ তাঁর রচনা বারংবার আবৃত্তি করেও ক্লান্ত হত না।

কুষাণযুগের অপর একটি রচনা সূত্রালঙ্কার মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গেছে। এটি একটি সংস্কৃত উপাখ্যানের সঙ্কলন। চৈনিক উপাদানে এই গ্রন্থটির সঙ্গে অশ্বঘোষের নাম যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটি হয়তো প্রকৃতপক্ষে

তাঁর কনিষ্ঠ সমকালীন কুমারলাটের সৃষ্টি। ইনি ছিলেন তক্ষশিলার অধিবাসী। অশ্বঘোষ তাঁকে প্রভাবিত করেন। অশ্বঘোষের অপর একজন সমসাময়িক, কনিষ্কের রাজসভা কর্তৃক আদৃত কবি ছিলেন মাতৃচেত। তাঁর *বৌদ্ধ স্তোত্র* মধ্য-এশিয়া এবং তিব্বত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ই-সিং-এর সময় এগুলিও খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই সময় কাব্যরীতিতে লিখিত বৌদ্ধ কাহিনীর মধ্যে আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টাব্দের *অবদানশতক* এবং দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের *দিব্যদান*-এর কথা বলা যায়।

তৎকালীন বৌদ্ধ লেখকদের মধ্যে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন নাগার্জুন। অশ্বঘোষের মতো তিনিও জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর চিন্তায় তাই বেদান্তের প্রভাব অনস্বীকার্য। চৈনিক এবং তিব্বতী ভাষায় রচিত তাঁর জীবনকাহিনী থেকে জানা যায় যে, তিনি কাঞ্চি অথবা বিদর্ভের উপকণ্ঠে বাস করতেন। অনেকে মনে করেন যে, কুষাণদের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না। চৈনিক উপাদানে কনিষ্ক প্রসঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়নি। গুন্টুর জেলার অন্তর্গত নাগার্জুনিকোন্ডের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দেখে মনে হয় যে, দক্ষিণের সাতবাহন রাজ্য তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। হালের *গাথাসপ্তশতিতে* এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সাতবাহন বন্ধুকে লেখা নাগার্জুনের চিঠি তিব্বতী ভাষায় রক্ষিত আছে। বাণভট্টও নাগার্জুনকে সাতবাহনের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্তক। তিনি একদিকে সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের একান্ত বাস্তবতা এবং অন্যদিকে যোগাচার বৌদ্ধদের চরম আদর্শবাদের মধ্যে মধ্যপথের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর প্রধান অকুতোভয় স্বকৃত টীকাসহ *মাধ্যমিক-কারিকা*। তাঁর মতে কোন বস্তুই সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত বা অনুপস্থিত নয়। তিনি 'সমবৃত্তি সত্য' অর্থাৎ বস্তুর আপেক্ষিক সত্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সুদীর্ঘকালব্যাপী দেহান্তর গ্রহণের, অর্থাৎ সংসারের, প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং পরিবর্তনশীল জগৎ যদি অবাস্তব হয়, তাহলে এর বিপরীত নির্বাণও অবাস্তব। সুতরাং সংসার ও নির্বাণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একমাত্র বস্তু যার অস্তিত্ব আছে, তার কোন উদ্দেশ্যের গুণ বা ধর্ম, অর্থাৎ বিধেয় থাকতে পারে না। তিনি একে শূন্যতা বলেছেন। তাঁর মতবাদকে তাই শূন্যতাবাদ বলা হয়।

নাগার্জুন শুধুমাত্র একজন বড় দার্শনিক ছিলেন না, তিনি বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। তাঁকে রসায়ন ও অপরসায়ন-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা মনে করা হয়। একথা বলা চলে যে তাঁর মাধ্যমে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেতু রচিত হয়েছিল।

ভেষজবিজ্ঞানের এ যুগে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চরক ও শুশ্রুতের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই ঠিক কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, বলা যায় না। ঐতিহ্য অনুসারে চরক কনিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। বাসাম তাঁকে প্রথম খ্রিস্টাব্দে স্থান দিয়েছেন। আবার অনেকের মতে তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। শুশ্রুতের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আরও তীব্র। কারও মতে তিনি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মানুষ। আবার অনেকের মতে তিনি ছিলেন চতুর্থ খ্রিস্টপূর্ব। অনেকে *চরক-সংহিতা* গ্রন্থটি চরকের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত মনে হয়। কেননা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির রচনায় এই গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। চরকের মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। নবম শতাব্দীর দৃঢ়বল নামক জনৈক কাশ্মীরী কর্তৃক পরিবর্তিত সংস্করণ পাওয়া গেছে। তিনি চরকের গ্রন্থের সঙ্গে কয়েকটি পরিচ্ছেদ যুক্ত করেছিলেন। এই গ্রন্থে আটটি প্রধান ব্যাধি ও তাদের প্রতিকারের কথা আছে। পরবর্তীকালে আরবী ও পার্সী ভাষায় বইটি অনূদিত

হয়েছিল। এ থেকে এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। শুশ্রুতের মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। চন্দ্রক কর্তৃক পরিবর্তিত একটি সংস্করণ পাওয়া গেছে। এই বইতে অস্ত্রোপচারের অস্ত্র ও বিধান সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রাচীন যুগে কুষাণগণ যে নিজস্ব ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগে মানুষের যাতায়াতের স্বাধীনতা ছিল। এর ফলে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বেড়েছিল এবং চিন্তার ক্ষেত্রে বাধা দূর হয়েছিল। তাই ভৌগোলিক ও জাতিগত দিক থেকে নিঃসম্পর্ক মানুষ পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। একদিকে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং অন্যদিকে কুষাণসম্রাটদের সৎকাব্য এবং শ্রীর মধ্যে বিরোধ মেটানোর সক্রিয় প্রয়াসের ফলে কুষাণযুগ প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি ফলবান অধ্যায় হতে পেরেছিল।

৪ক.৫ সাতবাহনগণ

মৌর্যগণ নানাভাবে ভারতের ঐক্যকে অগ্রসর করেছিলেন। তাঁরা ভারতের বৃহত্তর অংশ তাঁদের ছত্রছায়াতলে এনেছিলেন, আলেকজান্ডারের সেনাপতিগণ এবং সেলুকাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করেছিলেন, সমগ্র সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে একটি ভাষা ও ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষাটি ছিল প্রাকৃত এবং অশোকের সময় থেকে সেই ধর্ম ছিল, বৌদ্ধধর্ম।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের এই ঐক্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রকে কেন্দ্র করে সাতবাহন বংশ একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করে। শক্তি গৌরবের দিক থেকে এই সাম্রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

এ যুগের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে। প্রশ্নটি হল, মৌর্যসাম্রাজ্যের ভাঙনের পর উত্তর-ভারত, সিন্ধু এবং বঙ্গদেশ বাদে গঙ্গা উপত্যকা, বিদেশীরা আক্রমণ এবং অধিকার করেছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভারত প্রধানত স্থানীয় শাসকের অধীনেই থেকে গেল। ভারতের দুইটি অঞ্চলে এই পার্থক্য কেন ঘটল? এর মূল কারণ হয়তো এই যে, লাঙলব্যবহারকারী গ্রাম উত্তর ভারতের অর্থনীতিকে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে, অর্থাৎ নর্মদার দক্ষিণে, এই ধরনের অসংখ্য নিষ্ক্রিয় গ্রাম তখনও গড়ে ওঠেনি। সেখানে অনেক উন্নত সঙ্ঘ (গিল্ড) ছিল এবং অরণ্যে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে ব্যবসায়ে লাভও নেহাৎ কম হত না। দাক্ষিণাত্যে কৃষির বিকাশ বোধহয় মৌর্য-পরবর্তী যুগের ঘটনা। দাক্ষিণাত্য, জুনাগড় বাঁধের মতো কোন বৃহৎ জলাধারের কথা জানা যায় না। উত্তর ভারতে সমভূমিতে খাদ্যসংগ্রহকারী এবং খাদ্যউৎপাদনকারী, উভয়ের জন্য যথেষ্ট স্থান ছিলনা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে ঘন অরণ্যে ব্যাপক কৃষিকার্য অসম্ভব ছিল। দাক্ষিণাত্যে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে কৃষি এবং কৃষকদের বসতিস্থাপন প্রকৃতপক্ষে মৌর্যদের পরে শুরু হয়েছিল। সেখানে পর্বত অরণ্য দ্বারা বিচ্ছিন্ন বসতিবিরল সঙ্কীর্ণ বাণিজ্যপথই শুধু মৌর্যদের অধিকারে ছিল। মহীশূরের দক্ষিণে কোন অঞ্চল জয়ের চেষ্টা মৌর্যরা করেনি। দাক্ষিণাত্যে কৃষি মৌর্যদের পরে এসেছিল। তার অর্থ এ নয় যে, সাতবাহন সেখানে লাঙলের আমদানি করেছিলেন। বরং বলা যায় যে সাতবাহনবংশ যে ধরনের রাজত্ব স্থাপন করেছিল, লাঙলের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল।

অনেকে বলেছেন যে, পশ্চিম এবং উত্তর দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি ছিল উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে 'সেতুরাজ্য'। তাদের এই অবস্থিতি, একদিক দিয়ে তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেননা এর ফলে তারা যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, সাতবাহন রাজ্যের উত্থান এমন সময়ে হয়েছিল, যখন উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। সাতবাহন রাজ্যকে তাই উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে দ্রব্য ও ভাব বিনিময়ের প্রথম বাহন হতে হয়েছিল।

মৌর্য-পরবর্তী এবং গুপ্ত-পরবর্তীযুগের ইতিহাস প্রধানত সাতবাহন এবং কুষাণগণের দ্বারা চিহ্নিত। সাতবাগনগণ দক্ষিণ ভারতে এবং কুষাণগণ উত্তর ভারতে, মৌর্য-পরবর্তী বিক্ষুব্ধ যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। এই অন্ধকার মধ্যবর্তী সময়ে উজ্জ্বল সাফল্যের নিদর্শন তারাই রেখেছিল।

মৌর্যদের পর বিন্ধ্য-পরবর্তী অঞ্চলে দুইটি শক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল। একটি কলিঙ্গের চেদি অথবা চেতবংশ, অন্যটি উত্তর দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশ। চেদিবংশের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু সাতবাহন বংশের হয়েছিল।

৪ক.৫.১ কালসীমা

সাতবাহনবংশ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। পুরাণে এই বংশের রাজাদের সংখ্যা এবং তাঁদের মিলিত রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐক্যমত্য নেই। কোন কোন পুরাণে এই সংখ্যা দেওয়া উনিশ, আবার কোন কোন পুরাণে ত্রিশ। এই বংশের রাজত্বকালে কোথাও আছে তিনশো বছর, আবার কোথাও বা সাড়ে চারশো বছর। বায়ুপুরাণ-এ এই শাসনের মেয়াদ হয়েছে তিনশো বছর এবং চারশো এগারো বছর, দুই-ই। তাই অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সাতবাহনবংশের প্রধান শাখার শাসক-সংখ্যা ছিল উনিশ এবং তাঁরা তিন শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন, তবে এই বংশের বিভিন্ন শাখার সংখ্যা ছিল ত্রিশ এবং তাঁরা চার শতাব্দীরও অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন।

৪ক.৫.২ সিমুক

সিমুক সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরাণ অনুসারে তিনি কণ্ববংশীয় সুসর্মণ এবং শুঙ্গ ভগ্নাংশের ধ্বংসসাধন করে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কণ্ব এবং শুঙ্গদের কাছ থেকে তিনি যে অঞ্চল অধিকার করে, বিদিশার চারিদিকের অঞ্চল হয়তো তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরাণে কোন কোন স্থানে সিমুকের কণ্বদের ভৃত্য বলা হয়েছে। সুতরাং মনে হয় যে, তিনি পূর্বে কণ্বদের অধীনে একজন সামন্তরাজা ছিলেন। তিনি তেইশ বৎসর রাজত্ব করেন। জৈন বিবরণ অনুসারে রাজত্বের শেষ দিকে তিনি এমন দুষ্কৃতকারী হয়ে ওঠেন, যে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত এবং হত্যা করা হয়।

৪ক.৫.৩ কৃষ্ণ

সিকুকের পরে কণ্হ অথবা কৃষ্ণ রাজা হন। তিনি আঠারো বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যসীমা পশ্চিমে অন্তত নাসিক পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁর রাজত্বকালে নাসিকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (শ্রমণ মহামাত্র) একটি গুহা নির্মাণ করিয়েছিলেন।

৪ক.৫.৪ প্রথম সাতকর্ণি

কণ্হ বা কৃষ্ণের পরে প্রথম সাতকর্ণি রাজা হন। পুরাণ অনুসারে তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পুত্র। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মনে করেন যে, প্রথম সাতকর্ণি সিমুকের পুত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে ডঃ সরকার মন্তব্য করেছেন যে শাস্ত্রী হয়তো নানাঘাটের ভাস্কর মূর্তির উপর নির্ভর করে এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। এই মূর্তিগুলির গাত্রে পরিচয় সম্বলিত যে লেখগুলি আছে, তাতে কৃষ্ণের নাম নেই। কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই লেখগুলি নিশ্ছিদ্র নয়। কেননা মোট আটটি লেখর মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ ভগ্ন। এমনও হতে পারে যে ভগ্ন লেখ দুইটির একটিতে কৃষ্ণের নাম ছিল।

প্রথম সাতকর্ণির জন্য ঐতিহাসিক উপাদান কম নয়। পুরাণ ছাড়াও ভারতীয় সাহিত্যে সাতকর্ণি প্রতিষ্ঠানপতি এবং শক্তিকুমারের পিতারূপে পরিচিত। *পেরিপ্লাস* গ্রন্থের বড় স্যারগানাস প্রথম সাতকর্ণির বিকৃত নামান্তর মাত্র। সাতবাহন রাজাদের মধ্যে একাধিক সাতকর্ণি ছিলেন। তাই পেরিপ্লাস-এর লেখক স্বাভাবিকভাবেই প্রথম সাতকর্ণিকে 'বড়' আখ্যা দিয়েছেন। অন্য সাতকর্ণিগণ কখনও ভৌগোলিক পরিচয় (যেমন কুন্তল সাতকর্ণি) কখনও বা মাতৃপরিচয় (যেমন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি)। দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন। শিরি সত নামাঙ্কিত মুদ্রা যে প্রথম সাতকর্ণির, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রাণী নাগনিকার নানাঘাট-লেখ সম্পর্কেও সেই একই কথা। হাথিগুম্ফা-লেখতে যে সাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি প্রথম সাতকর্ণি কিনা, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে সন্দেহের কোন কারণ নেই। কেননা পুরাণে কৃষ্ণের পরবর্তী সাতকর্ণিকে কণ্বদেব পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। মহাপদ্মনন্দের তিনশত বৎসর পরের খারবেল যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর, সেকথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং খারবেল এবং প্রথম সাতকর্ণি সমসাময়িক ছিলেন, মনে করার কোন বাধা নেই। সাঁচি-লেখর "রাজন শ্রী সাতকর্ণি" প্রথম সাতকর্ণি কিনা এ বিষয়ে মার্শাল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কেননা তাঁর মতে প্রথম সাতকর্ণি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ এবং এই শতাব্দীতে পূর্ব মালব অন্ধ্রদের অধিকারে ছিল না, শুঙ্গদের অধিকারে ছিল। কিন্তু প্রথম সাতকর্ণি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন, একথা মনে রাখলে আর সন্দেহের কোন কারণ থাকে না।

প্রথম সাতকর্ণি ক্ষুদ্র সাতবাহন রাজ্যকে বৃহৎ আয়তন দান করেন। সাতবাহনদের দলিলসমূহের মধ্যে প্রথম নানাঘাট-লেখ থেকে জানা যায় যে তিনি শক্তিশালী অম্বির পরিবারের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করেন এবং 'দক্ষিণাপথপতি'-রূপে পরিচিত হন। এইভাবে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের না হলেও, উত্তর দাক্ষিণাত্যের অধিকার লাভ করেন। এই লেখতে তাঁর সম্পর্কে 'অপ্রতিহত চক্র' বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর রাজ্যজয় প্রতিহত হয়নি এমন দাবি করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, গোদাবরী উপত্যকা জয় করে তিনি 'দক্ষিণাপথপতি' অভিধা লাভ করেন। হাথিগুম্ফা-লেখ থেকে 'পশ্চিমের অধিপতি' প্রথম সাতকর্ণির সঙ্গে কলিঙ্গরাজ খারবেলের সম্পর্কের কথা জানা যায়। (শাস্ত্রী এই লেখতে উল্লিখিত সাতকর্ণি যে প্রথম সাতকর্ণি হতে পারেন সেই সম্ভাবনা অস্বীকার করেননি, তবে তাঁর মতে এই সাতকর্ণি দ্বিতীয় সাতকর্ণি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।) হাথিগুম্ফা-লেখর যে অংশে সাতকর্ণির উল্লেখ আছে, সেই অংশের পাঠান্তর থাকায় তাঁর সঙ্গে খারবেলের প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল, নিশ্চিত বলা যায় না। একটি পাঠ অনুসারে খারবেল তাঁকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছিলেন, অন্য পাঠ অনুসারে খারবেল তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। তবে এই লেখ থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রথম সাতকর্ণির

রাজ্যের পূর্বসীমা কলিঙ্গা রাজ্যের পশ্চিমসীমা স্পর্শ করেছিল। প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যজয় তাঁকে নর্মদা নদীর উত্তরে পূর্ব মালবে নিয়ে এসেছিল। এই অঞ্চলে তখন শক এবং যবন আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। পূর্ব মালবে সাঁচি-লেখর উপর নির্ভর করে ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, সাঁচি অঞ্চল প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে উৎসর্গীকৃত এই সাঁচিলেখতে প্রথম সাতকর্ণির কারিগরদের মধ্যে প্রধান, আনন্দ কর্তৃক একটি দানের উল্লেখ আছে। ডঃ সরকার মনে করেন যে, এই তথ্যের উপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কেননা, আনন্দ ব্যক্তিগতভাবে এবং তীর্থযাত্রীরূপে সাঁচি মঠে গিয়েছিলেন, এমন সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। তবুও ডঃ সরকার মনে করেন যে, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষ সহ উত্তর দাক্ষিণাত্য প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া উত্তর কঙ্কন এবং কাথিয়াবাড় তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন ছিল মনে হয়।

প্রথম সাতকর্ণি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। শাস্ত্রী মনে করেন যে, উত্তরভারতে শুঙ্গা সাম্রাজ্যশক্তিকে পরাজিত করে বিজয়োৎসব হিসেবে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পুরাণে তাঁর এই মতের সমর্থন মেলে। সেখানে আছে যে সাতকর্ণি শুঙ্গা-কণ্বদের অবশিষ্ট শক্তি চূর্ণ করেন। একাধিক কারণে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে এতে যেমন তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব সূচিত করে, তেমনই অন্যদিকে তিনি যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাও প্রমাণিত করে।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, প্রথম সাতকর্ণি সাতবাহন বংশের প্রথম শাসক, যিনি বিন্ধ্য-পরবর্তী অঞ্চলে এই শক্তিকে সার্বভৌম অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে গোদাবরী উপত্যকায় প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে, যা আয়তনে এবং শক্তিতে, গাঙ্গেয় উপত্যকার শুঙ্গা সাম্রাজ্যের এবং পাঞ্জাবে গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। তাঁর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈথান।

প্রথম সাতকর্ণির মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী অম্ভিয় বংশীয়া নাগনিকা (অথবা নায়নিকা) দুই নাবালক পুত্র বেদশ্রী এবং শক্তিশ্রীর (সাহিত্যের শক্তিকুমার) হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সাতবাহন বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন দ্বিতীয় সাতকর্ণি।

৪ক.৫.৫ দ্বিতীয় সাতকর্ণি

দ্বিতীয় সাতকর্ণি দীর্ঘ ৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। কারও কারও মতে তিনি শুঙ্গাদের কাছ থেকে মালব ছিনিয়ে নেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন *পেরিপ্লাস* বর্ণিত সানডারেস। তাঁর সময়েই সাতবাহনদের কল্যাণ বন্দর আর নিরাপদ ছিল না। *পেরিপ্লাস* থেকে জানা যায় যে কল্যাণগামী গ্রীক বাণিজ্য পোতকে সতর্ক প্রহরায় নর্মদা নদীর মোহানায় অবস্থিত বারিগাজায় (ভৃগুকচ্ছ, আধুনিক ব্রোচ) ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। *পেরিপ্লাস*-এ বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় মনে হয় শক-ক্ষত্রপ নহপাণের অপরন্ত (উত্তর কঙ্কন) জয়ের ফলে তা সৃষ্ট হয়েছিল।

পৌরাণিক তালিকায় প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির মধ্যবর্তী অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অনেকে সাতবাহন বংশের ভিন্ন শাখার মানুষ ছিলেন বলে মনে হয়। অন্য উপাদান থেকে মাত্র তিন জন শাসকের, আপিলক, কুন্তল সাতকর্ণি এবং হালের নাম পাওয়া যায়। মনে হয় এঁরা কেউই মূল সাতবাহন পরিবারভুক্ত ছিলেন না। আপিলক বোধহয় মধ্যপ্রদেশের কোন একটি শাখার মানুষ ছিলেন। অপর দুই জন ছিলেন কুন্তলের। হালের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনি প্রাকৃত ভাষায় বিখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষ,

প্রধানত যৌন প্রেম বিষয়ক *গাথাসপ্তশতি* গ্রন্থের সঙ্কলক। সৌন্দর্য এবং লালিত্য এই গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে গ্রামীণ দৃশ্যাবলী এবং প্রাকৃত জনের বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন স্তবকের মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভাব্য ঐতিহ্য অনুসারে গুণাধ্যর *বৃহৎকথা* গ্রন্থটিও হালের রাজসভার জন্য লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থটি গ্রামীণ ভাষায় (পৈশাচীতে) রচিত। সোমদেবের *কথাসরিৎসাগর* এবং ক্ষেমেন্দ্রের *বৃহৎকথামঞ্জুরী* এই গ্রন্থের সংস্কৃত-রূপায়ণ।

সময়ের দিক থেকে প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্রের মধ্যে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। এই সময় সাতবাহনগণ ধীরে ধীরে পশ্চিম উপকূল থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ব উপকূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম সাতকর্ণি যাদের ভয় করতেন, সেই শকরাই সাতবাহনদের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এই শকরা পূর্ব ইরান থেকে এসে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। শক-ক্ষত্রপ নহপাণের অনেকগুলি মুদ্রা নাসিক অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে এই অঞ্চল তাদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। অনেকে বলেন যে, সাতবাহনের এই আপাত বিপর্যয়ের ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র অঞ্চলে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। তাই পরে তারা যখন পশ্চিম উপকূলে ফিরে এসেছিল, তখন তাদের পক্ষে দাক্ষিণাত্যের অর্ধাংশ, এক উপকূল থেকে আর এক উপকূল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল।

৪ক.৫.৬ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি

গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি নিঃসন্দেহে সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে দুইটি লেখ আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। একটি তাঁর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বৎসরে রচিত। এটি নাসিক লেখ নামে পরিচিত। অন্যটি চতুর্বিংশ বৎসরে মা গৌতমী বলশ্রীর সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখ নাসিক প্রশস্তি। গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর উনিশ বৎসর পরে তাঁর মা এই প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। সাতবাহন বংশের দুর্দিনে পুত্রহারা মা এখানে তাঁর পুত্রের অতীত কীর্তি কাহিনী স্মরণ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লেখর সংখ্যা খুব বেশি নয়। খারবেলের হাতিগুম্ফা-লেখ, রুদ্রদামনের জুনাগড়-লেখ, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-লেখর সঙ্গে এটি তুলনীয়।

কয়েকটি সূত্র থেকে গৌতমীপুত্রের রাজত্বকাল নির্ণয় করা সম্ভব। প্রথমত তিনি নহপাণের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন। এই ঘটনাটি খ্রিঃ ১২৪-১২৫ অব্দে ঘটেছিল মনে হয়। কেননা তার পরে নহপাণের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরও মনে হয় যে গৌতমীপুত্রের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে তিনি নহপাণকে পরাজিত করেছিলেন। কেননা এই বৎসরে রচিত নাসিক-লেখতে আছে যে, গৌতমীপুত্র নহপাণের জামাতা, নাসিক ও পুনা অঞ্চলের শাসক ঋষভদত্তের অধিকারভুক্ত জমি অন্যকে দান করেছিলেন। আরও জানা যায় যে, সাতবাহন সেনাবাহিনী যখন জয়লাভে তৎপর, তখন একটি সামরিক ছাউনি থেকে এই দানপত্রটি প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গৌতমীপুত্র নিজে তখন নাসিক অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং এইসব ঘটনা যে নহপাণের সঙ্গে তাঁর শেষ সংগ্রামকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। খ্রিঃ ১২৪-২৫ অব্দ যদি গৌতমীপুত্রের রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসর হয়, তাহলে খ্রিঃ ১০৬ অব্দে তাঁর রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তাঁর শেষ লেখটি রাজত্বকালের চতুর্বিংশ বৎসরে রচিত হয়েছিল। মনে হয় তখন তিনি

পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন কেননা এই লেখটি গৌতম বলশ্রীর সঙ্গো যুক্তভাবে রচিত হয়েছিল। এর পরে তিনি আর বেশিদিন বাঁচেন নি। সুতরাং তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিঃ ১০৬-১৩০ অব্দ। ডঃ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন যুক্তি সহকারে দেখিয়েছেন যে, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির ২৪ বৎসরের রাজত্বকালের বেশিরভাগ ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে। তবে এমনও হতে পারে যে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে রাজত্ব করেন এবং গৌতমীপুত্র নহপপাণের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

গৌতমীপুত্র মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ পুনরুদ্ধার করে সাতবাহন বংশের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'সাতবাহন-কুল-যশঃ-প্রতিষ্ঠাপনকর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুনরুদ্ধার তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হলেও, একমাত্র কৃতিত্ব নয়। নাসিক প্রশস্তিতে তিনি যে অঞ্চলগুলি শাসন করতেন, তাদের নামের বিস্তৃত তালিকা আছে। এই নামগুলি হল ঃ আসিক (মহারাষ্ট্র), মলক (পৈথানের পার্শ্ববর্তী), সুরথ (কাথিয়াবাড়), কুকুর (উত্তর কাথিয়াবাড়), অনুপ (নর্মদাতীরে মাহিশ্মতী), বিদর্ভ (বেরার), আকর (পূর্ব মালব) এবং অবন্তী (পশ্চিম মালব)। এ ছাড়া এই প্রশস্তিতে তাঁকে বিন্ধ্য পর্বত থেকে মলয় পর্বত (ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়) পর্যন্ত এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি বলা হয়েছে। এ থেকে ডঃ সরকার মনে করেন যে, তিনি বিন্ধ্য-পরবর্তী সমগ্র ভূভাগের উপর তাঁর সার্বভৌমত্য দাবি করতেন। তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে প্রচারিত নাসিক লেখতে কানাড়া অঞ্চলে বেজয়ন্তী অন্তর্ভুক্তির বিশেষ উল্লেখ আছে।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, এই তালিকায় দুইটি প্রত্যাশিত নাম নেই। নাম দুটি হল অন্ধ্র এবং দক্ষিণ কোশল। লেখ এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই দুটি অঞ্চল কোন-না-কোন সময় সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির পুত্র পুলুমায়ি প্রথম সাতবাহন শাসক, যাঁর লেখ এখানে পাওয়া গেছে। গৌতমীপুত্র দাবি করেছেন যে তাঁর সৈন্যদল তিনটি সমুদ্রের (আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর) জল পান করেছিলেন (তি-সমুদ্র-তোয়-পীত বাহন)। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, এই দাবির মধ্যে তাঁর এই অঞ্চলের উপর আধিপত্যের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ডঃ কে. গোপালাচারি বলেছেন যে, গৌতমীপুত্রের অধিকৃত স্থানসমূহের মধ্যে মহেন্দ্র (মহানদী এবং গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতমালা) এবং চকোরের (পূর্বঘাট পর্বতমালার দক্ষিণভাগ) উল্লেখ আছে। এ থেকে কলিঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ যে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে 'শক-যমন-পল্লব-নিসূদন' অর্থাৎ ধ্বংসকারী বলা হয়েছে। পল্লবগণ ছিল পার্থিয় এবং যবনগণ, গ্রীক। তাদের সঙ্গো গৌতমীপুত্রের সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। শকদের সঙ্গো তাঁর সংগ্রামের রেখাচিত্র শকদের প্রসঙ্গো দেওয়া হয়েছে। জোগালথেম্বিতে প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে এই সংগ্রামের পরিণতির কথা জানা যায়। সেখানে নহপাণের যে অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে, দেখা যায় যে, তার দুই-তৃতীয়াংশ গৌতমীপুত্র কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এ থেকে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, নহপাণ গৌতমীপুত্রের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। ডঃ গোপালাচারি মন্তব্য করেছেন যে, গৌতমীপুত্রের এই সাফল্য সাতবাহনদের উচ্চাশাকে অতিক্রম করেছিল। নাসিক লেখতে যে স্থানগুলির উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে অপরান্ত, অনুপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, আকর এবং অবন্তী, এই জয়ের ফলে গৌতমীপুত্র লাভ করেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে এর দ্বারা উত্তর দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অংশবিশেষ বিদেশী শাসনমুক্ত হয়েছিল।

এই জয়লাভকে চিহ্নিত করার জন্য গৌতমীপুত্র গোবর্ধন জেলায় (নাসিক) বেনাক টক নগর নির্মাণ করেন এবং শকদের অনুকরণে আড়ম্বরপূর্ণ অভিধা (রাজরাজ এবং মহারাজ) গ্রহণ করেন।

গৌতমীপুত্রের এই জয়লাভ স্থায়ী হয়নি। শকদের অন্যতম শাখা, ক্ষহরত শাখার নহপাণকে তিনি পরাজিত করেন, কিন্তু অপর একটি শাখা, কার্দমক শাখা তাকে পরাজিত করে। এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা চষ্টন গৌতমীপুত্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর পৌত্র রুদ্রদামন খ্রিঃ ১৩০ অব্দে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য শুরু করেন। তার আগে তিনি চষ্টনের সহকর্মীরূপে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত হন। মনে হয় এই অবস্থায় তিনি গৌতমীপুত্রকে পরাজিত করেছিলেন। রুদ্রদামনের এই জয়লাভের প্রমাণ টলেমির গ্রন্থে এবং জুনাগড় লেখতে পাওয়া যায়। টলেমি প্রতিষ্ঠানকে (পৈথান) পুলুমায়ির রাজধানী এবং উজ্জয়িনীকে চষ্টনের রাজধানী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে চষ্টনের শাসনকালে মালব কার্দমক শকগণের অধিকারে ছিল এবং তাঁর পৈতৃক সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের উপর পুলুমায়ির কোন অধিকার ছিল না। খ্রিঃ ১৫০ অব্দে জুনাগড় লেখতে রুদ্রদামনের অধিকারভুক্ত স্থানগুলির উল্লেখ আছে। এই স্থানসমূহের মধ্যে আকর, অবন্তী, অনুপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত ইত্যাদির নাম নাসিক-প্রশস্তিতেও ছিল। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, এই স্থানগুলি তিনি সাতবাহনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং সাতবাহনশাসক তখন গৌতমীপুত্র ভিন্ন অন্য কেউ ছিলেন না। এই সমূহ বিপদের সময় গৌতমপুত্র তাঁর অধিকৃত কিছু অঞ্চল রক্ষা করার জন্য তাঁর অন্যতম পুত্র, বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণির (খুব সম্ভব পুলুমায়ির সৎ ভাই) সঙ্গে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কানহেরি (অপরান্তে) লেখতে এই বিবাহ সম্পর্কে আভাস আছে। এই বিবাহ গৌতমীপুত্রের বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। অনেকে কিন্তু এই বিবাহ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, বর্ণসঙ্করের বিরোধী সাতবাহনদের শক পরিবারের সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপন একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা। এ থেকে বোঝা যায় যে তখন জাতিভেদ ব্যবস্থা সম্পর্কে কথায় ও কাজে বিশেষ মিল ছিল না। অবশ্য এই বিবাহ প্রকৃতপক্ষে সাতবাহনের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছিল কিনা সন্দেহ। কেননা, জুনাগড় লেখতে আছে যে, রুদ্রদামন দাক্ষিণাত্যের অধিপতি সাতকর্ণিকে দুইবার পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু কুটুম্ব বলে তাঁর রাজ্য গ্রাস করেন নি। এই সাতকর্ণি কে ছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, এই সাতকর্ণি নিশ্চয়ই গৌতমীপুত্র কেননা বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি রুদ্রদামনের জামাতা ছিলেন। অন্য মতে, তিনি জামাতার ভাই-ও হতে পারেন। র‍্যাপসন মনে করেন যে, এই পরাজিত সাতবাহন নৃপতি ছিলেন পুলুমায়ি।

ডঃ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে, গৌতমীপুত্রের পরবর্তী বিপর্যয় সম্পর্কিত ধারণা ঠিক নয়। এই মত দুইটি ধারণার উপর নির্ভরশীল। একটি ধারণা এই যে, রুদ্রদামন যে সাতকর্ণিকে দুইবার পরাজিত করেন, তিনি গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি। দ্বিতীয়ত, রুদ্রদামন এবং চষ্টনের অন্ধাউ লেখ রচনাকালে অর্থাৎ ১৩০ খ্রিস্টাব্দে শকগণ সাতবাহন রাজ্যের বৃহৎ অংশ জয় করেছিলেন। এর উত্তরে ডঃ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, কানহেরি লেখ অনুসারে বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণির মহিষী মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যা ছিলেন। সুতরাং পুলুমায়ির পরবর্তী শাসক বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি রুদ্রদামনের আত্মীয় ছিলেন এবং স্পষ্টত তিনি অর্থাৎ বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি পরাজিত হয়েছিলেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি হননি, কেননা

তাঁর রাজত্ব ১৩০ খ্রিস্টাব্দের আগেই শেষ হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে পুলুমায়ি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করেন এবং সম্ভবত, তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী শাসক ছিলেন বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি। দ্বিতীয়ত, ১৩০ খ্রিস্টাব্দের অন্ধাউ লেখ থেকে জানা যায় যে, শুধুমাত্র অন্ধাউ (কচ্ছ) অঞ্চলের উপর চষ্টন গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সাতবাহন রাজ্যের বৃহৎ অংশের উপর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১১ বৎসরে, অর্থাৎ ৮৯ (১১+৭৮) খ্রিস্টাব্দ থেকে অন্ধাউ চষ্টনের অধিকারে ছিল। এই অঞ্চল একদা গৌতমীপুত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং এমন হতে পারে যে, ৮৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি এই অঞ্চল শাসন করতেন। তৃতীয়ত, তিনি বলেন যে, নহপাণের সম্বৎসরের সঙ্গে শকাব্দের কোন যোগ ছিল না। তাঁর ৪৬ বৎসর, যার সঙ্গে ৭৮ যোগ করে, ১২৪ খ্রিস্টাব্দ তাঁর রাজত্বের শেষ উল্লিখিত তারিখ মনে করা হয়, সেটি হয়তো শুধু তাঁর ৪৬ বৎসর বোঝায়। পেরিপ্লাস থেকে জানা যায় যে, নহপাণের সঙ্গে কুষাণদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং শকাব্দ অথবা কনিষ্কের অব্দ ব্যবহারের তাঁর কোন কারণ ছিল না।

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র শুধু যোদ্ধারূপে চিত্রিত হননি, সংস্কারক রূপেও চিত্রিত হয়েছেন। ডঃ গোপালাচারি বলেছেন যে, যোদ্ধা হিসাবে তিনি বড় ছিলেন, কিন্তু শান্তির কাজে তিনি ছিলেন আরও বড়। নাসিক প্রশস্তিতে আছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্প এবং মান চূর্ণ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ এবং নিম্নতম শ্রেণীর স্বার্থের উন্নতি বিধান করেছিলেন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ বন্ধ করেছিলেন। ডঃ গোপালাচারি শেষ বক্তব্যটি পুরোপুরি মেনে নেননি। তিনি বলেছেন যে, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষিত হলেও কর্মভিত্তিক উপ-জাতি গঠন বন্ধ করা যায়নি। গৌতমীপুত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও, বৌদ্ধদের প্রতি অতি উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। কার্লে, নাসিক প্রভৃতি স্থানের বিহারবাসীদের তিনি ভূমি এবং গুহা দান করেছিলেন। অবশ্য তাঁর সব দানই একশ্রেণীর বৌদ্ধদের (মহাসঙ্ঘিকগণ) জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ডঃ গোপালাচারি বলেছেন যে, তাঁর শাসনের ভিত্তি ছিল শাস্ত্রীয় বিধান এবং মানবতাবোধ। তাঁর করব্যবস্থায় এই বোধ প্রতিফলিত হয়েছিল।

৪ক.৫.৭ পুলুমায়ি

স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর এবং তাঁর পুত্র, ডঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, গৌতমীপুত্র এবং পুলুমায়ি যুগ্মভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

পুরাণ অনুসারে বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ি ২৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ডঃ রায়চৌধুরী কারলে লেখর উল্লেখ করে বলেছেন যে, সেখানে তাঁর রাজত্বকাল ২৪ বৎসর বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁর মতে পুলুমায়ির রাজত্বকাল খ্রিঃ ১৩০-১৫৪ অব্দ। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে তিনি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করেন।

সাতবাহনদের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লেখতে পুলুমায়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনিই এই বংশের প্রথম রাজা যাঁর লেখ পূর্ব দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গেছে। তাঁর লেখগুলি নাসিক, কারলে (পুণা) এবং অমরাবতীতে (কৃষ্ণা জেলা) পাওয়া গেছে। সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের উপর তাঁর অধিকার ছিল না। কিন্তু অমরাবতীতে প্রাপ্ত লেখ থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণা নদীর মোহানা পর্যন্ত সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত করে তিনি এই ক্ষতি আংশিক পূরণ করেছিলেন। সমগ্র কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল এবং মহারাষ্ট্র তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেলারি জেলার একটি তালুকেশ্রী পুলুমায়ির একটি লেখ পাওয়া গেছে। তাই কারও কারও মতে তিনি বেলারি জেলা অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ডঃ রায়চৌধুরী এই লেখতে পুলুমায়ির নামের সঙ্গে 'বাশিষ্ঠীপুত্র' কথাটি না থাকায়,

তিনি প্রকৃতপক্ষে বাশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ি ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। করমণ্ডল উপকূলে পুলুমায়ির কয়েকটি মুদ্রায় দ্বিমাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজের চিত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণে এই উপকূলেও তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করেছিল। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, লেখর সমর্থন না থাকায়, শুধুমাত্র মুদ্রায় উপর নির্ভর করে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে এই মুদ্রা নিঃসন্দেহে তৎকালীন নৌবহর এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের আভাস দেয়। তাহলে বলা যায় যে গৌতমীপুত্র এবং বাশিষ্ঠীপুত্রের সময় দাক্ষিণাত্য, উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে শুধু রাজনীতিতে নয়, ব্যবসা এবং ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও প্রকৃত যোগসূত্র হয়ে ওঠে।

তাঁরও রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান। এখানে তিনি নবনগর নির্মাণ করেন। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তুপটির আয়তনও তাঁর সময় বাড়ানো হয়।

পুলুমায়ির পর শিবশ্রী এবং পরে শিবস্কন্দ রাজা হন। ডঃ গোপালাচারি লিখেছেন যে, শিবশ্রীর সময় শকদের সঙ্গে সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হয় এবং এর ফলে সাতবাহনগণ অনুপ এবং অপরান্তের উপর তাঁদের অধিকার হারান। শিবস্কন্দ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৪ক.৫.৮ যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি

সাতবাহন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিঃ ১৬৫-১৯৪ অব্দ। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারে, উভয় দিকে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে নাসিক কানহেরি এবং কৃষ্মা জেলার চীন-গঞ্জামে তাঁর লেখগুলি পাওয়া গেছে। মাদ্রাজের কৃষ্মা-গোদাবরী জেলায়, মধ্যপ্রদেশের চন্দ জেলায়, বেরার, উত্তর কঙ্কন, বরোদা এবং কাথিয়াবাড়ে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনি মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র শাসন করতেন। শকদের কাছ থেকে তিনি অপরান্ত পুনরুদ্ধার করেন। সোপারায় (প্রাচীন সূর্পরক, অপরান্তের রাজধানী) তাঁর যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি এর অন্যতম প্রমাণ। এই মুদ্রায় শকমুদ্রার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সাতবাহনদের সব মুদ্রার মধ্যে একমাত্র যজ্ঞশ্রীর মুদ্রাতেই রাজার মাথা পাওয়া গেছে। পশ্চিম ভারতের শকদের মুদ্রার এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অপরান্ত ছাড়া যজ্ঞশ্রী শকদের পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষ এবং নর্মদা উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করেন। রুদ্রদামনের পরে শকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই তাঁর এই সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। তার মুদ্রায় অঙ্কিত জাহাজের চিত্র থেকে অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রের উপর তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। সাতবাহন বংশের তিনিই শেষ শাসক, যিনি যুগপৎ পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল শাসন করতেন। তাঁর পরেই সাতবাহন সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ও পতন ঘটে।

বয়সের ভারে এবং ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য সাতবাহন শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাও একে দুর্বল করেছিল। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির রাজত্বের শেষ দিকে এই দুর্বলতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবিরগণ তখন নাসিক অঞ্চল তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ডঃ গোপালাচারি মাধরিপুত স্বামী সকসেনকে যজ্ঞশ্রীর উত্তরাধিকারীরূপে উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী সাতবাহন শাসকদের মধ্যে বিজয়, চন্দ্রশ্রী এবং পুলমায়ির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাতবাহন সাম্রাজ্য পরিণামে কীভাবে ভেঙে পড়েছিল, তার আভাস অকোলায় প্রাপ্ত সাতবাহনদের বহুসংখ্যক মুদ্রা এবং নাগার্জুনিকোণ্ডে প্রাপ্ত ইক্ষাকুবংশের বিভিন্ন লেখ থেকে পাওয়া যায়। মনে হয় পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বংশ এই বৃহৎ সাম্রাজ্যকে তাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। সাতবাহনদের একটি শাখা উত্তরাঞ্চল অধিকার করেছিল। পশ্চিমে আভিরগণ নাসিক এলাকা অধিকার করেছিল। পূর্বে, কৃষ্ণা-গুন্টুর অঞ্চলে ইক্ষাকুগণ একটি রাজ্য গড়ে তুলেছিল। চুটুগণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দখল করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার রাজনৈতিক শূন্যতা পল্লবগণের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এইভাবে নন্দ বংশের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তার অবসান হয়েছিল।

৪ক.৫.৯ সাতবাহনদের রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা

গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণি এবং বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির সরকারি দলিল এবং ব্যক্তিগত বৌদ্ধ নথিপত্র থেকে বৃহৎ সাতবাহন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা জানা যায়। তবে এসবের পরিপূরক অথবা সমর্থকরূপে কোন সাহিত্য গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।

ডঃ গোপালচারি সাতবাহন রাষ্ট্রকে 'পুলিশ রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ধর্মনিরপেক্ষ সামরিক রাষ্ট্রের মতো, সাতবাহন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জটিল ছিল না। এটা ছিল সহজ সরল। ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিধান এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সাতবাহন রাজারা মাতৃপরিচয় দ্বারা চিহ্নিত হলেও এই রাজতন্ত্র ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং বংশানুক্রমিক। রাজপরিবারে বহু বিবাহের প্রচলন থাকলেও সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিতর্ক, ভ্রাতৃবিরোধ অথবা সাম্রাজ্য বিভাগের কাহিনী সাতবাহনদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেনি। সাতবাহন রাজারা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইন্দো-গ্রীক অথবা কুষাণদের মতো সাম্রাজ্যিক অভিধা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা দৈব অধিকার দাবি করেন নি। তাঁরা সামান্য 'রাজন' অভিধাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কেন ছিলেন, তার ব্যাখ্যাও অনেক দিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, স্থানীয় নৃপতিদের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ হয়তো এমন ছিল না, যাতে তাঁরা সাম্রাজ্যিক অভিধা নিতে পারতেন। নীতিগতভাবে সাতবাহন রাজারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু কার্যত তাঁদের ক্ষমতা দেশাচার এবং শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁদের সমাজশৃঙ্খলার রক্ষক মনে করা হত।

রাজা হয় রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগরীতে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতেন। তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়করূপে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলকে নেতৃত্ব দিতেন। অনেক সময় যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করতেন।

রাজপুত্রদের সকলকে 'কুমার' আখ্যা দেওয়া হত। চেত বংশের শাসনে তাদের 'যুবরাজ' বলা হত এবং তাদের দেশশাসনের সঙ্গে যুক্ত করা হত। সাতবাহনদের মধ্যে এই রীতির প্রচলন ছিল না। কিন্তু মৌর্য যুগের মতো তাঁরা প্রদেশ শাসনের কাজে নিযুক্ত হতেন। রাজার মৃত্যুর সময় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক হলে, রাণী-মা অথবা মৃত রাজার ভাই দেশশাসন করতেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর সামন্ত নৃপতিগণ সাতবাহনদের রাষ্ট্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সাধারণভাবে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে এঁরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ, তাঁরা 'রাজা' উপাধি গ্রহণ এবং নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন করতেন। কোলাপুরে এবং উত্তর কানাড়া অঞ্চলে এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এদের পরে স্থান ছিল মহারথীদের এবং মহাভোজদের। ডঃ গোপালাচারি বলেছেন যে, রথিক এবং ভোজগণ যুদ্ধে সাতবাহনদের সাহায্য করেছিল এবং তারই পুরস্কার হিসেবে এই নামের পদের সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুইটি

পদবীই বংশানুক্রমিক এবং কয়েকটি স্থান ও পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষভাবে বোম্বাই ও উত্তর মহীশূরের থানা ও কোলাবা জেলায় এদের সাক্ষাৎ মেলে।

ক্রমবর্ধমান সাতবাহন সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য পরবর্তীকালে মহাসেনাপতি এবং মহাতালবর, এই দুইটি সামন্ত পদবীর সৃষ্টি হয়। বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির রাজত্বকালে রচিত নাসিক লেখতে সর্বপ্রথম মহাসেনাপতি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর পরবর্তী রাজাদের লেখতে দুইবার এই পদের উল্লেখ আছে। একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা নথিপত্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হতেন। শেষ সাতবাহন রাজার সময় জনৈক মহাসেনাপতি জনপদের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে তাঁরা দূরবর্তী প্রদেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত হতেন। আবার অনেকে কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁরাও রাজপরিবারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতেন। এইভাবে রাজবংশের প্রতি তাঁদের আনুগত্যকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালানো হত। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে স্বনামে মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তাঁদের আনুগত্য লাভ সর্বদা সম্ভব হয়নি। সাতবাহন সাম্রাজ্যের ভাঙন পর্বে এই সামরিক শাসনকর্তা এবং সামন্ত নৃপতিগণ নিজ মূর্তি ধারণ করেছিলেন। অন্ধ্রদেশের সামন্ত পরিবার সালংকায়নগণ পরে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে পল্লবগণ নিঃসন্দেহে বেলারি জেলার সামরিক শাসকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শাসন কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে গামিকর অধীন গাম (গ্রাম)। এই গ্রামই ছিল রাজস্ব এবং সৈন্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। মনে হয় সেই সময় শাসনব্যবস্থায় যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল, তা উপরের স্তরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামগুলিকে তা স্পর্শ করেনি। সাতবাহন যুগের অন্য যে কর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ভাণ্ডারিক (ভাণ্ডার রক্ষক), নিবন্ধকার (দলিল নথিভুক্তকরণ সম্পর্কিত) দূতক এবং হেরাণিক (কোষাধ্যক্ষ) উল্লেখযোগ্য।

সে যুগে সরকারের আর্থিক অবস্থা ছিল দিন আনা দিন খাওয়া গৃহস্থের মতো। করের সংখ্যা পরিমাণ, কোনটাই খুব বেশি ছিল না। রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল রাজকীয় জমি, ভূমি-কর, লবণ উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার, আদালতে দেয় অর্থ এবং জরিমানা। সৈন্য এবং সরকারি কর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করতেন। অনেক সময় দ্রব্যের মাধ্যমে কর দেওয়া হত।

সাতবাহন নথিপত্রে বাতক (উদ্যান) এবং ক্ষেত্র সম্পর্কে পরিহার অথবা অব্যাহতি দানের যে কথা বলা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে সাধারণভাবে কৃষকদের জীবন খুব সুখের ছিল না। বলা হয়েছে যে, এইসব উদ্যানে অথবা ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা প্রবেশ করতে পারবে না, লবণের জন্য সেগুলি খনন করা চলবে না, জেলাপুলিশ সেগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে না। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, অন্যত্র কৃষকের জমিতে অনুরূপ নিরাপত্তা ছিল না। সেখানে সরকারের স্বার্থ এবং সরকারি কর্মচারীরা নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করত।

৪ক.৫.১০ সমাজ ও ধর্ম

সাতবাহনগণ ব্রাহ্মণ-প্রধান চতুর্বর্ণ সমাজ শাসন করলেও মনে হয় যে সে যুগে জাতিভেদের কঠোরতা বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। গৌতমীপুত্র নিজেকে 'এক ব্রাহ্মণ' বলে অভিহিত করলেও তিনি আজীবন ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করেছিলেন। সাতবাহন বংশের সঙ্গে শকদের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। এ যুগে একদিকে যেমন উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের উপর আরোপিত হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে আদিম উপজাতি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হিন্দু সাতবাহনগণ বৈদিক ধর্ম পালন করতেন। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এই বংশের রাজারা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রচুর সংখ্যক, গরু, ঘোড়া, হাতি, রথ, ইত্যাদি দান করতেন। নানাঘাট লেখতে তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বাসুদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র ইত্যাদি তাঁদের উপাস্য দেবতা ছিল। গাথাসপ্তশক্তিতে ইন্দ্র, কৃষ্ম, পশুপতি এবং গৌরী পূজার কথা পাওয়া যায়। শিবপালিত, বিষ্মুপালিত ইত্যাদি নাম শিব এবং বিষ্মু পূজার আভাস দেয়। এইভাবে বলা যায় যে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় দক্ষিণে এসেছিল।

সমগ্র সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসারলাভ হয়েছিল। সাতবাহন রাজা প্রথম দিকে এই ধর্মকে শুধু সহ্য করেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে তাঁরা সক্রিয়ভাবে এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিভিন্ন লেখ, অসংখ্য গুহা এবং বৌদ্ধস্তূপ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গুহাগুলি পশ্চিম বাণিজ্যপথ বরাবর নির্মিত হয়েছিল। সাতবাহনদের দ্বিতীয় রাজধানী জুন্নারকে ঘিরে অন্ততপক্ষে ১৩৫টি গুহা নির্মিত হয়েছিল। অমরাবতী, ঘন্টশাল ইত্যাদি স্থানে বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়েছিল। পুণার নিকটবর্তী ভাজার গুহাটি দাক্ষিণাত্যে প্রাচীনতম। এইভাবে গুহানির্মাণ থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে গুহামন্দির বা চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কার্লের চৈত্যটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের গায়ে ১২৪ ফুট গভীরতা সৃষ্টি করে এটি নির্মিত হয়েছিল। সাধারণভাবে এই পরিকল্পনা পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য গুহার মতো হলেও আয়তনে এবং জাঁকজমকে এটি অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর স্তম্ভগুলি আর আগের মতো সহজ ছিল না। সেগুলি গুরুভার এবং অলঙ্কারবহুল হয়েছিল। এই চৈত্যটিকে জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে সুন্দরতম বলা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে, অথবা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি রচিত হলেও, দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় ছিল খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী। এই সময় শক-ক্ষত্রপ এং সাতবাহনগণ নাসিকে বৌদ্ধবিহার নির্মাণের এবং নাকি এ কার্লের গুহায় বসবাসকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য অর্থ, ভূমি এবং গ্রাম দানের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই কাজ শুধু শাসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সামন্ত, নৃপতি, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রভৃতি সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমের সঙ্গে বাণিজ্য তখন সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসারলাভ ঘটেছিল। তার ফলেই বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে এই কাজ সম্ভব হয়েছিল। পূর্ব দাক্ষিণাত্যে অমরাবতী এবং অন্যান্য স্থানের স্তূপগুলি প্রধানত এই ব্যক্তিগত উদ্দীপনার ফসল। সাতবাহন যুগের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং বুদ্ধমূর্তির পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, লাঙল ব্যবহারকারী গ্রামগুলির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে আংশিকভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব অনিবার্য ছিল এবং সাতবাহন রাজ্যেও তার ব্যতিক্রমও ঘটেনি। শেষ দিকের সাতবাহন রাজারা কুষাণদের অনুকরণে যুবরাজদের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, নানাভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এই রাজারা উত্তর ভারতের শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে আনুমানিক ১৪০ খ্রিস্টাব্দের ম্যাকাদনি লেখর উল্লেখ করা হয়। এই লেখতে পুলুমায়ির রাজত্বকালে জনৈক গৃহস্থ কর্তৃক একটি জলাধার নির্মাণের উল্লেখ আছে। এই গৃহস্থের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি মহাসেনাপতি খামকন্দকের সাতবাহনিহার জনপদের অন্তর্গত সেনাপতি (গুমিক) কুমার দত্তের ভেপূরক গ্রামের

বাসিন্দা ছিলেন। এই লেখ থেকে গ্রামটি কোন অর্থে সেনাপতির এবং জনপদটি কোন অর্থে মহাসেনাপতির অধীনে ছিল জানা না গেলেও, তাদের নামোল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা একদিকে রাজা, অন্যদিকে গৃহস্থের মধ্যে প্রত্যক্ষভবে সেতু রচনা করেছিল।

৪ক.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ব্যাকট্রিয় গ্রীক শাসকদের মধ্যে মিনান্দারের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। সুরাষ্ট্রের ক্ষহরত ক্ষত্রপ নৃপতি নহপাণের রাজত্বকালের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

৩। কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৪। রাজ্যবিজেতা ও শাসকরূপে গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণির কৃতিত্ব নিরূপণ করুন।

৪ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী ঃ *এ কম্‌প্রিহেনসিভ্ হিস্ট্রি অফ্ ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৭); এ হিস্ট্রি অফ সাউথ ইন্ডিয়া (১৯৬৬)*

২। ডবলু. ডবলু. টার্ন ঃ *দি গ্রীকস্ ইন ব্যকট্রিয় এ্যান্ড ইন্ডিয়া (১৯৩৮)*

৩। বি. এন. মুখার্জী ঃ *দি রাইজ এ্যান্ড ফল্ অফ্ দি কুশান এম্পায়ার (১৯৮৮)*

৪। এ. এন. লাহিড়ী ঃ *করপাস্ অফ্ ইন্ডো-গ্রীক কয়েনস্ (১৯৬৫)*

৫। ভাস্কর চ্যাটার্জী ঃ *দি এজ্ অফ্ দি কুশানস্, এ নিউমিসম্যাটিক্ স্টাডি (১৯৬৭)*

একক ৪খ ❑ উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান, সম্প্রসারণ, অবনতি ও পতন; দক্ষিণ ভারতে বকাটক সাম্রাজ্যের ইতিহাস

গঠন

৪খ.০ উদ্দেশ্য

৪খ.১ প্রস্তাবনা

৪খ.২ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান

৪খ.২.১ গুপ্তদের উত্থান

৪খ.২.২ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

৪খ.২.৩ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ : সমুদ্রগুপ্ত

৪খ.২.৪ রামগুপ্ত

৪খ.২.৫ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

৪খ.২.৬ পরবর্তী গুপ্তরাজাগণ : প্রথম কুমারগুপ্ত

৪খ.২.৭ ঘটোৎকচগুপ্ত ও সম্ভাব্য ভ্রাতৃবিরোধ

৪খ.২.৮ স্কন্দগুপ্ত

৪খ.৩ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

৪খ.৪ গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

৪খ.৫ দক্ষিণ ভারতের বকাটক সাম্রাজ্য

৪খ.৬ সারাংশ

৪খ.৭ অনুশীলনী

৪খ.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান কীভাবে ঘটেছিল
- গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্তের শাসনকাল থেকে শুরু করে কীভাবে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে এই সাম্রাজ্যের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটল

- পরবর্তী দুই উল্লেখযোগ্য গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থা এবং হূণ আক্রমণ
- স্কন্দগুপ্ত-পরবর্তী অধ্যায়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ও পতনের কারণসমূহ
- গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার নানা বৈশিষ্ট্য
- সাতবাহন পরবর্তী অধ্যায়ের দক্ষিণ ভারতের বকাটক সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

৪খ.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আপনাদের জন্যে আলোচিত হবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পুনরায় উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করে কীভাবে আরেকটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের পত্তন হল তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। নানা কারণে মৌর্যযুগের পর গুপ্তযুগ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ছোট হলেও মৌর্য সাম্রাজ্যের অনুপাতে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরও দীর্ঘায়ু হয়েছিল। গুপ্তযুগে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আজও অস্তিত্ব অটুট গুপ্তযুগে তার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল। গুপ্তযুগের রাজসভার ভাষা হিসাবে প্রাকৃতের স্থান নিয়েছিল সংস্কৃত। এই সংস্কৃত ভাষা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাহন হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে পূর্ব-উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত ঘটেছিল। গুপ্ত বংশের প্রথম দুই শাসক শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত কোন উচ্চতর অভিধা গ্রহণ করেন নি। এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য পশ্চিমে প্রয়াগ ও অযোধ্যা ও পূর্ব মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গুপ্তবংশীয় তৃতীয় সম্রাট 'মহারাজাধিরাজ' প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বৈশালীর লিচ্ছবি বংশীয়া রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করে তিনি গুপ্তদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বহুলাংশে বর্ধিত করেছিলেন, কারণ এর ফলে দক্ষিণ বিহারের মহামূল্য খনিগুলির উপর গুপ্তদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে সমগ্র বিহার, সমতট বাদে সমগ্র বঙ্গদেশ ও বারাণসী পর্যন্ত পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করে নিজেকে 'একরাট' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এজন্য আর্যাবর্তের রাজ্যগুলিকে তিনি সরাসরি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ নীতির অবতারণা করেছিলেন। এগুলি ছিল যথাক্রমে গ্রহণ অর্থাৎ শত্রুকে বলপূর্বক বন্দী করা, মোক্ষ অর্থাৎ শত্রুকে মুক্তিদান করা এবং অনুগ্রহ অর্থাৎ পরাজিত শত্রুকে অনুগ্রহপূর্বক তার হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করার নীতি। সমুদ্রগুপ্তের সফল বিজয়াভিযানের বিস্তারিত বিবরণ গ্রথিত হয়েছিল হরিষেণ বিরচিত বিখ্যাত এলাহাবাদ স্তম্ভলেখে যা হরিষেণ প্রশস্তিরূপে প্রসিদ্ধ। এই প্রশস্তিতে বিজিত রাজাদের চারটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক কেমন ছিল তাও এখানে বর্ণিত হয়েছিল। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে শক-কুষাণগণের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপগুলিও সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক প্রভাবপুষ্ট হয়েছিল। এই বিশাল সৃষ্টি করার পর সমুদ্রগুপ্ত একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কৌটিল্যের

নীতি অনুসরণ করে তিনি সকল শ্রেণীভুক্ত বিজিত রাজ্যগুলির উপর সমানভাবে সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব করতে প্রয়াসী হন নি। এর থেকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার সমুদ্রগুপ্ত শুধু যোদ্ধা বা সফল রাজনীতিবিদই ছিলেন না, ছিলেন মানবিক গুণের আধার। বিদ্যোৎসাহী, শস্ত্রতত্ত্বে পারঙ্গম সমুদ্রগুপ্ত কবিতা রচনা করেছিলেন এবং সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পর প্রায় ৭৫ বছরের জন্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রামগুপ্তের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান ও সম্প্রসারণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের ভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও আচার বিশিষ্ট শকদের বিরুধ্বে তিনি এক শক্তিশালী সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন এবং শকদের পরাজিত করে সুরাষ্ট্র ও গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হরিষেণের মতো কোন প্রশস্তি রচয়িতা ছিলেন না। তবে বিভিন্ন মুদ্রা থেকে তাঁর শারীরিক শক্তি, মানসিক উৎকর্ষ, শিল্পরুচি ও ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কতকগুলি মুদ্রায় দেখা যায় যে তিনি 'সিংহ বিক্রম' অভিধা করেছিলেন। আবার কোন কোন মুদ্রায় তিনি নিজেকে বিক্রমাঙ্ক অথবা বিক্রমাদিত্যরূপে বর্ণনা করেছিলেন। এই অভিধাটি থেকে অনেকে তাঁকে লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্যের সঙ্গো অভিন্ন বলে মনে করেছেন। এই অনুমান ঐতিহাসিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হলেও, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দ্বারা চিহ্নিত নতুন যুগের পুরোধা পুরুষরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর প্রথম কুমারগুপ্ত গুপ্তসম্রাট হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্য বিজেতা হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ না হলেও, তিনি একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে এই সাম্রাজ্যের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ঐতিহাসিকেরা মনে করেছেন যে চূড়ান্ত অবনতি শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁর রাজত্বকালেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌরবের উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছিল।

গুপ্তবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। হূণ আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে বিবেচিত হয়। তাঁর ভিতারি স্তম্ভলেখ থেকে জানা যায় যে তিনি পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করেছিলেন এবং হূণদের সঙ্গো কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। শুধু যুদ্ধই নয়, সাম্রাজ্য শাসনেও যে তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল, তার পরিচয় বহন করে জুনাগড় শিলালেখ। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তর মৃত্যুর পর থেকেই এই সাম্রাজ্যের ভাঙন পর্বের সূচনা হয়েছিল।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে একদা সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁদের প্রতিভাবলে যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে তা দ্রুত পতনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। সাম্রজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বংশানুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও অন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণের সৃষ্টি এবং গুপ্ত রাজপরিবারের অন্তর্কলহ নিঃসন্দেহে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করেছিল। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের যথা বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত ও বালাদিত্যের বৌদ্ধধর্মের প্রতি দুর্বলতা সামরিক ক্ষমতাকে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। এছাড়া বিহার অঞ্চলে মৌখরিদের অভ্যুত্থান ও হূণ আক্রমণের অভিঘাত সহ্য করা এই সাম্রাজ্যের পক্ষে দুরূহ হয়েছিল।

মৌর্যযুগের মতো গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং রাজাই ছিলেন সামরিক, রাজনৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত সকল বিষয়ের প্রধান। কেন্দ্রীয় সচিবালয় তাঁর দ্বারা পরিচালিত

হত। তবে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না, মন্ত্রীদের পরামর্শ তিনি নিতেন, এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এছাড়া শাসন সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং নিগমসভাগুলি ভোগ করত। রাজা বিভিন্ন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে কেন্দ্রে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী সন্ধিবিগ্রহিক (শান্তি ও যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত) এবং অক্ষপটলাধিকৃত (সরকারি নথিপত্রের ভারপ্রাপ্ত) প্রধান ছিলেন। কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহাদণ্ডনায়ক (সেনাপতি), মহাবলাধিকৃত (সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক), মহাপ্রতিহার (প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান অথবা প্রতিহারদের প্রধান) প্রমুখ কর্মচারীগণ। কুমারামাত্য ও আয়ুক্তগণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যৌগসূত্র রচনা করতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি অঞ্চল যথা দেশ ও ভুক্তি অথবা রাষ্ট্রতে বিভক্ত ছিল। ভুক্তি শাসন করতেন উপরিকগণ, কুমারামাত্য, আয়ুক্ত এবং বিষয়গুলি শাসন করতেন বিষয়পতিগণ। বিষয়গুলির পরেই ছিল গ্রাম ও নগরের স্থান। গ্রামিক, মহত্তর ও ভোজকদের সাহায্যে গ্রাম শাসন চলত, আর নগর শাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন পুরপাল। তাঁকে সাহায্য করত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নগর পরিষদ। দেশ ও ভুক্তির সীমানার বাইরে ছিল সামন্ত ও গণরাজ্যগুলি। শাসনব্যবস্থাকে সুচারুরূপে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে গুপ্তগণ রাজস্ব ব্যবস্থা ও কর ব্যবস্থাকেও সুগঠিত করেছিলেন। ভারাকর অর্থাৎ ভূমিকর, ভোগকর অর্থাৎ চুঙ্গিকর এবং ভূতপ্রত্যয় অথবা আবগারি শুল্ক ছিল প্রধান।

গুপ্তযুগে রাষ্ট্র বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাস্তা, সেতু, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ করা হত। গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখতে সত্র, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন সাধারণভাবে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার উদারতার কথা বলেছেন, তাঁর মতে এই সাম্রাজ্যের মানুষ তখন ছিল অসংখ্য এবং সুখী।

গুপ্ত শাসনের উপরোক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অনেকে এই যুগকে 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দিয়েছেন। তবে গুপ্তযুগের বিলাসবহুল রাজসভা, অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিল্প, সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ কিন্তু ঐ যুগের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির দ্যোতক হয়ে ওঠে না। এই উন্নতি ছিল শ্রেণীগত ও স্থানগত দিক থেকে একান্তভাবেই সীমাবদ্ধ। উপসংহারে বলা যেতে পারে যে গঠনতন্ত্রের দিক থেকে এই শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের পরস্পরবিরোধী নীতিগুলির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই শাসনপদ্ধতি বিশেষ মূল্যবান ছিল কারণ ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্বে এই পদ্ধতিই ছিল একমাত্র বিকল্প।

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন পরবর্তী যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন বকাটকগণ। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নাগপুর ও বেরারের অন্তর্গত আকোলা ছিল তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল। বকাটক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন বিন্ধ্যশক্তি, তবে প্রথম প্রবরসেনের রাজত্বকালেই বকাটকদের প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেছিল। বকাটকগণ এই সময় উত্তর মহারাষ্ট্র বেরার মধ্যপ্রদেশও হায়দ্রাবাদের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে এই সাম্রাজ্য চারভাগে বিভক্ত হয় এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের শাসক হন তার পৌত্র প্রথম রুদ্রসেন। রুদ্রসেনের পরবর্তী বকাটক রাজা ছিলেন পৃথিবীসেন, যিনি প্রবল পরাক্রম গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বৈরিতা সৃষ্টি না করে সাম্রাজ্যের সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বকাটকদের মৈত্রীবন্ধন

অটুট হয়েছিল। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের অকালমৃত্যুর পর যখন প্রভাবতী তাঁর নাবালক পুত্রদ্বয়ের হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এরপর বকাটক সিংহাসনে পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিত হন দিবাকরসেন ও পরে দ্বিতীয় প্রবরসেন। পরবর্তী শাসক নরেন্দ্রসেনের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মেকলা ও মালবের রাজাগণ তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেন, এবং নরেন্দ্রসেনের রাজত্বকালের শেষ দিকে নলবংশীয় রাজা ভবদত্ত বর্মণের আক্রমণও বকাটকরা প্রতিহত করে। এরপর বকাটক বংশের অপর শাখা বৎসগুল্ম শাখার উল্লেখযোগ্য শাসক হরিষেণ মধ্য দাক্ষিণাত্যে বকাটকদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। তাঁর মৃত্যুর পরেই দুই বর্ষব্যাপী বকাটক রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

৪খ.২ গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থান

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাশার মৃত্যু হয়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্য আর একবার ঐক্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনেছিল। আয়তনে গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় ছোট ছিল। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় গুপ্ত সাম্রাজ্য দীর্ঘায়ু হয়েছিল। মৌর্যদের তুলনায় গুপ্তদের জন্য ইতিহাসের উপকরণ বহুতর এবং বিচিত্রতর। তাই ভারত ইতিহাসে সর্বপ্রথম গুপ্তযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। এবং এই ইতিহাসের সন তারিখও মোটামুটি নির্দিষ্ট।

গুপ্তযুগে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আজও বেঁচে আছে, গুপ্তযুগে তার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই যুগেই ভারতীয় মহাকাব্য দুটি তাদের পরিণত রূপ পেয়েছিল। পৌরাণিক সাহিত্য এই যুগে নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে একদিকে যেমন বৈদিক যুগের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে হিন্দুধর্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছিল। এ যুগে রাজসভার ভাষা হিসাবে প্রাকৃতের স্থান নিয়েছিল সংস্কৃত। এর ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল এবং এই ভাষা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাহন হতে পেরেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে এই সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে যায়নি। পরবর্তীকালে বারবার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও তা ততটা ফলবতী হয়নি।

অনেকে মনে করেন যে, গুপ্ত সম্রাটগণ বিদেশীদের বিতাড়িত করে ভারতের মুক্তি অর্জন করেছিলেন। বাসাম দুটি কারণে এই মতের বিরোধিতা করেছেন। প্রথমত, তিনি মনে করেন যে, বিদেশীরা ততদিনে আর বিদেশী থাকেনি, তারা ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেন যে, ভারত থেকে বিদেশী অপসারণের কাজ গুপ্ত সম্রাটদের জন্য অপেক্ষা করেনি। তাদের স্বল্প পরিচিত পূর্বসূরিগণ এ কাজ করেছিলেন।

উত্তর ভারতের গুপ্ত শাসনকে প্রায়ই 'সাম্রাজ্যিক' আখ্যা দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই বর্ণনা যথাযথ নয়। কেননা কেন্দ্রীভূত শাসন সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রকাঠামোর একটি অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং গুপ্তশাসনব্যবস্থায় এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় ছিল না। গুপ্তযুগকে ভারত ইতিহাসে অতি গৌরবময় যুগ বলা হয়। অনেকে মনে করেন যে এই বর্ণনাও অতিরঞ্জিত। কেননা শ্রেণীগত ও স্থানগত, দুদিক থেকেই এই গৌরব সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ এই গৌরবের অংশীদার ছিলেন। এ যুগে তাঁদের জীবনযাত্রা একটি অভূতপূর্ব মানে পৌঁছেছিল। তাছাড়া এই গৌরব একান্তভাবে উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ ভারতে উন্নত সভ্যতার বিবর্তন গুপ্তযুগে ঘটেনি, গুপ্ত-পরবর্তী যুগে ঘটেছিল।

৪খ.২.১ গুপ্তদের উত্থান

তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ভারতের তিনটি অংশে বৃহৎ শক্তির উত্থান ঘটেছিল। মধ্যদেশের পশ্চিমভাগে উত্থান ঘটেছিল ভারসিব নাগদের, দাক্ষিণাত্যে বকাটকদের এবং পূর্ব ভারতে গুপ্তদের। গুপ্তদের এই উত্থান নিশ্চয়ই কোন অভাবনীয় ঘটনা নয়। এর পিছনে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। ডঃ গয়াল এই কারণগুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে গুপ্তগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর গাঙ্গেয় অঞ্চলে অথবা উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশে অর্থাৎ প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা এবং বেনারসের মধ্যবর্তী ভূভাগ, যা অন্তর্বেদী নামে পরিচিত ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন সাসানীয়দের অধিকারে ছিল। পশ্চিম ভারত ছিল ক্ষত্রপগণের অধিকারে। দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। বকাটক বংশের প্রবরসেনের সময় সেই সম্ভাবনা বাস্তব আকার লাভ করেছিল। কিন্তু বকাটকগণের সাফল্য স্থায়ী হয়নি। সুতরাং একমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার পক্ষেই নেতৃত্বদান সম্ভব ছিল। ভারতের অন্য দুইটি অঞ্চলের পক্ষে (অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকায় এবং দাক্ষিণাত্যে) তা সম্ভব ছিল না।

ডঃ গয়াল বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে গুপ্তদের উত্থানের বিশেষ যোগ ছিল। তাঁর মতে প্রায়শ প্রতিবাদী ধর্মের (বৌদ্ধ, জৈন এবং অজিবিক ধর্ম) পৃষ্ঠপোষক বিদেশীদের আধিপত্যের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই পুনরভ্যুত্থান ছিল একান্তভাবে জাতীয়তাবাদী। সুতরাং তিনি গুপ্তদের উত্থানের মধ্যে ভারতে জাতীয়তাবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখেছেন। অনেকে এই মত একেবারেই মানেন নি। তাঁরা বলেছেন যে, গুপ্তদের প্রশংসা বেশিরভাগই তাঁদের নিজস্ব লেখসমূহে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক পাঠোদ্ধারের পূর্ব পর্যন্ত এই লেখগুলি সম্পূর্ণ বিস্মৃত অবস্থায় ছিল।

ডঃ গয়াল মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের তুলনা করে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মৌর্যদের শাসন ও শিল্প কাঠামো ছিল প্রধানত বৈদেশিক। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। গুপ্ত শাসনব্যবস্থা হিন্দুদের রাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পসাধনায় বিশেষভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছিল। গুপ্তদের মুদ্রায় তাঁদের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমদিকে গুপ্তদের মুদ্রায় রাজা ও রানীকে কুষাণদের অনুকরণে, বিদেশী পোশাকে সজ্জিত দেখা যায়। এই মুদ্রাগুলিতে অঙ্কিত দেবীমূর্তি নামে না হলেও, বাস্তবে অরদোক্ষোর হুবহু অনুকরণ। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গুপ্তরাজাদের অঙ্গে ভারতীয় পোশাক দেখা যায়। অরদোক্ষোর স্থান গ্রহণ করেন দুর্গা অথবা লক্ষ্মী। ডঃ গয়াল বলেছেন যে, মগধ প্রথম দিকে ব্রাত্য সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, পরে তা বিদেশী প্রতিবাদী ধর্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা মগধের ছিল না। অন্যদিকে, কুষাণ-পরবর্তী যুগে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বৃহত্তম ঘাঁটি, উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকার সে যোগ্যতা পুরোপুরি ছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চল প্রাক্-গুপ্তযুগে এবং গুপ্তযুগের প্রথম দিকে, বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। স্বর্ণমুদ্রার ১৪টি ভাণ্ডার এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের রোমান মুদ্রাও এখানে পাওয়া গেছে। সুতরাং শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল, বলা যায়।

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং সেনাবাহিনীতে নতুন মর্যাদা লাভ করেছিল। মনু বলেছেন যে কোন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা, সেনাপতি এবং দণ্ডধর হতে পারেন। কামন্দকের নীতিসারে এই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের স্বীকৃতি শুধু নীতিগতভাবে দেওয়া হয়নি, কার্যত দেওয়া হয়েছিল। এ যুগে পরিবর্তিত মহাভারতে ব্রাহ্মণ গৌরবের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, ব্রাহ্মণ ভৃগু পরশুরাম একুশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবার পর তা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বণ্টনের জন্য তাঁর পুরোহিত কশ্যপের হাতে তুলে দেন।

ডঃ পি. এল. গুপ্ত গুপ্তদের উত্থানের ব্যাখ্যা হিসাবে অন্য একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে ভারতের তিন প্রান্তে, শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। অথচ তাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বকাটক এবং নাগগণ পরস্পরের উপর নির্ভর করে আপন শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। বকাটকদের সঙ্গে গুপ্তদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘকাল বজায় ছিল। তাঁদের এই পারস্পরিক বোঝাপড়া গুপ্তদের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, গুপ্তবংশের প্রথম দুজন শাসক গুপ্ত এবং ঘটোৎকচ শুধুমাত্র "মহারাজা" ছিলেন এবং ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম "মহারাজাধিরাজ" এই উচ্চতর অভিধা গ্রহণ করেন। প্রথম দুজনের "মহারাজা" অভিধা থেকে অনেকে মনে করেন যে তাঁরা কারও অধীনে সামন্ত নরপতি মাত্র ছিলেন, স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না। অনেকে এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন যে, গুপ্তযুগের পরবর্তী অধ্যায়ে "মহারাজা" বলতে অনেক সময় সামন্ত নৃপতি বোঝাত, কিন্তু গুপ্তপূর্ব যুগে অথবা গুপ্তযুগের প্রথম দিকে তা বোঝাত না। তখন অনেক স্বাধীন নৃপতিও 'মহারাজা' অভিধা গ্রহণ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাতবাহন, ভারসিব নাগ, বকাটক এবং কৌশাম্ভীর মঘদের উল্লেখ করা যায়।

গুপ্ত কোন অঞ্চল শাসন করতেন সঠিক বলা যায় না। মৃগশিখাবনের সঙ্গে সারনাথের যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে বলা যায় যে, বেনারস অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে পশ্চিমে এই রাজ্য প্রয়াগ ও অযোধ্যার দিকে, এবং পূর্বে মগধের দিকে কিছুদূর বিস্তৃত ছিল।

গুপ্তের শাসনকালও সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। স্মিথ তাঁকে ২৭৫-৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক এই মত মেনে নিয়েছেন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজত্বের অবসান হয়েছিল।

৪খ.২.২ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

"মহারাজাধিরাজ" প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন তাঁর রাজত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখতে সমুদ্রগুপ্তকে সর্বদা "লিচ্ছবিদৌহিত্র" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে এই বিবাহ সম্পর্কের তাৎপর্যের আভাস পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক দিকে থেকে এই বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মনে করা হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একশ্রেণীর মুদ্রায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এই মুদ্রার একদিকে প্রথম স্কন্দগুপ্ত এবং তাঁর পত্নী কুমারদেবীর নাম ও চিত্র, অন্যদিকে সিংহের উপর উপবিষ্টা দেবীমূর্তি এবং "লিচ্ছবয়ঃ" কথাটি পাওয়া গেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা

যায় যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি সম্পর্কে তাঁর সৌভাগ্যের সূচক মনে করেছিলেন। এ্যালানের মতে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পিতা-মাতার বিবাহকে স্মরণীয় করার জন্য এই মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, লিচ্ছবিগণ ও লিচ্ছবি দুহিতা কুমারদেবীর সঙ্গে যুক্তভাবে এই মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন, এ. এস. আলটেকার এই মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিবাহের ফলে গুপ্তরাজ্যের সঙ্গে লিচ্ছবি রাষ্ট্র যুক্ত হয়েছিল এবং এই মিলিত রাষ্ট্রের সিংহাসনে সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারের দাবিকে সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর সম্পর্কে "লিচ্ছবিদৌহিত্র" বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

ডঃ গয়াল কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এই মৈত্রী সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তখন ভারসিব নাগ এবং বকাটকগণের মৈত্রীর ফলে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছিল। গুপ্ত-লিচ্ছবি মৈত্রীর ফলে তা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মৈত্রীর ফলে গুপ্তগণ দক্ষিণ বিহারের মহামূল্য খনিগুলির উপর তাঁদের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁরা যে খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছিলেন, মেহেরাউলি লৌহস্তম্ভ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সম্পদ লাভের ফলে গুপ্তগণ উত্তর ভারতের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানা যায়। তবে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের বিবরণ থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয় সম্পর্কে পরোক্ষভাবে ধারণা করা যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব ভারতে সমুদ্রগুপ্ত কোন অভিযান পরিচালনা করেন নি। তাই মনে হয় যে, সমতট বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট বঙ্গদেশ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমে তাঁর রাজ্য বিদিশার প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছিল, কেননা বকাটকগণ তখন বিদিশা শাসন করতেন। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমগ্র বিহার, সমতট বাদে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বারাণসী পর্যন্ত পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ পরবর্তী শাসক হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের নির্বাচন। সমুদ্রগুপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না কিন্তু যোগ্যতম ছিলেন। তাই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে নির্বাচিত করেন।

সমুদ্রগুপ্তের মনোনয়ন তাঁর ভাইদের ('তুল্য কুলজ') মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ডঃ গয়াল মনে করেন যে অভিজাত শ্রেণীর একাংশ এই বিক্ষোভের শরিক হয়েছিলেন, কেননা তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল যে সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের ফলে রাজসভায় লিচ্ছবিদের, অর্থাৎ ব্রাত্য সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী প্রথম চন্দ্রগুপ্তের অন্য পত্নীর গর্ভজাত, সিংহাসন বঞ্চিত, যুবরাজ কাচের মধ্যে তাঁদের স্বাভাবিক নেতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে কাচ বৌদ্ধধর্ম বিরোধী ছিলেন, কেননা বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ তাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ডঃ গয়াল বলেছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত ও কাচের সংগ্রাম শুধু দুইজন ব্যক্তির সংগ্রাম ছিল না, এটা ছিল অংশত দুটি ভিন্ন আদর্শের সংগ্রাম। রাজসভার উপদলীয় দ্বন্দ্ব এই সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কাচের মুদ্রা উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে (বালিয়া, তাণ্ডা, জৌনপুর ইত্যাদি স্থানে) পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটি ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্গবিশেষ। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং এর পিছনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন ছিল। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প* অনুসারে কাচের সাফল্য মাত্র তিন বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর পরিমিত সংখ্যক মুদ্রাও একই ইঙ্গিত বহন করে।

৪খ.২.৩ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ—সমুদ্রগুপ্ত

গুপ্তসম্রাটগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ সমুদ্রগুপ্ত। ভারতীয় ঐতিহ্যে তিনি একেবারে অপরিচিত ব্যক্তি নন। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ এবং যবদ্বীপের একখানি গ্রন্থ, *তন্ত্রি-কামান্ড*-এ তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। ওয়াং-হিউয়েন-সি তার সঙ্গে সিংহল দ্বীপের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলেছেন। সমুদ্রগুপ্তের অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, তাঁর জীবন ও রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়। একটিতে তিনি তীরধনুক-সহ দণ্ডায়মান, দ্বিতীয়টিতে, তাঁর হাতে একটি কুঠার, তৃতীয়টিতে তাঁর পদদলিত একটি ব্যাঘ্র, চতুর্থটিতে তিনি বীণাবাদনরত এবং পঞ্চমটি, অশ্বমেধের স্মারক। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে তাঁর যে সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা বলা হয়েছে, এই মুদ্রাগুলি যেন তারই অভিজ্ঞান।

সমুদ্রগুপ্তের জন্য দুইটি লেখ বিশেষ মূল্যবান। একটি, মধ্যপ্রদেশের এরাণ লেখ, অন্যটি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখ, বা হরিষেণ প্রশস্তি। এর মধ্যে হরিষেণ প্রশস্তির গুরুত্ব সমধিক। এ ছাড়া নালন্দায় এবং গয়ায়, যথাক্রমে ৫ ও ৯ বৎসরের দুটি তাম্র লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখ দুটিতে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে।

এলাহাবাদ লেখটি অশোকস্তম্ভের উপর রচিত। শুধু সমুদ্রগুপ্ত নয়, সমগ্র গুপ্তযুগের জন্য এই লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এতে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিত্বের ও কৃতিত্বের বিশদ বিবরণ আছে। সমুদ্রগুপ্তের জন্য এটিই আমাদের মুখ্য উপাদান। এতে ৩৩টি পংক্তি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর অংশবিশেষ ভেঙে যাওয়ায় এ থেকে ঘটনাপরম্পরা নির্ধারণ করা কঠিন। এই লেখটি দিগ্বিজয়ের পরে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বে রচিত, কেননা এতে এই অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ নেই। অলঙ্কারবহুল সংস্কৃতে এই লেখটি রচিত। অশোকের সরল, বিনত এবং প্রাকৃতে রচিত লেখগুলির সঙ্গে এই লেখটির তুলনা করলে দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য, তা বোঝা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধন এবং নিজেকে 'একরাট'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি আর্যাবর্তে এবং দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আর্যাবর্তে তিনি শুধু রাজ্যজয়ই করেননি, বিজিত রাজ্যগুলিকে সরাসরি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি তা করেননি। সেখানে তাঁর রাজ্যজয়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমটি গ্রহণ, অর্থাৎ শত্রুকে বলপূর্বক বন্দী করা, দ্বিতীয়টি মোক্ষ, অর্থাৎ শত্রুর মুক্তিদান এবং তৃতীয়টি অনুগ্রহ, অর্থাৎ পরাজিত শত্রুকে অনুগ্রহস্বরূপ তাঁর হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ। দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রগুপ্তের এই পরিবর্তিত নীতি, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলে মনে করা হয় বলা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থিত রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্য কার্যকরভাবে শাসন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না, তাই তিনি দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে এই আবেক্ষিক উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ সবই সত্য, কিন্তু এই একমাত্র সত্য নয়। এই উদার নীতির পিছনে যে, অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে গুপ্তদের সময় রাজ্যজয়কে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং এই বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। গুপ্তযুগে, অত্যধিক দূরত্বের জন্য, বলপ্রয়োগের সাহায্যে বসতিস্থাপন সম্ভব ছিল না। অপরিষ্কৃত জমির পরিমাণও তখন তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল। তাছাড়া পলিমাটিবিধৌত গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষদের উৎখাত করে, অপেক্ষাকৃত অনুর্বর দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাওয়াও সহজ ছিল না। তাই

দক্ষিণাপথের রাজারা পরাজিত হওয়ার পর পুনরায় তাঁদের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের প্রত্যেককেই কর দিতে হত। পরাজিত এইসব রাজাদের কাছ থেকে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে গুপ্তসম্রাটগণ একটি আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু মার্জিত রাজসভা, ও একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং এজন্য তাঁদের জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাতে হয়নি। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় এবং গুপ্তসম্রাটগণের বিভিন্ন সনদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁরা বলেছেন যে, গুপ্তযুগে বসতিস্থাপনে ধর্ম এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্য বলপ্রয়োগের স্থান গ্রহণ করেছিল। এইভাবে বর্ণের ছদ্মবেশে সেখানে একটি নতুন শ্রেণীর পত্তন করা হয়েছিল।

হরিষেণ প্রশস্তির সপ্তম স্তবকে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক সাফল্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংশটি ভগ্ন হওয়ায় এই স্তবকের সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখানে অচ্যুত, নাগসেন, গণপতিনাগ এবং কোটা-পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁর পরিপূর্ণ জয়লাভের কথা আছে। তারপরে বলা হয়েছে যে, তিনি পুষ্পনগরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। অচ্যুত সম্ভবত বেরিলির নিকট অহিচ্ছত্রের রাজা ছিলেন। নাগসেন ছিলেন গোয়ালিয়রের অন্তর্গত পদ্মবতীর নাগবংশীয় রাজা। গণপতিনাগের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বেশি, কেননা, তাঁর মুদ্রা বিদিশাতে পাওয়া যাওয়ায় তাঁর রাজ্যকে এখানে স্থান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু গণপতিনাগের মুদ্রা অনেক বেশি সংখ্যায় মথুরায় পাওয়া গেছে। সুতরাং তাঁকে মথুরার রাজা মনে করাই সঙ্গত। কোটা-পরিবার সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁদের মুদ্রা পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লিতে পাওয়া গেছে। তাঁরা বুলন্দশহর শাসন করতেন। এইসব রাজ্যের ভৌগোলিক পরিচয় থেকে মনে হয় যে, এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখতে 'পুষ্প' বলতে কান্যকুব্জ বা কনৌজ বোঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালে কান্যকুব্জের নাম ছিল পুষ্পপুর। তাই অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত কান্যকুব্জ থেকে উপরে উল্লিখিত রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, কেননা উত্তর-পশ্চিমে অহিচ্ছত্র, পশ্চিমে মথুরা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মাবতী এখান থেকে সমদূরত্বসম্পন্ন (১২৫ থেকে ১৫০ মাইলের মধ্যে) ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত প্রথমে পূর্বদিকে অগ্রসর না হয়ে কেন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, অনেকে তার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, পশ্চিমের নাগগণ ছিলেন, সমগ্র আর্যাবর্তে, গুপ্তদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাগদের সঙ্গে তখন বকাটকগণের মৈত্রীসম্পর্ক ছিল। নাগদের বিরুদ্ধে অভিযানে বিলম্ব হলে, বকাটকগণ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত করবেন, এমন আশঙ্কা ছিল। সুতরাং নাগদের বিরুদ্ধে দ্রুত জয়লাভ সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়েছিল। তাছাড়া নাগ ও বকাটক উভয় রাজ্যেই তখন অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে বিশেষত বকাটকরাজ প্রথম প্রবরসেনের মৃত্যুর পর নাগ-বকাটক মৈত্রীর উপর চাপ পড়েছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাঁর শত্রুদের এই বিপন্ন অবস্থার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্তগণ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক, এবং নাগগণ শিবের। সমুদ্রগুপ্ত প্রথমে নাগরাজ্য আক্রমণের এও এক অন্যতম কারণ ছিল।

নাগদের পরে সমুদ্রগুপ্ত হয়তো বকাটকগণের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ এবং উত্তীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের এরাণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্ত এখানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধজয়ের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, বকাটকগণ তাঁদের উত্তর ভারতীয় অঞ্চলগুলি হারিয়েছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাঁদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায়ের মতে সমুদ্রগুপ্ত বকাটকদের কাছ থেকে এরাণ জয় করেননি, খুব সম্ভব, পশ্চিমের ক্ষত্রপদের কাছ থেকে করেছিলেন। তাঁর মতে সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক মহাক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসেন পরাজিত হয়েছিলেন।

এইভাবে গঙ্গা ও দোয়াব অঞ্চলের সমভূমির উপর তাঁর অধিকার সুদৃঢ় করার পর সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বের হন। হরিষেণ প্রশস্তির এই পর্যায়ে যে-সব রাজ্য অথবা উপজাতি সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের নামের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই নামগুলি সেখানে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে সমুদ্রগুপ্ত সম্পর্ক বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে দক্ষিণাপথের (অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের) বারোটি রা্জা ও রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। এঁদের সম্পর্কে সমুদ্রগুপ্ত গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর্যাবর্তের নয় জন রাজার নাম আছে। উত্তর ভারতের এই রাজাদের তিনি উন্মূলিত এবং তাঁদের রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আটবিক রাজাগণ, পাঁচটি প্রত্যন্ত রাজ্যের নরপতিগণ এবং নয়টি উপজাতীয় প্রজাতন্ত্র, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। আটবিক রাজাদের তিনি দাসত্বের (পরিচারকীকৃত) পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন। অন্যদের তাঁকে সর্বপ্রকার কর দিতে হত (সর্বকরদান), তাঁর আদেশ মান্য (আজ্ঞাকরণ) করতে হত এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে প্রণাম নিবেদন (প্রণামাগণ) করতে হত। চতুর্থ শ্রেণীতে কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্বাধীন এবং অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা বিভিন্নভাবে সমুদ্রগুপ্তের সন্তোষবিধান করতেন।

সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাধিকারসূত্রে যে অঞ্চল লাভ করেছিলেন, সেই অঞ্চল, এবং হরিষেণ প্রশস্তিতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত যে রাজাদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন। এই রাজাদের সম্পর্কে ‘উন্মূল্য’ শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া দক্ষিণাপথের রাজাদের ক্ষেত্রে যেমন রাজা ও রাজ্যের নাম দুইয়েরই উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজাদের ক্ষেত্রে, তা নেই। সেখানে শুধু রাজার নাম আছে, রাজ্যের নাম নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই রাজ্যগুলি সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। হরিষেণ প্রশস্তিতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়। সেই নামগুলি হল, রুদ্রদেব, মতিল, চন্দ্রবর্মন, নাগদত্ত, নাগসেন, গণপতিনাগ, অচ্যুত, নন্দী এবং বলবর্মন। রাজ্যের নামের উল্লেখ না থাকায় এই রাজাদের সনাক্ত করা কঠিন। তাছাড়া পরাজিত সব রাজাই যে এখানে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, তাও মনে হয় না। কেননা এই প্রশস্তিতে রাজাদের নামের পরে, “এবং আর্যাবর্তের আরও অনেক রাজা” এই অস্পষ্ট কথাগুলি আছে।

রুদ্রদেব কে ছিলেন, তা এখনও অনিশ্চিত। একসময় মনে করা হত যে, তিনি এবং বকাটক রাজা প্রথম রুদ্রসেন অভিন্ন। ডঃ পি. এল. গুপ্ত কৌশাম্বীয় মুদ্রায় চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের যে রাজা রুদ্রের নাম পাওয়া গেছে, তাঁকে রুদ্রদেব বলে সনাক্ত করেছেন। তিনি বলেন যে, আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থলে, একদা এলাহাবাদ স্তম্ভলেখ যেখানে ছিল, সেখানেই এই মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাছাড়া হস্তলিপির দিক থেকেও এই লেখ ও মুদ্রার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

বুলন্দশহরে (উত্তরপ্রদেশ) একটি সিলের উপর মত্তিলার নাম পাওয়া গেছে। অনেকে তাঁকে মতিল বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু মত্তিলার নামের সঙ্গে কোন সম্মানসূচক অভিধা না থাকায় তিনি যে রাজা ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না।

চন্দ্রবর্মণকে সাধারণত সিংহবর্মণের পুত্র, পুষ্করণের রাজা চন্দ্রবর্মণ বলে মনে করা হয়। বাঁকুড়ার নিকট শুশুনিয়া পাহাড়ের লেখতে চন্দ্রবর্মণের নাম পাওয়া গেছে। পুষ্করণকে মনে করা হয় শুশুনিয়ার নিকটস্থ, বর্তমান পোখরণ।

গণপতিনাগ, নাগসেন এবং নন্দী, তিনজনই নাগবংশীয় ছিলেন বলে মনে হয়। গণপতিনাগ এবং নাগসেনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নন্দী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

নাগদত্তের নাম থেকে মনে হয় যে, তিনিও নাগবংশীয় ছিলেন। বলবর্মণের পরিচয়ও অনিশ্চিত।

অনেকে এই নয়জন রাজাকে পুরাণে-বর্ণিত 'নব নাগ' বলে উল্লেখ করেছেন। এই অনুমান সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

এই নয়জন রাজা ও তাঁদের রাজ্যের যে পরিচয় জানা গেছে তার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, মধ্য-ভারতের অংশবিশেষ এবং বঙ্গাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর বঙ্গাদেশ জয়ের পিছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করা হয়। তিনি এর দ্বারা সমুদ্রের সঙ্গো যোগাযোগ স্থাপন এবং তাম্রলিপির বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

আর্যাবর্ত জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত আটবিক রাজ্যগুলি জয় করেন। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে এই রাজ্যগুলি জব্বলপুরে এবং গাজিপুরে অবস্থিত ছিল। এরাণ লেখ থেকে এই রাজ্যগুলি জয়ের আভাস পাওয়া যায়। ডঃ পি. এল. গুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের গাজিপুরের আটবিক রাজ্যজয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কেননা তাঁর আগেই এলাহাবাদ থেকে পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ভৌগোলিক দিক থেকে গাজিপুর ছিল এই দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী। সমুদ্রগুপ্ত এই আটবিক রাজ্যগুলি জয় করে তাঁর দক্ষিণাপথ অভিযানের পথ সুগম করেছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের এই রাজ্যজয় 'প্রত্যন্ত নৃপতি' এবং উপজাতি রাষ্ট্রগুলির উপর গভীর বিস্তার করেছিল এবং তাঁরা নানা উপায়ে তাঁর 'প্রচণ্ড শাসনের' পরিতোষসাধন করেছিলেন। হরিষেণ প্রশস্তিতে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এই সীমান্ত রাজ্যগুলির বিবরণ থেকে, পরোক্ষভাবে, সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই সীমান্ত রাজ্যগুলির সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবই উত্তর ও পূর্ব ভারতে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যগুলির নাম সমতট, কামরূপ, নেপাল, দবক এবং কর্তৃপুরা। সমতট বলতে সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বোঝায়। এর রাজধানী ছিল কমিল্লা জেলার অন্তর্গত বড় কামতা। কামরূপ বলতে আসামের গৌহাটি জেলা এবং বৃহত্তর কিছু অঞ্চল বোঝায়। নেপাল বহু পরিচিত। দবকের অবস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বেশি। অনেকে দবক এবং ঢাকাকে অভিন্ন মনে করেছেন। কারও কারও মতে দবক ছিল চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল। কিন্তু খুব সম্ভব দবক ছিল আসামের নওগাঁ জেলার অন্তর্গত দবোক। কর্তৃপুরার অবস্থিতিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। অনেকের মতে এটি ছিল লজন্ধর জেলার কর্তারপুর। আবার কারও কারও মতে এটি ছিল কুমালন গাড়োয়াল-রহিলখন্দ অঞ্চল।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী উপজাতি রাজ্যগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে ছিল পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মালবগণ, অর্জুনায়নগণ, যৌধেয়গণ এবং মদ্রকগণের রাজ্য। সমুদ্রগুপ্তের সময় মালবগণ খুব সম্ভবত মেওয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের টংক এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল অধিকার করেছিল। অর্জুনায়নগণের বাসস্থান ঠিক কোথায় ছিল জানা যায় না। তারা আগ্রা এবং মথুরার পশ্চিমে, জয়পুরের নিকটবর্তী স্থানে বাস করত, বলা যায়। যৌধেয়গণের বাসস্থানও অনিশ্চিত। খ্রিস্টীয় অব্দের প্রথম দিকে তারা

রাজস্থানের অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যে বাস করত। কিন্তু শকক্ষত্রপ রুদ্রদামন কর্তৃক পরাজিত হয়ে তারা সেখান থেকে সরে যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় তারা সম্ভবত শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করত এবং তাদের রাজধানী ছিল লুধিয়ানার নিকবর্তী সুনেত। একদা মদ্রকদের বাসস্থান ছিল পাঞ্জাব এবং তাদের রাজধানী ছিল শিয়ালকোট। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের সময় হয়তো তারা বিকানীরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভদ্র নামক স্থানে বাস করত। পাণিনি বলেছেন যে, মদ্র এবং ভদ্র ছিল একই স্থানের দুইটি ভিন্ন নাম।

দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত পাঁচটি উপজাতি রাজ্যের অবস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আরও বেশি। এগুলি ছিল আভিরগণ প্রার্জুনগণ, সোনাকানিকগণ, কাকগণ এবং খরপরিকগণের রাজ্য। আভিরগণের প্রধান বসতি ছিল পশ্চিম রাজপুতানায়। কিন্তু মধ্যভারতে, ঝাঁসি এবং ভিলসার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁদের অন্য একটি বসতি ছিল। অনেকের মতে হরিষেণ প্রশস্তিতে এই দ্বিতীয় বসতির কথা বলা হয়েছে। ডঃ গুপ্ত মনে করেন যে সমুদ্রগুপ্তের সময় আভিরগণ এই অঞ্চলে আসেনি। তখন তাঁদের বাসভূমি ছিল নিম্নসিন্ধু উপত্যকা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব। কারও কারও মতে মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলা প্রার্জুনগণের বাসস্থান ছিল। কিন্তু এই অনুমান সত্য নাও হতে পারে কেননা অর্থশাস্ত্রে গান্ধারগণের সঙ্গে প্রার্জুনগণের নাম উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং প্রার্জুনগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীও হতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, সোনাকানিকগণ ভিলসার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু হরিষেণ প্রশস্তিতে সোনাকানিকগণের স্থান প্রার্জুন এবং কাকগণের মধ্যস্থলে হওয়ায় অনেকের মতে তাদের বাসভূমি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ভিলসার কুড়ি মাইল উত্তরে কাকপুর গ্রাম, অনেকের মতে কাকগণের বাসস্থান ছিল। অনেকের মতে তাদের বাসভূমি ছিল কাশ্মীর। খরপরিকগণকে অনেকে মধ্যপ্রদেশের দামো জেলায় স্থান দিতে চেয়েছেন কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহের অবসান ঘটেনি। অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অব্যবহিত পরে বাস করত।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, সমুদ্রগুপ্ত উপজাতি রাজ্যগুলিকে গ্রাস না করে তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, জাতিগত দিক থেকে, সামাজিক-রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে, গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষ এবং এই উপজাতিদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। তাই তিনি তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে সমস্যার সৃষ্টি করতে চাননি। তিনি তাদের তাঁর সাম্রাজ্যের প্রথম রক্ষাপ্রাচীর হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে অনেকের বক্তব্যের সুর কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা বলেন যে, সমুদ্রগুপ্তের অভিযানের ফলে নিশ্চিতভাবে এই অঞ্চলের উপজাতি প্রজাতন্ত্রগুলির ক্ষমতা চূর্ণ হয়েছিল।

হরিষেণের বর্ণনামূলক তালিকা থেকে সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। দেখা যায় যে, পশ্চিমে, এই অঞ্চলের ঠিক পরেই উপজাতি গণরাজ্যগুলির একটি বলয় তৈরি হয়েছিল। এই বলয়ের একদিকে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের মালবগণ, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ছিল খরপরিকগণ। পূর্বে দক্ষিণপূর্ব অংশ ভিন্ন সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। উত্তরে এই অঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। দক্ষিণে এই অঞ্চলের সীমান্ত মধ্যপ্রদেশের সৌগর জেলার এরাণ থেকে জব্বলপুর এবং পরে বিন্ধ্য পর্বত-বরাবর বিস্তৃত ছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে, পশ্চিম ভারতের শকগণ তখনও পর্যন্ত অপরাজিত ছিল। রাজস্থানের উপজাতিগণ সমুদ্রগুপ্তকে শুধুমাত্র কর দিত। পাঞ্জাব তখনও তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে ছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে, তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত গাঙ্গেয় উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

আটবিক রাজ্যগুলি জয় করার ফলে সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে দক্ষিণাপথের বারোটি রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। সবগুলি অভিযানের পরিচালনা ভার যে তিনি নিজে নিয়েছিলেন, তা বলা যায় না। হরিষেণ প্রশস্তিতে দক্ষিণাপথের বারোজন রাজা ও তাঁদের রাজ্যের নাম প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের সম্পর্কের গ্রহণ-মোক্ষ-অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

দক্ষিণাপথের এই বারোটি রাজ্য ও তাদের রাজার নাম হল ঃ কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কুরলের মন্তরাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি, কোট্টুরের স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লের দমন, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গির হস্তিবর্মণ, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের কুবের এবং কুস্থলপুরের ধনজয়।

এই রাজ্যগুলির সকলের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কোশল বলতে এখানে দক্ষিণ কোশল বোঝানো হয়েছে। বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, রায়পুর, দ্রুগ এবং ওড়িশার ও সম্বলপুর-গঞ্জামের অংশবিশেষ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাকান্তার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা খুব বেশি। ডঃ রায়চৌধুরী মহাকান্তার বলতে মধ্যভারতের অরণ্যভূমি বুঝিয়েছেন। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, এখানে ওড়িশার জয়পুর অরণ্যকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পরবর্তীকালের লেখতে এই অরণ্যকে 'মহাবন' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, 'মহাবন' এবং মহাকান্তার সমার্থক। কুরলের অবস্থিতি একেবারেই অনিশ্চিত। শুধুমাত্র এই রাজ্য যে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল, তা বলা যায়। পিষ্টপুরম বর্তমান গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিথপুরম। কোট্টুরের পরিচয় অনিশ্চিত। এমন হতে পারে যে, কোট্টুর ছিল গঞ্জাম জেলার মহেন্দ্রগিরির ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কোথুর অথবা ভিজাগাপটম জেলার পাহাড়ের পাদদেশের কোট্টুর। এরন্ডপল্ল হয়তো ছিল ভিজাগাপটম জেলায়। কাঞ্চি হল চিঙ্গোলপুট জেলার কাঞ্চিপুরম। অবমুক্ত হয়তো ছিল কাঞ্চি ও বেঙ্গির মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। পলক্ক ছিল গুন্টুর অথবা নেল্লোর জেলায়। সম্ভবত দেবরাষ্ট্র ছিল ভিজাগাপটমে এবং কুস্থলপুর, উত্তর আর্কটে।

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ অভিযানের দ্বারা তাঁর সাম্রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেননি। সুতরাং তাঁর এই অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মনে আসে। ডঃ জয়সোয়াল বলেছেন যে, পল্লব সেনাবাহিনী ধ্বংস করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল। কেননা সমুদ্রগুপ্ত জানতেন যে, দক্ষিণ থেকে পল্লববাহিনী এবং বুন্দেলখন্দ থেকে বকাটকগণ বিহার আক্রমণ করলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ সঙ্কটের সৃষ্টি হবে। ডঃ গয়াল বলেছেন যে, এই মতবাদ একান্তভাবে ভিত্তিহীন, কেননা যে ধারণার উপর নির্ভর করে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে, সেই ধারণাই এখনও পর্যন্ত প্রমাণসিদ্ধ হয়নি। এই ধারণাটি এই যে, পল্লবগণ বকাটকবংশের একটি শাখা ছিল। তিনি বলেছেন যে, তাই যদি হয় তাহলে সমুদ্রগুপ্ত যখন পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন তখন বকাটকগণের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় নি কেন। ডঃ গয়াল বলেছেন যে সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চল এবং মালাবার উপকূলে তাঁর আক্রমণ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, এ থেকেই তাঁর অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা যায়। এই অঞ্চলের অপরিমিত সম্পদ তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল। প্রথম চার খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রচুর সংখ্যক রোমান স্বর্ণমুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে।

সাধারণত মনে করা হয় যে, সমুদ্রগুপ্ত একবারই দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা সত্য নাও হতে পারে। আর্যাবর্তে বিভিন্ন রাজাদের তিনি যদি একাধিকবার আক্রমণের ফলে পরাজিত করে থাকেন, তাহলে দাক্ষিণাত্যেও তিনি যে তাই করেননি, তা বলা যায় না। হরিষেণ প্রশস্তিতে এ সম্পর্কে কোন

স্পষ্ট নির্দেশ নেই। এই প্রশস্তি থেকে তাঁর আক্রমণপথেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আর্যাবর্তের তুলনায় পর্বতসঙ্কুল দাক্ষিণাত্যে অভিযান পরিচালনা যে অনেক কষ্টসাধ্য ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর বৃহৎ সেনাবাহিনীর পক্ষে উত্তর থেকে দক্ষিণে সোজাসুজি অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। একমাত্র পূর্ব উপকূলরেখা ধরে তা সম্ভব ছিল। অনুমান করা যায় যে, তিনি মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে ওড়িশার উপকূলভাগের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তারপর গঞ্জাম, ভিজাগাপটম, গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং নেল্লোর জেলা অতিক্রম করে মাদ্রাজের দক্ষিণে কাঞ্চিপুরমে পৌঁছেছিলেন। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্তের এই অভিযানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৌবাহিনী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। তবে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপের উপর তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবের কথা স্মরণ করলে তাঁর যে শক্তিশালী নৌবহর ছিল, তা বলা যায়। ডঃ গয়াল বলেন, এমনও হতে পারে যে কাঞ্চি এবং কুরলের মতো উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিকে তাঁর নৌবহর সরাসরি আক্রমণ করেছিল। অনেকের মতে সমুদ্রগুপ্ত ফেরার পথে পশ্চিম উপকূলের কয়েকটি রাজ্য জয় করেছিলেন। দুব্রেইল মনে করেন যে, কাঞ্চির রাজা বিষ্ণুগোপের নেতৃত্বে গঠিত একটি রাজ্যজোট সমুদ্রগুপ্তকে পরাজিত করে এবং এর ফলে তিনি বিজিত রাজ্যগুলি পরিত্যাগ করে দ্রুত ফিরে আসতে বাধ্য হন। ডঃ গুপ্ত এই অনুমানকে একান্তভাবে "কল্পনানির্ভর" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত খুব সম্ভবত বেঙ্গি এবং কাঞ্চি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং হস্তিবর্মণ ও বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেছিলেন। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণাপথের এই অংশে তিনি বেঙ্গি ও কাঞ্চির রাজার মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ডঃ ত্রিপাঠি মনে করেন যে, তিনি হয়তো দূর দক্ষিণ ভারতে চেররাজ্য পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মহারাষ্ট্র ও খান্দেশের মধ্য দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

হরিষেণ প্রশস্তির প্রথম শ্রেণীভুক্ত বারোটি রাজ্য ও বারো জন রাজার মধ্যে বকাটক রাজ্য অথবা তার রাজা, সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন, প্রথম রুদ্রসেনের কোন উল্লেখ নেই। তাই অনেকে মনে করেন যে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে পরাজিত করেননি।

অন্যদিকে ডঃ গয়াল মনে করেন যে, প্রথম রুদ্রদেব এবং রুদ্রসেন অভিন্ন ছিলেন। তিনি বলেন যে সেই সময় বকাটকদের রাজনৈতিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল। প্রথম পৃথিবীসেনের পরে আর কোন বকাটক রাজা 'সম্রাট' অভিধা গ্রহণ করেননি। তাঁরা 'মহারাজা' অভিধাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই 'মহারাজা' অভিধা তাঁদের স্বাধীনতার পরিচায়ক, কিন্তু সাম্রাজ্য মহিমার পরিচায়ক নয়। তাঁর মতে, এই পরিবর্তিত অভিধা, বকাটকদের পরাজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

ভারতের অভ্যন্তরে একটি দেশীয় শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান সম্পর্কে সীমান্তপারের বিদেশী শাসকগণ উদাসীন থাকতে পারেননি। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, তাঁরা দ্রুত সমুদ্রগুপ্তের কাছ থেকে শান্তি ক্রয় করেছিলেন। হরিষেণ প্রশস্তিতে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত এই সব স্বাধীন অথবা অর্ধ-স্বাধীন নরপতিদের উল্লেখ আছে। এই সব বিদেশী প্রকৃতপক্ষে কারা এবং সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক ছিল, এ বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য আছে। এই বিদেশীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিষেণ প্রশস্তিতে, "সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপের" কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে "দৈবপুত্র শাহী শাহানুশাহী-শক-মুরুন্ড" এই সংযুক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। চীন সম্রাটের অভিধা "দেবপুত্র" বিভিন্ন কুষাণ সম্রাটগণ ব্যবহার করেছিলেন আমরা জানি। "শাহানুশাহী" ছিল পারস্য সম্রাটের অভিধা। শকদের

মাধ্যমে কুষাণগণ এই অভিধাটিও গ্রহণ করেছিলেন। তাই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, “দৈবপুত্র-শাহী-শাহানুশাহী” বলতে এখানে কাবুল ও পাঞ্জাবের একাংশের কুষাণ শাসককে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই অভিমত সত্য বলে মনে হয় না। কেননা চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় পাদে এমন আড়ম্বরপূর্ণ অভিধা গ্রহণের উপযুক্ত কোন কুষাণ শাসক এই অঞ্চলে ছিলেন না। তাই ডঃ গয়াল মনে করেন যে “দৈবপুত্রশাহী” বলতে একজনকে এবং “শাহানুশাহী” বলতে অন্য একজনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই সংযুক্ত শব্দটিতে, একজন নয়, দুইজন শাসককে বোঝানো হয়েছে। সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন কুষাণনৃপতি ছিলেন কিদার। তিনি কুষাণপরিবারের মানুষ ছিলেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের কাছে তিনি দেবপুত্র-পরিবারের রাজা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ‘শাহানুশাহী’ অভিধা গ্রহণের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তিনি শুধুমাত্র একজন ‘শাহী’ ছিলেন। ‘কিদার কুষাণ শা’ শব্দসম্বলিত তাঁর মুদ্রা এই কথাই প্রমাণিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হরিষেণ প্রশস্তিতে ‘দেবপুত্র’ শব্দটি অভিধা হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। দেবপুত্রের তদ্ধিত প্রত্যয় ‘দৈবপুত্র’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং “দৈবপুত্র” শব্দটি, পরবর্তী “শাহী” শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কিত, একথা বলা যায়। এই হিসাবে “দৈবপুত্র শাহী” একটি সংযুক্ত শব্দ ধরলে তার অর্থ দাঁড়ায়, “শাহী, যিনি দেবপুত্র পরিবারের মানুষ ছিলেন।” এখন “শাহানুশাহী” বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, তিনি কিদারের সমসাময়িক সাসানীয় “শাহানশাহ” দ্বিতীয় সাপুর ভিন্ন অন্য কেউ ছিলেন না।

হরিষেণ প্রশস্তিতে ব্যবহৃত ‘শক মুরুণ্ড’ শব্দটিও কম বিপত্তির সৃষ্টি করেনি। অনেকে ‘শক-মুরুণ্ড’কৈ একটি সংযুক্ত শব্দ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন যে ‘মুরুণ্ড’ একটি শক শব্দ যার অর্থ ‘স্বামী’ অথবা প্রধান। সুতরাং ‘শক-মুরুণ্ড’ শব্দের অর্থ শক-প্রধান। এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে হরিষেণ প্রশস্তিতে শকমুরুণ্ড বলতে পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র শকশাসকদের বোঝানো হয়েছে। অনেকে আবার মুরুণ্ডদের শকদের থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, মুরুণ্ড একটি উপজাতির নাম। একথা সত্য। এবং তাঁরা যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি শক্তিশালী মুরুণ্ড রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের লেখতে উল্লিখিত মুরুণ্ডের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কেননা গাঙ্গেয় উপত্যকা ইতিপূর্বেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাছাড়া মুরুণ্ড রাজ্য ছিল পূর্ব ভারতে, কিন্তু হরিষেণ প্রশস্তিতে শক-মুরুণ্ড শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্ত-পরবর্তী অঞ্চলের শাসকদের প্রসঙ্গে।

এই বিদেশী শক্তিসমূহের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক প্রসঙ্গে হরিষেণ প্রশস্তিতে ‘আত্মনিবেদন’ ‘কন্যোপায়ন দান’ এবং ‘গুরুৎমদ অঙ্ক-স্ব-বিষয়ক-ভুক্তি-শাসন-যাচনা’র কথা বলা হয়েছে। ‘আত্মনিবেদন’ বলতে হয়তো ব্যক্তিগত উপস্থিত বোঝায়। ‘কন্যোপায়ন দান’ বলতে বোঝায় কন্যাদের উপঢৌকন হিসাবে দান এবং সম্রাটের সঙ্গে তাদের বিবাহ। তৃতীয় সংযুক্ত শব্দটির অর্থ দুইরকমভাবে করা যায়। এর একটি অর্থ হতে পারে গরুড় চিহ্নিত (গরুৎমদ্-অঙ্ক) গুপ্ত মুদ্রা ব্যবহারের এবং স্বীয় অঞ্চল শাসনের (স্ব-বিষয়-ভুক্তি) সনদ লাভের (শাসন যাচনা) জন্য দ্বিবিধ অনুরোধ। অন্য অর্থটি অপেক্ষাকৃত সরল। এই অর্থ অনুসারে এখানে স্বীয় অঞ্চলে শাসনাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে গরুড় প্রতীক চিহ্নিত সনদ লাভের জন্য অনুরোধের কথা বলা হয়েছে। হরিষেণ প্রশস্তির এই অংশে অত্যুক্তি আছে বলে মনে করা হয়। সেই অত্যুক্তির অংশ বাদ দিলে যা দাঁড়ায় তার অর্থ হল, বিদেশী শক-কুষাণ শাসকগণ এবং সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপ, সেবার শর্তে সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন।

ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, শক-কুষাণ শাসকদের এই অধীন মনোভাব সমুদ্রগুপ্তের হাতে তাঁদের পরাজয়ের ফল, না পরাজয় এড়ানোর জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস, তা বলা যায় না। এই শাসকেরা সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে শুধুমাত্র জায়গীর হিসাবে তাঁদের রাজ্যগুলি শাসন করেছিলেন, একথা মেনে নিতে হলে নিশ্চিততর তথ্যের প্রয়োজন।

হরিষেণ প্রশস্তিতে উল্লিখিত 'সিংহল' সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সিংহলের সঙ্গে উচ্চারিত "এবং অন্য সব দ্বীপ" কথাগুলির অর্থ খুবই অস্পষ্ট। সিংহলের সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্কের কথা, এই প্রশস্তি ভিন্ন ওয়াং-হিউয়েন-সির রচনা থেকেও জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় সিংহলী তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি মঠ ও বিশ্রামাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রগুপ্তের কাছে প্রচুর উপঢৌকন সহ একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। "অন্য সব দ্বীপ" প্রসঙ্গে ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, এখানে মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি হিন্দু উপনিবেশগুলির কথা বলা হয়েছে। ভারতীয়গণ এই অঞ্চলে গুপ্তযুগে, এমনকি তার আগেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এদের সংস্কৃতিতে গুপ্ত সংস্কৃতির প্রভাব খুবই স্পষ্ট। মধ্য জাভায় গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারত ও এই উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা ফা-হিয়েন লিখেছেন।

ডঃ গয়াল তৎকালীন ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপের সঙ্গে এই সম্পর্ককে দেখেছেন। তিনি বলেছেন যে, গুপ্ত-পূর্বযুগে এবং গুপ্তযুগের প্রথম দিকে ভারতের সঙ্গে সিংহলের এবং বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, বাণিজ্য বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিংহল ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায়, এই মহাসাগরের উভয়দিকের সমুদ্রপথ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। ভারতের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায়, ভারতের পক্ষে এর গুরুত্ব আরও বেশি। আলেকজান্দ্রীয় গ্রীক কসমসের (ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে দ্রব্যসমূহ প্রথমে সিংহলে এবং পরে সেখান থেকে অন্যত্র যেত। সুতরাং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পক্ষে সিংহল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উত্তর ভারতের বৃহত্তম বন্দর তাম্রলিপ্তির সঙ্গে সিংহলের বিশেষ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন। সে যুগে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্যও কম ছিল না। মশলা, খনিজদ্রব্য, বিভিন্ন ধাতু, কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের জন্য এই দ্বীপপুঞ্জ বিখ্যাত ছিল। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। ৫০০ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক ইতিবৃত্ত সুংচু-তে বলা হয়েছে যে স্থলের ও সমুদ্রে সব দ্রব্যই ভারত থেকে আসত। ভারতীয় মসলীন চীনে বিশেষ পরিচিত ছিল। কাশ্মীরের জাফরাণ, বেশিরভাগ স্থলপথে হলেও, অংশত জলপথে ফু-নান হয়ে যেত। চৈনিক ইতিবৃত্তে ভারতের, বিশেষভাবে মগধের, গোলমরিচের চারার উল্লেখ আছে। ভারতীয়দের কাছে চীনের রেশমের (চিনাংশুকের) বিশেষ কদর ছিল। সুতরাং একথা বলা যায় যে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য সমুদ্রগুপ্তের বৈদেশিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল।

অনেকে বলেন যে, সমুদ্রগুপ্ত হিন্দু রাজচক্রবর্তীত্বের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই যুদ্ধজয় শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। বলা যায় যে, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁর আদর্শ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল। হরিষেণ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের এই যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছার আভাস আছে, কিন্তু অনুষ্ঠানের উল্লেখ

নেই। তার পরবর্তী সম্রাটদের লেখতে এই অনুষ্ঠানের কথা আছে। সমুদ্রগুপ্ত এই যজ্ঞানুষ্ঠানের স্মৃতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে "অশ্বমেধ পরাক্রমঃ" এই যুগ্ম শব্দ সম্বলিত বিশেষ মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর পরবর্তী গুপ্ত শাসকের লেখতে এই অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কে 'চিরোৎসন্ন' বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই শব্দটি হয়তো ভুল অর্থ করা হয়েছিল। তাই বলা হত যে, সমুদ্রগুপ্ত চির-উৎসন্ন, অর্থাৎ দীর্ঘকাল অপ্রচলিত এই যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই বক্তব্য যথার্থ নয়। কেননা মৌর্যযুগের পর পুষ্যমিত্র, খারবেল, সাতকর্ণি প্রভৃতি বিভিন্ন সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। অধুনা 'চিরোৎসন্ন' শব্দের অন্য অর্থ দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে এর প্রকৃত অর্থ 'ব্যাপক'। সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত ব্যাপক আকারে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, তাঁর পরবর্তীকালের লেখতে এই কথাই বলা হয়েছে।

সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের রাজ্যগুলি জয় করে এবং অপরিচিত ও দুর্গম দক্ষিণাপথে অভিযান পরিচালনা করে তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সংগঠনেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশ তিনি প্রত্যক্ষভাবে শাসন করতেন। একমাত্র দক্ষিণ দিক বাদ দিয়ে বাকি তিন দিকে তিনি এই অঞ্চলকে কয়েকটি করদ রাজ্য দ্বারা ঘিরে রেখেছিলেন। বলা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাঁচটি এবং পশ্চিম ভারতের নয়টি করদ রাজ্যের দ্বারা তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রথম রক্ষাব্যূহ রচনা করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বারোটি বিজিত রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ ছিল বলে মনে হয়। এই করদ রাজ্যগুলির পরে ছিল পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে শক-কুষাণগণের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপ। সমুদ্রগুপ্তের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন এই রাজ্য ও দ্বীপগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ স্বরূপ ছিল। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু এই আদর্শের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু কৌটিল্যের নীতি অনুযায়ী তিনি সকলের উপর সমানভাবে সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। সমুদ্রগুপ্ত এইভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে একটি দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মনোনয়ন ছিল সমুদ্রগুপ্তের শেষ স্মরণীয় কাজ।

হরিষেণ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শুধু যোদ্ধা এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি মানবিক গুণের আধার ছিলেন। 'মৃদু হৃদয়' সমুদ্রগুপ্তের মন অনুকম্পায় পূর্ণ ছিল। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শস্ত্রতত্ত্বে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি নিজে বহু কবিতাও রচনা করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। হরিষেণ তাঁকে এদিক থেকে বৃহস্পতি এবং নারদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা তাঁর সঙ্গীত রুচির নিদর্শন। শিল্পমণ্ডিত তাঁর সুবর্ণ মুদ্রা গুপ্তযুগের গৌরব। যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গৌরব অশোকের সময় থেকে ম্লান হয়েছিল, সমুদ্রগুপ্তের সময় তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দুই প্রধান পুরুষ অশোক এবং সমুদ্রগুপ্তের মধ্যে তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুই-ই চোখে পড়ে। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে এঁরা দুজনেই 'পরাক্রমে'র দ্বারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের দুজনের কাছে পরাক্রমের অর্থ ছিল ভিন্ন। অশোক পরাক্রম বলতে যুদ্ধ বোঝেন নি, কার্যকরভাবে ভারতের 'পোরাণ পকিতি' এবং বুদ্ধের বাণী প্রচার বুঝিয়েছেন। সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাক্রমের অর্থ ছিল প্রবলভাবে যুদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। হরিষেণ ছাড়াও প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত

বসুবন্ধু তাঁর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। অশোকের আদর্শ ছিল 'ধার্মিক ধর্মরাজত্ব', আর সমুদ্রগুপ্তের আদর্শ ছিল সনাতন 'রাজচক্রবর্তীত্ব'। উভয়েই ধর্মীবিজয়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মবিজয় সম্পর্কে দুইজনের ধারণা এক ছিল না। অশোক ধর্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত তা করেন নি। তিনি 'ধর্ম' এবং 'বিজয়ের' মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। অশোক তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে তাঁর অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য করেছিলেন। মানবিক এবং বিশ্বজনীনতার দিক থেকে অশোকের নীতি মহত্তর ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে এর ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের দায়ভাগ আংশিকভাবে অশোককে বহন করতে হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যের পতনের জন্য সমুদ্রগুপ্তকে তা করতে হয় না। বরং বলা যায় যে, অনাগত যুগের প্রবল জড় ও চিন্ময় শক্তির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক এবং এই যুগও অনেকাংশে তাঁরই সৃষ্টি। তিনি সাধারণভাবে 'পরাক্রম' এবং তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে 'বিক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত এবং অন্যান্য কয়েকজন গুপ্ত সম্রাট 'বিক্রমাদিত্য' অভিধা গ্রহণ করেন। এইভাবে গুপ্তযুগ বিক্রমাদিত্যদের যুগ নামে পরিচিত হয়। সমুদ্রগুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ভারত ইতিহাসে এই বিক্রমাদিত্য ঐতিহ্যের সূচনা করেছিলেন।

৪খ.২.৪ রামগুপ্ত

লেখ প্রমাণ অনুসারে সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হন। কিন্তু কিছুকাল আগে বিশাখাদত্ত রচিত *দেবীচন্দ্রগুপ্তম* নাটকের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এ বিষয়ে নতুন আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। বিশাখাদত্ত এই নাটকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, পরবর্তীকালে *হর্ষচরিত* এবং *কাব্য মীমাংসা*-এ তাঁর সমর্থন মেলে। এই কাহিনী অনুসারে সমুদ্রগুপ্তের পরে রামগুপ্ত সম্রাট হন। তাঁরগ রাণী ছিলেন ধ্রুবদেবী। রামগুপ্ত জনৈক শকরাজের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর হাতে তুলে দেন। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) বড় ভাই রামগুপ্তকে হত্যা করে, তাঁর বিধবা পত্নী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। গুপ্তযুগের লেখতে এই বিবাহের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

এতদিন রামগুপ্তের কোন লেখ পাওয়া যায় নি। কিন্তু সম্প্রতি বিদিশার কাছে একাধিক লেখ পাওয়া গেছে। রামগুপ্তের এই লেখগুলির সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি লেখ এবং সাঁচি লেখর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই লেখতে "মহারাজাধিরাজ" রামগুপ্তের নামোল্লেখ আছে। সুতরাং দীর্ঘকাল ইতিহাসের উপেক্ষিত রামগুপ্তের অস্তিত্ব এখন প্রায় প্রমাণিত বলা চলে। তবে তিনি কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, তা বলা যায় না।

৪খ.২.৫ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের পরে প্রায় ৭৫ বৎসরের জন্য গুপ্ত রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং প্রথম কুমারগুপ্ত তাঁদের যা কিছু সামরিক সাফল্য, তা এই অঞ্চলেই লাভ করেছিলেন। তাঁদের সময় পশ্চিম মালবের উজ্জয়িনী প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য অর্জন করেছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সংহতি ও সম্প্রসারণ দুই-ই সাধিত হয়েছিল। তাঁর সময় সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কামরূপের রাজা সমুদ্রবর্মন (আনু. ৩৮০-৪০৫ খ্রিস্টাব্দ), বলবর্মন (আনু. ৪০৫-৪২০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন। পশ্চিমে এই সাম্রাজ্য যমুনা পরবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। মথুরায়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দুইটি লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং মথুরা অবশ্যই তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি মথুরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন, অথবা নতুন জয় করেছিলেন, এ বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় ছিল। ডঃ গয়াল দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, তিনি মথুরা পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কেননা সমুদ্রগুপ্ত মথুরা ও পদ্মাবতীর নাগবংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই অঞ্চলে কোন সামরিক সাফল্য লাভ করেছিলেন, তাঁর কোন লেখতে তার প্রমাণ নেই। মথুরার পশ্চিমে যে উপজাতি রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন সেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্য ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল। বায়ানার ভাণ্ডারে প্রাপ্ত ১৮২১টি স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ৯৮৩টি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের। এ থেকে স্পষ্ট যে, এই অঞ্চলে তাঁর সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবে তাঁর তাম্রমুদ্রা থেকে একই অনুমান করা চলে। মধ্য পাঞ্জাবের শক শাসকগণও হয়তো তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে প্রমাণ ততটা জোরালো নয়। ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বহির্ভারতের হিন্দু উপনিবেশগুলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মধ্য জাভায় প্রাপ্ত তাঁর স্বর্ণমুদ্রা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়েছিল প্রধানত পশ্চিমে। এখানে ভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও আচার বিশিষ্ট শকদের উপস্থিতি অবশ্যই তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল। আয়তনের দিক থেকে তখন শকরাজ্য ছোট হয়ে গেলেও, এর দুষ্কার্যের ক্ষমতা খুব কম ছিল না। সম্ভবত রামগুপ্তের রাজত্বকালে শকগণ পূর্ব মালব আক্রমণ করেছিল। তাই শকদের উচ্ছেদ সাধনের ইচ্ছা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তিনি হয়তো পশ্চিম ভারতের শকদের উচ্ছেদ করে সমুদ্রগুপ্তের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করে সুরাষ্ট্র এবং গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শুধুমাত্র সীমান্ত সম্প্রসারণ তাঁর এই কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি জানতেন না, এর ফলে তিনি পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে সরাসরি প্রবেশ অধিকার লাভ করবেন এবং এইভাবে ভারতের পশ্চিম দিকের সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

পশ্চিম ভারতে তখন বৃহত্তম বন্দর ছিল বারিগাজা (ব্রোচ)। শুধু ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদিই নয়, মধ্য এশিয়া এবং চীন থেকে যেসব পণ্য ভারতে আসত, তাও এই বন্দরের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। অনেকে মনে করেন যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের অবনতি হয়েছিল। তাঁরা বলেন যে ভারতীয় রেশম শিল্পীদের তৎকালীন আর্থিক বিপর্যয়ের আভাস কুমারগুপ্তের মান্দাসোর লেখতে পাওয়া যায়। এই লেখতে বলা হয়েছে যে, রেশম শিল্পীদের একটি 'গিল্ড' লাট বিষয় (গুজরাট) থেকে পশ্চিম মালবের দাসপুরে চলে এসেছিল। তাদের এই অভিপ্রয়াণ দাসপুরে সূর্য মন্দির স্থাপনের, অর্থাৎ ৪৩৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ঘটেছিল। তাঁরা মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্যের অবনতি দেশের অভ্যন্তরে এই অভিপ্রয়াণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ভিসিগথ নেতা আলারিকের আঘাতে তখন রোম সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটেছিল। লাটের রেশমশিল্পীদের দুর্ভাগ্য তাই রোমের দুর্দিনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

ডঃ গয়াল এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সত্য বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, এমন অনেক তথ্য আছে যার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, গুপ্তযুগে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের বিশেষ কোন হেরফের হয়নি এবং ভারতীয় বণিকদের লাভের পরিমাণ যদি কমে থাকে, তবে তা নামমাত্র। ৪০৮ খ্রিস্টাব্দে আলারিক রোম

আক্রমণ থেকে বিরত হন, কিন্তু মুক্তিপণ হিসাবে তিনি ৩০০০ পাউন্ড গোলমরিচ এবং ৪০০০ রেশমের পোশাক দাবি করেন। তাঁর এই দাবি মেটানো হয়েছিল। এ থেকে কী বিরাট পরিমাণ প্রাচ্য দ্রব্য রোমে মজুত থাকত, তা বোঝা যায়। তাছাড়া রোমের অবনতির অল্পকাল পরেই রোমের স্থান গ্রহণ করেছিল কনস্ট্যান্টিনোপল বা বাইজানসিয়াম। এই শহরের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ধনী ও বিলাসী ছিলেন। তাঁদের কাছে প্রাচ্যের দ্রব্যসমূহের বিশেষ চাহিদা ছিল। রাজসভায় এবং গির্জায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ধূপ শুধু ভারতীয় এবং আরব বাণিজ্যের মাধ্যমে পাওয়া যেত। বাইজানসিয়ামের চিকিৎসা সংক্রান্তের গ্রন্থের লেখকেরা, সবরকম ভারতীয় মশলা সেখানে পাওয়া যায়, এটা ধরে নিয়ে তাঁদের বই লিখেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের (৫২৭-৫৬৫ খ্রিস্টাব্দ) আইনের সার সঙ্কলনে বাণিজ্য শুল্ক সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রসঙ্গে আমদানি পণ্যের ক'টি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় এমন অনেক পণ্যের নাম আছে, যেগুলি বিশেষভাবে ভারতীয়। বাইজানসিয়ামের অনেক মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া গেছে। তাছাড়া রোমান এবং বাইজানটাইনগণই ভারতীয় পণ্যের একমাত্র ক্রেতা ছিলেন না। প্রোকোপিয়াস লিখেছেন যে রেশমের একচেটিয়া বাণিজ্য তখন পারস্যের হাতে ছিল এবং পারস্য এই রেশম ভারত থেকে কিনত। জাস্টিনিয়ান ইথিওপিয়ার রাজা হেলেস্থিয়াসের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন, যাতে ইথিওপিয়ার ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে রেশম কিনে রোমকে বিক্রয় করে। কিন্তু ভারতীয় জাহাজ প্রথম যে বন্দরে নোঙর করত, পারসিক বণিকেরা সেখানে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে রোমের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিত। এইভাবে পশ্চিমে পৌঁছুবার আগেই তারা ভারতীয় জাহাজের সব মাল কিনে নিত। সুতরাং গুপ্তযুগে রেশমশিল্পীরা বিপন্ন হয়েছিল; এ ধারণা হয়তো ঠিক নয়। ডঃ গয়াল মনে করেন যে লাট থেকে রেশমশিল্পীদের মালবের অভ্যন্তরে দাসপুরে অভিপ্রয়াণ অন্য কারণেও হতে পারে। তখনকার শান্তি ও সমৃদ্ধি, বিশেষত দাসপুরের মতো শহরের উচ্চশ্রেণীর মানুষের ক্রমবর্ধমান বিলাসব্যসন হয়তো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে একই রকম আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তাই লাটের কিছুসংখ্যক উৎসাহী রেশমশিল্পী এই অভিপ্রয়াণে যোগ দিয়েছিলেন।

ডঃ মজুমদার লিখেছিলেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়নি। সমুদ্রগুপ্ত এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু শকরা তখনও শক্তিশালী ছিলেন। মাত্র অল্পকালের জন্য বকাটকগণ তাঁদের খর্ব করতে পেরেছিলেন। ডঃ গয়াল শকদের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে ডঃ মজুমদারের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শকদের তখন কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিও বলা চলে না। শকক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসেন (৩৪৮-৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে মালব ও রাজস্থানের উপর তাঁর অধিকার হারিয়েছিলেন। মাত্র কয়েকটি সীসার মুদ্রা ছাড়া ৩৫১-৩৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্য কোনপ্রকার মুদ্রা প্রচলন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর রাজত্বকালে সাধারণ মানুষ তাদের সম্পদ, নিরাপত্তার জন্য মাটির তলায় পুঁতে রাখত। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তিনি হয়তো রামগুপ্তের উত্থানের সুযোগ নিয়ে তাঁর অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামগুপ্তের হত্যা এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে শকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। তাঁর পরে সিংহসেন এবং সিংহসেনের পরে চতুর্থ রুদ্রসেন ক্ষমতালাভ করেন। ৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে শক শাসক ছিলেন জনৈক সত্যসিংহের পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেন। প্রচলিত ধারণা অনুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। এইভাবে তিনি শতাব্দীরও বেশি কালব্যাপী মালব-গুজরাট-সৌরাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রপ শাসনের অবসান ঘটে।

ডঃ গুপ্ত এই প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করেছেন। ক্ষত্রপদের তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের তথাকথিত সাময়িক অভিযান কোনমতেই পশ্চিমের ক্ষত্রপদের বিরুদ্ধে হতে পারে না। এই ক্ষত্রপদের রৌপ্য মুদ্রার তিনটি ভাণ্ডার সর্বনিয়া, সাঁচি এবং গণ্ডারমৌতে পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলি থেকে জানা যায় যে ৩৫১ খ্রিস্টাব্দে বা তার অল্পকাল পরে রাজস্থান এবং মালবে ক্ষত্রপদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তখন সিংহাসন থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তার আভাস হয়তো সমকালীন কয়েকটি লেখতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভিলসার নিকটবর্তী উদয়গিরি গুহালেখ'র কথা প্রথমেই বলা চলে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সন্ধিবিগ্রহিক বীরসেন এই গুহাটি শম্ভুকে দান করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে বীরসেন তাঁর প্রভুর সঙ্গে উদয়গিরিতে তখন গিয়েছিলেন, যখন তিনি (অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) "পৃথিবীর জয়ের চেষ্টায় রত ছিলেন।" সাধারণভাবে মনে করা যায় যে, এই লেখতে শকদের সঙ্গে যুদ্ধের ইঙ্গিত আছে। এই লেখতে কোন তারিখ না থাকায় সেই যুদ্ধের তারিখ এ থেকে জানা যায় না। ডঃ গুপ্ত লেখর সামরিক তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এমনও হতে পারে যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে, এই অঞ্চলে তাঁর কন্যা প্রভাবতীদেবীর (বকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের বিধবা পত্নী) সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

সাঁচিতে আরও একটি লেখ পাওয়া গেছে, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। এই লেখতে সম্রাটের সেনাপতি আম্রকার্দব কর্তৃক সাঁচির বৌদ্ধ বিহারে দানের কথা আছে। সেনাপতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে তিনি "অনেক যুদ্ধ- জয়ের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন"। এই লেখ'র তারিখ ৪১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে এই সেনাপতি শকদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনে সাঁচিতে গিয়েছিলেন। উদয়পুরে প্রাপ্ত দ্বিতীয় একটি লেখও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর তারিখ ৪০১-২ খ্রিস্টাব্দ। এতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্ত, একজন সোনাকানিক মহারাজার দানের উল্লেখ আছে।

ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভের প্রমাণ মুদ্রায় পাওয়া যায়। পশ্চিমের শকক্ষত্রপগণ দীর্ঘকাল ধারাবাহিকভাবে তাদের মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এই মুদ্রাগুলি তাঁদের তিন শতাব্দীরও বেশি কালব্যাপী শাসনের স্মারক। কিন্তু ৩৮৮-৩৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁদের এই মুদ্রা প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মুদ্রার পরিবর্তে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তখন শক মুদ্রার অনুকরণে তাঁর মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রপ শাসনের অবসান ঘটিয়ে তাঁদের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। ডঃ মজুমদার উপরোক্ত তিনটি লেখর সামরিক তাৎপর্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্ব মালবের একই স্থানে, একের পর এক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামন্ত, মন্ত্রী এবং সেনাপতির উপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে, শকদের বিরুদ্ধে সম্রাটের যুদ্ধ 'দীর্ঘস্থায়ী' হয়েছিল। শক মুদ্রার অনুকরণে তিনি যে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, তার সম্ভাব্য তারিখ ৪০৯-৪১৫ খ্রিস্টাব্দে। এইসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দশকে শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অভিযান পরিকল্পিত, পরিচালিত এবং সমাপ্ত হয়েছিল।

ডঃ গুপ্ত সোনাকানিক মহারাজার উদয়গিরি লেখ-র এবং আম্রকার্দবের সাঁচি লেখর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে বকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী প্রভাবতী নাবালক

পুত্রের হয়ে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর লেখতে গুপ্ত সম্রাটদের বংশতালিকা পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর সময় বকাটক শাসনব্যবস্থার উপর গুপ্তদের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। খুব সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যার সাহায্যার্থে পাটলিপুত্র থেকে কয়েকজন রাজকর্মচারী বকাটকে পাঠিয়েছিলেন। উদয়গিরি লেখ এবং সাঁচি লেখ এই সময়ের। প্রচলিত ধারণা অনুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করে কাথিয়াবাড় এবং উত্তর গুজরাট তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য এইভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের বেশিরভাগ এর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের সংযোগ নিকটতর হয়েছিল। দেশের ভিতরে বাণিজ্য শুল্কের বাধা দূরীভূত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উজ্জয়িনীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কার্যত এই নগরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিমে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে প্রধান ঐতিহাসিক উপকরণ দিল্লী সংলগ্ন কুতুবমিনারের নিকটস্থ মেহেরাউলি গ্রামে প্রাপ্ত একটি লৌহস্তম্ভ লেখ। এই লেখতে কোন তারিখ নেই। এতে 'চন্দ্র' নামে একজন রাজার উল্লেখ আছে, যিনি বঙ্গের শত্রুদের মিলিতভাবে পরাজিত করেছিলেন, এবং সপ্তসিন্ধু পার হয়ে বহ্লীকদের পরাজিত করেছিলেন। এখানে বহ্লীক বলতে হিন্দুকুশ পরবর্তী ব্যাকট্রিয়া বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। যাঁরা এই লেখর 'চন্দ্র' এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে একই ব্যক্তি মনে করেন, তাঁরাও স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অতদূর অগ্রসর হননি। কিন্তু তবুও এই লেখ যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কিত তা মেনে নিতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি, কেননা এই লেখতে 'বহ্লীক' শব্দটির সঙ্গে 'সিন্ধো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'বহ্লীক' বলতে সিন্ধুনদ এলাকা বোঝানো হয়েছে। আর পাঞ্জাব বা তার বেশিরভাগ অংশকে যে বহ্লীক বলা হত, মহাভারত থেকে তা জানা যায়। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই বহ্লীক দেশ নিম্ন সিন্ধুর পশ্চিমে, বোধহয় বেলুচিস্তান অঞ্চলে ছিল। 'বঙ্গ' সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য এই যে, এই অঞ্চল নিশ্চয়ই বিদ্রোহ করেছিল এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

একমাত্র শকরাজ্য জয় করা ভিন্ন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর রাজত্বকালের অন্য কোন রাজনৈতিক ঘটনা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর সময়ে স্থাপিত কয়েকটি বিবাহ-সম্পর্ক রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করা হয়। তিনি নাগবংশের কন্যা কুবেরনাগাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের কন্যা প্রভাবতীকে বকাটক রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন। কুন্তলের (বোম্বাই প্রদেশের কানাড়া অঞ্চল) কদম্ব বংশীয় রাজা কাকুস্থবর্মনের একটি লেখ জানা থেকে যায়, তিনি তাঁর কন্যাদের গুপ্তরাজাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্রের সঙ্গে তিনি তাঁর একটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়, না তাঁর পরবর্তী শাসকের সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। তবে এই বিবাহ গুপ্তনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এইমাত্র বলা যায়। একথাও সত্য যে বকাটক-গুপ্ত মৈত্রীর ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য অভাবিতভাবে লাভবান হয়েছিল। প্রভাবতী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনি যুগপৎ প্রথম পৃথিবীসেন এবং তাঁর স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রসেনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যুর পর বকাটক রাজ্যের শাসনভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে বকাটক রাজ্যে গুপ্তদের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যু প্রভাবতীর কাছে ব্যক্তিগত ক্ষতি হলেও, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পক্ষে তা পরম লাভজনক হয়েছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হরিষেণের মতো কোন প্রশস্তি রচয়িতা ছিল না। তবে বিভিন্ন মুদ্রা থেকে তাঁর শারীরিক শক্তি, মানসিক উৎকর্ষ, শিল্পরুচি এবং ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কতকগুলি মুদ্রায় দেখা যায় যে তিনি 'সিংহ বিক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। দুটি কারণে এই অভিধাকে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়। এই অভিধা নিশ্চিতভাবে তাঁর সাহস ও শৌর্যের পরিচায়ক। অনেকে বলেন যে, ব্যাঘ্রের পরিবর্তে সিংহের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এ হয়তো সিংহ অধ্যুষিত গুজরাট জয়ের স্মারক। তাঁর কোন কোন মুদ্রায় 'রূপকৃতি' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, এই শব্দটি তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক উৎকর্ষ এবং উন্নত রুচিবোধের পরিচায়ক। কোন কোন মুদ্রায় কর্মব্যস্ত সম্রাটের শান্ত পারিবারিক জীবনের চিত্র বিধৃত। এখানে দেখা যায় যে, রাজা এবং রানী একাসনে বসে আছেন।

কোন কোন মুদ্রায় দেখা যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রম' এবং 'বিক্রমাঙ্কে'র সঙ্গে 'বিক্রমাদিত্য' অভিধা গ্রহণ করেছেন। এই শেষের অভিধাটি আবার আলোচনার বিষয় হয়েছে। অনেকে তাঁকে লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে ভেবেছেন। লোক-কাহিনীর এই বিক্রমাদিত্য ছিলেন একজন 'শকারী', উজ্জয়িনী অধিবাসী, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮ অব্দের বিক্রমাব্দের প্রবর্তনক এবং অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক। আপাতদৃষ্টিতে লোককাহিনীর এই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক সাদৃশ্য আছে। তিনি শকদের জয় করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর কোন কোন দলিলে তাঁকে 'উজ্জয়িনী এবং পাটলীপুত্রের রাজা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, যে তিনি ছিলেন গুপ্তাব্দের প্রবর্তক। এবং তিনি ছিলেন প্রখ্যাত 'নবরত্ন সভার' পৃষ্ঠপোষক। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্য ছিলেন, না লোক-কাহিনীর নায়কের অনুসরণে তিনি বিক্রমাদিত্য অভিধা গ্রহণ করেছিলেন, বলা কঠিন। এই দুইয়ের যেকোন একটি সম্ভাবনা সত্য হতে পারে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজে লোক-কাহিনীর বিক্রমাদিত্য না হলেও, হয়তো এই বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে জড়িত কিছু ঐতিহ্যের উৎস ছিলেন তিনি-ই। এমন হতে পারে যে মধ্যযুগের সূচনা যখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রায় বিস্মৃত, তখন তাঁর সঙ্গে উজ্জয়িনীর সম্পর্ক এবং তাঁর গুপ্তাব্দের প্রবর্তন, মালবের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, উজ্জয়িনীর রাজা এই বিক্রমাদিত্যই তাদের অতিপ্রিয় মালব অব্দের (অর্থাৎ বিক্রমাব্দের) প্রবর্তক। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, কৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। কিন্তু তাই বলে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ঐতিহাসিক পুরুষ বিক্রমাদিত্যই ঐতিহ্যের উৎস, তাহলে তা অত্যুক্তি হবে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রথাগত ধারণার অভিব্যক্তি ডঃ মজুমদারের বক্তব্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যজয় আরম্ভ করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে সেই রাজ্যজয় সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একটি সুসংগঠিত সাম্রাজ্যের মধ্যে উপজাতি রাজ্য, সীমান্ত রাজ্য, এমনকি বিদেশী শক কুষাণদের অঙ্গীভূত করার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। একটি শান্তিপূর্ণ সুসংহত সাম্রাজ্য তিনি তাঁর পুত্রের মহৎ উত্তরাধিকার রূপে রেখে গিয়েছিলেন। দূর ভবিষ্যতে সমুদ্রগুপ্তের স্মৃতি প্রায় মুছে গিয়েছিল, কিন্তু কৃতজ্ঞ উত্তরপুরুষ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। বহু যুদ্ধ-উত্তীর্ণ সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন

ইতিহাসের বীর নায়ক। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দ্বারা চিহ্নিত নতুন যুগের পুরোধা। তাই তাঁর স্থান হয়েছিল অসংখ্য মানুষের অন্তরে।

কিংবদন্তী অনুসারে বরাহমিহির এবং কালিদাস উভয়েই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নবরত্ন সভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালের আলোচনায় মনে হয়েছে যে বরাহমিহির কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন না। তিনি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্যভট্টের পরবর্তী ছিলেন। কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাসের সমকালীন অথচ কালিদাস বিরোধী দিগনাগাচার্যের উল্লেখ করেছেন। এই দিগনাগ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং কালিদাসও তাই ছিলেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে ঈষৎ পরিবর্তিত ধারণার সূচনা হয়েছে। অনেকের মতে তিনি হয়ত সমুদ্রগুপ্তেরও সমসাময়িক ছিলেন। কালিদাস তাঁর *রঘুবংশম্*-এ সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক সাফল্যকে ভিত্তি করে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনায় শকদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ জয়ের কোন উল্লেখ নেই। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তিনি শকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সুতরাং *রঘুবংশম্* এই ঘটনার পূর্ববর্তী রচনা। আনুমানিক ৪০০ খিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল মনে করা হয়। এই গ্রন্থটি কালিদাসের বিশেষ পরিণত সৃষ্টি। এর আগে নিশ্চয়ই তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা ছিল। সুতরাং তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন বলা চলে। তা যদি হয়, তাহলে তিনি সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন। একথা এখন মোটামুটি স্বীকৃত যে, বিক্রমাদিত্যকাহিনী কেবল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে নয়, সমুদ্রগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছিল। এমন হতে পারে যে, কালিদাস, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উভয়েরই রাজসভায় উপস্থিত থাকায় জনমানসে দুই জন সম্রাটের কৃতিত্ব মিশে গিয়ে বিক্রমাদিত্য ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল।

৪খ.২.৬ পরবর্তী গুপ্তরাজগণ প্রথম কুমারগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শেষ নিশ্চিত তারিখ ৪১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ এবং প্রথম কুমারগুপ্তের প্রথম নিশ্চিত তারিখ ৪১৫-১৬ খিস্টাব্দ। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক লেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলিতে তাঁর রাজত্বকালের সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। তবে এই লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান এবং ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত তাঁর মুদ্রা থেকে একথা বলা যায় যে, তাঁর সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য অটুট ছিল। তিনি নতুন ধরনের স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন। এই মুদ্রাগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। তাঁর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রৌপ্যমুদ্রার প্রবর্তনও তিনিই প্রথম করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের রৌপ্যমুদ্রার একটি বৃহৎ ভাণ্ডার বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত সাতরা জেলার সামন্দ নামক স্থানে পাওয়া গেছে। তাছাড়া তাঁর ১৩টি মুদ্রা বেরারের অন্তর্গত এলিচপুরে পাওয়া গেছে। অনেকে এই মুদ্রাগুলিকে এই অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তারের ইঙ্গিত বলে মনে করেন। তবে শুধু এই মুদ্রাগুলির উপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। আবার অনেকে বলেন যে এই মুদ্রাগুলি থেকে, তিনি যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তা বলা যায়। প্রথম কুমারগুপ্ত 'ব্যাঘ্র-বল-পরাক্রম' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিধা থেকে ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, তিনি হয়তো নর্মদা পরবর্তী ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যভূমি আক্রমণ করেছিলেন। তবে তাঁর মতে, এই অভিযান বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে উদ্ধার করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের দাক্ষিণাত্যে সফল অভিযানের ফলে হয়তো উত্তর দাক্ষিণাত্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত। কিন্তু তা হতে পারেনি, যেহেতু তাঁর রাজত্বের শেষ দিক থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য একের এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল পুষ্যমিত্রদের এবং হূণদের আক্রমণ। এই আক্রমণের ফলে গুপ্তগণ শুধু যে দাক্ষিণাত্যে অভিযানের ফসল ঘরে তুলতে পারেন নি তাই নয়, তাঁদের সম্প্রসার চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্কন্দগুপ্ত অল্পদিনের জন্য সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু তখন থেকেই এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণাত্মক নয়, আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

এলাহাবাদ জেলায়, যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে মানকুওয়ার গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্তির উপর প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ের একটি লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখতে তাঁকে 'মহারাজাধিরাজ' না বলে, 'মহারাজা' বলা হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, প্রথম কুমারগুপ্ত হয়তো তাঁর সার্বভৌম অধিকার হারিয়েছিলেন। কিন্তু দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত লেখ এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এই লেখতে প্রথম কুমারগুপ্তকে 'পৃথিবীপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় একটি চৈনিক গ্রন্থ এবং একশ্রেণীর গুপ্ত মুদ্রার ভিত্তিতে অনুমান করেন যে কুমারগুপ্তের সময় কামরূপ হয়তো গুপ্তদের বশ্যতা অথবা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছিল।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার দিক থেকে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং এই প্রসঙ্গে প্রথম দামোদরপুর লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৪ গুপ্তাব্দে, অর্থাৎ ৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই লেখতে বলা হয়েছে যে, একজন ব্রাহ্মণ তিন দিনার মূল্যে এক কুল্যবাপ পতিত জমি কিনতে চেয়ে স্থায়ী দানপত্রের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন ককরতে পারেন। জমির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে যথাযোগ্য অনুসন্ধানের পর তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। কোটিবর্ষ বিষয়ের স্থানীয় প্রশাসন এই আবেদন মঞ্জুর করেন। এই কোটি বর্ষ বিষয়টি ছিল কুমারামাত্য বেত্রবর্মনের শাসনাধীন এবং বেত্রবর্মন ছিলেন পণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিক (প্রদেশপাল) চিত্রদত্তের অধীন। এই লেখতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ও বিভিন্ন শ্রেণীবিভক্ত কর্মচারীপদের উল্লেখ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের নিকটস্থ কর্মদণ্ড গ্রামে প্রাপ্ত লেখর রচনাকাল ১১৭ গুপ্তাব্দ, অর্থাৎ ৪৩৭ খ্রিস্টাব্দ। এই কর্মদণ্ড লিঙ্গ লেখ থেকে জানা যায় যে প্রথম কুমারগুপ্তের কুমারামাত্য এবং মহাবলাধিকৃত (সেনাপতি) পৃথিবীসেন অযোধ্যায় কয়েকজন ব্রাহ্মণদের জন্য দানকার্য করেন। এই লেখগুলি থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, এরাণ এবং হয়তো অযোধ্যা, এই তিনটি প্রদেশের শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মদণ্ড লেখতে যে পৃথিবীসেনের কথা বলা হয়েছে, তিনি আগে কুমারামাত্য ছিলেন এবং পরে মহাবলাধিকৃত হয়েছিলেন, না কিংবা সঙ্গে দুইটি পদে নিযুক্ত ছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। প্রথম অনুমান সত্য হলে গুপ্তযুগে অসামরিক কর্মচারী পরে সামরিক পদে নিযুক্ত হতে পারতেন। আর দ্বিতীয় অনুমান সত্য হলে বলা যায় যে তখন একই ব্যক্তি সামরিক এবং অসামরিক উভয় প্রকার দায়িত্ব যুগপৎ পালন করতে পারতেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক কার্যের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। তাঁর সময়ের বিভিন্ন লেখতে তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯৬ গুপ্তাব্দের (৪১৬ খ্রিস্টাব্দ) বিলসর লেখতে মহাসেন কার্তিকেয়ের মন্দিরে স্তম্ভ নির্মাণের কথা আছে। তৃতীয় উদয়গিরি গুহালেখতে (গুপ্তাব্দ ১০৬, ৪২৬ খ্রিস্টাব্দ) জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। ১১৩ গুপ্তাব্দের (৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ) মথুরা

লেখতে জনৈক মহিলা কর্তৃক জৈন মূর্তি স্থাপনের কথা আছে। মান্দাসোর লেখতে সূর্যমন্দির নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। বগুড়া জেলার অন্তর্গত বৈগ্রাম গ্রামে প্রাপ্ত ১২৮ গুপ্তাব্দের (৪৪৮ খ্রিস্টাব্দ) একটি লেখতে ভগবান গোবিন্দস্বামীর মন্দিরে ফুল এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের জন্য এবং ঐ মন্দির মেরামতের জন্য, দুইজন ব্যক্তিকে জমি বিক্রয়ের কথা আছে। বিভিন্ন দেবীর মূর্তি ও মন্দির নির্মাণের যে কাহিনী বিভিন্ন লেখতে ইতস্তত পাওয়া যায়, তা থেকে অনায়াসে বলা চলে যে, ধর্মের ক্ষেত্রে প্রথম কুমারগুপ্ত পরম সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম কুমারগুপ্তের সময় জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সত্রের উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বিলসর লেখতে সত্র প্রতিষ্ঠার কথা আছে। গধোয়া লেখতে (এলাহাবাদ) একটি সত্রের জন্য ১২ দিনার দানের উল্লেখ আছে।

কর্মদণ্ড লেখতেও ব্রাহ্মণদের জন্য দানের কথা পাওয়া যায়। দামোদরপুরে প্রাপ্ত দ্বিতীয় লেখতে (রচনাকাল ১২৮ গুপ্তাব্দ, অর্থাৎ ৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ) পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাই বলে তাঁর রাজত্বকালে ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ্রাস পায় না। বরং বলা যায় যে ইতিপূর্বে সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে তার পরিণত ফল পাওয়া গিয়েছিল। ডঃ রায়চৌধুরী এবং ডাঃ মজুমদার উভয়েই বলেছেন যে চূড়ান্ত অবনতি শুরু হওয়ার পূর্বে তাঁর রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব উচ্চতম সীমা স্পর্শ করেছিল।

৪খ.২.৭ ঘটোৎকচগুপ্ত ও সম্ভাব্য ভ্রাতৃবিরোধ

প্রথম কুমারগুপ্তের অব্যবহিত পরের ইতিহাস ঈষৎ অনিশ্চিত। এ বিষয়ে এতদিন দুইটি ধারণা প্রচলিত ছিল। একটি ধারণা অনুসারে প্রথম কুমারগুপ্তের পরে তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধারণা অনুসারে কুমারগুপ্তের পরে সিংহাসনের জন্য তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ শুরু হয়েছিল এবং এই বিরোধ স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত দাবিদার পুরুগুপ্তকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছিলেন।

৪খ.২.৮ স্কন্দগুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত বারো বৎসর রাজত্ব করেছিলেন (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর রাজত্বকালের জন্য আমাদের প্রধানত দুটি লেখর উপর নির্ভর করতে হয়। একটি ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুনাগড়ে শিলালেখ, অন্যটি তারিখবিহীন ভিতারি স্তম্ভ লেখ।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, প্রথম কুমরগুপ্ত যখন মারা যান তখন স্কন্দগুপ্ত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি কীভাবে সিংহাসন লাভ করেন তা যেমন অনিশ্চিত, তেমনই তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকের ঘটনাবলী সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। ভিতারি স্তম্ভ লেখর চতুর্থ স্তবকে আছে যে, তিনি পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করেছিলেন, অষ্টম স্তবকে আছে যে, তিনি হূণদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। জুনাগড়ে শিলালেখ'র দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, বৈরী রাজারা তাঁর বিরুদ্ধে সাপের মতো ফণা উদ্যত করেছিলেন, কিন্তু তিনি গরুড়ের মতো স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহায়তায় তাঁদের দমন করেন। এই লেখরই তৃতীয় পংক্তিতে যাঁরা তাঁর কাছে মাথা হেঁট করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে "ম্লেচ্ছদেশের শত্রুদের" কথা

বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এখানে “ম্লেচ্ছ” বলতে হূণদের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ভিতারি স্তম্ভলেখতে হূণদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় এই ধারণা সত্য নাও হতে পারে। তাই অনেকে মনে করেন যে, এখানে ‘ম্লেচ্ছ’ বলতে কিদার কুষাণদের কথা বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বকাটকগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পুষ্যমিত্রগণ প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করে সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করেন। তবে তিনি যুবরাজ হিসাবে, না তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, তা বলা যায় না। জুনাগড় শিলালেখতে তিনি উদ্যত ফণা সাপের মতো শত্রু এবং প্রতিষেধক গরুড় বলতে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। অনেকে মনে করেন যে এখানে পশ্চিম মালবের বিদ্রোহী বর্মণ বংশীয়দের, আক্রমণকারী বকাটক এবং তাদের সমর্থকগণকে বোঝানো হয়েছে, এবং ‘গরুড়’ বলতে অন্তত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুহৃদ, দাসপুরের শাসক প্রভাকরকে বোঝানো হয়েছে। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বর্মণগণ স্কন্দগুপ্তের কাছে পরাজিত হন, কিন্তু প্রভাকর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হননি। তাঁকে দাসপুরের নতুন প্রদেশপাল নিযুক্ত করা হয়েছিল।

হূণ আক্রমণ প্রতিহত করা স্কন্দগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে বিবেচিত হয়। ভিতারি স্তম্ভলেখতে কোন তারিখ না থাকায় এই হূণ আক্রমণ ঠিক কখন হয়েছিল, বলা কঠিন। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত সম্পর্কে গুপ্তদের নীতির দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ কোনদিনই এই অঞ্চল সম্পর্কে বলিষ্ঠ কোন নীতি গ্রহণ করেননি। মেহেরাউলি স্তম্ভলেখ অনুযায়ী ‘চন্দ্র’ সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করে বহ্লীকদের আক্রমণ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু এই অঞ্চলে স্থায়ী অধিকার স্থাপন এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। অবশিষ্ট ভারতের উপর তাঁদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে পাঞ্জাব এবং খাইবার গিরিপথের উপর নিয়ন্ত্রণ যে একান্ত প্রয়োজন, তাঁরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। এ দিক থেকে গুপ্তগণ মৌর্যগণের তুলনায় রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি পাঞ্জাব ও খাইবার গিরিপথ সুরক্ষিত রাখতে পারতেন, তাহলে হূণদেরদ সঙ্গো তাঁদের যুদ্ধ মালব এবং মধ্যভারতে অনুষ্ঠিত না হয়ে সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে অনুষ্ঠিত হত। এই অঞ্চলে সামরিক গুরুত্বের সঙ্গো অর্থনৈতিক গুরুত্ব যুক্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গো ভারতের বাণিজ্যপথগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও গুপ্তগণ এই অঞ্চলে তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারেননি, কেননা ভৌগোলিক বাধা ছিল খুব প্রবল। গঙ্গা উপত্যকার সঙ্গো সিন্ধু উপত্যকা যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দ্বারা যুক্ত (বর্তমান থানেশ্বর-দিল্লি-কুরুক্ষেত্র ভূভাগ), সেই ভূভাগ অরণ্যসঙ্কুল ও দুর্গম ছিল। তাই গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন শক্তির পক্ষে সিন্ধু উপত্যকা জয় করা সহজ ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুপ্তদের উত্তর-পশ্চিম ভারত নীতি বোঝা যায়, কিন্তু তাকে সমর্থন করা যায় না।

তৎকালীন হূণ নেতা আটিলা দানিউব নদের তীর থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসকার্য চালিয়েছিলেন, একথা মনে রাখলে হূণদেরদ বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের সাফল্যের তাৎপর্য পরিমাপ করা সহজ হয়। হূণদের পরাজিত করে তিনি সঙ্গাতভাবেই ‘বিক্রমাদিত্য’ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গো মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাপক হূণ আক্রমণের সম্মুখীন তখন ভারতকে হতে হয়নি। প্রথমত, ভারত হূণদের প্রধান আক্রমণ পথ থেকে অনেক দূরবর্তী ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারত এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে পর্বতমালার দুস্তর

বাধা ছিল। এই বাধা অতিক্রম করে হূণদের যে শাখা ভারত আক্রমণ করেছিল, ভারতে পৌঁছে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণকারী হূণদের যদি সমুদ্র বলা যায়, তাহলে ভারতে আক্রমণকারী হূণরা ছিল সেই সমুদ্রের একটি তরঙ্গ মাত্র। পারস্য আক্রমণকারীদের কাছে পথ যতটা উন্মুক্ত ছিল, পর্বতমালার কল্যাণে ভারত তা ছিল না। তাই পারস্য সম্রাট ফিরোজ হূণদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, আর গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাজিত করেছিলেন। তার পরে ৫০ বৎসর আর হূণ আক্রমণ হয়নি। এ থেকে তাঁর সাফল্যের পরিমাপ করা যায়।

একদা মনে করা হত যে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণরা বারবার ভারত আক্রমণ করেছিল। এই অনুমানের ভিত্তি ছিল স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার ভারি ওজন। মনে করা হত যে, বারংবার আক্রমণজনিত বিপর্যয়ের জন্য স্কন্দগুপ্তের মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেশি হয়েছিল। এখন এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে, কেননা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, স্কন্দগুপ্তের মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেশি ছিল না। বরং সোনার পরিমাণ বেশি ছিল।

স্কন্দগুপ্ত কেবল যুদ্ধেই নয়, সাম্রাজ্য শাসনেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জুনাগড় শিলালেখর ষষ্ঠ পংক্তিতে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আবশ্যিক গুণাবলীর যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে তিনি জনগণের কল্যাণ সাধন ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায়। সুরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদের সংস্কার তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জুনাগড় লেখতে বৃষ্টির জলে কীভাবে এই হ্রদটি বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং সুরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তা পর্ণদত্ত কীভাবে তাঁর পুত্র, স্থানীয় প্রশাসক চক্রপালিতের সাহায্যে মাত্র দুই মাসের মধ্যে ১০০ হাত লম্বা, ৬৮ হাত চওড়া, এবং সাতমানুষ সমান উঁচু বাঁধ সেখানে নির্মাণ করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে সক্রাদিত্য (স্কন্দগুপ্তের অন্যতম অভিধা) নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তা যদি হয়, তাহলে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। চীনের সঙ্গে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের জীবনের শেষ দিনগুলি শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শাসনকার্যে তিনি কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সুরাষ্ট্রের প্রদেশপাল পর্ণদত্ত, তাঁর পুত্র চক্রপালিত, অন্তর্বেদীর (গাঙ্গেয় দোয়াবের) বিষয়পতি সর্বনাগ এবং কোশলের শাসন ভীমবর্মণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে ভাগবত, অর্থাৎ কৃষ্ম-বিষ্নুর উপাসক হওয়া সত্ত্বেও অন্যের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন নি। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার অন্তর্গত কাহাযম নামক স্থানে প্রাপ্ত স্তম্ভলেখতে মদ্র নামক একজন ব্যক্তি কর্তৃক ১৪১ গুপ্তাব্দে (৪৬১ খ্রিস্টাব্দ) পাঁচজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিসহ একটি স্তম্ভ স্থাপনের কথা আছে।

পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে স্কন্দগুপ্তের সময়েও মধ্যভারত এবং সুরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বল অংশরূপে বিবেচিত হত। স্কন্দগুপ্ত বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সাম্রাজ্যের পশ্চিমতম অংশকে ভবিষ্যৎ দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। এমন একটি লেখ অথবা মুদ্রাও পাওয়া যায়নি, যার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের পরে সুরাষ্ট্র এবং পশ্চিম মালব নিশ্চিতভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হূণ আক্রমণ সত্ত্বেও তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্য অটুট ছিল। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্ত যখন মারা

যান, তখন তিনি অথবা অন্য কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, অল্পকাল পরে, তাঁদেরই চোখের সামনে এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে।

৪খ.৩ গুপ্তসাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন

স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাটদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দ্রুত হ্রাস পায়। স্কন্দগুপ্ত পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস তাই এই সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতি এবং পতনের কাহিনী।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির মধ্যে প্রথমেই পরবর্তী সম্রাটদের সন্ন্যাস ধর্ম সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা বলা যায়। প্রথম দিকের গুপ্ত সম্রাটগণ বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম তাঁদের সাম্রাজ্যিক আকাঙ্ক্ষা পুরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে সন্ন্যাস ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবের ফলে তাঁদের যুদ্ধোন্মাদনা ক্রমশ হ্রাস পায়। যুদ্ধবিমুখ সম্রাটগণ আর যাই হোক, সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেন না। তাঁদের মধ্যে এই প্রবণতা সর্বপ্রথম প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে চোখে পড়ে। তিনি এক ধরনের মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন, যাকে অপ্রতিঘ ধরন বলা হয়। এই মুদ্রায় তিনি সন্ন্যাসী পোশাক পরিহিত। এ থেকে অনুমান করা চলে যে, শেষ বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এই মুদ্রায় যে ‘অপ্রতিঘ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, ভারতীয় মহাকাব্যে এবং প্রাচীন সাহিত্যে তার অর্থ ‘অপরাজেয়’। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মে ‘প্রতিঘ’ শব্দের অর্থ ক্রোধ। সুতরাং অপ্রতিঘ শব্দের অর্থ অক্রোধ। এই মুদ্রা তাই বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রথম কুমারগুপ্তের বিশেষ আসক্তির পরিচয় দেয়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ পণ্ডিত পরমার্থের রচনায় গুপ্ত রাজপরিবারের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, বিক্রমাদিত্য (স্কন্দগুপ্ত) তাঁর রানী এবং যুবরাজ বালাদিত্যকে (নরসিংহগুপ্ত) অধ্যয়নের জন্য বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তৎকালীন গুপ্ত সম্রাটদের উপর এই বসুবন্ধুর প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। পরমার্থ লিখেছেন যে, তাই সাংখ্যদর্শনের পৃষ্ঠপোষক স্কন্দগুপ্ত বৌদ্ধধর্মে আগ্রহী হয়েছিলেন।

গুপ্তযুগের প্রথম দিকের এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরবর্তীকালে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে আধা-সামন্ততান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পরিণত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এই পরিবর্তিত রাষ্ট্রকাঠামোরই অন্যতর দিক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম দিকের শাসনব্যবস্থার মধ্যে এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত কিছুসংখ্যক রাজাকে নিয়মিত করদান-এবং অন্য কয়েকটি শর্তে তাঁদের হৃত রাজ্যগুলি ফিরিয়ে দিয়ে এই পরিবর্তনের সুচনা করেছিলেন। অবশ্য সমুদ্রগুপ্তের সময় তাঁর অধীন নরপতিদের সম্পর্কে ‘সামন্ত’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়নি। এই শব্দের ব্যবহার সর্বপ্রথম বৈন্যগুপ্তের গুনাইগড় লেখতে (৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) দেখা যায়। মৌখারী নৃপতি অনন্তবর্মণের বারাবার গুহালেখতে তাঁর পিতাকে “সামন্ত চূড়ামণি” বলা হয়েছে। বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এ সামন্তদের দায়িত্বের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। হরিষেণ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত তাঁর অধীন নৃপতিদের লিখিত সনদ দিয়েছিলেন। এই প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রত্যন্ত রাজ্য এবং বৈদেশিক নৃপতিদের ছাড়াও সোনাকানিক মহারাজা (৮২ গুপ্তাব্দের উদয়গিরি গুহালেখ) এবং মহারাজা ত্রিকমলের (৬৪ গুপ্তাব্দের গয়া লেখ) নাম পাওয়া গেছে। মধ্য ভারতের পশ্চিম অংশের তিনজন শাসক, মহারাজা স্বামীদাস,

মহারাজা ভুলুণ্ড এবং মহারাজা রুদ্রদাস যথাক্রমে ৬৭,১০৭ এবং ১১৭ গুপ্তাব্দে ভূমিদান পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে, সামন্ততন্ত্রজনিত যে দুর্বলতা, তা পরবর্তীকালের গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করেছিল।

খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, গুপ্ত সাম্রাজ্যকে তার রাজনৈতিক দিক বলা হয়। সুতরাং গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। গুপ্তযুগের রাজারা ভূমি অথবা গ্রাম দানের সঙ্গে দণ্ডদানের এবং প্রায় সকল প্রকার রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের অধিকার পরিত্যাগ করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর লেখক বুদ্ধগোষ ব্রহ্মদেয় দান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর সঙ্গে বিচার ও শাসন অধিকার যুক্ত ছিল। গুপ্তযুগে এই অধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য অনিবার্যভাবে দুর্বল হয়েছিল। এর ফলে শাসন বিষয়ে প্রায়-স্বাধীন এক ব্রাহ্মণ সামন্তশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুন্দেলখণ্ডের ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক-মহারাজাদের কথা বলা যায়। এ বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত ৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে এরাণের বিষয়পতি মাতৃবিষ্ণু। তাঁর পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ হিসাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। কিন্তু মাতৃবিষ্ণু সামান্য একজন বিষয়পতি হয়েও নিজেকে ‘মহারাজা’ বলে অভিহিত করেছেন।

গুপ্তযুগে সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের সামরিক এবং শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নগদ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করতেন কিনা তা সঠিক বলা যায় না। তবে অসংখ্য ভূমিদান পত্র থেকে জানা যায় যে, সামরিক কর্মচারীরা নগদ বেতন পেলেও, অন্যান্য কর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি পেতেন। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে অনেক সরকারি পদ বংশানুক্রমিক হয়েছিল। ভোগিক, মন্ত্রিণ, সচিব এবং অমাত্যপদ বংশানুক্রমিক হয়েছিল। হরিষেণ নিজে একজন মহাদণ্ডনায়ক ছিলেন। তাঁর পিতা ধ্রুবভূতিও তাই ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বীরসেনের পরিবার এবং প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পৃথিবীসেনের পরিবার থেকে এক পুরুষের বেশিকাল ধরে মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উপরিকগণের জয়দত্ত, ব্রহ্মদত্ত ইত্যাদি নাম থেকে মনে হয় যে, এখানে এই পদটিও বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। এই দুইজন উপরিক সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, দামোদরপুর লেখ থেকে জানা যায় যে, প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে ছিলেন উপরিক চিরাতদত্ত, কিন্তু পরবর্তীকালে, বুধগুপ্তের সময়, এই একই ভুক্তিতে ছিলেন উপরিক-মহারাজা জয়দত্ত এবং উপরিকমহারাজা ব্রহ্মদত্ত। বলা বাহুল্য এর ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন পরিবারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়েছিল, তেমনই অন্যদিকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ক্রমশ দুর্বলতর হয়েছিল। এই একই ঘটনা ঘটেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমতম প্রদেশে, সুরাষ্ট্রে। প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ বংশানুক্রমিক হওয়ায় সেখানে মৈত্রক রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয়ের যে চিত্র সমসাময়িক লেখ ভূমিদান পত্র দ্বারা উদ্‌ঘাটিত, সমকালীন মুদ্রায়ও তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হূণ আক্রমণ সত্ত্বেও স্কন্দগুপ্ত কিছুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তী সম্রাটগণ বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা বেশি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করতে পারেন নি। উপরন্তু, পরবর্তীকালের স্বর্ণমুদ্রায় সোনার পরিমাণও ক্রমশ হ্রাস পায়। তাছাড়া স্কন্দগুপ্ত বহু ও বিচিত্র রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। বুধগুপ্ত তাও করতে পারেননি। তিনি তাঁর রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন শুধু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলিতে বজায় রেখে অন্যত্র, যেমন গুজরাটে এবং কাথিয়াবাড়ে তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী গুপ্তযুগে রৌপ্যমুদ্রার এই দুষ্প্রাপ্যতার উপর অনেকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের

মতে এই দুষ্প্রাপ্যতা তৎকালীন বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতির পরিচায়ক। সাধারণত বাণিজ্যের এই অবনতির জন্য পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলা হয়। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পতন সত্ত্বেও ভারতের বহির্বাণিজ্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, গুপ্তযুগে রৌপ্যমুদ্রায় তুলনায় স্বর্ণমুদ্রার আধিক্য এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। অন্যদিকে রৌপ্যমুদ্রার স্বল্পতা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সঙ্কোচনের ইঙ্গিত দেয়। গুপ্তযুগের রাষ্ট্র বেসরকারি এই বসতিগুলিকে রক্ষা করত এবং পরিবর্তে মৌর্যযুগের তুলনায় কম হারে, দ্রব্যের মাধ্যমে, সেখান থেকে কর আদায় করত। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, গুপ্তযুগের এই সমৃদ্ধিই তার কাল হয়েছিল। প্রায় স্বয়ম্ভর গ্রামের অর্থ দাঁড়িয়েছিল মাথাপিছু দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস। অথচ বৃহৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের ভরণপোষণের জন্য ব্যাপক উৎপাদন, বিস্তৃত বাণিজ্য এবং পর্যাপ্ত অর্থ-রাজস্বের প্রয়োজন ছিল। পরিবর্তিত অবস্থায়, অর্থাৎ উৎপাদন হ্রাসের ফলে, বাণিজ্যের পরিমাণও বিশেষ কমে গিয়েছিল। যে গিল্ডগুলি সাতবাহনদের সময় এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, গুপ্তযুগে সেগুলি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রতি গ্রামে কারিগর এবং যন্ত্রশিল্পীদের রক্ষা করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্রব্যের মাধ্যমে যে কর আদায় করা হত, স্থানীয়ভাবে তাকে ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। এইভাবে যে বাণিজ্যের সাহায্যে সংগৃহীত দ্রব্যকে নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যেত (এবং সৈন্যদল রক্ষার জন্য যে নগদ অর্থের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি তা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এরই পরিণতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী দুর্বল হয়েছিল এবং স্থানীয় রাজা-মহারাজা, উচ্চাভিলাষী সামন্ত এবং হঠকারী রাজকর্মচারীদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি এবং পতনের সাধারণ কারণগুলি নির্দেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তার ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া এখনও পর্যন্ত প্রায় অসম্ভব। ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত কালসীমায় ঠিক কতজন গুপ্ত শাসক রাজত্ব করেছিলেন, তাও বলা কঠিন। এই রাজাদের সংখ্যা ছিল দশ বা তার কাছাকাছি। বিভিন্ন লেখ অথবা মুদ্রায় কিংবা সিল-এ তাঁদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই নামের অধিক কিছু পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের কৃতিত্ব অথবা ব্যর্থতা, এমনকি পারর্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

মনে হয় স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পরের বৎসরগুলিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্গতির সময় পশ্চিম এশিয়া থেকে ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সময় এসেছিল হূণরা। এই হূণদের আদি বাসস্থান ছিল চীনের কাছাকাছি। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে, তারা দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি শাখা ভল্গানদীর দিকে এবং অন্যটি ইক্ষাকু (অ'াস) নদীর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই দ্বিতীয় শাখাটি, পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে, ইক্ষবাকু উপত্যকায় বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এখান থেকে তারা পারস্য এবং ভারত আক্রমণ করে। পারস্য সম্রাট ফিরোজ এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি, কিন্তু গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত পেরেছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তীকালে, হূণদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা, সুঙইয়ুন এবং কোসমাসের বিবরণ থেকে জানা যায়। সুঙইয়ুন ৫১৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের রাষ্ট্রদূত হয়ে গান্ধারে হূণরাজার কাছে এসেছিলেন। কোসমাস, একজন আলেকজান্দ্রিয় গ্রীক, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর বিবরণ লিখেছিলেন। জৈন গ্রন্থ *কুবলয়মালা* (৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এ বিষয়ে আংশিক সাহায্য করে।

'স্কন্দগুপ্তের পরবর্তীকলে ভারতে হূণ আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তোরমান। তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে হূণ শক্তিকে সংহত করেন। শতদ্রু থেকে যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাপ্ত তাঁর ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রাগুলি এই আভাস দেয়। পরে তিনি পাঞ্জাব থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। মনে হয় এই আক্রমণে তিনি গুপ্ত বংশজাত কোন কোন ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্যলাভ করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জন্য তা সম্ভব হয়েছিল। *কুবলয়মালা*-য় গুপ্ত বংশজাত হরিগুপ্তকে তোরমানের 'গুরু' বলা হয়েছে। পাঞ্চালের অন্তর্গত রামনগরে আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দের হরিগুপ্ত নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। সম্ভবত এঁরা দুজন অভিন্ন ছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, হরিগুপ্ত শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তোরমানের দু'টি সিল কৌশাম্বীতে পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় যে তিনি অন্তর্বেদী, অন্তত কৌশাম্বী পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তিনি যে মালব জয় করেছিলেন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর 'রাজাধিরাজ' এবং 'মহারাজাধিরাজ' অভিধা থেকে মনে হয় যে, তিনি উত্তর ভারতে গুপ্ত সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তোরমান গুপ্ত সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ জয় করেছিলেন। তাঁর বিক্ষিপ্ত মুদ্রা থেকে মনে হয় যে, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অনেকাংশ তিনি জয় করেছিলেন। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে মনে করেন যে ৪৯৯-৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি গুপ্তদের বিরুদ্ধে সাফল্যলাভ করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কলহের পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিজিত অঞ্চলে শাসনব্যবস্থায় তিনি অকারণ হস্তক্ষেপ ক রেন নি। ধন্যবিষ্ণুর প্রতি তাঁর আচরণে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় তিনি সূর্য প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ধন্যবিষ্ণু এরাণে নারায়ণ মন্দির স্থাপন করতে পেরেছিলেন। পাঞ্জাবে প্রাপ্ত কুরা লেখতে "রাজাধিরাজ মহারাজ-তোরমান-শাহি-জৌবল"-এর উল্লেখ আছে। এই লেখটি প্রকৃতপক্ষে তোরমানের কিনা, এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সে যাই হোক, এতে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের কথা আছে। *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। *কুবলয়মালা*-এ জৈন ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জেলিতে প্রাপ্ত তোরমানের একটি তাম্র পট্টে একটি মন্দিরের হিতার্থে তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, মনে হয় যে তোরমান ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর রাজ্যজয়কে স্থায়ী করতে পারেননি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কোসমাসের বিবরণে বলা হয়েছে যে সিন্ধুনদ হূণ অধিকৃত অঞ্চল এবং অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল। এ থেকে মনে হয় যে, তোরমান এরাণ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন হতে পারে যে, ভানুগুপ্তই তাঁকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেছিলেন। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, কেননা এরাণ লেখ এ বিষয়ে নীরব। তোরমানের এই ব্যর্থতার জন্য তাঁর পুত্র মিহিরকুলকে পুনরায় যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। গোয়ালিয়রে মিহিরকুলের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে (আনুমানিক ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি লেখ পাওয়া গেছে। সুতরাং ঐ সময়, এই অঞ্চল যে তাঁর অধিকারে ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে মিহিরকুল সমগ্র ভারত জয় করেছিলেন। কোসমাসও তাঁকে সমগ্র ভারতের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে দুজন ভারতীয় নৃপতি, মালবের রাজা যশোধর্মন এবং নরসিংহগুপ্তের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

হূণ এবং বকাটকদের যুগপৎ আক্রমণের ফলে মালব তখন বিপর্যস্ত। এর ফলে এই অঞ্চলের উপর গুপ্তদের

অধিকারও অনেকাংশে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় নরপতি যশোধর্মন। তিনি মালবে নিজের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি এত বেশি শক্তি অর্জন করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে মিহিরকুলকে পরাজিত করা, এমনকি গুপ্ত সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বকেও অস্বীকার করা সম্ভব হয়েছিল।

মিহিরকুলের বিরুদ্ধে যশোধর্মনের সাফল্যের কথা ৫৮৯ মালবাব্দের, অর্থাৎ ৫৩১ খ্রিস্টাব্দের, মান্দাসোর লেখ থেকে জানা যায়। এই লেখ একটি প্রশস্তি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এতে কিছুটা অত্যুক্তি আছে। তবুও এর মোটামুটি বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। এতে বলা হয়েছে যে, উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত (গঞ্জাম জেলা) পর্যন্ত এবং পূর্বে লৌহিত্য নদ (ব্রহ্মপুত্র) থেকে শুরু করে পশ্চিমে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তিনি তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর বাহুবলের দ্বারা হিমালয়ের দুর্গমতার দর্প চূর্ণ করেছিলেন। এমনকি পরাক্রান্ত রাজা মিহিরকুলও তাঁর কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলেন।

মান্দাসোর লেখতে মিহিরকুল এবং হূণ দুইয়েরই উল্লেখ আছে, কিন্তু এমনভাবে আছে যে, তা থেকে মিহিরকুল যে হূণ ছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। তোরমান এবং মিহিরকুলের মুদ্রা সম্পর্কেও সে একই কথা প্রযোজ্য। এই অবস্থায় প্রায় সব ঐতিহাসিকই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে হূণদের বৃহৎ ভূমিকার উল্লেখ করায় ডঃ মজুমদার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই বিশ্বাস তোরমান এবং মিহিরকুল হূণ নৃপতি ছিলেন, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হয়তো তাঁরা হূণই ছিলেন, কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তোরমান একজন কুষাণ নরপতি ছিলেন এবং অনেকটা হূণদের মতো হওয়াতে ভারতে তাঁকে হূণ বলে ভুল করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কুরা লেখতে তোরমানকে শাহিজৈবৈল বলা হয়েছে। এবং সম্ভবত জৈবৈল ছিল হূণদের একটি উপাধি। সে যাই হোক, যশোধর্মন মিহিরকুলকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারেন নি। অনতিকাল পরে যশোধর্মনের পতন ঘটলে, মিহিরকুল পুনরায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

যশোধর্মনের পর মিহিরকুলকে হয়তো নরসিংহগুপ্তের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিহিরকুল এবং নরসিংহগুপ্তের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য আমাদের প্রধানত হিউয়েন সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়। হিউয়েন সাঙ ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সাকলে (শিয়ালকোট) গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর সাকল দর্শনের "কয়েক শতাব্দী" পূর্বে বালাদিত্যের দ্বারা মিহিরকুল পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা, প্রকৃতপক্ষে কয়েক শতাব্দী পূর্বে নয় প্রায় একশো বৎসর আগে ঘটেছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণে সন তারিখের এই অসঙ্গতি, মিহিরকুল সম্পর্কিত তাঁর বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে হিউয়েন সাঙের চেয়ে যোগ্যতার উপাদান আমাদের হাতে নেই।

নরসিংহগুপ্ত যশোধর্মনের আক্রমণের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ায় মিহিরকুল সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, নরসিংহগুপ্ত মিহিরকুলকে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। তার পরে নরসিংহগুপ্ত কীভাবে শক্তি সঞ্চয় করে মিহিরকুলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন, হিউয়েন সাঙ তার বিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কাহিনী সর্বদা যথাযথ নয়, তবুও তাঁর মূল বক্তব্য সত্য বলে মেনে নিতে হয়তো কোন বাধা নেই। একথা মেনে নেওয়া যায় যে, বালাদিত্য মিহিরকুলকে

পরাজিত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন। মিহিরকুলের এই পরাজয়ের ফলে ভারতে হূণদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়েছিল। এর পরে আর কোনোদিন হূণরা ভারত ইতিহাসের বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি।

উপরের এই বিবরণ থেকে মনে হয় যে, মিহিরকুল দুইবার, একবার যশোধর্মনের কাছে এবং আর একবার নরসিংহগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। অনেকে এ বিষয়ে একটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন যে, এমনও হতে পারে যে, যশোধর্মন স্বাধীনতা ঘোষণা করে নরসিংহগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি হয়তো তাঁর পরবর্তী সমৃদ্ধির দিনগুলিতে মিহিরকুলের বিরুদ্ধে তাঁদের মিলিত জয়লাভকে তাঁর একক জয়লাভ বলে ভেবেছিলেন। মান্দাসোর লেখতে হয়তো এই জয়লাভের কথাই বলা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, মিহিরকুল এবং নরসিংহগুপ্তের বিরোধের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি ছিল না। ধর্মীয় প্রশ্ন এই বিরোধের বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। নরসিংহগুপ্ত নিজে বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে মিহিরকুল ছিলেন প্রচণ্ডভাবে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী। উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম তাই এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

তোরমান এবং মিহিরকুলের আক্রমণের সময় এবং অনেকাংশে তাঁদের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ভাঙনের চিহ্নগুলি আরও প্রকট হয়েছিল। প্রথমত, সামন্ত নরপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এই সময় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের আর্থিক সম্পদও ক্রমশ কমে এসেছিল। একই ধরনের (রাজার তীরন্দাজ মূর্তি-সম্বলিত) অল্পসংখ্যক তৎকালীন হীনমানের মুদ্রায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, মৌখরি এবং পরবর্তী গুপ্ত নরপতিদের বিভিন্ন লেখতে চারদিকে যুদ্ধবিগ্রহের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে অস্থির উত্তেজনায় মুহূর্তগুলির কথা মনে আনে।

বকাটকগণের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, বকাটক বংশের বৎসগুল্ম শাসক হরিষেণ এই সময় মালব, গুজরাট এবং অন্যান্য অঞ্চলের উপর তাঁর রাজনৈতিক অধিকার বিস্তৃত করেন। হরিষেণের উত্থান খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, গুপ্তগণ যখন হূণদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তখন হরিষেণ এই অঞ্চলগুলি আক্রমণ করেছিলেন, যদিও তাঁর সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

হরিষেণের পর এসেছিলেন যশোধর্মন। তিনি মালবে নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আনুমানিক ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক দিগন্তে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করে তিনি আবার ধূমকেতুর মতোই মিলিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। মান্দাসোর লেখতে তাঁর রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবুও বলা যায় যে, হূণ এবং গুপ্তদের পরাজিত করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ভানুগুপ্ত যা পারেন নি, তিনি তাই পেরেছিলেন। গুপ্ত সম্রাট নরসিংহগুপ্ত তাঁকে প্রতিহত করতে পারেননি। কিন্তু তিনিও কোন স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের উত্তরবঙ্গের একটি ভূমিদানপত্রে দেখা যায় যে, সেখানে গুপ্ত সম্রাটের নামোল্লেখ করা হয়েছে, যশোধর্মনের করা হয়নি।

অন্যভাবে দেখলে বলা যায় যে, যশোধর্মন বিদ্রোহের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ক্ষয়িষ্ণু গুপ্তসাম্রাজ্যের

পক্ষে তা মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মৌখরিগণ এবং পরবর্তী গুপ্তগণ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাই ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ যত আলগাভাবেই হোক না কেন, যে ঐক্যসূত্রের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল, হূণদের নির্মম তরবারি তা ছিন্ন করেনি, যশোধর্মনের উচ্চাশা, করেছিল। সুতরাং তাঁর মতে, হূণদের তুলনায় যশোধর্মন সাম্রাজ্যের বেশি ক্ষতি করেছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে পরবর্তী গুপ্তদের কী সম্পর্ক ছিল তা সঠিক বলা যায় না। নাম, সময় এবং উভয়ের অধিকৃত অঞ্চল দেখে মনে হয় যে, তাঁদের মধ্যে রক্ত-সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পরবর্তী গুপ্তদের কোন লেখতে এই রক্তের সম্পর্কের উল্লেখ নেই। পরবর্তী গুপ্তদের প্রথম রাজা কৃষ্ণগুপ্তের আফসদ (গয়ার নিকটবর্তী) লেখতে তাঁদের 'সৎবংশজ' বলা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই পরবর্তী গুপ্তগণ মালব এবং মগধ শাসন করতেন।

মৌখরিগণের মতো পরবর্তী গুপ্তগণও প্রথমদিকে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। এই বংশের চতুর্থ প্রতিনিধি কুমারগুপ্ত মৌখরি বংশের চতুর্থ ব্যক্তি রাজা ইশানবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় যে, একই সময়ে এই দুটি বংশের উত্থান ঘটেছিল। কুমারগুপ্তের প্রথম তিনজন পূর্বসূরী, কৃষ্ণগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত এবং জীবিতগুপ্ত সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এই পরিবারের খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকের আফসদ লেখতে জীবিতগুপ্তের যুদ্ধাভিযানের কথা আছে। তবে তিনি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে সামন্ত নৃপতি হিসাবে, না স্বাধীন রাজা হিসাবে এই যুদ্ধ করেছিলেন, তার কোন উল্লেখ সেখানে নেই। কুমারগুপ্তও কি হিসাবে ইশানবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন, তাও অনিশ্চিত। তবে তিনি সামন্ত নৃপতিরূপেই যদি জয়লাভ করে থাকেন, তাহলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই জয়লাভের ফলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উত্থানের পথ সুগম হয়েছিল। অন্তত কৃষ্ণগুপ্তের সময় থেকে পরবর্তী গুপ্তগণ স্বাধীন হয়েছিলেন। যুদ্ধে কুমারগুপ্ত যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিলেন, তার প্রমাণ এই যে, আফসদ লেখতে বলা হয়েছে যে, তিনি প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র দামোদরগুপ্ত পুনরায় মৌখরিদের পরাজিত করেছিলেন।

শুধু মৌখরিগণ এবং পরবর্তী গুপ্তগণ নয়, 'বঙ্গ' অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশও (সমতট) এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিল। গুণাইগড় লেখতে বৈন্যগুপ্তকে 'মহারাজা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন কিনা, এই লেখতে তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে তাঁর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রা তাঁর স্বাধীনতার পরিচায়ক। তা যদি হয়, তাহলে তাঁর সময় থেকেই বঙ্গে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর তা যদি না হয়, তাহলেও অল্পকাল পরে 'মহারাজাধিরাজ' আখ্যাযুক্ত স্থানীয় রাজাদের অধীনে বঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই রাজাদের মধ্যে একজন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। যদি বা আগে না হয়, অন্তত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। বঙ্গের এই স্বাধীন নৃপতিগণ তাঁদের রাজত্বকালের উল্লেখ করে ভূমিদানপত্র প্রচার করেছিলেন।

নরসিংহগুপ্ত যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন অভ্যন্তরীণ কলহ এবং হরিষেণ ও তোরমানের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্যের যে অবস্থা হয়েছিল, তৎকালীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থা ছিল অনেকটা সেইরকম। অল্পকাল পরে যশোধর্মন

অস্ত্রধারণ করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, মান্দাসোর লেখতে যশোধর্মনের যে কৃতিত্বের কথা আছে, তার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। ছিল নেহাতই প্রথাগত দিগ্বিজয়-বর্ণনা। এই বর্ণনার আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করলেও, বোধহয় বলা চলে যে তাঁর আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বলভীর মৈত্রক বংশের রাজা প্রথম ধ্রুবসেন (৫২৫-৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর ১৪টি দানপত্র পাওয়া গেছে। সর্বত্র তিনি 'পরমভট্টারক পদানধ্যাতা' শব্দগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে গুপ্ত সম্রাটের প্রতি তাঁর নামমাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। প্রথম ধ্রুবসেনের অল্পকাল পরে বলভীর নথিপত্রে আর এই শব্দগুলি পাওয়া যায় না। ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের দামোদরপুর লেখও এই অঞ্চলে একই স্থিতাবস্থার পরিচয় দেয়। এর থেকে মনে হয় যে, গৌড়ের উপর তখন গুপ্তদের অধিকার বলবৎ ছিল। যশোধর্মন যদি সত্যিই লোহিত্য নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে অবশ্যই গৌড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। অথচ বুধগুপ্তের সময়ের দামোদরপুর লেখর সঙ্গে ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের লেখর তুলনা করলে দেখা যায় যে, ভুক্তিশাসনে ইতিমধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। জমির হস্তান্তর বিষয়ে একই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছিল। তার চেয়ে বড় কথা, ঋভুপাল নামক একজন নগরশ্রেষ্ঠিন এই অর্ধ শতাব্দীরও বেশিকাল ধরে সরকারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং তখনও পূর্বাঞ্চলে গুপ্তশাসনের ঐতিহ্যে কোন ছেদ পড়েছিল বলে মনে হয় না।

বিহার থেকে গুপ্তদের উচ্ছেদ সাধনে মৌখরীগণ বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একের পর এক, তাঁদের বিভিন্ন লেখতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরহা লেখতে (৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) ঈশানবর্মণের গৌড় অভিমুখে অভিযানের কথা আছে কিন্তু গুপ্তদের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা নেই। দেওবারানর্ক লেখ থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে ঈশানবর্মণের পুত্র এবং পৌত্র সর্ববর্মণ এবং অবন্তীবর্মণ, বিহারের শাহাবাদ জেলা অধিকার করেছিলেন। দক্ষিণ কোশলের শিবগুপ্তের সিরপুর লক্ষণমন্দির লেখতে বলা হয়েছে যে, মগধ সূর্যবর্মণের অধিকারে ছিল। এই সূর্যবর্মণ মৌখরি ঈশানবর্মণের পুত্র ছিলেন। অবশ্য তিনি রাজা হয়েছিলেন কিনা, তা অনিশ্চিত। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, মৌখরিগণই গুপ্তদের বিহার থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু বিহারের পতন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সমার্থক এবং সমকালীন ছিল বলে অনেকে মানেন না। তাঁরা মনে করেন যে, ৫৫১ খ্রিস্টাব্দের পরে অন্তত ১৯ বৎসর বঙ্গদেশে এবং ওড়িশা গুপ্তদের অধিকারে ছিল। ওড়িশার খল্লিকোটের অন্তর্গত সুমণ্ডল গ্রামে প্রাপ্ত একটি লেখতে ২৫০ গুপ্তাব্দে, অর্থাৎ ৫৬৯-৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, কলিঙ্গের উপর গুপ্তদের আধিপত্যের কথা আছে। তাঁরা মনে করেন যে, বিহার হারানোর পরে বঙ্গদেশকে ভিত্তি করে, গুপ্তগণ ওড়িশার উপর তাঁদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কিন্তু শুধু সুমণ্ডল লেখর উপর নির্ভর করে বঙ্গদেশ সম্পর্কে একথা বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

জিনসেন-রচিত জৈনগ্রন্থ হরিষেণ *পুরাণ*-এ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে দু'টি ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটি ঐতিহ্য অনুসারে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ২৩১ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৫৫০-৫৫১ খ্রিস্টাব্দে, এই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। দ্বিতীয় ঐতিহ্য অনুসারে এই পতন ঘটেছিল ২৫৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৫৭৩-৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে মনে করেন যে, গুপ্তগণ বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হারিয়েছিলেন ৫৫০-৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এবং বঙ্গদেশ ও ওড়িশা হারিয়েছিলেন ৫৭৩-৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু অন্য উপাদানের অভাবে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে দুইটি ঐতিহ্য প্রচলিত আছে, এই মাত্র বলা যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, হূণ আক্রমণকে এই সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ বলা যায় না। হূণ আক্রমণ এই পতনকে সাহায্য করেছিল মাত্র। তাঁর মতে গুপ্তসম্রাট-পরিবারের অভ্যন্তরীণ কলহ, যশোধর্মনের উচ্চাভিলাষ, সামন্ত নৃপতি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা, এই সাম্রাজ্যের পতনের প্রকৃত কারণ। হূণ আক্রমণ বিপদের সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে হূণ কখনও বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারেনি।

ডঃ রায়চৌধুরী গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যে কারণগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সঙ্গে ডঃ মজুমদারের মতের মূলত কোন বিরোধ নেই। তিনি বলেছেন যে একদা সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁদের প্রতিভা দ্বারা যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে দ্রুত তা পতনের পথে অগ্রসর হয়। গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে স্কন্দগুপ্তই (৪৫৫-৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ) শেষ শাসক যিনি পশ্চিম অঞ্চল নিজ অধিকারে রেখেছিলেন। তাঁর পরে গুপ্তদের সুরাষ্ট্র অথবা পশ্চিম মালবের বৃহৎ অংশের উপর আর কোন অধিকার ছিল না। বুধগুপ্তই (৪৬৭-৭৭ খ্রিস্টাব্দ—৪৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) বোধহয় শেষ সম্রাট যাঁর আদেশ যুগপৎ নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং নর্মদাতীরে মান্য করা হত। তাঁর পরে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা কোনক্রমে পূর্ব মালব এবং উত্তরবঙ্গের উপর কিছুদিনের জন্য তাদের অধিকার বলবৎ রেখেছিলেন। কিন্তু সবদিক থেকে তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এইভাবে জিনসেন-বর্ণিত অন্যতম ঐতিহ্য অনুসারে ৫৫১ খ্রিস্টাব্দে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর আর্যাবর্তে রাজনৈতিক অধিকার মৌখরি এবং পুষ্যভূতি বংশের হাতে চলে গিয়েছিল। ভারত-ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু মগধ থেকে কনৌজ স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে নতুন কোন কারণ ছিল না। এই কারণগুলি হল, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বংশানুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সৃষ্টি এবং গুপ্তরাজপরিবারের কলহ।

প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্রের আক্রমণে এই সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়েছিল। স্কন্দগুপ্ত সেই আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের অল্পকাল পরে মধ্য এশিয়ার হূণগণ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং পাঞ্জাব ও পূর্ব মালব অধিকার করেছিল। ভির্তারি কুরা, গোয়ালিয়র এবং এরাণে প্রাপ্ত বিভিন্ন লেখতে তার নির্ভুল সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই হূণ আক্রমণ প্রসঙ্গে তোরমান এবং মিহিরকুলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হূণ আক্রমণের পরে সেনাপতি এবং সামন্ত নৃপতিদের উচ্চাশার কথা বলা যায়। স্কন্দগুপ্তের সময় পর্ণদত্ত নামক একজন গোপ্তৃ সুরাষ্ট্র শাসন করতেন। অল্পকাল পরে মৈত্রক বংশের ভতার্ক, সেনাপতিরূপে নিজেকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে বলা হয়েছে যে, তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরী প্রথম ধারসেন 'সেনাপতি' অভিধায় সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসক দ্রোনসিংহকে রাজকীয় মর্যাদা দিতে হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই বংশেরই একটি শাখা মালবের পশ্চিমতম অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে সহ্যাদ্রি এবং বিন্ধ্য পর্বতের দিকে বিস্তৃত অংশ জয় করেছিলেন।

মৈত্রকগণ ব্যতীত মান্দাসোরের শাসকগণও একই পথ অনুসরণ করেছিলেন। মধ্যদেশের মৌখরিগণ,

বর্ধমানভুক্তি এবং কর্ণসুবর্ণের শাসকগণ মান্দাসোরের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মান্দাসোরের (মালবের) শাসক যশোধর্মন কী কাণ্ড করেছিলেন, সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর গুপ্তগণ পূর্ব মালব পুনরধিকার করলেও, অন্তত পশ্চিম মালব করতে পারেননি। এর একাংশ মৈত্রকদের অধিকারে ছিল। অপর অংশ, উজ্জয়িনীর উপর পরবর্তী শতাব্দীতে কলচুরি বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌখরিগণও প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের লেখ থেকে বারাবনকী, জৌনপুর এবং গয়া জেলার উপর তাঁদের অধিকারের কথা জানা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের এইসব অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে মৌখরিগণ গুপ্তদের অধীনে সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। অল্পকাল পরে ইশানবর্মণ মৌখরি গুপ্তদের সঙ্গে এবং হয়তো হূণদের সঙ্গেও শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহারাজাধিরাজ অভিধা গ্রহণ করেছিলেন।

মৌখরীগণের মতো বঙ্গদেশের শাসকগণও খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিলেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গদেশ অবশ্যই গুপ্তদের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে সমতটকে প্রত্যন্ত রাষ্ট্ররূপে উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ তখন গুপ্তদের অধিকারে ছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল থেকে প্রায় এক শতাব্দী উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দামোদরপুরে প্রাপ্ত পাঁচটি লেখতে তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইশানবর্মণের হরহা লেখ থেকে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি, গৌড়গণের উত্থান ঘটেছিল। হরহা লেখতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, গৌড়গণ সমুদ্রতীরে বাস করতেন। সুতরাং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গের উপকূলবর্তী স্থলভাগ নিশ্চিতভাবে তাঁদের বাসভূমি ছিল। পূর্বে বর্ণিত গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদের সম্পর্কে 'গৌড়' শব্দটি ব্যবহৃত না হলেও, তাঁদের ব্যবহৃত 'মহারাজাধিরাজ' অভিধা থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, তাঁরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছিলেন।

গুপ্তসম্রাট-পরিবারের অভ্যন্তীরণ বিরোধ এই সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য বিরোধের কাহিনী সত্য অথবা মিথ্যা যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বংশধরেরা যে সর্বদা তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেননি, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং তাঁরা প্রায়ই পরবর্তীকালের বিরোধে-সংঘর্ষে বিপরীতপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালের গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাঁদের জ্ঞাতিভাই বকাটকগণের সম্পর্ক ভাল ছিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রপৌত্র (কন্যা প্রভাবতীর মাধ্যমে) নরেন্দ্রসেন বকাটকের সঙ্গে মালবের অধিপতির শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। তাঁর পৌত্র হরিষেণ অবন্তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের দাবি করেছিলেন। মালবের অংশবিশেষের সঙ্গে গুপ্তগণ সর্বদা জড়িত ছিলেন। সুতরাং এই অঞ্চলে বকাটকদের জয়লাভ অবশ্যই তাঁদের জ্ঞাতিভাই গুপ্তদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছিল।

প্রথম দিকের গুপ্তসম্রাটগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের গুপ্ত সম্রাটদের, বিশেষত বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত এবং বালাদিত্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল. ইতিপূর্বে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্য রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে বালাদিত্য কীভাবে তাঁর মায়ের অনুরোধে বন্দী মিহিরকুলের মুক্তি দিয়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ কাহিনী কতদূর সত্য, তা বলা

যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, হিউয়েন সাঙ যাঁদের কাছ থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সপ্তম শতাব্দীর সেই ভারতীয়দের দৃষ্টিতে পরবর্তী গুপ্তসম্রাটগণ দয়া ও দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, শৌর্য-বীর্যের জন্য ছিলেন না। সে যাই হোক, বালাদিত্যের এই ভ্রান্ত উদারতার ফলে মিহিরকুল তাঁর অত্যাচারী শাসন চালিয়েছিলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা, এর ফলে যশোধর্মন এবং পরে ঈশানবর্মন এবং প্রভাকরবর্ধনের সামনে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেরি করেননি এবং যুগপৎ হূণদের, এবং উত্তর ভারতে গুপ্তশাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

৪খ.৪ গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার জন্য প্রধানত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। গুপ্তযুগের কিছুসংখ্যক লেখ প্রথম সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন ফ্লিট এবং পরবর্তীকালে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। এ যুগের বিভিন্ন মুদ্রা এবং সিল সংকলন ও প্রকাশ করেন এ্যালান। স্মৃতিশাস্ত্র, বিশেষত *মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি* ইত্যাদিও আমাদের সাহায্য করে। তবে স্মৃতিশাস্ত্র তত্ত্বের দিক প্রাধান্য পেয়েছে, বাস্তব দিক পায়নি। ফা-হিয়েনের রচনার মূল্য তুলনায় বেশি। তাঁকে স্মৃতিশাস্ত্রের পরিপূরক বলা যায়।

মৌর্যযুগের তুলনায় গুপ্তযুগের রাজনৈতিক আলোচনায় এবং অবনতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। *অর্থশাস্ত্র*-র মতো কোন গ্রন্থ এ যুগের মর্যাদা বৃদ্ধি করেনি। মনু এবং *মহাভারত*-এর রাজ-ধর্মসংক্রান্ত অংশে রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে জোরালো আলোচনা আছে। কিন্তু এ যুগের নীতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে এই আলোচনা অন্যমনস্ক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা গতানুগতিক। কামন্দকের *নীতিসার অর্থশাস্ত্র*-র একটি সঙ্কলন মাত্র। এতে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত অন্তর্দৃষ্টির একান্ত অভাব। এই গ্রন্থের নীতিবোধ-সম্পর্কিত মনোভাবের পিছনে মহাভারত-এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজার রাষ্ট্রপরিচালনা-সম্পর্কিত নির্দেশসমূহে কৌটিল্যের নির্মম মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এতে দুষ্ট প্রজাদের প্রকাশ্যে অথবা গোপনে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাজা যেখানে শক্তিশালী এবং যুদ্ধের স্থান-কাল যখন তাঁর অনুকূলে, সেখানে তিনি খোলাখুলি যুদ্ধ করবেন, আর প্রতিকূল অবস্থায় তিনি অশ্বত্থামার মতো বিশ্বাসঘাতকার আশ্রয় নেবেন। *কাত্যায়নস্মৃতি* এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রেও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। মনুতে অবশ্য যুদ্ধকে শেষ উপায় বলা হয়েছে। শত্রুদমনের জন্য সেখানে অন্য উপায়ের, যেমন আলোচনার, দানের এবং ভেদনীতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। বিজিত রাজ্যগুলিতে ধর্ম, প্রচলিত বিধান এবং সম্পত্তির অধিকারের উপর অকারণ হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করা হয়নি। এ যুগের সব স্মৃতিগ্রন্থেই রাজার অতিমানবিক সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। *দেবলস্মৃতি*-তে বলা হয়েছে যে, রাজা মনুষ্যবেশে দেবতা সুতরাং তাঁর কোন ক্ষতি করা উচিত নয়।

গুপ্তযুগের প্রথম দিকে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় প্রকার শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। এই প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন মদ্রকগণ, যৌধেয়গণ, অর্জুনায়নগণ, মালবগণ, প্রার্জুনগণ, কাকগণ, সোনাকানিকগণ, আভিরগণ ইত্যাদি, বেশিরভাগই ছিল উত্তর ভারতে। এলাহাবাদ স্তম্ভলেখতে এই গণরাজ্যগুলির সঙ্গে কোন রাজার নাম যুক্ত করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে যে, মালবগণ, যৌধেয়গণ প্রভৃতি সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই গণরাজ্যগুলিতে সমগ্র জনসমষ্টি সার্বভৌম অধিকার ভোগ করত না। এগুলিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রায়ই ভূম্যধিকারী

ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হত। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহকের পদ বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। অনেক সময় এই পদের সঙ্গে রাজকীয় অভিধা যুক্ত করা হত সোনাকানিগণের যিনি প্রাধান, তিনি এই অভিধা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পদটিও বংশানুক্রমিক হয়েছিল। যৌধেয়গণের যিনি প্রধান, তাঁকে মহারাজা বলা হত।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই গণরাজ্যগুলির কথা আর শোনা যায়নি।

মৌর্যযুগের মতো গুপ্তযুগেও শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন রাজা। রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল, তবে মৌর্যদের মতো গুপ্তরাজারাও অনেক সময় তাঁদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। মৌর্যযুগের রাজাদের মতো গুপ্তযুগের রাজারা সাধারণ 'রাজন' অভিধায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। সমসাময়িক লেখতে রাজাকে 'অচিন্ত্যপুরুষ', 'লোকধামদেব', 'পরম দৈবত' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে সব গুপ্ত সম্রাটই শক-কুষাণদের অনুকরণে 'মহারাজাধিরাজ' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন অভিধায় তাঁদের দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে, ধনদ (কুবের), ইন্দ্র, বরুণ এবং অন্তকের (যমের) সমকক্ষ বলা হয়েছে। তাঁকে কৃতান্তের যুদ্ধ-কুঠাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই আড়ম্বরপূর্ণ অভিধাগুলি গুপ্ত সম্রাটের মর্যাদাবৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে, প্রকৃত ক্ষমতাবৃদ্ধি করে না। এই অভিধাগুলির মাধ্যমে গুপ্তযুগে, মৌর্যযুগের পরে, কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে, রাজতন্ত্রের পুনর্বাসন ঘটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্র বলতে মৌর্যযুগে যা বোঝাত, গুপ্তযুগে তা আর বোঝাত না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, রাজতন্ত্রের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে ভারতে নতুন রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এই রাজতন্ত্র মৌর্যযুগের তুলনায় দুর্বলতর ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে এই পরিবর্তিত রাজতন্ত্রের স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। রাজা দেবতার সৃষ্টি, এই বিশ্বাস তখন অনেকাংশে শিথিল হয়েছিল। শুধু কর্মের ক্ষেত্রে রাজা এবং ঈশ্বরের মধ্যে সাদৃশ্য স্বীকার করা হত। ঈশ্বরের মত রাজাও অভ্রান্ত, একথা মানা হত না। ঈশ্বরের মতো রাজাকেও সম্মান করা উচিত, শুধু এইমাত্র মনে করা হত। *নারদস্মৃতি*-তে বলা হয়েছে যে, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মতো। জনকল্যাণের জন্য রাজাকে কঠোর ও দায়িত্বপূর্ণ জীবনযাপন করতে হত। যুবরাজের জন্য নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রাজা কর্তব্যভ্রষ্ট হলে, জনগণ মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারত। স্মৃতিশাস্ত্রে এই বিদ্রোহের অনুমোদন ছিল।

রাজা শুধু শাসনব্যবস্থায় শীর্ষে ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে। সামরিক, রাজনৈতিক, শাসনবিষয়ক এবং বিচারসংক্রান্ত সব অধিকারের কেন্দ্রে ছিলেন রাজা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্রীরা থাকতেন, কিন্তু সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান বিচারক। প্রদেশপাল এবং অন্যান্য বেসামরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, রাজা নিযুক্ত করতেন এবং তাঁরা একমাত্র তাঁর কাছেই দায়ী থাকতেন। কেন্দ্রীয় সচিবালয় তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হত। সুতরাং আপতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমত মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতেন। রাজা সাধারণত মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। দ্বিতীয়ত, রাজা আইন প্রণয়ন করতে পারতেন না। তাঁকে ধর্মশাস্ত্রের বিধান মেনে

চলতে হত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিনি বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন না। তৃতীয়ত, শাসন-সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নিগম সভাগুলি ভোগ করত। প্রকৃতপক্ষে, সেনাবাহিনী এবং বৈদেশিক নীতি ভিন্ন অন্যান্য সব বিষয়ই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হত। সর্বোপরি রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল।

রাজার পরেই স্থান ছিল যুবরাজের। বৈদিকযুগের মতো, গুপ্তযুগে রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল, অবশ্য রাজা তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে পারতেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

রাজা বিভিন্ন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে কেন্দ্রে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এইভাবে যে আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, তা বহুলাংশে গতানুগতিক ছিল। *অর্থশাস্ত্র*-এ উল্লিখিত মন্ত্রী এ যুগের বেসামরিক শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন। অন্য উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী সন্ধিবিগ্রহিক (শান্তি ও যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত) এবং অক্ষপটলাধিকৃত (সরকারি নথিপত্রে ভারপ্রাপ্ত) প্রধান ছিলেন। সন্ধিবিগ্রহিক পদটি গুপ্তযুগেই প্রথম সৃষ্টি হয়। কৌটিল্যের মন্ত্রীর মতো, ইনিও যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সঙ্গী হতেন।

রাজপদের মতো, মন্ত্রীপদও গুপ্তযুগে বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। বীরসেনের উদয়গিরি লেখতে "আন্বয়প্রাপ্ত সচিব্য", এই কথাগুলি আাছে। এ থেকে মন্ত্রীপদের বংশানুক্রমিকতা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়াআ যায়। শুধু মন্ত্রীপদই নয়, অন্য অনেক উচ্চপদও তখন বংশানুক্রমিক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাদণ্ডনায়ক হরিষেণ, মহাদণ্ডনায়ক ধ্রুবভূতির পুত্র ছিলেন। মন্ত্রী পৃথিবীসেন, মন্ত্রী শিখরস্বামিনের পুত্র ছিলেন। মান্দাসোর, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের গোপ্তৃ পদও ছিল বংশানুক্রমিক।

গুপ্তযুগে কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পদগুলির মধ্যে কয়েকটির পূর্ব ঐতিহ্য ছিল। মহাদণ্ডনায়ক হয়তো সেনাপতি, কিংবা পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন। এই পদটির সূচনা হয়েছিল কুষাণদের সময়। তিনি অন্য দণ্ডনায়কদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। মহাবলাধিকৃত ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সাতবাহন রাজাদের মহাসেনাপতির সঙ্গে এই পদটির বিশেষ মিল ছিল । মহাবলাধিকৃত তাঁর অধীন মহাশ্বপতি (অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান), ভাটাশ্বপতি (নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান), মহীপীলুপতি (হস্তিবাহিনীর প্রধান), সেনাপতি এবং বলাধিকৃতকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মহাপ্রতিহার ছিলেন হয়তো দ্বাররক্ষী, বা প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান। তিনি অন্য প্রতিহারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন।

গুপ্তযুগে সামরিক-অসামরিক পদগুলির মধ্যে কোন স্থির ও স্থায়ী ভেদরেখা ছিল না। একই ব্যক্তি সন্ধিবিগ্রহিক, কুমারামাত্য এবং মহাদণ্ডনায়ক নিযুক্ত হতে পারতেন।

গুপ্তযুগে কুমারামাত্য এবং আয়ুক্তগণ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করতেন। *অর্থশাস্ত্র*-এ সাধারণভাবে রাজকর্মচারীদের অমাত্য বলা হয়েছে। গুপ্তযুগের আয়ুক্তগণের অশোকের যূত এবং *অর্থশাস্ত্র*-র যুক্তগণের পূর্ব ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গুপ্তগণ অমাত্যদের মধ্যে থেকে কুমারামাত্য নামক এক নতুন শ্রেণীর কর্মচারীর সৃষ্টি করেন। 'কুমারামাত্য' বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হত, সে সম্পর্কে নানাজন নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারও মতে তিনি ছিলেন কুমারের অর্থাৎ যুবরাজের মন্ত্রী। দুই শ্রেণীর কুমারামাত্য ছিলেন। একশ্রেণীর কুমারামাত্যগণ রাজার কাজে নিযুক্ত থাকতেন (পরমভট্টারকপাদীয়), আর এক শ্রেণী যুবরাজের

কাজে (যুবরাজপদীয়)। তাঁরা সম্ভবত যুবরাজের ভারপ্রাপ্ত, অথবা তাঁদের উপদেষ্টা ছিলেন। গুপ্তযুগে কুমারামাত্যগণ কখনও জেলা (বিষয়) শাসনে কখনও বা প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিযুক্ত হতেন। অনেকে এঁদের ইংরেজ আমলে ভারতীয় সিভিল সারভিসের কর্মচারীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ যুগে আয়ুক্তগণের হাতে মাঝে মাঝে বিজিত রাজার সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দায়িত্ব দেওয়া হত। তাঁরা জেলা এবং রাজধানী তত্ত্বাবধানের ভারও পেতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে দেশ এবং ভুক্তি, কখনও বা রাষ্ট্র বলা হত। এগুলি আবার বিভিন্ন জেলায়, অর্থাৎ প্রদেশে অথবা বিষয়ে বিভক্ত হত। বিভিন্ন লেখতে দেশ হিসাবে সুকুলি দেশ, সুরাষ্ট্র, দাভালার (জব্বলপুর এলাকা) উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিন্দী (যমুনা) এবং নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল, পূর্বমালবসহ এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। ভুক্তিগুলি সবই ছিল গঙ্গা উপত্যকায়। এদের মধ্যে পুণ্ড্রর্ধনভুক্তি (উত্তরবঙ্গ), তীরভুক্তি (উত্তর বিহার), নগরভুক্তি (দক্ষিণ বিহার), শ্রাবস্তীভুক্তি (অযোধ্যা) এবং অহিচ্ছত্রভুক্তি (রোহিলখণ্ড) উল্লেখযোগ্য। প্রদেশ অথবা বিষয়গুলির মধ্যে গুজরাটে লাট বিষয়, জব্বলপুরে ত্রিপুরি বিষয়, পূর্বমালবে ঐরিকিন, গাঙ্গোয় দোয়াবে অন্তর্বেদী এবং দিনাজপুরে কেটিবর্ষ বিষয়ের নাম বিভিন্ন লেখতে পাওয়া গেছে।

“সর্বেষু দেশেষু বিধায় গোপ্তৃণ” এই বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, গোপ্তৃগণ দেশ শাসন করতেন। ভুক্তি শাসন করতেন উপরিক অথবা উপরিক মহারাজাগণ। মাঝে মাঝে রাজপরিবারের ব্যক্তিরা এই পদে নিযুক্ত হতেন। দামোদরপুর লেখতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসকরূপে রাজপুত্র দেবভট্টারকের উল্লেখের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বাসার (বৈশালী) সিল-এর তীরভুক্তি, উপরিক গোবিন্দগুপ্ত রাজপুত্র ছিলেন। মধ্যভারতের তুমাইনের শাসক ঘটোৎকচগুপ্তের পরিচয়ও হয়তো তাই ছিল।

এই উপরিকগণকে অশোকের প্রাদেশিকগণের এবং সাতবাহনদের প্রদেশিক রাজধানীর অমাত্যগণের নামান্তর বলা চলে। গুপ্তযুগে ভুক্তিশাসনে নিযুক্ত যুবরাজের সঙ্গে অশোকের সময়ের কুমার প্রদেশপালদের তুলনা করা চলে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, গুপ্তযুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় পুরোনো আদর্শই নতুন নামে অনুকরণ করা হয়েছিল।

কুমারামাত্য, আয়ুক্ত এবং বিষয়পতিগণ বিষয়গুলি শাসন করতেন। কখনও সামন্ত নৃপতিগণও বিষয় শাসনের ভার পেতেন। এরাণের মহারাজা মাতৃবিষ্ণু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন কোন বিষয়পতি, যেমন অন্তর্বেদীর সর্বনাগ এবং উত্তরবঙ্গের পঞ্চনগরীর কুলবৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীনে ছিলেন। কোটিবর্ষ, ত্রিপুরি এবং ঐরিকিনের বিষয়পতিগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে ছিলেন।

গুপ্তযুগে বিষয় শাসনে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন লেখতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার বিষয়পতিগণ সাধারণত প্রাদেশিক শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হতেন, সম্রাটদের দ্বারা হতেন না। উত্তরবঙ্গের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে, কুমারামাত্য, আয়ুক্ত অথবা বিষয়পতিগণ অধিষ্ঠানাধিকরণের (নগর পরিষদের) সাহায্যে রাষ্ট্রীয় জমি বিক্রয় করতেন। কখনও বা কুমারামাত্যগণ বিষয়াধিকরণের (জেলা আপিসের) সাহায্যে একাজ করতেন। অন্যসময় অষ্টকুলাধিকরণ গ্রামি (গ্রামপ্রধান) এবং গৃহস্থদের (কুটম্বিনগণ) সাহায্য নিতেন। অষ্টগুলাধিকরণ বলতে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, জানা যায় না।

তবে একটি ক্ষেত্রে মহত্তরগণ (গ্রামবৃদ্ধগণ) এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে এর দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েত বোঝানো হয়েছে বলা চলে।

প্রতি বিষয়ে একটি বেসরকারি পরিষদ ছিল। কেন্দ্রীয় কর্মচারী, বিষয়পতি, এতে সভাপতিত্ব করতেন। এই পরিষদে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ স্থান ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নগরশ্রেষ্ঠী (গিল্ডের সভাপতি), সার্থবাহ (প্রধান ব্যবসায়ী), প্রথম কুলিক (প্রধান কারিগর) এবং প্রথম কায়স্থ (প্রধান লিপিকার) এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন গিল্ডের সভাপতিগণ পদাধিকারবলে হয়তো পরিষদের সদস্য হতেন। অন্য সদস্যগণ কীভাবে মনোনীত অথবা নির্বাচিত হতেন, জানা যায় না। তবে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের যুক্ত করে গুপ্তগণ যে সাহস এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

বিষয়শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং কর ও রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁরা দায়ী থাকতেন। তাঁরা পতিত জমির তত্ত্বাবধান করতেন। পতিত জমি বিক্রয়ের জন্য তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হত। বনবিভাগের কর্মচারীগণও হয়তো তাঁদের অধীনে কাজ করতেন। দণ্ডনায়কগণ (সামরিক বিভাগের কর্মচারী) বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থান করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করতেন। দণ্ডপাসিকগণ এবং চোরোদ্ধরনিকগণ (পুলিশ এবং গুপ্তচর বিভাগের কর্মচারী) অপরাধীদের ধরে বিচারালয়ে নিয়ে আসতেন। ন্যায়াধিকরণ, ধর্মাধিকরণ এবং ধর্মশাসনাধিকরণের দপ্তরের সিল নালন্দা এবং বৈশালীতে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রদেশের এবং জেলার কেন্দ্রে এই বিচারালয়গুলি কাজ করত।

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত আলোচনায় বৈশালীতে প্রাপ্ত সিলগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি থেকে প্রাদেশিক এবং নাগরিক শাসনব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এই সিলগুলিতে বিভিন্ন পদ এবং দপ্তরের উল্লেখ আছে। অবশ্য এ সবই উত্তর বিহারের তীরভুক্তি-সম্পর্কিত। যুবরাজ গোবিন্দগুপ্ত এই ভুক্তি শাসন করতেন। এখানকার সিলগুলিতে উপরিক, কুমারামাত্য, মহাপ্রতিহার, তালবর, মহাদণ্ডনায়ক, বিনয়স্থিতিস্থাপক এবং ভডাশ্বপাতপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই পদগুলি ছাড়া যে দপ্তরগুলির নাম বৈশালীর সিলগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি হল যুবরাজ পাদীয় কুমারামাত্য অধিকরণ (যুবরাজের মন্ত্রী বা কুমারামাত্যের দপ্তর), রণভাণ্ডাগারাধিকরণ (যুদ্ধ বিভাগের প্রধান কোষাগারিকের দপ্তর বা কার্যালয়), বলাধিকরণ (যুদ্ধ দপ্তর), দণ্ডপাশাধিকরণ (পুলিশ অধ্যক্ষের দপ্তর), তীরভুক্তি উপরিক অধিকরণ (তীরভুক্তির উপরিকের দপ্তর), তীরভুক্তে বিজয়স্থিতিস্থাপক অধিকরণ (তীরভুক্তির বিনয়স্থিতিস্থাপকের দপ্তর) বৈশালী অধিষ্ঠান অধিকরণ (বৈশালীর নগর সরকারের দপ্তর) এবং শ্রী-পরম ভট্টারক-পাদীয়-কুমারামাত্য-অধিকরণ (সম্রাটের সেবায় নিযুক্ত কুমারামাত্যের দপ্তর)।

উপরের এই বিবরণের মধ্যে দুটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত এখানে কেন্দ্রীয় কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রদেশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। আবার প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে তীরভুক্তির কর্মচারীদের বৈশালী অধিষ্ঠানের কর্মচারীদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রণভাণ্ডারগারাধিকরণ, এই দপ্তরটির উল্লেখও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে সামরিক অর্থ-দপ্তরকে আসামরিক অর্থ-দপ্তর থেকে আলাদা করা হত।

গুপ্তযুগে মহকুমার মতো কোন প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা, জানা যায় না। কোন কোন স্থানে বিষয়ের অংশ হিসাবে পথক-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এর শাসন কীভাবে পরিচালিত হত, তা অনিশ্চিত। হয়তো পথকের শাসনকাঠামো বিষয়েরই ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল।

সে যুগে সাধারণত বিষয়গুলির পরেই ছিল গ্রাম ও নগর। গ্রামপ্রধান, অন্যান্য কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের, যেমন গ্রামিক, মহত্তর এবং ভোজকদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সাধারণত এই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিষয়ের কর্মচারীদের অধীনে থাকতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ভুক্তির উপরিকগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকত। বাড়িঘর, পথঘাট, বাজার, শ্মশান, মন্দির, কুয়ো, পুকুর, পতিত জমি, বন, কৃষিযোগ্য জমি, সবই গ্রামের শাসকদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমানাকারগণ কর্ষিত এবং অকর্ষিত সব জমিই পরিমাপ করতেন। গ্রামাধ্যক্ষ গ্রাম শাসনের শীর্ষে ছিলেন। একটি বেসরকারি পরিষদ (মহাসভা) তাঁকে সাহায্য করত। মহাসভার সদস্যগণ কীভাবে তাঁদের সদস্যপদ লাভ করতেন, তা বলা যায় না। গ্রামিকগণের ক্ষেত্রে এ যুগে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। পূর্বে গ্রামিকগণ জনপ্রতিনিধি ছিলেন, কিন্তু গুপ্তযুগে তাঁরা সরকারি কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিলেন।

পুরপালের উপর সাধারণত নগরশাসনের ভার থাকত। তাঁকে অনেক সময় কুমারামত্যের মর্যাদা দেওয়া হত। তাঁকে সাহায্য করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নগর পরিষদ ছিল। নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম কায়স্থ, নগর পরিষদের সদস্য হতেন। অধিকারিণ পদাধিকারী রাজকীয় কর্মচারী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান করতেন।

এইভাবে গ্রাম, নগর ও বিষয়শাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে গুপ্তসম্রাটগণ সবচেয়ে বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্থানীয় শাসন সরকারি অনুপ্রেরণায় পুষ্ট না হয়ে স্থানীয় স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করুক, গুপ্তসম্রাটগণ তাই চেয়েছিলেন। গুপ্তযুগের নগর পরিষদগুলি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরীর জন্য যে ছয়টি সমিতির বিবরণ দিয়েছেন, তাদের সদস্যগণ ছিলেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গুপ্তযুগে স্থানীয় প্রশাসন কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রের অধীনতা থেকে মুক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় নীতি অথবা নির্দেশে বিরোধী না হলে সব সিদ্ধান্তই স্থানীয়ভাবে গ্রহণ করা হত। জেলা এবং প্রদেশসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, আয়ুখ্ত ও কুমারামাত্যগণ স্থানীয় প্রশাসন এবং কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মৌর্যযুগের সঙ্গে তুলনায় এক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অশোক জেলাগুলির ক্ষুদ্রতর কর্মচারীদের কার্যকলাপের কথাও ব্যক্তিগতভাবে জানতে চাইতেন, কিন্তু গুপ্তসম্রাটগণ এ বিষয়ে আয়ুক্ত ও কুমারামাত্যগণের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে সন্তুষ্ট ছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ এবং ভুক্তিগুলির সীমানার বাইরে সামন্ত ও গণরাজ্যগুলি ছিল। এলাহাবাদ স্তম্ভ লেখ এবং অন্যান্য দলিলে এইসব ‘প্রত্যন্ত নৃপতি’ এবং গণরাজ্যগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা অধীনতামূলক স্বাধীনতা ভোগ করত বলা চলে। বৃহৎ সামন্ত নৃপতিগণ সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই ভূমিদান-পত্র প্রচার করতে পারতেন। বুন্দেলখণ্ডের পরিব্রাজক-মহারাজাগণ এইভাবে ভূমিদান করেছিলেন। তবে তাঁরা স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রচলন করতে পারতেন না। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, এইসব সামন্ত নৃপতিদের মর্যাদা তাঁদের এবং গুপ্তসম্রাটদের পারস্পরিক শক্তিসামর্থ্যের সমীকরণের উপর নির্ভর করত। প্রবলপ্রতাপশালী সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল এঁরা কর দান করে এবং অন্যান্য উপায়ে সম্রাটের সন্তোষবিধান করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই তা করেননি।

পরিব্রাজক-মহারাজাগণ তাঁদের দলিলে গুপ্তসম্রাট সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। বলা বাহুল্য, এই নীরবতা এক অর্থে বিশেষ বাঙময়।

গুপ্তযুগের শাসন সম্পর্কে কর ও রাজস্বব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগের করব্যবস্থা বিষয়ে বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নেই, কেননা তৎকালীন লেখগুলি এ সম্পর্কে নীরব। মোটামুটিভাবে গুপ্তযুগে যে করগুলি প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়, সেগুলি হল ঃ (১) ভাগকর অথবা ভূমিকর এর পরিমাণ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ, অথবা এক-চতুর্থাংশ। (২) ভোগকর অথবা চুঙ্গিকর--এই কর গ্রাম এবং শহরের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের অংশ হিসাবে বরাদ্দ করা হত। এই দুইটি করই দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। (৩) ভূতপ্রত্যয় বা আবগারি শুল্ক। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শিল্পজাত দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করা হত। বিষ্টি অথবা বাধ্যতামূলক শ্রম একেবারে অজানা ছিল না। পতিত জমি, বন এবং লবণখনির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ছিল। সেগুলিকে ভাড়া দিয়ে অথবা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করা হত।

রাজস্বমন্ত্রী কর এবং রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। এগুলি বেশিরভাগই দ্রব্যের মাধ্যমে এবং অংশত, অর্থের মাধ্যমে, আদায় করা হত। পতিত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হলেও, তার পরিচালনার ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপর থাকত।

গুপ্তযুগের ভূমিরাজস্বের সঙ্গে জমির মালিকানার প্রশ্নটি জড়িত। ডঃ বসাক মনে করেন যে, তখন জমির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ছিল না। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি প্রধানত দুইটি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমত তিনি বলেন যে, প্রদেশের এবং জেলার জনপ্রতিনিধি, মহামাত্র এবং অন্য ব্যবসায়িকগণ, এমনকি সাধারণ মানুষের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্র জমি হস্তান্তরিত করতে পারত না। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন যে, ফরিদপুরে প্রাপ্ত একটি দানপত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে আইনগত, জমির বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক-ষষ্ঠাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাবে। বাকি অর্থ কোথায় যাবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ এই দানপত্রে না থাকলেও ডঃ বসাকের কাছে এটা খুব স্পষ্ট মনে হয়েছে যে, অবশিষ্ট ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ যেত গ্রামসভার কোষাগারে।

ডঃ ঘোষাল, ডঃ বসাকের দুটি যুক্তিই খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, ডঃ বসাকের মতো যথেষ্ট তথ্য- নির্ভর নয়। তিনি বলেন, গুপ্তযুগের লেখতে এই প্রসঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের কোন উল্লেখ নেই, ক্ষুদ্র কর্মচারীদের উল্লেখ আছে এবং জমি বিক্রয়ের জন্য তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন হত, এমন কোন প্রমাণ নেই। তিনি আরও বলেছেন ডঃ বসাকের দ্বিতীয় যুক্তিটি ‘ধর্মষড়ভাগ’ শব্দের ভুল অনুবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ, ধর্মীয় পুণ্যের ভাগ। তখনকার দিনে জমি কেনার জন্য আবেদনপত্রে প্রার্থীকে লিখিতভাবে জানাতে হত যে, পরে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে ক্রেতা পুনরায় সেই জমি হস্তান্তর করবেন। সুতরাং মনে করা হত যে, রাজা প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করে সেই সম্ভাব্য পুণ্যের ভগ্নাংশ লাভ করবেন।

উপরোক্ত আলোচনায় জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগে দীর্ঘকাল কৃষকই জমির মালিক ছিল বলে মনে হয়। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত লেখগুলিতে এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। মনে হয় রাষ্ট্র এবং গ্রামসম্প্রদায় যৌথভাবে জমির মালিকানা ভোগ করত। জমি হস্তান্তরের অধিকার ছিল যুগ্মভাবে রাজা এবং জেলা পরিষদগুলির হাতে। সমগ্র সাম্রাজ্যের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্থির এবং সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও সম্ভব নয়। তবে রাজকীয় শস্যাগারগুলিতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য যে প্রচুর পরিমাণ শস্য সঞ্চয় করা হত, তা থেকে জমিতে রাজার কোন অধিকার ছিল না, তা মনে হয় না।

হিন্দু-ঐতিহ্য অনুসারে রাজা রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে তিনি স্বয়ং বিচার করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি রাজধানীর বিচারালয়ে নির্ণায়ক সভ্যদের সাহায্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। এই সর্বোচ্চ আদালতে গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার বিচার করা হত। নিম্ন-আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এখানে আপীল করা যেত। জেলা এবং প্রাদেশিক শহরগুলিতে সরকারি আদালত ভিন্ন জনসাধারণের বিচারালয় ছিল। গিল্ডগুলি বিচার করত। এছাড়া শহরে ও গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। গুপ্তযুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয়ভাবে বিচারকার্য সমাধা করা হত বলে সরকারি আদালতগুলিতে মোকদ্দমা স্তূপীকৃত হতে পারত না। বৃহস্পতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য থেকে বিশদ ও ব্যাপক বিচারপদ্ধতির কথা জানা যায়। নালন্দা এবং বৈশালীতে প্রাপ্ত সিল থেকে জানা যায় যে, প্রতি আদালতের নিজস্ব সিল ছিল। ফা-হিয়েন গুপ্তযুগের ফৌজদারি আইনের কোমলতার কথা বলেছেন। বেশিরভাগ অপরাধের শাস্তি ছিল জরিমানা। তিনি বলেছেন যে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড এবং অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল না। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। সেখানে অঙ্গচ্ছেদ, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়।

পুলিশ বিভাগের শীর্ষে নিশ্চয়ই কেউ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদের সরকারি আখ্যা কি ছিল, তা জানা যায় না। বৈশালীর সিল-এ দণ্ডপাশিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হয়তো জেলা পুলিশের অধ্যক্ষ ছিলেন। পুলিশ বাহিনীর সাধারণ কর্মীদের চাট এবং ভাট বলা হত।

বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ হয়তো কোন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর অধীনে ছিল। দ্রঙ্গিকগণ (চুঙ্গি কর্মচারী) তাঁর অধীনে কাজ করতেন।

রাজা নাবালক না হলে সামরিক বাহিনীর শীর্ষে থাকতেন। তাঁর অধীনে মহাসেনাপতিগণ এবং তাঁর অধীনে হয়তো মহাদণ্ডনায়কগণ ছিলেন। চতুরঙ্গ সেনা বলতে যা বোঝায়, তা এ যুগে ছিল না। পদাতিক, অশ্বারোহী এবং হস্তিবাহিনী নিয়ে সৈন্যদল গঠিত হত। সে যুগে কোন রথবাহিনী ছিল না। হয়তো তার পরিবর্তে উষ্ট্রবাহিনী ছিল। প্রতি বিভাগের কর্মীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। তাদের অশ্বপতি, মহাঅশ্বপতি, পীলুপতি, মহাপীলুপতি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হত প্রতিটি গ্রাম এবং নগর পরিখা অথবা প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত করা হত। সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে ভেদরেখা খুব স্পষ্ট ছিল না। মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য ছিল। কৃতী সামরিক কর্মচারীগণ মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হতেন। আবার একজন মন্ত্রিণ (গোপন উপদেষ্টা) মহাদণ্ডনায়কের পদে নিযুক্ত হতে পারতেন।

গুপ্তযুগে রাষ্ট্র বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাস্তা, সেতু, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণ করা হত। গুপ্তযুগের বিভিন্ন লেখতে সত্র, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের কথা পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দানের উল্লেখও সেখানে বারংবার পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ যাতে ধর্মীয় অনুশাসনগুলি মেনে চলে, তা দেখার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। অনেকে মনে করেন যে, বিনয়স্থিতিস্থাপক বলতে এই কর্মচারীদের বোঝাত। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের কর্মচারীদের বলা হত অগ্রহারিক। গিরনার লেখতে উল্লিখিত হ্রদ জনকল্যাণমূলক কাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ফা-হিয়েন লিখেছেন যে, রাজার দেহরক্ষী এবং পরিচালকগণ নিয়মিত বেতন পেতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তসম্রাটগণ তাঁদের সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দিতেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে মৌর্যদের নীতি অনুসরণ

করেছিলেন। কিন্তু সর্বত্র এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। অন্যান্য কর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে জমি পেতেন। এ যুগের অসংখ্য দানপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে ভূম্যধিকারী শ্রেণী সৃষ্ট হওয়ায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ফা-হিয়েন সাধারণভাবে গুপ্ত শাসনব্যবস্থার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে, সাধারণ মানুষকে তাদের বাড়িঘরের বিবরণ সরকারি দপ্তরে নথিভুক্ত করতে হত না। তাছাড়া তাদের সর্বত্র যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌর্যযুগের কঠোর গুপ্তচরব্যবস্থা এ যুগে অনেকাংশে শিথিল হয়েছিল। এ বিষয়ে ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের চিরকালীন গুপ্তচরব্যবস্থা এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদানের কথা মনে রাখলে, গুপ্তদের শাসন যে প্রাচীন ভারতের ফৌজদারি দণ্ডবিধি ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, তা স্বীকার না করে পারা যায় না। নালন্দায় গুপ্তসম্রাটগণ অনেকেই একাধিক বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এ থেকে জ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

গুপ্ত শাসনের ফলাফল কী হয়েছিল, তার ইঙ্গিত ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, মধ্যপ্রদেশের মানুষ তখন 'অসংখ্য এবং সুখী' ছিল। ডঃ মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, গুপ্তসম্রাটগণ, গরিবদের প্রতি তাঁদের উদারতা এবং সাধারণভাবে আর্থিক এবং নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য সঙ্গতভাবেই গর্ববোধ করতেন।

উপরে গুপ্তশাসনের যে বর্ণনা দেওয়া হল, তা এইযুগের 'স্বর্ণ যুগ' আখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু অধুনা গুপ্ত শাসনের মূল্যায়ন সম্পর্কে ভিন্ন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে যে, এ যুগের অর্থনীতিতে দুইটি যুগপৎ এবং পরস্পরবিরোধী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এর একদিকে ছিল সমৃদ্ধি এবং মুষ্টিমেয় নগরে-বন্দরে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে ছিল অনেক বড় শহরের অবক্ষয়। ফা-হিয়েন লিখেছেন যে, শ্রাবস্তীতে মাত্র ২০০টি পরিবার বাস করত। একদা কোলিয়গণের রাজধানী রামনগর পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং এর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। কপিলাবস্তু, কুশিনার, প্রাচীন রাজগৃহ এবং গয়া তাদের পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন বাণিজ্যপথের আর কোন গুরুত্ব ছিল না। গুপ্ত সাম্রাজ্যে ধীরে ধীরে গ্রামগুলিই প্রাধান্য অর্জন করেছিল। পাটলিপুত্র তখনও পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের বৃহত্তম নগরী ছিল, কিন্তু সেখানে অশোকের প্রাসাদ জীর্ণ, পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মনে হয় এই প্রাসাদের ছায়া দ্রুত সমগ্র নগরীকে আচ্ছন্ন করেছিল। কেননা হিউয়েন সাঙ, যিনি অনতিকাল পরে এদেশে এসেছিলেন, এই নগরীর চরম দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এ যুগে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজদরবার নতুন বিলাসিতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের নিদর্শন, বিশেষত অজন্তা (পরে আলোচ্য) এই যুগের। তবে এখানেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। একদা অনেকের মিলিত প্রয়াসে সাঁচি এবং কার্লেতে যে শিল্প সৃষ্ট হয়েছিল, এ যুগে তা আর সম্ভব ছিল না। এ যুগে শিল্পসৃষ্টির পিছনে বিশেষভাবে রাজসভা, অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। উপর থেকে 'সামন্ততন্ত্রের' প্রাথমিক সাফল্যের ফলে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল তা নিঃসন্দেহে আগের তুলনায় অধিকতর শান্তিপূর্ণ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচারী ছিল। গুপ্তযুগের যে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে, তা পূর্বের অথবা পরের, কোন যুগে, পাওয়া যায়নি। সেদিক থেকে এই যুগ একক মহিমায় মণ্ডিত বলা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ যুগে বিলাস দ্রব্যের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ের বাহন, রৌপ্যমুদ্রা, দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। বর্ধিত জনসংখ্যা এবং

নিত্যনতুন গ্রামবসতির দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গো সঙ্গাতি রক্ষা করে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে ব্যাপক হারে মুদ্রা প্রচলনের আবশ্যকতা ছিল, এযুগে তার বিশেষ অভাব দেখা গিয়েছিল। ফা-হিয়েন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ির উল্লেখ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল এদেশে ছিলেন, কিন্তু বিনিময়ের অন্য মাধ্যম তাঁর চোখে পড়েনি। ইতিহাসের অন্য উপাদান থেকে আমরা সুবর্ণ, দিনার, রূপক ইত্যাদি বিভিন্ন মুদ্রার কথা জানতে পারি। তাই মনে হয় যে, এগুলির ব্যবহার ব্যাপক ছিল না। গুপ্তযুগে অনেক কর্মচারীকে অর্থের মাধ্যমে বেতন না দিয়ে জমির মাধ্যমে দেওয়া হত। অবশ্য এই জমি তখনও পর্যন্ত, পূর্ণ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যেমন দেওয়া হয়, বংশানুক্রমিকভাবে দান করা হত না। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হত। পূর্ণ-সামন্ততন্ত্রে, দরিদ্র শ্রেণী যেমন করের পরিবর্তে শ্রম দান করে, এ যুগে তা করা হত না। গুপ্তযুগের সমাজে অর্থনীতিতে পূর্ণ-সামন্ততন্ত্র ছিল না, কিন্তু তার বীজ নিহিত ছিল। গুপ্তযুগের এই সমৃদ্ধি শ্রেণীগত এবং স্থানগত দুদিক থেকেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগের উন্নতিকে তাই সর্বাঙ্গীণ বলা যায় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত শাসনব্যবস্থা একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। গঠনতন্ত্রের দিক থেকে এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয়সাধন করা হয়েছিল। শাসনকার্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। জেলা, গ্রাম এবং নগরের শাসনব্যবস্থা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্ব সর্বদা রাজার হাতে ছিল তাই এ ব্যবস্থা, বিকেন্দ্রীকরণ সত্ত্বেও, দক্ষ ছিল। এ যুগের রাজারা জনকল্যাণের এবং কর্তব্যপালনের উচ্চ-আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। মৌর্যযুগের তুলনায় এ যুগের শাসকের শোষক-ভূমিকা অনেক কম ছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই শাসনপদ্ধতি বিশেষ মূল্যবান। কেননা ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল।

৪খ.৫ দক্ষিণ ভারতের বকাটক সাম্রাজ্য

দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন-পরবর্তী অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন বকাটকগণ। উত্তর ভারতে শুঙ্গ এবং কণ্বদের মতো বকাটক বংশেও ছিলেন ব্রাহ্মণ। ডঃ কে. পি. জয়সোয়ালের মতে বকাটকগণের আদি নিবাস ছিল বুন্দেলখন্ডের ওরছা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাগাত জেলায়। অপরদিকে অধ্যাপক নিরাশির মতে বকাটকরা ছিলেন মূলত দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নাগপুর ও বেরারের অন্তর্গত আকোলাই ছিল বকাটকদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল।

বকাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্যশক্তি তৃতীয় শতকের তৃতীয় পাদে তাঁর রাজত্বকাল শুরু করেন। অজন্তায় প্রাপ্ত একটি লিপি ও পুরাণ-বিধৃত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিন্ধ্যশক্তি বিদিশা (ভোপালের নিকটবর্তী আধুনিক ভিলসা) এবং পুরিকা (আধুনিক বেরার) শাসন করতেন। পুরিকা ছিল তাঁর রাজধানী। বিন্ধ্যশক্তি কোন আড়ম্বরপূর্ণ অভিধা ধারণ করেননি। তাই অনুমান করা যায় যে, বকাটকবংশের প্রকৃত অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল পরবর্তী শাসক প্রথম প্রবরসেনের রাজত্বকালেই।

প্রথম প্রবরসেন 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর রাজত্বকালে একটি রাজপেয় ও চারটি অশ্বমেধ

যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা হয়তো তাঁর রাজ্যজয়ের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র বকাটক শক্তি উত্তর মহারাষ্ট্র, বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করায়ত্ত করে একটি প্রকৃত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রবরসেন তাঁর পুত্র গৌতমীপুত্রের সঙ্গে ভরাশিব নাগবংশীয় রাজা ভাবনাগের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহবন্ধন বকাটকদের মধ্যভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণের সহায়ক হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

প্রথম প্রবরসেনের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র গৌতমীপুত্রের জীবনাবসান হয়েছিল তাঁর পিতার রাজত্বকালেই। প্রবরসেনের দ্বিতীয় পুত্র সর্বসেন বৎসগুল্ম নামক এক নূতন শাখার প্রবর্তন করেছিলেন আকোলা জেলায়। প্রথম প্রবরসেনের অপর দুই পুত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় যে, তাঁরা দক্ষিণ কোশল ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের উপর তাঁদের অধিকার বজায় রেখেছিলেন।

বকাটক বংশীয় রাজাগণের লেখগুলির থেকে জানা যায় যে, প্রথম প্রবরসেনের পর বকাটক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁর পৌত্র রুদ্রসেন। সমসাময়িক যুগের বকাটক লিপিগুলি থেকে আরো জানা যায় যে, পদ্মাবতীর নাগবংশীয় রাজাগণ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই লিপিগুলিতে ভারসিব নাগবংশীয় রাজা ভাবনাগের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, তিনি তাঁর মাতামহের সহায়তা লাভ করেছিলেন, এবং বকাটক সাম্রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের যে বিবরণ হরিষেণ প্রশস্তিতে পাওয়া যায় তা থেকে অনেকে মনে করেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের বারোজন বিজিত রাজার মধ্যে হয়তো রুদ্রসেনও ছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন যে, এই প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নয়জন রাজার মধ্যে বর্ণিত রুদ্রসেন ছিলেন বকাটকবংশীয় নৃপতি রুদ্রসেনের সঙ্গে অভিন্ন। ডঃ পি. এল. গুপ্ত এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণ প্রশস্তিতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত দক্ষিণ ভারতীয় বারোজন রাজার নামের তালিকায় রুদ্রসেনের নাম অনুপস্থিত সুতরাং সমুদ্রগুপ্ত যদি বকাটক নৃপতি প্রথম রুদ্রসেনকে সত্যিই পরাজিত করতেন, তাহলে, এই প্রশস্তিতে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা থাকত, কারণ বকাটক সাম্রাজ্য তখন আয়তনে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দক্ষিণে বকাটকদের প্রাধান্য ছিল মূলত মধ্য ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁর সমর অভিযান পরিচালিত করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের পূর্বদিকে। তাই বকাটকগণের সঙ্গে সম্ভবত তাঁর কোন শক্তিপরীক্ষা ঘটেনি। ডঃ পি. এল. গুপ্তর মতে বকাটকদের দক্ষিণ ভারতের প্রতিপত্তির কথা স্মরণে রেখে সমুদ্রগুপ্ত হয়তো তাদের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলেন। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত ও বকাটকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা হয়তো এই চুক্তিরই ক্রমপরিণতি।

অন্যদিকে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী সমুদ্রগুপ্তর এরাণ লেখের উল্লেখ করে বলেছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত বকাটকদের মধ্যভারতে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর মতে মধ্যভারতের ঐ অঞ্চল তখন বকাটকদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল ছিল না, তাঁরা তাঁদের সামন্ত নৃপতিদের মাধ্যমে আলোচ্য অঞ্চলটিকে শাসন করতেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে তাই এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে, প্রথম রুদ্রসেনের পুত্র পৃথিবীসেনের রাজত্বকালে তাঁরই এক সামন্ত নৃপতি ব্যাঘ্রকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করেছিলেন।

প্রথম রুদ্রসেন-পরবর্তী বকাটক রাজা ছিলেন তাঁর পুত্র প্রথম পৃথিবীসেন। পিতার মতো তিনিও ছিলেন শৈব এবং তাঁর শাসনকালে বকাটক সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। ডঃ পি. এল. গুপ্তর মতে বিচক্ষণ

পৃথিবীসেন প্রবল পরাক্রমী গুপ্তসম্রাটদের সঙ্গে কোন বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি না করে তাঁর সাম্রাজ্যের সংহতি অটুট রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন শকক্ষত্রপ-অধ্যুষিত মালবে ও কাথিয়াবাড় জয় করতে প্রয়াসী হন, তখন তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সহায়তা করেছিলেন। এই বন্ধুত্বের পরিণতি হিসাবেই বকাটকবংশীয় যুবরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর কন্যা প্রভাবতীগুপ্তর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। নাগপুরের নিকটবর্তী নন্দীবর্ধনে তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

পরবর্তী বকাটক বংশীয় রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেন ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকালে গুপ্ত - বকাটক মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। অধ্যাপক স্মিথ বলেছিলেন যে, বকাটক রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান গুপ্তদের শকরাজ্যগুলি আক্রমণের সহায়ক হয়েছিল। এদিক থেকে বিচার করলে এই মৈত্রীকে চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ কূটনৈতিক সাফল্য হিসাবে দেখা যায়। অনেকে বলেছেন যে, আর্থিক দিক থেকে বকাটক রাজ্য ছিল সমৃদ্ধ। বকাটক সেনাবাহিনী সাম্প্রতিক কালে দক্ষিণ ভারতে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। তাই এই মৈত্রীর ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জামাতা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। প্রভাবতী ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তিনি যুগপৎ প্রথম রুদ্রসেন এবং তাঁর স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রসেনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ৩৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের অকালমৃত্যুর পর বকাটক শাসনভার তিনি স্বহস্তে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর মাধ্যমে বকাটক রাজ্যে গুপ্তদের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যাকে রাজ্য পরিচালনায় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয় রুদ্রসেনের দুই পুত্র দিবাকরসেন ও দ্বিতীয় প্রবরসেন পর্যায়ক্রমে বকাটক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তবে দিবাকরসেনেরও অকালমৃত্যু হয়। তাই তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় প্রবরসেন পরবর্তী বকাটক রাজা রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বিভিন্ন তাম্র অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, বিদর্ভ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যথা আমরোতি, ওয়ার্দা, বেতুল, নাগপুর, ছিনদ্বারা, ভানদ্বারা এবং বালাঘাট তখন বকাটক সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র বেরার ছিল তাঁর শাসনাধীন। দ্বিতীয় প্রবরসেন তাঁর নতুন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ার্দা জেলার পাবনার অন্তর্ভুক্ত প্রবরপুরে। দ্বিতীয় প্রবরসেন শুধু সুদক্ষ যোদ্ধা বা শাসকই ছিলেন না, ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-অনুরাগীও। প্রাকৃত ভাষায় রচিত *সেতুবন্ধ* কাব্যটির রচয়িতা তিনিই ছিলেন বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে শৈবধর্মে বিশ্বাসী হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির প্রতি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রবরসেনের পর ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রসেন পরবর্তী বকাটকসম্রাট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কদম্ববংশীয় রাজা কাকুস্থবর্মণের কন্যা অজিতা-ভত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। সমকালীন সরকারি নথিপত্র অনুসারে কোশলের রাজগণ এবং মেকলা ও মালবের নৃপতিগণ তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করেছিলেন যেহেতু এ অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন নরেন্দ্রসেন। তবে নরেন্দ্রসেনের রাজত্বকালের শেষ দিকে নলবংশীয় রাজা ভবদত্তবর্মণ তৎকালীন রাজধানী নন্দীবর্মন আক্রমণ করেছিলেন। নরেন্দ্রসেন এই আক্রমণ প্রতিহত করে নলবংশীয় রাজাদের অধিকৃত ছত্রিশগড় অঞ্চলটিকে তাঁর সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবত বকাটক বংশের অপর এক শাখার নৃপতি হরিষেণ ও নলবংশীয় রাজা ভবদত্তবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। দক্ষিণ গুজরাটের ত্রৈকটক বংশীয় রাজা দাহরাসেনের

সঙ্গেও তার যুদ্ধ হয়েছিল। বকাটক বংশের প্রধান শাখার তিনিই ছিলেন সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তাঁর মৃত্যুর পর বকাটক বংশের অপর এক শাখা বৎসগুল্মর নৃপতি হরিষেণ বিদর্ভ জয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুইশতবর্ষব্যাপী বকাটক রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

অধ্যাপক ভি. ভি. মিরাশীর মতে বকাটকবংশীয় রাজগণ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা শাসন-পরিচালনাতেই কৃতিত্ব অর্জন করেননি, সাহিত্য ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপেও উত্তর ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমতুল্য হয়ে উঠেছিলেন।

৪খ.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১) গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তর আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য বিজয়নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলা যায় কী?

৩) গুপ্ত সাম্রাজের পতনের কারণগুলি আলোচনা করুন।

৪) গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

৫) দক্ষিণ ভারতের বকাট সাম্রাজ্যের সঙ্গে গুপ্তদের সম্পর্ক বিবৃত করুন।

৪খ.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। পি. এল. গুপ্ত ঃ *দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তাস্, প্রথম খণ্ড (১৯৭৪)*

২। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.) দি ক্লাসিকাল এজ্ (১৯৭০)

৩। আর. সি. শর্মা ঃ *পার্সপেকটিভস্ অফ্ সোস্যাল এ্যান্ড ইকনমিক্ হিস্ট্রি অফ্ আর্লি ইন্ডিয়া (১৮৮৩)*

৪। অশ্বিনী আগরওয়াল ঃ *রাইজ এ্যান্ড ফল্ অফ্ দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তাস্ (১৯৮৯)*

৫। এন. কে শাস্ত্রী ঃ *এ হিস্ট্রি অফ্ সাউথ ইন্ডিয়া (১৯৬৬)*

৬। ভি. আর. আর. দিকশিতার ঃ *দি গুপ্তা পলিটি (১৯৫২)*

৭। আর. এন. সালেটর ঃ *লাইফ্ ইন্ গুপ্তা এজ্ (১৯৪৩)*

৮। এস. কে. মাইতি ঃ *দি ইকনমিক্ লাইফ্ অফ্ নর্দান ইন্ডিয়া, ৩০০-৪০০ খ্রিস্টাব্দ (১৯৫৭)*

৯। আর. এন. ডান্ডেকার ঃ *দি এজ্ অফ্ দি গুপ্তাস এ্যান্ড আদার এসেস্ (১৯৮২)*

১০। রবীন্দ্র শর্মা ঃ *কিংগশীপ ইন ইন্ডিয়া ফ্রম্ দি ভেদিক এজ্ টু দি গুপ্তা এজ (১৯৯৫)*

১১। এ. এস. আলতেকর ঃ *দি কয়েনজ্ অফ্ দি গুপ্তা এম্পায়ার (১৯৫৭)*

১২। এ. এস. আলতেকার ও আর. সি. মজুমদার (সম্পা.) ঃ *দি বকাটকা গুপ্তা এজ্ (১৯৪৬)*

১৩। এস. আর. গোয়েল ঃ *এ হিস্ট্রী অফ্ দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তাস্ (১৯৬৭)*

১৪। ডি. কে. গাঙ্গুলী ঃ এসপেকট্স্ অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ (১৯৭৯)।

পর্যায় - ২

একক ১ক ☐ আদি ও মধ্যযুগের উত্তর ভারত (৬০০-১০০০ খ্রিঃ)

গঠন

১ক.১ উদ্দেশ্য

১ক.২ প্রস্তাবনা

১ক.৩ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের উত্তর ভারত

১ক.৩.১ বলভীর মৈত্রকগণ

১ক.৩.২ রাজস্থান ও নন্দীপুরীর গুর্জারগণ

১ক.৩.৩ থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশ

১ক.৩.৪ কনৌজের মৌখরিগণ

১ক.৩.৫ মগধের পরবর্তী গুপ্তগণ

১ক.৩.৬ বঙ্গাদেশ

১ক.৪ হর্ষবর্ধন (৬০১-৬৪৭ খ্রিঃ)

১ক.৪.১ হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ

১ক.৪.২ হর্ষের রাজ্যের বিস্তৃতি

১ক.৪.৩ হর্ষের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী

১ক.৫ হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারত (৬৫০-৭৫০ খ্রিঃ)

১ক.৫.১ কাশ্মীর ঃ কার্কোটক বংশ (৬২৭-৮৫৫ খ্রিঃ)

১ক.৫.২ আরব আক্রমণ

১ক.৬ পাল ও প্রতিহার প্রাধান্যের যুগ (৭৫০-১০০০ খ্রিঃ)

১ক.৬.১ ধর্মপাল

১ক.৬.২ দেবপাল

১ক.৬.৩ দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ

১ক.৬.৪ গুর্জর প্রতিহারগণ (৭৩০-৭৫৬ খ্রিঃ)

১ক.৬.৫ কাশ্মীর ঃ উলার রাজবংশ

১ক.৭ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাস
১ক.৭.১ উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশ
১ক.৭.২ কাশ্মীর ঃ লোহর রাজবংশ
১ক.৭.৩ কনৌজের গাহড়াবালগণ
১ক.৭.৪ গুজরাতের চালুক্যগণ
১ক.৭.৫ রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ
১ক.৭.৬ মালবের পারমারগণ
১ক.৭.৭ জেজাকভুক্তির চন্দেল্লগণ
১ক.৭.৮ ত্রিপুরীয় কলচুরিগণ
১ক.৭.৯ বঙ্গ-বিহারের পালবংশ
১ক.৭.১০ বঙ্গদেশের সেনবংশ
১ক.৮ অনুশীলনী
১ক.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১ক.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কনৌজের উত্থান, বিশেষ করে হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে কনৌজের উত্তর শ্রীবৃদ্ধি
- হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতে আঞ্চলিক শক্তির বিন্যাস
- আরব আক্রমণের কথা
- পাল ও প্রতিহার প্রাধান্যের কথা
- ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাসের ধরন।

১ক.২ প্রস্তাবনা

ইতিপূর্বে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীনতম পর্ব থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করেছি। এবারে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের কথা আলোচনা করব। এখানে প্রথমে আদি-মধ্যযুগের উত্তর ভারতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা আকারের ও আয়তনের স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে হর্ষবর্ধনের কনৌজের উত্থান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র উত্তর ভারত আবার খণ্ড খণ্ড হয়ে অনেকগুলি দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর কনৌজের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও খবর পাওয়া যায় না। এই সময়কালে

আঞ্চলিক শক্তির বিন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের মধ্যেই ভারতে আরব আক্রমণ ঘটে। পাল এবং প্রতিহার প্রাধান্যের কথাও এই এককে উল্লিখিত হয়েছে। সর্বশেষ অংশে ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাসের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

১ক.৩ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের উত্তর ভারত

গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সমগ্র উত্তর ভারতে নানা আয়তনের ছোট বড় স্বাধীন বা প্রায়স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে সেগুলির মধ্যে বলভীর মৈত্রক, রাজস্থান ও নান্দীপুরীর গুর্জর, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি, কনৌজের মৌখরি, বিহারের পরবর্তী গুপ্ত, কামরূপের বর্মা এবং গৌড়-বঙ্গ ও ওড়িশার স্থানীয় কয়েকটি রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। এই সকল শক্তির সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১ক.৩.১ বলভীর মৈত্রকগণ

পূর্ব কাথিয়াবাড় অঞ্চলের বল নামক শহরকে কেন্দ্র করে বলভী রাজ্য গড়ে ওঠে। ভটার্ক নামক মৈত্রক গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি, যিনি গুপ্তদের সেনাপতি ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শাসক ছিলেন, মৈত্রকদের আদিপুরুষ হিসেবে কথিত। তাঁর বংশের দ্রোণসিংহ, যাঁর একটি লেখের তারিখ ৫০২ খ্রিস্টাব্দ, মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম ধ্রুবসেন (আনুমানিক ৫২৫-৪৫ খ্রিঃ) গুপ্ত সম্রাটদের আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন ধরপট্ট ও গুহসেন (আনুমানিক ৫৪৫-৫৭০ খ্রিঃ)। শেষোক্তজন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির কারণে স্বাভাবিকভাবেই বলভীর সার্বভৌম রাজায় পরিণত হন। পরবর্তী রাজদ্বয় দ্বিতীয় ধরসেন ও শিলাদিত্য-ধর্মাদিত্যের লেখসমূহের তারিখ যথাক্রমে ৫৭১-৯০ খ্রিঃ ও ৬০৬-১২ খ্রিঃ-এর মধ্যে। তাঁদের অধীনস্থ কিছু সামন্ত রাজারও উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলাদিত্যের পর যথাক্রমে তাঁর ভাই খরগ্রহ (৬১৩-১৬ খ্রিঃ) ও পুত্র তৃতীয় ধরসেন (৬১৬-২৮ খ্রিঃ), দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (৬২৮-৪১ খ্রিঃ) ও চতুর্থ ধরসেন (৬৪১ খ্রিঃ—) রাজত্ব করেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমকালীন।

১ক.৩.২ রাজস্থান ও নান্দীপুরীর গুর্জরগণ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হরিচন্দ্র নামক জনৈক গুর্জর নেতা রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর চার পুত্রের যথাক্রমে ভোগভঠ, কক্ক, রজ্জিল ও দদ্দ। এঁদের মধ্যে রজ্জিল মান্দোর বা মাণ্ডব্যপুরে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র নরভট। শেষোক্তের পুত্র নাগভট মেড়ান্তক বা মেরতায় রাজধানী স্থাপন করেন। হরিচন্দ্রের অপর পুত্র দদ্দ ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করেন, যার রাজধানী নান্দীপুরী বা নান্দোদ। তাঁর পুত্র বীতরাগ জয়ভট ও পৌত্র দ্বিতীয় দদ্দ প্রশান্তরাগ। হরিচন্দ্র ও তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী আনুমানিক ৫৫০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের সূচনা এই গুর্জর রাজবংশগুলির থেকেই হয়েছিল। নান্দীপুরীর গুর্জরগণ নিজেদের সামন্ত হিসেবেই পরিচয় দিতেন। তবে তাঁরা যে ঠিক কাদের সামন্ত ছিলেন বলা কঠিন।

১ক.৩.৩ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

থানেশ্বর বা স্থানীশ্বর ছিল বর্তমান হরিয়ানা অঞ্চল। এখানকার পুষ্যভূতিবংশীয় রাজারা গুপ্তরাজগণের অধীনস্থ হিসেবে রাজত্ব করতেন। প্রতিষ্ঠাতা নববর্ধন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন। তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন ও পৌত্র আদিত্যবর্ধন। শেষোক্তজনের রাজত্বে থানেশ্বরের উপর গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব চিরতরেই বিলুপ্ত হয়। আদিত্যবর্ধন মূল গুপ্তদের একটি শাখাবংশের, অর্থাৎ মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশের, রাজা মহাসেন গুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র ছিলেন প্রভাকরবর্ধন যাঁর রাজত্বকালের সূত্রপাত ঘটে ৫৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। আনুমানিক ৬০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভাকরবর্ধন যখন মারা যান, সেই সময় তাঁর জামাতা কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজা গ্রহবর্মা মালবাধিপতি দেবগুপ্তর হাতে নিহত হন। তাঁর কন্যা গ্রহবর্মার পত্নী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন এবং দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণ করেন। প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন, কিন্তু তিনি নিজে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের চক্রান্তে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন অতঃপর ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের রাজপদে অভিষিক্ত হন, এবং কিছুটা পরবর্তীকালে অপুত্রক বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রীর তরফ থেকে নিজেকে কনৌজের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন।

১ক.৩.৪ কনৌজের মৌখরিগণ

উত্তরপ্রদেশে গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত হিসেবেই কনৌজের মৌখরিগণের প্রতিষ্ঠা। বিহারের গয়া অঞ্চলেও তাদের একটি শাখাংশের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের হরিবর্মা, আদিত্যবর্মা ও ঈশ্বরবর্মা গুপ্তদের অধীনতা স্বীকার করতেন। চতুর্থ ঈশানবর্মা সার্বভৌম নৃপতি ছিলেন, যিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন ও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি অথবা তাঁর পুত্র শর্ববর্মা হূনদের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শর্ববর্মা ও তৎপুত্র অবন্তীবর্মার সময় সমগ্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও বিহারের কিয়দংশ মৌখরিদের অধিকার ছিল। উপযুক্ত তিন রাজার রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ৫৫০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। অবন্তীবর্মার পুত্র গ্রহবর্মা মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে নিহত হলে, তাঁর বিধবা পত্নী থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের দুহিতা রাজ্যশ্রীর অভিভাবক হিসেবে হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতার এই হস্তান্তর কীভাবে হয়েছিল বলা কঠিন। নালন্দা থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে অবন্তীবর্মার অপর এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়। সিলটি ভগ্নপ্রাপ্ত নামটির প্রথম অক্ষর সু (...), দ্বিতীয় অক্ষর হয় (....) ব, না হয় (.....)চ। সম্ভবত ইনি গ্রহবর্মার উত্তরাধিকারী হন, এবং পরে হর্ষবর্ধন কর্তৃক অপসারিত হন। *ফাংচি* নামক একটি চৈনিক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধন তাঁর বিধবা ভগ্নীর তরফে প্রথম কনৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিজেকে কনৌজের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।

১ক.৩.৫ মগধের পরবর্তী গুপ্তগণ

গুপ্ত উপাধিধারী এই রাজারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত হয়তো এঁদেরই কোন শাখাবংশের অন্তর্গত ছিলেন। গয়ার নিকটে প্রাপ্ত অফসদ লেখে এই বংশের আটজনের নাম দেওয়া আছে যাঁরা হলেন কৃষ্ণগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত, জীবিতগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, দামোদরগুপ্ত, মহাসেনগুপ্ত, মাধবগুপ্ত ও আদিত্যসেন। এই বংশের চতুর্থ রাজা কুমারগুপ্ত মৌখরিরাজ ঈশানবর্মাকে ৫৫০-৭৬ খ্রিঃ) পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজা দামোদরগুপ্ত মৌখরিদের আরও একবার পরাজিত করেন। দামোদরগুপ্তের

পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করেন। *হর্ষচরিত*-এ বলা হয়েছে যে মহাসেনগুপ্ত মালবের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, এবং তাঁর শেষ পরিণতি কী হয়েছিল বলা যায় না। তবে তাঁর দুই পুত্র কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের আশ্রিত ছিলেন। তাঁরা হর্ষবর্ধনের সহচর ছিলেন এবং হর্ষের মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসনে আসীন হন। মাধবগুপ্তর পর তাঁর পুত্র আদিত্যসেন রাজা হন। একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। আদিত্যসেনের তিনজন উত্তরাধিকারীর নাম জানা যায় যাঁরা হলেন দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও জীবিতগুপ্ত। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ অঞ্চল কনৌজের যশোবর্মা কর্তৃক অধিকৃত হয়।

১ক.৩.৬ বঙ্গদেশ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের যুগে বঙ্গাদেশে দু'টি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে—একটি দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অংশ নিয়ে বঙ্গ, অপরটি উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গৌড়। বঙ্গ অঞ্চলের রাজাদের অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, যেগুলিতে তিনজন রাজার নাম আছে—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। শেষোক্তজন নিজ নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এই তিনজনের মোট রাজত্বকাল আনুমানিক ৫২৫ থেকে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু নিম্নমানের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলি থেকে দু'টি নাম মোটামুটি পড়া যায়, পৃথুবীর ও সুধন্যাদিত্য। এঁদের খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে স্থান দেওয়া হয়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে, মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেনগুপ্তের আমলে গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রোটাসগড়ের পার্বত্য দুর্গের একটি উৎকীর্ণ লেখে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নামটি বর্তমান। সম্ভবত শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের সামন্ত ছিলেন। বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ তাঁকে গৌড়ের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। উড়িষ্যার মান ও শৈলোদ্ভব বংশের নৃপতিরা তাঁর নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় তিনি কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজা গ্রহবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তাঁর চক্রান্তে নিহত হন। হর্ষবর্ধন কোন দিন শশাঙ্কের উপর প্রতিশোধ নিতে পেরেছিলেন কিনা বলা শক্ত, কেননা শশাঙ্ক ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে শশাঙ্ক আমৃত্যু মগধের অধীশ্বর ছিলেন। শশাঙ্কের পর গৌড়-বঙ্গের রাজনৈতিক চিত্র বড়ই অস্পষ্ট।

১ক.৪ হর্ষবর্ধন (৬০১-৬৪৭ খ্রিঃ)

বাণভট্ট বিরচিত *হর্ষচরিত* থেকে জানা যায় যে শশাঙ্কের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হওয়ার পর হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক ও গৌড়দের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক দারুন প্রতিজ্ঞা করেন এবং হংসবেগ নামক একজন দূত মারফত প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন।

হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্ত হর্ষকে বরাবরই কনৌজের সম্রাট বলা হয়েছে, থানেশ্বরের নয়। তাঁর রচনা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন শূন্য ও উত্তরাধিকারবিহীন হয়ে গেলে, এবং রাজ্যশ্রী ওই সিংহাসনের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে কনৌজের মন্ত্রীরা হর্ষবর্ধনকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এবং কিছুটা ইতস্তত করার পর হর্ষ রাজি হন। কিন্তু ব্যাপারটির সম্ভবত এভাবে

হয় নি। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি সিল থেকে জানা যায় যে, কনৌজের মৌখরিরাজ অবন্তীবর্মার গ্রহবর্মা ছাড়াও আরও একজন পুত্র ছিল। কাজেই গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর কনৌজের সিংহাসন খালি ছিল একথা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ‘মৌখরিগণ’ দ্রষ্টব্য।

১ক.৪.১ হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ

হর্ষের সামরিক অভিযানসমূহ মোটামুটি চারটি শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় যথা বলভী ও গুর্জরের শাসকবৃন্দ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী, সিন্ধু এবং পূর্বদিকের দেশসমূহ, যেমন মগধ, গৌড়, ওড্র ও কোঙ্গোদ।

বলভীর মৈত্রক রাজবৃন্দের মধ্যে খরগ্রহ, তৃতীয় ধরসেন, দ্বিতীয় ধ্রুবসেন ও চতুর্থ ধরসেন (খ্রিঃ ৬১৩-৬৪১) সকলেই ছিলেন হর্ষের সমকালীন। তাই ঠিক কার বিরুদ্ধে হর্ষ যুদ্ধ করেছিলেন তা সঠিক বলা শক্ত।

নান্দীপুরীর গুর্জরবংশীয় সামন্তরাজাদের লেখ থেকে জানা যায় যে, তাদের প্রাক্তন নৃপতি দ্বিতীয় দদ্দ তাঁর প্রভু বলভীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে বিখ্যাত হর্ষদেবকে পরাস্ত করেন, যদিও দদ্দের নিজের কোন লেখে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপিতে গুর্জর, মালব ও লাটদের পুলকেশীর অধীন সামন্তশক্তি বলা হয়েছে যারা কোন একটি বৃহৎ শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর অধীন হয়। সম্ভবত বলভীর মৈত্রকদের পক্ষ নেওয়ায় দ্বিতীয় দদ্দ হর্ষের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। আবার এও হতে পারে যে দদ্দ ছিলেন খুবই গৌণ শক্তি যিনি প্রথমে মৈত্রকদের ও পরে চালুক্যদের হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে এইজন্য তাঁর বংশধরদের নিকট থেকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা পান।

বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (খ্রিঃ ৬২৮-৪১) হর্ষের জামাতা হয়েছিলেন এবং মাত্র এইটুকু তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, তিনি হয় হর্ষের নিকট পরাস্ত হয়ে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে নিজ অধিকার বজায় রাখেন, না হয় হর্ষ তৎকর্তৃক পরাস্ত হয়ে অথবা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শেষ করার ইচ্ছায় নিজ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন।

হর্ষের দ্বিতীয় সামরিক অভিযান ছিল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে। নর্মদার তীরে এই যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হন। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন যে, হর্ষ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের নিয়োগ করেছিলেন এবং নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সাফল্যলাভ করেন নি। এই যুদ্ধ ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ঘটেছিল।

সিন্ধুতে হর্ষবর্ধন সাফল্যলাভ করেছিলেন কি না সন্দেহ আছে, যদিও বাণভট্ট লিখেছেন যে হর্ষবর্ধন সিন্ধুর রাজার সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে হরণ করেছিলেন।

পূর্বদিকে হর্ষ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হিউয়েন সাঙ কামরূপে গিয়েছিলেন যখন হর্ষ কোঙ্গোদ ও ওড়িশা জয় করে রাজমহলের নিকটবর্তী জঙ্গলে গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করেছিলেন। মা-তোয়ান-লিন লিখেছেন যে, শিলাদিত্য অর্থাৎ হর্ষবর্ধন ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মগধরাজ উপাধি নিয়েছিলেন। গৌড়ে যদি হর্ষ কিছু সাফল্য অর্জন করে থাকেন তা তিনি করেছিলেন শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ৬৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে মগধে ভ্রমণকালে হিউয়েন সাঙ শোনেন যে, সেই সময়ের কিছু আগে, শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষটির মূলোচ্ছেদ করেন, এবং তার অনতিকাল পরেই মারা যান। গৌড়ে ও মগধে হর্ষের সাফল্য ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর ঘটে।

১ক.৪.২ হর্ষের রাজ্যের বিস্তৃতি

বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের উপর ভিত্তি করে আগেকার দিনে হর্ষের রাজ্যের সম্পর্কে একটা অতিরঞ্জিত ধারণা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে হর্ষের রাজত্ব ছিল বর্তমান হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানের একাংশ, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল এবং বিহার ও উড়িষ্যার কতকাংশ নিয়ে। সিন্ধুপ্রদেশে হর্ষের অধিকার সম্পর্কে কোন পাকা প্রমাণ নেই। হিউয়েন সাঙ নিজেই হর্ষের সমসাময়িককালে উত্তর-পশ্চিমে কপিল ও উদ্যান, উত্তরে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। পশ্চিম মালবে (মো-লা-পো) তখন স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি বর্তমান ছিল। পূর্বদিকে ওড়িশা (ওড্র ও কোঙ্গোদ) মগধ এবং গৌড়বঙ্গের কিয়দংশ তাঁর অধীনে আসে। দক্ষিণে হর্ষবর্ধন চালুক্যদের এলাকা ভেদ করতে পারেন নি।

হর্ষবর্ধনের সামরিক জীবন খুব সফল না হলেও, এবং তাঁর সাম্রাজ্যের পরিসর সুবিস্তৃত না হলেও, তিনি শক্তিমান সম্রাট হিসাবে আদৃত ছিলেন এবং তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্র ছিল সর্বভারতীয়। দক্ষিণ ভারতীয় লেখসমূহে তাঁকে 'সকল-উত্তরাপথ-নাথ' বলা হয়েছে, যা তাঁর খ্যাতির ব্যাপ্তির পরিচায়ক।

সম্ভবত হিউয়েন সাঙের কাছ থেকে হর্ষবর্ধন চীন দেশ ও চীন সম্রাটের কথা শোনেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি একজন দূত চীনে প্রেরণ করেন। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে লি-ই-পিয়াও এবং ওয়াং-হিউয়েন-সের নেতৃত্বে আরও একটি দৌত্য হর্ষের রাজসভায় আসে। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ চীনে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর কাছ থেকে হর্ষের সংবাদ প্রত্যক্ষভাবে জেনে চীন সম্রাট পুনর্বার ওয়াং-হিউয়েন-সে এবং সিয়াং-চেউ জেনকে ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পাঠান। তাঁরা ভারতে পৌঁছে শোনেন যে হর্ষ মারা গেছেন। হর্ষের মৃত্যু হয়েছিল ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। হর্ষের কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মন্ত্রী অর্জুন অথবা অরুণাশ্ব সিংহাসন আরোহন করেন। ওয়াং-হিউয়েন-সে সম্ভবত তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

১ক.৪.৩ হর্ষের ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী

রাজা হিসাবে হর্ষবর্ধন যতটা না বড় ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী সারা ভারতেই তাঁকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। সাহিত্যিক হিসেবে হর্ষের প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি *রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা* ও *নাগানন্দ* নামক তিনটি নাটক রচনা করেন এবং সম্ভবত তা প্রদর্শনের জন্যও সচেষ্ট হন। এছাড়া তাঁর আমলে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে জোয়ার আসে তা বাণভট্ট ও অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারগণের রচনা থেকে উপলব্ধ হয়। ই-ৎসিং লিখেছেন ঃ "শিলাদিত্য সাহিত্যের রীতিমত অনুরাগী ছিলেন। তিনি শুধু বোধিসত্ত্ব জীমূতবাহনের (নাগানন্দ) কাহিনীকে ছন্দোবদ্ধই করেন নি, নৃত্য ও অভিনয়ের দ্বারা তিনি তা প্রদর্শন করান।"

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ষ প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন বলে হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। হর্ষের ধর্মের বিষয়ে কোন গোঁড়ামি ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, এবং নিজে শৈব হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাঁর সময়ে কনৌজে একটি ধর্ম সম্মেলন হয়, যাতে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মাসহ কুড়ি জন রাজা ও বহু পন্ডিত যোগদান করেন। এখানে হিউয়েন সাঙ বক্তৃতা করেন। হর্ষ ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি।

দানশীলতার জন্যও হর্ষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তিনি গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে দান-ধ্যান করতেন।

হর্ষ একটি অব্দ প্রচলন করেন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সিংহাসনারোহণের সময় থেকে। অল-বিরুনী লিখেছেন যে কনৌজ ও মথুরা অঞ্চলে তাঁর সময় এই অব্দের প্রচলন ছিল। হর্ষ কোন উত্তরাধিকারী রেখে যান নি।

১ক.৫ হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারত (৬৫০-৭৫০ খ্রিঃ)

হর্ষবর্ধন কোন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন কিনা তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। এখানে বি. এন. শ্রীবাস্তবের মতামত উল্লেখ্য। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র উত্তর ভারত পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছরের কনৌজের ইতিহাস সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় না। তবে আনুমানিক ৬৯০ থেকে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমরা যশোবর্মা নামক একজনকে কনৌজে রাজত্ব করতে দেখি, যাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী বাকপতির গৌড়বহো নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি প্রকৃতই দিগ্বিজয়ী ছিলেন যিনি আরব আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এবং ৭৩১ খ্রিস্টাব্দে চীনে বুদ্ধসেন নামক এক মন্ত্রীকে দূত হিসাবে পাঠান। তাঁর উত্থান ও পতন উল্কার ন্যায় ঘটেছিল। তিনি যুদ্ধে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের দ্বারা নিহত হন।

হর্ষবর্ধন মগধ জয়ের পর তাঁর আশ্রিত পরবর্তী গুপ্তবংশীয় মহাসেনগুপ্তের পুত্রদের সেখানকার সিংহাসনে বসিয়ে দেন। কিন্তু তাঁদের বংশধরেরা প্রাগুক্ত যশোবর্মা কর্তৃক উৎখাতপ্রাপ্ত হন। হর্ষের রাজনৈতিক মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করেন। কর্ণসুবর্ণ থেকে তাঁর একটি দানলেখ পাওয়া গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর কামরূপে কিছুটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা যায়। পরে সালস্তম্ভ নামক এক ব্যক্তি সেখানে একটি নতুন রাজবংশের পত্তন করেন। যে বলভীর মৈত্রকদের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই শিলাদিত্য উপাধিধারী মৈত্রক রাজারা ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। রাজা পঞ্চম শিলাদিত্য আরব আক্রমণ একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন।

রাজস্থান ও গুজরাত অঞ্চলে চারটি শক্তির উত্থান ঘটে, যথা গুর্জর প্রতিহার, গুহিলোত বা গুলিহপুত্র, চাপ বা চাপোৎকট এবং চাহমান। হরিচন্দ্র যোধপুরে প্রথম গুর্জর রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর বংশধররা রাজস্থান, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের কোন কোন স্থানে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলেন। পশ্চিম ভারতে আরব আক্রমণের পটভূমিকায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে অবন্তীর গুর্জরদের প্রতিহার শাখার নৃপতি নাগভট্ট খণ্ড-বিক্ষিপ্ত গুর্জর রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন, যা থেকে পরবর্তীকালের বিখ্যাত গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

১ক.৫.১ কাশ্মীর ঃ কার্কোটক্ বংশ (৬২৭-৮৫৫ খ্রিঃ)

হর্ষবর্ধনের সময়ে, আনুমানিক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে, কাশ্মীরে দুর্লভবর্ধন কার্কোট বা নাগবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হিউয়েন সাঙ, যিনি তাঁর সময়ে কাশ্মীর পরিদর্শন করেন, লিখেছেন যে তখনকার দিনে তক্ষশিলা, সিংহপুর, উরশা, পান-নু-সো (পুঞ্চ) এবং রাজপুর (রাজৌরি) কাশ্মীরের অধীন ছিল। দুলর্ভবর্ধন ৩৬ বছর এবং তাঁর পুত্র দুর্লভক ৫০ বছর রাজত্ব করেন।

রাজতরঙ্গিনী-র বক্তব্য অনুযায়ী, দুর্লভকের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য রাজত্ব করেন ও প্রতাপপুর নগরী স্থাপন করেন। এর পুত্র চন্দ্রাপীড় কাশ্মীরের রাজা হন। তিনি ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে চীনের কাছ থেকে সাহায্য

চেয়ে একজন দূত পাঠান, কেননা আরব সেনাপতি মুহম্মদ-বিন-কাসিম আরব সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরে যুদ্ধ করা তাঁর হয় নি, কেননা আরব কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে নিয়ে হত্যা করে। সাড়ে আট বছর রাজত্ব করার পর চন্দ্রাপীড় তাঁর ভাই তারাপীড় কতৃক নিহত হন। তারাপীড় চার বছর রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা হন তাঁর ছোট ভাই ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭২৪ খ্রিঃ)।

ললিতাদিত্য প্রথমে তিব্বতীদের ও পরে দর্দ, কাম্বোজ ও তুর্কদের (আরব) জয় করেন। অতঃপর তিনি যশোবর্মাকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। কলহন তাঁর *রাজতরঙ্গিনী*-তে ললিতাদিত্যের দ্বিগ্বিজয়ের একটি অতিরঞ্জিত কাহিনী বলেছেন যা অনুযায়ী তিনি কলিঙ্গ, গৌড়, কর্ণাট, দ্বারকা, অবন্তী, প্রাগজ্যোতিষ, স্ত্রীরাজ্য, উত্তরকুরু এবং দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত জয় করেছিলেন।

কলিঙ্গ বা কর্ণাট বা কাবেরী পর্যন্ত অঞ্চলে তাঁর অধিকার বিস্তারের অন্য কোন প্রমাণ নেই। তবে কামরূপের ইতিহাসে দেখা যায় সেখানকার কোন কোন রাজবংশের সঙ্গে কাশ্মীর ও নেপালের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে ললিতাদিত্য দক্ষিণ হিমালয়ের পার্বত্য পথ ধরে প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপে গমন করেন এবং সেখানকার কোন স্থানীয় রাজার আনুগত্য গ্রহণ করেন। প্রাগজ্যোতিষের পথেই গৌড়ের কোন রাজার সঙ্গে তাঁর একটা বোঝাপড়া হয়, এবং তিনি তাকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানান। ওই একই পথে গাড়োয়াল-কুমায়ুনের নিকটবর্তী অঞ্চলের একটি স্ত্রীরাজ্যের, অর্থাৎ যেখানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে মাতৃপ্রাধান্য বর্তমান, তার কথা হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এইরকম কোন স্ত্রীরাজ্য তিনি অধিকার করেন। উত্তরকুরু দেশটি কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত। ললিতাদিত্য তা দখল করতেই পারেন। দ্বারকা বা অবন্তীতে তিনি কিছু যুদ্ধবিগ্রহ করে থাকতেও পারেন। প্রধানত আরব আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি কনৌজরাজ যশোবর্মার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে কিছুকালের জন্য আবদ্ধ হয়েছিলেন।

গৌড়রাজকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানিয়ে ললিতাদিত্য তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করেন। এই সংবাদ পেয়ে কয়েকজন গৌড়বাসী কাশ্মীরে গিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। তারা বিষ্ণু রামস্বামীর মন্দির ধ্বংস করে এবং রাজধানীতে ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। প্রত্যেকে নিহত না হওয়া পর্যন্ত তারা সমানে যুদ্ধ করেছিল। তাদের এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রশংসা কল্হন মুক্তকণ্ঠে করেছেন।

৩৬ বছর রাজত্ব করার পর ৭৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ললিতাদিত্য মারা যান। তাঁর উত্তরাধিকারীরা দুর্বল ছিলেন। তাঁর পৌত্র জায়পীড় অবশ্য কাশ্মীরের পূর্বমর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। অবশ্য কার্কোট বংশ ৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

১ক.৫.২ আরব আক্রমণ

খলিফা ওমরের আমল থেকেই (৬৩৪-৪৪ খ্রিঃ) আরবেরা বারবার স্থলপথে ও জলপথে ভারতে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে অল-হজাজ ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে জলপথে ও স্থলপথে ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। স্থলপথে তিনি কাবুল ভেদ করতে না পারলেও সিন্ধুপ্রদেশে তিনি সফল হন।

সিংহল থেকে একটি জাহাজ কিছু মুসলিম তীর্থযাত্রিনী নিয়ে ইরাক যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দেবল বন্দরের নিকট তারা জলদস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। হজাজ রাজা দাহরকে চিঠি মারফৎ অনুরোধ করেন এই

তীর্থযাত্রিনীদের মুক্ত করতে। দাহর জানান যে জলদস্যুদের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে হজাজ দেবল আক্রমণের জন্য একটি বাহিনী পাঠান। এই ঘটনাটি অবশ্য হজাজের পক্ষে একটা অজুহাত, কেননা ইতিপূর্বেই তিনি স্থলপথে কয়েকবার সিন্ধুতে হানা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। যাই হোক, হজাজ প্রেরিত এই বাহিনী পরাজিত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণ হয় বুদাইলের নেতৃত্বে। দাহরের পুত্র জয়সিংহ এক্ষেত্রেও জয়লাভ করেন এবং বুদাইল নিহত হন।

অতঃপর হজাজ বিস্তৃত সামরিক আয়োজন করে নিজ জামাতা মুহম্মদ-ইবন-কালিমকে দাহরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবারে মুহম্মদ দেবল অধিকারে সমর্থ হন। দেবল বন্দরটি সম্ভবত ছিল সিন্ধুর ত্তা অঞ্চলে। দেবল থেকে মুহম্মদ নেরুন-এ (বর্তমান পাকিস্তানের হায়দরাবাদ) উপস্থিত হন এবং সেখানে থেকে সিউইস্তানে (সেহোয়ান) পৌঁছান। তিনি মোকা প্রমুখ কিছু প্রভাবশালী বিশ্বাসঘাতক সামন্তের সহায়তা পান। তারপর তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে রাওর নামক স্থানে দাহরের সম্মুখীন হন। যুদ্ধকালে দাহর অকস্মাৎ নিহত হলে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়। এরপর দাহরের পুত্র জয়সিংহ ব্রাহ্মণাবাদে পিছিয়ে আসেন এবং রাজধানী আলোর রক্ষায় সচেষ্ট হন। ছয় মাস চেষ্টার পর আলোরের পতন ঘটে। অতঃপর মুহম্মদ উত্তর দিকে মূলতান জয় করেন।

৭১৪ খ্রিস্টাব্দে হজাজের মৃত্যুর পর ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদেরও মৃত্যু ঘটে। এর পর নতুন খলিফা সুলেইমানের সময় কাশিমের প্রাণদণ্ড হয়। মুহম্মদের মৃত্যুর পর সিন্ধুর সামন্তরাজারা আরব অধিকার অস্বীকার করেন। খলিফা দ্বিতীয় উমর (৭১৭-২০ খ্রিঃ) তাঁদের সামন্তরাজা হিসেবে স্বীকার করে নেন এই শর্তে যে এঁদের সকলকে মুসলমান হতে হবে। জয়সিংহ ও অনেকেই তা মেনে নেন। কিন্তু পরে জয়সিংহ বিদ্রোহী হন এবং সিন্ধুর শাসনকর্তা জুনাইদের হাতে পরাস্ত ও নিহত হন। ৭২৪ থেকে ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জুনাইদ রাজস্থানের মধ্য দিয়ে পূর্বে মালব ও দক্ষিণে ব্রোচ পর্যন্ত জয় করেন। কিন্তু এই জয়লাভ ক্ষণস্থায়ী হয়। প্রতিহাররাজ নাগভট এবং লাটের (দক্ষিণ গুজরাত) চালুক্যরাজ অবনিজনাশ্রয় পুলকেশীরাজ আরব বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

উত্তর-পশ্চিমে মুহম্মদ-বিন-কাশিমের চেষ্টায় মূলতান, কিরাজ বা কাংরা ও কাশ্মীরের কিছু অংশ আরবদের অধিকারে এসেছিল কিন্তু জুনাইদ তা বজায় রাখতে পারেননি। কনৌজের যশোবর্মা ও কাশ্মীরের ললিতাদিত্য আরব বাহিনীকে পরাজিত করেন।

এদেশে আরব আক্রমণ কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখতে পারেনি। পরবর্তীকালে ভারত ইতিহাসে তুর্কীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার সূত্রপাত আরবেরা করেছিল বললে ঠিক বলা হবে না।

১ক.৬ পাল ও প্রতিহার প্রাধান্যের যুগ (৭৫০-১০০০ খ্রিঃ)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষ সমগ্র বঙ্গাদেশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিহীন অথচ পরস্পর বিবাদমান অসংখ্য রাজ্যের অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে এবং শেষ পর্যন্ত একজন যোগ্য ব্যক্তির প্রাধান্য মেনে নেওয়া ভিন্ন এই সকল শক্তির কোন উপায় থাকে না। এরই ফলে ছোট ছোট রাজা-জমিদারেরা নিজেদের নিরাপত্তার কারণেই গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে সার্বভৌম রাজা হিসাবে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নির্বাচিত করে যিনি ৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই গোপাল থেকে পালবংশের প্রতিষ্ঠা। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

১ক.৬.১ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রিঃ)

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল বৃহত্তম ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় গুর্জর-প্রতিহারগণ। প্রতিহার সম্রাট বৎসরাজ কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধের ঊর্ধ্বতন ছিলেন। ধর্মপাল এই ইন্দ্রায়ুধকে উচ্ছেদ করে তাঁর জায়গায় তাঁরই জ্ঞাতি চক্রায়ুধকে বসান। তার ফলে প্রতিহার বৎসরাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্তী কোন স্থানে। এই যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু বৎসরাজ তাঁর বিজয়লাভের ফল ভোগ করার আগেই দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আকস্মিকভাবে (অথবা কোন পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী) তাঁকে আক্রমণ করেন এবং বৎসরাজ পরাজিত হয়ে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে পালিয়ে যান। ধর্মপাল ধ্রুবের বশ্যতা স্বীকার করেন। ধ্রুব স্বরাজ্যে ফিরে গেলে, প্রতিহারদের শক্তিক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে ধর্মপাল উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং কনৌজে একটা দরবার আহ্বান করে চক্রায়ুধকে সেখানকার সিংহাসনে বসিয়ে অধীনস্থ সামন্তদের দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেন।

প্রতিহাররাজ বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কনৌজ পুনর্দখল করে চক্রায়ুধকে হটিয়ে ইন্দ্রায়ুধকেই আবার কনৌজের রাজা করে দেন এবং ধর্মপাল তার প্রতিকার করতে গিয়ে মুঙ্গের নিকটবর্তী কোন স্থানে দ্বিতীয় নাগভট্টের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু এবারেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ধ্রুবের পুত্র রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাটকীয়ভাবে এক্ষেত্রেও আবির্ভূত হন এবং নাগভট্টকে পরাস্ত করে ধর্মপালকে উদ্ধার করেন। দু'বার পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও আসল লাভটা ধর্মপালেরই হয়। সম্ভবত রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে ধর্মপালের কোন রাজনৈতিক বোঝাপড়া ছিল।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরগণ ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তবে এটা আনুষ্ঠানিক দাবি। ওই নামগুলির মধ্যে অনেকগুলি তখনকার দিনে বাস্তবে অনুপস্থিত ছিল। কার্যত ধর্মপাল বাংলা ও বিহারের রাজা ছিলেন। উত্তপ্রদেশের অনেকটা অংশ তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ছিল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও সন্নিহিত অঞ্চলের কিছু সামন্ত রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। *স্বয়ম্ভুপুরান*-এ বলা হয়েছে যে নেপালও ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার করত।

ধর্মপাল পরমেশ্বর, পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বিক্রমশিলা ও সোমপুরী মহাবিহারদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কোন কোন তিব্বতী গ্রন্থের মতে তদন্তপুরী বিহারও তিনি নির্মাণ করেন, যদিও এই প্রসঙ্গে গোপাল ও দেবপালের নামও করা হয়। তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১ক.৬.২ দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রিঃ)

ধর্মপালের পুত্র দেবপালের আমলের লেখসমূহ তাঁকে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য ও পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার অধিপতি বলে বর্ণনা করেছে। পাল লেখসমূহ থেকে এও জানা যায় যে তিনি পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য অঞ্চল অধিকার করে প্রাগজ্যোতিষ জয় করেন, হূনদের দর্পচূর্ণ করেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরদের গৌরব খর্ব করেন।

সম্ভবত কাম্বোজ অঞ্চলকেই এক্ষেত্রে হূন এলাকা বলা হয়েছে। আসাম ও ওড়িশা বিজয় তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁর গুর্জর প্রতিপক্ষ ছিলেন হয় দ্বিতীয় নাগভট্ট, অথবা রামভদ্র বা ভোজ। তাঁর দ্রাবিড় প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন কোন ক্ষুদ্র দক্ষিণী নৃপতি।

দেবপালও তাঁর পিতা ধর্মপালের মতো বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। মালয়েশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট নালন্দার একটি মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন এবং তা মঞ্জুর হয়েছিল।

১ক.৬.৩ দেবপালের উত্তরাধিকারীগণ

দেবপালের পর মহেন্দ্রপাল, শূরপাল প্রভৃতি পালবংশীয় নৃপতিদের অধীনে পাল রাজত্বের অবক্ষয়ের সূচনা হয়। নারায়ণপালের আমলে কামরূপের হর্জরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ওড়িশার শৈলোদ্ভবরা পাল প্রাধান্য অস্বীকার করে। চন্দেল্ল ও কলচুরিদের লেখসমূহ থেকে জানা যায় যে তারা গৌড়, রাঢ়, অঙ্গ ও বঙ্গালের শাসকদের পরাজিত করে, যা থেকে মনে হয় যে খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষের দিকে পালদের নিজস্ব এলাকাগুলিই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথক পৃথক ভৌগোলিক সত্তায় পরিণত হয়। এই সকল অঞ্চলের শাসকরা কার্যত স্বাধীন হয়ে যান। হয়তো তাঁরা পালদের একটা আনুষ্ঠানিক আনুগত্য স্বীকার করতেন, এই মাত্র।

৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহীপাল যখন রাজা হন তখন বঙ্গদেশই পালদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, শুধু দক্ষিণ বিহারের মগধ অঞ্চলেই তারা কায়ক্লেশে টিকে আছে। প্রথম মহীপাল এই হতমান অবস্থা থেকে পালবংশকে উদ্ধার করেন এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ পুনরায় দখল করেন যা তাঁর বাণগড় লেখ থেকে বোঝা যায়। উত্তর বিহারের অনেকটা অংশ পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত এলাকা তিনি অধিকার করেন। মহীপালের আমলে বাংলাদেশে রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ ঘটে। রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বঙ্গালের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করেন বলে তাঁর লেখে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সমগ্র বঙ্গদেশে মহীপালের অধিকার বজায় ছিল না। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ১০২৬ থেকে ১০৩৪ খ্রিঃ-এর মধ্যে কলচুরি গাঙ্গেয়দেবের সঙ্গে যুদ্ধের পরিণতিতে মহীপাল বারাণসী অঞ্চলটি হারাতে বাধ্য হন।

১ক.৬.৪ গুর্জর-প্রতিহারগণ

(ক) **প্রথম নাগভট্ট** (৭৩০-৭৫৬ খ্রিঃ) ঃ গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নাগভট্ট আরব আক্রমণ প্রতিহত করে যশস্বী হন। তাঁর পিতৃপুরুষগণ পূর্ব রাজস্থান ও মালবের কিয়দংশে যে রাজ্য স্থাপন করেন নাগভট্ট তার সীমানাকে ব্রোচ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর আরব প্রতিদ্বন্দ্বী জুনাইদ বা তাঁর উত্তরাধিকারী তামিল ছিলেন কিনা সে কথা বলা শক্ত। রাষ্ট্রকূট লেখসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে প্রথম নাগভট্ট রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হন।

(খ) **বৎসরাজ ঃ** রমেশচন্দ্র মজুমদার বৎসরাজের সময়কালের সূচনা ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ বলে লিখেছেন। প্রথম নাগভট্টের পর তাঁর ভাই-এর দুই পুত্র কক্কুর এবং দেবরাজ রাজা হন। দেবরাজের উত্তরাধিকারী বৎসরাজ যিনি ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনৌজের সিংহাসনে তাঁর মনোনীত ইন্দ্রায়ুধকে সরিয়ে যখন পাল রাজা ধর্মপাল চক্রায়ুধকে বসান, বৎসরাজ ধর্মপালের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। গঙ্গাযমুনার দোয়াব অঞ্চলের যুদ্ধে তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের আকস্মিক আক্রমণে তাঁকে প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে রাজস্থানের মরু অঞ্চলে পালিয়ে যেতে হয়। তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

(গ) **দ্বিতীয় নাগভট্ট ঃ** দ্বিতীয় নাগভট্টের রাজত্বকাল ৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ধরা যেতে পারে। বৎসরাজের উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট। তাঁর পৌত্রের গোয়ালিয়র লেখ থেকে জানা যায় যে তিনি অন্ধ্র, সৈন্ধব, বিদর্ভ এবং কলিঙ্গের বশ্যতা আদায় করেন। তিনি চক্রায়ুধ ও বঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেন এবং আনর্ত, মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস ও মৎস্যদের পার্বত্য দুর্গগুলি জয় করেন। কয়েকটি দাবি প্রথাগত হলেও তিনি যে রীতিমত শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং বিভিন্ন সামন্ত শক্তির আনুগত্য লাভ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি প্রথমেই কনৌজ দখল করে ধর্মপালের মনোনীত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে সরিয়ে নিজের লোক ইন্দ্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান এবং তাঁর বাহিনী নিয়ে মুঙ্গের পর্যন্ত এগিয়ে যান। বাধা দিতে এসে ধর্মপাল তাঁর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু এবারেও সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আকস্মিকভাবে এসে প্রতিহারবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। নাগভট্ট বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে যান, এবং তাঁর বিষয়ে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

(ঘ) **ভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খ্রিঃ)** ঃ দ্বিতীয় নাগভট্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামভদ্র তিন বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন ভোজ, যাঁর ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত বারা-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ওই সময় নাগাদ মহোদয় বা কনৌজ তাঁর রাজধানী ছিল। তাঁর আমলে কনৌজ অবশেষে প্রতিহারদের আয়ত্তে আসে। তাঁর দৌলতপুর-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি যোধপুরে প্রতিহারদের পুনর্মূষিক করেন এবং গুর্জরত্রা অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানে নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮৪৫ থেকে ৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রকূটগণ, পালবংশীয় রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাল রাজ্যের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেন এবং অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাজিত করেন। গোরখপুর অঞ্চলের কলচুরিরা তাঁর সামন্ত ছিল। বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাও তাঁর অনুগত ছিল। তাঁর রাজ্য ছিল উত্তরে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। মালব অঞ্চলও তাঁর অধীনে ছিল।

(ঙ) **পরবর্তী প্রতিহারগণ ঃ** ভোজের রাজ্যসীমা তৎপুত্র মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯০৯ খ্রিঃ) বজায় রাখেন। তাঁর পরবর্তী রাজারা ছিলেন দ্বিতীয় ভোজ এবং বিনায়কপাল বা মহীপাল। শেষোক্তজন শক্তিমান নরপতি ছিলেন যেকথা অল-মাসুদি এবং তাঁর সভাকবি রাজশেখর উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রকূটদের হাতে সাময়িকভাবে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলেও মহীপাল তাঁর হৃতরাজ্যের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। তাঁর রাজ্যসীমা ছিল পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, পূর্বে বারাণসী ও দক্ষিণে চান্দেরা। মহীপাল ৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর অযোগ্য বংশধরদের আমলে ধীরে ধীরে প্রতিহার সাম্রাজ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে। মূলত রাষ্ট্রকূট ও চন্দেল্ল আক্রমণ, সামন্তদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও প্রতিহার রাজাদের অযোগ্যতা ও সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বই তাদের ধ্বংসের কারণ। প্রতিহার রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তিনটি শক্তির উত্থান ঘটে—রাজস্থানের চাহমান গুজরাতের চালুক্য এবং মালবের পরমার।

১ক.৬.৫ কাশ্মীর ঃ উলার রাজবংশ

৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের কার্কোটবংশের পতনের পর অবন্তিবর্মা কাশ্মীরে উলার বংশের শাসনের পত্তন করেন। অবন্তিবর্মা সুশাসক ছিলেন যিনি মহাপদ্ম নামক একটি হ্রদ (বর্তমান বুলুর) থেকে খাল কেটে কাশ্মীরের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। বিতস্তা নদীতেও তাঁর নির্দেশে বাঁধ দেওয়া হয়। ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অবন্তিবর্মার মৃত্যু ঘটলে

সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় তাতে জয়লাভ করে তাঁর অন্যতম পুত্র শঙ্করবর্মা কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। শঙ্করবর্মা সম্ভবত ৮৮৫ খ্রিঃ থেকে ৯০২ খ্রিঃ-এর মধ্যে রাজত্ব করেন।

শঙ্করবর্মা বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী দার্বাভিসার অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানকার খশগোষ্ঠীর শাসক নরবাহনকে হত্যা করেন। ত্রিগর্তের, অর্থাৎ কাংরা অঞ্চলের, রাজা পৃথিবীচন্দ্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। পাঞ্জাব অঞ্চলে গুজরাত নামক রাজ্যের গুর্জর রাজা অলখান তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে চন্দ্রভাগার দক্ষিণস্থ তক্ক দেশের অধিকার তাঁকে ছেড়ে দেন। প্রতিহার মহেন্দ্রপালকেও শঙ্করবর্মার হাতে পরাজিত হয়ে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়। যোদ্ধা হিসেবে সার্থক হলেও রাজা হিসেবে তিনি উৎপীড়ক ছিলেন। উরশা বা হাজারা অঞ্চলে তিনি আকস্মিকভাবে স্থানীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা নিহত হন।

শঙ্করবর্মার হত্যার পর তাঁর নাবালক পুত্র গোপালবর্মা ৯০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন, কিন্তু তিনি মন্ত্রী প্রভাকর কর্তৃক নিহত হন। তিনি শঙ্করবর্মার পুত্র বলে কথিত জনৈক সঙ্কটকে সিংহাসনে বসান। সঙ্কট দশদিন পরেই মারা যান। তখন শঙ্করবর্মার স্ত্রী সুগন্ধা নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তন্ত্রী নামক একটি সামরিক সামন্তচক্র রাজস্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা রানী সুগন্ধাকে পদচ্যুত করে ৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাক্তন রাজা অবন্তিবর্মার সম্পর্কিত ভ্রাতা নির্জিতবর্মা ওরফে পঙ্গুর দশমবর্ষীয় পুত্র পার্থকে রাজা করে। সুগন্ধা লুস্কপুরে পালিয়ে যান এবং ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তন্ত্রীদের বিরোধী একাঙ্গা নামক একটি সামরিক সামন্তচক্রের সহায়তার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তন্ত্রীরা একাঙ্গাদের পরাজিত করে এবং সুগন্ধকে হত্যা করে।

এদিকে পঙ্গুতন্ত্রীদের উৎকোচ দিয়ে পুত্র পার্থের অভিভাবক হয়ে বসেন এবং প্রজাদের উপর দারুণ করভার চাপান। ৯২১ খ্রিস্টাব্দে নাবালক পুত্র পার্থকে উৎখাত করে পঙ্গু নিজেই রাজা হন এবং তাঁর অপর পুত্র চক্রবর্মাকে উত্তরাধিকারী করে মারা যান। তন্ত্রীরা আরও টাকার লোভে চক্রবর্মাকে সরিয়ে তাঁর সম্পর্কিত ভাই সুরবর্মাকে সিংহাসনে বসায়, এবং এক বছর পরে পূর্বোক্ত পার্থকে, আবার ৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে চক্রবর্মাকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু তন্ত্রীদের আরও দাবি মেটাতে না পেরে চক্রবর্মা পলাতক হন। তখন শম্ভুবর্ধন নামক জনৈক মন্ত্রী অর্থের বিনিময়ে রাজা হন।

চক্রবর্মা ডামর নামক তন্ত্রীদের বিরোধী আর একটি সামন্তচক্রের সহায়তায় তন্ত্রীদের পরাস্ত করেন ও শম্ভুবর্ধনকে নিহত করে রাজপদ পুনরায় দখল করেন। কিন্তু তিনি ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। এর পর পার্থের পুত্র উন্মত্তাবন্তীকে সিংহাসনে বসানো হয়। ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী কমলবর্ধন তন্ত্রী, একাঙ্গা, ডামর প্রভৃতি গোষ্ঠীকে নির্মূল করেন। কিন্তু রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার জন্য করায়ত্ত রাজপদ লাভ করতে অপারগ হন।

পরবর্তী রাজারা ছিলেন যশস্কর ও সংগ্রামদেব। যাঁরা উভয়েই নিহত হন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন পর্বগুপ্ত ও ক্ষেত্রগুপ্ত। ৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষেমগুপ্তর বিধবা দিদ্দা তাঁর নাবালক পুত্র অভিমন্যুর হয়ে সর্ব ক্ষমতা অধিকার করেন। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়, এবং ক্ষমতালোভী রাণী দিদ্দার চক্রান্তে অভিমন্যুর তিন পুত্র-নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্ত পরপর নিহত হন। ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে দিদ্দা নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। ১০০৩ খ্রিস্টাব্দে দিদ্দা মারা যান। কিন্তু তার আগে তিনি তাঁর ভাগ্নে লোহবংশীয় সংগ্রামরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সংগ্রামরাজ থেকে কাশ্মীরে লোহর বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

১ক.৭ উত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিন্যাস (১০০০-১২০০ খ্রিঃ)

১ক.৭.১ উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশ

সিরহিন্দ থেকে লমঘন এবং কাশ্মীর সীমান্ত থেকে মূলতান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় শাহীবংশীয় রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল রাওয়ালপিন্ডি জেলার আটকের নিকট উদভান্ডপুর বা উন্দ (ওহিন্দ)। শাহীরা প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ছিলেন না। এঁরা পরবর্তীকালে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। অলবিরুনী তাঁদের কনিষ্কের বংশোদ্ভূত বলেছেন। এঁরা তুর্কী শাহীয়া নামে পরিচিত। খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষের দিকে এই বংশের রাজা জয়পাল দু'বার গজনীর অধিপতি সবুক্তিগিনের নিকট পরাস্ত হন। তিনি ১০০০ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদের হাতে বন্দী হন। ২৫০,০০০ দীনার এবং ২৫টি হাতির-বিনিময়ে তিনি মুক্তি পান। পর পর তিনবার বিধর্মীদের হাতে পরাজয়ের গ্লানিতে জয়পাল অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেন, এবং ১০০১ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপাল উদভাণ্ডের সিংহাসনে বসেন।

১০০৬ ও ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপাল গজনীর মাহমুদের নিকট পরাজিত হয়ে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। ১০১৩ খ্রিস্টাব্দে এবং ১০২০-২১ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচনপালকে পরাস্ত করেন। পঁচিশ বছর একটানা প্রতিরোধ করার পর শাহী রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। অলবিরুনী লিখেছেন ঃ "হিন্দু শাহী বংশ এখন উৎখাত প্রাপ্ত হয়েছে, এবং গোটা পরিবারের সামান্যতম অবশিষ্ট বর্তমান নেই। কিন্তু আমরা অবশ্যই বলব যে তাঁদের সকল জাঁকজমকের মধ্যেও তাঁরা যা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত তা করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় কোন শৈথিল্য দেখান নি, এবং তাঁরা মহৎ মনোভাব ও মহৎ সম্পর্কের মানুষ ছিলেন।"

১ক.৭.২ কাশ্মীর ঃ লোহর রাজবংশ

একাদশ শতকে কাশ্মীরের সিংহাসন লোহর বংশের সংগ্রামরাজের হাতে চলে যায়। তাঁর মন্ত্রী তুঙ্গ সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে শাহী ত্রিলোচনপালকে সাহায্য করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা অনন্ত ডামার নামক সামন্ত গোষ্ঠী দমন করেন, দর্দদের আক্রমণ প্রতিহত করেন, চম্বার শাসক সালবাহনকে উচ্ছেদ করেন, দার্বাভিসার, ত্রিগর্ত ও ভর্তুলের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজা ছিলেন কলস। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। এই দুশ্চরিত্র রাজা মারা গেলে তৎপুত্র উৎকর্ষ রাজা হন। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে হর্ষ ক্ষমতায় আসেন।

হর্ষ ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাবান, বহু গুণে গুণী এবং তাঁর রাজসভা কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের কাছে কল্পবৃক্ষের ন্যায় ছিল। তিনি বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করেন, কিন্তু রাজৌরির শাসক ও দর্দদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও হর্ষ ছিলেন লম্পট-শিরোমণি ও অত্যাচারী। তাঁর করনীতি ও লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির জন্য দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা যায় এবং ১১০১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে হর্ষ নিহত হন।

পরবর্তী রাজারা ছিলেন উচ্চল (১১০১-১১) এবং সুস্সল। শেযোক্তজন ১১২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র জয়সিংহের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ১১২৮ খ্রিস্টাব্দে রহস্যজনকভাবে নিহত হন। জয়সিংহ বিদ্রোহী সামন্তবর্গকে নির্মম হস্তে দমন করেন এবং ১১৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হন

তাঁর পুত্র পরমানুক (১১৫৫-৬৫ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র লোহর বংশের উচ্চল শাখার শেষ রাজা বন্তিদেব (১১৬৫-৭২ খ্রিঃ)। বন্তিদেবের মৃত্যুর পর সামন্তরা বুপ্পদেব নামক ভিন্নবংশীয় একজনকে সিংহাসনে বসায়। ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জস্সক ১১৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১ক.৭.৩ কনৌজের গাহড়বালগণ

১০১৯ খ্রিস্টাব্দে গজনীর মাহমুদের আক্রমণ এড়াতে কনৌজের প্রতিহার রাজা রাজ্যপাল বারি নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু কয়েকটি লেখের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, তারপর একটি রাষ্ট্রকূট বংশ কনৌজে কিছুকাল রাজত্ব করে। এই বংশের গোপালের রাজত্বকালে ১০৬৮ থেকে ১০৮০ খ্রিঃ-এর মধ্যে কনৌজ ইয়ামিনিদের অধিকারে আসে। চন্দ্রদেবের সময়কাল সম্বন্ধে দু'টি তারিখ পাওয়া যায় (১০৯০ খ্রিঃ ও ১১০০ খ্রিঃ)। ইয়ামিনি শাসক ইব্রাহিমের পুত্র মাহমুদ চাঁদ রায় নামক একজন হিন্দুকে কনৌজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করেন। ইনিই সম্ভবত গাহড়বালবংশীয় চন্দ্রদেব যিনি পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মদনচন্দ্র ইয়ামিনিবংশীয় তৃতীয় মামুদ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু মদনচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (১১১৪-৫৪ খ্রিঃ) ইয়ামিনিদের পরাস্ত করে পিতাকে উদ্ধার করেন ও গৌড়ের রামপালের আক্রমণ প্রতিহত করেন। গোবিন্দচন্দ্র চন্দেল্লদের পরাজিত করে পূর্বমালব দখল করেন। তাঁর সাথে চালুক্যবংশ ও কাশ্মীর রাজবংশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কলিঙ্গ ও উৎকলাধিপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া ব্যাহত করেন এবং মিথিলার নান্যদেবের আক্রমণ রোধ করেন। তাঁর পুত্র বিজয়চন্দ্র ইয়ামিনি খুসরো মালিকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর পুত্র জয়চন্দ্র ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুইজুদ্দীন ঘুরী কর্তৃক এটাওয়া জেলার চন্দাবার নামক স্থানে পরাজিত হন। কিন্তু জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র জৌনপুর, মীর্জাপুর ও কনৌজের উপর পুনরায় অধিকার স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী অড়ক্কমল্লের হাত থেকে ইলতুৎমিস কনৌজ দখল করেন ১২৩৬ খ্রিঃ-এর কিছু আগে।

১ক.৭.৪ গুজরাতের চালুক্যগণ

একাদশ শতকের শুরুতে চালুক্যগণ গুজরাত অঞ্চলে শক্তিমান হয়। এই চালুক্যগণ প্রাথমিকভাবে সারস্বতমণ্ডল বা সরস্বতী নদী প্রবাহিত অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করেন। এঁরাই পরে সোলাঙ্কি রাজপুত রূপে পরিচিত হন। ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভীমের আমলে সুলতান মাহমুদ গুজরাত আক্রমণ করেন ও বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। ভীমের পুত্র কর্ণ (১০৬৪-৯৪ খ্রিঃ) মহারাষ্ট্রের নবসারি অঞ্চলটি জয় করেন এবং মালবের পারমারদের সঙ্গে নিষ্ফল যুদ্ধ করেন। পরবর্তী রাজা জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৫ খ্রিঃ) উত্তরে যোধপুরের বলি ও জয়পুরের সাম্ভভর, পূর্বে ভীলসা ও পশ্চিম কচ্ছ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন কুমারপাল (১১৪৫-৭২ খ্রিঃ) ও অজয়পাল (১১৭২-৭৬ খ্রিঃ)। শেষোক্তের পুত্র দ্বিতীয় মূলরাজের আমলে ১১৭২ খ্রিস্টাব্দে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী গুজরাত আক্রমণ করেন, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় ভীম ১২৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১ক.৭.৫ রাজস্থান ও সন্নিহিত অঞ্চলসমুহ

বয়ান-শ্রীপথ অঞ্চলে, অর্থাৎ ভরতপুরে যদুবংশীয়দের শাসন ছিল ১০০০ থেকে ১১৯২-৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। কচ্ছপঘাতদের তিনটি শাখা একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করে যথাক্রমে গোয়ালিয়র, ডুবকুণ্ডু এবং নরওয়ারে। আবুপাহাড়, বাগড়, জালোর ও ভিলমালে পরমারদের কয়েকটি শাখাবংশ রাজত্ব করত একাদশ

ও দ্বাদশ শতকে। মেবারে গুহিলদের অধিকার চতুর্দশ শতকের শুরু পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিশোদিয়ায় গুহিলদের আর একটি শাখাবংশ রাজত্ব করত। গুহিলগণ বা গিহ্লোটবংশীয় রাজারা প্রধানত মেবারে শাসন করতেন। একাদশ শতক থেকে চতুর্দশ শতকের সূত্রপাত পর্যন্ত চাহমানদের পাঁচটি শাখা যথাক্রমে শাকম্ভরী, রণস্তম্ভপুর, নাডোল, জাবালিপুর ও দেবড়ায় রাজত্ব করত। শাকম্ভরীর চরহমানবংশীয় তৃতীয় পৃথ্বিরাজ ১১৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করলেও ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন।

১ক.৭.৬ মালবের পারমারগণ

পারমার বা পাওয়ার (পারব) রাজপুতগণ মালবে, চাহমান বা চৌহান রাজপুতগণ গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন। মুঞ্জ ও সিন্ধুরাজের অধীনে মালব অঞ্চলে পারমারগণ শক্তি সঞ্চয় করে। সিন্ধুরাজের পুত্র ভোজ (১০০০-১০৫৫ খ্রিঃ) কলচুরি গাঙ্গোয়দেব ও তাঞ্জোরের চোলের সহায়তায় কল্যাণের চালুক্যবংশীয় জয়সিংহকে পরাস্ত করেন। গঞ্জাম জেলার আদিনগরের ইন্দ্ররথ, শিলাহার কেশিদেব, চালুক্য কীর্তিরাজ এবং শাকম্ভরীর চাহমানগণ তাঁর হাতে পরাজিত হন। তিনি চালুক্য সোমেশ্বর, চন্দেল্ল বিদ্যাধর ও কচ্ছপঘাত কীর্তিরাজের নিকট পরাস্ত হন। বস্তুত একমাত্র কোঙ্কন ভিন্ন তাঁর অধিকৃত সকল এলাকাই তাঁর হস্তচ্যুত হয়। তবে ১০০৮-এ তিনি গজনীর মাহমুদের বিরুদ্ধে শাহী-আনন্দপালকে সাহায্য করেন। ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচনপালকে আশ্রয় দেন। ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিজোট গঠন করেন এবং সাত মাস কাল লাহোরে দুর্গ অবরোধ করে রাখেন।

পরবর্তী পারমার নৃপতিগণ ছিলেন জয়সিংহ, উদয়াদিত্য, লক্ষ্মদেব (জগদ্দেব), নরবর্মা, যশোবর্মা, জয়বর্মা, বিন্ধ্যবর্মা ও সুভটবর্মা (মোট রাজ্যকাল ১০৫৫-১২১০ খ্রিঃ)। এই সকল রাজারা চালুক্য, চৌলুক্য, চন্দেল্ল, কলচুরি, চাহমান ও হোয়েসলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই শক্তি ক্ষয় করেন।

১ক.৭.৭ জেজাকভুক্তির চন্দেল্লগণ

জেজাকভুক্তির উত্তরসীমা ছিল আগ্রা থেকে শুরু করে যমুনা নদী বরাবর এলাহাবাদ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত, দক্ষিণ সীমা ছিল বর্তমান জব্বলপুর পর্যন্ত। পশ্চিমে খাজুরাহো ও পূর্বে কালিঞ্জর জেজাকভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

রাজা ধঙ্গের আমলে চন্দেল্লগণ প্রতিষ্ঠা পায়, যদিও চন্দেল্লকুলে কোন কীর্তিমান সম্রাটের উদ্ভব হয় নি। ধঙ্গের পৌত্র বিদ্যাধরের আমলে ১০১৯ ও ১০২২ খ্রিস্টাব্দে দু'বার গজনীর মাহমুদ কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। বিদ্যাধর পারমার ভোজ ও কলচুরি দ্বিতীয় কোক্কলের আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন দেবেন্দ্রবর্মা (১০৫০ খ্রিঃ) এবং তাঁর ভাই কীর্তিবর্মা (১০৭৩-১০৯০ খ্রিঃ) যিনি পাঞ্জাবের ইয়ামিনি শাসনকর্তা মাহমুদকে পরাজিত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন মল্লক্ষণবর্মা, পৃথিবীবর্মা ও মদনবর্মা যাঁরা পারমার, কলচুরি, চৌলক্য ও চাহমানদের সঙ্গে নিষ্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যান।

১১৮২ খ্রিঃ থেকে ১২০২ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন মদনবর্মার পৌত্র পরমর্দী। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে কুতবুদ্দিন কালিঞ্জর আক্রমণ করলে পরমর্দী অপমানজনক শর্তে সন্ধি করেন, যাতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মন্ত্রী অজয়দেব তাঁকে হত্যা করেন ও যুদ্ধ চালিয়ে যান। এরপরেও চন্দেল্লরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন।

১ক.৭.৮ ত্রিপুরীর কলচুরিগণ

ডাহল বা জব্বলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহে দ্বিতীয় কোক্কল ও তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের আমলে একাদশ শতকে কালচুরিদের বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। গাঙ্গেয়দেব তুর্কী অধিকৃত কাংরা উপত্যকায় আক্রমণ চালিয়ে পাঞ্জাবের শাসক আহমদ নিয়ালতিগিনের কাশী লুণ্ঠনের (১০৩৪ খ্রিঃ) প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ, যিনি কর্ণ নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ, তুর্কীদের পরাজিত করেন। তিনি বঙ্গদেশেও অভিযান করেন কিন্তু তা সফল হয়নি। নিজ কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়ে তিনি পালদের সঙ্গে সন্ধি করেন। দক্ষিণ ভারতেও তিনি অনেকগুলি যুদ্ধে জয়ী হন। কর্ণ নিকটে ও দূরে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করলেও এলাহাবাদ অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই পাকাপাকিভাবে নিজ রাজ্যে যুক্ত করতে পারেন নি। ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লক্ষ্মীকর্ণের পুত্র যশঃকর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন যিনি বিহারের চম্পারণ্য ও চম্পারণ পরগনাটি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। পরবর্তী রাজারা ছিলেন পয়াকর্ণ, নরসিংহ ও জয়সিংহ। শেষোক্তজন (১১৫৯-৮০ খ্রিঃ) বালুক্য কুমারপাল ও কুন্তলের রাজা বিজ্জলকে পরাজিত করেন এবং মালিক খুসরোর নেতৃত্বাধীন একটি তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁর পুত্র বিজয়সিংহের লেখসমূহ থেকে জানা যায় যে তিনি ১২১১ খ্রিঃ পর্যন্ত বাঘেলখণ্ড ও ডাহলমণ্ডলের উপর নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন।

১ক.৭.৯ বঙ্গ-বিহারের পালবংশ

১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে মহীপালের মৃত্যুর পর বঙ্গ-বিহারের পাল রাজশক্তির পুনরায় অবক্ষয় ঘটতে শুরু করে। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপালের আমলে দিব্য নামক জনৈক কৈবর্ত নেতা বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন (১০৭৫ খ্রিঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদোক এবং তারপর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হন। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর *রামচরিত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ভীমও বিশেষ শক্তিমান ছিলেন।

কৈবর্ত অধিকারের ফলে বঙ্গাদেশ পালবংশীয় রাজাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। বিহারে দ্বিতীয় মহীপাল ও শূরপালের ভ্রাতা রামপাল ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে রাজত্ব করেন। তিনি চোদ্দোজন সামন্ত ও বন্ধুরাজার সহায়তায় একটি বাহিনী গঠন করেন। তাঁকে একাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেন তাঁর মাতুল, অঙ্গের শাসক মথনদেব। এই বাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে ভীমকে পরাস্ত করে, এবং বরেন্দ্রী আবার পালদের অধিকারে আসে। অতঃপর রামপাল পূর্ববঙ্গের যাদবরাজ হরিবর্মার আনুগত্য আদায় করেন। তাঁর সেনাপতি তিঙ্গ্যদেব কামরূপ দখল করেন। পরে অবশ্য তিনি পালদের অধীনতা অস্বীকার করেন।

১১২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও মাতুল মথনদেব মারা গেলে শোকগ্রস্থ রামপাল মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দেন। তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে পাল রাজত্ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। গয়ামণ্ডলের সামন্ত শাসক বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপাল, মগধের শাসক বর্ণমান ও তাঁর পুত্র রুদ্রমান, মিথিলার নান্যদেব প্রভৃতি সামন্ত শক্তিবর্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দিনাপুর পর্যন্ত বিহার দখল করেন। পাল শক্তির বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানেন কলিঙ্গাধিপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গা এবং সেনবংশীয় বিজয়সেন। ১১৬২ খ্রিঃ নাগাদ বঙ্গ-বিহারে পাল শাসন অবলুপ্ত হয়ে যায়।

১ক.৭.১০ বঙ্গদেশের সেনবংশ

সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত সামন্তসেন সম্ভবত পালরাজাদের সামন্ত ছিলেন এবং রাঢ় অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন বঙ্গ কলচুরি আক্রমণের সুযোগে রাঢ় অঞ্চলে নিজের শক্তি আরও বাড়ান। উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত অধিকারের পর শূরপাল ও রামপাল সম্ভবত তাঁর আশ্রয় নেন।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন রাজা হন। তিনি কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং গঙ্গার পশ্চিমতীরে হুগলী জেলা পর্যন্ত জয় করেন। তিনি পালরাজাদের সামন্ত বীর (কোটাটবীর বীরগুণ) ও বর্ধনকে (কৌশম্বীর দ্বোরপবর্ধন) পরাস্ত করেন, এবং গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানকালেই তিনি মিথিলার নান্যদেবকে পরাস্ত করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গালের যাদবরাজা ভোজবর্মা বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পরাস্ত করেন এবং মদনপালের হাত থেকে বরেন্দ্রী অধিকার করেন। তিনি কামরূপের রাজাকেও, সম্ভবত রায়ারিদেবকে, পরাজিত করেন এবং অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাঘবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁর দু'টি রাজধানী ছিল, একটি বিক্রমপুর, অপরটি বিজয়পুর (নদীয়া)।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন রাজা হন ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গয়া অঞ্চলের জনৈক গোড়রাজ গোবিন্দপালকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্ব ছিল মূলত বঙ্গ, রাঢ়া, বাগড়ি, বরেন্দ্রী ও মিথিলা নিয়ে। আশেপাশের এলাকাগুলিতেও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল।

১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁর সাতটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় যে পিতা ও পিতামহের অর্জিত রাজ্য তিনি বজায় রেখেছিলেন। ১১৮৩ খ্রিঃ থেকে ১১৯২ খ্রিঃ-এর মধ্যে কোন সময়ে গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্র পূর্বদিকে তাঁর রাজ্য বোধগয়া পর্যন্ত বিস্তার করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন তাঁকে পরাস্ত করেন। আসামেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের লেখসমূহে তাঁকে কাশী ও কলিঙ্গাবিজেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুর্কী আক্রমণ। এই আক্রমণ চালিয়েছিলেন মুহম্মদ-বখতিয়ার যিনি ১২০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নদীয়া ও উত্তরবঙ্গ জয় করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেন তারপরেও রাজত্ব করেন। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারী হন বিশ্বরূপ সেন।

১ক.৮ অনুশীলনী

১। হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে কনৌজের উত্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। ভারতে আরব আক্রমণের বর্ণনা দিন।

৩। আরব আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন

(ক) ধর্মপাল

(খ) কাশ্মীরের কার্কোটিক বংশ

(গ) গুর্জর-প্রতিহারগণ

(ঘ) উদভাণ্ডপুরের শাহীবংশ

(ঙ) বঙ্গাদেশের সেনবংশ

১ক.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। আর. সি. মজুমদার : *এজ অফ ইম্পিরিয়াল কনৌজ, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বম্বে (১৯৬১)। স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার : বম্বে, (১৯৬১)।*

২। এইচ. সি. রে : *ডাইনেস্টিক হিষ্ট্রি অফ নর্দান ইন্ডিয়া, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, লন্ডন, (রিপ্রিন্ট (১৯৭২) হিস্ট্রি অফ বেঙ্গাল,* প্রথম খণ্ড (১৯৪১)।

৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)।

৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* (১ম ও ২য় খণ্ড)।

একক ১খ ❐ আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলা (৬০০-১২০৫ খ্রিঃ)

গঠন

১খ.১ উদ্দেশ্য
১খ.২ প্রস্তাবনা
১খ.৩ শশাঙ্ক
১খ.৩.১ শশাঙ্কের রাজ্যসীমা
১খ.৩.২ শশাঙ্কের শাসনব্যবস্থা
১খ.৩.৩ শশাঙ্কের শাসনকালীন সময়ে সমাজব্যবস্থা
১খ.৩.৪ শশাঙ্ক-পরবর্তীকালে বাংলার অবস্থা
১খ.৪ পালবংশ
১খ.৪.১ ধর্মপাল
১খ.৪.২ দেবপাল
১খ.৪.৩ মহেন্দ্রপাল
১খ.৪.৪ শূরপাল
১খ.৪.৫ পরবর্তী পালরাজগণ
১খ.৫ পালবংশের সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য রাজবংশ
১খ.৫.১ দেববংশ
১খ.৫.২ চন্দ্রবংশ
১খ.৫.৩ বর্মনবংশ
১খ.৫.৪ অন্যান্য বংশ
১খ.৬ সেন বংশ
১খ.৬.১ বিজয় সেন
১খ.৬.২ বল্লাল সেন
১খ.৬.৩ লক্ষ্মণ সেন
১খ.৬.৪ বিশ্বরূপ সেন

১খ.৭ পালদের শাসনকাঠামো
১খ.৭.১ মন্ত্রী, সচিব এবং অমাত্য
১খ.৭.২ সৈন্যবাহিনী
১খ.৭.৩ পুলিশ বিভাগ
১খ.৭.৪ মহাফেজখানা
১খ.৭.৫ রাজস্ব বিভাগ
১খ.৭.৬ মুদ্রাব্যবস্থা
১খ.৮ সেনদের শাসন কাঠামো
১খ.৮.১ প্রশাসনিক বিভাগ
১খ.৮.২ রাজকর্মচারী
১খ.৮.৩ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা
১খ.৮.৪ উপসংহার
১খ৯ অনুশীলনী
১খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১খ.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- শশাঙ্কর শাসনকাল
- পাল রাজবংশ ও তাঁদের শাসনব্যবস্থা, এবং
- সেন রাজবংশ ও তাঁদের শাসনব্যবস্থা

১খ.২ প্রস্তাবনা

আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার উত্থানের ইতিহাস বুঝতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে অন্তত গুপ্তযুগ থেকে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির ভিত্তিতে মনে করা হয় যে তিনি বাংলার দু'জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এঁরা হলেন নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মন। নাগদত্ত ছিলেন পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গের রাজা। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়ায় পাওয়া প্রস্তরলিপির ভিত্তিতে চন্দ্রবর্মনকে বলা যায় 'পুষ্করণাধিপতি'। বাঁকুড়া ও সন্নিহিত অঞ্চল পুষ্করণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সমকালীন বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে আর কোন রাজা রাজত্ব করতেন কিনা তা জানা যায় না। কিন্তু উত্তর ভারতের পরাজিত বিশিষ্ট রাজাদের মধ্যে নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মনের উল্লেখ এ কথাই প্রমাণ করে যে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলা তখন মর্যাদালাভ করেছিল। নাগদত্ত ও চন্দ্রবর্মনের রাজ্যদু'টি সমুদ্রগুপ্ত তাঁর

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের পূর্ব-প্রান্তের প্রত্যন্ত দেশ ছিল সমতট, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং ভারতের ত্রিপুরা অঞ্চল। কুমিল্লার গুণাইঘরে পাওয়া বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন (৫০৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বভাগে সমতট অঞ্চলও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্তরাজাদের তখন পতনোন্মুখ অবস্থা। তাই ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্তদের অধিকারে থাকলেও আঞ্চলিক শক্তিগুলি এই সময় থেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়। এই পর্বের তিনজন রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেব। ধর্মাদিত্যের দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চল থেকে। তার একটিতে নব্য-অবকাশিকার 'উপরিক' নাগদেব এবং জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেনের নাম পাওয়া গেছে। গোপচন্দ্রের অষ্টাদশ রাজ্যবর্ষের ফরিদপুর তাম্রশাসনেও এই দু'জনের উল্লেখ আছে। কাজেই ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা না জানা গেলেও কালানুক্রমের দিক থেকে এঁদের কাছাকাছি আনা যেতে পারে। গোপচন্দ্রের প্রথম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে বর্তমান ওড়িশার বালেশ্বর অঞ্চল থেকে। অপর একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে বর্ধমান জেলা থেকে। ফলে, আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে গোপচন্দ্রের উত্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ না জানা গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তাঁর রাজত্বকালেই বাংলার বৃহত্তর অঞ্চল গুপ্তবংশীয় অধিকার থেকে বেরিয়ে আসে এবং আঞ্চলিক শক্তির ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাচারদেব সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর দু'টি তাম্রশাসনই ফরিদপুর অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে।

১খ.৩ শশাঙ্ক

শশাঙ্ক এঁদের উত্তরসূরি। কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাঁকে সমাচারদেবের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বলেছেন। আবার কেউ বা তাঁকে গুপ্তবংশীয় রাজাই বলতে চান, কারণ বাণভট্টের *হর্ষচরিত*-এর একটি পাণ্ডুলিপিতে তাঁকে নরেন্দ্রগুপ্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ সমস্তই অনুমান। শশাঙ্ক তাঁর তাম্রশাসনে নিজের বংশপরিচয় কিছুই দেন নি। বিহারের রোহ্‌তাসগড়ে পাওয়া সীলমোহরের ছাঁচ থেকে এইটুকুই শুধু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল 'মহাসামন্ত' হিসেবে। কিন্তু কোন্ সার্বভৌম রাজার তিনি 'মহাসামন্ত' ছিলেন তা সঠিকভাবে বলার মত কোন উপাদান ঐতিহাসিকদের হাতে নেই। ফলে, পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত নেই। কেউ বা বলেন বপ্প-ঘোষবাট তাম্রশাসনের জয়নাগ ছিলেন তাঁর অধিরাজ কারণ তিনিও ছিলেন কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে যুক্ত। এই কর্ণসুবর্ণ পরবর্তীকালে শশাঙ্কের রাজধানী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আবার অনেকে মনে করেন গৌড় তখন ছিল মৌখরি রাজা ঈশানবর্মনের গৌড় জয়ের উল্লেখ থাকলেও অনেকে বলেন যে এই সময় মালবের উত্তরকালীন গুপ্তরাজারা বাংলা-বিহার অঞ্চল মৌখরিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সেইজন্যই এই বংশের মহাসেনগুপ্তর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী কামরূপ জয় করা। শশাঙ্ক এই মহাসেনগুপ্তরই মহাসামন্ত ছিলেন বলে এইসব ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

'মহাসামন্ত' থেকে সার্বভৌম রাজা হিসেবে শশাঙ্কের উত্তরণ ইতিহাসও আমাদের অজানা। এ প্রসঙ্গে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের দু'টি তাম্রশাসনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তাম্রশাসন থেকে তাঁর পিতা সুস্থিতবর্মার মৃত্যুর ঠিক পরই গৌড়ীয় সেনাদের কামরূপ আক্রমণের খবর পাওয়া যায়। দুই রাজপুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মন ও

ভাস্করবর্মন, বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালালেও অবশেষে বন্দী হন। শত্রুরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের স্বরাজ্যে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই গৌড়ীয় সেনারা কোন্ রাজার হয়ে কামরূপ আক্রমণ করেছিল এবং কেনই বা তারা দুই বন্দী রাজকুমারকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল তা জানা নেই। তবে, অনুমান করা হয় যে মহাসেনগুপ্তই গৌড় সেনাদের নিয়ে কামরূপ আক্রমণ করেন। তিনি যখন দূরদেশে বিজয়াভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর মালব রাজ্য অধিকার করে নেন দেবগুপ্ত। পরবর্তীকালে দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক জোটবদ্ধ হবার ঘটনা থেকে মনে হয় এঁরা দুজনে মিলে একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহাসেনগুপ্তকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। ফলে, দেবগুপ্ত হলেন মালবরাজ আর শশাঙ্ক হলেন গৌড়ের রাজা। এই সমস্ত রাজনৈতিক পালাবদলের গোলযোগের সুযোগেই কামরূপের দুই রাজপুত্র কিছুটা দৈবানুগ্রহে এবং কিছুটা তাঁদের নিজেদের গুণবত্তায় মুক্তি পেয়ে যান। আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শশাঙ্কের রাজত্বের শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়।

শশাঙ্কের রাজত্বের শুরুতেই তাঁকে উত্তর ভারতের রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়তে হয় এবং একটি বিতর্কিত ঘটনার নায়ক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় রাজাদের সঙ্গে মৌখরিদের ছিল বহুদিনের বিরোধ। দেবগুপ্ত মালবের সিংহাসন অধিকার করে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মাকে আক্রমণ করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের স্ত্রী রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বরের (বর্তমান হরিয়ানা) পুষ্যভূতিবংশীয় প্রভাকরবর্ধনের কন্যা। ঠিক যে সময়ে দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করেন তখন প্রভাকরবর্ধন মারা গেছেন ও রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেছেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যু ও রাজ্যশ্রীর বন্দী হবার খবর পেয়েই রাজ্যবর্ধন কনৌজের দিকে যাত্রা করেন। তিনি দেবগুপ্তদের পরাজিত করলেও কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের পর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন রাজা হন। হর্ষবর্ধনের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত লেখক বাণভট্ট এবং হর্ষবর্ধনের পরিসেবাধন্য চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এই মৃত্যুর জন্য শশাঙ্ককে দায়ী করেছেন। বাণভট্ট লিখেছেন, হর্ষবর্ধন গৌড়রাজকে নিহত করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেন। এইভাবে বাংলার ইতিহাস উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল। বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে শশাঙ্কর উত্থানকে দেখা আর সম্ভব নয়।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর ঘটনা যেহেতু বাংলার ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাই এটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দাবি করে। হর্ষবর্ধন তাঁর দু'টি তাম্রশাসনেই বলেছেন যে সত্যানুরোধ রাখবার জন্য শত্রুভবনে রাজ্যবর্ধনকে প্রাণ দিতে হয়। শত্রুর নাম কিন্তু কোন লেখতেই নেই। বাণভট্ট তাঁর *হর্ষচরিত*-এ লিখেছেন, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাজ্যবর্ধনের বিশ্বাস অর্জন করেন। তারপর তিনি যখন স্বভবনে একাকী, মুক্ত-শস্ত্র ও বিশ্রব্ধ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করা হয়। হর্ষবর্ধনের টীকাকার শঙ্কর বহু দিন পরে এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শশাঙ্ক নাকি তাঁর মেয়ের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের বিয়ের মিথ্যা প্রস্তাব দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিলেন। আর, হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, শশাঙ্ক প্রায়শই বলতেন যে প্রতিবেশী সঙ রাজার রাজত্ব তাঁর নিজের রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই মন্ত্রীরা রাজ্যবর্ধনকে একটি আলোচনায় ডাকেন এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

এই সমস্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে শশাঙ্ক অন্যায়ভাবেই রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু রমাপ্রসাদ চন্দ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অনেকেই মনে করেন যে এক তরফের বিবরণ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না, বিশেষত সূত্রগুলি যখন নিজেরাই পরস্পর বিরোধী ও অ-সম্ভাব্য

সংবাদ পরিবেশন করে। শশাঙ্ক এই মৃত্যুর সঙ্গে কোনরকমভাবে জড়িত হয়ে থাকলেও তা তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধির ও রাজ্যবর্ধনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবের প্রকাশ হিসাবেই দেখা উচিত। রাজ্যবর্ধনের উপদেষ্টারা তাঁকে সঠিক পথে চালিত করতে পারেননি—এটাই আসল সত্য।

শশাঙ্কের উল্লেখ আছে এমন চারটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দু'টি পাওয়া গেছে মেদিনীপুর থেকে, একটি পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলারই এগরা থেকে এবং চতুর্থ লেখটি পাওয়া গেছে ওড়িশার গঞ্জাম থেকে। ওড়িশার বালেশ্বর অঞ্চলের কয়েকটি লেখও শশাঙ্কর রাজত্বের উপর আলোকপাত করে, যদিও এই লেখগুলিতে শশাঙ্কের নাম পাওয়া যায় না। এই তাম্রশাসনগুলির সাহায্যে শশাঙ্কর রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশাসন পদ্ধতি ও সমকালীন আর্থ-সামাজিক সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

১খ.৩.১ শশাঙ্কর রাজ্যসীমা

গঞ্জাম তাম্রশাসন থেকে বোঝা যায় যে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই শশাঙ্কর রাজ্যসীমা উত্তরবঙ্গের গৌড় থেকে দক্ষিণে ওড়িশার কোঙ্গাদ অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ওড়িশার দু'টি রাজবংশের রাজাদের পরাজিত করে তাঁর পক্ষে এই রাজ্যবিস্তার করা সম্ভব হয়েছিল। উত্তর ওড়িশায় তিনি মানবংশীয় কোনও রাজাকে পরাজিত করে তোসলী অঞ্চল জয় করেন। কোঙ্গাদ অঞ্চলে তিনি শৈলোদ্ভববংশীয় দ্বিতীয় মাধববর্মাকে পরাজিত করেন। শৈলোদ্ভব রাজা শশাঙ্কর সামন্ত হিসাবে কোঙ্গাদ শাসন করতে থাকেন। কিন্তু উত্তর ওড়িশা তিনি তাঁর নিজের শাসনাধীনে আনেন। শশাঙ্ক মেদিনীপুর তাম্রশাসনে মহাপ্রতিহার শুভকীর্তিকে দণ্ডভুক্তির শাসনকর্তা হিসাবে দেখা যায়। সোরো তাম্রশাসনে মহাপ্রতিহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, অন্তরঙ্গ সোমদত্ত বলে একজনের নাম পাওয়া গিয়েছিল। যদিও তিনি কোন্ রাজার অধীনে ছিলেন তা জানা ছিল না। মেদিনীপুরের দ্বিতীয় তাম্রশাসনটিতেও সোমদত্তের নাম থাকায় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই দুই সোমদত্ত একই ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে বলা যায় যে সোমদত্ত প্রথমে শশাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তী কোন সময়ে তিনি সামন্ত পদে উন্নীত হন এবং শশাঙ্কের উনিশ রাজ্যবর্ষে সোমদত্ত উৎকল দেশের সঙ্গে দণ্ডভুক্তিও শাসন করতে থাকেন। এইভাবে সাম্রাজ্যের কিছু অংশ স্বশাসনাধীনে রেখে এবং বাকী অংশ সামন্তদের সাহায্যে তিনি শাসন করতে থাকেন। শশাঙ্কর রাজত্বের বিস্তার সম্পর্কে আমাদের সঠিক তথ্য নেই। তাঁর নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা গৌড় বঙ্গ সমতট অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এছাড়া উৎকল-কঙ্গোদ ও মগদ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল, ফলে এ অনুমান হয়তো মিথ্যা নয় যে শশাঙ্কর সময়ে সমগ্র বাংলা একই রাজচ্ছত্রের অধীনে আনা সম্ভভব হয়েছিল।

শশাঙ্ককে নিহত করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সংকল্প হর্ষবর্ধনের থাকলেও সে ইচ্ছা ফলপ্রসূ হয়েছিল বলে মনে হয় না। বহু পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ গ্রন্থ *আর্য-মঞ্জু-মূলকল্প* পুণ্ড্রবর্ধনের যুদ্ধে হর্ষবর্ধনের হাতে শশাঙ্কর পরাজয়ের কথা বললেও তা অসমর্থিত। হর্ষবর্ধন তাঁর কোন লেখাতেই এই বিজয়ের কথা লেখেননি। বরং হিউয়েন সাঙ-এর লেখা থেকে মনে হয় যে শশাঙ্কর মৃত্যুর পরই হর্ষবর্ধন পূর্বদিকে ওড়িশা পর্যন্ত বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এই অভিযানে হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনও তাঁর সহযোগী ছিলেন। ভাস্করবর্মনের নিধনপুর তাম্রশাসনটি সম্ভবত এই সময়েই কর্ণসুবর্নের জয়স্কন্ধাবার থেকে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পর লুপ্ত হয়ে যায়।

১খ.৩.২ শশাঙ্কর শাসনব্যবস্থা

এই যুগে ভুক্তি-বিষয়-বীথী-গ্রাম এইভাবে প্রাদেশিক ভাগগুলি বিন্যস্ত। শশাঙ্কর আমলের শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটি ছিল গুপ্তযুগের মতোই। রাজ্য কয়েকটি বড় বিভাগে বা ভুক্তিতে সম্ভবত বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি বিভাগ একাধিক বিষয়ে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিছু গ্রাম। কিছু অঞ্চলে বিষয় ও গ্রামের মধ্যে আরেকটি রাজ্যশাসন একক-বীথীও প্রত্যক্ষ হয়। শাসনকার্যের অনেকটাই, যেমন জমি কেনাবেচা ও তার দলিল তৈরি ইত্যাদি বিষয় অধিকরণ থেকেই পরিচালিত হত। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তত দু'টি বিষয়ের কথা শশাঙ্কর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়—একটি তাবীর বিষয়, অন্যটি একতাক্ষ বিষয়। তাবীদের বিষয় অধিকরণটি ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান। এই খবরটুকু ছাড়া সেখানকার কার্যাবলী সম্পর্কে আর প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু একতাক্ষ বিষয় সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। একতাক্ষ বিষয়ে এখনকার পঞ্চায়েত বোর্ডের মতো কোন সংস্থা ছিল। এই সংস্থায় পঁয়ত্রিশ অথবা আরও বেশি সদস্য ছিলেন। যে জমির দান উপলক্ষ্যে এগরা তাম্রশাসনটি লেখা হয়েছিল তাতে পঁয়ত্রিশ জন সদস্যের অনুমোদনের উল্লেখ আছে। এই সদস্যদের পরিচিত থেকে বোঝা যায় যে একাধিক গ্রামের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই সংস্থা পরিচালিত হত। সদস্যদের তালিকাটি দীর্ঘ হলেও সংস্থার গঠনপ্রণালী বোঝার জন্য সদস্য পরিচিতি জানা দরকার। একতাক্ষ বিষয়ের শাসনকার্যালয়ে অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন মহামহত্তর স্কন্দসেন ও নাগসেন। ঐ অঞ্চলের অগ্রহার বা নিষ্কর জমি ভোগকারী অনেকেই ছিলেন এই সংস্থার সদস্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন একতাক্ষর পট, ত্রাণেক অগ্রহারের নাগদেব ও অনন্তদেব, তরোক্তদর্ভ অগ্রহারের মহামহত্তর ধর্মগুপ্ত ও যজ্ঞবসু, লোড্ডাবা অগ্রহারের মহামহত্তর সোমদেব ও গুহদেব, আখবটয়িক অগ্রহারের গোধ্যক্ষিঘোষ ও মোক্ষদেব। অগ্রহার সাধারণত ব্রাহ্মণদের দেওয়া হলেও এঁরা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে, তাঁরা ঐসব অগ্রহারের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই ছিলেন মহামহত্তর পদাধিকারী। এইসব নিষ্কর জমিস্বত্বভোগকারীরা ছাড়াও সভার সদস্য হিসেবে ছিলেন বিংশতি খড্ডানের মহামহত্তর মহীভদ্র, রাত এবং তাঁর একটি ছাত্র, মৃগাটার মহত্তর গোমিদত্ত, গুর্জারপদ্রকের ভট্ট ধনপাল, কাপলাশকের ভট্ট গোপালদেব, সর্ষপবাসিনীর মহাদেব ও ব্রাহ্মণ পদ্রকের রৈথিস্বামী। নিষ্কর জমি ভোগ না করলেও এঁরা অনেকেই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা এঁদের ভট্ট, স্বামী ইত্যাদি নামাংশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সামাজিক স্তরে এঁরা যে সবাই সমগোত্রিয় ছিলেন না তাও বোঝা যাচ্ছে মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ও অ-ব্যবহার থেকে। অপর কয়েকজন সদস্যকে বিশেষ কোন স্থানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় নি। যেমন, মহামহত্তর বৎসশর্মা, মহাপ্রধান উদয়চন্দ্র, প্রধান জয়দেব, প্রধান ধ্রুবদ, প্রধান যশোনাগ, প্রধান বান্ধবনাগ। রাজকীয় কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন বৈষয়িক অনাম, কারণিক প্রবুদ্ধদত্ত, সমুদ্রদত্ত, উদ্যোতসিংহ, পুস্তপাল জিনসেন, আদামর, অচোন এবং স্থায়িপাল শ্রীধর্ম ও স্বস্তি।

একতাক্ষ বিষয়ের কেউ যদি জমি বেচা-কেনা বা দান করতে চাইতেন তবে তাকে এই সমিতির কাছে আবেদন করতে হত। অনুমোদিত হলে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মচারীদের উদ্দেশে বিজ্ঞাপিত করা হত। গুপ্তযুগে এ ধরনের সমিতির গ্রামস্তর থেকে শুরু করে বিষয়স্তর পর্যন্ত ছিল। গ্রামের জমি সংক্রান্ত আলোচনায় গ্রামের প্রতিনিধিরাই অংশ নিতে। কোটিবর্ষ বিষয়ের মতো উন্নত শহরাঞ্চলে এ ধরনের বিষয়

সমিতির সদস্য হতেন শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিকদের মতো ব্যবসায়িক ও কারিগরী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। কুমারমাত্য, কায়স্থ প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের সহায়তায় এঁরা বিষয় সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। শশাঙ্কর তাম্রশাসনে বিষয়-শাসনাধিকরণে এঁদের অনুপস্থিতি উল্লেখ সময়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ও গঠন প্রণালী জানার মতো কোন উপাদান নেই। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে শশাঙ্কের আমলেও গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো ছিল না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমতের ভিত্তিতে গ্রামীণ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিষয় অধিকরণের অনেক কাজ নির্বাহ হত।

শশাঙ্কর তাম্রশাসনগুলি থেকে যে সমস্ত রাজকর্মচারী পদের কথা জানা যায় সেগুলি হত অমাত্য, মহাপ্রতিহার, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, অন্তরঙ্গা ইত্যাদি। নীহাররঞ্জন রায়-এর মতে "বাংলাদেশে এই আমলেই পুরোপুরি সামন্ততন্ত্র রচনারও সূত্রপাত দেখা যায়।"

১খ.৩.৩ শশাঙ্কর শাসনকালীন সময়ে সমাজব্যবস্থা

শশাঙ্কর শাসনকালীন সময়ের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে জনজীবন তখনও ছিল স্তর বিন্যস্ত। সামাজিকভাবে ব্রাহ্মণরা ছিলেন সম্মানিত এবং শাসনকাজের সঙ্গে তাঁরা অনেকেই যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণরাও সবাই সমমর্যাদা সম্পন্ন বা সমক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই। রাজকর্মচারীরা অনেকেই ছিলেন ধনাঢ্য। শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের সব ক'টি তাম্রশাসনই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সামন্তদের ভূমিদানের স্বীকৃতি আছে। এগরা তাম্রশাসনে চণ্ডাল পুষ্করিণীর উল্লেখ থাকায় দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে জমিতে স্থায়ী প্রজাস্বত্ব না থাকলে পুকুর খোঁড়া যায় না, কাজেই বোধহয় ঐ অঞ্চলে চণ্ডালদের কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু চণ্ডালদের পৃথক পুষ্করিণী থাকার অর্থ সমাজের নিম্নস্তরে তাদের অবস্থিতি। তাদের ছোঁয়ায় অন্য পুকুরের জল দূষিত হবে বলে মনে করা হত।

সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও কিছু বলা মুশকিল। এগরা তাম্রশাসনে 'পণ' নামের মুদ্রার কথা থাকলেও তা কড়ির গণনার মানও হতে পারে। গুপ্তযুগেই সাধারণ বেচা-কেনার মাধ্যম ছিল কড়ি। শশাঙ্কর আমলেও সেই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা সম্ভব। শশাঙ্কর নামাঙ্কিত কিছু স্বমুর্ণদ্রাও পাওয়া গেছে। এগুলি গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত প্রচলিত সুবর্ণ ও অর্ধ-সুবর্ণ মানের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোনার সঙ্গে অন্য ধাতু প্রচুর পরিমাণে মেশানো হয়েছে। এ ধরনের মুদ্রা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অবক্ষয়েরই পরিচয় দেয়।

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। তাঁর মুদ্রাতেও তাই শিবের প্রতিকৃতি। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী। তিনি নাকি গয়ার বোধিবৃক্ষটি কেটে ফেলেছিলেন এবং ফলে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। কিন্তু এসব কথা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ শশাঙ্কর রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কাছেই ছিল বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার যেখানে হিউয়েন সাঙও এসেছিলেন। সুধীররঞ্জন দাসের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উৎখননের ফলে এই মহাবিহারটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এটি মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চলে অবস্থিত।

১খ.৩.৪ শশাঙ্ক-পরবর্তীকালে বাংলার অবস্থা

শশাঙ্কর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্যজয় করলেও সে অধিকার সুদৃঢ় হয় নি। ৬৪৬ বা ৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন তাঁর মন্ত্রী। কিন্তু তিনিও চৈনিক ও তিব্বতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হন। হর্ষবর্ধনের সহযোগী ভাস্করবর্মনও ঐ বংশের শেষ রাজা। মগধের উত্তরকালীন গুপ্তবংশের রাজারা অষ্টম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত রাজত্ব করলেও তাঁরাও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় তখন কোনই ক্ষমতাবান রাজশক্তি ছিল না। ছোট ছোট স্থানীয় শক্তি আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কোন রাজা বা রাজবংশই প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে সমগ্র বাংলায় অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। এই পর্বের ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জয়নাগ, লোকনাথ শ্রীধারণারত ও দেবখড়্গ। জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধরার থেকে ভূমিদানের আদেশ দেন, তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা বীরভূম-মুর্শিদাবাদ থেকে পাওয়া যায় ও *আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পেও* এর উল্লেখ আছে। লোকনাথ সমতটের সামন্ত রাজবংশের শিবনাথের উত্তরাধিকারী। শ্রীধারণরাতও সমতটের রাজবংশ জাত। দেবখড়্গ আস্রফপুরের লিপি ও ইৎ-সিউ-এর বিবরণীতে উল্লিখিত খড়্গ সামন্ত বংশজাত। এঁরাই পরে স্বাধীনভাবে বঙ্গসমতটের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন করেন। জয়নাগ ব্যতীত এঁরা সকলেই সমতট অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। খড়্গরা এ অঞ্চলে অষ্টম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত রাজত্ব করলেও বাংলাকে তাঁরা এক রাজশক্তির কর্তৃত্বাধীন করতে পারেন নি।

বাংলার দুর্বল রাজশক্তির পরিচয় পেয়ে এ অঞ্চলে বারবার আক্রমণ হতে থাকে। হিমালয়ের উপত্যকা অঞ্চলের শৈলবংশীয় রাজা, পৌণ্ড্রের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। কনৌজের যশোবর্মন গৌড়রাজকে বধ করেছিলেন বলে তাঁর সভাকবি বাক্‌পতিরাজ *গৌড়বহো* কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি থেকে মনে হয় মগধনাথ এবং গৌড়রাজ একই ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তাঁর নাম কোথাও লেখা হয়নি। যশোবর্মন বঙ্গের রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন। এরপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তানীড় কনৌজ জয় করে কলিঙ্গ পর্যন্ত অভযান চালান। গৌড়রাজ পরাজিত হন। তাঁকে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে বাংলা থেকে কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কল্‌হণ এঁদের সাহসিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কল্‌হণের *রাজতরঙ্গিণী* থেকে জানা যায় যে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ও পূর্বদিকে অভিযান চালনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে কাশ্মীরের সিংহাসন অন্যে অধিকার করে নিলে তিনি একা ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। সে সময়ে গৌড় ছিল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই রাজাদের একজনের কন্যাকে জয়াপীড় বিয়ে করেন এবং অন্য রাজাদের জয় করে তাঁর শ্বশুর জয়ন্তকে অধিরাজ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এসব কথা *রাজতরঙ্গিনীতে* বলা হলেও জয়ন্ত যে বাংলার রাজশক্তিকে শক্তিশালী করে তুলতে পেরেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

এইভাবে অন্তর্কলহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বাংলার জনজীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক পরবর্তী গৌড়ের অরাজক অবস্থার উল্লেখ *আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ পাওয়া যায়। আর লামা তারনাথ বলেছেন তখন প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, অভিজাত, ব্রাহ্মণ এবং বণিক স্বগৃহে রাজা হয়ে উঠেছিলেন, কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলে কিছুই ছিল না। পরবর্তীকালের খালিমপুর তাম্রশাসনে এই অরাজক অবস্থাকে বলা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়'। অর্থাৎ বড় মাছেরা

যেমন ছোট মাছেদের খেয়ে নেয় সেইরকম তখন সবলের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

১খ.৪ পালবংশ—গোপাল

এই 'মাৎস্যন্যায়' থেকে বাংলাকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। গোপালের পুত্র ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে মাৎস্যন্যায় থেকে দেশকে রক্ষার জন্য 'প্রকৃতি'রা গোপালের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দেয়। এই উপমার মাধ্যমে গোপালের রাজপদে অভিষিক্ত হবার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু 'প্রকৃতি' কারা? 'প্রকৃতি' শব্দটির সাধারণ অর্থ 'জনগণ' হিসাবে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে ধরে নিতে হয় যে গোপাল ছিলেন আপামর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। অথচ, বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের নির্বাচন অকল্পনীয়। তাই অনেকে মনে করেন, 'প্রকৃতি' শব্দটি এক্ষেত্রে কহ্লনের *রাজতরঙ্গিণীতে* উল্লিখিত 'রাজকর্মচারী' অর্থে ব্যবহৃত করা হয়েছে। কাশ্মীরের রাজা জলৌককে সাতজন 'প্রকৃতি' বা রাজকর্মচারী নির্বাচিত করেছিলেন। একইভাবে গোপালকেও হয়তো রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কিন্তু যেখানে শাসনব্যবস্থাই ভঙ্গুর সেখানে কর্মচারীদের দ্বারা গোপালের নির্বাচনের কল্পনাও সহজ নয়। এমন হতে পারে যে বিবদমান ছোট ছোট রাজারা একসময় অনুভব করেছিলেন সুদৃঢ় রাজশক্তির প্রয়োজন এবং তাঁরাই একত্র হয়ে গোপালকে নেতা হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। জনগণ এই নির্বাচনকে সমর্থন করে। দীনেশ চন্দ্র সরকার অবশ্য একে জনগণের দ্বারা রাজার নির্বাচনই বলতে চান। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্যে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ "....এ যুগেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ঠিক জনসাধারণের দ্বারা হয় না, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই মনোনীত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা হয়ে থাকে। আবার নির্বাচিত ব্যক্তি সাধারণত প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশের মনোনীত, তাঁদের সকলের নয়। তাই বর্তমান জগতের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে যদি জনসাধারণের নির্বাচন বলতে বাধা না থাকে তবে প্রাচীন ভারতের নরপতি নির্বাচনকে জনসাধারণের নির্বাচন বলে উল্লেখ করায় দোষ আছে বলে মনে হয় না।"

রমেশচন্দ্র মজুমদার গোপালকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য সমকালীন বাঙ্গালীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ঃ "The people who had suffered untold miseries for a long period, suddenly developed a political wisdom and a spirit of self-sacrifice to which there is no recorded parallel in the history of Bengal. They perceived that the establishment of a single strong central authority offered the only effective remedy against political disintegration within and invasion from abroad to which their unhappy land was so long a victim. They also realised that such a happy state of things could only be brought about by the voluntary surrender of authority to one person by the numerous petty chiefs who had been exercising independent political authority in different parts of the country. The ideal of subordinating individual interests to a national cause was not as common in India in the eighth century A.D. as it was in Europe a thousand years later. Our admiration is, therefore, all the greater,

that without any struggle the independent political chiefs recognised the suzerainty of a popular hero named Gopal. Thus took place a bloodless revolution which both in spirit and subsequent result reminds us of what happened in Japan about A.D. 1870. এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়-এর মতামত, "যাহা হউক, এই শুভ বুদ্ধির ফলে বাঙলাদেশ নৈরাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক শত্রুর কাছে বারবার অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল"।

লামা তারনাথ (সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় তিনি *ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস* লেখেন) গোপালের রাজা হবার একটি গল্প বলেছেন। গল্পটি যদিও সত্যি নয় তবু এই গল্পেও সমকালীন অরাজকতার ছবি ফুটে উঠেছে। ভঙ্গাল বা বঙ্গাল দেশে রাজপদ শূন্য থাকায় জননায়করা একজন রাজা নির্বাচন করেন। কিন্তু এক নাগিনী রাজমহিষীর রূপ ধারণ করে সেই রাজাকে হত্যা করে। প্রতিদিন এইভাবে একজন রাজা হতেন আর মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু শেষে এক যুবক চুন্দাদেবীর দেওয়া কাঠের গদার আঘাতে সেই নাগিনীকে হত্যা করেন এবং তাঁকেই গোপাল নাম দিয়ে স্থায়ী রাজা নির্বাচিত করা হয়।

খালিমপুর তাম্রশাসন থেকে গোপালের পিতা ও পিতামহ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা-ও সমকালীন অরাজক অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। এই উক্তির যথার্থতা স্পষ্ট নয়। গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু ছিলেন সর্ববিদ্যার-বিশারদ। কিন্তু তাঁর পুত্র বপ্যাট শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর বীরত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা বদান্যতার খ্যাতি।

পালরাজাদের বংশ-পরিচয় কিছু জানা যায় না। হরিভদ্রর *অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা*-এ পালদের 'রাজভটাদি বংশ পতিত' বলা হয়েছে। খড়্গবংশের একজন রাজার নাম রাজরাজভট, তাই অনেকে মনে করেন যে পালরা খড়্গবংশীয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। কিন্তু 'পতিত' শব্দটি গৌরবাত্মক নয়। সেইজন্যে কেউ বা এই অর্থ গ্রহণে অনাগ্রহী। পালরাজাদের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দীর মতে পালরাজারা সমুদ্রকুল থেকে উৎপন্ন এবং তাঁরা ক্ষত্রিয়। খালিমপুর লিপিতে ভদ্রাত্মজা বলে ধর্মপাল অভিহিত হয়েছেন। এটি কারও কারও মতে ধর্মপালের মাতা দেদ্দাদেবীর বিশ্লেষণ। সন্ধ্যাকরনন্দীও তারানাথের বর্ণনা অনুযায়ী পালদের গৌড়বঙ্গের সমুদ্রাশ্রেয়ী আদি নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলেছেন। *আর্য-মঞ্জুশ্রী মূলকল্প*-এ গোপালকে 'দাসজীবী' বলা হয়েছে। বহু পরবর্তীকালে আবুল ফজল পালদের 'কায়স্থ' বলে উল্লেখ করেছেন।

তারানাথের গল্পের গোপাল পুণ্ড্রবর্ধনের ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বঙ্গাল বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম রাজা হয়েছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশের উপরেই ক্রমে পালরাজাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। গোপাল আনুমানিক ৭৫০ থেকে ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি 'ভদ্র'বংশের দেদ্দাদেবীকে বিবাহ করেন।

১খ.৪.১ ধর্মপাল

গোপাল পালরাজ্যের ভিৎ সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁর পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭৫-৮১০ খ্রিঃ) উত্তরভারতের রাজনীতির মঞ্চে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পেয়েছিলেন এবং আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলার মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

এই সময় কনৌজ বা কান্যকুব্জের সিংহাসন নিয়ে আয়ুধবংশীয় দু'জন রাজার মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এঁরা হলেন ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ। ধর্মপালের প্রশস্তি প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে লেখা হয়েছে ঃ "সেই বলবান রাজা ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুবর্গকে জয় করিয়া, (মহোদয়শ্রী) কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন; এবং (পুরাণ-প্রসিদ্ধ) বলিরাজ যেমন (পুরাকালে) ইন্দ্রাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া, মহোদয়শ্রী লাভ করিয়াও, যাচকরূপী (চক্রায়ুধ) বামনাবতারকে তৎসমস্ত পুনরায় দান করিয়াছিলেন, এই বলবান রাজাও সেইরূপ প্রণতিপরায়ণ (বামনরূপে চরণাবত) চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালকে কান্যকুব্জের রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন"। সম্প্রতি প্রকাশিত পালবংশীয় মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও ইন্দ্ররাজের পরাজয় এবং চক্রায়ুধের সিংহাসন প্রাপ্তির কথা আছে।

এইসব বর্ণনা থেকে মনে হয় যে চক্রায়ুধ সিংহাসন পাবার জন্য ধর্মপালের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রায়ুধকে হারিয়ে চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজপদে অভিষিক্ত করান। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে এই অভিষেকের বিবরণ পাওয়া যায়। পাঞ্চাল দেশের বৃদ্ধরা যখন অভিষেকের স্বর্ণ-কলস উত্তোলন করেছিলেন তখন ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কীরদেশের প্রণতিপরায়ণ রাজারা 'সাধু, সাধু' বলে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে এই সমস্ত রাজাদেরও ধর্মপাল পরাজিত করেছিলেন। ভোজরা বর্তমান বেরার, মৎস্যরা আলোয়ার ভরুপুর ও জয়পুর, মদ্রগণ মধ্য পাঞ্জাব, কুরুরা দিল্লী-মীরাট, যদুরা গুজরাত, যবনেরা সিন্ধু, অবন্তিরা পশ্চিমমালব, গান্ধারেরা পেশোয়ার এবং কীররা কাঙ্ড়া অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধর্মপাল বিজয়াভিযান চালিয়েছিলেন ধরে নিতে হয়। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সরকারের গবেষণা থেকে জানতে পারা যায় যে ইন্দ্রায়ুধ যথেষ্ট শক্তিশালী রাজা ছিলেন। *হরিবংশ* গ্রন্থে বলা হয়েছে, গুজরাতের পূর্বদিকে ছিল অবন্তিদেশ এবং উত্তরদিকে ছিল ইন্দ্রায়ুধের রাজ্য। যেহেতু কনৌজ অবন্তির পূর্বোত্তরে, তাই দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেছেন যে "ইন্দ্রায়ুধের অধিকার রাজস্থান ও পাঞ্জাব অঞ্চলের কিয়দংশে প্রসারিত না হলে গুজরাতের উত্তরদিগ্‌বর্তী দেশে তাঁর শাসনের উল্লেখ কোনক্রমেই সম্ভব হত না।" তিনি বলেছেন যে উপরে উল্লিখিত রাজাদের অনেকেই হয়তো ইন্দ্রায়ুধের বশীভূত ছিলেন ; কিন্তু ধর্মপাল যখন কনৌজ অধিকার করেন তখন এই রাজারা ধর্মপালের অনুগৃহীত চক্রায়ুধকে তাঁদের সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। এইভাবে ধর্মপালও উত্তর ভারতের শক্তিমান রাজা হিসাবে স্বীকৃত হলেন।

ঘটনা পরম্পরায় ইন্দ্রায়ুধ চক্রায়ুধের কনৌজের সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া চতুঃশক্তির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল এবং এ লড়াই বহুদিন চলেছিল। গৌড়দেশের পালরা এবং কান্যকুব্জের আয়ুধরা ছাড়া প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজারাও এই লড়াই-এ জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই লড়াইয়ের কালানুক্রমিক বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন। ফলে অনেক সময় ঘটনাপরম্পরা নিয়ে তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা যায়।

সম্ভবত চক্রায়ুধ ধর্মপালের দ্বারস্থ হলে ইন্দ্রায়ুধ প্রতিহাররাজ বৎসরাজের (আনুমানিক ৭৭৫-৮০০ খ্রিঃ) সাহায্যপ্রার্থী হন। রাষ্ট্রকূটদের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বৎসরাজ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু বৎসরাজের প্রাধান্য স্থায়ী হয় নি। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের (আনুমানিক ৭৮১-৭৯৪ খ্রিঃ; রমেশচন্দ্র মজুমদার

ধ্রুবের সময়সীমা ৭৭৯-৭৯৩ খ্রিঃ ধরেছেন) হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। প্রতিহাররা যোধপুর অঞ্চল থেকে শাসন চালাতেন আর রাষ্ট্রকূটরা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অধিপতি। এই দুই বংশের রাজ্যসীমা এসে মিলেছিল মালব-গুজরত অঞ্চলে। ফলে, এদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। গৌড়রাজকে পরাজিত করে উত্তর ভারতে বৎসরাজের প্রাধান্য বিস্তার তাই ধ্রুব সহ্য করেন নি। নিজের শক্তির পরিচয় দেবার জন্য ধ্রুব উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গৌড়েশ্বরকেও পরাজিত করেন। কিন্তু যেহেতু ধ্রুব উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার করতে আগ্রহী ছিলেন না তাই তিনি এই বিজয় অভিযানের পর দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন। সেই সুযোগেই ধর্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে পেরেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। এই ঘটনা থেকে কান্যকুব্জ যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল সে কথা পরিষ্কার।

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট (আনুমানিক ৮০০-৮৩৩ খ্রিঃ) পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন এবং বঙ্গাপতি ধর্মপাল ও পরাশ্রিত চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। নাগভট্ট যে এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সামন্তদের লেখগুলি থেকে। যে সমস্ত সামন্ত তাঁকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও এই বিজয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন। প্রতিহার সামন্ত বাউক যোধপুর শিলালেখতে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পিতা কক্ক মুদ্গগিরি বা মুঙ্গোরে গৌড়দের সঙ্গো যুদ্ধে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। উপ তাম্রশাসনে অন্য এক সামন্ত দ্বিতীয় অবনীবর্মা জানাচ্ছেন যে তাঁর প্রপিতামহ বহুকধবল যুদ্ধে ধর্মকে পরাজিত করেছিলেন। এই ধর্ম অবশ্যই ধর্মপাল। এমনকী রাষ্ট্রকূট সামন্ত কর্কর বরোদা তাম্রশাসনে প্রতিহার রাজাকে 'গৌড়েন্দ্র-বঙ্গাপতি-নির্জর-দুর্বিদগ্ধ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু নাগভট্টের এই বিজয়ও বোধহয় স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে নাগভট্টের কাছে পরাজিত হয়ে ধর্মপাল ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের (আনুমানিক ৭৯৪-৮১৩ খ্রিঃ) সাহায্যপ্রার্থী হন। অথবা এমনও হতে পারে যে নাগভট্টের বিজয়ে শঙ্কিত হয়েই তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন এবং নাগভট্টকে পরাজিত করেন। সঞ্জান তাম্রশাসন অনুসারে তিনি উত্তরপ্রদেশে পৌঁছলে ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ধ্রুবর মতো তৃতীয় গোবিন্দও বিজয়াভিযান শেষ করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান, ধর্মপালও আবার উত্তর ভারতে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। দীনেশ চন্দ্র সরকার অবশ্য মনে করেন যে দ্বিতীয় নাগভট্ট তৃতীয় গোবিন্দের প্রত্যাবর্তনের পর শক্তি সঞ্চয় করে কান্যকুব্জ জয় করেন এবং মুঙ্গোর পর্যন্ত এগিয়ে এসে ধর্মপালকে পরাজিত করেন। তিনিই প্রতিহার রাজধানী কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু নাগভট্টের রাজত্বকালীন কোন লেখতে এই ঘটনার উল্লেখ না থাকায় রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে নাগভট্টের বিজয় তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে স্থায়িত্ব পায়নি।

ধর্মপালের সময় বাংলায় তিব্বতীয় অভিযান হয়ে থাকতে পারে। তিব্বতীয় বংশাবলী অনুযায়ী Khri-srong-lae-btsan (৭৫৫-৯৭ খ্রিঃ) ভারতবর্ষ জয় করেছিলেন। নবম শতাব্দীর একটি তিব্বতীয় গ্রন্থে আছে যে তাঁর পুত্র Mu-tig Btsan-po ভারতীয় রাজা Dharma-dpal-কে বশ্যতাস্বীকারে ও নিয়মিত ধনরত্ন দিতে বাধ্য করেছিলেন। এই বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করার অন্য কোন উপাদান নেই। সমসাময়িক কালে রাজারা বিস্তীর্ণ রাজ্যজয়ের নানাবিধ দাবী করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব দাবী ছিল শুধুই বাচনিক।

ধর্মপালের ক্ষেত্রেও এ ধরনের দাবী করা হয়েছে। দেবপালের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে

বেরিয়ে কেদার তীর্থে, গঙ্গাসাগরে, গোকর্ণ ও অন্যান্য তীর্থে ধর্মকার্য করেছিলেন। এ ধরনের বর্ণনা থেকে ধর্মপালের রাজ্যসীমা নির্ণয় করতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু ধর্মপাল যে সমকালীন রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তার অন্য প্রমাণও আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত গুজরাতী কবি সোড্‌ঢলের *উদয়সুন্দরীকথায়* তাঁকে বলা হয়েছে 'উত্তরাপথস্বামিন্'। কাজেই এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে তাঁর উত্থান হলেও এবং কেবলমাত্র বাংলা ও বিহারে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন সীমাবদ্ধ থাকলেও, তিনি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিতে গৌড় দেশটিকে সর্বভারতীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

১খ.৪.২ দেবপাল

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটবংশের পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র দেবপাল পরবর্তী রাজা (আনুমানিক ৮১০-৪৭ খ্রিঃ)। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর পরিবর্তে দেবপাল কেন রাজা হলেন তা জানা নেই। আবার সোড্‌ঢলের *উদয়সুন্দরীকথা* এবং অভিনন্দন *রামচরিতকাব্য* থেকে 'যুবরাজ' বা 'যুবরাজ হারবর্ষ' বলে একজনের কথা জানা যায়। তাঁকে ধর্মপালের কুলের গৌরব ও বিক্রমশীলের পুত্র বলা হয়েছে। বিক্রমশীল ধর্মপালেরই উপাধি। ফলে ত্রিভুবনপালের মতো হারবর্ষও ধর্মপালের পুত্র। কী পরিস্থিতিতে এঁদের পরিবর্তে দেবপাল রাজা হলেন, তা বলার মতো কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনেকে বলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ও যুবরাজ হারবর্ষ একই ব্যক্তি।

দেবপালের রাজত্বের কালানুক্রমিক বিবরণ না পাওয়া যাওয়ায় তাঁর রাজ্যসীমা ও যুদ্ধবিজয়ের বর্ণনা কতটা সত্যভিত্তিক তা বলা মুশকিল। তাম্রশাসন ও শিলালেখাদির ভিত্তিতে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বাংলা-বিহারে তাঁর শাসন সুদৃঢ় ছিল। পরবর্তীকালের বাদাল প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে দেবপাল উৎকল জয় করেছিলেন, হূণদের পরাজিত করেছিলেন এবং দ্রাবিড় ও গুর্জরদের দর্প চূর্ণ করেছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনেও দেবপালের রাজত্বকালে উৎকল ও কামরূপ জয়ের উল্লেখ আছে। এসব দাবী কতটা সত্য তা বলা শক্ত। উৎকল জয়ের দাবী সত্য হওয়া সম্ভব। ভৌমকরবংশের কোন রাজাকে বোধহয় তিনি হারিয়েছিলেন। কামরূপ জয়ের দাবীও সত্য হতে পারে। গুর্জর-প্রতিহারদের সঙ্গে যুদ্ধ তো হয়েইছিল। পাঞ্জাব অঞ্চলের হূণরা প্রতিহারদের সামন্ত হিসাবে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু দ্রাবিড় জয়ের দাবী অনেকে অস্বীকার করেন। দ্রাবিড় বলতে অনেকে রাষ্ট্রকূটদের প্রতি ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তারা ছিল কর্ণাটকবাসী। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন পরাজিত দ্রাবিড় রাজা পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার বল্লভ। তাঁর শিন্নামামূর তাম্রশাসনে পল্লব, ঢোল, কলিঙ্গ ও মগধের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের কথা আছে। কিন্তু এই মগধ তামিলনাড়ুর মগদৈ নাড়ু বলে অনেকে মনে করেন।

পাল-প্রতিহার সংঘর্ষের কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেলেও তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ সহজ নয়। প্রতিহাররাজ ভোজের গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে দাবী করা হয়েছে যে, তিনি ধর্মপালের পুত্রের রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর সামন্ত গোরখপুরের কলচুরিবংশীয় গুণোম্ভধিও গৌড়রাজ্য জয়ের কথা বলেছেন। প্রতিহারদের সামন্ত গুহিলরাও ভোজের পক্ষ অবলম্বন করে গৌড়জয়ের কাহিনী বলেছেন। ভোজের বরাহ তাম্রশাসন কান্যকুব্জ থেকে দেওয়া হয়েছিল। তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কনৌজ প্রতিহারদের হস্তগত হয়েছিল।

কিন্তু ভোজ রাজাও রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। দেবপালও বিহার থেকে প্রতিহারদের বিতাড়িত করে বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করেছিলেন বলে মনে হয়। তাই বারাণসীতে পাল মহিষী ও সামন্তদের মন্দির প্রভৃতি তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। লিপিমালা অনুযায়ী দেবপাল বিন্ধ্য থেকে হিমালয় ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভারতের সমুদ্রতট পর্যন্ত সমস্ত উত্তরভারত থেকে কর ও বশ্যতা আদায় করেছিলেন। এমনকী মুঙ্গের লিপিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত এক সমরাভিযানের কথা বলা হয়েছে। এই দাবীগুলি অনেকাংশে অত্যুক্তি।

তিব্বতীয় দাবী অনুসারে দেবপালের সমসাময়িক Ral-pa-chan গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ভারত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। অন্যদিকে পাল তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে দেবপাল নেপাল জয় করেছিলেন। নেপাল ছিল তিব্বতের অধীনে। তাই এক্ষেত্রেও উভয়পক্ষের দাবীর সমর্থনে অন্য কোন উপাদান না থাকায় প্রকৃত সত্য জানা সম্ভব নয়।

মনে হয় নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেবপালের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। নালন্দা তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তাঁর রাজ্যসীমা কম্বোজ থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ বা রামেশ্বর, পূর্বে পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। এ ধরনের বর্ণনা আসলে চক্রবর্তী ক্ষেত্র' সূচক, প্রকৃত রাজ্যসীমা নয়। তাই দেবপালের সঠিক রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

দেবপালের রাজত্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুবর্ণদ্বীপাধিপতি বালপুত্রদেবের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই রাজা ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশোদ্ভূত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করেন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেন। নালন্দা তাম্রশাসন থেকে মনে হয় যেন বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল গ্রামগুলি দান করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বালপুত্রদেবই পাল রাজকোষে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে গ্রামগুলি কিনে নালন্দার বিহারকে দান করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে এই সম্পর্ক কেবলমাত্র ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ ছিল এ কথা মনে হয় না। আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পালদের গৌরবময় উত্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও প্রভাব ফেলেছিল, তাই বালপুত্রদেব এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে চেয়েছিলেন। ঐতিহ্যপূর্ণ নালন্দা মহাবিহারে একটি বিহার স্থাপন করে বালপুত্রদেব দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ সুগম করেছিলেন। দেবপাল ও গ্রামদানের অনুমতি দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে সাহায্য করেছিলেন। দেবপালের ৩৫ বা ৩৭ রাজ্যবর্ষের এই নালন্দা তাম্রশাসন তাঁর আমলের শেষ লেখ। তাই আনুমানিক পঁয়ত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর তাঁর রাজত্বকাল ধরা হয়। আরব পর্যটক সুলেমান নবম-শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী পালরাজ গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যদলে ৫০,০০০ হাতি ও প্রায় ১৫ হাজার সেবক নিযুক্ত ছিল সৈন্যদের পরিচর্যার জন্য।

১খ.৪.৩ মহেন্দ্রপাল

দেবপালের পর তাঁর পুত্র শূরপাল সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে এতদিন মনে করা হত। কিন্তু সম্প্রতি মালদা জেলার জগজ্জীবনপুর থেকে পাওয়া তাম্রশাসন এ ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করেছে। প্রকৃতপক্ষে,

দেবপালের পর রাজা হয়েছিলেন তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপাল। মহেন্দ্রপাল নামের রাজার শিলালেখ বাংলা, বিহার থেকে পাওয়া গেলেও এতদিন তাঁকে প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল হিসাবে সনাক্ত করা হত। জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন নতুনভাবে পাল রাজত্বের পর্যালোচনা দাবী করছে। এই মহেন্দ্রপালও শূরপালের মতো মাহটাদেবীর গর্ভজাত। এই তাম্রশাসনেই প্রথম মাহটাদেবীর পিতা দুর্লভরাজকে চাহমানবংশীয় রাজা হিসাবে চেনা গেল। এই চাহমান রাজা প্রথমে বৎসরাজের সামন্ত হিসাবে ধর্মপালের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও পরবর্তী সময়ে দেবপালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে পালদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র গূবক অবশ্য প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নগভট্টের পক্ষেই অবলম্বন করেছিলেন।

জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন থেকে মহেন্দ্রপালের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি অন্ততঃ পনেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৮৪৮-৮৬৩ খ্রিঃ) এবং বাংলা-বিহারে পালশাসন তখন অক্ষুণ্ণ ছিল।

১খ.৪.৪ শূরপাল

এর পর মহেন্দ্রপালের অনুজ শূরপাল সিংহাসনে বসেন। জগজ্জীবনপুর শাসনের তিনি ছিলেন অন্যতম দ্যোতক। উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলা থেকে শূরপালের তৃতীয় রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাঁর মা মাহটা দেবীর বারাণসীর শিব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাশুপত আচার্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য শাসনের মাধ্যমে চারটি গ্রাম দান করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি গ্রাম ছিল কল্মষনাশপার বিষয়ের অধীন। কল্মষনাশ বা কর্মনাশা নদী বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমা। ঐ নদীর তীরবর্তী গ্রামটি বারাণসী জেলায় হওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে বারাণসী দেবপালের সময় থেকেই পাল অধিকারে ছিল, প্রতিহারদের অধীনে নয়। সারনাথেও শূরপালের সময়ের একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন যে দেবপালের পর পালবংশের পতন হয় এবং পালরা উত্তর ভারতের রাজনীতিতে আর তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। দীনেশচন্দ্র সরকার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন। শূরপাল অন্তত বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৮৬৪-৮৭৬ খ্রিঃ)।

১খ.৪.৫ পরবর্তী পাল রাজগণ

শূরপালের পর রাজা হন বিগ্রহপাল। একসময় ভাবা হত যে শূরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যক্তি। কিন্তু তিনি দেবপালের খুল্লতাত (কাকা) জয়পালের পুত্র। তিনি সম্ভবত শূরপালকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি কলচুরি বা হৈহয় বংশীয়া লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র নারায়ণপাল পরবর্তী পালরাজা। এইভাবে ধর্মপালের বংশের পরিবর্তে তাঁর ভাইয়ের বংশধরদের হাতে পালরাজ্যের শাসনভার হস্তান্তরিত হয়ে গেল। প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কোন লেখ না পাওয়ায় মনে করা হয় যে তিনি অল্প কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন।

বিহারশরীফ থেকে পাওয়া মূর্তিলেখ থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী রাজা নারায়ণপাল অন্তত চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৮৭৭-৯৩১ খ্রিঃ)। তাঁর সতেরো রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে ভাগলপুর থেকে। তারপর দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছরের আর কোন লেখ না পাওয়া যাওয়ায় পণ্ডিতেরা ধরে নিয়েছিলেন যে মহেন্দ্রপাল নামের প্রতিহার রাজা (আনুমানিক ৮৮৫-৯০৮ খ্রিঃ) এই সময় বাংলা-বিহারের অনেক অংশ

জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনের ভিত্তিতে ঐ মহেন্দ্রপালকে পালরাজা হিসাবে সনাক্ত করায় প্রতিহারদের বাংলা-বিহার জয়ের তত্ত্ব বাতিল করা প্রয়োজন। তবে এই সময় উত্তরবঙ্গ কম্বোজ অধিকারভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। কম্বোজবংশীয় কুঞ্জরঘটাবর্ষ দিনাজপুর লিপিতে নিজেকে গৌড়পতি বলেছেন। কম্বোজরা সমতট অঞ্চল পর্যন্ত অভিযান চালনা করেছিলেন। পালদের এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে বঙ্গালদেশে ত্রৈলোক্যচন্দ্র স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এছাড়ও‌া নারায়ণপালের কালে রাজা মাধবর্মা শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে উড়িষ্যার শৈলোদ্ভববংশ ও রাজা হর্জর ও তাঁর পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামরূপ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ম (৮৮০-৯১৫ খ্রিঃ অথবা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতানুযায়ী ৮৭৮-৯১৪ খ্রিঃ) তাঁর লেখতে বলেছেন যে তিনি গৌড়দের বিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ জয় করেছিলেন। কৃষ্মা জেলার বেলনাণ্ডুর রাজা প্রথম মল্ল সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্মের সামন্ত ছিলেন। তিনিও বঙ্গ, মগধ ও গৌড় জয়ের দাবী করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রকূটদের হাতেও নারায়ণপালের অস্তিত্ব সাময়িকভাবে বিপন্ন হয়ে থাকতে পারে। নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের স্ত্রী রাষ্ট্রকূটবংশীয় জগত্তুঙ্গোর কন্যা ভাগ্যদেবী। অনেকে মনে করেন জগত্তুঙ্গ দ্বিতীয় কৃষ্মেরই পুত্র। পারস্পরিক যুদ্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্ক সে যুগে একই সঙ্গে হওয়া সম্ভব ছিল।

নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল অন্তত বত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ৯৩২-৯৬৪ খ্রিঃ)।

তিনি ম্লেচ্ছ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র, পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, ক্রীত ও চীনদের জয় করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। এ ধরনের প্রশস্তির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংশয় থাকে। তবে তিনি চীন বা কম্বোজদের অধিকার থেকে উত্তরবঙ্গ উদ্ধার করে থাকতে পারেন। রাজশাহী জেলার ভাতুড়িয়ায় পাওয়া শিলালেখ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। কামরূপরাজ রত্নপাল এই রাজ্যপালকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তার ফল কী হয়েছিল জানার উপায় নেই। বাংলা এবং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্যপালের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি শক্তিমান রাজা ছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের রাজত্বকালে প্রতিহার রাজধানী কনৌজ বিজিত হয়েছিল মনে করা হয়। প্রতিহারদের সামন্তরা বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। ফলে, রাজ্যপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিহারদের দিক থেকে কোন আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। মধ্যভারতে নতুন শক্তির উত্থানে পালরাজাকে চন্দেল্ল বা কলচুরিদের মতো নতুন শত্রুর সম্ভবত সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চান্দেল্লরাজ যশোবর্মন গৌড় জয়ের দাবী করেছেন, কিন্তু এই দাবী অন্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত নয়।

রাজ্যপালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজা হন। বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং সমতট অঞ্চলে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সমতটের ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা যায়। শ্রীচন্দ্র দাবী করেছেন যেতিনি গোপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অবরুদ্ধা পালমহিষীকে গোপালের কাছে প্রত্যর্পণ করেন। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন যে গোপাল প্রথমে শ্রীচন্দ্রকে পরাজিত করে চন্দ্ররাজ্যের কিছু অংশ আত্মসাৎ করেন, কিন্তু পরে তিনি শ্রীচন্দ্রের কাছে পরাজিত হন ও তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। গোপালের তাম্রশাসনে তাঁর রাজত্বকালীন যুদ্ধের কোন নিশ্চিত বিবরণ নেই। তিনি অন্তত পনেরো বছর রাজত্ব করেন (আনুমানিক ৯৬৫-৯৮০ খ্রিঃ)।

দ্বিতীয় গোপালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে ইনি সম্ভবত সাতাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন, কারণ ‘পঞ্চরক্ষা’র একটি পুঁথি অনুলিখিত হয়েছিল জনৈক বিগ্রহপালের ছাব্বিশ রাজ্যবর্ষে। দীনেশচন্দ্র সরকার এটি দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালের বলে মনে করেন না, তাঁর মতে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের দীর্ঘ রাজত্বের কোনও প্রমাণ নেই; তাঁকে বড়জোর পাঁচ বছরের শাসনকাল দেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালীন একটি মূর্তিলেখ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতে তাঁর রাজ্যবর্ষের উল্লেখ নেই (আনুমানিক ৯৮০-৯৮৫ খ্রিঃ)।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র মহীপাল সিংহাসনে বসেন। তাঁর পঞ্চম রাজ্যবর্ষের তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে তিনি অনধিকারীদের হাত থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এর থেকে মনে হয় যে, দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই পালরাজ্য বিশেষ সঙ্কটের মুখে পড়েছিল। এই ‘অনধিকারীরা’ সমতটের চন্দ্রবংশীয় রাজারা হতে পারেন। শ্রীচন্দ্র শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আসামের একটি শাসনে শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্রের গৌড়ের রাজাকে পরাজিত করার ইঙ্গিত আছে।

অন্য রাজবংশের রাজারাও গৌড় জয়ের কৃতিত্ব দাবী করেছেন। চান্দেল্লরাজ যশোবর্মন নাকি গৌড়দের লতার মতো কেটে ফেলেছিলেন। তাঁর পুত্র ধঙ্গ রাঢ় ও অঙ্গের রাজাদের মহিষীদের বন্দী করেছিলেন বলে গর্ব করেছেন। ঠিক একইভাবে কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ গৌড় জয় করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। গাঙ্গেয়দেবের সময়ে কলচুরিরা বিহারের কিছু অংশে নিজেদের অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

অনেকে এই শত্রুদের কম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল ও ভাগ্যদেবীর পুত্র নারায়ণপাল ও নয়পলের উল্লেখ আছে। এঁরা প্রিয়ঙ্গু থেকে শাসন করতেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই রাজ্যপাল ও ভাগদেবীকে পাল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মনে করে বলেছিলেন যে রাজ্যপালের পর অন্তর্কলহে পাল রাজ্য খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এ সিদ্ধান্ত ভুল। ইর্দা শাসনের রাজারা ছিলেন কম্বোজবংশীয় এবং পালদের সামন্ত। পালরাজাদের নামের অনুকরণে তাঁরা নিজেদের নাম দিয়েছিলেন। মহীপালের পুত্র নয়পালের নামে ইর্দা শাসনের নয়পালের নাম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সুতরাং এঁরা বিগ্রহপালের রাজ্যজয়কারী না হওয়াই সম্ভব। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রথম মহেন্দ্রপাল ও শূরপালের রাজত্বকালের পর থেকেই গৌড়-বঙ্গে পালরাজাদের শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকী গৌড়-বঙ্গের ভিতরেও।

মহীপালের রাজ্যত্বকালীন সময়ের লেখ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও সমতট অঞ্চলে পাওয়া গেছে। কাজেই এ কথা অনুমান করা যায় যে তিনি সত্যিই পাল গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মহীপালের ৪৮ রাজ্যবর্ষের দুটি মূর্তিলেখ মজঃফরপুর জেলায় পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ তিনি কলচুরিদের বিতাড়িত করে বিহারে পাল অধিকার ফিরিয়ে এনেছিলেন। ১০৮৩ বিক্রম সংবৎ বা ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে সারনাথ লেখ থেকে জানা যায় যে বারাণসী তখন মহীপালের শাসনাধীন ছিল।

ইতিমধ্যে মহীপালকে হয়তো কিছু যুদ্ধে পরাজয়ও স্বীকার করতে হয়েছিল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালৈ লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি বাংলায়ও বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন এবং দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল, দক্ষিণরাঢ়ের রণশূর, বঙ্গালদেশের গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তররাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করেছিলেন। এই

লেখের উপর ভিত্তি করে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, এই সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল এবং বাংলায় পাল প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ অঞ্চলে। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকার এরকম সিদ্ধান্তে আসেন নি। তিনি বলেছেন যে এই রাজাদের মধ্যে কেউবা ছিলেন মহীপালের বশীভূত মিত্র এবং কেউবা ছিলেন সামন্ত। তবে এই যুদ্ধের স্থায়ী কোন প্রভাব বাংলায় বোধহয় পড়ে নি। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে এই আক্রমণ ঝটিকা-যুদ্ধের অতিরিক্ত কিছু নয়।

মহীপাল আনুমানিক ৯৮৫ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন (এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত ৯৮০-১০৩০ খ্রিঃ ও নীহার রায়ের মত ৯৭৭-১০২৭ খ্রিঃ)। তারপর, তাঁর পুত্র নয়পাল সিংহাসনে বসেন (১০২৭-১০৪৩ খ্রিঃ)। এই সময় পালদের সঙ্গে কলচুরিদের আবার যুদ্ধ বাধে। কলকচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণকে (আনুমানিক ১০৪১-১০৭২ খ্রিঃ) বঙ্গ ও গৌড় বিজেতা বলা হয়েছে। কর্ণের বিজয়াভিযানের প্রমাণ আছে বীরভূম জেলার পাইকোড় গ্রামের শিলালেখতে। কিন্তু ঐ জেলারই সিয়ান গ্রামের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, পরাক্রমশালী চেদিরাজের কোটি কোটি সৈন্য ধ্বংস করে নয়পাল প্রজাদের আনন্দ দিয়েছিলেন। কর্ণের এই পরাজয়ের কাহিনী তিব্বতীয় কিংবদন্তীতেও স্থান পেয়েছে। পশ্চিমদেশের রাজা কর্ণ নয়পালের রাজত্বকালে মগধ আক্রমণ করে পরাজিত হলে বৌদ্ধ অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় দুই রাজার মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এর টীকা অনুযায়ী অবশ্য কর্ণকে পরাজিত করার কৃতিত্ব নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের। তিনি ডাহল দেশের রাজা কর্ণকে পরাজিত করেন এবং তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। বিগ্রহপাল সম্ভবত নয়পালের সেনাপতি হিসাবে কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন এবং বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়ে থাকতে পারে। সিয়ান শিলালেখতে সুহ্ম দেশের রাজাকে 'ক্রূর' বলা হয়েছে। সুতরাং এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমান মেদিনীপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের উত্তরে ছিল সুহ্মদেশ এই পাল সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই কর্ণ সাময়িকভাবে পালরাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করে সৈন্য নিয়ে বীরভূম পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কর্ণকে পরাজিত করে নয়পাল আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পাল রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন এবং উত্তর ভারতে বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। সুদূর তিব্বত পর্যন্ত এই যুদ্ধ জয়ের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। নয়পাল আনুমানিক ১০২৭ থেকে ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ১০৪৩-৭০ খ্রিঃ)। তাঁর রাজত্বকালীন যুদ্ধবিগ্রহের সঠিক কোন উল্লেখ পাল লেখতে পাওয়া যায় নি। তবে পাল-কলচুরি দ্বন্দ্বের বোধহয় অবসান হয় নি। কর্ণের পুত্র যশকর্ণ উত্তর-বিহার জয়ের দাবী করেছেন। কিন্তু ঐ অঞ্চল থেকে বিগ্রহপালের তাম্রশাসন পাওয়ায় ঐ দাবীর যৌক্তিকতা অগ্রাহ্য করা যায়। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় প্রথম আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্যও গৌড় ও কামরূপ জয়ে দাবী করেছেন। এক্ষেত্রের সমর্থনযোগ্য প্রমাণের অভাবে দাবীর সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন।

অনেকে মনে করেন যে এই সময় পীঠীপতিদের উত্থানের ফলে দক্ষিণ বিহারে পাল আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পীঠীপতিরা ছিলেন পালদের সামন্ত। এই সময় পর্যন্ত বাংলা এবং বিহারে পালশাসন বজায় ছিল বলেই মনে হয়। তবে সমগ্র বাংলায় পালরাজাদের শাসন বজায় ছিল না। বর্ধমান অঞ্চলে সামন্তরাজা

ঈশ্বরঘোষ স্বাধীন রাজত্ব দাবী করেন। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে প্রথমে চন্দ্রবংশ ও পরে বর্মনরাজারা শাসন করেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরেই পাল রাজত্বে বিপর্যয় শুরু হয়। বিগ্রহপালের তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন অধিকার করেন ও অন্য দুই ভাই, শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়েই উত্তর বাংলায় কৈবর্ত দিব্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বঙ্গদেশে তখন শাসনক্ষমতা চন্দ্রদের থেকে বর্মনদের হাতে চলে গিয়েছিল। এই বংশের জাতবর্মা পালরাজার পক্ষ নিয়ে দিব্যকে পরাজিত করে থাকলেও সন্ধ্যাকর নন্দীর *'রামচরিত'* থেকে জানা যায় যে দিব্যর সঙ্গে যুদ্ধে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বাধীন কৈবর্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহীপালের মৃত্যুতে শূরপাল ও রামপাল মুক্তি পান। শূরপাল সিংহাসনে বসলেও তাঁর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি (আনুমানিক ১০৭১-৭২ খ্রিঃ)। এর পর রাজা হলেন রামপাল।

সিংহাসনে বসার পর রামপালের (আনুমানিক ১০৭২-১১২৭ খ্রিঃ) প্রধান কাজ হল কৈবর্তদের হাত থেকে উত্তরবঙ্গ অধিকার করা। দিব্যর এই বিদ্রোহকে অনেকে সামন্ত বিদ্রোহ বলেছেন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এটি প্রকৃতপক্ষে কৃষক বিদ্রোহ। পালরাজাদের ভূমি ও রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে কৃষিজীবী কৈবর্ত সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গের শক্তিশালী ও যোদ্ধা সম্প্রদায়। নীহার রঞ্জন রায় এদের জেলে কৈবর্ত বলে মনে করেন। রাজ্যপালের শাসনকালীন ভাতুরিয়ার লেখ থেকে জানা যায় যে রাজ্যপালের মন্ত্রী যশোদাস, কৈবর্ত ছিলেন এবং দিব্য যশোদাসের আত্মীয় ছিলেন। দিব্য হলেন এই বিদ্রোহীদের নেতা। পালদের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দীর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে দিব্য দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রুদোক বিদ্রোহীদের নেতা হন। তারপর রাজা হন ভীম। এইভাবে কৈবর্তরাজারা পঁচিশ-ত্রিশ বছর উত্তরবঙ্গ তাঁদের অধিকারে রাখতে পেরেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই সময় পালরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসন বিহার অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকায় রামপালের রাজত্বকালীন সমস্ত শিলালেখ বিহার থেকে পাওয়া গেছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে কৈবর্তদের উৎখাত করার জন্য রামপাল যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিভিন্ন সামন্তরাজার তিনি সাহায্যপ্রার্থী হন। *রামচরিত*-এ এ প্রসঙ্গে বাংলা-বিহারের চোদ্দজন সামন্তরাজার নাম পাই। এই সামন্তরাজাদের সকলকে বা তাঁদের শাসিত অঞ্চলের সবক'টি সনাক্ত করা যায় নি। এই সামন্তদের মধ্যে ছিলেন—

(১) পীঠীপতি কান্যকুব্জরাজ বিজেতা মগধেশ্বর ভীমযশ। পীঠীপতিরা বুদ্ধগয়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

(২) 'দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী' কোটাটবীর রাজা বীরগুণ। কোটাটবীর স্থান নির্ধারণ করা যায় নি, তবে এটি রাঢ় অঞ্চলে হওয়া সম্ভব।

(৩) উৎকলরাজ কর্ণকেশরী-বিজেতা দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ। দণ্ডভুক্তির নগর ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলায়।

(৪) বালবলভীর রাজা বিক্রমরাজ। 'বালবলভী' নামটি অন্য সূত্র থেকে জানা গেলেও জায়গাটি সনাক্ত করা যায় নি।

(৫) আটবিক সামন্ত-চূড়ামণি অপর-মন্দার পতি লক্ষ্মীশূর। অপরমন্দার রাজ্য বর্তমান হুগলী জেলার গড়মন্দারণ অঞ্চলে ছিল।

(৬) কুব্জবটীর রাজা শূরপাল। কুব্জবটী সাঁওতাল পরগনার নয়া দুমকার চোদ্দ মাইল উত্তরে।

(৭) তৈলকম্পরাজ রুদ্রশিখর। তৈলকম্প বর্তমান পুরুলিয়া জেলার তেলকূপী।

(৮) উচ্ছালরাজ ভাস্কর বা ময়মলসিংহ। এই জায়গাটিও সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

(৯) ঢেক্করীর প্রতাপসিংহ। ঢেক্করীকে অনেকে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী ঢেকুরীর সাথে অভিন্ন মনে করেন। ঢেক্করীর ইছাইঘোষের তাম্রশাসনটি অবশ্য পাওয়া গেছে দিনাজপুর থেকে।

(১০) কয়ঙ্গাল-মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন। কয়ঙ্গাল যদি কজঙ্গালের অপভ্রংশ হয় তবে এই জায়গাটি বর্তমান রাজমহলের কাঁকজোল অঞ্চল হতে পারে।

(১১) সঙ্কটাগ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন। এই অঞ্চলটির সঠিক অবস্থানও আমাদের অজানা।

(১২) নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। নিদ্রাবলী অঞ্চলটি সনাক্ত করা না গেলেও বিজয়রাজকে অনেকে পরবর্তীকালের সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন মনে করেন।

(১৩) কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন। এই কৌশাম্বী বাংলা দেশের বগুড়া জেলার কুশুম্বী হতে পারে। সেনবংশের বিজয়সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনেও এঁর উল্লেখ আছে।

(১৪) পাদুবন্বা মণ্ডলের সোম। পাদুবন্বা বর্তমান বাংলা দেশের পাবনা হতে পারে।

এই চোদ্দজন সামন্ত ছাড়াও 'রামচরিতে' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অঙ্গাদেশের অধিপতি রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথন বা মহণের কথা। মহণের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতিহার শিবরাজ এবং তাঁর দুই পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুর এবং সুবর্ণও রামপালকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

রামপালের সঙ্গে যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম পরাজিত ও বন্দী হন। ভীম বন্দী হলে কৈবর্ত সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে থাকে। তখন বঙ্গের হরিবর্মা কৈবর্ত সৈন্যদের সংগঠিত করে পালদের বাধা দিতে থাকেন। এই হরিবর্মার পিতা জাতবর্মা ছিলেন পালদের সামন্ত। কিন্তু হরিবর্মা ভীমের সহযোগী হয়েছিলেন। রামপাল কূটনীতি প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরস্ত করতে সক্ষম হলেন। হরিবর্মা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজা বলে স্বীকৃত হলেন। পরাজিত ভীমকে অনুচরসহ হত্যা করা হল। এইভাবে কৈবর্তদের বিদ্রোহ দমন করে রামপাল উত্তরবঙ্গ আবার অধিকার করলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করা গেলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই বিদ্রোহ পাল রাজ্যকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছিল।

রামপালের রাজত্বের প্রথমদিকে কলিঙ্গের সোমবংশীরাজা কর্ণ বাংলায় অভিযান চালালেও দণ্ডভুক্তির জয়সিংহের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ তাঁকে উৎখাত করেন। চোড়গঙ্গও ভাগীরথী পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন এবং তার ফলে দক্ষিণ পশ্চিমবাংলার কিছু অংশে পালরাজাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

রামপালের সময়েই সেনাপতি তিম্‌গদেবকে কামরূপ জয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কামরূপ জয় করার পর নিজেই সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

গাহড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে মনে হয় যে বিহারের কিছু অংশও পালদের হস্তচ্যুত

হয়ে গিয়েছিল। কাজেই, রামপাল কৈবর্তদের কাছে থেকে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করতে পারলেও তাঁরই সময়ে অন্যত্র পাল অধিকার সঙ্কুচিত হতে থাকে। তবে কুলোত্তুঙ্গাচোলের বঙ্গ, বঙ্গাল ও মগধ জয়ের দাবী ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয় না। একথা ধরা যেতে পারে যে গঙ্গাদের বিরুদ্ধে রামপাল এবং কুলত্তুঙ্গ মিলিত হয়েছিলেন। *রামচরিতে* পাওয়া যায় যে রামপাল কর্ণাটদের লুব্ধদৃষ্টির হাতে থেকে বরেন্দ্রীকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত চুয়ান্ন বছর রাজত্ব করেন।

পরবর্তী রাজা কুমারপাল (আনুমানিক ১১২৬-২৮ খ্রিঃ) অল্পদিন রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিম্‌গদেবের বিদ্রোহ দমন করার জন্য বৈদ্যদেবকে পাঠানো হয়। তিনি তিম্‌গদেবকে পরাজিত করেন এবং পালদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবেই বোধহয় কামরূপ শাসন করতে থাকেন এবং সেইজন্যই তাঁর কমৌলি তাম্রশাসনে প্রাগ্‌জ্যোতিষকে 'ভুক্তি' বা পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ শাসনে পালরাজার নাম না থাকায় এ কথাও মনে হয় যে প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যদেব স্বাধীনভাবেই কামরূপ শাসন করছিলেন।

কুমারপালের পুত্র তৃতীয় গোপাল শৈশবেই রাজ্যভার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি আনুমানিক চোদ্দো-পনেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন (আনুমানিক ১১২৮-৪৩ খ্রিঃ)। *রামচরিত* থেকে মনে হয় যে তিনি কোন এক যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করলেও দুর্ভাগ্যবশত নিজে মৃত্যুবরণ করেন। কোন্ রাজার বিরুদ্ধে গোপাল যুদ্ধ করেছিলেন তাও জাা সম্ভভব নয়। কিন্তু রাজশাহী জেলার নিমদীঘির শিলালেখতেও এই ঘটনার সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়। গোপাল ও তাঁর সামন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। কিন্তু ঐ অঞ্চল শত্রু কবলিত হয় নি। ঐড়দেবের আত্মীয় ভবদাস মৃতদের সৎকার স্থানে একটি মন্দির তৈরি করেন এবং নিমদীঘির প্রশস্তিটি খোদাই করান।

তৃতীয় গোপালের রাজত্বের অন্য কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই। সম্প্রতি রাজীবপুর থেকে তৃতীয় গোপালের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। কিন্তু তার থেকেও নতুন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী রাজা মদনপাল ছিলেন রামপালের পুত্র। ইনি পালবংশের একমাত্র রাজা যাঁর তারিখ দেওয়া শিলালেখ পাওয়া গেছে। মুঙ্গের জেলার বাল্‌গুদরে তাঁর ১৮ রাজ্যবর্ষের লেখটির তারিখ ১০৮৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১১৬১ খ্রিঃ। সুতরাং মদনপাল ১১৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এতদিন মনে করা হত যে তিনি ১৮ রাজ্যবর্ষ বা ১১৬১ খ্রিস্টাব্দের পর আর রাজত্ব করেন নি। সম্প্রতি আবিষ্কৃত মদনপালের রাজীবপুর তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে যে তিনি আরও দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন। এই তাম্রশাসনের তারিখ কেউ কেউ ৩২ পড়ে থাকলেও মনে হয় গৌরীশ্বর ভট্টাচার্যের পাঠ অনুযায়ী এটি তাঁর ২২ রাজ্যবর্ষের শাসন বলেই ধরা উচিত। অর্থাৎ ১৮ নয় মদনপাল অন্তত ২২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এছাড়া *রামচরিত*-য়েও তাঁর সম্পর্কে ৩৬টি শ্লোক রয়েছে।

মদনপালের রাজত্বকালও শান্তিপূর্ণ ছিল না। গাহড়বালরা বিহার পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন, তবে মদনপাল সাময়িকভাবে তাঁদের নিরস্ত করতে পেরেছিলেন মনে হয়। নইলে, তাঁর সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেবের পক্ষে বারাণসীতে শিবমন্দির করা সম্ভব ছিল না। ভীমদেবের রাজঘাট শিলালেখতে বলা হয়েছে যে তিনি কলিঙ্গরাজ এবং রায়ারি

বংশের রাজার হাত থেকে মদনপালের রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। ওড়িশার গঙ্গারাজা ও শ্রীহট্টের রায়ারিবংশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পালরা জয়ী হয়েছিলেন ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে পাল রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেও মদনপাল সামন্তদের শক্তিবৃদ্ধি রোধ করতে পারেন নি। এই সামন্তদের অন্যতম ছিলেন বিজয় সেন, যাঁকে রামপালের সামন্তচক্রের বিজয়রাজের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়। বিজয় সেনের বিজয় অভিযানের কাহিনী সেনরাজাদের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে। তবে মদনপালই বাংলার শেষ পালরাজা। পরবর্তী কোন পালরাজার তাম্রশাসন বা মূর্তিলেখ বাংলা থেকে পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী পালরাজা গোবিন্দপাল। গয়াতে পাওয়া একটি শিলালেখর তারিখ "বিকারী নামক বিক্রমসংবৎ ১২৩২ অর্থাৎ ১১৭৫ খ্রিঃ এবং গোবিন্দপালের 'বিনষ্ট' রাজ্যের ১৪ বৎসর"। এই লেখ-এর উপর ভিত্তি করে দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেছিলেন যে ১১৬১ বা ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দপাল রাজত্ব করতে শুরু করেন। কিন্তু মদনপালের রাজীবপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হবার পর দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময় মদনপালই পালরাজা ছিলেন। সুতরাং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় গবেষণা দাবী করে। প্রথমত দেখা দরকার বিকারী সংবৎ এবং বিক্রম সংবৎ সত্যিই এক কিনা। দ্বিতীয়ত মদনপাল ও গোবিন্দপালের পারস্পরিক সম্পর্ক কী ছিল।

যেহেতু গোবিন্দপালের কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি তাই মদনপালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আমাদের জানা নেই। যদি 'বিকারী সংবৎ' এবং 'বিক্রম সংবৎ' একই হয় তবে ধরে নিতে হবে যে মদনপাল ১১৬১ খ্রিস্টাব্দের পরও উত্তরবঙ্গ শাসন করতেন কিন্তু বিহার অঞ্চলে ১১৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জনৈক গোবিন্দপাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। কিন্তু গোবিন্দপাল বোধহয় সিংহাসন লাভের কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য হারান।

এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমসাময়িক কিছু পাণ্ডুলিপিতে গোবিন্দপালের মৃত্যুর পরও তাঁর রাজ্যসংবৎ অনুযায়ী তারিখ দেওয়া হয়েছে। গোবিন্দপালের নাম সম্বলিত এরকম এগারোটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন যে এই সময় গাহড়বালেরা পাটনা-গয়া অঞ্চল অধিকার করে ফেলেছিল, কিন্তু গাহড়বাল সৈন্যদের অত্যাচারের জন্য ক্ষোভবশত স্থানীয় লোকেরা বোধহয় বিজেতা রাজার নামোল্লেখ না করে ভূতপূর্ব রাজা গোবিন্দপালের নামই তারিখে উল্লেখ করত।

গোবিন্দপালের সঙ্গে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের সম্পর্কের কথাও কিছু জানা যায় না।

পলপালকে শেষ পালরাজা বলে ভাবা হয় যদিও পূববর্তী পালরাজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা কিছুই জানা নেই। তিনি অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর পঁয়ত্রিশ রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখ বিহারের লক্ষ্মীসরাইয়ের কাছাকাছি কাবায়া জয়নগরে পাওয়া গেছে। পলপালের রাজ্যের মধ্যেই বল্লাল সেনের আমলেরও একটি মূর্তিলেখ পাওয়া যাওয়ায় পণ্ডিতেরা এই দুই রাজার মধ্যে সম্পর্কের একটি সূত্র খুঁজেছেন। তিনি সেনবংশীয় রাজার বশীভূত মিত্র হিসাবে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভাগলপুর অঞ্চলের শাসক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

এইভাবে প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে পালবংশের রাজারা বাংলা-বিহারে তাঁদের শাসন চালিয়েছিলেন।

বাংলার কোন রাজবংশই এতদিন একটানা শাসনক্ষমতায় থাকতে পারে নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান যে সবসময়ই দৃঢ় ছিল তা হয়তো নয়। কিন্তু যে অরাজক অবস্থা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করে তাঁরা শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তা নিশ্চয়ই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেও পালরাজারা সর্বভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে বাংলাকে বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে বসাতে পেরেছিলেন। এটা একাধারে তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বীর্যবত্তার পরিচয় দেয়। নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও, নানা পতন-উত্থানের মধ্য দিয়ে পালরাজারা আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের কোন রাজশক্তিই এখানে তাদের স্থায়ী অধিকার বিস্তার করতে পারেন নি। বিভিন্ন অঞ্চল সাময়িকভাবে তাদের হস্তগত হলেও পালরাজারা তাঁদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠা সেন রাজবংশের হাতে বাংলার অধিকার তুলে দিতে তাঁরা বাধ্য হলেন। এবিষয়ে উল্লেখ্য যে পালরাজাদের তারিখগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই একটু সমস্যা রয়েছে।

১খ.৫ পালবংশের সমসায়িক বাংলার অন্যান্য রাজবংশ

আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে পালরাজাদের উত্থানের ইতিহাস জানার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অন্যান্য রাজবংশের পরিচয় ও পালদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথাও জানা দরকার।

১খ.৫.১ দেববংশ

গোপালের সিংহাসনে বসার আগেই কুমিল্লার দেবপর্বতে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের দেববংশ বলা হয়। এই বংশের আনন্দদেব গোপালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শ্রীবঙ্গালমৃগাঙ্ক' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তারনাথের বর্ণনা থেকে মনে হয় গোপাল বঙ্গালদেশের প্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সিয়ান শিলালেখ থেকেও মনে হয় যে গোপালের সময়েই সমতট পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অথচ আনন্দদেবের পুত্র ভবদেবকেও তাঁর দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষে কুমিল্লা অঞ্চলে ভূমিদান করতে দেখা যায়। কাছেই পালরাজাদের সঙ্গে এই দেববংশীয় রাজাদের সম্পর্ক কেমন ছিল তা নির্ধারণ করা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। ভবদেবেই এই বংশের শেষ রাজা।

ভবদেবের পর দেববংশের কথা জানা না গেলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে হরিকেল মণ্ডলাধিপতি কান্তদেবকে তাম্রশাসনের মাধ্যমে ভূমিদান করতে দেখা যায়। কান্তিদেবের রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল সম্ভবত শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্ধমানপুর নামক এক স্থানে। তাঁর পিতা ধনদত্ত, পিতামহ ভদ্রদত্ত। কান্তিদেব 'দত্ত'র পরিবর্তে 'দেব' শব্দটি নামের সঙ্গে যোগ করায় পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে তিনি ছিলেন ভবদেবের দৌহিত্র ও মাতামহের রাজত্বের উত্তরাধিকারী। তিনি আনুমানিক ৮০০ থেকে ৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে ধর্মপাল ও দেবপালের সামসাময়িক রাজা বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু পালরাজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেও কথাও আমাদের জানা নেই। কান্তিদেবের বংশধরদের সম্বন্ধে কোন তথ্য নেই।

১খ.৫.২ চন্দ্রবংশ

এরপর বঙ্গালদেশে দীর্ঘকাল চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন। এই বংশের সাতজনের নাম জানা গেছে। প্রথম পূর্ণচন্দ্র (আনুমানিক ৮৬৫-৮৫ খ্রিঃ)। তাঁর পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এবং পৌত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র। চন্দ্রদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র সমতট আক্রমণ করেন এবং ক্ষীরোদা নদীর তীরবর্তী রাজধানী দেবপর্বত জয় করেন। তাঁর বঙ্গ আক্রমণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন দেবপর্বত কোন রাজা বা রাজবংশের অধীন ছিল তা জানা নেই। কিন্তু এই বিজয়াভিযানের আগেই যে দেবপর্বত কম্বোজ সৈন্যদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল তা জানা যাচ্ছে। এই কম্বোজরা যে পাল সাম্রাজ্যের ভিত সাময়িকভাবে টলিয়ে দিয়েছিল তা নারায়ণপালের রাজ্যপাল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্র সম্পর্কে তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন 'আধারো হরিকেল রাজ-কুকুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াম্' অর্থাৎ 'হরিকেলের স্বেতচ্ছত্রই যাঁর আশ্রয় সেই রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়'। এই বিশেষণের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। ফলে, তিনি হরিকেল রাজার মিত্র ছিলেন না-কি হরিকেল রাজাকে জয় করে সেখানকার রাজলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দীনেশচন্দ্র সরকার লিখছেন ঃ "ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে উত্তর-বাংলায় ও দক্ষিণ-বিহারে প্রতিহার মহেন্দ্রপালের অধিকার ছিল। তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে হরিকেলরাজের পক্ষে পূর্ব-দক্ষিণ বাংলা থেকে পাল প্রভুত্ব উচ্ছেদ করা অসম্ভব নয়"। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, প্রতিহার মহেন্দ্রপাল বলে এতদিন যাঁকে ভাবা হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে পাল সম্রাট। তাই নতুন তথ্যের আলোয় দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বরং, কম্বোজ বিজয়ে পাল ক্ষমতার সাময়িক বিপর্যয়ের সুযোগে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কম্বোজ আক্রমণ-বিধ্বস্ত হরিকেল অঞ্চল জয় করেছিলেন এমন সিদ্ধান্তে আসাই বোধহয় সমীচীন। দেবপর্বত জয় করার পর ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সেনাবাহিনী বিন্ধ্যর সূরদাঁ নদীতীরবর্তী অঞ্চলে ও কাবেরী তীরবর্তী মলয় উপত্যকায় গিয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে। এগুলি অতিশয়োক্তি বলেই ধরা উচিত। এঁদের রাষ্ট্রকেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ, এবং এঁরা শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে শাসন করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্রশ্রীচন্দ্র (আনুমানিক ৯২৫-৭৫ খ্রিঃ) গৌড় ও কামরূপ জয় করেছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। তিনি যুদ্ধে পালরাজাকে পরাজিত করলেও পাল মহিষীকে প্রত্যপর্ণ করেছিলেন। কিন্তু পরাজিত পালরাজার নাম তাম্রশাসনে বলা হয়নি। ঠিক একইভাবে তিনি লৌহিত্যবাসী ম্লেচ্ছদের পরাজিত করার দাবী জানালেও পরাজিত কামরূপ রাজের নাম উল্লেখ করেন নি।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনুমানিক ৯৭৫-১০০০ খ্রিঃ)। এই সময় পালরাজারা আবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে থাকেন। বর্তমান কুমিল্লা জেলার মনধুক গ্রামে দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালীন একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গেছে। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালীন দু'টি মূর্তিলেখ কুমিল্লায় পাওয়া গেছে। ফলে, পালরাজাদের সঙ্গে চন্দ্রদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা সহজ নয়। কল্যাণচন্দ্র, তাঁর পুত্র লড়হচন্দ্র ও পৌত্র গোবিন্দ্রচন্দ্র সমসাময়িক পালরাজাদের লঘু মিত্র হিসাবে সম্ভবত রাজত্ব করতেন। কামরূপের পালবংশীয় রাজা রত্নপাল বাংলার পালরাজা রাজ্যপালকে এবং তাঁর পুত্র ইন্দ্রপাল শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করেছেন।

রাজেন্দ্রচোলের তিরুমালৈ লেখতে পূর্ব-ভারতের যে সমস্ত পরাজিত রাজার নাম আছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম বঙ্গাল দেশের গোবিন্দচন্দ্র। ইনি চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র হওয়াই সম্ভব।

১খ.৫.৩ বর্মনবংশ

গোবিন্দচন্দ্রের পর চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। এরপর বঙ্গ অঞ্চলে অন্য একটি রাজবংশকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই বংশের প্রথম রাজা বজ্রবর্মা। তাঁর পুত্র জাতবর্মা। তিনি কলচুরি রাজা কর্ণের সামন্ত হিসাবে জীবন শুরু করে থাকতে পারেন। কারণ, কর্ণের রেওয়া শিলালেখতে জাত নামের সামন্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কীভাবে জাতবর্মা বাংলার রাজা হয়ে বসেন তা জানা নেই। কলচুরিদের সঙ্গে পাল- রাজাদের সংঘর্ষের কথা আমাদের জানা আছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল কলচুরি রাজা কর্ণকে পরাজিত করেন ও তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন। জাতবর্মা কর্ণের অপর এক কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন। কলচুরিরাজের পরাজয়ের পর জাতবর্মা পালদের সঙ্গে মিত্রতা করে থাকতে পারেন। জাতবর্মার সঙ্গে পাল রাজার সুসম্পর্কের কথা বেলাবো তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। জাতবর্মা তৃতীয় বিগ্রহপালের অধীনস্থ রাজা ছিলেন মনে করা যায়। তিনি সম্ভবত কৈবর্ত দিব্যকে পালরাজার পক্ষ অবলম্বন করেই পরাজিত করেছিলেন। তাম্রশাসনের দাবী অনুযায়ী তিনি অঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন এবং গোবর্ধন নামের রাজাকে পরাজিত করেন।

জাতবর্মার পুত্র হরিবর্মা। এইসময় কৈবর্ত নেতা ভীমের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হরিবর্মা ভীমের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হন। রামপাল ভীমকে পরাজিত ও বন্দী করলে হরিবর্মা কৈবর্ত সৈন্যদের সংগঠিত করে পালরাজার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কূটনীতি প্রয়োগ করে রামপাল তাঁকে নিবৃত্ত করেন। রামপাল সম্ভবত হরিবর্মার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হরিবর্মার পর সামলবর্মা রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁর বজ্রযোগিনী শাসনে খণ্ডাংশ থেকে দু'জনের সম্পর্কের কথা জানা যায় না। তিনি হরিবর্মার উত্তরাধিকারীকে উৎখাত করে সিংহাসন দখল করে থাকতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পরবর্তী রাজা ভোজবর্মার বেলাবো তাম্রশাসনেও সামলবর্মার নাম নেই। ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা। ভোজবর্মার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। তিনি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোন কোন অংশে ভূমি দান করেছিলেন যা থেকে মনে হয় পুণ্ড্রবর্ধনের রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চলেও তাঁর শাসন বা আধিপত্য ছিল। এরপর বিক্রমপুর অঞ্চল, যেখানে থেকে বর্মনরাজাদের তাম্রশাসনগুলি প্রচারিত হয়েছিল, সেনরাজাদের হস্তগত হয়।

এই বর্মনরাজাদের পাল সম্রাটদের অধীনস্থ রাজা হিসাবে মেনে নিলে বঙ্গ-সমতট অঞ্চলে এই সময় পাল প্রভুত্বের কথা স্বীকার করা যায়। অন্যথায় বর্মনদের স্বাধীন স্থানীয় রাজা ভাবতে হয় যাঁরা কখনও পালরাজাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, আবার কখনও বা পাল রাজাদের বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের উৎখাত করতে চেয়েছেন। পাল সাম্রাজ্যের চরম বিপদের সময় যখন রামপাল বিভিন্ন সামন্তদের সাহায্যপ্রার্থী তখন হরিবর্মা কৈবর্ত ভীমের মিত্র। হরিবর্মা যদি কৈবর্ত সৈন্যদের সাহায্যে রামপালকে পরাজিত করতে পারতেন তবে হয়তো বর্মনদের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হত। কিন্তু তা না হওয়ায় বাংলা ইতিহাসে বর্মনরাজাদের ভূমিকার কথা তেমনভাবে উল্লেখ করা হয় না।

১খ.৫.৪ অন্যান্য বংশ

বঙ্গ-সমতটের এইসব রাজবংশের কথা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের ভূস্বামীদের কথা তাম্রশাসন থেকে সামান্য জানা গেছে। প্রিয়ঙ্গুর কম্বোজবংশীয় রাজারা বর্তমান মেদিনীপুর-বালেশ্বর অঞ্চলে শাসন

করতেন। তাঁরা পালসম্রাটদের অনুকরণে নাম গ্রহণ করলেও তাম্রশাসনে কোন পালরাজাকে অধীশ্বর হিসাবে উল্লেখ করেন নি।

ঢেক্করীর ঈশ্বরঘোষ দিনাজপুর থেকে তাম্রশাসন দিয়েছিলেন। রামপালের সামন্ত ঢেক্করীর প্রতাপসিংহের সঙ্গে এঁর সম্পর্কের কথা জানা নেই। তবে ঈশ্বরঘোষের পূর্বপুরুষেরা অন্তনাম হিসাবে সিংহ ব্যবহার করেন নি, ঘোষ ব্যবহার করেছেন। কৈবর্ত বিদ্রোহের সুযোগে 'মহামান্তলিক' ঈশ্বরঘোষ সাময়িকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন, তাই ঈশ্বরঘোষের বংশধরদের সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

গয়ার পীঠীপতি রাজারা পালদের সামন্ত ছিলেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করার জন্য পীঠীপতি ভীমযশা রামপালকে সাহায্য করেছিলেন। পরে বোধহয় এই অঞ্চলটি সিন্দবংশীয়দের হাত থেকে কোন আচার্য বংশের হাতে চলে যায়। এই পীঠীপতির আচার্যরাও পালদের সামন্ত ছিলেন। এঁদের কখনও কখনও 'মগধরাজ' বলা হয়েছে। গয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ শূদ্রকের বংশের যক্ষপালও পালদের সামন্ত ছিলেন।

উত্তর বিহারের দারভাঙ্গা অঞ্চল থেকে মহামাণ্ডলিপ সংগ্রামগুপ্তের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বলেন।

এই সমস্ত রাজারা ছাড়াও পালদের বহু সামন্ত যে বাংলা-বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ উল্লিখিত রামপালের সামন্তচক্রের তালিকায়।

১খ.৬ সেনবংশ

কিন্তু পাল সম্রাটদের পর যে রাজবংশ বাংলার ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল সেনবংশ। এই বংশের বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, সেনরা ছিলেন কর্ণাটকের অধিবাসী। মাধাইনগর তাম্রশাসনে তাঁদের কর্ণাটকের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে।

কীভাবে সেনরা বাংলার রাজা হন তা অনুমানসাপেক্ষ। এ বিষয়ে নীহার রঞ্জন রায়ের মত সমর্থনযোগ্য। তিনি বিল্‌হনের রচনায় উল্লিখিত চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয় যাত্রা ও চালুক্য লিপিতে বর্ণিত একাধিক চালুক্যরাজের একাধিক যুদ্ধযাত্রার কাহিনীগুলিকে নির্দেশ করে বলেছেন যে, "এইসব কর্ণাট দেশীয় সমরাভিযানকে আশ্রয় করিয়াই কিছু কিছু কর্ণাট্য ক্ষত্রিয় সামন্ত পরিবার এবং অন্যান্য কিছু লোক বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন এবং সৈন্যাভিযানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও তাঁহারা এইখানেই থাকিয়া গিয়াছিলেন।" বিহার ও বাংলাদেশের সেন রাজবংশ এইসব দক্ষিণী কর্ণাট পরিবার থেকে উদ্ভূত বলে তিনি মনে করেছেন। পালরাজাদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, পাল সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে আসা সৈন্য নিযুক্ত হত। তেমনিভাবে কর্ণাটক থেকে আসা কোন সৈনিক সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ হতে পারেন। পালরাজাদের অন্য কর্ণাটকদেশীয় সামন্তদের কথাও আমাদের জানা আছে। যেমন পীঠীপতি দেবরক্ষিতও ছিলেন কর্ণাটকদেশীয়।

পণ্ডিতেরা দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনার কথাও বলেন। বাংলায় বিজয় অভিযানকারী কোন কর্ণাটক রাজার সঙ্গে এসেছিলেন সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ। সৈন্য ঘাঁটির অধিকর্তা হিসাবে তিনি থেকে যান। কর্ণাটকের রাজবংশের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁরা সুসম্পর্ক রাখেন। কর্ণাটকের রাজবংশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার কৃতিত্ব তাঁরা দাবী করেছেন।

এই সেনরা নিজেদের চন্দ্রবংশীয় বলেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক রাজবংশের মতো এঁরাও ছিলেন 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়'। এই শব্দটির অর্থ নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেছেন যে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও যারা ক্ষত্রিয়দের মতো যুদ্ধবিদ্যা ও রাজকার্যনির্ভর পেশায় নিযুক্ত হয়েছিলেন তারাই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন। দীনেশচন্দ্র সরকার এ মত ভ্রান্ত মনে করেন। তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের রক্তের সংমিশ্রণ এঁদের মধ্যে হয়েছিল বলেই এঁরা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।

এই রাজাদের বংশতালিকা শুরু হয়েছে বীরসেনকে দিয়ে। সেই বংশের সন্তান সামন্ত সেন। তিনি কর্ণাটকের চালুক্য রাজাদের সাহায্যার্থে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এই সময় চালুক্য রাজাদের সঙ্গে চোলরাজাদের সংঘর্ষ চলছিল। সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরের পুণ্যাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হয়তো এই সময় থেকেই বাংলার সঙ্গে কর্ণাটক থেকে আসা এই সৈনিক বংশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলার রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে সেনাদের যুক্ত করায় এ কথা বলা যায় যে, এই অঞ্চলের সামন্ত রাজা হিসাবেই তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১খ.৬.১ বিজয় সেন

সামন্তসেনের পুত্র হেমন্ত সেন। তাঁর পুত্র বিজয় সেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করতে রামপালকে যে যে সামন্তরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। অনেকে মনে করেন ইনিই বিজয় সেন (আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৯ খ্রিঃ)। প্রথম জীবনে তিনি পালদের সামন্ত থাকলেও পরবর্তীকালে পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন এবং ক্রমশ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে বাংলার বৃহত্তর অংশের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে তাঁর এই অগ্রগতির ইতিহাস জানা যায়।

বীরভূম জেলার পাইকোড়ে বিজয় সেনের শিলালেখ এর একটি ভাঙা অংশ পাওয়া গেছে। ফলে, রাঢ় অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চল যে বিজয় সেনের অধিকারে ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই রাজশাহী জেলার দেওপাড়ায় তাঁর শিলালেখ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর ব্যারাকপুর তাম্রশাসনটি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর থেকে দেওয়া। অর্থাৎ এই অঞ্চলেও বিজয় সেনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দেওপাড়া প্রশস্তিতে বলা হয়েছে যে, বিজয় সেন নান্য, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজাদের পরাজিত করে ছিলেন। নান্য মিথিলার রাজা নান্যদেব। এই বংশের রাজারাও সেনদের মতো কর্ণাটক দেশ থেকেই এসেছিলেন। এই নান্যদেবকে পরাজিত করায় উত্তর বিহারে বিজয় সেনের আধিপত্য প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে। রামপালের সাহায্যকারী সামন্তচক্রের মধ্যে কোটাটবীর বীরগুণ ও কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্ধনের নাম পাওয়া যায়। বিজয় সেন কর্তৃক পরাজিত বীর ও বর্ধন এঁরাই হওয়া সম্ভব। কাজেই বাংলার সমসাময়িক শক্তিশালী সামন্তরাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেই বিজয় সেনকে সেনরাজবংশর ভিত্তি স্থাপন করতে হয়েছিল। অন্য পরাজিত রাজা রাঘব ছিলেন ওড়িশার গঙ্গা- বংশীয় রাজা। রাঘবের পিতা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ গোদাবরী থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল জয় করার দাবী জানিয়েছেন। তিনি মন্দাররাজ্যের আরম্যাননগরী জয় করেছিলেন। আরম্যা বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ ও মন্দার বর্তমান মন্দারণ। পালরাজ্যের বিরুদ্ধে এই আক্রমণে বিজয় সেন

চোড়গঙ্গকে সাহায্য করে থাকতেন পারেন। আনন্দভট্টের *বল্লালচরিত*-এ বিজয় সেনকে 'চোড়গঙ্গ-সখ' বলা হয়েছে। কিন্তু দেওপাড়া প্রশস্তি প্রমাণ করে যে, কলিঙ্গের গঙ্গাবংশের সঙ্গে বিজয় সেনের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নি। বিজয় সেন কলিঙ্গ ছাড়া গৌড় ও কামরূপ জয়েরও দাবী করেছেন। গৌড়ের সমকালীন রাজা মদনপাল। দেওপাড়া প্রশস্তিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, পশ্চিমদিকের রাজাদের জয় করার জন্য তিনি গঙ্গা ধরে নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে এ থেকে বিহারে অবস্থিত পালরাজ ও তাঁর সামন্তগণের সঙ্গে যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাগলপুরে পাওয়া একটি শিলালেখ থেকে সাহুর নামক ব্যক্তির কথা জানা যায়। লেখটিতে বলা হয়েছে যে গৌড়েশ্বরের হয়ে তিনি বঙ্গেশ্বরের নৌবাহিনী ধ্বংস করেছিলেন। এই গৌড়েশ্বর মদনপাল ও বঙ্গপতি বিজয় সেন হওয়া সম্ভভব।

দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেছিলেন যে বিজয় সেন পালবংশীয় মদনপালের অধিকার বিলুপ্ত করে উত্তর বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং এই ঘটনা মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বর্ষের অর্থাৎ আনুমানিক ১১৫১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালের ঘটনা। এরপর মদনপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করতেন। কিন্তু রাজীবপুত্র তাম্রশাসন প্রমাণ করেছে যে, উত্তরবঙ্গে মদনপালের কর্তৃত্ব ২২ (অথবা ৩২) রাজ্য সংবৎ পর্যন্ত বহাল ছিল। ফলে, বিজয় সেনের উত্তরবঙ্গ জয়ের সময় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভভব নয়।

বিজয় সেন অন্তত বাষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বাষট্টিতম রাজ্যবর্ষে তিনি খাড়ী বিষয়ে (বর্তমান চব্বিশ পরগনা) নিষ্কর জমিদান করেছিলেন। এইভাবে বিজয় সেনের রাজত্বকালেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি শূরবংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। রামপালের সামন্তচক্রের তালিকায় আমরা আটবিক-সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি অপরমন্দারপতি লক্ষ্মীশূরের নাম পাই। বিলাসদেবী এই বংশোদ্ভূতা হতে পারেন।

১খ.৬.২ বল্লাল সেন (আনুমানিক ১১৫৯-৭৯ খ্রিঃ)

বিজয় সেন ও বিলাসদেবীর পুত্র বল্লাল সেন। তাঁর সময় সেন অধিকার সম্ভবত বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়েছিল। সনোখার থেকে বল্লাল সেনের নবম রাজ্যবর্ষের একটি মূর্তিলেখ পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর আমলের বিজয়াভিযানের কোন বিবরণ সেনদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় না।

এই সময় বিহারে পাল ও গাহড়বাল সংঘর্ষ চলছিল। গোবিন্দচন্দ্রের হাত থেকে মদনপাল বিহার উদ্ধার করতে পারলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার গাহড়বালরা পাটনা পর্যন্ত জয় করে নেয়। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনা জেলার একটি গ্রাম দান করে তাম্রশাসন প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত গোবিন্দপালকে পরাজিত করে ঐ অঞ্চল অধিকার করেন। পালগাহড়বাল বিরোধের সুযোগে সেনরা ভাগলপুর অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন শেষ পালরাজা পলপাল। তাঁর সময়কালীন মূর্তিলেখ চম্পানগরীতে পাওয়া গেলেও তাঁকে সেনরাজার বশীভূত মিত্র মনে করা উচিত।

১খ.৬.৩ লক্ষ্মণ সেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬/৭ খ্রিঃ)

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন। তিনি প্রায় ষাট বৎসর বয়সে ১১৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে পাল—গাহড়বাল বিরোধ সেন-গাহড়বাল বিরোধে পরিণত হয়। তিনি গাহড়বাল রাজা

জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন এবং বারাণসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তিনি দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং সেখানেও জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। তিনি পূর্বদিকে কামরূপ বা আসামের রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেন শক্তিমান রাজা হওয়া সত্ত্বেও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে পারেন নি। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লীর চৌহানবংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ তুর্কী মুহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পরাজিত হন। এরপর গাহড়বাল রাজা পরাজিত হলেন। তুর্কীসৈন্য বাংলার দিকে এগোতে থাকে। মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তুর্কী সেনাবাহিনী বিহার অধিকার করে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়ার দিকে অগ্রসর হয়। মিনহাজউদ্দীনের *তবকাৎ-ই-নাসিরি*-এতে এই তুর্কীদের নদীয়া জয়ের একটি কাহিনী বলা হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের ঘোড়া ব্যবসায়ী মনে করে কেউ বাধা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ফলে, তাদের অতর্কিত আক্রমণে সেন সৈন্যরা বিভ্রান্ত হল। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে মুহম্মদের অন্যান্য সৈন্যরা নগরে পৌঁছে যায়। বাংলা তুর্কী বাহিনীর কবলিত হয়। তাছাড়া আনুমানিক ১১৯৬ খ্রিঃ সুন্দরবনের (পূর্বখাটিকা) একাংশ বিদ্রোহ করে ও জনৈক মহামাণ্ডলিকের পুত্র মহারাজাধিরাজ ডোম্মনপাল স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষ্মণ সেন তাঁর রাজ্যের পশ্চিমাংশ হারালেও তখনও সেনরাজ্যের অবসান হয় নি। লক্ষ্মণ সেন আনুমানিক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। ইতিমধ্যে ১২০৫ সালে মুহম্মদ ঘোরীর নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচারিত হয়েছে। এই স্বর্ণমুদ্রায় এক পিঠে 'গৌড়-বিজয়ে' শব্দটি নাগরীলিপিতে লেখা আছে।

১খ.৬.৪ বিশ্বরূপ সেন

এইভাবে অঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বাংলার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিনের অবসান হলেও এর পরেও সেনরাজারা কিছুদিন বিক্রমপুর থেকে শাসন চালিয়েছেন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্রশাসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল তাম্রশাসনটি বিশ্বরূপ সেনের পুত্র সূর্য সেনের দ্বিতীয় রাজ্যবর্ষের। কিন্তু পরে মূল দলিলের কিছু অংশ ঘষে তুলে আবার লেখা হয়। শাসনটি এর ফলে হয়ে দাঁড়াল বিশ্বরূপ সেনের চতুর্দশ রাজ্যবর্ষের। এই দলিলের ভিত্তিতে দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে, বিশ্বরূপ সেন কিছুদিনের জন্য রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন। তখন তাঁর পুত্র সূর্য সেনকে সিংহাসনে বসানো হয়। পরে বিশ্বরূপ সেনই রাজপদ গ্রহণ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে জানা সম্ভব হয় নি। 'বিশ্বরূপের এই সাময়িক অক্ষমতার কারণ দুরারোগ্য ব্যাধি, শত্রু-হস্তে বন্দিত্ব, প্রভৃতি কিছু হতে পারে'।

ইদিলপুর তাম্রশাসনটি সূর্য সেনের তৃতীয় বর্ষের। কিন্তু এটিও পরে ঘষে তুলে বিশ্বরূপ সেনের নামে প্রচারিত হয়। এই তাম্রশাসনে গর্গ যবনদের পরাজয়ের কথা লেখা আছে। এই গর্গ যবন বলতে পৌরাণিক কাল-যবনদের বোঝানো হয়েছে। গৌরবর্ণ যবন বা গ্রীকদের থেকে এই বিদেশী তুর্কীদের পৃথক করার জন্য তাদের কৃষ্ম যবন বলা হত। এই যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব সূর্য সেনের। কিন্তু নামের পরিবর্তন করার ফলে এটি বিশ্বরূপ সেনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যাইহোক বাংলার পূর্ণ অধিকার নিয়ে তুর্কীদের সঙ্গে সেনদের যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল এবং সেনরাজারা তাদের বাধা দেওয়ায় এ অঞ্চল বহুদিন তুর্কী শাসনমুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সেনবংশের রাজারা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তারপর এই অঞ্চল সমতটের দেববংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। এইভাবে বাংলার অধিকার সম্পূর্ণভাবে সেনদের হস্তচ্যুত

হয়। দেব বংশীয় রাজারা বিক্রমপুরকে রাষ্ট্রকেন্দ্র করে বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন।

তুর্কী আক্রমণের পর থেকে বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ ধরা হয়। ইতিহাসের যে পর্বে পাল-সেনবংশীয় রাজারা আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তা আদি মধ্যযুগের অন্তর্গত। এই আদি মধ্যযুগের সমস্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে পাল-সেন রাজাদের মূল্যায়ন করা চলে।

১খ.৭ পালদের শাসনকাঠামো

পালরাজারা দীর্ঘকাল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে শাসন করলেও তাঁদের শাসনব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার মতো তথ্য আমাদের নেই। তাম্রশাসন, শিলালেখ ও *রামচরিত*-এর বিবরণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সামন্ত বা লঘু মিত্রদের দ্বারা শাসিত হয়। বাকী অংশ পালরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল। ধর্মপালের প্রচেষ্টায় কনৌজ থেকে ইন্দ্রায়ুধ বিতাড়িত হলেও ঐ অঞ্চলে ধর্মপাল তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন চালাতে সচেষ্ট হন নি। সেসব অঞ্চলে ধর্মপালের কোন ধরনের লেখও পাওয়া যায় নি। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন বাংলা-বিহারে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তী পাল রাজারাও কলিঙ্গ বা আসাম জয়ের দাবী করলেও তাঁদের প্রত্যক্ষ শাসন সম্ভবত ঐসব অঞ্চলেও ছিল না। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে প্রাক্‌জ্যোতিষপুর 'ভুক্তি' হিসাবে বর্ণনায় থাকলেও তিনি প্রায় স্বাধীন রাজার মতোই ব্যবহার করেছেন। তাম্রশাসনে কোন পালরাজার উল্লেখ করেন নি।

রামচরিত-এর সামন্তচক্রের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে সামন্তরা সম্রাটের প্রয়োজনে সৈন্যাদি দিয়ে সাহায্য করতেন। আবার এ কথাও সত্য যে সম্রাটের দুর্বলতার সন্ধান পেলে সামন্তরা স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্যোগী হতেন। পাল আমলে সামন্তচক্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। পালদের লেখগুলিতে রাজন, রাজনক, রানক, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সামন্ত এবং লঘু মিত্রদের সম্পর্ক সবসময় একরকম থাকতো না। অনেক সময়ই পালরাজাদের সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য ছোট ছোট রাজবংশের সম্পর্ক নির্ণয় করা তাই সহজ হয় না। যেমন, বঙ্গের জাতবর্মাকে আমরা পালদের সহায়ক হয়ে দিব্যকে পরাজিত করতে দেখি, অথচ তাঁর পুত্র হরিবর্মাকে দেখা যায় বিদ্রোহী ভীমের পক্ষ অবলম্বন করে পালরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সঙ্গে পাল সম্রাটদের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়।

পালরাজারা গুপ্তসম্রাটদের মতোই পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করতেন। রাজন্, রাজন্যক, রাজনক, মহাসামন্ত, সামন্ত ইত্যাদি উপাধিধারী ব্যক্তিরা ছিলেন পাল শাসনকাঠামোর উপরিভাগে। এঁরা যে ক্ষমতাবান ও বিত্তবান ছিলেন তা পাল লেখ ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। ধর্মপালের মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা শুভস্থলী গ্রামে নন্ন-নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরে পূজা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য ধর্মপাল চারটি গ্রাম দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নারায়ণবর্মাই গ্রামগুলি রাজার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন ঃ "তিনি যে ভূমির মূল্য রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই"। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলাধিপতি বলবর্মাও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সুবর্ণাধিপতি বালপুত্রদেব যখন নালন্দার বিহার করে তার রক্ষণাবেক্ষণ পূজা-পাঠ ইত্যাদির জন্য পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন তখন বলবর্মাই দেবপাল ও বালপুত্রদেবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন। মণ্ডলাধিপতিরা যে শক্তিমান হয়ে উঠে স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার করতে পারতেন পরবর্তীকালের ঢেক্করীর মণ্ডলাধিপতি ঈশ্বরঘোষ তার প্রমাণ। 'দূতক'রা সর্বদাই উচ্চপদাধিকারী হতেন। খালিমপুর তাম্রশাসনের 'দূতক' ছিলেন যুবরাজ ত্রিভুবনপাল। মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনের 'দূতক' ছিলেন তাঁর ভাই শূরপাল। কাজেই রাজপুত্ররা অনেক সময়ই 'দূতক' হিসাবে কাজ করতেন। মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসনে দু'জন দূতকের নাম আছে। শূরপাল ছাড়া অন্য 'দূতক' ছিলেন 'মহাসেনাপতি' বজ্রদেব।

১খ.৭.১ মন্ত্রী, সচিব এবং অমাত্য

রাজার শাসনকার্যের প্রধান সহায়ক ছিলেন মন্ত্রী এবং সচিবরা। নারায়ণপালের সমকালীন বাদাল প্রশস্তি থেকে একটি মন্ত্রী পরিবারের কথা জানা যায়। এই বংশের লোকেরা পুরুষানুক্রমে পালরাজাদের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই ধরনের মন্ত্রীরা যে কী পরিমাণ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেন তা প্রশস্তিটির ভাষা থেকেই বোঝা যায়। এই বংশের গর্গ পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম নামের রাজাকে অখিল দিকের স্বামী করে দিয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে। গর্গের পুত্র দর্ভপানির উপদেশ গ্রহণের জন্য দেবপাল তাঁর অবসরের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তাঁকে মহার্ঘ আসন দিয়ে তবে রাজা সিংহাসনে বসতেন। এই বংশের কেদারমিশ্রের যজ্ঞে শূরপাল স্বয়ং উপস্থিত থেকে শান্তি জল নিতেন। শ্রীগুরবমিশ্রকে নারায়ণপাল মাননীয় মনে করতেন। এই গুরুবমিশ্র নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনের 'দূতক' ছিলেন।

পালরাজাদের অপর একটি সচিব পরিবারের কথা জানা যায় কমৌলি তাম্রশাসন থেকে। এই বংশের যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপালের সচিব ছিলেন। তাঁর পুত্র বোধিদেব রামপালের সচিব ছিলেন। বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব গৌড়েশ্বরের প্রিয় বন্ধু ছিলেন এবং প্রধান অমাত্য হিসেবে সর্বদা রাজাকে রক্ষার চেষ্টা করতেন। তিম্‌গদেবের বিদ্রোহ দমনের জন্য এই বৈদ্যদেবকে আসামে পাঠানো হয়েছিল। তিনি বিদ্রোহ দমন করে নিজেকে সেই রাজ্যের মহীপতি বলে ঘোষণা করলেন। তবে তাঁর তাম্রশাসনে প্রাক্‌জ্যোতিষকে 'ভুক্তি' বলায় বোঝা যায় যে পালশাসকের নামের ব্যাপারে তিনি নীরব থাকলেও তিনি পালরাজাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক বিভাগের উচ্চ রাজপদাধিকারী কর্মচারী। মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব বারাণসীতে শিব মন্দির তৈরি করেছিলেন। মনহলি তাম্রশাসন প্রকাশিত হবার সময় তিনি ছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক। ঐ তাম্রশাসনের 'দূতক'ও তিনিই ছিলেন।

এই সমস্ত বিশিষ্ট পদাধিকারীরা ছাড়াও রাজাকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাজকর্মচারী ছিলেন। পালরাজাদের তাম্রশাসনে এইসব পদের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। তাঁদের সকলের প্রশাসনিক দায়িত্বের কথা তাঁদের পদ-নাম থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তবু পাল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা এইসব তালিকা থেকেই পাওয়া যায়। পালদের প্রত্যক্ষ শাসনভুক্ত অঞ্চল কয়েকটি 'ভুক্তি'তে বিভক্ত ছিল। ভুক্তিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয় এবং বিষয়গুলি অন্যান্য ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। এইসব বিভাগের বিবরণ ও কর্মচারীদের তালিকা থেকে মনে হয় যে, শাসনকাঠামো স্তর বিন্যস্ত ছিল। যেমন, সামন্তদের নিজস্ব একটি অভ্যন্তরীণ শাসনসংক্রান্ত কর্মচারী পরিকাঠামো ছিল; পাল সম্রাটের কেন্দ্রীয়

শাসন চালাবার জন্য একশ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগের কাজকর্ম চালাবার জন্য আলাদা কর্মচারী থাকতেন।

বাংলার পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, দণ্ডভুক্তি, বিহারের তীরভুক্তি শ্রীনগরভুক্তি এবং আসামের প্রাক্জ্যোতিষ ভুক্তির নাম পালযুগের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পরবর্তী বিভাগ হিসেবে একবার ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল এবং আর একবার স্থালীক্কট বিষয়ের নাম পাই। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল মহন্তাপ্রকাশ বিষয়, আর স্থালীক্কট বিষয়ের অন্তর্গত ছিল আম্রষণ্ডিকামণ্ডল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভুক্তি বিষয়ে না মণ্ডলে বিভক্ত হবে সে সম্পর্কে পালদের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে আবার অন্য ধরনের বিভাগের নাম পাই। এক্ষেত্রে জমি দেওয়া হয়েছিল শ্রীনগর ভুক্তিতে। এই ভুক্তির অন্তর্গত ছিল রাজগৃহ এবং গয়া বিষয়। কিন্তু রাজগৃহের ক্ষেত্রে পরবর্তী বিভাগ হিসেবে অজপুর 'নয়', পিলিপিন্কা 'নয়', অচলা 'নয়' প্রভৃতি 'নয়'র উল্লেখ পাই। গয়া বিষয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী বিভাগ বীথী। যেমন কুমুদসূত্র বীথী। 'নয়' বা 'বীথী'র অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রাম, নয় বা বীথী, বিষয় বা মণ্ডল ও সবশেষে ভুক্তি ক্রমশ বৃহত্তর রাষ্ট্র বিভাগের এককগুলির নাম ছিল।

১খ.৭.২ সৈন্যবাহিনী

পালরাজাদের সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন মহাসেনাপতি বা সেনাপতি। অনেক সময় রাজপরিবারের লোকেরাই এই পদাধিকারী হতেন। দেবপালের সেনাবাহিনীর নায়ক ছিলেন তাঁর ভাই জয়পাল। সেনাবাহিনীর সর্বনিম্ন স্তরে ছিলেন চাট, ভটরা অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী সৈনিক। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে গৌড়, মালব, খশ, কুলিক, কর্ণাট, গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সৈনিকের পদে যোগ দিতে পারতেন। বলাধ্যক্ষ এই সেনাবিভাগেরই অধ্যক্ষ হওয়া সম্ভব। কোট্টপাল ছিলেন দুর্গগুলির দায়িত্বে। মহাদণ্ডনায়কও বোধহয় এই বিভাগের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য যে পদগুলি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল সেগুলি হল গৌল্মিক, প্রান্ত পাল, নাবাধ্যক্ষ।

১খ.৭.৩ পুলিশ বিভাগ

দাণ্ডিক, দাণ্ডপাশিক এবং দণ্ডশক্তি পুলিশ বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকতে পারেন। ছোট ছোট অপরাধের শাস্তিও এই বিভাগের আধিকারিকরা দিতে পারতেন। দশাপরাধিক দশ রকম অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারতেন। চৌরোদ্ধরণিক চোর ধরা ও চোরাই মালের ব্যবস্থা করতেন। খোল ছিলেন গুপ্তচর বিভাগের অধিকর্তা।

১খ.৭.৪ মহাফেজখানা

মহাফেজখানার দায়িত্বে ছিলেন মহাক্ষপাটলিক। তাঁর অধীনে ছিল অক্ষপাটলিক ও কায়স্থরা। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে কায়স্থদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায়, খালিমপুর তাম্রশাসনে জ্যেষ্ঠ কায়স্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু পালরাজাদের অন্যান্য কর্মচারী তালিকায় আর কায়স্থদের দেখা পাওয়া যায় না। আয়ুক্তক, বিনিযুক্তক এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১খ.৭.৫ রাজস্ব বিভাগ

ষষ্ঠাধিকৃত সংজ্ঞক কর্মচারী ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহকারী। উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হত বলে রাজস্ব সংগ্রহকারীকে ষষ্ঠাধিকৃত বলা হয়েছে। তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক প্রভৃতি কর্মচারীরাও রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আযুক্তক, বিনিযুক্তক, ক্ষেত্রপ, প্রমাতৃরা জরীপ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। রাষ্ট্রের আয় নানা উৎস থেকে আসত। মূল উৎস ছিল কর। পাঁচ প্রকার করের উল্লেখ সাধারণভাবে পাওয়া যায় : ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ও উপরিকর। কৃষি ছাড়া ফেরি বা জলপথে পারাপার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অরণ্য থেকে রাষ্ট্রের আয় হত।

নৌকাধ্যক্ষ নৌকার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হাতি, ঘোড়া, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি পশুদের যিনি অধ্যক্ষ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন তিনি অবশ্যই পশুপালন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিষয়পতি ছিলেন বিষয়ের শাসক। দশগ্রামিক নিশ্চয়ই দশটি গ্রামের শাসনব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মহামহত্তর ছিলেন গ্রামের প্রতিনিধি। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, গ্রামের জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রামসভার পরামর্শ নেওয়া হত। ঐসব সভায় মহত্তর, মহত্তম সংজ্ঞক গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যেমন থাকতেন তেমনি থাকতেন সাধারণ কুটুম্বিন বা কৃষক। পালদের কোন তাম্রশাসনেই এই ধরনের গ্রামসভার উল্লেখ নেই। তবে মহামহত্তর, দশগ্রামিক ইত্যাদি পদনাম থেকে মনে হয় গ্রামসভা হয়তো একেবারে লুপ্ত হয় নি। জনজীবন ছিল শ্রেণী-বিন্যস্ত। সামাজিক স্তরে ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন আর মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডালরা ছিলেন সর্বনিম্ন স্থানে। কিন্তু ভূমিদান দলিলে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে, বিশিষ্ট এবং সাধারণ কৃষিজীবীদের সঙ্গে সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসীদেরও জমিদান সংক্রান্ত ঘোষণা জানানো হয়েছে।

পাল রাজাদের তাম্রশাসন থেকে সমকালীন ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানা যায়। পালরাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণদের অথবা মঠ-মন্দিরের জন্য নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে ধর্মপাল চারটি গ্রাম নন্ন নারায়ণের মন্দিরের ও মন্দিরের ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে দান করেছিলেন। ধর্মপালের নালন্দা তাম্রশাসনে আর্যতারা ভট্টারিকার দেবমন্দিরের জন্য গ্রামদানের উল্লেখ আছে। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ সুবর্ণদ্বীপাধিপতি বালপুত্রদের প্রতিষ্ঠিত নালন্দার বিহারের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রামদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে জনৈক ব্রাহ্মণকে গ্রামদানের উল্লেখ আছে। মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে একটি বৌদ্ধ বিহারে জমিদানের কথা বলা আছে। শূরপালের একটি তাম্রশাসনে বারাণসীতে রাজামাতা মাহটাদেবী প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও সেখানকার পাশুপত আচার্যদের জন্য চারটি গ্রামদানের কথা আছে। নারায়ণপালের ভাগলপুর তাম্রশাসনেও উত্তর বিহারের একটি শিবমন্দির ও পাশুপত আচার্য পর্ষদের জন্য গ্রামদানের কথা আছে। দ্বিতীয় গোপালের জাজিলপাড়া তাম্রশাসন একটি শিবমন্দিরের জন্য দু'টি গ্রামদানের দলিল। প্রথম মহীপালের রাজত্বের দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। অবিভক্ত দিনাজপুর থেকে দুটিই ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের দলিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। দুটির মাধ্যমে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে দুজন ব্রাহ্মণকে জমিদানের কথা লেখা আছে। অপর একটিতে বিহারের তীরভুক্তিতে জনৈক ব্রাহ্মণকে জমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মদনপালের মনহলি তাম্রশাসনের মাধ্যমে পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে মহাভারত পড়ে শোনাবার দক্ষিণা হিসাবে ব্রাহ্মণ বটেশ্বরস্বামীকে জমি দান করা হয়েছিল। মদনপালের পরবর্তী কোন পালরাজার রাজত্বকালের জমিদানের উল্লেখ সহ তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি।

এই সমস্ত জমি শুধু নিষ্কর ছিল তাই নয়, দানগ্রহণকারীরা আর কী কী অধিকারে পাবেন তাও তাম্রশাসনগুলিতে বিশদভাবে বলা আছে। যেমন, খালিমপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে কেবলমাত্র চারটি গ্রামই দেওয়া হয় নি, একটি হাট ও তলপাটকও দেওয়া হয়েছিল। দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনের মাধ্যমে মেষিকা গ্রাম দেওয়া হয়েছিল "তৃণ-যুতি গোচর পর্যন্ত" সীমা নির্ধারণ করে। সেখানকার আম্র-মধুক-জল-স্থল-মৎস্য, তৃণ ইত্যাদি সবকিছুর উপর দান-গ্রহীতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। দশপরাধ, চৌরোদ্ধরণ ইত্যাদির জন্য শাস্তিদান ও অন্যান্য ব্যবস্থা করবার অধিকারও তাঁদের ছিল। তাঁদের রাজাকে কিছু দিতে হত না। এমনকি রজার সৈন্যদেরও ঐ গ্রামে ঢুকবার অনুমতি ছিল না।

এই জমিদান প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বিতর্কের উল্লেখ করা উচিত। রামশরণ শর্মা ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে এই জমি-দান প্রথার প্রসার হয় গুপ্তযুগ থেকে। এর আগে জমি দানের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তা ছিল সীমিত। এই জমিদান প্রথার প্রসারে এঁরা রাষ্ট্রক্ষমতার অবক্ষয়ের ছবি খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন কারণে এই সময় থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনের প্রয়োজনীয় রাজস্বাদি সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে এঁরা মনে করেন। ফলে রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ, ধর্মীয় সংস্থা ও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের ভূমিদান করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত অঞ্চলের শাসনক্ষমতাও তাদের হাতে অনেকাংশে তুলে দেয়। এইভাবে রাজা ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে নানা ধরনের স্বত্বভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠে ও সামন্তপ্রথার মতো রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠে। ইউরোপের সামন্তপ্রথার সঙ্গে ভারতীয় কাঠামোর সম্পূর্ণ মিল না থাকায় রামশরণ শর্মা একে "ভারতীয় সামন্ততন্ত্র" আখ্যায় ভূষিত করতে চান।

পালযুগের ভূমিদানের দলিল থেকে শর্মা তাঁর সমর্থনে তথ্য পেয়েছেন। তিনি মনে করেন যে দানগ্রহীতারা শক্তিশালী ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং নানা ধরনের কর আদায় করে কৃষকদের উৎপীড়ন করতেন। অর্থনৈতিক সুবিধার সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতা যুক্ত করে রাষ্ট্র দানগ্রহীতাদের সামন্তশ্রেণীতে পরিণত করে। যেমন, গ্রহীতাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, তারা গ্রামের অধিবাসীদের দশাপরাধের জন্য জরিমানা করতে পারবে। দশ অপরাধ হল— (১) কোন জিনিসে অধিকার না থাকলেও তা নেওয়া; (২) বিচারকের আদেশ ছাড়া কাউকে হত্যা করা; (৩) পরদারগমন; (৪) অনুচিত বাক্য প্রয়োগ; (৫) মিথ্যাচরণ; (৬) কুৎসা রটনা; (৭) অসংলগ্ন কথা বলা; (৮) অপরের সম্পত্তির উপর লোভ; (৯) অলীক বস্তুর চিন্তা; (১০) অসত্যের প্রতি আসক্তি। রামশরণ শর্মা বলেন যে, "এই তালিকায় পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত প্রায় সমস্ত অপরাধই এসে যায়।" তিনি আরও বলেছেন যে, দশাপরাধ দন্ডের অর্থ করা হয় যে এই দশ রকমের অপরাধের জন্য জরিমানা আদায়। কিন্তু যদি 'দণ্ড' শব্দটির 'জরিমানা' অর্থ না গ্রহণ করে 'শাস্তি' অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে "স্বীকার করতে হয় যে ভোক্তাগণ এই সকল অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিকে দৈহিক বা কায়িক উভয় প্রকারের দণ্ডই দিতে পারত। এইভাবে দানগ্রহীতাকে ফৌজদারী মামলার বিচার সম্বন্ধীয় অধিকারদানের এই প্রথা অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে শুরু হয়ে পাল সাম্রাজ্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল"।

পাল তাম্রশাসনে রাজকর্মচারীদের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে অবশ্য শর্মা ধারণা করেছেন যে, বিহার ও বাংলাদেশ জুড়ে তাঁদের সাম্রজ্যের বৃহত্তর অংশের শাসন এইসব রাজকর্মচারীদের মাধ্যমেই পরিচালিত হত। "তারা রাজ্যের নানান স্থানের লোকেদের কেন্দ্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।"

রামশরণ শর্মা মনে করেন যে, এই সময় রাষ্ট্রব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছিল। তার প্রধান প্রমাণ

মুদ্রা ব্যবহার হ্রাস পাওয়া। চারশো বছরেরও বেশি সময় পালরাজারা রাজত্ব করা সত্ত্বেও তাদের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নি। "মধ্যকালীন স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রার অভাব কিছু আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় না" বলে শর্মা মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ অনেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই মতবাদ স্বীকার করে না। পালরাজাদের জমিদানের মাধ্যমে রাজার অধিকার খর্ব হয়েছিল, রাজশক্তি দুর্বল হয়েছিল এ কথা তাঁরা মানেন না। দীনেশচন্দ্র সরকার তা মনে করেন না যে জমিদানের ফলে রাজার রাজস্বের উৎস সংকুচিত হয়েছিল। তিনি মনে করেন যে, প্রাচীন ভারতীয় রাজাগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনের বেশিরভাগই পূণ্যলোভী ব্যক্তিদের কাছ থেকে ভূমির মূল্য নিয়ে দেওয়া হত। তাতে ভূমিদান জনিত পুণ্যলাভ হত রাজার এক-ষষ্ঠাংশ এবং ভূমিক্রেতার পাঁচ-ষষ্ঠাংশ"। অর্থাৎ খালিপুর তাম্রশাসনের মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা শুভস্থলীতে নন্ন-নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ঐ মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুরোহিতদের জন্য ভূমিদান করার জন্য ভূমির মূল্য রাজকোষে জমা দিয়েছিলেন। দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনের উল্লেখ করে সরকার বলেছেন যে, দেবপাল বালপুত্রদেবের প্রার্থনানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। কিন্তু "এই নিষ্কর সম্পত্তি সৃষ্টির জন্য বালপুত্রকে পাল রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল।"

তাছাড়া, সরকারের মতে, ভূমিদান গ্রহণকারীরা ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণ বা মন্দির মঠের মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং রাজকীয় ক্ষমতা এদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্তদের প্রভাব ছাড়া 'আমলাতন্ত্র' ইত্যাদির ছায়া একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় স্পষ্টরূপে প্রতীয় হয়। সাধারণ জনজীবন এই স্তর বিভক্ত শাসনবিন্যাস সম্ভবত প্রভাব রেখে যায়।

১খ.৭.৬ মুদ্রাব্যবস্থা

পালরাজাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা না পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা মানতে সরকার ও তাঁর অনুগামীরা নারাজ। গুপ্তযুগে যেমন তেমনি পরবর্তী যুগেও সাধারণ বেচা-কেনার মাধ্যমে হিসেবে কড়ির বহুল প্রচলন ছিল। এছাড়া পূর্ববর্তী রাজাদের মুদ্রা বাজারে থাকায় নতুন করে মুদ্রা তৈরি করবার প্রয়োজনীয়তা পালরাজারা অনুভব করেন নি।

এই বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পালযুগের রাষ্ট্রকাঠামো ও সমাজব্যবস্থার সর্বসম্মত কোন রূপরেখা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে কোন রাজবংশই পালরাজাদের মতো এত দীর্ঘকাল বাংলা শাসন করেনি। বাংলার অঞ্চলিক ইতিহাসে তাই পাল শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১খ.৮ সেনদের শাসনকাঠামো

পালরাজাদের মতো সেনবংশীয় রাজারাও পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি নিতেন। এছাড়াও প্রত্যেক সেনরাজার বিশেষ একটি বিরুদ ছিল। বিজয়সেন ছিলেন অরিরাজবৃষভশঙ্কর, বল্লালসেন ছিলেন অরিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্কর, লক্ষ্মণসেন ছিলেন অরিরাজ মদনশঙ্কর। বিশ্বরূপ সেন তাঁর প্রপিতামহের মতো অরিরাজবৃষভশঙ্কর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এই উপাধিগুলি থেকে সেনরাজাদের শৈবধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোঝা যায়। সেনরাজাদের

সীলমোহরেও ছিল সদাশিবের প্রতিকৃতি। লক্ষণসেনের উপাধি সম্ভবত তাঁর বৈষ্ণব ধর্মাসক্তির কথাও বলে। তিনি পিতা বা পিতামহের মতো 'পরমমাহেশ্বর' ছিলেন না; তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

১খ.৮.১ প্রশাসনিক বিভাগ

সেন রাষ্ট্রও বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। সেনদের তাম্রশাসন থেকে তিনটি ভুক্তির নাম জানা যায়— (১) পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি (২) বর্ধমান ভুক্তি এবং (৩) পঙ্ক গ্রামভুক্তি। বিহার থেকে সেন আমলের মূর্তিলেখ পাওয়া গেলেও কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ কথা অনুমান করা যেতে পারে যে সেনরাজাদের প্রত্যক্ষ শাসন বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিহারের কোন কোন অংশ তাঁরা পলপালের মতো সামন্তদের মাধ্যমে শাসন করতেন। গুপ্ত আমলে রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি। পাল আমলে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র উত্তরবঙ্গই ভুক্তিটির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হয়ে ওঠে। মালদার জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনের ভূমিও পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। কিন্তু সেনযুগের পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার বৃহত্তর অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলের বারোটি তাম্রশাসনের মধ্যে নয়টিই পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত জমির দানের দলিল। বর্ধমান ভুক্তির মধ্যে ছিল রাঢ় অঞ্চল। পরে এই অঞ্চল ভেঙে দু'টি ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপর ভুক্তির নাম হল কঙ্কগ্রাম ভুক্তি। কঙ্কগ্রাম ভুক্তির প্রধান নগর বোধহয় ছিল রাজমহলের কাঁকজোল। সেনরাজাদের দেওয়া অন্তত দু'টি জমি বর্ধমান এবং একটি কঙ্কগ্রাম ভুক্তির অন্তর্গত ছিল বলে তাম্রশাসন থেকে জানা যায়।

সেনরাজাদের তাম্রশাসনেও ভূমিদান প্রসঙ্গে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পদাধিকারীদের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় রাজা, রাজকন্যাদের পরেই যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি মহিষী বা রাজ্ঞী। এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাল তাম্রশাসনে রানীদের জন্য তালিকায় কোন স্থান নির্দিষ্ট ছিল না। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এই রানীরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও করতেন। বিজয়সেনের আমলের একটি তাম্রশাসনের ভূমি দিয়েছিলেন সম্ভবত রাজ্ঞী বিলাসদেবীই, তাঁর কনক-তুলাপুরুষ দান উপলক্ষ্যে। বল্লালসেনের আমলের একমাত্র তাম্রশাসনও এই বিলাসদেবীর নামের সঙ্গেই যুক্ত। রাজমাতার সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের সময় হেমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণা হিসাবে এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্মণসেনের আমলের ভাওয়াল তাম্রশাসনের ভূমি দেওয়া হয়েছিল শ্রিয়াদেবী ও কল্যাণদেবী নামের মহিষীদের পুণ্যের জন্য। বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসনে যেসব ভূমিদানের উল্লেখ আছে তার একটি রাজমাতার চন্দ্রগ্রহণ দেখার উপলক্ষ্যে দেওয়া।

চন্দ্র, বর্মন এবং কম্বোজবংশীয় রাজাদের তাম্রশাসনেও রাজ্ঞীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং সেনদের তাম্রশাসনে রাজ্ঞীদের উল্লেখ একক দৃষ্টান্ত না হলেও গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক একইভাবে বর্মন ও কম্বোজবংশীয় রাজাদের শাসনের মতো সেনরাজাদের তাম্রশাসনের তালিকাভুক্ত পুরোহিতরাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সামাজিক পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন। প্রথম দিকের পালরাজারা ছিলেন পরমসৌগত বা বৌদ্ধ। পরবর্তীকালে পালরাজারা শৈবধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁদের তাম্রশাসনেও পুরোহিতদের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান ভূমিদান প্রসঙ্গে তালিকাভুক্ত হয় নি। সেনরাজারা প্রথম থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাই তাঁদের তাম্রশাসনে রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাত্যের পরেই পুরোহিতের স্থান নির্দিষ্ট হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে তিনি মহাপুরোহিত পদ নামে অভিহিত হতেন।

পাল আমলের মতো সেনরাজাদের শাসনপর্বেও প্রশাসনিক বিভাগগুলি একই ছাঁচের ছিল না। যেমন, বিজয় সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে দেওয়া ভূমিখণ্ড ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির খাড়ী বিষয়ের ঘাসসম্ভোগ ভাট্টবড়া গ্রামে। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনের জমি ছিল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলের স্বল্প দক্ষিণ বীথির বাল্লাহিট্‌ঠা গ্রাম। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত দানের জমি ছিল বর্ধমান ভুক্তির পশ্চিম খাটিকার অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরকের বিড্ডারশাসন গ্রাম। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসনটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে দামরবড়াপাটক ও বিজহারপুরপাটকের ছয় পাটক জমি দান করা হয়েছিল। এই জমি কঙ্কগ্রামভুক্তির মধুগিরি কুম্ভীনগর সম্বন্ধ এবং দক্ষিণ বীথির অন্তর্গত কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। এছাড়াও ভূমিব্যবস্থার এককগুলি সব স্থানে সমানভাবে বিন্যস্ত ছিল না, তবে এই নামগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের নথি থেকে পাওয়া যায়। এইভাবে ভুক্তি বিষয় অথবা মণ্ডলে, মণ্ডল বীথিতে, বীথি চতুরকে এবং চতুরক গ্রামে বিভক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

১খ.৮.২ রাজকর্মচারী

ভুক্তির শাসনকর্তাকে বোধহয় এই সময় বলা হত বৃহৎ-উপরিক। বিষয়ের অধিকর্তা ছিলেন বিষয়পতি। মহাধর্মাধ্যক্ষ বোধহয় বিচারব্যবস্থার অধিকর্তা ছিলেন। মহামুদ্রাধিকৃত পাল আমলের কর্মচারী তালিকায় স্থান পাননি। তিনি বোধহয় রাজকীয় সিলমোহরের দায়িত্বে ছিলেন। মহাসর্বাধিকৃত নামক পদটিও নতুন। ইনি হয়তো শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

যে সমস্ত রাজকর্মচারীদের নাম পাল ও সেন উভয় আমলের তালিকাতেই পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ, রাজন্যক, রাণক, রাজপুত্র, সেনাপতি, ভোগপতি বা মহাভোগির, দৌঃসাধনিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলাধ্যক্ষ, গোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক। কর্মচারী তালিকার এই মিল থেকে মনে হয় যে প্রশাসনের পরিকাঠামোতে সেন আমলে আমূল কোন পরিবর্তন করা হয় নি। পাল আমলের শাসনব্যবস্থারই তাঁরা উত্তরাধিকারী ছিলেন। যদিও পাল আমলের তুলনায় সেনরাজাদের কর্মচারী তালিকার দৈর্ঘ্য কম, তবুও তার থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে পালযুগের অন্যান্য পদগুলি সেন পর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেনদের তাম্রশাসনে কর্মচারী তালিকাটি দেওয়ার পর বলা হয়েছে যে রাজাদেশ অন্যান্য অধ্যক্ষদেরও জানানো হচ্ছে যদিও সকলের উল্লেখ তালিকায় করা সম্ভব হয় নি। তবে কিছু পুরোনো পদের বিলুপ্তি ও নতুন পদের সৃষ্টির সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদের তুলনামূলক উচ্চতর অবস্থান। সেন আমলে সামরিক বিভাগে মহাগণস্থ, মহাব্যুহেপীতি মহাপীলুপতি, পদগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১খ.৮.৩ ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থা

তাম্রশাসনগুলির ভিত্তিতে সেন আমলের ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহকে যদি কৃষক বিদ্রোহ বলে ধরা যায় তবে এ কথা নিশ্চিত যে প্রথম দিকের পালরাজারা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও পরবর্তী পালরাজাদের আমলে কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বিজয়সেন এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন তাঁর প্রধান প্রমাণ তাঁর রাজত্বকালের তাম্রশাসনের স্বল্পতা। তাঁর বাষট্টি রাজ্যবর্ষের একটি মাত্র ভূমিদান দলিল পাওয়া গেছে।

সে জমিও রাজ্ঞী বিলাসদেবীর অধিকারভুক্ত জমি থেকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। জমিদানের সময়সীমা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

বিজয়সেন সম্ভবত ভূমির পরিমাপের ক্ষেত্রে সমতা আনার চেষ্টা করে একটি বিশেষ 'ণল'-এর মাপের সূচনা করেছিলেন। এটি তাঁর উপাধি অনুসারে 'বৃষভ-শঙ্কর-ণল' নামে পরিচিত। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র এই 'ণল'-এর প্রচলন করা সেন আমলেও সম্ভব হয় নি। বিজয় সেনের আমলের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনে অবশ্য অন্য একটি ণলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খাড়ী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল সমতটীয় ণল। চন্দ্ররাজাদের তাম্রশাসনেও বঙ্গ অঞ্চলে সমতটীর ণলের প্রচলনের কথা জানা যায়। রাঢ় অঞ্চলে 'বৃষভ-শঙ্কর-ণলের'র ব্যবহারের কথা বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে বলা হয়েছে। বাগড়ি অঞ্চলেও এই ণলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এ ছাড়াও অন্য ধরনের ণলের ব্যবহার বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের 'অষ্ট-নবক-ণলের'র ব্যবহার বোধহয় এ যুগে আর ছিল না। কোন তাম্রশাসনেই এর উল্লেখ নেই।

ভূমির পরিমাপসূচক অনেক শব্দের কথা সেনরাজাদের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। পাটক, খাড়ী, কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, উন্মান ও কাকলীর মধ্যে মাপের পার্থক্য বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা সম্ভব হয়েছে।

৪ কাকনী = ১ উন্মান বা উদান

৫০ উন্মান = ১ আঢ়বাপ

৪ আঢ়বাপ = ১ দ্রোণবাপ

৮ দ্রোণবাপ = ১ কুল্যবাপ

১৬ দ্রোণবাপ ১ খাড়ী

৪০ দ্রোণবাপ = ১ পাটক

পরবর্তীকালে চন্দ্ররাজাদের আমলে ১০ দ্রোণের পাটকের প্রচলন করা হয়েছিল। উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে 'দ্রোণ' দিয়েই প্রধানত জমির মাপ হত। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলের মাপে আঢ়বাপের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। সেন তাম্রশাসনের ছোট ছোট ভূমিমাপের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে জমির উপর অধিকারবোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং প্রত্যেক ভূখণ্ড সুনির্দিষ্ট মাপে সীমা চিহ্নিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে সেন আমলের গোড়ায় জমি ও গ্রাম জরিপের একটি চালু ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল। জমিজমা সংক্রান্ত দলিল বিষয়ক একটি পদ হয়তো মহামুদ্রাধিকৃত নামে পরিচিত ছিল। এই কর্মচারীটির দায়িত্ব ছিল প্রতিটি দলিলে রাজকীয় সীলমোহর অঙ্কিত করা।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে পরবর্তী সেনরাজারা ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের উপর যথেষ্ট সচেতন দৃষ্টি দিতে পারেননি। তাম্রশাসন থেকে তিন ধরনের জমির কথা জানা যায়— (১) বাস্তুক্ষেত্র, যেখানে বসতবাড়ি তৈরি হয়, (২) বাপক্ষেত্র বা নালক্ষেত্র, যে জমিতে চাষ-আবাদ হয়, এবং (৩) খিলক্ষেত্র বা অনাবাদী জমি, গুপ্তযুগে খিলক্ষেত্রকে বাপক্ষেত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে অল্প দামে এ ধরনের জমি বিক্রির দলিল পাওয়া গেছে। কিন্তু পাল-সেনযুগের এ ধরনের কোন ছবি তাম্রশাসনে ধরা পড়ে নি।

গুপ্তযুগের তাম্রশাসন থেকে মনে হয় সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা হত। এ ছাড়াও জমির জন্য খাজনা দিতে হত। পালযুগের 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামক কর্মচারীও এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ধর্মপালের পরবর্তী কোন পালরাজার অথবা সেনরাজার কর্মচারী তালিকায় এই পদের উল্লেখ না থাকায় আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধা হয়। পরবর্তী পালরাজাদের তাম্রশাসন ও প্রথম দিকের সেনরাজাদের তাম্রশাসন একসঙ্গে পড়লে মনে হয় সেনরাজারা তাঁদের পূর্ববর্তী পালরাজাদের রাজস্বব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন। যেমন, তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগাঁও তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে প্রদত্ত ভূমিখণ্ড থেকে বছরে পাঁচশো 'পুরাণ' রাজস্ব আয় হত। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনেও বলা হয়েছে যে প্রদত্ত ভূমির বাৎসরিক আয় ছিল দুশো 'কপর্দ্দক পুরাণ'। অর্থাৎ, বিশেষ পরিমাণের কড়ির গণনায় বছরের রাজস্ব আয় নির্ধারিত হত। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে প্রতি দ্রোণতে পনেরো 'পুরাণ' আয় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা যদি সেন রাজত্বের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত করা হয়ে থাকে তবে মনে করা উচিত যে জমিপ্রতি আয় আগেই নির্ধারিত হত এবং কৃষককে সেই অনুযায়ী রাজস্ব দিতে হত, প্রতি বছরের উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রতি বছর রাজস্ব নির্ধারিত হত না। তবে লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি তাম্রশাসন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক জমির ক্ষেত্রে একই হারের রাজস্ব-আয় নির্দিষ্ট হত না। সম্ভবত জমির উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন জমির বিভিন্ন রাজস্বসীমা নির্ধারণ করা হত।

সাধারণের ব্যবহার করা রাস্তা, গ্রামের গোচারণ-ভূমি ইত্যাদি রাজস্ব আয়ের তালিকার বাইরে ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জমি এমনকী সংলগ্ন বনাঞ্চলও রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচার্য ছিল। বিশ্বরূপ সেনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসনের ভিত্তিতে বলা যায় যে বিভিন্ন ধরনের জমি থেকে বিভিন্ন হারে রাজস্ব আদায় করা হত। এই তাম্রশাসনের মাধ্যমে যে জমি দেওয়া হয়েছিল তার বাৎসরিক আয় ছিল আশি পুরাণের কিছু বেশি। তার মধ্যে ৪$^{৩}/_{৪}$ উদানের বাস্তুজমির রাজস্ব ছিল উদানপ্রতি ১$^{৩}/_{৮}$ পুরাণ। দুই উদানের 'নাল' জমির রাজস্ব ছিল উদানপ্রতি ১$^{১}/_{৮}$ পুরাণ। জমির রাজস্ব নির্ধারণ করার সময় পানের বরজ, কলা, নারকেল, সুপারী গাছেরও হিসাব নেওয়া হত। নতুন ও পুরনো বরজের হিসাব রাখা হত। ফল-ফলাদির হিসাবও রাখা হত বলে মনে হয়।

যে সমস্ত জমি ব্রাহ্মণদের দান করা হত তা ছিল সাধারণত নিষ্কর। ঐ জমির থেকে যে রাজস্ব রাজার রাজকোষে জমা পড়ার কথা ছিল তা রাজা দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণদের ভোগ করার অধিকার দিতেন। কখনও কখনও এ ধরনের নিষ্কর জমি একজন ব্রাহ্মণের অধিকার থেকে নিয়ে অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হত। এ ধরনের নিষ্কর জমি যদি কোন ব্রাহ্মণ অপর কোন ব্রাহ্মণকে বিক্রি করতেন তবে সেই জমি আর নিষ্কর থাকত না, যদি না সেই জমি আবার রাজা নিষ্কর বলে ঘোষণা করতেন। বিশ্বরূপ সেনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে যে রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের ১২$^{৩}/_{৪}$ দানের নিষ্কর জমি পণ্ডিত হলায়ুধ কিনে নিয়েছিলেন।

রাজা, রানী, রাজপুত্ররাও জমি ভোগ করতেন, অর্থাৎ ঐ সমস্ত জমি থেকে আয় তাঁদের ব্যক্তিগত খরচের জন্য নির্দিষ্ট হত। ঐ সমস্ত জমি থেকে তাঁরা দানও করতেন এবং অনেক সময় সেইসব দানের জমি 'নিষ্কর' বলে ঘোষণা করা হত। বিজয়সেনের স্ত্রী ও বল্লালসেনের মা বিলাসদেবীকে দু'বার নিষ্কর জমি দান করা হয়।

বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তিরাও তাঁদের জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত জমি দান করতেন। সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্রিসিংহ হলায়ুধ নামের ব্রাহ্মণপন্ডিতকে জমিদান করেছিলেন এবং সে জমি 'নিষ্কর' ঘোষিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ছাড়া দেবতা, মঠ, মন্দিরের জন্যও নিষ্কর জমি দেওয়া হত। কখনও কখনও দানের জমি সম্পূর্ণ নিষ্কর করার পরিবর্তে অল্প রাজস্ব ধার্য করা হত।

সেন আমলের তাম্রশাসনগুলি পড়লে মনে হয় যে বিজয়সেন, বল্লালসেনের মতো রাজারা রাজস্ব বিভাগটি শক্তিশালী করার চেষ্টা করলেও তাঁদের সে চেষ্টা সার্থক হয় নি। প্রথম দিকের সেন তাম্রশাসনে নলের ব্যবহার জমির মাপ ও সীমা সম্পর্কে যে ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করতে দেখা যায় তা লক্ষ্মণসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না। প্রথম দু'জন নিষ্কর ভূমিদানের ক্ষেত্রেও যে সংযম দেখিয়েছেন তা লক্ষ্মণসেনের আমল থেকে আর দেখা যায় না। কেবলমাত্র লক্ষ্মণসেনের আমলে রাজস্ব বিভাগের কাজ যে অত্যন্ত শিথিলভাবে চলতো তাম্রশাসনগুলি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেন আচার্য কুবেরকে ছয় 'পাটক' জমি দিয়েছিলেন। রাজস্ব বিভাগ তাঁকে জানায়-ই নি যে ঐ জমি তাঁর বাবা গয়াল ব্রাহ্মণ হরিদাসকে আগেই দান করেছেন। এই ত্রুটি আবিষ্কৃত হবার পর নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হল। বিশ্বরূপ সেনের আমলেও একই রকমের ঘটনা ঘটতে দেখি। ১৩২ পুরাণ বা চূর্ণি আয়ের একটি ভূখণ্ড বিশ্বরূপ দেবশর্মন নামের ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছিল। পরে দেখা গেল যে ঐ জমি আসলে কন্দর্প-শঙ্কর আশ্রমের নিজস্ব।

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনের মাধ্যমে বর্ধমানভুক্তির পশ্চিম খাটিকা অঞ্চলের ৬০ দ্রোণ এবং ১৭ উন্মান পরিমাণ জমি জনৈক ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছিল। দ্রোণপ্রতি ১৫ পুরাণ ছিল রাজস্ব এবং ঐ জমির রাজস্ব আয় ছিল নশো পুরাণ। কিন্তু আমরা হিসাব করলে দেখতে পাই যে দ্রোণপ্রতি পনেরো পুরাণ রাজস্ব ধার্য করলে ষাট দ্রোণেরই আয় হয় নশো পুরাণ। অর্থাৎ বাকী সতেরো উন্মান পরিমাণ জমির রাজস্বের কোন হিসাবই ছিল না।

ব্যক্তিগত জমির ঊর্ধ্বতন সীমাও নির্দিষ্ট করা ছিল না। ফলে, প্রভাবশালী ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা দান ও ক্রয়ের মাধ্যমে বিশাল জমির অধিকারী হয়ে বসতেন। যেমন ধরা যাক হলায়ুধ পন্ডিতের কথা। রাজা তাঁকে 'নিষ্কর' জমি দান করেছেন। তিনি নিজেও নানা ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কিনেছেন এবং সেই সব জমিও 'নিষ্কর' বলে ঘোষিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যে নানাভাবে রাজার ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করতেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

বহিরাগত তুর্কীসেনাদের আক্রমণে বাংলায় সেনদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু এই পতনের বীজ বোধহয় নিহিত ছিল লক্ষ্মণসেন ও তাঁর উত্তরসূরিদের শাসনকাঠামোর দুর্বলতায়। ভূমি ও রাজস্বের মতো বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগেই যখন এত গাফিলতি তখন অন্যান্য বিভাগের শাসনব্যবস্থা যে কতদূর শক্তিশালী ছিল তা ধারণা করা কঠিন। এ ছাড়া এরকমও দেখা যায় যে বিষয়পতিগণ মাঝে মাঝে প্রজাদের উৎপীড়ন করতেন। ভাট ভাইগণও নানারকম চাপ সৃষ্টি করতেন। প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। সদুক্তিকর্ণমৃত বা সহজিয়া দোহাগুলি থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের ছবি পাওয়া যায়। সম্ভবত শাসনবিভাগেই দুর্বলতা, অরাজকতা, ব্রাহ্মণ বা সামন্ত বা বিষয়পতিগণের উৎপীড়ন এ সবই রাজ্য শাসনকাঠামোকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

১খ.৮.৪ উপসংহার

সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলায় আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক সমাজের সম্প্রসারণ হয়। বন কেটে বসতি গড়া হয়। পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম, সমতটের বিভিন্ন অঞ্চল মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়ে ওঠে। শশাঙ্কের মতো শক্তিশালী রাজা হয়তো এই সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চলের উপর তাঁর অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে বাংলায় শক্তিশালী শক্তির অভাব হয়েছে সেই সময়ই ছোট ছোট ভূস্বামীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করেছেন। এঁরা যে শক্তিশালী কোন শাসনকাঠামো গড়ে তুলতে পারবেন না তা ধরেই নেওয়া যায়। ফলে, দেখা দিয়েছে মাৎস্যন্যায়। পালরাজারা এই অরাজকতা দূর করতে পারলেও তঁদের সাড়ে চারশো বছরের রাজত্বের সবসময়ই তাঁরা যে সমস্ত অঞ্চলগুলির উপর তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন তা নয়। দুর্বল রাজাদের আমলে সামন্তরা স্বাধীন হয়েছে, আবার ছোট ছোট ভূখণ্ড নিজস্ব শাসনব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সাথে পাল-সেন রাজাদের মতো আঞ্চলিক শক্তিকে লড়তে হয়েছে বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শক্তিশালী রাজশক্তির বিরুদ্ধে। যখন যে রাজশক্তি শক্তিমান হয়ে উঠেছে তখনই তারা তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করতে চেয়েছে, অন্যান্য অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রসারিত করতে চেয়েছে। এর ফলে পাল-সেন রাজাদের যেমন উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে তেমনি লড়তে হয়েছে উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের রাজশক্তির সঙ্গে। এই সমস্ত যুদ্ধে তাঁদের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে তাঁদের স্থায়িত্বের কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তি বা সামন্তচক্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা। কিন্তু যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল, বাংলায় যে সমস্ত রাজশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে সেনরাজাদের মতো কেউ কেউ বহিরাগত হলেও বাংলার সাংস্কৃতিক স্থিতি তাদের দ্বারা বিঘ্নিত হয় নি। শাসনকাঠামোর অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে। গুপ্তযুগের তাম্রশাসনের সঙ্গে পাল-সেনযুগের তাম্রশাসনের তুলনা করলেই এই প্রশাসনিক পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে যদিও বিভিন্ন রাজবংশের অনুসৃত শাসনপদ্ধতি বিস্তৃত আলোচনা করার মতো তথ্য অপ্রতুল। পাল আমলের তাম্রশাসনে বিপুলসংখ্যক রাজকর্মচারীর পদ ও নাম পাওয়া গেলেও শাসনকাঠামোর রূপটি পরিষ্কার নয়। পাল রাজত্বের শেষের দিকের তাম্রশাসন অর্থনৈতিক সংকটের আভাস দেয়। কৈবর্তবিদ্রোহ দমন করা হলেও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি নিশ্চয়ই ভেঙে যাচ্ছিল। সেনরাজারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ভূমি-রাজস্বনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো সতেজ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, হয়তো অনেকাংশে তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। তাই বাংলার বুকে দীর্ঘ সেন রাজত্বও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সেন- রাজাদের আমলে শাসনব্যবস্থার রাশ নিশ্চয়ই টেনে ধরা হয় নি। তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত সেনরাজাদের পক্ষে তাই বিক্রমপুর অঞ্চলেও আর দীর্ঘকাল ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তি হিসাবেও টিকে থাকা সম্ভবপর হল না।

১খ.৯ অনুশীলনী

১। শশাঙ্কের সময়ে বাংলার সমাজব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

২। দেবপালের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা দিন।

৩। সেনরাজবংশের শাসনকাঠামো আলোচনা করুন।

৪। টীকা লিখুন ঃ

(ক) মহেন্দ্রপাল

(খ) চন্দ্রবংশ

(গ) বল্লালসেন

(ঘ) পালরাজাদের রাজস্ব বিভাগ

১খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ *দ্য হিস্ট্রী অফ্ বেঙ্গাল,* প্রথম খণ্ড (১৯৪৩)।

২। নীহাররঞ্জন রায় ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদি পর্ব (১৯৮০)।

৩। দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ *পাল-পূর্বযুগের বংশানুচরিত* (১৯৮৫)।

৪। দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ *পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত,* (১৯৮২)।

৫। রামশরণ শর্মা ঃ *ভারতের সামন্ততন্ত্র* (চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী) (১৯৮৫)।

৬। দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ *সিলেক্ট ইনস্ক্রিপসনস্ বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী অ্যান্ড সিভিলাইজেশন,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৫, ১৯৮৩)।

একক ১গ ❑ সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজবংশসমূহ

গঠন

১গ.১ উদ্দেশ্য

১গ.২ প্রস্তাবনা

১গ.৩ কাঞ্চিপুরমের পল্লবরা

১গ.৩.১ সিংহবর্মন এবং সিংহবিষ্ণু (৫৫০-৬০০ খ্রিঃ)

১গ.৩.২ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিঃ)

১গ.৩.৩ প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিঃ)

১গ.৩.৪ দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন (৬৬৮-৬৭০ খ্রিঃ)

১গ.৩.৫ প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (৬৭০-৭০০ খ্রিঃ)

১গ.৩.৬ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ (৭০০-৭২৮ খ্রিঃ)

১গ.৩.৭ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২৮-৭৩১ খ্রিঃ)

১গ.৪ চোলবংশ—সূচনা

১গ.৪.১ রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৪ খ্রিঃ)

১গ.৪.২ রাজেন্দ্র চোল

১গ.৪.৩ পরবর্তী চোলশাসক

১গ.৫ চোল শিল্প স্থাপত্য

১গ.৬ চোলদের শাসনব্যবস্থা

১গ.৭ অনুশীলনী

১গ.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১গ.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কাঞ্চিপুরমের পল্লববংশীয় রাজাদের ইতিহাস
- চোল-রাজবংশের ইতিহাস
- চোলদের শিল্প স্থাপত্যের ইতিবৃত্ত এবং
- চোলদের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

১গ.২ প্রস্তাবনা

উপদ্বীপীয় ভারতের দক্ষিণ অংশে খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় দক্ষিণ ভারতে তিনটি প্রধান রাজবংশের উত্থান ও পতন ঘটেছিল। এদের মধ্যে একটি হল চালুক্যরাজবংশ। এর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল উত্তর কর্ণাটক। অন্য দুটি রাজবংশ হল পল্লব এবং পাণ্ড্য। এদের ক্ষমতার জায়গা ছিল তামিল ভাষাভাষী এলাকাগুলি। এই দুটির মধ্যে পল্লবরা, যাদের রাজধানী হল কাঞ্চিপুরম, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তী দুটি শতক জুড়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবয়ব নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। পল্লবদের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে উপরোক্ত তিনটি শক্তির মধ্যে ক্রমান্বয়ে তিক্ত সংঘর্ষ চলেছিল; কিন্তু সাংস্কৃতিক দিকে এই সময়ে দেখা গিয়েছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত ধর্মীয় 'ভক্তি' আন্দোলন। একইরকম গুরত্বপূর্ণ ছিল মন্দির তৈরির কলাকৌশলের উন্নতি।

১গ.৩ কাঞ্চিপুরমের পল্লবরা

পল্লবদের আদি ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা। সম্ভ বত অন্ধ্রে এদের আদিবাস ছিল এবং দক্ষিণে অন্ধ্রের কোনও অংশ এদের অধিকারে ছিল। প্রস্তরলিপির তথ্য থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত পল্লবরা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। পল্লবদের একটি শাখা বাসস্থান ছেড়ে আরও দক্ষিণদিকে এগিয়ে তোণ্ডাইমণ্ডলম অঞ্চলে চলে আসে এবং কাঞ্চিকে রাজধানী করে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। পল্লবশাসকদের মধ্যে এরাই অতি শীঘ্র খ্যাতি লাভ করে এবং খ্রিস্টীয় নবম শতক পর্যন্ত তাঁদের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে।

১গ.৩.১ সিংহবর্মন এবং সিংহবিষ্ণু (৫৫০-৬০০ খ্রিঃ)

সিংহবর্মন ও সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকালে কাঞ্চির পল্লবদের ইতিহাসের সূচনা। এঁরা বংশপরম্পরায় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই দুজনেরই মধ্যে সিংহবর্মন সম্পর্কে খুবই কম জানা যায়। সম্ভবত তিনি দশ বছরেরও কম সময় রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং পল্লববংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিংহবিষ্ণু। কাসাককণ্ডিলিপি অনুসারে তিনি মালয়, কালাভ্র, মালব, চোল, পাণ্ড্য এবং সিংহলের রাজাদের পরাজিত করেন। তাঁর চোলরাজ্য জয়ের কথা বেলুরপালাইয়াম লিপিতেও বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে একথা বলা যায় যে, সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকালে চোলমণ্ডলম ছিল পল্লব সাম্রাজ্যের দক্ষিণভাগ। তাঁর রাজত্বের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা বেশ কঠিন, কিন্তু তা ষষ্ঠ শতকের শেষ দশকের কোনও একসময় শেষ হয়েছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

১গ.৩.২ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (৬০০-৬৩০ খ্রিঃ)

সিংহবিষ্ণুর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রবর্মন এক বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ও উত্তর-অঞ্চলসমূহ। মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। আগেই বলা হয়েছে, এই

সময় ধর্মীয় 'ভক্তি' আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে, যার নেতৃত্বে ছিলেন শৈব্য নায়ানার এবং বৈষ্ণব আলবাররা। এই সকল সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল এবং একইসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করেছিল। এ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তাঁর রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম তোণ্ডাইমণ্ডালের পাথর কেটে মন্দির তৈরি হয়। আবার তাঁর সময়েই সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সুদৃঢ় দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারবি এবং দণ্ডিণ-এর মতো সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত পল্লব-রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পল্লবদের সময়ে কাঞ্চিপুরম শুধুমাত্র বিখ্যাত ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবেই নয়, শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল থেকে তামিল সংস্কৃতির রূপায়ণ সূচিত হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে অবশ্য মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল ব্যাপক কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অন্যদিকে, তাঁর সমসাময়িক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালেই দ্বিতীয় পুলকেশী কাঞ্চিপুরম আক্রমণ করেন এবং সম্ভবত তাঁকে পরাজিত করেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মন সংস্কৃত তামিল এবং তেলেগু ভাষায় কয়েকটি পদবী গ্রহণ করেছিলেন। এইসব পদবী সঠিক হলে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পদবীগুলির কয়েকটি হলঃ সংকীর্ণজাতি, মত্তবিলাস, বিচিত্র-চিত্ত, চিত্রকারাপ্পুলি (শিল্পীদের মধ্যে ব্যাঘ্রবিশেষ) প্রভৃতি। তবে মহেন্দ্রবর্মন যে একজন নামী লেখক ছিলেন একথা সুবিদিত, কারণ সংস্কৃত ভাষার অন্যতম ব্যাঙ্গাত্মক রচনা *মত্তবিলাসপ্রহসনম্* তাঁর রচনা। সংস্কৃত ব্যাঙ্গ রসাত্মক রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম *ভাগবদাজ্জুকীয়ম্* তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই মতের ভিত যথেষ্ট দুর্বল। তামিল শৈব্য ঐতিহ্যানুসারে প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন জৈন, পরে নায়নারদের মধ্যে অন্যতম আপ্পার-এর দ্বারা শৈবমতে দীক্ষিত হন। আপ্পারকে 'তিরুনাভাক্কারাসু' নামেও অভিহিত করা হয়। পাথর কেটে তৈরি মন্দিরের অন্তত ছয়াটি নির্মাণ-কৃতিত্ব প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের। এর সবকটিতেই লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এর মধ্যে তিরুচিরাপল্লির পাথর কেটে তৈরি মন্দিরের লেখতে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মন সিংহাসনে বসেন। ইনি 'মমল্ল' নামেই বেশি পরিচিত।

১গ.৩.৩ প্রথম নরসিংহবর্মন (৬৩০-৬৬৮ খ্রিঃ)

নরসিংহবর্মন ওরফে 'মমল্ল' পল্লবরাজবংশের স্মরণীয় শাসক ছিলেন। তাঁর লেখগুলি ছাড়াও চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে পল্লব দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কৌতূহলজনক বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পল্লবদের রাজধানীতে এসেছিলেন। সিংহলী বিবরণ 'মহাবংশ' থেকে সিংহলের রাজবংশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পল্লব হস্তক্ষেপের কথা জানা যায়। নরসিংহবর্মন তাঁর মিত্র সিংহলরাজ মানববর্মাকে সিংহাসন পেতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রথম নরসিংহবর্মনের সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক সাফল্য চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ। ৬৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় পুলকেশী দ্বিতীয়বার কাঞ্চিপুরম আক্রমণ করেন কিন্তু এবারে তাঁর বিপক্ষে ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী প্রথম নরসিংহবর্মন। তাঁর পৌত্র পরমেশ্বরবর্মনের কুমারলিপি অনুসারে, দ্বিতীয় পুলকেশীর নেতত্বে চালুক্য সেনাবাহিনী কাঞ্চিপুরমের কুড়ি মাইল ভেতরে ঢুকে আসে। অনুপ্রবেশকারী

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রথমে মণিমণ্ডলমে তীব্র সংঘর্ষ হয় এবং পল্লববাহিনী জয়লাভ করে। চালুক্যসেনা ক্রমে পিছু হটতে থাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিয়ালা এবং সুরমারাতের যুদ্ধে চালুক্যসেনার চরম পরাজয় ঘটে। অবশেষ পল্লব-সৈন্য সরাসরি বাতাপিতে প্রবেশ করে এবং শহরটি দখল করে। সকল সম্ভাবনা যাচাই করে বলা যায় যে এই যুদ্ধগুলির কোনও একটিতেও দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু ঘটে, কারণ, এরপরে তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

প্রথম নরসিংহবর্মনের বাতাপি-লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বছরে; সুতরাং বলা চলে যে ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নরসিংহবর্মন বাতাপি জয় করেন। তিনি ‘বাতাপি-কোণ্ড’ (বাতাপি-বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। পল্লবদের এই জয় চালুক্য রাজনীতিতে তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং রাজধানীটি এক দশকেরও বেশি সময় পল্লবদের অধীনে ছিল। ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য বাতাপিতে চালুক্যশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গে পল্লবদের সঙ্গে চালুক্যদের এক তিক্ত শত্রুতার সূচনা হয়, যা এরপরের প্রায় একশ বছর ধরে বজায় ছিল।

প্রথম নরসিংহবর্মন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দক্ষিণ ভারতীয় কলা এবং স্থাপত্যশিল্পে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও অবদান রেখেছিলেন। পাথর কেটে তৈরি মহাবলিপুরমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুহামন্দিরগুলি স্থাপত্যশিল্পে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও অবদান রেখেছিলেন। পাথর কেটে তৈরী মহাবলিপুরমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুহামন্দিরগুলি স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

১গ.৩.৪ দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন (৬৬৮-৬৭০ খ্রিঃ)

৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মমল্লর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন সিংহাসনে বসেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও লেখ পাওয়া যায় নি এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সময়কার বর্ণনায় তাঁকে বাঁধা গতে সামান্য প্রশংসা করা হয়েছে। গাড্ডেমান লেখতে সম্ভবত দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মনের সঙ্গে জয়সিংহের পুত্রর এবং চালুক্যরাজের ভাগনে শিলাদিত্য-এর সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে। হয়তো এই যুদ্ধেই মহেন্দ্রবর্মন প্রাণ হারিয়েছিলেন।

১গ.৩.৫ প্রথম পরমেশ্বরবর্মন (৬৭০-৭০০ খ্রিঃ)

দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মন এক সঙ্কটময় মুহূর্তে সিংহাসনে বসেন এবং পল্লব রাজনীতি তথা সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্য দিয়ে একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কুরাম লেখ, ভুন্না গুরুভায়াপালেম লেখ এবং মমল্লপুরমের বেশকিছু প্রস্তর লেখ থেকে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানা যায়।

পশ্চিমের চালুক্যদের সঙ্গে পারিবারিক শত্রুতা প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সময়েও বজায় ছিল। হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮১ খ্রিঃ) ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই পল্লবশাসক—প্রথম নরসিংহ, দ্বিতীয় মহেন্দ্র এবং প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সময়ে লড়াই চালিয়েছিলেন। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংঘাতটি ঘটেছিল ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের সিংহাসন আরোহণের মাত্র তিন বছর পরে। হোনুর লেখ এবং গাঢ় ভাল লেখ অনুসারে ৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে কাঞ্চিপুরমের কাছে মল্লিউর-

এ তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং শীঘ্রই শহর আক্রমণ করেন যাতে পল্লবরাজ পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তিনি এরপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কাবেরী নদীর তীরে উরগপুর-এ শিবির স্থাপন করেন। চূড়ান্ত পরাজয়ের পরেও নির্ভীক রাজা প্রথম পরমেশ্বরবর্মন তিরুচির কাছে পেরুভালানাল্লুর-এর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি চালুক্যরাজকে চাপে ফেলার জন্য তাঁর অন্যতম সেনাপতি পরনজ্যোতির নেতৃত্বে একটি সৈন্যদলকে চালুক্য রাজধানী আক্রমণের জন্য পাঠান। কৌশলটি কাজ করেছিল এবং কুরম লেখ অনুসারে প্রথম পরমেশ্বরবর্মন তাঁর অধিকৃত অঞ্চল থেকে চালুক্য সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাতাপির দিকে পল্লব বাহিনীর পরিচালক সেনাপতি পরমজ্যোতি পরবর্তীকালে তামিল শৈবধর্মের নায়নার-এ পরিণত হন। তাঁকে 'চিরুট্টনডার' (ছোট্ট ভৃত্য) নামে স্মরণ করা হয়।

চালুক্যদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ছাড়াও প্রথম পরমেশ্বরবর্মন তাঁর দক্ষিণের প্রতিবেশী সঙ্গেও পাণ্ড্যদের সঙ্গেও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পাণ্ড্যরাজ অরিকেশরী নরবর্মন (৬৭০-৭০০ খ্রিঃ) নেলভেলির যুদ্ধে পল্লবরাজকে পরাজিত করেন। প্রথম পরমেশ্বরবর্মন গঙ্গারাজ ভূবিক্রম-এর সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের ভালো সময়টাই আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক যুদ্ধের নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী।

প্রথম পরমেশ্বরবর্মন ছিলেন অত্যন্ত শিবভক্ত, যদিও তিনি গণেশ রথ নির্মাণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রামানুজমণ্ডলম, ধর্মাজমণ্ডলম, মমল্লাপুরমের আদি-বরাহ গুহামন্দির প্রভৃতি তাঁরই পৃষ্ঠপোষণায় নির্মিত হয়। সর্বোপরি, তিনি হলেন তামিলনাড়ুতে পাথরের মন্দিরের গঠনগত স্থাপত্যশৈলীর প্রবক্তা। কুরমের 'বিদ্যাবিনিতা-পল্লব' পরমেশ্বর-গৃহ হল তামিলনাড়ুর প্রাচীনতম গঠনগত মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শন।

১গ.৩.৬ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ (৭০০-৭২৮ খ্রিঃ)

৭০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন সিংহাসনে বসেন এবং পরবর্তীকালে 'রাজসিংহ' উপাধি দ্বারা পরিচিত হন। রাজসিংহ তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজত্ব চালিয়েছিলেন, কারণ তাঁর সময়ে চালুক্যপল্লব-পাণ্ড্য সংঘর্ষে ছেদ পড়েছিল। সেইজন্যই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সম্পদ শিল্পকলার বিকাশে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। বস্তুত, তাঁর রাজত্বকালেই তোণ্ডাইমণ্ডলের দ্রাবিড় স্থাপত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ মমল্লপুরমের সমুদ্রতট মন্দির, কাঞ্চিপুরমের কৈলাশনাথ মন্দির চত্বরে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করেন।

রাজসিংহ তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের মতো বিভিন্ন ধরনের উপাধি গ্রহণ পছন্দ করতেন। যেমন রণবিক্রম, অমিত্রমল্ল, অখণ্ডশনি, অতিরণচণ্ড, চিত্রকরমুক, সমরধনঞ্জয়, ধানসুর প্রভৃতি রাজত্বের প্রথমদিকের মতো শেষের বছরগুলি কিন্তু রাজসিংহের শান্তিপূর্ণ ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তৃতীয় মহেন্দ্রবর্মন তাঁর আগেই মারা যান। বৈকুণ্ঠপেরামল-এর প্রাচীরের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের প্যানেল থেকে একথা বলা যায় যে, তৃতীয় মহেন্দ্রবর্মন গাঙ্গারাজের সঙ্গো যুদ্ধে আহত এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন। প্যানেলে দেখা যায় যে রাজসিংহ এবং তাঁর রানীর সামনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন আহত ব্যক্তিকে শিবিকায় শুইয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই ঘটনার পর রাজসিংহ বেশিদিন বাঁচেন নি।

১গ.৩.৭ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২৮-৭৩১ খ্রিঃ)

রাজসিংহের মৃত্যুর পর সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল মাত্র তিন বছর। এর মধ্যেই পশ্চিমের চালুক্য সাম্রাজ্যের যুবরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের কাছে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে।

দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মনের মৃত্যুর পর চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা যায়। ক্ষমতা দখল করার মতো যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তের ঘটনাবলী কাঞ্চির বৈকুণ্ঠপেরামলের ঐতিহাসিক স্থাপত্যে মূর্ত হয়ে আছে। প্যানেল থেকে যোগ্য উত্তরাধিকার খোঁজার জন্য মাত্রা, মূল-পুরুষদের নিয়োগের কথা জানা যায় এবং অন্যান্যরা এ ব্যাপারে হিরণ্যবর্মন (রাজবংশের একজন সদস্য)-কে অনুরোধ জানান। তিনি যাদরেই জিজ্ঞাসা করেন, তারা সকলেই অসম্মতি জানান। শেষ পর্যন্ত হিরণ্যবর্মনের বারো বছরের পুত্র নন্দীবর্মনকে মনোনীত করা হয়। কিন্তু কাঞ্চি পৌঁছতে এবং সিংহাসনে বসতে হলে নন্দীবর্মনকে অনেক পাহাড়, নদনদী পেরিয়ে যেতে হয়। তাঁর এই মনোনয়ন মসৃণ বা শান্তিপূর্ণ ছিল না। তাঁকে পাণ্ড্যরাজ নববর্মন রাজসিংহের (৭৩০-৭৬৫ খ্রিঃ) সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। পাণ্ড্যরাজা অসন্তুষ্ট পল্লব রাজপুত্র চিত্রময়কে যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে তুলে ধরে এই যুদ্ধ করেন। তাছাড়া পল্লব রাজবংশের অন্যান্য প্রতিপক্ষের সঙ্গেও নন্দীবর্মনকে যুঝতে হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই এইসব ঘটনা একসঙ্গে ঘটে যায় এবং শেষ পর্যন্ত, ৭৩১ খিস্টাব্দে দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের পল্লবমল্লের শাসন শুরু হয়। দ্বিতীয় নন্দীবর্মনের পর পল্লববংশ দীর্ঘকাল ধরে কাঞ্চিপুরমকে কেন্দ্র করে সুদূর দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। পল্লবরাজ অপরাজিত এই বংশের শেষ রাজা যিনি আদিত্য চোলের হাতে পরাজিত ও উচ্ছেদ হন আনুমানিক ৮৯০ খ্রিস্টাব্দে।

১গ.৪ চোলবংশ—সূচনা

পল্লবরাজশক্তির প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চোল-শক্তির প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নবম শতাব্দের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দের শেষদিক পর্যন্ত চোলরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই ঐ অঞ্চলের ইতিহাস গড়ে ওঠে। অবশ্য তার আগেও চোলদের পরিচিতি কম ছিল না। অশোকের শিলালিপিতে *পেরিপ্লাস* গ্রন্থে, টলেমির বর্ণনায়, পালিগ্রন্থ *মহাবংশ*-এ এবং *মিলিন্দ পঞ্হো*-তে চোলদের বন্দর হিসেবে কোলপত্তন বা কাবেরীপত্তন এবং নেগপত্তমের উল্লেখ আছে। তবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের মূল উত্থান নবম শতাব্দে।

দক্ষিণ ভারতে চোলশক্তির প্রথম স্রষ্টা বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭১ খ্রিঃ) পল্লবরাজা নৃপতুঙ্গের সামন্তরাজা হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রিঃ) পল্লবদের অধীনতা অস্বীকার করেন। তিরুবালঙ্গারুপট্ট এবং কন্যাকুমারী লেখ থেকে জানা যায় যে, পল্লবরাজ অপরাজিতকে রাজ্যচ্যুত করে তোণ্ডাইনাদে প্রথম আদিত্য পল্লব শাসনের অবসান ঘটান এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত চোল-নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। প্রথম আদিত্য-র পুত্র প্রথম পরান্তক (৯০৭-৯৫৫ খ্রিঃ) পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করে 'মাদুরাইকোণ্ড' অভিধা নিয়েছিলেন। আবার ৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে বল্লালের যুদ্ধে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে হারিয়ে দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন 'বীর-চোল' আখ্যা। চোলগণ মাত্র দু'দশকের মধ্যে একটি বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁদের শাসন জারী করেন।

১গ.৪.১ রাজরাজ চোল (৯৮৫-১০১৪ খ্রিঃ)

রাজরাজ চোল-এর শাসন চোল রাজতন্ত্রের গঠনকাল বলা হয়। এই তামিলরাজা পাণ্ড্যদের নিঃশেষ করে, কেরলের উদ্ধত রাজাদের পরাজিত করে নৌবহরের সাহায্যে সিংহল আক্রমণ করেন। সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্বদিকে পালিয়ে গেলে রাজরাজের বাহিনী রাজধানী অনুরাধপুর ধ্বংস করে এবং পোলন্নরুবতে সিংহলীয় চোল-প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়।

৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট শক্তির অবক্ষয়ের পর দক্ষিণের গঙ্গারাজ্য মিত্রহীন হয়ে পড়ে এবং তখন রাজরাজ গঙ্গারাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মহীশূরের অন্তর্গত গঙ্গাপাড়ি, নোলম্বপাড়ি এবং তড়িগৈপাড়ি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের পূর্বউপকূলে বেঙ্গির চালুক্যদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে রাজরাজ সেখানে তার আধিপত্য ছড়িয়ে দেন। পশ্চিম উপকূলে পশ্চিম-চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয়ের রাজ্য তিনি লুঠ করেন, মান্যখেত পুড়িয়ে দেন এবং বনবাসি ও রাইচুর দোয়াবের অনেকটা এলাকা দখল করে নেন।

সামরিক দিক থেকে রাজরাজ চোলের শেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল মালদ্বীপ বিজয়। এই নৌবিজয়ের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, তার পরে রাজেন্দ্র চোল নৌবহরে যে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, তার প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছিল রাজরাজের সময়ে।

১০১২ খ্রিস্টাব্দে রাজরাজ রাজেন্দ্র চোলকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন। ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। নিজে শৈব উপাসক হয়েও তিনি সবধর্মের পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন। তাঞ্জোর রাজরাজেশ্বর শিব মন্দিরের ভাস্কর্য আর বিষ্মু মন্দিরগুলো তাঁর ধর্মীয় উদারতার সাক্ষ্য দেয়। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা শ্রী-মার বিজয়োত্তুঙ্গ তারই উৎসাহে নেগাপত্তমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ করেন। বুদ্ধের উদ্দেশে নির্মিত এই বিহারের জন্য রাজরাজ একটি গ্রাম দান করেছিলেন।

১গ.৪.২ রাজেন্দ্র চোল

১০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে দু'বছর যুবরাজ হিসেবে যুগ্মভাবে রাজরাজ চোলের সঙ্গে রাজ্যশাসন করবার পর ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে বসেছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন সমগ্র তামিলনাডু, অন্ধ্র এবং মহীশূর ও সিংহলের একাংশ, একটি সংহত রাষ্ট্রকাঠামো, দক্ষ আমলাগোষ্ঠী, শক্তিশালী সেনা ও নৌবাহিনী। রাজেন্দ্র চোল তার সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সময়ে চোল সাম্রাজ্য আয়তনে, মর্যাদায় গৌরবে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিল।

রাজত্বের পঞ্চম বছরে রাজেন্দ্র চোল সিংহল অভিযান করেন। সিংহলী ইতিবৃত্ত *মহাবংশ* থেকে জানা যায় যে, গোটা সিংহলই রাজেন্দ্র চোল অধিকার করতে পেরেছিলেন। তিরুবালঙ্গারু পট্ট অনুসারে ষষ্ঠ বছরে রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বার হন এবং পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য জয় করেন। পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য আরব বণিকদের দাপট কমানোর জন্য রাজত্বের শেষ দিকে নৌবহর পাঠিয়ে তিনি মালদ্বীপ জয় সম্পূর্ণ করেন।

পশ্চিম-চালুক্যদের বিরুদ্ধে চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অভিযান করেছিলেন বলে কয়েকটি লেখতে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। সম্ভবত বেঙ্গিরাজ চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র চোলের গাঙ্গেয় উপত্যকা অভিযানও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তা বঙ্গাভিযানের সময় যে ক'জন কর্ণাট

সামন্তনায়ক বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজনের বংশধর সামন্তসেন সেনবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া গঙ্গাতীর থেকে শৈবদের নিয়ে এসে রাজেন্দ্র চোল কাঞ্চিপুরমে তাদের বসিয়ে দেন। অভিযান শেষ করে তিনি ফিরে এসে তিরুচিরাপল্লি জেলায় নতুন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম গড়ে তুলেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের শেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল শ্রীবজয় অভিযান। মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও সংলগ্ন দ্বীপগুলো এই সামুদ্রিক রাষ্ট্রের অধীনে ছিল। চোলদের পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত আরব বণিকদের চাপে শ্রীবিজয়ের রাজা চোল-বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। তাই শ্রীবজিয় অভিযান করা ছাড়া রাজেন্দ্র চোলের আর কোন উপায় ছিল না। অভিযান ছিল সফল। শ্রীবিজয়ের রাজধানী চোল নৌবাহিনীর হাতে অগ্নিদগ্ধ হয় এবং শ্রীবিজয়ের রাজা তাদের হাতে বন্দী হন। অবশ্য আনুগত্য স্বীকারের শর্তে রাজেন্দ্র চোল তাকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

১গ.৪.৩ পরবর্তী চোলশাসক

১০৪৪ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যু হয়। তার উত্তরাধিকারীরা রাজত্ব করেন ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজেন্দ্র চোলের পরবর্তী তিন শাসক ছিলেন, তারই তিন পুত্র। তুঙ্গাভদ্রা-পরবর্তী চালুক্য ও দক্ষিণের পাণ্ড্য-কেরল রাজ্যের ধারাবাহিক বিরোধিতায় তাদের বিপর্যস্ত হতে হয়। প্রথম রাজাধিরাজের যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যু হয়। অবশেষে পূর্ব-চালুক্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে চোলদের শক্তিবৃদ্ধি করে চোলরাজ্যকে টিকিয়ে রাখা হয়। তবে রাজেন্দ্র চোলের পর চোলরাষ্ট্রের রাজনৈতিক গুরুত্ব আর ছিল না।

১গ.৫ চোল শিল্প-স্থাপত্য

চোলশিল্প স্থাপত্যের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজরাজ চোল ও রাজেন্দ্র চোল। এই শিল্প স্থাপত্যের প্রধান নিদর্শন হল প্রাসাদোপম মন্দির। এ.এল. ব্যাসাম মনে করেন, রাজপ্রাসাদের অনুকরণে তৈরি করা হত বলে মন্দির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত।

রাজরাজ চোলের সময়ে নির্মিত হয়েছিল তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরের বিমান, অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ এবং সামনের বড় নন্দিচত্বর, সবই প্রশস্ত (৫০০ ফুট × ৯৫ ফুট) দেওয়াল-ঘেরা প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রাঙ্গণের অন্যান্য ছোট ছোট মন্দিরও আছে। পূর্বদিকে আছে গোপুরম। মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর বিমান যাকে ভারতের স্থাপত্য শিল্পের 'কষ্টিপাথর' বলা হয়। তাঞ্জোরের মন্দিরে একটি মাত্র প্রস্তরখণ্ড থেকে নির্মিত চোদ্দোতল বিশিষ্ট গম্বুজসমন্বিত বিমানটির উচ্চতা ২০০ ফুট।

তাঞ্জোরের মন্দিরের প্রায় কুড়ি বছর পর রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে আর একটি মন্দির তৈরি করান। এই মন্দিরের কারুকাজ আগেরটির চাইতেও অনেক বেশি ও বিচিত্র। মন্দিরটি নিঃসন্দেহে চোলসাম্রাজ্যের বিত্তবৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

দেওয়াল-ঘেরা বড় প্রাঙ্গণের (৩৪০ ফুট × ১০০ ফুট) মধ্যে অবস্থিত এই মন্দিরের মণ্ডপটির আয়তন ১৭৫ ফুট x ৭৫ ফুট। একটি গলিপথ বিরাট বিমান ও মণ্ডপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। অপেক্ষাকৃত নিচু মণ্ডপের সমতল ছাদ ১৫০টিরও বেশি সারিবদ্ধ স্তম্ভের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে। সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, এই মণ্ডপের মধ্যে পরবর্তীকালের সহস্রস্তম্ভ দ্রাবিড় মণ্ডপের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র চোলের পর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি কমে আসার ফলে চোল শিল্প-স্থাপত্য ও তার পূর্বকার জৌলুস হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী মন্দিরগুলো ছিল নিতান্তই সাধারণ। সংখ্যায় ও জাঁকজমকে গোপুরমগুলোই মূল মন্দিরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। উদাহরণ হিসেবে কুম্ভকোনমের গোপুরমটির উল্লেখ এখানে করা যায়।

১গ.৬ চোলদের শাসনব্যবস্থা

চোলদের শাসনব্যবস্থার জন্য প্রধানত লেখর উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য এই লেখগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা সর্বদা একমত নন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাষ্ট্রকূট রাষ্ট্রবিন্যাসের সঙ্গে চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসের মৌলিক পার্থক্য ছিল। সামন্ত নরপতিরা চালুক্য-রাষ্ট্রকূট রাজাদের উচ্চাশাকে খর্ব করতেন। একমাত্র চোলরাই দীর্ঘকাল সামন্ত নরপতিদের প্রভাব কমিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

সঙ্গম যুগের মতো চোল আমলেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজার অভিধা ছিল 'চক্রবর্তীগল'। অসংখ্য প্রাসাদ এবং কর্মচারী ও বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ এই রাজতন্ত্রকে অনেকে বাইজানটাইন রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চোল রাজতন্ত্র ছিল খুবই কার্যকর। বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা রাজার কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করতেন, তিনি সে সম্পর্কে মৌখিক আদেশ দিতেন। রাজকীয় আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় শাসনকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রতিবেদন পেশের স্থান ও কাল, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নাম, ইত্যাদি সম্বলিত রাজাদেশ, সাধারণ মন্দির প্রাচীরে টাঙানো হত। আইন-প্রণয়ন নয়, সামাজিক বিধান রক্ষা ও বলবৎ করাই ছিল রাজার কাজ।

রাজকীয় কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ এবং তাঁদের বিভিন্ন অভিধা ছিল। এই অভিধাগুলি সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে, পার্থক্য সূচিত করত। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয় বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের "আদিগারিগল" বলা হত। উচ্চপদস্থ কর্মচাতীদের সাধারণত "পেরুন্দরম" এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের "সিরুদনম" বলা হত। উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী কর্মচারীদের বলা হত "সিরুদনত্তুপ-পেরুন্দরম"। সেনাপতিগণও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন পদ বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল স্ব-শাসিত গ্রাম। কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত কুররম অথবা নাড়ু অথবা কোট্টম। বড় গ্রাম, যা একাই হয়তো একটি কুররম বিবেচিত হত, তাকে বলা হত তনিয়ুর। মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের 'বরো'র সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। কয়েকটি কুররম নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠিত হত। বলনাড়ুর উপরে ছিল 'মণ্ডলুম' বা প্রদেশ। এগুলিই ছিল রাষ্ট্রবিন্যাসের বৃহত্তম বিভাগ। রাজরাজ চোলের রাজত্বকালের শেষে সিংহলসহ এই মণ্ডলমের সংখ্যা ছিল আট কি নয়। চোল রাজত্বে এই সংখ্যা আর বাড়ে নি।

চোল আমলে ভূমিকরই ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস। এই কর নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, নগরের প্রবেশদ্বারে দেয় শুল্ক এবং খনি অরণ্য থেকে রাজস্ব আসত।

গ্রাম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য ভূমিকরের জন্য গ্রামসভাগুলি দায়ী থাকত। যুদ্ধ এবং মন্দিরের প্রয়োজন

ছাড়াও বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধের সংস্কারকার্যের জন্য অতিরিক্ত করা ধার্য করা হত। সবসময়েই অতিরিক্ত কর ধার্য করার আগে করদাতাদের সম্মতি নেওয়া হত।

বিচারের কাজ সাধারণত স্থানীয়ভাবে করা হত। গ্রামসভাগুলির বিচার সম্পর্কিত ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। রাজকীয় আদালতগুলিকে সম্ভবত ‘ধর্মাসন’ বলা হত। ধর্মাসনগুলিতে যেসব মামলা বিচারের জন্য আনা হত; সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণদের (ধর্মাসনভট্ট) সাহায্যে নেওয়া হত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না।

গ্রামসমিতি ছিল দুটি, উর এবং সভা। তাছাড়া শুধু ব্যবসায়ীদের জন্য সমিতি ছিল। তাকে বলা হত নগরম। এই সবগুলিই ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক সমিতি। এরা মোটামুটিভাবে সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা মাঝে মাঝে তাদের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করতেন। এছাড়া তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করত। এই সমিতিগুলি যখন তাদের সংবিধান পরিবর্তন অথবা ভূমিস্বত্ব পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা তাদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন।

স্থানীয় সমিতিগুলির মধ্যে উর ছিল সবচেয়ে সহজ ও সরল। অনেক সময়ে উর সভার পাশাপাশি থেকে কাজ করত। প্রয়োজন অনুসারে উর এককভাবে, অথবা সভার সঙ্গে যৌথভাবে কার্যনির্বাহ করত। কখনো কখনো উরই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। গ্রামের করদাতাদের নিয়ে উর গঠিত হত।

চোলদের লেখতে সভা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সর্বত্র এই সভা ব্রাহ্মণ-গ্রাম, অর্থাৎ চতুর্বেদিমঙ্গলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজারা তাঁদের দানের দ্বারা অনেক মঙ্গলম সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান তখন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। এইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল; এবং এই উপনিবেশগুলিতে ব্রাহ্মণরা সভার মাধ্যমে স্থানীয় কৃর্তত্ব লাভ করেছিলেন।

মহাসভার স্থানীয় শাসনযন্ত্র তুলনায় অনেক বেশি জটিল। সাধারণভাবে এই মহাসভা বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সমিতির মাধ্যমে কাজ চালাত। এই কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির পূর্ব ইতিহাস জানা নেই। তবে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল।

আগেই আঞ্চলিক বিভাগ হিসেবে যে নাড়ুর কথা বলা হয়েছে, তারও নিজস্ব সভা ছিল, এবং এই সভাগুলি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। নাড়ুর সভাকে ‘নাত্তার’ বলা হত। নাড়ুর অন্তর্গত বিভিন্নগ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে নাত্তার গঠিত হত এবং এখানে অন্যান্যদের মধ্যে হিসাবরক্ষকও উপস্থিত থাকতেন। এই নত্তারগুলি বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। তামিল লেখগুলির ‘নগরম’ ও নাড়ুর সঙ্গে, সংস্কৃত সাহিত্যের ‘পৌর’ ও ‘জনপদের’ অন্তত নামের দিক থেকে বিশেষ মিল দেখা যায়।

চোল আমলের এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল না। ‘মধ্যস্থ’ ও ‘করণত্তার’ (হিসেবরক্ষক) —গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এইসব কিছুর লক্ষ্য একটাই—তা হল সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধন।

সুতরাং জনমুখী চোল শাসনব্যবস্থায় একদিকে ছিল যোগ্য আমলাতন্ত্র আর অন্যদিকে ছিল সক্রিয় স্থানীয়

প্রতিষ্ঠানগুলো। এই দুই-এর সাহায্যে চোল আমলের শাসনব্যবস্থা যে উচ্চমান লাভ করেছিল, তা হয়তো অন্য কোন হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১গ.৭ অনুশীলনী

১। প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বর্ণনা করুন।

২। প্রথম নরসিংহবর্মনের রাজত্বের সময়কাল কী ছিল ? তাঁর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সাফল্যের বর্ণনা দিন।

৩। চোল রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে রচনা লিখুন।

৪। চোল রাজাদের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করুন।

১গ.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.)ঃ *এজ অফ্ ইম্পিরিয়াল কনৌজ (১৯৬১)*

২। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.)ঃ *স্ট্রাগল ফর এম্পায়ার (১৯৬৩)*

৩। কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ঃ *হিস্ট্রী অফ্ সাউথ ইন্ডিয়া*

৪। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড।

একক ২ □ প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
২.১ কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা
২.১.১ অর্থকরী ফসলের চাষ
২.১.২ কর্ষণযোগ্য ভূমি
২.১.৩ চাষের পদ্ধতি
২.১.৪ জলসেচ ব্যবস্থা
২.২ ভূমির মালিকানা
২.৩ মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও কৃষককুল
২.৪ সামন্ত প্রথার ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিতর্ক
২.৫ অনুশীলনী
২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

চতুর্থ পর্যায়ের এই এককটিতে প্রাচীন ভারতের অর্থনীতির বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত উভয়বিধ জীবনযাত্রা ও তার সঙ্গো সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়া ঐ সময়ের সমাজচিত্রটিও জানা যাবে; বিশেষ করে পারিবারিক সংগঠন ও নারীর স্থান বিষয়ে একটি আলোচনা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ। এছাড়া, ঐ যুগের অর্থনীতির সঙ্গো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে সংযোগ ঘটেছিল তারও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বিশদভাবে। পরিশেষে, সমাজ ও অর্থনীতির আলোয় তৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের একটি আনুপূর্বিক চিন্তন এর সঙ্গো যুক্ত হয়েছে।

২.১ কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা

কৃষি ও প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব : ভারতবর্ষে কৃষিকার্য প্রবর্তনের সঠিক সময়কে সূচিত করা সহজ নয়। উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ জেলার কোল্‌দিহাওয়া থেকে প্রাপ্ত শিলীভূত ধান্যের তুষের কার্বন[১৪] পরীক্ষার ফলে ওই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম সহস্রাব্দের মধ্যে কৃষির অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া

যায়। অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুন্ডিগক এবং বোলান গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী কোয়েটা থেকে ১৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত মেহেরগড়ে আবিষ্কৃত শস্যাগার ও বসতির অবশেষসমূহ এই অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ সহস্রাব্দে কৃষিভিত্তিক নবাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। গম ও যব ছাড়াও মেহেরগড়ে তুলা চাষের প্রাচীনতম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মেহেরগড়ের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের বেলুচিস্তান ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রাক্-হরপ্পীয়, নবাশ্মীয়, তাম্রাশ্মীয় গ্রাম্য বসতিসমূহে এবং হরপ্পা সভ্যতায়। এই প্রাক্-হরপ্পীয় কৃষিভিত্তিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বসতি হল বেলুচিস্তানের উত্তরের কোয়েটা অঞ্চলের কিলি-গুল-মুহম্মদ ও ডাম্ব সাদৎ, লোরালাই উপত্যকায় রাণাখুণ্ডাই, ঝোব উপত্যকায় পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, মধ্য অঞ্চলের আঞ্জীরা, দক্ষিণের কুল্লী-মেহী ও নাল-নান্দারা, গোমাল উপত্যকায় গুমলা ও হাথালা এবং সিন্ধুপ্রদেশের অম্রী ও কোটডিজি।

হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল ২৫০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ এবং এই সভ্যতার নানা কেন্দ্র সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ, উত্তর-রাজস্থান ও গুজরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর নগর পরিকল্পনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, এই রকম নাগরিক সভ্যতা উন্নততর খাদ্য উৎপাদন, ব্যাপক বাণিজ্য এবং বিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। হরপ্পার কেন্দ্রস্থলে ১৬৯ × ১৩৫ ফুট একটি বৃহৎ শস্যাগারের অবশেষে পাওয়া গেছে—এটি দুটি বিভাগে বিভক্ত, মধ্যে ২৩ ফুট ব্যবধান। দুটি বিভাগই কয়েক ভাগে বিভক্ত হলঘর ও বারান্দা বর্তমান। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে গম, যব, নানা ধরনের কলাই ও তৈলবীজ, তৎসহ খেজুর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া শন, তিনিস ও তুলার চাষের নিদর্শনও বর্তমান। রংপুর ও লোথালে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ ধান-চালের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজস্থানের কালিবঙ্গান থেকে লাঙল ব্যবহারের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেছে। কালিবঙ্গানের উৎখনন থেকে হরপ্পা আমলের একটি কৃষিক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যাতে লাঙলের ফলার দাগ আছে। গরু, মহিষ, ভেড়া, শূকর ও উটের কঙ্কাল হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সিলসমূহে অঙ্কিত বৃষমূর্তি গো-জাতীয় জীবের ব্যাপক অস্তিত্বের পরিচায়ক। এই সকল নিদর্শন থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে হরপ্পীয় নগরসমূহের সঙ্গে অসংখ্য গ্রামের যোগাযোগ ছিল যেগুলিতে কৃষিকাজ ও পশুপালন করা হত। গ্রামগুলির পিছনে কিছু বনাঞ্চলও ছিল। বস্তুত, অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজ ও পশুপালন করা হত গ্রামগুলির পিছনে কিছু বনাঞ্চলও ছিল। বস্তত, অত্যন্ত সুবিস্তৃত কৃষিকাজের পটভূমিকা ব্যতিরেকে ভারতের প্রথম নগরায়ণের পরিচায়ক হরপ্পা সভ্যতার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। খাদ্য উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মুক্তি না পেলে নগর জীবন ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, প্রস্তর যুগের দ্বিতীয় বিকাশের অধ্যায়টি নিওলিথিক বা নবাশ্মীয় হিসেবে পরিচিত। নবাশ্মীয় আয়ুধসমুহের অধিকাংশই ভূমিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত। ব্যাপকতর অর্থে নবাশ্মীয় শব্দটি একটি সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক পর্যায়কে সূচিত করে যার বৈশিষ্ট্য খাদ্য সংগ্রহ থেকে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থায় উত্তরণ, যখন মানুষ শুধু তার অস্ত্রকেই ধার দিতে শেখেনি, কৃষিকাজে হাত লাগিয়েছে; এছাড়াও পশুপালন, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প ও স্থায়ী আবাসে অভ্যস্ত হয়েছে। এই কারণেই গর্ডন চাইলড্ 'নবাশ্মীয় বিপ্লব' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় অধ্যায়টির অবস্থা বড়ই এলোমেলো এবং

তা কালসীমার নিরিখে বড়ই অর্বাচীন। অবিমিশ্র-নবাশ্মীয় সংস্কৃতির সংখ্যা এখানে বেশি নয়; যেগুলি কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, বিহার, আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং এই সকল সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রস্তর ও অস্থি নির্মিত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী হাতিয়ারের উপস্থিতি। অপরাপর অঞ্চলে নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের এত ব্যাপক সংমিশ্রণ ঘটেছে যে উভয়েরই আদ্যন্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। দক্ষিণের নবাশ্মীয় কৃষিভিত্তিক বসতিসমূহের মধ্যে কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার প্রত্নক্ষেত্রগুলির ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী পালিশ করা পাথরের কুঠারের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। এইগুলির কালনির্ণয় করা হয়েছে ২০০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। বস্তুত নবাশ্মীয় এবং তাম্রাশ্ময়ী সংস্কৃতগুলির কালসীমার কোন একক ধারাবাহিকতা ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকেই এই সকল নবাশ্মীয় সংস্কৃতি তাম্রাশ্মীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। গুজরাট হরপ্পা-উত্তর তাম্রাশ্মীয় বসতিসমূহের (১৮০০-১১০০ খ্রিঃপূঃ) উৎখনিত বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও উপকরণসমূহ ওই অঞ্চলে কৃষির বিস্তৃতির পরিচয় দেয়। একথা দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের বানাস উপত্যকায় আহাড় সংস্কৃতির (২০০০-১০০০ খ্রিঃ পূঃ) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চম্বল, নর্মদা ও মধ্যপ্রদেশের অপরাপর নদী বিধৌত এলাকাসমূহে বিকশিত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহে কৃষিকর ব্যাপক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নভডাটোলি এবং কায়থা থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে ধান, গম, যব, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উত্তর গোদাবরী-প্রবরা অববাহিকায় এবং তাপ্তী উপত্যকায় গড়ে ওঠা তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহ নানা ধরনের কৃষির নিদর্শনে পরিপূর্ণ, তবে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয় লোহার লাঙল ব্যবহৃত হওয়ার পর থেকে। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে ভারতে লোহার প্রচলন শুরু হয়, যদিও এই বিরাট দেশে সর্বত্রই তা একই সময়ে হয়নি। উত্তর ভারতের লৌহব্যবহারকারীদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটি বিশেষ মৃৎশিল্পের ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যার নামকরণ করা হয়েছে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতি (১১০০-৪৫০ খ্রিঃপূঃ) যা পাঞ্জাব থেকে একদিকে রাজস্থান ও অপরদিকে গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে লৌহযুগের বসতিগুলির সঙ্গে আর একটি নতুন ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ ঘটেছিল যার নামকরণ করা হয়েছে কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি, যার বিকাশকাল ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে। যে কৃষিনির্ভরতা আধুনিক ভারতবর্ষেরও প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, তার সূত্রপাত ভারতের উর্বরতম সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে যেখানে উপযুক্ত সংস্কৃতিদ্বয় গড়ে উঠেছিল।

বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত কৃষিব্যবস্থা : ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগের কালসীমা আনুমানিক ১৫০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। *ঋগ্বেদ*-এ পশুপালনমূলক অর্থনীতিকে কৃষিকার্যের তুলনীয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দেখানো হলেও কৃষি মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। গাভী সম্পর্কে *ঋগ্বেদ*-এর কবিদের অতি উৎসাহের একমাত্র কারণ হল মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে পশু বিশেষ করে গাভী ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম এবং রক্ষাযোগ্য সম্পদ, স্বাভাবিক নিয়মেই যার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। তদুপরি যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের দ্বারা গো-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো যায়। কৃষি ও পশুপালন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয় নয়; একে অপরের পরিপূরক। বস্তুত, ভূমিকুঠার বা খুরপির দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে বৃহৎ পরিসরে কৃষিজ উৎপাদন ঘটানো যায় না, যা কেবল পশুবাহিত লাঙলের দ্বারাই

সম্ভব। *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম ও দশম মণ্ডলে কৃষিকাজের পর্যাপ্ত উল্লেখ আছে; তবে মণ্ডলদুটি অপরগুলির তুলনায় কিছুটা অর্বাচীন। চতুর্থ মণ্ডলের একটি সমগ্র সূক্ত (৪/৫৭) কৃষি বিষয়ক। পরবর্তী সংহিতাসমূহে ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যে কৃষিমূলক সীতাযজ্ঞের কথা উল্লিখিত হয়েছে এখানে তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। *অথর্ববেদ*-এ পৃথ্বি বৈণ্যকে কৃষিবিদ্যার উদ্‌গাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথর্ববেদ-এ ও কাঠক *সংহিতা*-র সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, চাষযোগ্য জমিকে বলা হত 'উর্বরা' বা 'ক্ষেত্র', 'সকন' এবং 'খরিষ' ছিল 'সার'। ছয় আট এমনকী বারো জোড়া বদল দিয়েও 'সীর' বা লাঙল টানা হত। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ লাঙ্গল দেওয়া (কৃষন্ত), বীজ বপন করা (বপন্ত), ফসল তোলা (লুনন্ত) এবং ঝাড়াই-বাছাই করার (বির্ণন্ত) বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ কুল্যা (৩/৪৫/৩) শব্দটির দ্বারা কৃত্রিম জলপ্রণালীকে বুঝিয়েছে। 'খনিত্রি মা আপুঃ' (৭/৪৯/২) বা 'খনন করে যে জল পাওয়া যায়' বাক্যাংশটি সেচব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে। *বাজসনেয়ী সংহিতা*-এ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের একটি তালিকা দেওয়া আছে। পোকামাকড় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে ফসল রক্ষার মন্ত্র *অথর্ববেদ*-এ দেওয়া আছে। ফসল কাটার জন্য ব্যবহৃত কাস্তেকে বলা হত 'দাত্র' বা 'সৃণি', আটি বাঁধাকে বলা হত 'পর্ষ', ঝাড়াই-মাড়াই-এর কাজ হত 'খল', 'তিতৌ এবং 'শূর্পের' সাহায্যে। যারা এই কাজ করত তাদের বলা হত 'ধান্যকৃত' এবং যে পাত্রের সাহায্যে ফসল মাপা হত তার নাম ছিল 'উর্দয়'। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ বলা হয়েছে যে বছরে দুবার ফসল তোলা হত।

বৈদিক যুগে পশুপালনের সঙ্গে কৃষির সংযুক্তি, কৃষিক্ষেত্রে পশুবাহিত লাঙলের ব্যবহার উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচুর উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করে। এই উদ্বৃত্তের অধিকারের দ্বন্দ্ব থেকেই সামাজিক শ্রেণীভেদ তীব্র হয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব পুরাতন উপজাতীয় জীবনচর্যার অবসান ঘোষণা করে, সম্পদ হিসেবে যুদ্ধে জিতে পশু ছাড়াও নানা ধরনের কৃষিজ উৎপাদনের গুরুত্ব বেড়ে যায়, রাজকীয় রাজস্বের ক্ষেত্রেও ফসলের ভাগ প্রধান হয়ে ওঠে। রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কৃষির উন্নতি ঘটানো রাজকার্যের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেলেও উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা কিন্তু কৃষিকে কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। সে ঐতিহ্য আজও বজায় আছে। *পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ*-এ (১৭/১) কৃষিকে নিম্নশ্রেণীর মানুষের বৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও *ঋগ্বেদ*-এর অশ্বদ্বয়কে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং জুয়াড়িকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করে কৃষিকাজে নিযুক্ত হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তথাপি বৈদিক সাহিত্যে কৃষিকর প্রতি খুব সম্ভ্রমসূচক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় না।

উৎপাদিত ফসলসমূহ : *ঋগ্বেদ*-এর যে কোনও খাদ্যশস্যকেই 'ধান্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া যব, জই (তোক্‌মন), ধান (ব্রীহি) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। *বাজসনেয়ী সংহিতা*-র (২৮/১২) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের একটি প্রদত্ত তালিকায় ধান (ব্রীহি), যব (উপবাক), কলাই (মদত্ত, মাষ), তিল, অনু, খল্ব, গোধূম (গম), নীবার, প্রিয়ঙ্গু, মসুর, শ্যামাক, উর্বারু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ও প্রাচীনতর বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে ধান্য, ব্রীহি, শালি প্রভৃতি নানা ধরনের ধানের চাষ বপন ও রোপণ উভয় প্রক্রিয়া এবং তৎসহ গোধূম (গম), যব ও ইক্ষুর ব্যাপক চাষের কথা বলা হয়েছে। মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগের কৃষিব্যবস্থার পরিচয় মেগাস্থিনিসের রচনায়, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ ও বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*-এ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ শালি, ব্রীহি, কোদ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্গু, দরক, মুদ্‌গ, মাষ, শৈম্ব্য, কুসুম্ভ, মসুর, কুলখ,

যব, গোধূম, কলায়, অতসী, সর্ষপ ও তৎসহ ভল্লিফল (লাউ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি), মৃদ্বিকা (দ্রাক্ষাফল) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এছাড়া ওষধি, গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতোপযোগী কয়েকটি বিশেষ ধরনের গাছ ও লতা এবং তৎসহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নানা ধরনের মূলের ব্যাপক উৎপাদনের কথা আছে। বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*-এ ও *অমরকোষ* নামক বিখ্যাত অভিধানে নানাপ্রকার ধান, গম, যব, কলাই ও মসুর, তিল, তিসি ও সর্ষপ প্রভৃতি তৈলবীজ, আদা এবং অপরাপর নানা ধরনের সবজি, ইক্ষু, মরিচ ও অপরাপর মশলার উল্লেখ আছে। *বৃহৎসংহিতা*-এ ৫৫তম অধ্যায়টি *বৃক্ষায়ুর্বেদ* নামে পরিচিত যেখানে রোগগ্রস্ত ও অপুষ্ট অথবা পোকামাকড়ের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া চারাগাছসমূহের চিকিৎসার বিধান দেওয়া আছে।

২.১.১ অর্থকরী ফসলের চাষ

অর্থকরী ফসলের চাষও— যেমন মরিচ, নারিকেল, তৈলবীজ, সুপারী (গুবাক) প্রভৃতি ব্যাপক পরিমাণে চাষ করা হত। সিন্ধু ও কাশ্মীর অঞ্চলে জাফরানের উৎপাদনের কথা *রঘুবংশ* ও *অমরকোষ*-এ বলা হয়েছে। রঘুবংশ থেকে আরও জানা যায় যে, মরিচ, এলাচ ও চন্দন মলয় পর্বতাঞ্চলে অর্থাৎ পূর্বঘাট অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বলেন যে, উদ্যান, দারেল ও কাশ্মীরের জাফরান বিখ্যাত; কাশ্মীর ও কুলুতে বিশেষভাবে ভেষজ উৎপাদিত হয়; ওড্রদেশের ফল বিখ্যাত; মলয় পর্বতে চন্দন, কর্পূর ও অপরাপর সুগন্ধী বৃক্ষ জন্মায়; এগুলি পাণ্ড্যদেশ বা মালাবার অঞ্চলেও পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে হিউয়েন সাঙ আম, তরমুজ, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা, তেঁতুল, বেল, ডালিম ও কমলালেবুর কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ই-ৎ-সিং কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। শূরপালের *বৃক্ষায়ুর্বেদ* গ্রন্থে যব, গম, চাল, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরি (বাজরা), তিসি, সর্ষপ, তিল, তুলা ও বিভিন্ন ধরনের ডাল উৎপাদনের কথা বলা আছে। গুপ্তোত্তর যুগে রচিত *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে কৃষিজ উৎপাদন-বিষয়ক বহু তথ্য দেওয়া আছে।

গ্রীক বিবরণীতে, বিশেষ করে স্ত্রাবো ও ডায়োডোরাসের রচনায় এদেশে দুবার বর্ষার কথা এবং ধান, গম ও যবের প্রভূত ফলনের উল্লেখ আছে। প্লিনি আখের উৎপাদনও ভারতীয় ফসলের তালিকায় রেখেছেন এবং এদেশে কার্পাস ফলনে বিস্ময় প্রকাশ করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে উৎকীর্ণ নহপানের নাসিক লেখে ব্যাপকভাবে নারিকেল বৃক্ষ রোপণের কথা আছে। প্লিনি এদেশে মশলার চাষের কথাও বলেছেন, বিশেষ করে গোলমরিচ, এলাচ ও দারুচিনির। দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণে এই সকল মশলার ব্যাপক উৎপাদনের কথা *পেরিপ্লাস* গ্রন্থে লেখক বলেছেন। তামিল সঙ্গম সাহিত্যেও মশলার প্রভূত উল্লেখ আছে।

২.১.২ কর্ষণযোগ্য ভূমি

বৈদিক সাহিত্যে কর্ষণযোগ্য ভূমিকে 'উর্বরা' ও 'ক্ষেত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হলকর্ষণে সৃষ্ট খাতের নাম 'সীতা'। পাণিনি তাঁর বিখ্যাত *অষ্টাধ্যায়ী*-তে তিন প্রকার ভূমির কথা বলেছেন : যে ভূমিতে চাষ হয় (কর্ষ), পশুচারণের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি (গোচর) এবং পতিত ভূমি (উষর)। উৎপন্ন শস্যের গুণমান ও পরিমাণের ভিত্তিতে তিনি আবার কর্ষণযোগ্য ভূমির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কৌটিল্য পাঁচ প্রকারের ভূমির কথা বলেছেন : কৃষ্ট অর্থাৎ চাষযোগ্য, অকৃষ্ট অর্থাৎ যে জমিতে চাষ হয় না, স্থল অর্থাৎ উচ্চ ও শুষ্ক ভূমি, কেদার অর্থাৎ যে জমিতে খাদ্যযোগ্য মূল অর্থাৎ মানকচু, ওল, মূলা, রাঙালু, আদা ও নানাবিধ কন্দজাতীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। পতঞ্জলী তাঁর *মহাভাষ্য* নামক গ্রন্থে কৃষিযোগ্য (ক্ষেত্র) ও চারণ (গোচর) এই দুপ্রকার ভূমির উল্লেখ করেছেন। লাঙলের

সাহায্যে যে ভূমি চাষ করা হয় তার নাম হল্য বা সীত্য। চরক ও সুশ্রুত তিন ধরনের ভূমির কথা বলেছেন : জাঙ্গাল অর্থাৎ যে জমি বন্ধ্যা, যেখানে দু-একটি ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু জন্মায় না; অনুপ অর্থাৎ জলাভূমি, যেখানে ওই ভূমির উপযোগী বৃক্ষাদি জন্মালেও চাষ সম্ভব নয়; এবং সাধারণ, যেখানে হলকর্ষণ করা যায়। সুশ্রুতের ভেষজ প্রস্তুতের উপযোগী গাছপালা চাষের জন্য বালুকা, পটাশ ও লবণবিহীন উজ্জ্বল, ঈষৎ কঠিন কৃষ্ণবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তবর্ণ ভূমি বাঞ্ছনীয়।

২.১.৩ চাষের পদ্ধতি

বৈদিক সাহিত্যে পশুবাহিত লাঙল, সার ও সেচের উপযোগিতা স্পষ্ট করেই বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। *অথর্ববেদ*-এ কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, অতিবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষার সমস্যা আলোচিত হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (১/৬/১/৩) কৃষিকার্যের চারটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে, যথা লাঙল দ্বারা ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, ফসল, সংগ্রহ এবং তা ঝাড়াই-মাড়াই করা। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ (২/২৪) বর্ষার পর তিনবার ভূমিকর্ষণের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া *অর্থশাস্ত্র*-এ বীজ শোধনের কথা বলা হয়েছে। *বৌদ্ধ মিলিন্দ পঞ্হো* নামক গ্রন্থে জমি থেকে আগাছা, কাঁটা, পাথর, ইত্যাদি উৎপাটন, লাঙল চালনা, বীজবপন, সেচন, কৃষিক্ষেত্রের চারপাশ বেড়া দেওয়া, নজরদারী বজায় রাখা, ফসল কাটা ও ঝাড়াই বাছাই করার কথা বলা হয়েছে। বীজকে নানা পদ্ধতিতে পরিষ্কৃত ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নানাবিধ উপায় *বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ* ও *কৃষিপরাশর*-এ বর্ণিত হয়েছে। *অমরকোষ*-এ কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির পরিচয় দেওয়া আছে, যথা লাঙল বা হল, যোত (লাঙলের সংযোজক), প্রাজন বা তোড়ন (অঙ্কুশ), কোতিষ (জমিতে দেওয়ার মই), খনিত্র (কোদাল বা খুরপি), দত্র বা লবিত্র (কাস্তে) প্রভৃতি। *কৃষিপরাশর*-এ যেসকল যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সৃণি (কাস্তে), খনিত্র, মুষল, উর্প (শস্য ঝাড়া ও পরিষ্কার করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ঝুড়ি বা কুলা), ধান্যকৃত (শস্য ঝাড়ার কাজে ব্যবহৃত পাখা), চালনী এবং মেথি (শস্য আছড়াবার বা মোড়াই-এর দণ্ড) উল্লেখযোগ্য।

কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগের বিষয়টি এমনকী ঋগ্বেদের যুগেও অজানা ছিল না। সকল ও করীষ এই দুটি শব্দ ছিল সারের বৈদিক নাম। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ গেময় ও অস্থিচূর্ণকে সার হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *বৃহৎসংহিতা*-এ মাছ ও মাংস থেকে প্রস্তুত জৈব সারের কথা আছে। *অগ্নিপুরাণ* ও *কৃষিপরাশর*-এ সার তৈরি ও তা ব্যবহারের নিয়মাবলী প্রদত্ত হয়েছে। শস্যক্ষেত্রের চারাগাছগুলি যাতে রোগগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর রাখা হত। অপুষ্ট বা রোগ্রসস্ত চারাগাছের চিকিৎসার নানা ব্যবস্থাপত্র শূরপাল রচিত *বৃক্ষায়ুর্বেদ* এবং চক্রপাণি মিশ্রের *বিশ্ববল্লভ* নামক গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে পশুসম্পদ ও পশুশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় পশুদপ্তর ও সেই দপ্তরের অধ্যক্ষ নিয়োগের কথা বলেছেন। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*-এ পশুপালন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্তমান। *অগ্নিপুরাণ* ও *বিষ্ণুধর্মোত্তর*-এ পশুদের রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা আছে। *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গবাদি পশুর জন্য পরিচ্ছন্ন গোশালা ও নির্মল পানীয় জলের প্রয়োজন। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, প্রতিটি গ্রামেই কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি পশুদের চারণভূমি থাকা দরকার।

২.১.৪ জলসেচ ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা মূলত বর্ষা নির্ভর। কিন্তু এক্ষেত্রে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সমস্যা আছে। কাজেই

প্রকৃতি নির্ভরতা ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ প্রথা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান ছিল। বৃষ্টির জল বা বন্যার জলকে ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মাণের রীতি বহু প্রচলিত ছিল। *ঋগ্বেদ*-এ (১০/১০১/৬-৭) কূপ থেকে জল তুলে চোঙার সাহায্যে ও নালার ভিতর দিয়ে তা কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করানো, এবং এই কাজের জন্য কপিকলের মতো যন্ত্রের (১০/৯২/১৩) উল্লেখও আছে। পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*-এ (১/১/২৩) নদী থেকে খাল খনন করে জল নিয়ে এসে চাষ করার কথা বলা আছে। *নারদস্মৃতিতে* দুই ধরনের খালের কথা বলা হয়েছে—খেয়, অর্থাৎ যা প্রবহমান এবং বন্ধ্য, অর্থাৎ যা একটি বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। *কাশ্যপীয় কৃষিশুক্তির* মতো পরবর্তীকালে রচিত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থে খাল খনন, জলাধার নির্মাণ ও বাঁধ দেওয়ার বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

কূপ ও পুষ্করিণী খননের বহু উদাহরণ প্রাচীন লেখসমূহে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক, শক এবং কুষাণ আমলে অনেক জলাশয় খনন করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এই প্রসঙ্গে অনেক তথ্য জানা গেছে। তক্ষশিলার সিরকাপ উৎখননের ফলে একটি মন্দির সংলগ্ন জলাশয় পাওয়া গেছে। কুষাণ আমলে আফগানিস্তান ও পেশোয়ার অঞ্চলে অনেকগুলি খাল বা প্রণালী খনন করা হয়। এলাহাবাদের নিকটবর্তী শৃঙ্গাবেরাপুরে উৎখননের ফলে একটি বৃহৎ জল সংরক্ষণ প্রকল্প আবিষ্কৃত হয়েছে। নাসিক থেকে প্রাপ্ত একটি লেখে উদকযান্ত্রিক বা সেচবিষয়ক প্রযুক্তিবিদের কথা জানা যায়।

জলসেচ ব্যবস্থার উপর যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব আরোপ করা হত তার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান। এই প্রসঙ্গে সৌরাষ্ট্রের সুদর্শন হ্রদের উপর দেওয়া বাঁধের কথা উল্লেখযোগ্য যা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে তৈরি হয়েছিল এবং যা থেকে অশোকের আমলে তুষাস্ফ নামক জনৈক প্রযুক্তিবিদ আধিকারিক সেচখাল খনন করেন। ১৫০-১৫১ খ্রিস্টাব্দে একটি ভয়াবহ ঝড়ে ওই বাঁধ বিনষ্ট হলে সেচখালগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। তখন শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের নির্দেশে সৌরাষ্ট্র ও আনর্তের শাসক সুবিশাল ওই বাঁধের সংস্কার করে সেচখালগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের (৪৫৫-৬৭ খ্রিঃ) আমলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে ওই বাঁধ আবার ভেঙে পড়ে এবং সম্রাটের নির্দেশে স্থানীয় পর্ণদত্ত এবং তাঁর পুত্র চক্রপালিত তার সংস্কার করেন। একটি বিশেষ বাঁধের সাড়ে-সাতশো বছরের ইতিহাস সত্যই চমকপ্রদ। কলিঙ্গসম্রাট খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যা যে, নন্দরাজাদের আমলে নির্মিত একটি খাল তিনি তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে দীর্ঘায়িত করেন, যা করতে তাঁর এক লক্ষ মুদ্রা খরচ হয়েছিল।

সেচের উদ্দেশ্যে বন্যাপ্রবণ নদীসমূহের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনও কোনও নরপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন করিকাল চোল কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা কাশ্মীররাজ অবন্তীবর্মা (৮৩৬-৫৫ খ্রিঃ) যিনি বিতস্তা নদীকে শাসন করে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে দেন। এছাড়া, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে কূপ, পুষ্করিণী ও জলাশয় খননের বহু নিদর্শন বর্তমান। মৌর্যোত্তর যুগের অনেক লেখে পুষ্করিণী খননের উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও লেখ থেকে জ্ঞাত অধিকাংশ জলাশয়ই খ্রিস্টীয় প্রথম দুই শতকের মধ্যে নির্মিত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে যজ্ঞের ফল লাভ করার জন্য শূদ্রদের পূর্তকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্তকর্মসমূহের মধ্যে জলাশয় খনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রে সেচের জন্য একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা সেতু নামে পরিচিত। মনু বলেন যে, সেতুভঙ্গকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া প্রয়োজন; তবে সে যদি সেচপ্রকল্প মেরামত করে দেয় তবে এক হাজার পণ জরিমানা দিয়ে সে রেহাই পেতে পারে।

এই শাস্তির বিধান তৎকালীন সমাজে সেচব্যবস্থার প্রতি সচেতনতার পরিচায়ক। সরকারি জলসেচ ব্যবস্থার সুযোগ যারা গ্রহণ করে কৌটিল্য তাদের উপর 'উদকভাগ' বা জলকর চাপানোর সুপারিশ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় লেখসমূহে এই কর আদায়ের কোনও উল্লেখ নেই। তবে প্রাক্-মধ্যযুগীয় গাহড়বাল রাজারা জলকর নামে একপ্রকার সেচকর আদায় করতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জলসেচ প্রকল্পের সূচনা ও প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ শাসকেরা করলেও কালক্রমে সরকারির চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগই প্রবলতর হয়ে ওঠে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল আদি-মধ্যযুগে তামিল এলাকার কয়েকটি আঞ্চলিক সংগঠন, যাদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় পুষ্করিণী ও জলাশয় সযত্নে খনিত হত। এছাড়া সেচের কাজে নদীর প্লাবনের উপর ভরসা করা হত। একথা বিশেষ করে মধ্য-গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের ক্ষেত্রে সত্য।

২.২ ভূমির মালিকানা

ভূমির মালিকানার প্রশ্ন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়। এক্ষেত্রে তিনটি প্রসঙ্গ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মতভেদ বর্তমান, যেগুলি হল (১) গোষ্ঠীগত মালিকানা (২) ব্যক্তিগত মালিকানা এবং (৩) রাজকীয় মালিকানা। ভারতবর্ষের মতো বিরাট উপমহাদেশে যেখানে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং জনজীবনের অসম বিকাশ একটা বরাবরের ব্যাপার, সেখানে কোনও সুনির্দিষ্ট ধরনের জমির মালিকানাবিধি অন্বেষণ করতে যাওয়া বৃথা। তবুও বলা যায় যে, যে সকল সমাজ জাতিভিত্তিক, অর্থাৎ কৌমসমাজ এবং যেখানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা (গণ ও সংঘ) প্রচলিত, সেখানে ভূমির গোষ্ঠীগত মালিকানা আশা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিগ্রন্থসমূহে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রাচীনতর যুগে জমি সাধারণের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হত এবং তা ভাগ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে যখন ভূমিবিভাগ বিধিসম্মত হয়ে গিয়েছিল তখনও দেবভট্ট বলেছেন যে, এই বিভাগ সকল জ্ঞাতিদের সম্মতি নিয়ে করা উচিত ('অখিল দায়াদানুমাত্যা, স্ব-গ্রাম-জ্ঞাতি-সামন্ত-দায়াদ-অনুমোদনে চ') প্রাচীন ভারতীয় রচনাসমূহ থেকে এমন একটা ধারণা পাওয়া যায় যে, 'সীতা' বা রাজকীয় ভূমির (ক্রাউনল্যাণ্ড) মালিক রাজা স্বয়ং ছিলেন এবং তৎসহ পদাধিকার বলে তিনি (ক) অনাবাদী ভূখণ্ড, (খ) নূতন পত্তন করা জনপদ, (গ) সেচ প্রকল্প (ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ, (ঙ) অরণ্য (চ) 'ব্রজ' বা গোচারণভূমি এবং (ছ) মাটির নীচে আবিষ্কৃত গুপ্ত সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার ভোগ করতেন। এ থেকেই একটি সিদ্ধান্ত অনেকেই করেন যে, রাজাই ছিলেন সকল ভূমির অধিকারী এবং ব্যক্তিগত ভূম্যাধিকারী বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত অনেকটা অবাস্তব, কেননা প্রাচীন বিধিগ্রন্থসমূহে ভূমির উপর ব্যক্তির 'স্বত্ব' ও 'স্বামিত্ব' খুব গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া শিলালেখ ও তাম্রশাসনসমূহে ভূমির হস্তান্তর, বিক্রয়, দান, বন্ধক প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল।

ঋগ্বেদের যুগে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল কি না তা বলা যায় না যদিও *ঋগ্বেদ*-এ (৮/৯১/৫) অপলার পিতার ব্যক্তিগত জমি থাকার ইঙ্গিত আছে। পরবর্তীকালের অর্থে সেটা ঠিক মালিকানা ছিল কি না, তা একটি বড় প্রশ্ন, কেননা *ঋগ্বেদ*-এর অন্যত্র জমি বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক, উপহার বা অন্য কোনও উপায়ে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির হাত বদল করার কোন সাক্ষ্য নেই। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের চিত্রও খুব

স্পষ্ট নয়। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (৭/১/১/৮) বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয় (রাজা বা কৌমপ্রধান) জনগণের সম্মতিতে কোনও ব্যক্তিকে বসতি প্রদান করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় না যে, দাতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বা রাজা ওই ভূখন্ডের মালিক ছিলেন, কিংবা যেহেতু তিনি জনগণের সম্মতি নিয়ে দান করেছিলেন অতএব ভূখণ্ডটি ছিল গোষ্ঠী মালিকাধীন, অথবা যে গ্রহীতা হস্তান্তর-বিক্রয়-বন্ধক-দান প্রভৃতির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ওই ভূখণ্ডের স্বামিত্ব পেয়েছিলেন। *শতপথ* (১৩/৭/১-১৫) এবং *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* (৮/২১)-এ একটি কাহিনী আছে যে, রাজা বিশ্বামিত্র তাঁর পুরোহিত কশ্যপকে ভূমিদান করতে চাইলে ভূমি নিজেকে প্রদত্ত হতে দিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে এই বক্তব্যই জৈমিনি ও শবর কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ভূমি সকলের, কোনও সার্বভৌম ব্যক্তির নয়। যখন বলা হয় 'রাজা সকল জমির প্রভু' তা একান্তই আলঙ্কারিক অর্থে। তিনি ভূমির করগ্রাহী, এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কোনও ভূমিখণ্ডের প্রয়োজন হ'লে তিনি করপ্রদানকারী ভূমির বাস্তব মালিকের কাছ থেকেই তা কিনতে পারেন। অষ্টম শতকের কাশ্মীররাজ চন্দ্রাপীড় একটি ভূমিখণ্ড একজন চর্মকারের নিকট থেকে নগদ মূল্যে ক্রয় করেন। মনুর মতে, ভূমির মালিক সে-ই হয় যে পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে।

প্রাক্-মৌর্যযুগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টি বৈধতা লাভ করে, যদিও এই মালিকানার প্রকৃতি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ছিল। এই জাতীয় সিদ্ধান্ত পরোক্ষ সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। অসুবিধাটা এইখানে যে, মৌর্যযুগে পূর্ববর্তী কোন লেখ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অশোকের রাজত্বকালের আগে লিপিবদ্ধ হয়নি। *বৌধায়ন, গৌতম, আপস্তম্ব* ও *বশিষ্ঠ* এই চারটি প্রাচীন ধর্মসূত্রের সাক্ষ্য থেকে যে উত্তরাধিকারি সংক্রান্ত আইনকানুনের পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বপক্ষে অনুমান করা চলে। বৌদ্ধ গ্রন্থ *সংযুক্ত নিকায়*-এ বলা হয়েছে যে, ভরদ্বাজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এত বিশাল একটি কৃষিক্ষেত্রের অধিকারী ছিলেন যে তা কর্ষণ করতে পাঁচশত লাঙল অথবা লাঙলধারী কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জৈন *নায়াধম্মকহাও* নামক গ্রন্থে কৃষিশ্রমিক নিয়োগের উল্লেখ আছে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে জেতবন নামক বিখ্যাত উদ্যান ক্রয় ও তা বুদ্ধকে উপহার প্রদানের বিখ্যাত কাহিনী থেকে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তা বিক্রয়, হস্তান্তর ও দানের অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস ও অপরাপর গ্রীক লেখকদের মতে, মৌর্য আমলে দেশের সমস্ত জমিই রাজার মালিকানাধীন। রাজা ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তির জমির উপর অধিকার নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মেগাস্থিনিসের পর্যবেক্ষণ বহুক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং পরবর্তী গ্রীক লেখকগণ তাঁর রচনাকেই অবলম্বন করেছিলেন। ডায়োডোরাসের মতে প্রজারা রাজাকে জমির মালিক হিসেবে ফসলের এক-চতুর্থাংশ খাজনা হিসেবে প্রদান করে। করের পরিমাণ ও হার নিয়ে অবশ্য গ্রীক লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণে ভূমি মোটামুটি তিন শ্রেণীর—রাষ্ট্রের খাস জমি, প্রজাদের নিকট রাজস্বের বিনিময়ে বিলি করা জমি এবং অকর্ষিত এলাকা যেখানে রাষ্ট্রীয় অধিকারের ধরন নানা পর্যায়ের। রাষ্ট্রীয় খাস জমিরও (সীতা) আবার নানা প্রকারভেদ ছিল; যথা যে জমি রাজা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতেন; জমি শাসকশ্রেণীর অধীন কর্মচারী এবং রাজার পরিজনরা ভোগ করতেন, যে জমিতে আবাদ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হত, যে জমি ভাগে চাষ করানো হত প্রভৃতি। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* থেকে যে আভাস পাওয়া যায় তা

হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র অকর্ষিত ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম চালু করতে এবং কর্ষিত ক্ষেত্রে তা বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থেই ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রাক্ কৌটিল্য ও কৌটিল্যোত্তর উভয় যুগেই বর্তমান ছিল। সাধারণভাবে বক্তিগত মালিকানা স্বত্ব প্রধানত সেইসব জমিতেই পুরুষানুক্রমে চালু ছিল যে জমিগুলি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে ওঠার আগে থেকেই বহুকাল ধরে কর্ষিত হচ্ছে। বরং রাষ্ট্র যে জমিতে তার শাসন প্রসারিত করছিল ও উপনিবেশ সৃষ্টি করছিল সেখানেই নতুন করে কৃষকদের সীতা জমির রীতি অনুযায়ী চাষের জন্য নিয়োগ করেছিল।

কৌটিল্যকে মৌর্যযুগে স্থান দেওয়া না দেওয়া অন্য কথা, তবে একথা ঠিক যে পরবর্তী রাজবংশগুলির তুলনায় প্রথম তিনজন মৌর্য নৃপতির আমলে রাজশক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রাবল্য ছিল। মৌর্যোত্তর যুগে এমন কোনও রাষ্ট্রীয় খামারের কথা পাওয়া যায় না সেখানে কৌটিল্যকথিত কৃষি অধীক্ষকের তত্ত্বাবধানে 'ভূমিশ্রমিক' দিয়ে চাষ করানো হত। কিন্তু নগর, বন্দর, খনি ইত্যাদির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছিল। তবে, কৌটিল্যের এই কথা যে কৃষির জন্য প্রস্তুত ভূমি করপ্রদানকারী জীবনস্বত্বে ও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করবে, মনুও মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন যে, চাষের কাজে পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি বা চাষের উপযোগী নয় এমন জমিকে যারা চাষের উপযোগী করে তোলে, তাদের সেই জমির মালিকানা দিতে হবে। তাঁর মতে, জঙ্গাল কেটে জমি যে প্রথম পরিষ্কার করে এবং হরিণকে প্রথম যে আঘাত করে, ঋষিগণ উভয়ের উপর তাদের অধিকার স্বীকার করে নেন। *মিলিন্দ পঞ্হো* গ্রন্থে ঠিক এই রকম এক ব্যক্তির কথা আছে যে বনাঞ্চল পবিষ্কার করে জমিকে চাষযোগ্য করে তুলে তার মালিক হয়। মনু বলেন যে, কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ষিত ভূমির চেয়ে অকর্ষিত ভূমির দানগ্রহণ কম নিন্দনীয়, সম্ভবত ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য মনু ভাইদের পৃথক সংসার করার উপদেশ দিয়েছেন যাতে ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা করেন।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী যুগের ধারণাসমূহ মনুস্মৃতিতে একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এই বক্তব্য পরবর্তী যুগের ভৌম অধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহকে পরিচালিত করেছে। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলি কার্যত মনুস্মৃতিতে ব্যাখ্যা ও যুগোপযোগী রূপান্তর; মনুর টীকা ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে একথা খাটে। আরও কিছু তথ্য এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশীয় নৃপতিবর্গের লেখসমূহ থেকে। সাতবাহন রাজাদের কোনও কোনও প্রজা বিভিন্ন আয়তনের ভূমিখণ্ড যে বৌদ্ধভিক্ষুদের দান করেছিলেন তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্তমান। ভারতে ভূমিদানের প্রাচীনতম লৈখিক সাক্ষ্য খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে পুরোহিতদের গ্রামদান করা হয়। এই দানগুলি ছিল করমুক্ত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রদত্ত একটি দানে সাতবাহন নৃপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি সর্বপ্রথম তাঁর প্রশাসনিক অধিকার ত্যাগ করেন। তাঁদের মধ্যে বণ্টিত ভূখণ্ডে এমনকী রাজকীয় সেনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সাতবাহন সাম্রাজ্যের রাজকীয় জমি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ সংঘকে জমিদান করার সময় অপরের জমি ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এখানেও জেতবনের ন্যায় একই জমির দু'বার হস্তান্তর, বিক্রয় ও দান মারফত, লক্ষ্য করা যায়।

গুপ্তোত্তর যুগের স্মৃতিশাস্ত্রে জমির দান, বিভাগ, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা প্রভৃতি ব্যক্তিগত পর্যায়ের

হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে। চারণভূমিকে ভাগ করা যাবে না এই বিবরণ মনু (৯/২১৯) ও বিষ্ণু (১৮/৪৪) দিলেও বৃহস্পতি তা ভাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। কৌটিল্য বাস্তু বিক্রয়ের উল্লেখ করলেও বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী হিসেবে আবাদী জমির কথা বলেন নি। নারদ (১২/৫-৬) এবং যাজ্ঞবল্ক্য (১/১৭৭) বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী হিসেবে লৌহ, বস্ত্র, গাভী, ভারবাহী পশু, দাসদাসী প্রভৃতির উল্লেখ করেননি। বৃহস্পতি এবং কাত্যায়নই ভূমি বিক্রয়ের ও বন্ধক দেওয়ার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। জমির উপর মালিকানা হারিয়ে ফেলার যেসব নিয়ম আছে তা থেকেও জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রমাণিত হয়। মনু বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও সম্পত্তি দশ বছর ভোগ করে, তাহলে যার সম্পত্তি সে ভোগ করছে সে তার মালিকানা হারায়। জমির ইজারা ও বিলিব্যবস্থা সম্পর্কিত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত আইনকানুন থেকেও ব্যক্তিগত মালিকানার প্রমাণ হয়। প্রাপ্তিসাধ্য তথ্যসমূহের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে কোন একটি যুগে কোন একটি নির্দিষ্ট ধরনের জমি-মালিকানা ব্যবস্থা বা নিয়ম সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বত্র একরূপ ছিল না। বরং বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার সহাবস্থান কখনো একই জায়গায় একই সময় লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে বলা যায় যে মেগাস্থিনিস ও অপর গ্রীক বিবরণীতে ধারণা পাওয়া যায় তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। ব্যক্তিগত মালিকানা বহুল অংশে প্রচলিত ছিল। রাজার সার্বভৌম অধিকার সর্বক্ষেত্রেই বজায় ছিল।

২.৩ মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও কৃষককুল

পূর্বোক্ত সাতবাহনদের দানলেখসমূহের সূত্র ধরে বলা চলে যে, কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বা দেবতার নামে অথবা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করার যে রীতি গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ের যুক্তি। এর অর্থ, লোক জমিকে যেমন আবাদিযোগ্য করে তুলে প্রথম পর্যায়ে তা নিষ্কর ভোগ করে, সেই ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান। যদি কোন শাসক বা অধীনস্থ রাজা কিছু জমি নিষ্কর করে দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দিতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে রাজার অনুমতি নিতে হবে। প্রথা অনুযায়ী এই দানের যে ধর্মীয় পুণ্য তার দায়ভাগের পাঁচ ভাগ দাতার এবং এক ভাগ রাজার। এইজন্যই রাজকীয় তাম্রশাসনে লেখা হত যে রাজা তার অধীনস্থ অমুক স্থানের অমুক কর্মচারীর অনুরোধে অমুককে দেওয়া জমি নিষ্কর করছেন। যদি অধীনস্থ শাসক বা জমিদার অধিকতর শক্তিশালী হতেন তাহলে তিনি রাজার অনুমতি নিয়ে নিজেই দানপত্রের তাম্রশাসন জারি করতেন। আরও শক্তিমানেরা ঊর্ধ্বতনদের সমীহ করতেন না।

অগ্রহার, ব্রহ্মদেয়, দেবদান প্রভৃতি নামে পরিচিতি ভূমিদান অনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং ভূম্যধিকারের ক্ষেত্রে এই ধরনের নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এই সকল ভূমিদানের গ্রহীতারা স্বাভাবিকভাবেই বড় বড় জোতের মালিক হয়েছিল। তারা উৎপাদনের সুফল ভোগ করত (ভুজ্যমানক) কিন্তু স্বহস্তে চাষ করত না, ভূমিশ্রমিক বা ভাগচাষী নিযুক্ত করত। শাসিত এবং কৃষকদের মধ্যবর্তী এই শক্তিশালী মধ্যস্বস্তভোগী ভূম্যধিকারীরা আনুমানিক ৩০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন করেছিল বলে ঐতিহাসিকবর্গের একাংশ মনে করেন। এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

গুপ্তযুগের কিছু কিছু লেখ থেকে জানা যায় যে সম্রাটের অধীনস্থ কোন রাজা বা শাসক যখন কোন ব্যক্তিকে বৃহৎ ভূমিখণ্ড ব্রহ্মদেয় হিসাবে দান করছেন তিনি সেই সঙ্গে তাঁর শাসনতান্ত্রিক অধিকারও গ্রহীতাকে

হস্তান্তরিত করতেন। আবার বঙ্গদেশ ও মধ্যভারতের গুপ্ত আমলের ভূমিদানলেখসমূহ থেকে জানা যায় যে গ্রহীতা তার প্রাপ্ত ভূখণ্ড থেকে বরাবরের জন্য রাজস্ব ইত্যাদি পাওয়ার অধিকার হলেও সেই অধিকার হস্তান্তর করার ক্ষমতা বা অধস্তন প্রজা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার ছিল না। ব্রাহ্মণ বা ধর্মের সঙ্গে পেশাগতভাবে সম্পর্কিত নয় এবং ব্যক্তিকেও ধর্মকার্য নির্বাহের জন্য ভূমিদান করা হত, দৃষ্টান্ত ৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভারতের উচ্চকল্পবংশীয় জয়নাথের একটি লেখ যেখানে জনৈক দিবির বা কারণিককে একটি গ্রাম দান করা হয়েছে ধর্মীয় প্রয়োজন নির্বাহের জন্য। মধ্যভারতের, পশ্চিমভারতে ও দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে যে জমি দেওয়া হত তা সরাসরি রাজকীয় দান। জমি ও গ্রাম দু-ই দান করা হত। এই ভূমিদানের সময় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের পাশাপাশি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষ ও কুটুম্বীরা, অর্থাৎ জমির মালিকানা আছে এমন কৃষক উপস্থিত থাকতেন। বকাটক আমলে পশ্চিমভারতে ৩৫টি গ্রাম অগ্রহারে পরিণত করার দৃষ্টান্ত আছে। শুধু ব্রাহ্মণরাই নয়, বৌদ্ধবিহারগুলিও যে ভূসম্পদ লাভ করত, তার নজীর কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত বৈণ্যগুপ্তের তাম্রশাসন থেকে বোঝা যায়।

বঙ্গবিহারের পালবংশীয় রাজারা বৈষ্ণব, শৈব এবং বিশেষ করে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচুর জমির মধ্যস্বত্ব দান করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত ধর্মপালের একটি লেখে বলা হয়েছে যে তার অধীনস্থ রাজা নারায়ণবর্মা কর্তৃক শুভস্থলীতে নির্মিত একটি মন্দিরের জন্য প্রদত্ত গ্রামের গ্রহীতা ওই মন্দিরেরই লাট ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের গ্রামস্থ কৃষিজীবি ও পেশাদারগণ ছাড়াও নিম্নভূমি (তলপাটক), হাটবাজার (হট্টিক) এবং দশ ধরনের অপরাধের জন্য জরিমানা ধার্য করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল এইরকম শর্তে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বহু গ্রাম দান করেছিলেন। প্রতিহারবংশীয়সম্রাটদের লেখ থেকে জানা যায় যে তাঁদের অধীনস্থ কোন রাজা বা ভূম্যধিকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদান করতে চাইলে তাঁকে তন্দ্রপাল নামক রাজকর্মচারীর নিকট আবেদন করতে হত। সম্ভবত এই তন্দ্রপালেরা ছিলেন বিভিন্ন অধীনস্থ রাজ্যে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতিনিধি। রাষ্ট্রকূটদের ভূমিদানলেখের সংখ্যা পাল ও প্রতিহারদের চেয়ে অনেক বেশি, এক্ষেত্রেও গ্রহীতাদের কাছে শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এই ঐতিহ্য পরবর্তী যুগেও (১০০০-১৩০০ খ্রিঃ) বজায় ছিল।

নিয়মিতভাবে ভূসম্পদের উপর মালিকানা বা ভোগাধিকার পাওয়ায় কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হাতে বিস্তর অর্থনৈতিক সুবিধা জমা হয়েছিল। এইভাবে একটি মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকার শ্রেণী গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণদের অগ্রহার হিসাবে গ্রামের রাজস্বভোগের অধিকার দেওয়ার পিছনে ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য বহুলাংশে কার্যকর ছিল, এবং সেই একই প্রয়োজনে বিভিন্ন মন্দির ও মঠ ভূম্যধিকার লাভ করত। হিউয়েন সাঙ জানিয়েছেন যে নালন্দা-বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য একশো গ্রামের রাজস্ব বরাদ্দ ছিল, ই-ৎসিং এর সময় তা বেড়ে দুশোটি গ্রাম হয়। অগ্রহার প্রথা প্রবর্তনের দরুন রাজা বহু পরিমাণে কৃষিজ রাজস্ব হারাতেন একথা খুবই সত্য, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে অগ্রহার করার বহু ঘটনাতেই পতিত, অনুর্বর, অনুপাদক এবং সেহেতু রাজস্ববিহীন জমি হস্তান্তরিত হত। যেহেতু দানগ্রহীতাদের এই জাতীয় জমিদানে অন্ন সংস্থান হত, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁরা কোন-না-কোন ভাবে ওই অনুর্বর জমিকে চাষের আওতায় আনতেন। তবে মঠ বা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। গুপ্ত আমলের দানলেখসমূহে বলা হয়েছে যে গ্রহীতা তাঁর প্রাপ্ত

ভূখণ্ডের অধিবাসী, কৃষক, কারিগর ও অপরাপর পেশাদারদের কাছ থেকে বিধিসম্মতভাবে কর আদায়েরও অধিকারী ছিলেন। এ বক্তব্য বুদ্ধ ঘোষের রচনাতেও সমর্থিত হয়েছে যেখানে ব্রহ্মদেয় ভূখণ্ডের অধিকারীর শাসন ও বিচার বিষয়ক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মদেয় ভূমিখণ্ডের গ্রহীতাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করার খবর পাওয়া যায় না, তবে বকাটকরাজ দ্বিতীয় প্রবরসেনের চম্মক তাম্রশাসনে কিছু শর্ত আছে যেমন গ্রহীতারা রাজদ্রোহ, চৌর্য, ব্যাভিচার বা অন্য গ্রামের প্রতি অন্যায় কার্য থেকে বিরত থাকবে।

লেখসমূহে গ্রামদানের বা ভূমিদানের প্রসঙ্গে প্রদত্ত এলাকাটিকে অচাটভাট-প্রবেশ্য বা চাটভাট-অপ্রবেশ্য ঘোষণা করা বহুক্ষেত্রে হয়েছে, যার অর্থ সেখানে রাজকীয় নিয়মিত বা অনিয়মিত রক্ষীবাহিনীর প্রবেশাধিকার নেই। এর অর্থ দানগ্রহীতা কেবলমাত্র ভূসম্পদ ও গ্রাম থেকে প্রাপ্য রাজস্বই ভোগ করতেন না, রাজকীয় রক্ষীদের পরিবর্তে তিনি নিজেই গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও রাজস্ব সংগ্রহের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করতেন। গ্রহীতারা বরাবরের জন্য তাঁদের প্রাপ্ত গ্রামগুলি থেকে শুধুমাত্র কর আদায়েরই অধিকার পাননি, শাসন ও দণ্ডদানেরও (দশ প্রধান দণ্ড বা দশাপচার) অধিকার পেয়েছিলেন। এ থেকে যা অনুমান করা যায় তা হচ্ছে এই যে প্রদত্ত এলাকাসমূহে রাজকীয় ক্ষমতার ব্যাপক হস্তান্তর চলত, সাম্রাজ্য বা রাজ্যের মধ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

পাশাপাশি কৃষকদেরও প্রসঙ্গ আসে। ধনী চাষী বা জোতদার শ্রেণীর কৃষিজীবীরা গহপতি (গৃহপতি), কুটুম্বিক, মহত্তর প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু বিশাল কৃষকশ্রেণী, যাঁরা সচরাচর হালিক, কর্ষক প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন, বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, এবং অধিকাংশই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতেন। ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষুরা যাঁরা শাসকদের নিকট থেকে ভূমি বা গ্রাম অগ্রহারস্বরূপ লাভ করতেন, তাঁরা স্বহস্তে চাষ করতেন না। তাঁরা কৃষক নিয়োগ করে তাঁদের দিয়ে চাষ করাতেন। এই কৃষকদের অস্তিত্ব অবশ্যই ভূম্যধিকারীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ই-ৎসিং লিখেছেন যে নালন্দা বিহারের কৃষিভূমি অস্থায়ী কৃষকদের দিয়ে চাষ করানো হত। বৌদ্ধ সঙ্ঘ তাদের বলদের যোগান দিত, তবে লাঙ্গল, বীজ, সার এই সকল সামগ্রী দিত কি না তিনি তার উল্লেখ করেননি। বিনিময়ে সঙ্ঘ উৎপন্ন ফসলের ষষ্ঠাংশের অধিকারী হত। যাদের দিয়ে এইভাবে জমির চাষ করানো হত তাদের সঙ্গে এযুগের বর্গাদার বা ভাগচাষীর সাদৃশ্য আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে ভূমিসংক্রান্ত অধিকারের নিয়মাবলী সব ক্ষেত্রে একই রকম ছিল না। কৌটিল্য বলেছেন যে নতুন বসতির ক্ষেত্রে কর্ষণযোগ্য ভূমি রাজা প্রত্যক্ষভাবে কৃষককেই অর্পণ করবেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে কৃষককে জমি বরাদ্দ করবেন ক্ষেত্রস্বামী; রাজা বা মহীপতির এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার নেই। যাজ্ঞবল্ক্য ২/৫৭-র *মিতাক্ষরা* ও *বীরমিত্রাদয়*-এর ব্যাখ্যা অনুসারে ভূমির অধিকার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারটি স্তর নির্ণয় করেছেন—মহীপতি, ক্ষেত্রস্বামী, কর্ষক ও মজুর। বৃহস্পতি বলেন যে ক্ষেত্রস্বামী বা স্বামী রাজা এবং কৃষকের মধ্যবর্তী, যিনি কৃষকদের কর্ষণযোগ্য জমি দেবেন, এবং সেই জমি অকর্ষিত পড়ে থাকলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। মহারাষ্ট্র ও গুজরাত থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত দানলেখসমূহে এই জাতীয় ব্যবস্থার একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় যেখানে ইজারায় কর্ষণযোগ্য ভূমি গ্রহণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণরা অগ্রহার হিসাবে যে সকল গ্রাম পেতেন সেই সকল গ্রামের কর্ষণযোগ্য ভূমি স্বভাবতই কৃষকদের ইজারায় বা ভাগে দেওয়া হত।

মধ্যভারতের গুপ্তযুগীয় শাসনসমূহ থেকে কৃষকদের পক্ষে রাজার জন্য বিষ্টি বা বাধ্যতামূলক শ্রমদানের নিয়ম পাওয়া যায়। বকাটক ও গুপ্তদের অধীনস্থ কোন কোন রাজার লেখসমূহ থেকে জানা যায় যে ধর্মার্থে প্রদত্ত কোন গ্রামের ক্ষেত্রে এই বিষ্টি বা বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় চলবে না। মহারাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের একটি তাম্রশাসনে বিষ্টি ও দিত্য থেকে মুক্ত অগ্রহারের উল্লেখ আছে। পশ্চিম ভারত থেকে অনুরূপ আরও বহু তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ৪৫৭ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ। ধর্মীয় ও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়, শুধু রাজাই নয় যে-কোন ভূম্যধিকারীই এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। ষষ্ঠ শতকের বলভীর রাজা প্রথম ধরসেনের একটি শাসনে অগ্রহারিককে প্রয়োজনে এই অধিকার প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে প্রথম শিলাদিত্যের লেখসমূহে ভূম্যধিকারীর এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বাদামির চালুক্যদের শাসনসমূহেও এই প্রথার কথা বলা আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজা, অগ্রহারিক ও ক্ষেত্রস্বামীদের হাতে কৃষক ও ভূমিশ্রমজীবীদের উৎপীড়িত হতে হত। নানা প্রকারে রাজকর ও শ্রমদান ছাড়াও রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেত তাদের খোরপোষের জন্য অর্থ এবং রসদের যোগান দিতে হত ও তাদের জিনিসপত্র পরিবহণের জন্য গবাদি পশুও দিতে হত। সম্ভবত এই জাতীয় কর-কে কৌটিল্য সেনাভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ভাগচাষীরা মোটামুটি একই জমিতে চাষ করতেন জমির মালিকানা বদল সত্ত্বেও। পূর্ববঙ্গের আশরাফপুর তাম্রশাসনসমূহ থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধ সঙ্ঘকে প্রদত্ত একটি ভূমিখণ্ডে যাঁরা আগে চাষ করতেন তাঁদেরই রেখে দেওয়া হয়েছিল। একটি পল্লব দানলেখে দেখা যায় যে, চারজন ভাগচাষী সমেত একটি ভূমিখণ্ডকে ব্রহ্মদেয় করা হয়েছে। গোদাবরী জেলার এলোরে প্রাপ্ত সালংকায়ন বিজয় দেববর্মার একটি দানলেখ একজন ব্রাহ্মণকে কুড়িটি ভূমির নিবর্তন ক্ষেতমজুর ও তাদের বাসগৃহসহ প্রদত্ত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রিক বা কর্ষকরা কর্তব্যে অমনযোগী হলে স্বামী বা ভূমির মালিক তাদের পরিবর্তন করতে পারে। মালিকের প্রাপ্ত ভাগ ক্ষেত্রফল নামে পরিচিত ছিল যার পরিমাণ অবশ্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। উত্তম এবং নিয়মিত কর্ষিত জমির ক্ষেত্রে মালিকের ভাগ এক-ষষ্ঠাংশ, অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রে তা এক-অষ্টমাংশ বা এক-দশমাংশ ছিল।

২.৪ সামন্ত প্রথার ধারণা ও সংশ্লিষ্ট বিতর্ক

পূর্বে যে মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে এই শ্রেণীর দ্বারাই একজাতীয় সামন্ততন্ত্র এদেশে ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বলে রামশরণ শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকবর্গ মনে করেন। ভূমিদানলেখসমূহ থেকে শর্মা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে গুপ্তযুগ থেকেই এদেশে এক ধরনের সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও দর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহু-ক্ষেত্রেই কর আদায়ের অধিকারসহ গ্রামদান করা হত। এই অধিকার হস্তান্তরের ফলে একটি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে গ্রামবাসীদের সমষ্টিগত অধিকারসমূহ গ্রহীতা জমিদারদের হাতে চলে গিয়েছিল এবং বর্ধিত করভার ও বাধ্যতমূলক শ্রম আদায় কৃষকদের পক্ষে এই নূতন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে খুবই নিপীড়নমূলক করে তুলছিল। এই জমিদার প্রভাবিত

সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের পরাধীনতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এককসমূহ, ওজন ও মাপের স্থানীয়তা, মুদ্রার সংখ্যাল্পতা, বাণিজ্যের অবক্ষয় এবং ছোট ধরনের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন। শর্মার মতে এগুলিই হচ্ছে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান লক্ষণ। মধ্যস্বত্বভোগী এই জমিদারশ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক ও রাজস্বভোগের অধিকারসহ গ্রাম ও গ্রামনিচয়ের মালিকানা লাভ যেমন প্রদত্ত এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সহায়ক হয়েছিল, অপরদিকে তেমনই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকাশ ও কেমিসমাজের রূপান্তরের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শর্মার মতে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্মেষ খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬০০-র সময়সীমা, খ্রিস্টীয় ৬০০-৯০০-র মধ্যে এবং চূড়ান্ত রূপটি খ্রিস্টীয় ৯০০-১২০০-র মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

শর্মা বলেন যে সামন্তপ্রথার উদ্ভব এক বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্ম দিয়েছিল। এর ফলে ভূমিব্যবসায় ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপক প্রসার ও ভূম্যধিকারীদের ব্যাপক ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং পাশাপাশি জমির উপর রাষ্ট্রীয় ও যৌথ অধিকারের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়েছিল। যারা বরাবরের কৃষক তাদেরও অবস্থার হানি হয়েছিল। পূর্বে গৃহপতি, কুটুম্বী প্রভৃতি যে সকল পরিভাষার দ্বারা সমৃদ্ধ কৃষকদের বোঝাত, সেই সকল পরিভাষা পরবর্তীকালে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, পরিবর্তে হালকর, বদ্ধহল, আশ্রিত হালিক প্রভৃতি বিশেষ পরিভাষা কৃষকদের হীনাবস্থার পরিচায়ক হয়েছিল। অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে যে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয়, যেখানে লেনদেন হওয়ার মতো যথেষ্ট পণ্য উৎপাদিত হত না। এই অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। বাণিজ্যের অবক্ষয়ের সবচেয়ে প্রধান প্রমাণ হিসাবে শর্মা মুদ্রা ব্যবহারে ব্যাপক হ্রাসের ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি কার্যত ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থা সচলতা হারানোর ফলে কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে নগরের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং নগরসমূহের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে।

শর্মার এই গবেষণার গুরুত্ব অসাধারণ এবং তাঁকে অনুসরণ করে বি. এন. এস. যাদব বলেন যে মৌর্যোত্তর যুগ থেকেই এক জাতীয় ভ্যাসালেজ প্রথা, অর্থাৎ বড় রাজার সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ রাজাদের কিছু বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, গুপ্তযুগে যে সম্পর্কের ব্যাপ্তি ঘটে। গুপ্তোত্তর যুগের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার আবর্তে যে অর্থনৈতিক অধোগতি শুরু হয়েছিল তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু পূর্ব-শর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর মতে ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সংখ্যাল্পতা ও নিকৃষ্ট মানের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে মনে করা যেতে পারে যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নাগরিক জীবনে একটা বড় অবক্ষয় ঘটে গিয়েছিল এবং সমাজ বর্ধিতভাবেই গ্রামীণ হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় আঞ্চলিকতা ও স্থানীয়তার বিকাশ বেশিমাত্রায় ঘটেছিল এবং অর্থনৈতিক বদ্ধদশা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থনীতির সূত্রপাত করেছিল। তাঁর মতে মধ্যযুগের ইউরোপেও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রামানের এইরকম অধোগতি হয়েছিল। মুদ্রাব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে রাজাদের পক্ষে অধীনস্থ শাসকদের হাতে অধিকতর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল, এবং মুদ্রায় বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই কর্মচারীবর্গ, সশস্ত্র অনুগামী প্রভৃতি ব্যক্তিদের ভূমিদান করতে হয়েছিল।

ভূমিদান সংক্রান্ত যে তথ্যাবলী রামশরণ শর্মা উপস্থাপিত করেছেন তার প্রায় সবটাই হচ্ছে রাজা বা শাসকগণ কর্তৃক ধর্মার্থে ব্রাহ্মণদের বা কোন মঠ-মন্দিরকে ভূমিদান, যার সঙ্গে ইউরোপীয় ভূমি বিভাজন

বা হস্তান্তরের কোন তুলনা হয় না। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে একটা পবিত্র দায়বদ্ধতা, যেখানে প্রজা মনিবের জন্য শ্রমদান করতে বাধ্য, বিভিন্ন মাপের জমিদার ও সামন্তরা তাদের ঊর্ধ্বতন প্রভুকে অর্থ, লোকবল প্রভৃতির যোগান দিতে বাধ্য, বিনিময়ে রাজা তাদের অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য শপথের দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু এখানে রাজা বা শাসক, ভূমি বা গ্রামদান করেছেন শর্তহীনভাবে এবং এই প্রাপ্তির বিনিময়ে গ্রহীতার কোন বাধ্যবাধকতা ঊর্ধ্বতন প্রভুর কাছে নেই। যে জমি ব্রাহ্মণ বা মঠ-মন্দিরসমূহকে দান করা হত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিল অপ্রহত বা খিল-ক্ষেত্র, অর্থাৎ অকর্ষিত ভূমি। ইউরোপীয় ফিউডাল ব্যবস্থায় যে সামন্তরা ভূম্যধিকার পেতেন তা তাঁরা অধীনস্থ উপসামন্তদের মধ্যে শর্তাধীনে বিলিবন্দোবস্ত করার অধিকারী ছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে যে ভূমি বা গ্রামদান করা হ'ত তা করা হত নীতিধর্মের আদর্শে, যা অনুযায়ী গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই ভূমির বিলিব্যবস্থা, হস্তান্তর, বিক্রয় ও বন্ধক প্রদানের অধিকারী হতে পারেন না।

শর্মার মতে ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অনুসৃত ভূমিদানরীতি অন্যান্য পদাদিকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত কেননা হিউয়েন সাঙ ও মনু বলেছেন যে রাজকীয় পদাধিকারীদের বেতন হিসাবে ভূমি ও জায়গীরদানের রীতি ছিল। কিন্তু এই বক্তব্যকে সমর্থন করার মতো পর্যাপ্ত দানলেখ খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন সামন্তগণ রাণক, ভূপাল, ভোক্তা, মহাসামন্ত, মণ্ডলিক, ভৌগিক, মহামণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। এই উপাধিগুলি কোন এলাকার উপর আধিপত্যবাচক, কিন্তু উপাধিধারীরা রাজার কাছ থেকে ভৌম অধিকার পেয়েছিলেন একথা কোন ভূমিলেখের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় না। এও দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র আঞ্চলিক নৃপতি দম্ভপূর্ণ রাজকীয় উপাধি নিয়েছেন, এবং তাঁর চেয়ে অনেক বড় রাজা ছোটখাটো উপাধিতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। ভারতীয় কৃষকেরা ছিলেন স্বাধীন কৃষিজীবী জাতি, ইউরোপীয় সার্ফদের মতো তাঁরা নিছকই ভূমিশ্রমিক ছিলেন না বা তাঁদের প্রভুর জমিতে বদ্ধ ছিলেন না। ইউরোপীয় ম্যানরের অধিপতির সঙ্গে ভূমিবদ্ধ সার্ফদের যে সম্পর্ক ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, ভারতে তা অনুপস্থিত। বাধ্যতামূলক শ্রম বা বিষ্টি এখানে কৃষক ছাড়াও শ্রমিক ও কারিগরদের কাছ থেকে আদায় করা হত। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রসমূহে এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান করপ্রদান বলে গণ্য হয়েছে যা প্রজারক্ষার বিনিময়ে রাজার বেতন। ইউরোপের মতো ভারতবর্ষে ভূমিস্বামীদের ব্যাপক বেগার খাটানোর আইনানুগ অধিকার ছিল না।

শর্মার সিদ্ধান্তসমূহ হরবন্‌স মুখিয়া অনুমোদন করেন নি। তাঁর মতে আদি মধ্যযুগে কৃষকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন যেগুলির উপর সামন্ত বা ভূম্যধিকারীর নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা না থাকায় ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে আধিপত্য-অধীনতার সম্পর্ক দানা বাঁধতে পারেনি। খ্রিস্টীয় ৬৫০-১২০০ পর্বের উৎপাদন ব্যবস্থায় যেহেতু ভারতবর্ষে 'ভূমিদাস' শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, এবং যেহেতু রাজা এবং ভূস্বামীর মধ্যে, তথা ভূস্বামী ও কৃষকের মধ্যে কোন চুক্তি থাকার প্রমাণ নেই, সেই কারণে এই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামন্তপ্রথা অভিধায় চিহ্নিত করতে তিনি নারাজ। শর্মা ও যাদবের তত্ত্বর সমালোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে অগ্রহার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রতাপ হ্রাস বা অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয় না। এই ব্যবস্থায় দানগ্রহীতা কর ভোগের অধিকার পেতেন, কিন্তু বিভিন্ন লেখের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে এটাও দেখানো যায় যে, কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত, কর সংগ্রহ করার ক্ষমতা

ও অধিকার দানগ্রহীতার ছিল না। বহু ক্ষেত্রে রাজকীয় আদেশনামা দ্বারা অগ্রহার এলাকা থেকেও কর সংগ্রহ করা হত। তাঁর মতে অগ্রহার ব্যবস্থার ভূম্যধিকারীরা প্রকৃতপক্ষে জমিদারের সমতুল্য ছিলেন, মধ্যস্বত্বভোগী বা উপস্বত্বভোগী ভূস্বামী ছিলেন না।

অর্থনৈতিক অধোগতির তত্ত্ব সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের স্থাপত্যমূলক কীর্তিসমূহ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে একটা বৃহৎ পরিমাণের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত রাজা এবং উচ্চবর্গের ব্যক্তিদের হাতে জমা হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পালদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে চিত্র আরব লেখকদের রচনায় পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তৎকালীন রাজাদের এমন দুর্দশা হয়নি যে নগদ মুদ্রায় তাঁরা কর্মচারীদের বেতন দিতে অক্ষম ছিলেন। সুলতান মাহমুদ কর্তৃক লুণ্ঠিত সামগ্রীসমূহের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যা কম ছিল না। অনেক শক্তিমান রাজা বা রাজবংশ রাজার চালু মুদ্রাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে নূতন মুদ্রা প্রচলন করেননি। কাশ্মীরে একাঙ্গ, তন্ত্রী ও ডামররা রাজা কেনাবেচা করত নগদ মুদ্রার মাধ্যমে। পাণ্ড্যরাজারা আরবদের কাছ থেকে নগদ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে অশ্ব ক্রয় করতেন বিপুল সংখ্যায়। তিনি আরও বলেন যে প্রত্নলেখসমূহ থেকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন নরপতি এবং তাঁদেরও অধীনস্থদের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এইসব তথাকথিত সামন্তরাজা বা সর্দাররা রাজস্ব-মুক্ত গ্রাম বা ভৌম এলাকা সৃষ্টির জন্য দায়ী, এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত উপরোক্ত তথ্যপ্রমাণাদি এ কথাই বলে যে প্রাচীন ভারতে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধাঁচ লক্ষ্য করা যায় না। তবে মানব-জমি সম্পর্ক, জমি মালিকানার স্বরূপ ও সংজ্ঞা, রাষ্ট্র সংগঠনের রূপ ও চরিত্র, রাজার সার্বভৌমিক শক্তির রূপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুপ্তোত্তর যুগ থেকে ক্রমশ বর্ধিত পরিবর্তনসমূহ সমাজকে একটি বিশেষ আকার দিয়েছিল—যা থেকে আমাদের বলতেই হবে যে আদি মধ্যযুগের সূচনা এই সময় থেকে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনগুলির একটি ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সংজ্ঞা না খাড়া করেও পরিবর্তনগুলির বাস্তবতা ও তার চরিত্র খোঁজা যায়। তবে শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকদের তত্ত্বমূলক সংজ্ঞা খোঁজার প্রচেষ্টা অপরিসীম মূল্যবান এবং তাঁদের নির্দেশিত তথ্যাবলী নূতন গবেষণার ও পুনর্মূল্যায়নের দাবী রাখে। সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের অবসান এখনো ঘটেনি।

২.৫ অনুশীলনী

১। প্রাচীন ভারতে কৃষি ও জলসেচ ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

২। প্রাচীন ভারতে চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

৩। প্রাচীন ভারতে ভূমির মালিকানা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস, কৌটিল্য ও গুপ্তযুগের ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

৪। মধ্যস্বত্বভোগী ভূম্যধিকারী শ্রেণী ও কৃষকদের অবস্থা ও সম্পর্ক সম্বন্ধে রচনা লিখুন।

৫। সামন্ত প্রথার ধারণাকে ঘিরে কী বিতর্ক উঠেছিল?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। রণবীর চক্রবর্তী ঃ *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (১৯৯১)*

২। রাধাগোবিন্দ বসাক ঃ *কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র,* দুই-খণ্ড (১৯৬৪,১৯৬৭)

৩। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় ঃ *ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা (১৯৯৩)*

৪। ইউ. এন. ঘোষ ঃ *দি এগরেরয়ান সিস্টেম ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৭১)*

৫। ডি. এন. ঝাঁ (সম্পা.) ঃ *ফিউডাল সোশাল ফরমেশানস ইন আর্লি ইন্ডিয়া (১৯৮৭)*

৬। ডি. সি. সরকার ঃ *ল্যান্ডলর্ডইসম্ এ্যান্ড টেনান্সি ইন এনশিয়েন্ট এন্ড মেডিয়াভাল ইন্ডিয়া, (১৯৬৯)*

একক ৩ ☐ প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির কৃষি-অতিরিক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.১.১ হরপ্পা সভ্যতা

৩.১.২ হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিসমূহ

৩.১.৩ বৈদিক যুগের কারিগরি

৩.১.৪ পরবর্তী পর্যায়সমূহ

৩.২ কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহ ঃ শ্রেণী, সঙ্ঘ ইত্যাদি

৩.৩ বাণিজ্য ও নগরকেন্দ্রিকতা

৩.৩.১ হরপ্পা সভ্যতা

৩.৩.২ বৈদিক যুগ

৩.৩.৩ দ্বিতীয় নগরায়ণের যুগ

৩.৪ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বন্দরসমূহ

৩.৪.১ রোমক বাণিজ্য

৩.৪.২ গুপ্তযুগের বাণিজ্য

৩.৪.৩ আদি-মধ্যযুগের বাণিজ্য ও নগরসমূহ

৩.৫ অনুশীলনী

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- প্রাচীন ভারতের কারিগরি ব্যবস্থা
- কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহ
- বাণিজ্য ও নগরায়ণ

৩.১ কারিগরির উৎস সন্ধানে

প্রাক্-হরপ্পীয় পর্যায় : ভারতবর্ষে ধাতব ও অপরাপর কারিগরির উৎস অনুসন্ধানে কোয়েটা থেকে ১৫০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত মেহেরগড় নামক প্রত্নস্থলটিতে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যেখানে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ থেকে তাম্রের ব্যবহার শুরু হয়। মেহেরগড়ের দ্বিতীয় পর্বে হাতে তৈরি ও কুমোরের চাকার পাত্র দেখা যায়, সেই সঙ্গে শঙ্খ এবং দামী-আধাদামী পাথরের উপর সূক্ষ্ম কাজ। পরবর্তী পর্বগুলিতে মৃৎশিল্পের আরও উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়, যেখানে নানাপ্রকার রঙের প্রয়োগ দেখা যায়। বেলুচিস্তানের প্রাক্-হরপ্পীয় নবাশ্মীয়-তাম্রশ্মীয় সংস্কৃতিগুলির (খ্রিস্টপূর্ব-চতুর্থ-প্রথম সহস্রাব্দ) ক্ষেত্রে বিবর্তনধর্মী কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় যেমন গ্রাম্যদশা থেকে ইষ্টকনির্মিত আবাস ব্যবস্থায়, অর্থাৎ নাগরিকতায়, রূপান্তর; হস্তনির্মিত মৃৎপাত্র থেকে চক্রনির্মিত; ক্ষেত্রবিশেষে রঙের দ্বারা চিত্রিত, মৃৎপাত্রশিল্পে রূপান্তর; এবং হাতিয়ারগত কলাকৌশলের ক্ষেত্রে প্রস্তর থেকে তাম্র ব্রোঞ্জ এবং হরপ্পা-উত্তর যুগে তাম্র ব্রোঞ্জ থেকে লৌহে রূপান্তর। এইসকল সংস্কৃতিতে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় নানাপ্রকার সামগ্রী দেওয়ার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—তামার হাতিয়ার ও উপকরণ, আধা-দামী পাথরের গহনাপত্র, তামা এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত দর্পণ প্রভৃতি। এছাড়া পোড়ামাটির বৃষ ও মাতৃকামূর্তির কথাও উল্লেখ্য। মুন্ডিগক, কিলিগুল-মুহম্মদ, ডাম সাদত, কুল্লী, নাল প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে নানা সংস্তর থেকে তাম্রনির্মিত কুঠার, হাতল পরাবার গর্তযুক্ত বাইস, করাত, বাটালি, বর্শাফলক, ছোরা, পিন, আয়না, কাস্তে ধরনের ফলা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণরঞ্জিত মৃৎপাত্রের ব্যাপক পরিচয় বিভিন্ন কেন্দ্রে পাওয়া গেছে। সিন্ধুর অম্রী নামক কেন্দ্রের প্রাক্-হরপ্পীয় পর্যায়ে প্রথম দিকে হস্ত ও পরে চক্রনির্মিত, ক্রীমরঙের এবং জ্যামিতিক নকশা-শোভিত মৃৎপাত্র ছাড়াও হালকা লোহিত অথবা পাটল বর্ণের অলঙ্করণ যুক্ত মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধুর কোট-ডিজিতেও উন্নতমানের চক্রনির্মিত মৃৎপাত্র, প্রস্তর ও তাম্র ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ও উপকরণ, পোড়ামাটির খেলনা, মূর্তি বল পাওয়া গেছে। রাজস্থানের কালিবঙ্গানে পাথরের ফলা শিল্প, চুনাপাথর ও আধা-দামী পাথরের নানা উপকরণ এবং তামার তৈরি কিছু সামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখনকার প্রাক্-হরপ্পীয় মৃৎপাত্র চক্রনির্মিত, হালকা, লোহিতাভ থেকে পাটল বর্ণের কালো রঙের দ্বারা চিত্রিত, জ্যামিতিক বা প্রাকৃতিক অলঙ্করণসহ। অনুরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে চৌতাঙ্গা নদীর তীরে সোথি নামক স্থানে।

৩.১.১ হরপ্পা সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতায় তাম্রের ব্যবহারের চার রকম প্রকারভেদ দেখা যায়—গন্ধকের উপাদানসহ অপরিশোধিত তাম্র, আর্সেনিক ও অ্যান্টিমনি উপাদানের সাধারণ লক্ষণসহ পরিশুদ্ধ তাম্র, দুই থেকে পাঁচ শতাংশ আর্সেনিকের উপাদানসহ সাধারণ ব্যবহৃত তাম্র, এবং ব্রোঞ্জ যেখানে টিনের খাদের পরিমাণ এগারো থেকে তেরো শতাংশ। হরপ্পায় কলস জাতীয় পাত্রাদি মূলত ধাতু পিটিয়ে তৈরি করা হত, তবে ব্রোঞ্জের খেলনা, মূর্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ছাঁচে ঢালাই করার প্রথাই চালু ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় নানা ধরনের স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যের সামগ্রী পাওয়া গেছে। এই সোনা হালকা রঙের কিছুটা রৌপ্য মিশ্রিত। সোনা বা রূপার কাজের ক্ষেত্রে বর্তমান স্বর্ণকারদের অনুসৃত পদ্ধতিই কার্যকর ছিল। ঝকমকে পাথরের অলঙ্কারের কিছু নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভয় নগর থেকেই পাওয়া গেছে। অলঙ্কারে ব্যবহৃত আধা-দামী পাথরের মধ্যে পান্না, নীলকান্ত, ল্যাপিস-লাজুলি, জেড, অকীক, জ্যাসপার, প্লাসমা প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য যেগুলি হার বা মালার দানা হিসাবে ব্যবহৃত হত। তামা বা ব্রোঞ্জ নির্মিত দর্পণ ও ক্ষুর, হাতির দাঁতের নির্মিত চিরুনি প্রভৃতিরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। কাপড় বোনার যে প্রচলন ছিল তা প্রাপ্ত কয়েকটি মাকু থেকেই বোঝা যায়। নানা আকারের মৃৎপাত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে, চক্রনির্মিত, সচরাচর লালরঙের কাদায় তৈরি, বর্ডার দেওয়া খুবই সাধারণ ধরনের। চিত্রিত মৃৎপাত্রের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কালো রঙের ব্যবহার ছিল এবং সেগুলি জ্যামিতিক নকশা বা পশুপাখির চিত্র বহন করত। শিল্পগত নিদর্শন হিসাবে মূর্তি, সিল, তাবিজ ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্র সামগ্রীর উল্লেখ করা যায়। মৃন্ময় মূর্তিগুলি পোড়ামাটির। বাতিদান, প্রদীপ, চেয়ার, চৌকি, টুল, মাদুর, খেলনা, গরুর গাড়ি, মার্বেল, পাথরের বল, পাশা, ধাতব ছুঁচ, করাত, ছুরি, বড়শি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তামা অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি কুড়াল, বর্শা, ছোরা, তীর, গাদা, তরবারি, দাঁতালো করাত প্রভৃতি হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাথর একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি, বরং চার্ট পাথরের কলাশিল্পে বিশেষ বিকাশ ঘটে।

৩.১.২ হরপ্পা-উত্তর সংস্কৃতিসমূহ

অন্ধ্র ও কর্ণাটকের কৃষ্ণা ও কাবেরী উপত্যকার নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় (২০০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) সংস্কৃতিসমূহের প্রথম পর্যায়ে প্রধানত ভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী মসৃণ কুঠার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক আয়ুধ, চার্ট ও কোয়ার্টজ নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্ম, অস্থিনির্মিত হাতিয়ার, ফলা-শিল্প (ব্যাপক বিকাশ অন্ধ্র ও কর্ণাটকের সঙ্গানকল্লু, ব্রহ্মগিরি ও পিকলিহালে), বিভিন্ন ধরনের হস্তনির্মিত এবং প্রধানত ধূসর বর্ণের মৃৎশিল্প (পিকলিহালে পাঁচ ধরনের, সঙ্গানকল্লু, ব্রহ্মগিরি ও মাস্কিতে তিন ধরনের), কাঠের খুটিওয়ালা চালাঘর, কিছু পোড়ামাটির বৃষমূর্তি, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে, আনুমানিক ১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে, উপযুক্ত এবং দক্ষিণী কেন্দ্রসমূহে তাম্রনির্মিত আয়ুধ ও সামগ্রী পাওয়া গেছে। গুজরাতের তাম্রাশ্মীয় বসতিসমূহে তাম্র ও ব্রোঞ্জের সামগ্রী, আধা-দামী পাথরের পুঁতি, পোড়ামাটির খেলনা এবং উজ্জ্বল লাল এবং কালো-ও-লাল বর্ণের পাত্রাদি পাওয়া গেছে। হরপ্পা-উত্তর বানাস উপত্যকার আহাড় সংস্কৃতিতে তাম্রনির্মিত হাতিয়ার ও উপকরণের প্রাচুর্য দেখা যায়। এখানে সাত ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, প্রধান ধরনটি হচ্ছে কালো-ও-লাল, সাদা চিত্রণসহ। উভয় অঞ্চলেই বিশিষ্ট গৃহনির্মাণশিল্প ও বয়নশিল্পের বিকাশ দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহে পূর্বোক্ত ধরনের ধাতব, গৃহনির্মাণগত এবং বয়নসংক্রান্ত কারিগরির নিদর্শন পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের কায়থ প্রত্নক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্তরে যে মৃৎশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তা মালব ও জোরওয়ে ধরন নামে পরিচিত। জোরওয়ে আহমদনগর জেলায় অবস্থিত। নাবডাটোলি তৃতীয় সংস্তরে জোরওয়ে ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, যেগুলি চক্রনির্মিত, কালো রঙের সামান্য অলঙ্করণসহ সাল রঙ বিশিষ্ট। জোরওয়ে নেভাসা, দাইমাবাদ, চন্দোলি, সোনেগাঁও, ইনামগাঁও, বহুরূপ প্রভৃতি অম্রাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলি মহারাষ্ট্রের পশ্চম জেলাগুলিতে অবস্থিত এবং প্রকাশ ও বহল পশ্চিমে বহমান তাপা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। এগুলি সামীপ্যের কারণে মধ্যপ্রদেশের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিসমূহের সদৃশ। নেভাসা, ইনামগাঁও ও চন্দোলিতে তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব দেখা যায়। কার্পাস ছাড়াও রেশমের বস্ত্র উৎপাদিত যে হত তারও প্রমাণ আছে। ১১০০ থেকে ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনা-দেয়াব অঞ্চলে গড়ে ওঠা চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সাথে লৌহনির্মিত উপকরণ পাওয়া গেছে। অত্রাঞ্জিখেরা, নোহ, অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র থেকে লোহার কুঠার, দোরা, খুরপি, বাণফলক, বঁড়শি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। গাঙ্গেয় পূর্বোত্তরাংশে গড়ে ওঠা উত্তরের কৃষ্ণমসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতির সাথে লৌহনির্মিত

সামগ্রীর সঙ্গে বিশেষ ধরনের মৃৎশিল্পের সংযোগ ঘটেছে। একথা উপদ্বীপীয় ভারতের ক্ষেত্রেও সত্য। এখানকার মহাশ্মীয় সমাধিগুলিতে লৌহনির্মিত হাতিয়ার ও উপকরণ পাওয়া গেছে। দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের সমাধিতেও সমজাতীয় উপকরণ দেখা যায়। সম্ভবত লৌহনির্মিত এই সকল উপকরণ একটি বিশেষ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে তৈরি হত এবং সেখান থেকে সমাধিতে অর্পণ করার উদ্দেশ্যে সামগ্রীগুলিকে রপ্তানি করা হত।

৩.১.৩ বৈদিক যুগের কারিগরি

বৈদিক সাহিত্যে অসংখ্য বৃত্তিজীবী মানুষের উল্লেখ আছে, এবং এ-সকল পেশাদার গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে বিভিন্ন মর্যাদার জাতিতে রূপান্তরিত হয়। *ঋগ্বেদ*-এ সূত্রদর, তুষ্টা বা বিশেষ ধরনের সূত্রধর, কর্মার বা কর্মকার, চর্মন্ন বা চর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। *অথর্ববেদ*-এ (৩/৫/৬-৭) রথকার ও কর্মারের উল্লেখ আছে। *বাজসনেয়* (১৬/২৭), *কাঠক* (১৭/১৩) এবং *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য় কর্মার, রথকার, তক্ষণ (যারা কাঠের উপর কারুকার্য করে), কুলাল (কুম্ভকার), ধন্বকৃৎ (ধনু প্রস্তুতকারক) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কর্মার ও রথকারদের মনীষিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে যে থেকে মনে হয় তাদের কুশলী কারিগর মনে করা হত। *যজুর্বেদ*-এর শতরুদ্রীয় অংশে সুনির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী হিসাবে কুলাল, রথকার, তক্ষণ, কর্মার, মণিকার, ইষুকার-ধন্বকার-জ্যাকার (ধনু ও বাণ নির্মাতা), রজ্জুসর্গ (রজ্জু প্রস্তুতকারী), সুরাকার, অয়স্তাপ (ঢালাইকর), বিদলকার) ধাতুর উপর কারুকার্যকরী, কন্টককার প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে।

অয়স্কার বা কর্মকারদের কথা *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে যারা বিভিন্ন ধাতব উপকরণ নির্মাণে পারদর্শী ছিল। ঋগ্বেদ-এ অয়স বলতে ঠিক কোন্ ধাতু বুঝিয়েছে তা বলা শক্ত, লোহা বা ব্রোঞ্জ দুই-ই হতে পারে। *বাজসনেয় সংহিতা*-এ (১৮/১৩) অয়সকে ছয়টি ধাতুর একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকী পাঁচটি যথাক্রমে হিরণ্য, শ্যাম, লোহা, সীম ও ত্রপু। এগুলির মধ্যে হিরণ্য অবশ্যই সোগ, সীম, সীসা এবং ত্রপু টিন। *অথর্ববেদ*-এ (১১/৩/১ ইত্যাদি) এবং *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-এ (৪/২৯) অয়সকে শ্যাম ও লোহিত এই দুটি ভাগে ভাগ করকা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমটি লৌহ এবং দ্বিতীয়টি তাম্রা বা ব্রোঞ্জের দ্যোতক। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (৫/১/৪/২) অয়স ও লোহায়সের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। কর্মার বা কর্মকারদের ধমাতৃ হিসাবে ঋগ্বেদ-এ (৫/৯/৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, শব্দটির অর্থ ধাতুর তরলীকরণ। ধাতব পাত্রে (ঘর্ম অয়স্ময়) অগ্নিতে ধাতু গলিয়ে তরল করে ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হত তার উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ (৫/৩০/১৫) আছে। লোহা গলাবার জন্য চর্মনির্মিত হাপরের কথাও জানা যায়। সোমপানের পাত্র গলানো ধাতু (অয়োহত) পিটিয়ে প্রস্তুত করার কথাও *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ কৌলালচক্র বা কুমোরের চাকার উল্লেখ আছে যা থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে চক্রের সাহায্যে মৃৎপাত্র গড়ার যে পদ্ধতি বর্তমান অনুসৃত হয় সেই একক পদ্ধতি সে যুগেও বহাল ছিল। ইষুকার বা ইষকৃৎ বলতে বাণ প্রস্তুতকারী এবং ধন্বকৃৎ বলতে ধনু প্রস্তুতকারী বোঝায়। চর্মনির্মিত ধনুর ছিল বা জ্যা যারা প্রস্তুত করত তাদের জ্যাকার বলে অভিহিত করা হত। বাণ প্রস্তুত বিষয়টি খুব সাধারণ ছিল না, যার জন্য পেশাদারী দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। চর্মন্ন বলতে বোঝায় চামড়ার কারিগর। তাদের কর্মপদ্ধতি বিশেষ করে চামড়াকে ঋতু-সহ বা ট্যান করার পদ্ধতি 'ম্লা' বলে কথিত হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ শঙ্কুর সাহায্যে চামড়াকে কাজের উপযোগী করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে রথকারদের একটি সুনির্দিষ্ট জাতি বলে গণ্য করা হয়েছে। তাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিল, কেননা রথনির্মাণের কাজ প্রযুক্তিবিদ বা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। বৈদিকযুগের রথ

সচরাচর দ্বিচক্র নির্ভর হত। চাকার বেষ্টনী বা বিমকে বলা হত পবি, মধ্যস্থ গোলাকার ভরকেন্দ্রটিকে বলা হত প্রধি, ভরকেন্দ্রের মধ্যবর্তী গর্তটিকে বলা হত নভ্য এবং যে গোলাকার দণ্ড দিয়ে দুটি চক্রের নভ্যকে জোড়া হত তাকে বলা হত অক্ষ। এই অক্ষ তৈরি হত অরটু নামক কাঠ দিয়ে। অক্ষের দুই প্রান্তের উপর ভর দিয়ে কোমা বা রথের উপরের অংশ নির্মিত হত। আসলে রথের বাহ্যিক আচরণ বা কারুকার্যের চেয়ে চেসিস (শ্যাসি) বা মূল কাঠামোটা গড়ে তুলতে রীতিমত দক্ষতার প্রয়োজন হত। বিশেষ করে অক্ষদণ্ড সংস্থাপনের ক্ষেত্রে ভুল হলে চলন্ত অবস্থায় রথের ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে রথকারদের কাজের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। *ঋগ্বেদ* (১০/২৬/৫) এবং *অথর্ববেদ*-এর (১৯/৪১/২) বক্তব্য অনুযায়ী প্রধানত সূক্ষ্ম কাজের জন্য তক্ষণদের প্রয়োজন হত। তক্ষণদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে আমরা কুলিশ, পরশু ও ভূরিজের উল্লেখ পাই (*ঋগ্বেদ*-এ ৩/২/১, *কাঠক সংহিতা* ১২/১০) যা বাটালি, ভোমর প্রভৃতির পরিচায়ক। কাঠের কারিগরদের বোঝানোর জন্য *ঋগ্বেদ*-এ ত্বষ্টা নামক একটি বিশেষ পরিভাষা কখনও কখনও ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.১.৪ পরবর্তী পর্যায়সমূহ

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ খনি ও খনিজদ্রব্য তথা ধাতুশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এই সকল ক্ষেত্রের শ্রমিক ও কারিগরদের ব্যাপক অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় যারা আকরাধ্যক্ষ, লোহাধ্যক্ষ, খন্যধ্যক্ষ, রূপিক, রূপদর্শক ও লবণাধ্যক্ষের অধীনে কর্মরত থাকত। এছাড়া বস্ত্রশিল্প ও সুরাশিল্পের কথাও কৌটিল্য বলেছেন। লেখসমূহ, বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৈদেশিক বিবরণসমূহে সূত্রধর বা বর্ধকি (পালি ঃ বড়চকি), রসকার বা বাঁশের কারিগর, কৌলিক বা তাঁত, রঙ্গাকার (যারা বিভিন্ন রঙ দিয়ে কাপড় ছাপায়) গন্ধিক বা সুবাসক অর্থাৎ সুগন্ধ প্রস্তুতকারী, মালাকার, দন্তকার (যারা হাতির দাঁতের কাজ করত), মনিকার, সুবর্ণকার, ডুবুরি ও মুক্তাচাষী প্রভৃতি। বৈদেশিক বিবরণসমূহে পণ্য ও পণ্যকরের পেশার কথা আছে, কিন্তু বর্ধকী, কৌলিক প্রভৃতি নামের উৎসদেশীয় রচনা ও লেখমালা।

ধাতুর কারিগরদের মধ্যে গুপ্তযুগে কর্মকারের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কর্মকার কখনও কখনও সমকালীন সাহিত্যে লোহাকার নামে অভিহিত হয়েছে। বকাটক লেখে কাংসকারক ও সুবর্ণকারক নামক দুটি গ্রামের উল্লেখ আছে যেগুলি অবশ্যই কাঁসারি ও সোনার কারিগরদের অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দের গুজরাত থেকে পাওয়া একটি তাম্রশাসনে কুম্ভকার ও কুম্ভকারদের তৈরি মাটির পাত্রের উল্লেখ আছে। বৈণ্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসনে বর্ধকি বা ছুতোরের উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিদরা সম্ভবত বিলাল বলে অভিহিত হতেন। *অমরকোষ*-এ তন্তুবায়দের কথা আছে। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দের বিষ্ণুষেণের শাসনে কল্লার বা সুরাপ্রস্তুতকারীদের কথা বলা হয়েছে।

আদি মধ্যযুগের সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ থেকে কার্পাস ও বস্ত্রশিল্পের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। সমকালীন চৈনিক রচনাসমূহ এবং আরব লেখকদের বর্ণনায় বস্ত্রোৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রসমূহ, কোন কোন এলাকায় কী ধরনের কাপড় উৎপন্ন হয়, এবং বিভিন্ন বস্ত্র সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই তন্ত্রবায়রা তন্তুবায়রা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণী হয়ে উঠেছিলেন। তৈলিক বা তেলীয় উল্লেখ লেখমালায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তৈলোৎপাদকদের চক্রিক এবং খানক আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের অর্থুনা লেখে চিনি ও গুড়ের পৃথক কারিগরির কথা বলা হয়েছে। ধাতুর কারিগরি মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। অগণিত ধাতব দেবদেবীর মূর্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ সাক্ষ্য

দেয়। যাঁরা এই সকল মূর্তি গড়তেন তাঁরা ব্রোঞ্জ ঢালাই-এর মতো শক্ত কাজেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। লোহার কারিগরিও গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে রীতিমত বিকাশলাভ করেছিল। মেহেরৌলির লৌহস্তম্ভ (যেটি কুতবমিনারের চত্বরে অবস্থিত) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *যুক্তিকল্পতরু* গ্রন্থে বারাণসী, সৌরাষ্ট্র ও কলিঙ্গে তৈরি তলোয়ারের খ্যাতির কথা বলা হয়েছে।

৩.২ কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহ ঃ শ্রেণী, সঙ্ঘ ইত্যাদি

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই কারিগর ও বৃত্তিজীবীদের নানা সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলির সাথে মধ্যযুগের ইউরোপীয় গিল্ড ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে। *বৌধায়ন ধর্মসূত্র*, পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* ও পালি সাহিত্যে এগুলি শ্রেণী, সঙ্ঘ, গণ, পূগ সমূহ প্রভৃতি নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে যে এই সংগঠনগুলি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা পালি সাহিত্য ও লেখসমূহ থেকে জানা যায়। জাতক কাহিনীসমূহে শিল্পের স্থানীয়তার (লোকালাইজেশন) পরিচয় পাওয়া যায় যেমন, কর্মকারদের গ্রাম, বর্ধকীদের গ্রাম, উৎপল-বীথি (যে রাস্তার দুধারে পদ্মফুল বিক্রয় হত) ইত্যাদি। শ্রেণী বা সঙ্ঘের প্রধান হিসাবে জেটঠক (জেষ্ঠক) বা পমুখ (প্রমুখ)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, ধর্মশাস্ত্রসমূহে যাদের কার্যচিন্তক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরা সদ্বংশজাত, কর্মকুশল, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হবেন এই রকম আশা করা হত। শ্রেণী বা সঙ্ঘের সদস্যবর্গের জন্য নিয়মাবলীর কথা ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্ঘভুক্ত কারিগরদের উপার্জিত সম্পদ সমভাবে বণ্টিত হত। কোন সদস্য সঙ্ঘের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হত। সদস্যবৃন্দের সাথে নেতাদের বিরোধ ঘটলে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন দেখা দিত। এই সঙ্ঘ বা শ্রেণীসমূহ যে কতদূর প্রভাবশালী ছিল এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে কী ধরনের শ্রদ্ধা পেত তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে স্মৃতিশাস্ত্রে এমন বিধান দেওয়া হয়েছে। সঙ্ঘ বা শ্রেণী নিজেদের জন্য যে আইন প্রণয়ন করবে সেই আইনের বৈধতা রাজা মেনে নেবেন এবং তদনুসারে বিচার করবেন।

লেখসমূহের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে কারিগরি বৃত্তিসমূহকে সুসংহত করা ছাড়াও বহুক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের মতো কাজ করত। শক ক্ষত্রপ নহপানের নাসিক লেখে তন্তুবায়দের দুটি সঙ্ঘ বা শ্রেণীর (কৌলিক নিকায়) উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমটিতে নহপানের জামাতা দুই হাজার কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখেন। এই শ্রেণীটি ওই মূল অর্থের উপর বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ দিত। দ্বিতীয়টিতে তিনি একহাজার কার্ষাপণ জমা রাখেন। এরা সুদ দিত বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে। এই সুদ বা বৃদ্ধি থেকে আয় হত ৩৩০ কার্ষাপণ, যা দিয়ে নিকটস্থ বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুদের ভোজনের ক্ষেত্রে সামান্য সাহায্য করা হত। কুষাণরাজ হুবিষ্কের আমলে মথুরাতে আটাকলের কারিগরদের শ্রেণীতে এক রাজকর্মচারী ৫৫০ পুরাণ পরিমাণ আমানত গচ্ছিত রাখেন যা থেকে প্রাপ্য সুদ একটি মন্দিরের সেবায় লাগত। নাগার্জুনিকোন্ডায় অনুরূপ ব্যবস্থায় ৩৩০ কার্ষাপণ অর্থ চারটি শ্রেণীর দায়িত্বে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। নগদ অর্থ ছাড়াও স্থাবর সম্পত্তি, ক্ষেত্র, বৃক্ষাদিও আমানত হিসাবে রাখা হত এবং সঙ্ঘগুলি এ-সকল ক্ষেত্রে অছির ভূমিকা গ্রহণ করত। বহুক্ষেত্রে বরাবরের জন্য অর্থ জমা রাখা হত যে ব্যবস্থা অক্ষরনীবি নামে পরিচিত। আমানতকারীর মনে এই বিশ্বাস থাকত যে তাঁর অবর্তমানেও তাঁর গচ্ছিত অর্থের সুদ, যে উদ্দেশ্যে তিনি অর্থ গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যবহৃত হবে। এথেকে বোঝা যায় জনজীবনে এই শ্রেণী বা সঙ্ঘসমূহ কতটা বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিল।

পরবর্তীকালের লেখসমূহে অবশ্য শ্রেণী বা সঙ্ঘ সংক্রান্ত তথ্য কিছুটা কম। প্রাচীন মালবের দশপুর বা আধুনিক মান্দাসোর থেকে কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মার সময় উৎকীর্ণ একটি লেখে গুজরাত থেকে মালাব্দ আগত একদল দক্ষ রেশমশিল্পীর কথা বলা হয়েছে। এই লেখটি অন্য একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাগুক্ত শিল্পীরা শুধু দেশত্যাগই করেননি, তাঁদের মধ্যে অনেকে পেশাও বদলেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তৈলিকদের একটি শ্রেণীতে পূর্ববর্তী যুগের মতো চিরকালীন ভিত্তিতে অর্থলগ্নী করা হয়েছিল যার সুদ থেকে স্থানীয় সূর্যমন্দিরে দীপ প্রজ্জ্বলনের ব্যয় নির্বাহ হবে। গোয়ালিয়র থেকে ৮৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত দুটি লেখে অন্তত কুড়িজন তৈলিক প্রধান (তৈলিকমহত্তর) এবং চোদ্দোজন মালাকার গোষ্ঠীপ্রধানের উল্লেখ আছে। এছাড়া সুরা প্রস্তুতকারীদের, পরাতর কাটার কারিগরদের শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল সংগঠন নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করত। শুধুমাত্র বৈশালী থেকেই ২৭০টির মতো সিলমোহর ও সিলমোহরের ছাঁচ পাওয়া গেছে যেগুলিতে ‘শ্রেষ্ঠী-সার্থবহ কুলিক-নিগম’ এই জাতীয় বাক্যাংশ উৎকীর্ণ আছে। ‘নিগম’ শব্দটি সঙ্ঘ ও শ্রেণীর সমার্থক। কুলিক নিগম বলতে কারিগরদের সংগঠন বোঝায়, আর প্রথম কুলিক বলতে কারিগরদের. প্রতিনিধিকে বোঝায়। শেষোক্ত পদাধিকারী শাসনের ব্যাপারে বিষয়পতি বা জেলাশাসককে বেসরকারি ব্যক্তি হিসাবে সহায়তা করতেন।

গুপ্তযুগের স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে শ্রেণী বা সঙ্ঘ কর্তৃক সংস্থাপিত বিধিবিধানের দ্বারাই কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যের অপরাধের বিচার রাজা করবেন। শ্রেণীর নিয়ম ও প্রথাকে *নারদ* ও *বৃহস্পতি* স্মৃতিতে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রাজা শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এই রীতির ব্যতিক্রম তখনই হতে পারে যদি শ্রেণীর কর্তাব্যক্তিরা শ্রেণীর সদস্যদের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন। শ্রেণীর আপত্তি সত্ত্বেও যদি কোন সদস্যের কাজের দ্বারা শ্রেণীর সম্পদ হানি হয়, সেক্ষেত্রে ওই সদস্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। শ্রেণীর অন্তর্গত সদস্যেরা যখন কোন কাজ নেবেন তখন তাঁরা তা সমভাবেই নেবেন। শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক। বৃহস্পতির মতে যিনি শ্রেণীর সদস্য হতে চাইবেন তাঁকে ‘কোষ’ বা চারিত্রিক শুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, তাঁকে ‘লেখক্রিয়া’ বা শ্রেণীর নিয়মাবলী মানার অঙ্গীকার পত্র দিতে হবে এবং একজন ‘মধ্যস্থ’ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করবেন। আদি-মধ্যযুগে এই সকল শ্রেণী বা সঙ্ঘের গুরুত্ব কিছু কমে যায়। মনুস্মৃতির মেধাতিথি বিরচিত ভাষ্যে সদস্যদের উপর শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদি-মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তীকালে বিভিন্ন শাস্ত্রে শ্রেণীকে জাতির অভিধা দেওয়া হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে, জাতি ও শ্রেণী সমার্থক হয়ে গেছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত *বৃহদ্ধর্ম* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণে শ্রেণীগুলিকে সংকর বা মিশ্রজাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যে সকল শ্রেণী উত্তম ধরনের অর্থাৎ বস্ত্র, হিরণ্য প্রভৃতি পণ্য উৎপাদন করত তারা শুদ্ধ শ্রেণীরূপে পরিগণিত হত। পণ্যের প্রকৃতি, মূল্যবান ও পবিত্রতার মাত্রাভেদে শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ণীত হত।

৩.৩ বণিজ্য ও নগরকেন্দ্রিকতা

৩.৩.১ হরপ্পা সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতা ভারত ইতিহাসের প্রথম নগরায়ণের দৃষ্টান্ত। হরপ্পার নগরাশ্রয়ী অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল তার বাণিজ্য। হরপ্পীয় কারিগরদের বিভিন্ন ধরনের ধাতুর ব্যবহার থেকে প্রতিপন্ন হয়

যে সেখানে নানা স্থান থেকে ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তর আমদানি করা হত। মেসোপটেমিয়ার উর থেকে প্রাপ্ত চব্বিশটি হরপ্পীয় সিল সিন্ধু উপত্যকা ও টাইগ্রসি-ইউফ্রেটিস উপত্যকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। অক্কাদের রাজা সার্গনের লেখে উল্লিখিত মেলুহা অঞ্চলকে পণ্ডিতেরা নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার সাথে অভিন্ন মনে করেন। এখান থেকে পশ্চিম এশিয়ায় স্বর্ণ-রৌপ্য, ল্যাপিস লাজুলি, ময়ূর ওকাঠ রপ্তানি করা হত। সমুদ্র বাণিজ্যের অপর নিদর্শন পাওয়া যায় গুজরাতের লোথালে। এখানে একটি পোতাশ্রয় ছাড়াও বোতামের আকারের সিলমোহর পাওয়া গেছে, পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় যেগুলির চল খুব বেশি ছিল। বাণিজ্যিক লেনদেন চলার মাধ্যমে সম্ভভবত সিলমোহরগুলি পারস্য উপসাগরীয় এলাকা থেকে লোথালে আসে। দূর দূর এলাকার সঙ্গো ব্যবসা বজায় রাখার জন্য হরপ্পীয় নগরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। হরপ্পীয় অবশেষসমূহ থেকে ওজনের যে সকল বাটখারা ও মাপের যে সকল দণ্ড পাওয়া গেছে, উভয় ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখার জন্য হরপ্পীয়দের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

৩.৩.২ বৈদিক যুগ

যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে বৈদিক সভ্যতা একেবারেই গ্রামীণ, একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে বৈদিক সভ্যতার ব্যপ্তি বহুশতকের, এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রকৃতি মূলত ধর্মীয় হওয়ার জন্য ব্যবসা- বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী এখানে সীমিত। তবে বৈদিক সাহিত্যে যে সকল পেশা বা বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে বৈদিক সমাজে সচলতা যথেষ্টই ছিল, এবং ভাল ধরনের শিল্প-বাণিজ্যের পরিকাঠামো না থাকলে বৈদিক সাহিত্যে এত বিচিত্র পেশাদারিদের উল্লেখ থাকত না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে দ্রব্য বিনিময় প্রথা চালু ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে গাভীই ছিল বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম। সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু অবশ্যই সম্পদ হিসাবে গণ্য হত এবং তা সংগ্রহের পর্যাপ্ত চেষ্টা হত। *ঋগ্বেদ*-এ 'নিষ্ক' শব্দটির প্রয়োগ সম্ভবত 'মুদ্রা' অর্থে হয়নি। সেখানে (১/১১৬/২) শত নিষ্কের উল্লেখ বোধহয় শত সুবর্ণমুদ্রার পরিবর্তে সুবর্ণখণ্ডকে বুঝিয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ (৩/১২/৩) বাণিজ্যে শতধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। দূরবর্তী স্থানে এমনকী সমুদ্রপথেও বাণিজ্যের ইঙ্গিত আছে (১/৫৬/২)। যদিও *ঋগ্বেদ*-এ (১০/১৩৬/৫) পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ আছে এবং কোথাও কোথাও সামুদ্রিক সম্পদের কথাও বলা হয়েছে, তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে বৈদিক মানুষেরা, পরবর্তীকালের মুঘলদের মতোই, একান্তই স্থলচর মানুষ ছিল।

পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের যুগে অবশ্য বাণিজ্যিক বিকাশ ভালরকম দেখা যায় যেখানে বাণিজ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ বৈশ্যদের শ্রেষ্ঠী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ এযুগে কতদূর হয়েছি বলা শক্ত। *শতপথ ব্রাহ্মণে* কুসীদজীবীদের উল্লেখ আছে যারা নগদ মুদ্রায় না হোক, পণ্য এমনকী ধান্য বা গমের মতো কৃষিজ পণ্যও ধার দিত, এবং লাভের একটা অংশ সুদ হিসাবে গ্রহণ করত। ওজন হিসাবে 'মান' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন মান একটি কৃষ্মল বা গুঞ্জফলের সমান। এই হিসাবে শতমান সম্ভবত শত কৃষ্মলের সমান ওজনের সুবর্ণখণ্ড ছিল। মনে হয় এই শতমানই পরবর্তীকালে নিষ্ক বা মুদ্রা হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। পণ্যসিদ্ধি নামক একটি যজ্ঞের পরিচয় গৃহ্যসূত্রসমূহে পাওয়া যায় যার উদ্দেশ্য বাণিজ্যে সাফল্য লাভ। বাণিজ্যের সামগ্রী হিসাবে বংশ, কূটজ, ইক্ষু, মদ্য, কট (মাদুর), পশুচর্ম ও নানা ধরনের বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে

মধ্যযুগের ইউরোপের মতোই যাজক (ব্রাহ্মণ) ও সম্ভ্রান্ত (ক্ষত্রিয়) শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা খুবই উচ্চে ছিল। তুলনায় বাণিজ্যজীবী জাতি হিসাবে বৈশ্যদের সামাজিক অবস্থান খুব সম্মানের ছিল না।

৩.৩.৩ দ্বিতীয় নগরায়ণের যুগ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই উৎপাদক ও বণিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে, পক্ষান্তরে প্রাকৃত জৈন গল্পসাহিত্যের প্রসিদ্ধ সঙ্কলনসমূহ ভ্রাম্যমাণ বণিকদের কথিত বিনোদনমূলক কাহিনীর সঙ্কলন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সকল কথা-সাহিত্যমূলক সঙ্কলন উৎসর্গ করা হয়েছে কোন জিন বা তীর্থঙ্করের নামে নয়, ধনাধিপতি কুবেরের নামে। ধনী বণিক পালি সাহিত্যে সেট্‌ঠি বা শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত। ছোট দোকানদার (পাপনিক) ও ভ্রাম্যমাণ বণিকদের কথাও বলা হয়েছে, শেষোক্তরা সার্থবাহ নামে পরিচিত ছিলেন। *দীর্ঘনিকায়* গ্রন্থে হাজার গো-শকট নিয়ে সার্থবাহকদের মরু অঞ্চল পার হওয়ার বর্ণনা আছে। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-তে গন্ধার, মদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্য ও নানা ধরনের পশুবিক্রেতার উল্লেখ আছে। সমুদ্রবাণিজ্জ বা সমুদ্র বাণিজ্যের উল্লেখ পালি সাহিত্যে থাকলেও এবিষয়ে বিশদ তথ্য দেওয়া নেই। বৌদ্ধধর্ম বণিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণে এই ধর্মে সুদ গ্রহণ ও দাস রাখা নিন্দনীয় নয়। ধাতব মুদ্রার প্রচলন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে পাকাপাকি ঘটেছিল। এই যুগের 'অঙ্ক-চিহ্নিত মুদ্র' বা পাঞ্চ-মার্কড-কয়েন বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে। এগুলি বেসরকারি উদ্যোগে প্রবর্তিত ধাতবখণ্ড, মোটামুটি একই রকম ওজনের ভেজালহীন ধাতুর তৈরি এবং ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন নকশা ছাপ দেওয়া।

দ্বিতীয় নগরায়ণের সূত্রপাত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে যে নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয় তারই ফলে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার অনেকগুলি নগরের আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘনিকায়ের *মহাপরিনির্ব্বাণ*-সুত্ত-এ সাক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধের সমকালীন নগরের সংখ্যা ষাট। এগুলির মধ্যে ছয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল বারাণসী, কোশাম্বী, চম্পা, রাসগৃহ, শ্রাবস্তী ও কুশীনগর। পালি সাহিত্যে এই সকল নগরের বর্ণনা একান্তই প্রথাগত। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত পাটলিপুত্র নগর এই তালিকায় নেই। মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ণের কারণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা ধরনের মত আছে। দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী ও রামশরণ শর্মার মতে যেহেতু কৃষির ব্যাপক উন্নতি ব্যতিরেকে নগরের বাসিন্দা ও তাদের উপজীবিকাগুলি টিকতে পারে না, যেহেতু নাগরিক জীবিকাগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে গ্রামের থেকে আসা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের যথাযথ সরবরাহের উপর, সেইহেতু মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও নগর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত কৃষি উপাদান অপরিহার্য ছিল, যেক্ষেত্রে লোহার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বিশেষ করে লাঙলের ফলায় লোহার ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অমলানন্দ ঘোষ মনে করেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এত পর্যাপ্ত নয় যা দিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে কৃষিকাজে লৌহ ফলাযুক্ত লাঙলের ব্যাপক ব্যবহার প্রমাণ করা যাবে। তার মধ্যে তামার হাতিয়ার দিয়েও উদ্ভিদ ফলানো সম্ভব। এক্ষেত্রে কারিগরি কুশলতার চেয়েও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সংগঠনের ভূমিকা ছিল। অবশ্য দুটি মতই অনুমানমূলক।

মৌর্য আমলে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে পাটলিপুত্র একটি বিশাল নগরে পরিণত হয়, যে নগরের বর্ণনা গ্রীক লেখকগণ দিয়েছেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৌশম্বীও ছিল একটি বড় নগর যার বাস্তব পরিচয় উৎখননের

ফলে পাওয়া গেছে। তক্ষশিলা মৌর্য আমলে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র রূপে যথেষ্ট গুরুত্বলাভ করে। তক্ষশিলার ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সিরকপের ঢিবি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। তক্ষশিলার নিকটেই ছিল পুষ্কলাবতী। চারসাদ্দা নামক স্থানে খননকার্যের দ্বারা এই শহরের পরিচয় পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে মথুরা নগরী গড়ে ওঠে। পতঞ্জলী তাঁর *মহাভাষ্য* গ্রন্থে মথুরাকে পাটলিপুত্র ও সাঙ্কাশ্যের চেয়ে উন্নত বলেছেন। মথুরা এবং মথুরার নিকবর্তী সংঘ-এ উৎখননের ফলে সমৃদ্ধি এবং অবক্ষয়, উভয়েরই চিত্র পাওয়া যায়। শক, পহ্লব ও কুষাণ আমলে মথুরার সমধিক উৎকর্ষ ঘটে। মৌর্য আমলে প্রাচীন বঙ্গদেশে নগরায়ণের সূত্রপাত ঘটে। বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে মৌর্য ব্রাহ্মীতে রচিত একটি লেখের সাক্ষ্যে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের কথা জানা যায়, যে নগরের ধ্বংসাবশেষ রাও বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত আবিষ্কার করেন। দক্ষিণাপথে নেভাসা, টের ও সাতানিকোটাতে উৎখননের ফলে নগরজীবনের চাক্ষুষ রূপটি বোঝা যায়। কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে অমরাবতী, ভোট্টিপ্রোলু, শালিহুণ্ডম, নাগার্জুনিকোণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে উৎখননের ফলে নগরজীবনের অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুদূর দক্ষিণে মাদুরা ও কাবেরীপট্টিনম নগরদ্বয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশালভাবে গড়ে ওঠে। তামিল সাহিত্যে উভয় নগরের বিশদ বর্ণনা বর্তমান।

৩.৪ সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বন্দরসমূহ

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে হিপ্পালাস কর্তৃক মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বহির্দেশীয় নাবিক ও বণিকদের পক্ষে ভারতে আসার পথ সুগম হয়ে যায়। অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক রচিত *পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী* গ্রন্থে (এবং তৎসহ টলেমির ভূগোলে কিছুটা অবিন্যস্তভাবে) ভারতীয় উপকূলের প্রধান বন্দরগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের মোহনায় নদের সাতটি মুখের মধ্যে মাত্র মাঝেরটিই নাব্য ছিল যার উপর ছিল বারবারিকাম নামক প্রসিদ্ধ বন্দর। সেখান থেকে অনেকখানি দক্ষিণে নর্মদা মোহনায় ছিল তখনকার দিনের সবচেয়ে কর্মব্যস্ত বন্দর বারুগাজা, সংস্কৃত নাম ভৃগুকচ্ছ, প্রাকৃতে ভারুগচ্ছ, আধুনিক ব্রোচ। বারবারিকাম ও বারুগাজার মধ্যে গুজরাত উপকূলে টলেমি সুরাষ্ট্রিনি এবং মনোগ্লোসন (মানগোল) নামক দুটি বন্দরের উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি পরবর্তীকালের বিখ্যাত সুরাট। বারুগাজা বন্দরে জাহাজ সহজে ভিড়তে পারত না। তাই স্থানীয় মাঝিমাল্লারা ছোট ছোট জলযানের সাহায্যে পথ দেখিয়ে বড় জাহাজকে বন্দরে নিয়ে আসত। এই ব্যাপারে স্থানীয় শক শাসক ম্যামবানুস বা ন্যামবানুস (নহপান) খুবই উৎসাহ দিতেন এবং পণ্য তোলা-নামানো যাতে সহজে হয় তা দেখার জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। শকদের মতো সাতবাহনবংশীয় রাজারাও এই বিষয়ে সজাগ ছিলেন। বিশাল পশ্চাৎভূমির সঙ্গে বারুগাজা বন্দরের চমৎকার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল।

বারুগাজার দক্ষিণে কোঙ্কণ উপকূলে পেরিপ্লাস-এ লেখক তিনটি বন্দরের উল্লেখ করেছেন—সুপ্পারা (বোম্বাই-এর নিকটবর্তী সোপারা), ক্যালিয়েনা (বর্তমান কল্যাণ) এবং সিমুল্লা (বোম্বাই থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণে চৌল)। আরও দক্ষিণে কয়েকটি ছোট বন্দর ছিল, যথা—মণ্ডাগোরা (সম্ভবত বানকোট), পালিপাটমে (সম্ভবত দাভোল) মেলিজিগারা (জয়গড়), বাইজানটিয়াম (সম্ভব ভিজাদ্রুগ), টোগারাম (দেওগড়) এবং তুরান্নাবোয়াস (সম্ভবত মালভান)। কিন্তু এগুলি ভৃগুকচ্ছ বা কল্যাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কোঙ্কণ

ছাড়িয়ে মালাবার উপকূলের সবচেয়ে বিখ্যাত বন্দর ছিল মুজিরিস যার অবস্থান আধুনিক ক্রাঙ্গাগেরের কাছাকাছি। টলেমি এবং প্লিনিও মজিরিসের কথা বলেছেন। *তামিলসঙ্গম* সাহিত্যে এই বন্দর মুচিরিপত্তনম নামে পরিচিত এবং বলা হয়েছে যে বিদেশী জাহাজগুলি এখানে স্বর্ণমুদ্রা ভরে নিয়ে আসত এবং গোলমরিচে জাহাজ ভর্তি করে ফিরে যেত। এখানে রোমক বণিকদের একটি স্থায়ী বসতি ছিল এবং সম্রাট অগাষ্টাসের স্মৃতিতে গড়া একটি মন্দির ছিল। মালাবার উপকূলে আরও দুটি বন্দর ছিল নরা (কান্নানোর) ও টুন্ডিস (পোন্নানি)—এবং দক্ষিণতম সীমা ছিল কোমারি (কন্যাকুমারী)।

করমণ্ডল উপকূলে কোলচি বা আধুনিক কোরকাই-এ মুক্তার চাষ হত। এই উপকূলে বর্তমান তামিলনাড়ু সংলগ্ন তিনটি বন্দরের নাম কামারা, পোদুকা ও সোপাট্মা। পোদুকা নিঃসন্দেহে পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিকামেদু। টলেমির ভূগোলে উল্লিখিত খাবেরোস কাবেরী নদীর মুখে অবস্থিত সঙ্গম সাহিত্যে উল্লিখিত কাবেরীপট্টিনম নামক বিখ্যাত বন্দর, যার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে আধুনিক পুহার-এ। অন্ধ্র উপকূলে মাসালিয়া বা মুসলিপত্তন অঞ্চলে কণ্টাকসুল্লা (ঘণ্টকশাল) এবং আলোসুগনে নামক দুটি বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপকূলের বন্দরসমূহ থেকে সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ত। গাঙ্গোয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে পেরিপ্লাস-এ গাঙ্গে বা গঙ্গা নামক বন্দরের উল্লেখ আছে। টলেমি টামেলিটিস বা মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করেছেন।

৩.৪.১ রোমক বাণিজ্য

টলেমি কয়েকটি বন্দরের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেসব বন্দরে রোমক বণিকদের পাকাপাকি বসতি থাকত, এম্পোয়িরন নামক পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। ভারতের সাথে রোমের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিচয় *পেরিপ্লাস,* প্লিনির রচনা প্রভৃতি সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এই বাণিজ্য যে ভারতের অনুকূলে ছিল, এবং ভারতীয় বিলাসদ্রব্য যে ন্যায্য দামের চেয়ে বহুগুণ বেশি দামে রোমের বাজারে বিক্রয় হত, তা নিয়ে সম্রাট টাইবেরিয়াস এবং ঐতিহাসিক প্লিনি খেদ প্রকাশ করেছেন। এখান থেকে রোমে চাল, গম, সুগন্ধী, গোলমরিচ, দারুচিনি, চন্দন ও অপরাপর মূল্যবান কাঠ, সাধারণ ও মিহি বস্ত্র, মসলিন, দামী পাথর প্রভৃতি রপ্তানি হত। আমদানি হত খেজুর, সুরা, নানা ধরনের পাত্র, কাচের সামগ্রী, বিভিন্ন ধাতু ইত্যাদি। রোমের স্বর্ণমুদ্রাও বুলিয়ান হিসাবে আমদানি হত। কুষাণ যুগেই বিশেষ করে রোমের সাথে বাণিজ্য চলত। রোমের সাথে বাণিজ্য চলত। রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান প্রমাণ ভারতের নানা স্থানে রোমক মুদ্রার আবিষ্কার।

৩.৪.২ গুপ্তযুগের বাণিজ্য

গুপ্তযুগে ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠী বা সার্থবাহের উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্তমান। তাঁদের সামাজিক গুরুত্বের প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে বিষয়পতি বা জেলাধিকারিকের প্রশাসনিক কাজে যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁদের মধ্যে নগরশ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহ প্রধান। কারিগরদের মতো বণিকেরাও পেশাদারী সংগঠন গড়ে তোলেন। অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শাসকবর্গ বণিকদের সুযোগসুবিধা দানে কার্পণ্য করতেন না। স্থলপথ ও জলপথে অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা যে উৎকৃষ্ট ছিল সেকথা চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় বলে গেছেন। ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই রোমের সঙ্গে বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে এবং ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য পতনের পর তা বুন্ধ হয়ে যায়। বাইজান্টাইন বা পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য তেমন দানা বাঁধতে পারেনি,

কেননা কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য মূলত পারস্য উপসাগর দিয়ে শুরু হয় যা নিয়ন্ত্রণ করতেন ইরানের সাসানীয় বংশের শাসকরা। তৎসত্ত্বেও পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের সঙ্গে একেবারেই বাণিজ্য বন্ধ হয়নি যার প্রমাণ পূর্ব-রোমের সম্রাটদের মুদ্রা কেরল ও তামিলনাড়ুর মধ্যবর্তী কোয়েম্বাটোরে পাওয়া গেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহ থেকে পারস্য উপসাগরে অবশ্যই বাণিজ্যপোত যাতায়াত করত। দক্ষিণাপথের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১০-৪২ খ্রিঃ) বিনা কারণে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে দৌত্য সম্পর্ক বজায় রাখেননি; বাণিজ্যিক স্বার্থই ছিল বড় কথা। পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ চলত প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে। করমণ্ডল উপকূলের বন্দরসমূহ ছাড়াও উড়িষ্যার দুটি বন্দর এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে বাণিজ্যের অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্কন্দগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তদের স্বর্ণমুদ্রার মানের অবনতি ঘটতে শুরু করে।

৩.৪.৩ আদি-মধ্যযুগের বাণিজ্য ও নগরসমূহ

মোটামুটিভাবে ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের একটা গুণগত পার্থক্য চোখে পড়ে। পশ্চিম ভারতে বকাটকবংশীয় শাসকদের আমলে মুদ্রাব্যবস্থার গৌণতার যে পরিচয়ের সূচনা হয়েছিল তারই ব্যাপ্তি হিসাবে দেখা যায় যে বঙ্গ-বিহারের পাল-সেন রাজারা মুদ্রা প্রস্তুত করেননি, রাষ্ট্রকূট সম্রাটদের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি, গুর্জর-প্রতিহারদের মুদ্রা থাকলেও সেগুলির ধাতব বিশুদ্ধি এবং ওজনের স্থিরতা অনিশ্চিত। মুদ্রা প্রস্তুত না করার অনেক কারণ থাকতে পারে। পূর্বে এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত্ত হয়েছে। তবুও এই মুদ্রার অনুপস্থিতির বিষয়টিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যদিও বাজারচালু মুদ্রাসমূহ অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই। পাশাপাশি হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গাঙ্গেয় উপত্যকার বহু সমৃদ্ধ নগরের অবক্ষয় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই ঘটে গিয়েছিল। এই সকল নগরের মধ্যে কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম, কুশীনগর ও বৈশালীর মতো বিখ্যাত নগর অন্তর্ভুক্ত। এই অবক্ষয় বাস্তব, কিন্তু কোন অতসরলীকৃত কারণের দোহাই দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। বস্তুত যেভাবে প্রদর্শন করা হয়, আসলে নগরসমূহ ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছিল। যদি কোন কারণেই কোন নগরের বাস্তবিকই অবক্ষয় ঘটে, সেই কারণটি অর্থনৈতিক নাও হতে পারে।

এই যুগের উত্তর ভারতের বিভিন্ন লেখে হট্ট বা হট্টিকা (হাট) উল্লিখিত হয়েছে। হাট ছাড়া মেলাতেও পণ্য কেনাবেচা বলত। লেখসমূহে মণ্ডপিকা (যা থেকে উত্তর ভারতে মণ্ডী শব্দটি চালু হয়েছে) বাজার অর্থে উল্লিখিত, দক্ষিণ ভারতে যা নগরম নামে পরিচিত। লেখসমূহে, শ্রেষ্ঠী, সার্থবহ ও বণিকদের যথেষ্ট উল্লেখ বর্তমান। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবক্ষয় হয়েছিল এমন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বরং লেখসমূহের সাক্ষ্য বিপরীত কথা বলে। রামশীণ শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পর থেকে রোম-ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক সঙ্কোচনকে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের অন্যতম উপাদান হিসাবে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের ফলে অষ্টম শতকের পর থেকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসে। আরব বণিকেরা ভারতের পশ্চিম উপকূলের বিভিন্ন বন্দরে তাদের পণ্যবাহী জাহাজ নোঙ্গর করত, এবং সেখান থেকে পণ্য চীনা জাহাজে উঠত। আবার চীন থেকে অনুরূপভাবে ভারত উপকূলে একই উদ্দেশ্যে জাহাজ ভেড়ানো হত। কোচিন এবং চীন একই ব্যাপার। আরব লেখকরা ভারতীয় বন্দরসমূহের উপযোগিতার কথা বলেছেন। দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাদের সঙ্গে আরব বণিকেরা সুসম্পর্ক রাখতেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্তি তার গুরুত্ব হারায়, কিন্তু আরব লেখকদের রচনায়, বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম সমন্দর নামক একটি নূতন গড়ে ওঠা বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বন্দর দিয়েই বঙ্গাদেশে ও কামরূপের পণ্য চলাচল করত। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বজায় রাখা হত। চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-৪৪ খ্রিঃ) দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গো বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চোলদের সমুদ্র বাণিজ্যে প্রবল উৎসাহ ছিল । কাজেই আদি-মধ্যযুগে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের কথা বলা হয় তা সর্বাংশে ঠিক নয়।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর ভারতের বেশ কয়টি বিখ্যাত নগর অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-অবক্ষয় সঠিক কিনা অথবা তার সঙ্গো সামন্ত ব্যবস্থার কোন যোগাযোগ আছে কিনা একথা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাচীন নগরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে কুষাণ বা তৎপরবর্তী সময় থেকে তুর্কী আমল পর্যন্ত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। অহিচ্ছেত্র, অত্রাঞ্জিখেরা, রাজঘাট, চিরণ্ড প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রের কথা এ প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য। লেখসমূহ থেকেও কয়েকটি নগরের ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন বুলন্দশহরের নিকটবর্তী তত্ত্বানন্দপুর, সীয়াডোনি, গোপাদ্রি বা গোয়ালিয়র, জব্বলপুরের নিকটবর্তী বিলহরি প্রভৃতি। আদি-মধ্যযুগে নতুন নগরেরও পত্তন হয়েছিল। কাজেই আদি-মধ্যযুগের ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা মন্থর হলেও গতিময়তা, বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সবই ছিল।

৩.৫ অনুশীলনী

১। হরপ্পা এবং হরপ্পা-উত্তর সভ্যতায় কারিগরি ব্যবস্থা কীরূপ ছিল?

২। প্রাচীন ভারতে কারিগর ও পেশাদারি সংগঠনসমূহের বর্ণনা দিন।

৩। প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য ও নগরায়নের চরিত্র সম্বন্ধে রচনাত্মক আলোচনা করুন।

৪। প্রাচীন ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য কীভাবে বিস্তারলাভ করেছিল?

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ (১৯৮৪)*

২। নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৪৯)*, পুনমুর্দ্রণ, ১৯৮০

৩। বি. এ্যান্ড আর অ্যাল্লেকিন : *দ্য রাইস অফ্ সিভিলাইজেশন্ ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান (১৯৮২)*

৪। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় : *দ্য মেকিং অফ্ আর্লি হিস্টরিকাল ইন্ডিয়া (১৯৭৩)*

৫। আর. এস. শর্মা : *মেডিয়াভাল কালচার এ্যান্ড সোশাল ফরেমেন্টসান ইন এনসিয়েন্ড ইন্ডিয়া (১৯৮৩)*

৬) ওয়ারমিঞ্জাসান ই. এইং : *কমার্স বিটুউইন দি রোমান এম্পায়ার এন্ড ইন্ডিয়া (১৯৭৪)*

একক ৪ ☐ সামাজিক জীবন, বিজ্ঞানচেতনা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ পারিবারিক জীবন

৪.১ জাতিবর্ণ প্রথা

৪.৩ দাসপ্রথা

৪.৪ নারীজাতির অবস্থা ও বিবাহপ্রথা

৪.৪.১ শিক্ষা

৪.৪.২ বিবাহ

৪.৪.৩ বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

৪.৪.৪ নিয়োগপ্রথা

৪.৪.৫ সম্পত্তির অধিকার

৪.৪.৬ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

৪.৪.৭ বিধবা

৪.৪.৮ দেহোপজীবিনী

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন প্রাচীন ভারতের

- পারিবারিক জীবন
- নারীজাতির অবস্থা
- প্রযুক্তি, বিজ্ঞান
- ধর্মীয় সংস্কৃতি

৪.১ পারিবারিক জীবন

কিছু কিছু অঞ্চল বা উপজাতি বাদ দিলে ভারতবর্ষের সর্বত্র-ই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বর্তমান ছিল। যৌথ পরিবারসমূহে যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, একেবারে অথর্ব না হয়ে পড়লে, তিনি হতেন পরিবারের নিয়ন্ত্রক ও

পরিচালক। তবে বৈদিক সাহিত্যে পিতা-মাতা-সন্ততি সহ ছোট পরিবারেরও উল্লেখ আছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। *ঋগ্বেদ*-এ একটি সূক্তে পরিবারের বিভিন্ন বৃত্তির কথা পাওয়া যায়।

জাতিত্ববাচক, আত্মীয়বাচক এবং কুলবাচক পরিভাষাসমূহ সুনির্দিষ্ট ছিল যথা কুল (পরিবার), গোত্র (বর্গ) জ্ঞাতি (পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়বর্গ), সবন্ধু (কুটুম্ব), সজাত এবং বন্ধু (আত্মীয়) ইত্যাদি। এছাড়া প্রতাতমহ, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, তাত (পিতা এবং পিতার ভ্রাতাগণ), ননা এবং মাতৃ (মাতা), তন্ব, পুত্র ও সূনু (পুত্র), পুত্রিকা (যে কন্যা পুত্রের কাজ করে), শেষ (সন্তানবর্গ), দম্পতি, শ্বশুর, জামাতৃ, স্নুসা (পুত্রবধূ), ভার্যা, সপত্নী, ভ্রাতৃ, ভগিনী ও স্বসৃ, বোন, দেব (দেবর), জিধিষুপতি (ভগ্নীপতি), ননন্দৃ (ননদ), মতুল ও মাতুর্ভ্রাতৃ (মামা), শাল্য (শ্যালক), স্বস্রীয় (ভাগ্নে), ভ্রাতৃব্য, ভর্তৃ (স্বামী), নপাত, নঃ ও পৌত্র (নাতি) প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্কবাচক পরিভাষা সুনির্দিষ্ট ছিল। আরও কিছু বিশেষ পারিবারিক পরিভাষা ছিল যথা সমানগোত্র, সমানজন, বিধবা, পুনর্ভু, (পুনর্বিবাহিতা স্ত্রী) প্রভৃতি।

মনু কর্তৃক তাঁর সন্তানদের মধ্যে অযৌক্তিকভাবে সম্পত্তিবণ্টনের যে কাহিনী ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় তা থেকে সন্তানদের উপর পিতার কর্তৃত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ধর্মশাস্ত্রসমূহের যুগের পূর্বে মেয়েদের পারিবারিক সম্পত্তির উপর কোন অধিকার ছিল না। স্ত্রীধনের ধারণা প্রথম *মনুস্মৃতি*-তে পাওয়া যায়, তবে স্ত্রীধন উত্তরাধিকার নয়, যদিও এর দ্বারা পরিবারের নারী সদস্যদের আর্থিক অবিচারের সম্পূর্ণ শিকার হওয়া থেকে কিছুটা রেহাই দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। *অথর্ববেদ*-এ সম্পূর্ণ একটি বিখ্যাত সূক্তে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার প্রার্থনা করা হয়েছে, যদিও পারিবারিক অশান্তি ও কলহের বহু নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে বর্তমান। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততার চিত্র সাহিত্যে পাওয়া যায়, বিপরীত চিত্রেরও অভাব নেই।

পিতার জীবিতকালেই পুত্রগণ কর্তৃক তাঁর সম্পত্তির বিভাজনের উল্লেখ আছে, পিতা যে সন্তানদের পৃথক করে দিয়েছেন তারও নজির আছে, আবার ছেলেরা নিজ উদ্যোগে পৃথক হয়ে গেছে তারও নজির আছে। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে পুত্রগণ তাঁর ঋণ শোধ করতে বাধ্য, যদিও এই বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী পিতা যখন সম্পত্তির মালিক, তিনি নিজ ইচ্ছামতই তার বিলিব্যবস্থা করতে পারেন, এমনকী তাঁর উত্তরাধিকারীদের যে তাঁর রক্তের সম্পর্কিত হতে হবে এর কোন মানে নেই। তিনি ইচ্ছামত উইল করতে পারেন, না করলে সম্পত্তি স্ত্রী ও পুত্রগণের মধ্যে বণ্টিত হবে, এবং জ্যেষ্ঠপুত্রই সর্বাধিক অংশ পাবে। পুত্রগণ তাঁদের ভাগের এক-চতুর্থাংশ তাঁদের ভগিনীদের বিবাহের জন্য প্রদান করবেন, তবে তা বাধ্যতামূলক কিনা সে কথা মনু বলেন নি। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বংশে সন্তান জন্মালেই সে পারিবারিক সম্পত্তির ভাগীদার ও উত্তরাধিকারী হবে। বিষয়টি নারীজাতির অবস্থার আলোচনার প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

৪.২ জাতিবর্ণ প্রথা

যে জাতিবর্ণ প্রথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অন্যন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং আজও পর্যন্ত যার প্রভাব রাষ্ট্রিক ও সমাজজীবনে অসীম, সেই প্রথার প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। জাতিপ্রথা ও বর্ণভেদ পৃথক বিষয়। বর্ণভেদ বলতে বোঝায় একটি বিশেষ আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র সাধারণকে কয়েকটি বিশেষ মর্যাদার শ্রেণীতে বিভাজন। পৃথিবীর সর্বত্রই শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, শাসক ও যোদ্ধা শ্রেণী, উৎপাদক

ও বণিক শ্রেণী এবং কারিগর ও শ্রমজীবী শ্রেণী বর্তমান। এই বিভাজন সর্বত্র এবং সর্বযুগে দেখা যায়, প্রাচীন ভারত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্বর্ণ্যে বিভক্ত করার যে পরিকল্পনা শাস্ত্রকারেরা করেছিলেন তা কিন্তু জাতিপ্রথার মতো একটি জটিল, সর্বত্রগামী ও বহুরূপী ব্যবস্থার গঠনগত ও কার্যকারিতাগত দিকসমূহ ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

স্মরণ রাখা দরকার যে ভারতবর্ষে চাতুর্বর্ণ্যের মতো সহজ সরল সামাজিক বিভাজন কোন যুগেই ছিল না, আজও নেই। বাস্তবে যা আছে তা হচ্ছে পাঁচ হাজারের মতো জাতি ও শাখাজাতি। শাখাজাতি বলতে সেইসব জাতিদের বোঝায় যারা কোন বড় জাতি ভেঙে গড়ে উঠেছে, অথবা কোন আঞ্চলিক ক্ষুদ্র জাতি যারা গৌরবার্থে নিজেদের কোন বড় জাতির শাখা হিসাবে পরিচিত করে। এস. ভি. কেটকার দেখিয়েছেন যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই আটশোর উপর শাখাজাতিতে বিভক্ত। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তি পদ্ধতিবদ্ধ করিয়াছিলেন প্রাচীন ধর্মসূত্র ও স্মৃতি গ্রন্থের লেখকরা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্বর্ণের কাঠামোর মধ্যে তাঁরা সমগ্র সমাজ জীবনকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চাতুর্বর্ণ্যের প্রথা অলীক উপন্যাস এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কৌম ছিল। প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কৌমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর, উপস্তর। ধর্মসূত্র ও কৌমের স্তর উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব কিছুকেই আদি চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

জাতি বলতে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বোঝায়, সেনার্তের মতে যা বংশপরম্পরায় একই উদ্ভব সূত্রে গ্রথিত, প্রধান ও পরিষদ সহ কয়েকটি প্রথাগত অথচ স্বাধীন সংগঠন দ্বারা পরিচালিত এবং নির্দিষ্ট পেশা ও আচরিত রীতিনীতিসমূহের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ। বিজলী বলেন জাতি বলতে বোঝায় কয়েকটি পরিবার বা পারিবারিক গোষ্ঠীর সমবায় যারা প্রত্যেকেই একই জাতিনামের অন্তর্গত, একই পৌরাণিক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, একটি নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তির অনুসরণ করে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে এবং অনুরূপ অন্য জনগোষ্ঠীর সাথে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। আরও বহু লেখক জাতিপ্রথার নানা বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত করেছেন। সকলের বক্তব্যের সারসঙ্কলন করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে জাতি বলতে বোঝায় একটি বিশেষ পেশার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে, সমাজে কাঠামোয় ছোটবড় যেমনই হোক না কেন যাদের একটি নির্দিষ্ট স্থান ও ভূমিকা আছে, যাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যারা তাদের নিজস্ব সামাজিক আইনের দ্বারা পরিচালিত এবং পেশাগত ও অপরাপর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের সার্বভৌমত্ব ভোগ করে। একটি জাতির কর্ম বা অধিকারের ক্ষেত্রে অপর জাতির হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ যদিও বিশেষ পরিস্থিতিতে কৌলিক বৃত্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে অথবা কৃষিকাজের মতো ব্যাপক বৃত্তির ক্ষেত্রে একাধিক জাতি আসতে পারে।

সকল ঐতিহাসিক কার্যকারণ পরম্পরায় জাতিপ্রথার উদ্ভব হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হল যে এই প্রথা, বিশেষ করে জাতিকাঠামোর মধ্য ও নিম্নস্তরের সোপানাবলী, আসলে উপজাতীয় সমাজের বা কেমিসমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিমাণ। বহুক্ষেত্রেই উপজাতীয়ব্যবস্থার ও জাতিব্যবস্থার মধ্যকার সীমারেখা মোটেই স্পষ্ট নয়। অসংখ্য উপজাতি তাদের উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে কোন বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করে

বৃহত্তর হিন্দু সমাজে স্থান করে নিয়েছে এবং সেই বৃত্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী জাতিকাঠামোর নানা পর্যায়ে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত হয়ে এইভাবে যারা হিন্দু সমাজের আওতায় এসেছে, এবং বিভিন্ন পেশার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাদের চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে ঢোকাবার এবং ব্যাখ্যা করার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে শাস্ত্রকারেরা বর্ণসংকর তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। *ঋগ্বেদ*-এর পুরুষ সূক্তের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে মনু বলেন যে বিশ্বস্রষ্টার মুখ, বাহু, উরুদেশ এবং পদদ্বয় থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। এই চার বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক অনুলোম (উচ্চবর্ণের পুরুষ এবং নিম্নবর্ণের স্ত্রী) বিবাহের ফলে নানা সংকর জাতির উদ্ভব হয়। এভাবে উদ্ভূত সংকর জাতিসমূহ পুনরায় পারস্পরিক অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিসমূহকে উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংকর জাতিরা একই ভাবে তৃতীয় পর্যায়ের জাতিদের উৎপন্ন করে। এই পদ্ধতি অনুসরণে অসংখ্য জাতিকে বিভিন্ন পর্যয়ের সংকর জাতি হিসাবে চাতুর্বর্ণ্যের মূল কাঠামোর মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া যায়।

একটি উদাহরণ দিলে পদ্ধতিটি বোঝার সুবিধা হবে। অমষ্ঠ নামক একটি বার্তাশস্ত্রোপজীবী 'জন' বা উপজাতি পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস করত যাদের উল্লেখ প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যে-কোন কারণেই হোক তারা তাদের মূল অঞ্চল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং ভারতের নানা স্থানে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এক এক অঞ্চলে তারা এক- একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ শুরু করে এবং অবলম্বিত বৃত্তির গুরুত্ব অনুযায়ী তদনুরূপ জাতিতে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গদেশে তারা বৈদ্যের বৃত্তি গ্রহণ করে। ধর্মশাস্ত্রকাররা তাদের অনুলোম সংকরজাতি হিসাবে জাতি কাঠামোয় স্থান দেন এবং তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারা ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার মিলনজাত। কিন্তু বর্ণ-সংকর তত্ত্ব শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্যের অনুকূল হলেও বাস্তব হতে পারে না। তবে জাতিকাঠামোর মধ্যে অনুলোম-সংকর জাতিদের উপরের দিকে এবং প্রতিলোম-সংকর জাতিদের নীচের দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে বর্ণ-সংকরের ধারণা বজায় রাখলেও বাস্তবে এই তত্ত্ব থেকে শাস্ত্রকারেরা সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কেননা অসবর্ণ-বিবাহজাত সন্তান বাস্তবে পিতার জাতিভুক্তই হয়, কোন তৃতীয় জাতিতে পরিণত হয় না। কাজেই পরবর্তীকালে পেশার মর্যাদা ও জীবন যাপন-পদ্ধতির শুদ্ধতার নিরিখে জাতিসমূহের ক্ষেত্রে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন বর্গের বিভাজন করা হয়।

জাতিপ্রথার অসাম্যমূলক দিকটিকে স্বীকার করে নিয়েও জে. এইচ. হাটন বলেন যে জাতিপ্রথা একজন ব্যক্তিকে তার জন্ম থেকেই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে আনয়ন করে। সম্পদ বা দারিদ্র্য, সাফল্য বা বিপর্যয়, যাই হোক না কেন, জাতির আশ্রয় থেকে সে কখনোই বঞ্চিত হয় না, যদি না সে তার জাতি প্রবর্তিত মান লঙ্ঘন করে। জাতি তার অন্তর্গত ব্যক্তিকে বরাবরের সাহচর্য দেয়, তার সমস্ত ব্যবহার ও যোগাযোগকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিবাহক্ষেত্রে তার পছন্দকে প্রণালীবদ্ধ করে, তার ট্রেড ইউনিয়ন, বান্ধব সমাজ, সাহচর্যকেন্দ্র এবং আতুরাশ্রমের ভূমিকা পালন করে। জাতিই তার স্বাস্থ্যবীমার প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজন হলে অন্ত্যেষ্টিরও অবলম্বন। ফর্নিভাল বলেন যে ভারতে এক জাতীয় প্লুরাল বা বহুত্ববাদী সমাজ একমাত্র জাতিপ্রথার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অসাম্যমূলক হলেও প্রতিটি জনগোষ্ঠী নিজস্ব সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখে এই ব্যবস্থায় স্থান পেতে পারে। এই কারণে জাতিপ্রথা শুধু ভারতীয় হিন্দু সমাজেরই বৈশিষ্ট্য নয়, বেসরকারিভাবে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও খ্রিস্টান সমাজেও এই প্রথা কার্যকরভাবে বর্তমান। এই প্রথা বিভিন্ন

জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ না করে একটা বিরাট দেশের জনসমাজের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় বিধান করেছে। দ্বিতীয়ত, জাতিপ্রথা এমন একটি পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যার মূল কোন বলপ্রয়োগ নেই। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারী-শাসনের বিকল্প হিসাবে জাতিপ্রথা সামাজিক শাসনের কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। চতুর্থত, এই প্রথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দক্ষতা, জ্ঞান ও ব্যবহারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। জাতিপ্রথার উচ্চ-নীচ ভেদের অসাম্যমূলক দিকটি প্রকট থাকলেও, তার কার্যকর দিকগুলিকে স্বীকার না করলে এই প্রথার প্রবল দীর্ঘস্থায়িত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদ-এ পেশাদারী জাতিপ্রথা লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি চাতুর্বর্ণ্যের ধারণাও গড়ে উঠেছিল, যদিও বৈশ্য ও শূদ্র শব্দদ্বয়ের উল্লেখ একমাত্র পুরুষসূক্ত (*ঋগ্বেদ* ১০/৯০) ভিন্ন অন্যত্র নেই, তবে বিশ্ শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে, কোন গ্রামের বা এলাকার অধিবাসী অর্থে। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের যুগে যেমন একদিকে পেশাদার জাতিসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে অপরদিকে তেমনই চাতুর্বর্ণ্যের ধারণারও বিকাশ ঘটেছে, এবং ব্রাহ্মণদেরও মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ (১১/৫/৭/১) ব্রাহ্মণদের চারটি বিশেষ গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যথা— ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্মের বিশুদ্ধি), প্রতিরূপর্যা (চরিত্রমাধুর্য), যশ (গৌরব) এবং লোকপক্তি (লোকশিক্ষা প্রদান)। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছয়টি—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। তবে খুব অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই শুদ্ধবৃত্তিধারী ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রসমূহে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের জন্য দশটি বৃত্তির বিধান আছে, যথা শিক্ষাদান, হাতের কাজ, সেবা, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, মহাজনী-কারবার, দিনমজুর, উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা (*মনু* ১০/১১৬)। ক্ষত্রিয়দের স্বধর্ম পাঁচটি, যথা অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, শাস্ত্রজীব (যুদ্ধ ব্যবসায়) এবং ভূতরক্ষণ (লোকরক্ষ)। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক বিচারে ক্ষত্রিয় বলতে মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়কে বোঝায়। রাজক্ষমতার অধিকারী যে-কোন জাতিই—এমনকি গ্রীক, শক, পহ্লবদের মতো বহিরাগত হলেও—বিশেষ অভিষেকের দ্বারা মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ে পরিণত হ'তে পারত। বৈশ্যের বৃত্তি ছয়টি, যথা অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশু-পাল্য এবং বাণিজ্য। শূদ্রের বৃত্তি চারটি, যথা দ্বিজাতিশুশ্রূষা, বার্তা (ধন-উৎপাদন), কারুকর্ম এবং কুশীলবকর্ম, (হাতির কাজ)।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-এ বলা হয়েছে যে, শুনঃশেপকে বিশ্বামিত্র মুনি পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর পুত্রগণ তাতে আপত্তি করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাদের যে অভিশাপ দেন তার ফলে তাদের থেকে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, মুতিব ও পুলিন্দ জাতির উদ্ভব হয়। এই পাঁচটি জাতি-ই কিন্তু প্রাচীন ভারতের পাঁচটি বিখ্যাত উপজাতি। তাদের উপজাতীয়তা বিলোপ ও জাতিকাঠামোয় অনুপ্রবেশের বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ করার জন্যই এই কাহিনীটির সৃষ্টি করা হয়েছে। একই যুক্তির সূত্র ধরে *মনুস্মৃতি*-তে (১০/৪৩-৪৫) পুণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দর্দ ও খসদের ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে নামিয়ে শূদ্র করা হয়েছে। *ধর্মসূত্র* এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণসংকর তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন কৌম সমাজ বা উপজাতিকে জাতিপ্রথার আওতায় আনা হয়েছে এবং সংকর জাতি বলে গণ্য করা হয়েছে, যেমন ভিল্ল, বৈদেহিক, মগধ, আভরীয়, অন্দ্র, অম্বষ্ট, আবন্ত্য, ওড্র, কিরাত, মেকল, দ্রাবিড়, লাট, লিচ্ছবি, চুঞ্চু মেদ, মদ্গু, নিষাদ, পুলিন্দ, ভোজ, মাতঙ্গ, মাহিষ্য প্রভৃতি।

ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে শূদ্র পর্যায়ের সকলকেই সংকর জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নিম্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের মাতা থেকে সৃষ্ট জাতিসমূহ অধম-সংকর হিসালে পরিগণিত। উচ্চবর্ণের পিতা এবং নিম্নবর্ণের

মাতা সম্ভূত জাতিসমূহ উত্তম-সংকর হিসাবে পরিচিত, এবং মধ্যম-সংকর, অধম ও উত্তমের মাঝামাঝি। উত্তমরা উচ্চবর্গের পেশা, মধ্যমরা মধ্যবর্গের পেশা এবং অধমরা নিম্নবর্গের পেশার অধিকারী। আচার ও শুদ্ধতার বিচারেও অনুরূপ ভেদ বর্তমান। জাতিকাঠামোয় নিম্নতর পর্যায়ে চণ্ডাল, স্বপচ, ক্ষত্রি, সূত, বৈদেহিক, মগধ, মেদ, পুল্কস, রজক, চৈলনির্ণেজক, চর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, ভিল্ল প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। অন্দ্র, কিরাত, চণ্ডাল, চুঞ্চু, মেদ, মদ্‌গু, পুলিন্দ, মাতঙ্গ, শবর, স্বপচ ও লুব্ধকগণ শিকারজীবী। সোপাক, শূলিক (সুনিক, সৌনিক, উদ্বন্ধক, ঘাটিক), দিগবন (মোচিকার), কারাবর (আহিণ্ডিক), ডোম্ব, স্বপচ, চর্মকার প্রভৃতি জাতি পশুহননের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। কৈবর্ত (জালিক), কল্ল, মার্গব, দাস, ধীবর, মল্ল, মৎস্যবন্দক প্রভৃতি মৎস্যজীবী জাতি। অপরাপর পেশাদার জাতিসমূহের মধ্যে গোপ, গোপালক, গোলক এবং উরভ্র বা ধঙ্গর (পশুপালক), অম্বষ্ঠ ও ভিষক (চিকিৎসাব্যবসায়ী), অয়স্কার, কর্মার ও লোহকার (কর্মকার), কুলাল ও কুম্ভকার, তক্ষণ, উপক্রুষ্ট ও বর্ধকী (কাঠের কারিগর), কাংসকার (কাঁসারি), তাম্রোপজীবী (তাম্রের কারিগর বা ব্যবসায়ী)। বেণুক ও পাণ্ডুসোপাক (বাঁশের কারিগর), সুবর্ণকার, সৌবর্ণিক ও হেমকার (সোনার ও স্যাকরা), রঞ্জক, রঙ্গারী, সিন্দোলক বা সন্দলিক (রঙের কারিগর), রোমিক (লোনার বা লবণ উৎপাদনকারী), মন্যু (গোয়েন্দা), বন্ধুল (স্বর্ণবিন্দু সংগ্রাহক), পৌষ্টিক (পাল্কীবাহক), অঘাসিক, আন্ধাসিক ও বান্দবন্ধু (খাদ্য বিক্রেতা) সৈরিন্ধ্র (গৃহভৃত্য), সূচিকা (সূচীশিল্প), বন্দী (বন্দনাগায়ক), কাকবক (যারা ঘোড়ার ঘাস কাটে), বঙ্গবতারী (যারা সাজঘর ও বেশবাসের সংস্কার করে), ঐশ্বিক (অশ্বব্যবসায়ী), মৈত্রেয়ক (রাজভৃত্য), কুক্কুট (অস্ত্রনির্মাতা), মালাকার বা মালিক, কুন্তলক ও নাপিত, কোলিক (ভারবাহক), নর্তক, খনক, চক্রী, চাক্রিক ও তৈলিক (তৈলপ্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ী), চুচুক ও তাম্বুলিক (পান উৎপাদক ও বিক্রেতা), তন্তুবায়, তুন্নবায় (দর্জি) প্রভৃতি।

শূদ্র পর্যায়ের জাতিসমূহ কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণী নয় এবং তারা অসংখ্য শাখাজাতির সমাহার। তথাকথিত চাতুর্বর্ণ্যের ধারণায় ধর্মশাস্ত্রকাররা শূদ্রদের দাস পর্যায়ভুক্ত করেছেন, কিন্তু সকল ধর্মশাস্ত্রেই শূদ্রকে স্বাধীন মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আসলে শূদ্র তত্ত্বের দিক থেকে চতুর্বর্ণের অন্যতা অঙ্গ, যার উদ্ভব সেই পরমপুরুষ বা স্রষ্টার দেহ থেকে। শূদ্র ধন উপার্জন, সঞ্চয় ও সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকারী, যোগ্যতা থাকলে প্রশাসনিক উচ্চপদ পেতে শূদ্রের কোন বাধা নেই, এমনকী রাজা হতেও। জৈমিনীর মীমাংসাসূত্রে এবং তার উপর রচিত শবর ভাষ্যে এই বিষয়টিকে বাস্তবতার বিচারে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজবংশই ছিল শূদ্র, এমনকী সুবিখ্যাত নন্দ ও মৌর্য বংশও। অনুরূপভাবে সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণদের শোষকবৃত্তি ও অত্যাচারী ভূমিকার কথা খুব উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হলেও তা সঠিক নয়। জাতিকাঠামোয় আজও পর্যন্ত মধ্যশ্রেণীর জাতিগুলিই, তাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তির জোরে, ডমিনান্ট কাস্ট বা প্রভাবশালী জাতি হিসাবে পরিচিত, ব্রাহ্মণ নয়। এই মধ্য শ্রেণীর জাতিগুলি মূলত ভূম্যধিকারী, শস্ত্রজীবী ও বণিকদের নিয়ে গঠিত এবং স্থানভেদে এক একটি জাতি প্রাধান্য পায়। যেমন উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে রাজপুত ও বানিয়া, পশ্চিমাঞ্চলে জাঠ এবং অন্যান্য আহির (যাদব) ও গুজর। রাজস্থানে দেখা যায় যে বিভিন্ন গ্রামের প্রধান যে জাতির অন্তর্গত, সেই জাতির মানুষরাই সেই গ্রামে সবচেয়ে প্রভাবশালী। হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে জাঠরা সবচেয়ে প্রভাবশালী, এমনকী শিখদের মধ্যে জাঠ-শিখই প্রভাবশালী। কর্ণাটকে লিঙ্গায়ৎ ও ভোক্কালিকা এবং অন্ধ্রে কাপু বা রেড্ডিরা প্রধান।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যে জাতিপ্রথা বিরোধী বলে সচরাচর কথিত হয় তা সঠিক নয়। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং জাতিবর্ণ প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষত্রিয়দের স্থান দেন। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণদের যে প্রশস্তি করা হয়েছে তা প্রায় ধর্মশাস্ত্রসমূহের অনুরূপ। *ধর্মপদ*-এর একটি পুরো অধ্যায় ব্রাহ্মণদের গুণ বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বদাই অক্ষত অবস্থায় গমন করেন, তাঁকে আক্রমণ করা ক্ষমার অতীত। ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ বৃত্তিসমূহকে বৌদ্ধধর্মও স্বীকার করে নিয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রসমূহের মতোই শুদ্ধ বৃত্তিসমূহ অবলম্বন করার যোগত্য যাদের নেই, সেই সকল ব্রাহ্মণ যে চিকিৎসক, দূত, কর-সংগ্রহকারী, কাঠুরিয়া, ব্যবসায়ী, চাষী, পশুপালক, কসাই, সামরিক প্রহরী ও শিকারজীবীদের বৃত্তি গ্রহণ করে সে কথাও বলা হয়েছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করেন না। একথা তীর্থঙ্কর বা জৈনদের ক্ষেত্রেও সত্য। মহাবীর-বর্ধমান ব্রাহ্মণী দেবনন্দার গর্ভে সৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু যিনি ভাবী তীর্থঙ্কর অতএব ব্রাহ্মণীর গর্ভে তার জন্ম উচিত হবে না মনে করে দেবতারা তাঁর ভ্রূণকে ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে সরিয়ে দেন। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বেস্‌স (বৈশ্য) ও শুদ্ধ (শূদ্র) শব্দদ্বয় বাঁধা ছকের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু জাতি বা বর্ণ হিসাবে বৈশ্য ও শূদ্রদের বিষয় সেখানে আলোচিত হয়নি। বৌদ্ধ জাতকসমূহে যাদের গহপতি বা গৃহপতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা ভূম্যধিকারী ও বণিক শ্রেণীর মানুষ, যাদের সামাজিক অবস্থান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নীচে। এদের মধ্যে যারা অধিকতর ধনী তারা শ্রেষ্ঠী নামে পরিচিত হত। জাতক সাহিত্যে গহপতি ও কুটুম্বিক সমার্থক, তবে এরা ছিল প্রধানত বাণিজ্যজীবী। শ্রমজীবী দু'প্রকার মানুষের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, ভতক বা কম্মকার (ভাড়া করা শ্রমিক) এবং দাস। এছাড়া বহু ধরনের পেশাদার ও কারিগর জাতির কথা আছে যাদের নিজস্ব গিল্ড বা সংগঠন ছিল যা শ্রেণী বা সঙ্ঘ নামে কথিত। সুত্তবিভঙ্গে ঝুড়ি প্রস্তুতকারক, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চর্মকার, নাপিত প্রভৃতি বৃত্তিকে হীনসিপ্প (হীনশিল্প) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং বেন, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ পুক্কুস প্রভৃতিকে হীনজাতি বলা হয়েছে।

৪.৩ দাস প্রথা

প্রাচীন ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় দাসপ্রথার এত বিস্তৃতি ছিল যে মার্কস-প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদগণ মানব-ইতিহাসের একটি পর্যায়কে 'দাসতার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী এদেশে দাসপ্রথার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন বলেছেন, যদিও রামশরণ শর্মা ও দেবরাজ চানানা বিপরীত মত পোষণ করেন। ভারতে দাসপ্রথা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের মতো এখানে এই প্রথার বিশেষ বিকাশ ঘটেনি। অতি সীমাবদ্ধ পরিসরে ও অতি সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে (যেমন গৃহকর্ম ইত্যাদি) কিছু কিছু দাস এখানে কেনাবেচা চলত। এবং কেউ কেউ স্বেচ্ছামূলকভাবে আত্মবিক্রয় করত, কিন্তু এই পরিসর মোটেই বিস্তৃত ছিল না, তাই মেগাস্থিনিস যথার্থ বলেছিলেন যে 'ভারতবর্ষে দাসপ্রথা নেই'। এর অর্থ তিনি স্বদেশে যে দাসপ্রথার চিত্র দেখেছিলেন সেরকম কোন চিত্র এদেশে তাঁর চোখে পড়েনি।

ঋগ্বেদ-এ যে 'দাস' এবং 'দস্যু' শব্দদ্বয় আছে তাদের দ্বারা স্থানীয় অবৈদিক বা শত্রুভাবাপন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে বোঝানো হয়েছে। তবে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর কাহিনী অনুযায়ী অজীগর্ত তার মধ্যমপুত্র শুনঃশেপকে রোহিতের নিকট শত ধেনুর বিনিময়ে বিক্রয় করেছিল। মহাভারতে দেখা যায় যে যুধিষ্ঠির নিজেদের দাসত্বের বাজি

ধরেছিলেন। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী রাজা হরিশচন্দ্র নিজেকে বিশ্বামিত্রের নিকট বিক্রয় করেছিলেন, এবং তাঁর দাস হয়েছিলেন। অশোক তাঁর নবম পর্বতানুশাসনে দাসদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন যা দাসপ্রথা অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মনু সাত ধরনের দাসের কথা বলেছিলেন : যারা যুদ্ধে অধিকৃত হয়েছে,যারা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য খাদ্যের অভাবে দাসত্ব স্বীকার করেছে, যারা দাসীর গর্ভে জন্মেছে, যাদের কেনা হয়েছে, যারা পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে, যারা উত্তরাধিকারসূত্রে দাস হয়েছে এবং যারা আইনগত কারণে দাসত্ব করেছে। কৌটিল্যও অনুরূপ কয়েক ধরনের দাসের কথা বলেছেন। নারদের মতে দাস পনেরো ধরনের। যাজ্ঞবল্ক্য এবং কাত্যায়ণও দাসের সম্পর্কে বিস্তৃত বিধান দিয়েছেন।

মনুর মতে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তিকে এবং নাবালক শূদ্রকে দাস করা যাবে না। কৌটিল্য আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন যে আর্যদের অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যভুক্ত মানুষদের কদাচ দাস করা যাবে না, যদিও ম্লেচ্ছদের (শক, যমন, পারদ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে তা করা যাবে। কৌটিল্য দাসদের ব্যক্তিগত উপার্জন, সম্পত্তিরক্ষা এবং বিলিব্যবস্থার স্বাধীনতা দিয়েছেন। প্রভুকে অর্থপ্রদানের দ্বারা দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার বিধান সকল ধর্মশাস্ত্রেই দেওয়া হয়েছে। যদি দাসদের বিরুদ্ধে মনিব কোন অপরাধ করে বা যদি দাসকে দিয়ে কোন কুকর্ম করায় দাস তদ্দণ্ডে মালিকের আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে এবং মালিককে রাজদণ্ড ভোগ করাতে পারে। নারদ (৩০) ও যাজ্ঞবল্ক্য (২/১৮২) বলেন যে প্রভুর কোন বিশেষ উপকার করলে অথবা যে শর্তবিধানে কোন ব্যক্তি দাস হয়েছে সে শর্তের পূরণ হয়ে গেলে দাস স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে যদি কেউ দাস রাখার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে অনুলোমজ দাস রাখতে হবে। কৌটিল্য (৩/১৩) এবং কাত্যায়ণ (৭২৩) বলেন যে প্রভু যদি কোন দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন মাতা ও সন্তান তদ্দণ্ডেই স্বাধীন হিসাবে গণ্য হবে। ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে দাসদের পারিবারিক জীবনযাপন করার অধিকার ছিল এবং সেখানে প্রভুর হস্তক্ষেপ অবৈধ বলে গণ্য হত, এবং দ্বিতীয়ত, তাদের নিজস্ব উপার্জন তারা নিজেরা ভোগ করতে পারত।

৪.৪ নারিজাতির অবস্থা ও বিবাহপ্রথা

সমাজে নারীর স্থান ঃ ভারতীয় সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক হওয়ার কারণে (কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মাতৃপ্রধান সমাজ বাদ দিলে) ঋগ্বেদের যুগ থেকেই সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদার ক্রমিক অবক্ষয়ের যে সূচনা হয় তা ভারত-ইতিহাসে বরাবরই অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে সুদূর অতীতে মেয়েদের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার হত, কিন্তু কালক্রমে তা বন্ধ হয়ে যায়, বেদপাঠ তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয় এবং বিবাহ ছাড়া তাদের কোন সংস্কার স্বীকার করা হয় না। তাদের বিবাহের বয়সও কমিয়ে আনা হয়, যদিও বৈদিক যুগে তুলনামূলকভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা অনেকটা বেশি ছিল। প্রাচীন যুগে নিয়োগ প্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়গুলি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়। পাশাপাশি অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, কর্তব্য ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয়। ঋগ্বেদের যুগ থেকে ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না। যেমনই হোক, এবিষয়ে প্রথম *মনুস্মৃতি*-তে কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হয়। নারীর ধর্মীয় কর্তব্য এবং পূর্তধর্মাদির বিধান ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। আইন ও অপরাধীর শাস্তির ক্ষেত্রে

কিছু বিশেষ সুবিধা তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু নারীজাতির প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, মনু যা বলেন, যে তারা বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। নারী কদাচ স্বাধীন নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজও পর্যন্ত কার্যত বজায় আছে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বযুগেই ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বেশ কয়েকজন সম্রাজ্ঞী ও শাসিকার পরিচয় পাওয়া যায়—যাঁরা দক্ষতায় ও যোগ্যতায় পুরুষদের চেয়ে কোন অংশই কম ছিলেন না।

৪.৪.১ শিক্ষা

উপনিষদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে গার্গীর মতো কোন কোন নারী ব্রহ্মবাদিনী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং তাঁরা শাস্ত্রালোচনা সভায় পুরুষদের সাথে সমানভাবে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বালকদের মতো বালিকাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ধর্ম পালন বাধ্যতামূলক ছিল না এবং তারা গুরুগৃহে শিক্ষার্থে প্রেরিত হত না। তবে অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে গুরুগৃহের কন্যাবৃন্দ পুরুষ শিক্ষার্থীদের সাথেই শিক্ষালাভ করত, এবং এই ধারা যে অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ ভবভূতির *মালতীমাধব* নাটকের কামন্দকী—যে পুরুষ ছাত্রদের পাশাপাশি বসেই শিক্ষালাভ করত। পাণিনি বিভিন্ন বৈদিক শাখায় অধ্যয়নরতা নারীদের কথা বলেছেন। 'উপাধ্যায়া' নামক বিশেষ পরিভাষাটি প্রমাণ করে যে শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষয়িত্রীর কাজও করতেন। পতঞ্জলি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নারীদের কথা বলেছেন। অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুণী রচত সঙ্গীত থেরী গাথায় আছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ছিলেন এবং মোক্ষলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করেন। জয়ন্তী নাম্নী এক সুশিক্ষিতা রমণী মহাবীরের সাথে উন্নতমানের দার্শনিক আলোচনা করেন। সচরাচর নৃত্য-গীত-অঙ্কন বিদ্যার ন্যায় ললিতকলা চর্চায় মেয়েরা পারদর্শিনী হতেন, তবে কেউ কেউ ধনুর্বেদেও শিক্ষালাভ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বহু বিদূষী মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও সামগ্রিক বিচারে সুবিশাল নারীজাতির খুব সামান্য অংশেরই শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটত। তবে একথাও স্বীকার্য যে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের স্ত্রী-ভগিনী-কন্যারা তাঁদের কৌলিক বিদ্যায় দক্ষ হতেন।

৪.৪.২ বিবাহ

ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিধান অনুযায়ী বিবাহই ছিল মেয়েদের একমাত্র সংস্কার। স্মৃতি ও নিবন্ধ অনুযায়ী বিবাহের উদ্দেশ্য তিনটি, যথা ধর্মসম্পত্তি (ধর্মানুষ্ঠানের জন্য), প্রজা (পুত্রোৎপাদন) এবং রতি (সুরতক্রিয়া) ও কামশাস্ত্র অনুযায়ী কন্যা যেন পাত্রের চেয়ে পাত্রের চেয়ে অন্তত তিন বছরের বয়সে ছোট হয়। বেদ এবং মহাকাব্যদ্বয়ে মেয়েদের পূর্ণ যৌবনেই বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ধর্মশাস্ত্রসমূহে মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স নামিয়ে আনা হয়েছে। এমনকী বয়ঃসন্ধির পূর্বেই তা চুকিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মনুর মতে যদি কন্যা উৎকৃষ্ট হয় তাহলে তার কুল খারাপ হলেও তাকে গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন যে পাত্র যোগ্য না হলে কন্যা বরং সারাজীবন অবিবাহিতা থাকবে। মনু আরও বলেন যে কন্যা সাবালিকা হলে তার পিতা তার বিবাহ না দেন, সে নিজেই যেন স্বামী খুঁজে নিতে সচেষ্ট হয়। অসবর্ণ বিবাহ চলতে পারে, তবে তা অনুলোম হওয়া বাঞ্ছনীয় (উচ্চবর্ণের পাত্র, নিম্নতর বর্ণের পাত্রী), যদিও প্রতিলোম বে-আইনী নয়। সপিণ্ড অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ককে বিবাহ নিষিদ্ধ, বিবাহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রথা ও রীতিনীতি মানার আবশ্যকতা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত।

আট ধরনের বিবাহ ধর্মশাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে, যথা, ব্রাহ্ম অর্থাৎ যে বিবাহে গুণবান ও শাস্ত্রজ্ঞ পাত্রকে

আমন্ত্রণ জানিয়ে, কন্যার পিতা স্বয়ং তার হাতে সালঙ্কারা কন্যাকে সমর্পণ করেন; আর্য অর্থাৎ কন্যার পিতা যখন একজোড়া বলদ অথবা একটি বলদ ও একটি গাভী পাত্রের কাছ থেকে গ্রহণ করে তাকে কন্যাদান করেন; দৈব অর্থাৎ যে বিবাহে কন্যার পিতা সুসজ্জিতা কন্যাকে যজ্ঞকারী পুরোহিতের হস্তে অর্পণ করেন; প্রজাপত্য অর্থাৎ যে বিবাহে পিতা তাঁর কন্যাকে পাত্রের হস্তে এই বলে সম্প্রদান করেন যে 'তোমরা একত্রে যথাবিহিত ধর্ম পালন কর'। গান্ধর্ব অর্থাৎ যে বিবাহ পূর্বপরিচিত পাত্র-পাত্রীর প্রেম-ভালবাসার দ্বারা সম্পন্ন হয়; আসুর অর্থাৎ যে-বিবাহে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে ধনসম্পদ উপহার ইত্যাদি দিয়ে পাত্রের জন্য কন্যা নিয়ে আসেন; রাক্ষস অর্থাৎ যে বিবাহে পাত্রীকে বলপূর্বক হরণ করা হয়; এবং পৈশাচ অর্থাৎ যেখানে পাত্রীকে ঘুমন্ত অথবা মত্তাবস্থায় অথবা তার অসর্তকতার সুযোগে ধর্ষণ করা হয়।

যে বিবাহকে পৈশাচ আখ্যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ কর্মকে মনু অন্যত্র শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং অপরাধীর পুরুষাঙ্গছেদের বিধান দিয়েছেন। কাজেই মনে হয় পৈশাচ বিবাহ বলতে আদিতে অন্য কিছু বোঝাত এবং পরে একটি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করা হয়। গন্ধর্বরা হিমালয় অঞ্চলে বাস করত (এখনও ওই নামে একটি জাতি আছে), অসুররা ইরানে। রামায়ণে একটি পুরোদস্তুর রাক্ষস সভ্যতার পরিচয় আছে। পিশাচ নিঃসন্দেহে একটি জনগোষ্ঠীর নাম, কেননা পৈশাচী প্রাকৃত নামে একটি ভাষা ছিল যে ভাষায় গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা রচিত হয়েছিল। মনে হয় গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহ ওই সকল জনগোষ্ঠীর আচরিত বিবাহ রীতি। এই আট প্রকার বিবাহ ছাড়াও রাজকন্যাদের ক্ষেত্রে স্বয়ম্বর প্রথা চালু ছিল যা অনুযায়ী সমাগত পাণিপ্রার্থীদের মধ্য থেকে রাজকন্যারা তাদের মনোমত পতি পছন্দ করে নিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রার্থীদের কোন প্রতিযোগিতায় জয়লাভের দ্বারা নিষ্পন্ন হত।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য দিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন হত : গুণ পরীক্ষা, বরপ্রেষণ, বাগ্‌দান, মণ্ডপকরণ, বধূগৃহাগম, মধুপর্ক, সাপন-পরিধাবন-সম্মোহন, সমাঞ্জন, প্রতিসরবন্ধল পরস্পর সমীক্ষণ, কন্যাদান, অগ্নিস্থাপন, হোম, পানিগ্রহণ, লাজহোম, অস্মাবোহন, সপ্তপদী, মুর্ধাভিষেক, দক্ষিণাদান, গৃহপ্রবেশ, ধ্রুবারুন্ধতী দর্শন, ত্রৈরাত্রব্রত, চতুর্থী, কর্ম, সীমান্তপূজন, তৈলহরিদ্রারোপণ, আর্দ্রাক্ষতারোপণ এবং মঙ্গালসূত্র ধারণ।

৪.৪.৩ বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

বৈদিক সাহিত্যে এমন কিছু কিছু বক্তব্য আছে যেগুলি কোন নারীর বিবাহবিচ্ছেদের ইঙ্গিতবহ। পুনর্ভূ শব্দটি সেই বিধবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। বৌধায়ন *ধর্মসূত্র*-এ (২/২/৩১) পৌনর্ভব শব্দটি দ্বারা সেই ধরনের নারীর সন্তানকে বুঝিয়েছে যে নারী তার প্রথম স্বামীর ক্লীবত্ব বা পতিত হয়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। *নারদ* ও *পরাশরস্মৃতি*-তে এবং *অগ্নিপুরাণ*-এ বলা হয়েছে যদি কোন নারীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়, অথবা মারা যায়, অথবা প্রব্রজ্যা নিয়ে সংসার ত্যাগ করে, অথবা ক্লীব হয়, অথবা কোন দুষ্কর্মের জন্য পতিত বা সমাজচ্যুত হয় তাহলে সেই নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। মনু (৯/৭৬) বলেন যে কোন নারীর স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে সে কয়েক বছর অপেক্ষা করবে। তবে মনু (৯/১৯০-৯১) এক স্থানে বলেছেন যে কোন নারীর প্রথম স্বামীর সন্তান ও দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান থাকলে, প্রথমোক্তগণ প্রথম স্বামীর এবং দ্বিতীয়োক্তগণ দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে বাস্তবে কোন নারীর দ্বিতীয় স্বামী থাকা খুবই সম্ভব ছিল। তারপর সে পুনর্বিবাহ করবে কি না একথা মনু স্পষ্ট বলেননি, যদিও *নারদস্মৃতি*-তে পুনর্বিবাহের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

এই সকল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ বিবাহবিচ্ছেদের আধুনিক ডিভোর্সের দৃষ্টান্ত নয়। একমাত্র কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-য়েই (৩/৩) বলা হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা ঘটলে উভয়ের আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। এই বিষয়ে স্থানীয় লোকাচারকে, বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মহিলাদের ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহের বিষয়টি, স্মৃতিগ্রন্থসমূহের টীকাভাষ্যে আলোচিত হয়েছে। গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী পুনর্বিবাহিতা ছিলেন বলে প্রকাশ। পুনর্ভু তিন প্রকারের হতে পারে— যদি প্রথম বিবাহ যথাবিহিত না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ; প্রথম স্বামীকে পরিত্যাগ করে কোন নারীর দ্বিতীয় বিবাহ; এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর মৃতের স্বজনবর্গ যদি তার সপিণ্ড সম্পর্কের কোন পুরুষের সঙ্গে ওই নারীর পুনরায় বিবাহ দেয়।

৪.৪.৪ নিয়োগপ্রথা

অপুত্রক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যদি অন্য কোন নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা নিজগর্ভের সন্তান উৎপাদন করে, এই প্রকার ব্যবস্থাকে নিয়োগপ্রথা বলে। নিয়োগের ফলে সৃষ্ট সন্তানকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হয়। এই প্রথার বহু উৎপাদন মহাভারতেই আছে। ঋষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভ সঞ্চার করেছিলেন। দীর্ঘতমা ঋষি রানী সুদেষ্মার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম নিয়োগপ্রথার ফলে, নিযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং ব্যাসদেব যিনি অম্বিকা, অম্বালিকা ও জনৈকা দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। পঞ্চপাণ্ডবও নিয়োগপ্রথার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষেত্রজ সন্তান। এই প্রথার উপযোগিতা ও যাথার্থতা গৌতম, বশিষ্ঠ ও বৌধায়নের ধর্মসূত্রে এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদের ধর্মশাস্ত্রে, তথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও আপস্তম্ব প্রমুখ শাস্ত্রকাররা এই প্রথা সমর্থন করেন নি। মনুও বিষয়টির ক্ষেত্রে অনেকগুলি শর্ত আরোপ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪.৪.৫ সম্পত্তির অধিকার

মেয়েদের সম্পত্তি স্ত্রীধন নামে পরিচিত। মনু বলেন স্ত্রীধন ছয় প্রকার ঃ বিবাহ-হোমকালে লব্ধ যে ধন তাকে অধ্যাগ্নি ও পতিগৃহে যাওয়ার সময় লব্ধ যে ধন তাকে অধ্যাবাহনিক বা ব্যবহারিক স্ত্রীধন বলে। রতিকালে অথবা অন্যকালে পতি কর্তৃক প্রীতি-সহকারে দত্ত যে ধন তা প্রীতিদত্ত। বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভর্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্তৃকুল হতে লব্ধ যে ধন তাকে অন্বাধেয় বলা (৯/১৯৪/৯৫) হয়। মাতারা ভ্রাতারা তাদের ভাগের এক-চতুর্থাংশ বহন করবে, এরকম কথা বলা আছে বটে তবে তা ইচ্ছামূলক না বাধ্যতামূলক তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। কৌটিল্য (২/২) শুল্ক (কন্যার প্রাপ্য), অন্বাধেয় (যা পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া যায়), অধিবাদনিক (যা স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া যায়) এবং বন্ধুদত্ত এই চারপ্রকার স্ত্রীধনের উল্লেখ করেছেন। স্ত্রীধন সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা কাত্যায়ণ স্মৃতিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীদনের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : "স্থাবর বা অস্থাবর যে-কোন সম্পত্তিই হোক না কেন, যা কোন নারী তার কুমারী অবস্থায়, বিবাহকালে, বিবাহের পর তার স্বজন ও বান্ধবের কাছ থেকে পেয়ে থাকে সে যা উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা উপার্জনসূত্রে লাভ করে, সবটাই তার স্ত্রীধন"। স্ত্রীধনের উপর স্বামী বা শ্বশুরকুলের কোন অধিকার নেই তবে কোন কোন স্মৃতির মতে দুর্ভিক্ষে, বন্দীদশায়, রোগে এবং ধর্মার্থে স্বামী তার স্ত্রীর স্ত্রীধন গ্রহণ করতে পারে।

৪.৪.৬ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি ও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যাতে পুত্রবধূর সুসম্পর্ক

থাকে সে বিষয়ে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কিন্তু গৃহের পরিবেশ যে সর্বদা শান্তিপূর্ণ থাকত না তারও উল্লেখ আছে। মহাকাব্যদ্বয়ে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের তৎসহ পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে রাজা, রাজবংশীয় এবং সম্ভ্রান্তদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল, যদিও সাধারণ মানুষেরা এক স্ত্রী নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতেন। সর্বর্ণা স্ত্রী এবং তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি বৈষয়িক ও আইনগত অধিকার অসবর্ণা স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিকতর ভোগ করত। মনু বলেন যে, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে স্বামীকে রাজদণ্ড ভোগ করতে হবে, যদিও তিনি সর্বাংশে স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করেছেন। কৌটিল্য স্বামী ও স্ত্রীকে সমান চোখেই দেখেছেন। নারদ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস মহাপাপ এবং উভয়ের সম্পর্ক বিশ্বাসের হলেই তা মধুর হয়। তাঁর মতে (১২/৯০-৯৬) স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় বা স্বামীকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত থাকে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করতে পারে, অন্যথায় স্বামী রাজাকর্তৃক দণ্ডিত হবে। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ ঘোরতর পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষ প্রাধান্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর প্রতি কিছুটা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তারা প্রায়শ্চিত্ত করে সহজেই শুদ্ধ হতে পারে। স্ত্রী নিজে থেকে স্বামীর সম্পত্তির বিভাজন দাবি করতে পারে না, তার সম্পত্তি ভাগের সময় সন্তানদের সমতুল্য ভাগের অধিকারী হতে পারে।

৪.৪.৭ বিধবা

কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ স্বীকার করে নিলেও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত দেননি, যদিও কৌটিল্য এবং নারদ ও তদানুসারে *পরাশরস্মৃতি* ও *অগ্নিপুরাণ*-এ বিধবার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে অনুমোদন আছে। ধর্মসূত্রসমূহেও (বশিষ্ঠ ১৭/১৯, ২০, ৭২, ৭৪; বৌধায়ন ৪/১-১৬ ইত্যাদি) বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি আছে। *ঋগ্বেদে*-এ সতীপ্রথার কোন উল্লেখ নেই, তবে *অথর্ববেদ*-এ একস্থলে (১৮/৩/১) আছে। *মহাভারত*-য়েও বিধবার অগ্নিতে দেহ বিসর্জনের কয়েকটি কাহিনী আছে। ওনেসিক্রিতোস, ডায়োডারাস, আরিস্তোবুলোস প্রভৃতি গ্রীক লেখকেরা বিধবাদের সহমরণ প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রথা অনুমোদিত নয়। মনু (৫/১৫৭-৬০) বলেন যে বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মসংযমী ও শুদ্ধ হয়ে অবশিষ্ট জীবন যাবন করে যশস্বিনী হবে। মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের কথা কৌটিল্য (৩/২) প্রথম বলেন। *মহাভারত*-এ বিধবাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা নষ্ট করা বা বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে মনু একেবারেই নীরব কিন্তু নারদ বলেন যে বিধবা আমৃত্য খোরপোস পাবার অধিকারিণী। বৃহস্পতি ও কাত্যায়ণ অধিকাংশ উদার, তাঁরা বিধবাকে স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হতে আপত্তি করেন নি। দায়ভাগে সন্তানহীনা বিধবা পুরো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, এমনকী যৌথ পরিবারেও স্বামীর অংশ সে-ই ভোগ করে। মিতাক্ষরাতেও বিধবাকে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হয়েছে, তবে সব দিকের বিচারে বিধবাদের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ সুবিচার করেনি।

৪.৪.৮ দেহোপজীবিনী

দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর মতে বেশ্যা শব্দটি *ঋগ্বেদ*-এ উল্লিখিত 'বিশ' থেকে নিষ্পত্তি হয়েছে। 'বিশ' শব্দের অর্থ জনবসতি, গ্রাম, অঞ্চল প্রভৃতি, এবং সেই হিসাবে বেশ্যা বলতে সাধারণ মহিলাকে বোঝায়, যাদের সম্পর্কে অবশ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বযুগেই একরকম নয়। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এ (১/৩/২০-২১) বলা হয়েছে যে সকল বেশ্যাই গণিকা নয়, যারা চৌষট্টিকলায় পারদর্শিনী, রূপ ছাড়াও বিদ্যা ও বুদ্ধিতে

শ্রেষ্ঠ, যার কথাবার্তা মধুর, সুনির্দিষ্ট, মার্জিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত, তারাই হচ্ছে গণিকা। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত আম্রপালী যার আমন্ত্রণ, বৈশালীর রাজকুমারদের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন। কৌটিল্য গণিকাধ্যক্ষ নামক রাজকর্মচারী নিয়োগের কথা বলেছেন যাঁর দায়িত্ব ছিল কার্যরতা দেহোপজীবিনীদের দেখাশোনা করা ও সুরক্ষা প্রদান করা। কৌটিল্য বলেন যে কূটনৈতিক প্রয়োজনে রাজা এক সহস্র পণ বেতনে একজন সুশিক্ষিতা ও গুণসম্পন্না গণিকা নিযুক্ত করবেন, এবং এর অর্ধবেতনে একজন প্রতিগণিকা নিয়োগ করবেন। দেহোপজীবিনীদের পেশা বিষয়ক বিবিধ আইন কৌটিল্য প্রণয়ন করেছেন। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এর একটি বিশেষ অংশে তাদের ব্যবসায়ের রীতিনীতি, শ্রেণীবিভাগ, গ্রাহকদের সাথে ব্যবহার, সুবিধা, অধিকার, কর্তব্য, সুরক্ষা, কৌশল প্রভৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। *মৃচ্ছকটিক* নাটকের বসন্তসেনা, দশকুমার রাগমঞ্জরী ও চন্দ্রসেনা প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট গণিকা চরিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। *মৎস্যপুরাণ*-এ একটি অধ্যায়ের নাম 'বেশ্যাধর্ম' যাতে এই বৃত্তির খুঁটিনাটি অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। *উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা*-র দুটি কাহিনীতে উৎকৃষ্ট ধরনের গণিকাদের কথা আছে। দামোদরগুপ্তের (অষ্টম শতক) বিখ্যাত *কুট্টনীমত* নামক রচনা তৎকালীন গণিকাবৃত্তির উপর মূল্যবান আলোকপাত করে। ক্ষেমেন্ড (একাদশ শতক) বিরচিত *সময়মাতৃকা* একজন অবসরপ্রাপ্তা দেহোপজীবিনীর জীবনকথা যে অপর দেহোপজীবিনীদের অবিভাবিকা (মাতৃকা, এযুগের মাসী) স্বরূপ কাজ করে। অনেক দরিদ্র ঘরের নারী যে গোপনে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত তারও সাহিত্যগত উল্লেখ বহু আছে। গণিকা ছাড়া সাধারণ দেহোপজীবিনীরা রূপাজীবা, কুম্ভদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, শিল্পীকারিকা, নটী প্রভৃতি নামে পরিচিত হত।

৪.৫ অনুশীলনী

১। প্রাচীন ভারতের জাতিবর্ণ প্রথা সম্পর্কে রচনাত্মক বর্ণনা দিন।

২। প্রাচীন ভারতের নারীজাতির অবস্থা বর্ণনা করুন।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : *লোকায়ত দর্শন* (১৯৫৫)

২। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা* (১৯৮৭)

৩। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য : *ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট* (১৯৯৬)

৪। নির্মল কুমার বসু : *হিন্দু সমাজের গড়ন*

৫। এ. এল. বাসাম (সম্পা.) : *এ কালচারাল হিস্ট্রী অফ্ ইন্ডিয়া* (১৯৭৫)

৬। আর. সি. মজুমদার (সম্পা.) : *হিস্ট্রী এ্যান্ড কালচার অফ্ দ্য ইন্ডিয়ান পিপ্‌ল,* ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯৫১-৬৬)

৭। বি. এন. এস. যাদব : *সোসাইটি এ্যান্ড কালচার ইন নরদ্যান ইন্ডিয়া ইন দ্য টুয়েলফ্‌ত সেঞ্চুরী এ. ডি.* (১৯৭৩)

৮। ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় : *এ হিস্ট্রী অফ্ সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ইন এনসিশয়েন্ট ইন্ডিয়া খণ্ড ৩।*

পর্যায়-৩

একক ১ক ❑ ভারতে ইসলামের অভিঘাত ও রাজনৈতিক পরিবর্তন— দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা

গঠন

১ক.০ উদ্দেশ্য

১ক.১ প্রস্তাবনা

১ক.২ ইসলামের আবির্ভাব ও ভারতে ইসলামের প্রসার

১ক.২.১ ইসলামের অভিঘাতে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তন

১ক.৩ ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ

১ক.৩.১ ভারতে আরব অভিযান

১ক.৩.২ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

১ক.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

১ক.৪ তুর্কী অভিযানের সময় ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১ক.৪.১ ভারতে তুর্ক-আফগান অভিযানের শুরু : সুলতান মামুদ

১ক.৪.২ মামুদের অভিযানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

১ক.৫ ভারতের বিকেন্দ্রিকৃত সামন্ত কাঠামো

১ক.৫.১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব

১ক.৫.২ তুর্ক-আফগান অভিযানের পর ভারতীয় শাসকদের অবস্থা

১ক.৬ মহম্মদ ঘুরির অভিযান

১ক.৬.১ মহম্মদ ঘুরির অভিযানের ফল : কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন

১ক.৭ তুর্ক-আফগানদের সাফ্যল্যের কারণ : ভারতীয় সামন্ত শাসকদের দুর্বলতা

১ক.৮ অনুশীলনী

১ক.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- ইসলামের অভিঘাতের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা
- কিভাবে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করেছিল, বিশেষ করে সুলতান মামুদের আক্রমণের আগের ভারতের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ
- সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ ও ভারতীয় প্রতিরোধের ব্যর্থতা
- মহম্মদ ঘুরির বিজয় ও তার প্রতিক্রিয়া

১ক.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন এই এককটি সামগ্রিক ভাবে ভারতে ইসলামের অভিঘাতের প্রথম পর্ব সম্পর্কে একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। উত্তর ভারতের যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের আবির্ভাব, সেটিকেও যথাসম্ভব স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। সুলতান মামুদের আক্রমণের উদ্দেশ্য এবং ফলাফলের কথাও এই এককে উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে মহম্মদ ঘুরির বিজয়ের কারণ এবং তরাইনের যুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধের ব্যর্থতার কথাও আপনারা এই এককে জানতে পারবেন।

১ক.২ ইসলামের আবির্ভাব ও ভারতে ইসলামের প্রসার

সপ্তম শতকে ইসলামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পশ্চিং এশিয়ার আরবদেশে হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) এই ধর্মমত প্রবর্তন ও প্রচার করার একশো বছরের মধ্যেই ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নানাদিকে প্রসার ঘটে। ইসলামের এই দ্রুত প্রসারের ফলে পশ্চিম এশিয়া এবং ইরান তার করায়ত্ত হয়। তারপর খোরাসান, মধ্য এশিয়া এবং বিশেষ করে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় ইসলামের বিস্তৃতি ঐসব অঞ্চলে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। সতীশচন্দ্র মনে করেন, স্থলপথে ভারতের সঙ্গে চীনের এবং পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কও ইসলামের অভিঘাতে ব্যাহত হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য বহির্বাণিজ্যের এই প্রাথমিক অসুবিধাগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কেটে গিয়েছিল, ভারতীয় নাবিক ও বণিকরাও কালক্রমে তাঁদের পুরনো ভূমিকায় ফিরে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ হয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়। এই আমল থেকে দ্বাদশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত নানাভাবে ইসলামের ভারতে প্রবেশ এবং এই যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে।

সপ্তম শতকের শেষদিক থেকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি ও ইসলামের আবির্ভাব সংক্রান্ত সমকালীন তথ্যসূত্র প্রধানত তিন ধরনের, যথা—বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির শাসনকালে উৎকীর্ণ লেখমালা, দেশীয় সাহিত্যগত বিবরণ (প্রধানত জীবন-চরিত) এবং আরবি ও পারসিক পর্যটক-পন্ডিতদের বিবরণ। এই শেষোক্ত তথ্যসূত্রের মধ্যে আলোচ্য পর্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণটি হল পণ্ডিত আলবেরুনির লেখা 'তহকিক-ই-হিন্দ' বা ভারততত্ত্ব।

১ক.২.১ ইসলামের অভিঘাতে ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তন

ইসলামের অভিঘাতে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক (Centralized monarchy) শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই শাসনব্যবস্থা দিল্লি-সুলতানি (Delhi Sultanate) নামে পরিচিত। সামরিক শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রীভূত তুর্কি রাষ্ট্রব্যবস্থা কালক্রমে সর্বভারতীয় চেহারা লাভ করে এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। তবে কেবলমাত্র রাজ্যজয় ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই ইসলামি

নেতারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এই ধারণা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে তুর্কি রাষ্ট্রনৈতিক শাসন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ইসলামি জগতের নানাধরনের মানুষ নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। এদের মধ্যে বণিক, পর্যটক, ধর্মপ্রচারক, মরমি সাধক যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন সৈন্য, রাষ্ট্রনেতা ও লুঠেরার দল। কাজেই 'একহাতে তরবারি ও অন্যহাতে কোরাণ' নিয়ে ইসলামের ভারতজয়ের কাহিনী ইতিহাসের সরলীকরণ এবং একপেশে ব্যাখ্যা। সপ্তম শতক থেকে ইসলামের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ আসলে এক দীর্ঘ, জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছিল দিল্লি-সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যেমন একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে আসেননি তেমনই তাঁদের প্রবেশ পথও ছিল ভিন্ন। কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে আরব ও তুর্কি-আফগান সেনাবাহিনী নয়, জলপথে এদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে এসে নেমেছিলেন বণিক ও পর্যটকেরা।

১ক.৩ ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ

নানা পথে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামের ভারতে প্রবেশ এদেশের ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু সে পরিবর্তনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগবিভাগ করা যায় কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। দিল্লি-সুলতানি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ শুরু হল এই ধারণা মেনে নিতে সবাই রাজি নন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের একাংশ ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আদি মধ্যযুগের সূচনা করেছিল বলে মনে করেন। ষষ্ঠ শতকে কেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অবক্ষয় ও উৎপাদন সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে তাঁরা যুগ-পরিবর্তনের মূল সূত্রগুলি সনাক্ত করেছেন। আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ জেমস মিল (The History of British India) সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠা থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'হিন্দু যুগ' শেষ হয়ে 'মুসলিম লিগ' শুরু হয় বলে মনে করতেন। শসকশ্রেণীর ধর্ম অনুসারে এই সাম্প্রদায়িক যুগবিভাগ ইতিহাসের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা থেকে তৈরি। ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুলতানেরা ক্ষমতায় বসা মাত্র (১২০৬) রাতারাতি ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ পাল্টে যায়নি। ইসলামের অভিঘাতে ভারতীয় জনজীবনে পরিবর্তন এসেছিল ধীরে, জটিল ও দীর্ঘ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। কাজেই সুলতানি ও মুঘল আমলাকে 'মুসলিম যুগ' আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক।

১ক.৩.১ ভারতে আরব অভিযান

ভারতবর্ষে ইসলামের অভিঘাতের চরিত্র সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাটি সেরে ফেলার পর এবার মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে এই উপমহাদেশের যোগাযোগের একটি সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। সপ্তমশতকে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের ওপর আরব বণিকদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার তাদের ভারতবর্ষে বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারেও বিশেষ আগ্রহী করে তোলে। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের তিরোধানের পর মাত্র বারো বছরের মধ্যেই তিনবার ভারতের পশ্চিম উপকূলের তিনটি বন্দরে আরব নৌ-বাহিনী অভিযান চালায়। তানহ্, ভৃগুকচ্ছ এবং দেবল বন্দরে এই তিনটি আক্রমণই চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী প্রতিহত করেন। এরপর

অষ্টম শতকের গোড়ায় সিন্ধু অঞ্চলে তিনবার আরব সামরিক চালানো হয়। ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজ বিন-ইউসুফের নেতৃত্বে প্রথম দুটি আক্রমণ ব্যর্থ হলেও, মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযানটি সফল হয়। ৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে কাশিমের হাতে সিন্ধুরাজ দাহির পরাজিত ও নিহত হন। সুলতানকে কেন্দ্র করে সিন্ধু অঞ্চলে আরব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান জয়ের পর আরব-বাহিনী আরও ভূখণ্ড জয়ে সচেষ্ট হল। মহম্মদ-বিন-কাশিম স্বয়ং কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হলেন। অন্য একটি বাহিনী কনৌজ দখলের চেষ্টা করল। কিন্তু কাশ্মীরের ও কনৌজের রাজা আরব অগ্রগতি প্রতিহত করে তাদের রাজ্যসীমা থেকে বিতাড়িত করেন। এই পরাজয়ের পর মহম্মদ-বিন-কাশিম স্বদেশে ফিরে যান ও সেখানে নিহত হন। তাঁর অবর্তমানে সিন্ধুর শাসনভার গ্রহণ করেন সেনাপতি জুনাইদ। তাঁর বাহিনী ৭২৪ থেকে ৭৩৮ সালের মধ্যে রাজপুতানা পর্যন্ত উত্তর ভারতে বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করে নেয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিহাররাজ প্রথম নাগভট্ট, চালুক্যরাজ পুলকেশী ও কাশ্মীরের কার্কটবংশীয় রাজারা বারবার সিন্ধুদেশ আক্রমণ করায় আরবশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। আরব থেকে নতুন কোনও সামরিক সাহায্যে এই সময়ে আসেনি। সিন্ধু ও মূলতান ছাড়া অন্যান্য বিজিত অঞ্চল দ্রুত আরবশক্তির হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে দ্বাদশ শতকের শেষদিকে তুর্কি নেতা মহম্মদ ঘুরির আক্রমণে ভারতে শেষ আরব শাসনটুকু নিশ্চিহ্ন হয়।

১ক.৩.২ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

প্রধানত বাণিজ্যিক কারণে ও লুঠপাটের উদ্দেশ্যে সিন্ধু অঞ্চলে আরব আক্রমণ ও তাদের সাময়িক শাসনের প্রতিক্রিয়া অবশ্য তেমন ব্যাপক হয়নি। উপমহাদেশের বাকি অংশে মহম্মদ-বিন-কাশিমের অভিযানের কোনও প্রভাবই পড়েনি। সুলতানের সামান্য এলাকা ছাড়া ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আরব জাতি দ্বিতীয়বার আর ভারত আক্রমণ করেনি। তবে সিন্ধু অভিযানের পর আরব ও ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সিন্ধুজয়ের পরবর্তী বছরগুলিতে এই অঞ্চলের বণিকেরা আরবের প্রায় প্রতিটি শহরে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছিল। এই বণিকদের মাধমেই আরব সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১ক.৩.৩ অর্থনৈতিক প্রভাব

ইসলামের অভ্যুদয় ও অষ্টম শতকে ভারতে আবির্ভাব উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবনকে সেভাবে প্রভাবিত না করলেও অর্থনীতিকে করেছিল। ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের উত্থানের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য ও অর্থনীতি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জড়িয়ে যায়। পশ্চিম উপকূলের জনজীবনেও এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। আরব লেখক আল-মাসুদি, যিনি ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন, চৌল (সৈমুর) বন্দরে কমপক্ষে দশ হাজার মুসলমান বণিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। দশম শতকে আরব বণিকেরা অনেকে কোঙ্কন উপকূলে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের প্রথম পর্বের ইতিহাস আলোচনা করার সময় কেবল মহম্মদ-বিন-কাশিম বা সুলতান মামুদের কথা নয়, এইসব অনামা বণিকদের কথাও মনে রাখা উচিত। যদিও যথেষ্ট তথ্য ও গবেষণার অভাবে এই ক্ষেত্রটি এখনও কিছুটা অস্পষ্ট থেকে গিয়েছে।

১ক.৪ তুর্কি অভিযানের সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অন্যদিকে উত্তর ভারতে ৭০৮ সালে সিন্ধুর পতনের পর অতন্ত তিনশো বছর আর কোনও বড় মাপের বহিরাক্রমণ হয়নি। এই দীর্ঘ, নিশ্চিন্ত অবসরে আকস্মিক যবনিকাপতন একাদশ শতকের গোড়ায়, ততদিনে মধ্য-এশিয়ার রাজনীতিতে আরবরা পিছু হটে গিয়েছে। ইসলামের পতাকা উড়িয়ে এবার-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়েছিল তুর্ক-আফগান বাহিনী। কিন্তু তুর্কি হানা ও তার পরিণতিতে দিল্লী-সুলতানি প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু করার আগে ওই অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিত কেমন ছিল সেদিকে একবার নজর ফেরানো দরকার। উত্তর ভারতে ঐক্যবন্ধ, কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতকে দিল্লী-সুলতানি প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত উত্তর ভারত আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। কেবল তাই নয়, আলোচ্য পর্বে সমগ্র উপমহাদেশেই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙক্ষা ক্রমশ আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমতি হয়ে পড়েছিল। মৌর্যদের মতো সর্বভারতীয় শক্তি দূরে থাক, গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত বা বাকাটকদের মতো সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের নজিরও এই পর্বে পাওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ, বাংলার পাল সেন বংশ, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ও সুদূর দক্ষিণের চোল সাম্রাজ্য সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হলেও এলাকাভিত্তিক শক্তি হিসেবেই এদের সনাক্ত করা যায়। এই প্রধান শক্তিগুলির অধীনে আবার বহু ছোট ছোট শাসকগোষ্ঠী ছিল, যার সাম্রাজ্যগুলির আধিপত্য মেনে নিলেও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে সর্বদাই তৎপর থাকত। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে এবং অধীনস্ত শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতাদখলের লড়াই এই আমলের একটি অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা।

১ক.৪.১ ভারতে তুর্ক-আফগান অভিযানের শুরু : সুলতান মামুদ

উত্তর ভারতের এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় একাদশ শতকে হানা দিয়েছিল তুর্কো-আফগানরা। আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের শাসক মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে সতেরবার উত্তর ও পশ্চিম ভারতে আক্রমণ চালান। মধ্যযুগের কিছু মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণে সুলতান মামুদ ইসলামের ধ্বজাধারী বীর যোদ্ধার মর্যাদালাভ করলেও, ওই আফগান সমরনেতা কিন্তু এদেশে রাজ্যজয় বা ধর্মপ্রচারের কোনও চেষ্টা করেননি। সুলতান মামুদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের হিন্দুশাহী শাসক জয়পালকে পরাস্ত করা। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি শাহীদের বিরুধে যে অভিযান করেন তাতে জয়পাল শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করেও পরাস্ত হন। কথিত আছে যে মামুদ জয়পালের সঙ্গে এরপর সমঝোতা করলেও, জয়পাল পরাজয়ের গ্লানি সহ্য না করতে পেরে জ্বলন্ত আগুনে আত্মবির্সজন দিয়েছিলেন। এই বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে শাহীরা এরপরেও মামুদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস সফল হয়নি। ১০০৬ সালে মামুদ উত্তর সিন্ধু অঞ্চল দখল করেন, ১০০৯ সালে এক নির্ণায়ক যুদ্ধে জয়লাভ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন। এইভাবে ধাপে ধাপে তিনি তাঁর সামরিক শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে ইতিহাস মামুদকে ভারতে নতুন এক রাজ্যবিজেতা বা শাসক হিসেবে মনে রাখেনি। তাঁর সতেরবার ভারত

অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম ধনসম্পদ লুণ্ঠন। এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলি তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদেশের বিভিন্ন মন্দিরে বহুযুগ ধরে সঞ্চিত ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে গিয়ে মামুদ প্রধানত দুইভাবে কাজে লাগান। মধ্য এশিয়ায় তুর্কি উপজাতীয় হানাদারদের বিরুদ্ধে যে নিয়মিত লড়াই এই সময় গজনী রাজ্যকে চালাতে হচ্ছিল তার ব্যয়ভার অনেকটাই মেটানো সম্ভব হয়েছিল ভারত থেকে লুঠের বখরা দিয়ে। এখানে মনে রাখা দরকার, ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিয়ম করে গ্রীষ্মকালগুলিতে সুলতান মামুদ যে তাঁর বাহিনী নিয়ে ভারতে হানা দিতেন, সেই অভিযানগুলির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁকে মধ্যএশিয়ায়ও লড়াই চালাতে হয়েছিল। লুঠের বখরারা একাংশ দিয়ে রাজধানী গজনী মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন মামুদ। ভারত কখনও তাঁর কাছে স্থায়ী আকর্ষণের কারণ হয়ে ওঠেনি। তাঁর এতগুলি সামরিক অভিযানের দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রভাবও পড়েনি ভারতের রাজনীতি কিংবা জনজীবনে। ১০৩০ সালে গজনীতে মামুদের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মানুষ হাঁপ ছেড়ে ভেবেছিলেন সীমান্ত থেকে বিপদ বোধহয় কেটে গেল।

১ক.৪.২ মামুদের অভিযানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব

মামুদের আক্রমণ থেকে উত্তর ভারতের রাজনীতি কোনও শিক্ষা না নিলেও ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের সুফল স্পষ্ট হয় অন্য এক স্তরে। অষ্টম শতকে সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তী যেমন, তেমনই একাদশ শতকের শুরুতে মামুদের হানার পরেও মুসলিম বণিকদের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের লেনদেন বৃদ্ধি পায়। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। নিছক অর্থনৈতিক কারণে উত্তর ভারতের হিন্দু রাজারা এই নতুন বাণিজ্য সম্ভাবনার উৎসাহী হন। এবার উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে মুসলিম বণিকদের বসতি গড়ে ওঠে। এরই সঙ্গে সুফি নামে পরিচিত ধর্ম-প্রচারকেরা ভারতে আসতে থাকেন। প্রেম ও ভক্তিতে বিশ্বাসী এক ঈশ্বরের পূজারী এই সাধকেরা হিন্দু সমাজের একেবারে নিচের স্তরে আলোড়ন তোলেন। এইভাবে বণিক এবং সুফি মরমিয়া সাধকদের মাধ্যমে ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও সমাজের আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

১ক.৫ ভারতের বিকেন্দ্রীভূত সামন্ত-কাঠামো

কেবল রাজনীতিতে নয়, সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আলোচ্য আমলে আঞ্চললিকতার উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা সচেতন। ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে—এই কালসীমায় ভারতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার ব্যাপক বিকাশের মূল সূত্রটি অর্থনীতি তথা উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন রামশরণ শর্মা। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বিষয়ক তাঁর পথিকৃৎ প্রতিম গবেষণায় (Indian Feudalism) শর্মা দেখিয়েছেন, জমিতে কৌমের যৌথ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তি-মালিকানার প্রতিষ্ঠা কীভাবে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যস্তত্বভোগী ভূস্বামী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিয়ে রাষ্ট্র-বিকেন্দ্রীকরণের পথ খুলে দিয়েছিল। এই ভূস্বামী বা সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্থানীয় শক্তির উত্থানের মধ্যে। পাশাপাশি কারিগরি শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্যে এই আমলে দেখা গিয়েছিল নজিরবিহীন সঙ্কোচন। সামগ্রিকভাবে এক স্বনির্ভর, আবদ্ধ, জড়বৎ গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল যে

পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক মৃতকল্প অবস্থা বিরাজ করতে থাকে, যা পরিবর্তন ও অভিনবত্বের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

১ক.৫.১ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে গোটা উপমহাদেশে অর্থনৈতিক সঙ্কোচন ও সামগ্রিক অবক্ষয়ের সিধান্ত নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। অলোচ্য পর্বে উপমহাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে বাণিজ্যের সঙ্কোচন তো নয়ই বরং বৃদ্ধি এবং কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু বিশেষভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের বিশ্লেষণ করলে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের সমৃদ্ধির সময় কখনোই বলা যায় না। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, উত্তর ভারতে একসঙ্গে এতগুলি রাজনৈতিক শক্তির সহাবস্থান এই আমলের আগে দেখা যায়নি। দশম শতকের শেষেও একাদশ শতকের গোড়ায় সুলতান মামুদের অভিযানগুলির সময় উত্তর ভারতের অসংখ্য রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরের লোহর বংশ, পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলি এবং বাংলার পাল ও সেন বংশ। রাজপুত রাজত্বগুলির মধ্যে আবার অজমীরের চৌহান, মালবের পরমার, কনৌজের গাহড়য়াল, দিল্লির তোমর, মধ্য ভারতের কলচুরি ইত্যাদি বংশের রাজত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। এতগুলি স্থানীয় শক্তির সহাবস্থান ও তাদের মধ্যে নিয়মিত সংঘর্ষ উত্তর ভারতে একটি ঐক্যবন্ধ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে করে তুলেছিল সুদুর পরাহত। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় দিল্লিকে কেন্দ্র করে সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে আলোচ্য পর্বে উত্তর ভারতে বাণিজ্য অথবা নগরায়ণের প্রসার দেখা যায়নি। সমাজ-জীবনের যে ছবি সমকালীন তথ্যসূত্রে পাওয়া যায় তাকে অভিনবত্বের পরিপন্থী বা জড়বৎ আখ্যা দিলে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল জাতিভেদ প্রথা। ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা ও সম্পৃশ্যতা সমাজের প্রাণশক্তি বহুলাংশে হরণ করেছিল। মানুষে মানুষে কঠোর সামাজিক ব্যবধান, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের পার্থক্য, কতিপয় সম্পদশালী সামন্ত রাজন্যবর্গ ও অগণিত দরিদ্র কৃষিজীবীর মধ্যে দুস্তর আর্থিক তফাত গোটা সমাজকে এমনভাবে স্তরে স্তরে ভাগ করে গিয়েছিল যে কোনও ধরনের সর্বজনীন নাগারিকত্বের বোধ এই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা সম্ভবই ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই বর্ণবিশিষ্ট, বহুস্তরবিশিষ্ট সমাজ সব ধরণের পরিবর্তন থেকে মুখ ফিরিয়ে সনাতন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিল। সমকালীন উত্তর ভারতের সমাজের আত্মসন্তুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সেরা মূল্যায়ন সম্ভবত আলবেরুণির গ্রন্থের (তহবিক-ই-হিন্দ) প্রথম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায় যেখানে তিনি লিখেছেন :

''ভারতীয়রা মনে করে তাদের সঙ্গে তুলনীয় কোনও দেশ নেই, জাতি নেই, রাজা নেই, ধর্ম নেই ও বিজ্ঞান নেই... তারা যা জানে তা অন্যকে জানাতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক। এমনকি স্বদেশের লোক ভিন্ন বর্ণের হলে তার কাছ থেকে নিজের জ্ঞানটুকু সযত্নে লুকিয়ে রাখে, বিদেশি হলে তো কথাই নেই।''

১ক.৫.২ তুর্ক-আফগান অভিযানের পর ভারতীয় শাসকদের অবস্থা

একাদশ-দ্বাদশ শতকের উত্তর ভারতে কলহপরায়ণ আত্মসন্তুষ্ট রাজন্যবর্গ সুলতান মামুদের বার বার হানা জোটবদ্ধভাবে রুখতে পারেইনি, এই আক্রমণগুলি সঠিক মূল্যায়ন করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান মামুদের

বাহিনীকে তারা পূর্বতন শক বা হুণদের মতোই আরও একদল ‘ম্লেচ্ছ’ বলে মনে করেছিল। তাই এই আক্রমণ থেকে কোনও শিক্ষাই তারা নেয়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁাষে যে একটি আগ্রাসী তুর্কি সাম্রাজ্য জন্ম নিচ্ছে এবং মধ্য এশিয়ার এই পট-পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক নিয়তি, সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত স্থানীয় শক্তিগুলি। অন্যদিকে, মামুদের সতেরবার অভিযানের সুবাদে তুর্ক-আফগান হানাদার বাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথগুলি হাতের তালুর মতো চিনে নিয়েছিল। মহম্মদ ঘুরির অভিযানের বহু আগেই তুর্কি-বাহিনী গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে নেমে আসতে পারত। উত্তর ভারতের রাজনীতি ও সমরনীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলিও অভিযানকারীদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা চাইলে দ্বাদশ শতকেই দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা হতে পারত ইসলামি শাসন। এর জন্য যে ত্রয়োদশ শতকের শুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তার কারণ মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতি তুর্কি নেতৃত্বকে এতদিন ব্যস্ত রেখেছিল। মামুদের মৃত্যুর পর থেকে প্রায় দেড়শো বছরের এই অবসরে উত্তর ভারতের রাজারা জোটবদ্ধভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে পারতেন। কিন্তু স্থানীয় প্রয়োজনে তাঁরা সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেও মধ্য-এশিয়া থেকে আক্রমণ প্রতিরোধে সর্বভারতীয় স্তরে কোনও সচেতনতা বা প্রয়াস এই আমলেও দেখা যায়নি। মামুদের শেষ আক্রমণ এবং ঘুরির আক্রমণের মধ্যবর্তী দেড়শো বছর উত্তর-ভারতে ভাঙাগড়ার যুগ। অবশ্য গড়ার চেয়ে ভাঙার দিকেই পাল্লা ভারি ছিল। রাজপুত রাজন্যবর্গ লাগাতার পরস্পরের সঙ্গে আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। কিন্তু কোনও একজন রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা নিতে পারেনি। রাজপুত রাজন্যবর্গ, আসলে যুদ্ধকে তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক শৌর্যের অঙ্গ করে তুলেছিলেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের দিকে মন দেননি। পরিবর্তন বিমুখ দেশীয় নেতৃত্ব ধীর অথচ অনিয়ন্ত্রিত গতির হস্তিবাহিনীর ওপরেই ভরসা করেছিলেন। ঢাল-তলোয়াল, তীর-ধনুক, পদাতিক সৈন্য ও হাতির সাহায্যে সামরিক বাহিনী গঠনের গতানুগতিকতার বাইরে যেতে পারেননি। তাই দ্রুতগামী অশ্ব ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত মহম্মদ ঘুরির বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলার সময় উত্তর ভারতের রাজারা ততটাই অপ্রস্তুত ছিলেন যতটা দেখা গিয়েছিল মামুদের আক্রমণের প্রাক্কালে।

১ক.৬ মহম্মদ ঘুরির অভিযান

উত্তর-পশ্চিম আফগাস্তানের ঘুর রাজ্যের অধিপতি মুইজুদ্দিন মহম্মদ-বিন-সাম বা মহম্মদ ঘুরি গজনীর অধিপতি হন ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এখানকার অধিপতি নিযুক্ত হওয়ার পর গজনী সম্প্রসারণই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য গোমাল গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিন্ধু অঞ্জল জয় করে নেন। ১১৮৫ সালে তাঁর তুর্কিবাহিনী লাহোর দখল করে নেয়। মামুদের মতো কেবল লুঠপাটের অভিপ্রায়ে নয়, মহম্মদ ঘুরি ভারতে এসেছিলেন রাজ্য বিস্তারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে। সিন্ধু ও লাহোর জয়ের পর এই তুর্কি সমরনেতা গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের দিকে নজর দেন। ফলে এই অঞ্চলের রাজপুত শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আজমীরের চৌহান-বংশীয় নৃপতি পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে রাজপুত শক্তিগুলি তুর্কি হানা রুখতে সাময়িকভাবে জোটবন্ধ হয়। এঁদেরই মধ্যে কনৌজের গাহড়ওয়াল বংশীয় জয়চাঁদ অবশ্য সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জোটে যোগ দেননি। ১১৯০-৯১ সালে মহম্মদ ঘুরি ভাতিন্দা দখল করে নিলে পৃথ্বীরাজ

তাঁর রাজপুত-বাহিনী নিয়ে থানেশ্বরের অদূরে তরাইনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তুর্কি সেনাদের রুখে দেন। ঘুরি এই যুদ্ধে আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি বাহিনী নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। পৃথ্বীরাজ ভাতিন্দা পুনর্দখল করেন। কিন্তু রাজপুত যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী পলায়মান শত্রুর পিছনে ধাওয়া করে তাদের বিনাশ না করে পৃথ্বীরাজ আজমীরে ফিরে আসেন।

১১৯২ সালে আরও বিশাল বাহিনী নিয়ে মহম্মদ ঘুরি ফের তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। তাঁর জোটসঙ্গী দিল্লির গোবিন্দরাজ যুদ্ধে নিহত হন। পৃথ্বীরাজ নিজে হাতির পিঠ ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে ধরা পড়েন ও নিহত হন। তাঁর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত জোট ভেঙে যায়। অমিত শৌর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার দৈন, সনাতন সমরসজ্জা, ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তুর্কি বাহিনীর সুপরিকল্পিত অভিযানের কাছে পরাস্ত হয়।

১ক.৬.১ মহম্মহ ঘুরির অভিযানের ফল : কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর মহম্মদ ঘুরি তাঁর বিশ্বস্ত তুর্কি ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতের বিজিত অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে গজনীতে ফিরে যান। গজনী সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের শাসক কতুবউদ্দিন, মহম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি হিসেবে আজমীর ও মেরঠের বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর দিল্লি অধিকার করে সেখানেই প্রথম তুর্কি শাসনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১১৯৪ সালে মহম্মদ ঘুরি ফের দিল্লিতে আসেন ও কতুবউদ্দিনের সাহায্যে কনৌজের অধিপতি জয়চাঁদকে পরাজিত ও নিহত করেন। ঘুরি নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেও কতুবউদ্দিন এরপর আলিগড় (১১৯৫), আনহিলওয়াড়া (১১৯৬) ও বদাউন (১১৯৭) দখল করেন। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে আর এক তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খলজি জয় করেন বাংলার কিছু অংশ। ১২০২ সালে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লরাজা পরমলদেবকে হারিয়ে তুর্কি সেনারা কালিঞ্জর, খাজুরাহো ও অন্যান্য অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়। এইভাবে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুর্কি অধিকার কায়েম হয়। কিন্তু ভারতের এইসব ভূখণ্ড বিজয় ছিল মূলত গজনী সুলতানের জয়।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে গজনী ফেরার পথে আততায়ীর হাতে মহম্মদ ঘুরি নিহত হন। এবার কতুবউদ্দিনের সামনে স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ আসে। কতুবউদ্দিন সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দিল্লিতে এক স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লি-সুলতানি নামে পরিচিত এই সাম্রাজ্য কালক্রমে সর্বভারতীয় চেহারা নেয় এবং যে কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জন্ম দেয় তা তিনশো বছরেরও বেশি স্থায়ী হয়েছিল।

১ক.৭ তুর্ক-আফগানদের সাফল্যের কারণ : ভারতীয় সামন্ত শাসকদের দুর্বলতা

এই আলোচনা শেষ করার আগে মহম্মদ ঘুরির সাফল্যের কারণগুলো আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তরাইনের যুদ্ধে ঘুরির সাফল্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে যে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে তিনি রাজপুত প্রতিরোধকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়ের উদ্রোক করে। সমসাময়িক মুসলিম লেখকরা ঘুরির সাফল্যকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে এই ধরনের দৈবনির্ভর

ব্যাখ্যা ইতিহাসসম্মত নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মহম্মদ হবিব ঘুরির সাফল্যের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন সেই সময়ের সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে। আলবেরুনীর বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে হবিব মনে করেন জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে সংঘবন্ধ হতে দেয়নি, এবং বহুধা বিভক্ত করে রেখেছিল। সেই সঙ্গে সামরিক দক্ষতাকেও বাড়তে দেয়নি। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলেও অনেক ঐতিহাসিকই এর সঙ্গে সহমত নন। জাতিভেদ প্রথা কতটা সামরিক দুর্বলতার কারণ, সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, মুসলিম সমাজের তথাকথিত সামাজিক সমতা ঘুরির আক্রমণের সময় নিচু জাতের হিন্দুদের ধর্মান্তরে প্রলুব্ধ করেছিল, এর স্বপক্ষে বিশেষ তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ব্যাপক হারে ধর্মান্তর ঘটেনি। ইরফান হবিবও মনে করেন সরকার অথবা ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে এই সময় হিন্দু জাতিভেদ প্রথার ওপর সরাসরি কোনও আক্রমণ ঘটেনি। এককথায় আলবেরুনীর পর্যবেক্ষণের যথার্থ মেনে নিলেও, হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাজনের সঙ্গে তরাইনের যুদ্ধে রাজপুতদের ব্যর্থতার সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বরং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিরোধের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। প্রথমত, বিগত একশো বছরেরও বেশি সময় জুড়ে বহিরাগত আক্রমণকারীরা উত্তর-পশ্চিমে পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতের প্রতিরোধ বেষ্টনীকে ক্রমেই দুর্বল করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে রাজপুতরা আদপেই কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে পাঞ্জাবকে গজনী দখলমুক্ত করার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু এর জন্য রণনীতির যে বিশেষ ধ্যানধারণা প্রয়োজন তা সমকালীন রাজপুত নেতৃত্বের ছিল না।

সতীশচন্দ্রের মতে, রণনীতি সম্পর্কে চেতনার আলোচ্য এই ঘাটতি বস্তুত রাজপুতদের রাজনৈতিক অনৈক্যের অনিবার্য ফল। রাজপুত রাজন্যবর্গের সৈন্যসামন্ত বা অর্থবল কম ছিল না। বরং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন তুর্কিদের তুলনায় রাজপুত রাজাদের সৈন্যবল বা যুদ্ধের উপকরণ বেশিই ছিল। জাতিভেদ প্রথা এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়নি। শৌর্য বা বীরত্বও তাঁদের পর্যাপ্ত ছিল। অস্ত্রশস্ত্রেও তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। তাহলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে সৈন্যসংখ্যা, অর্থবল বা সমরসম্ভারে দুর্বল না হলেও সংগঠন বা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে রাজপুতরা পিছিয়ে ছিল। আয়তনে সুবিশাল রাজপুত-বাহিনী রণক্ষেত্রে যখন তুর্কিদের সম্মুখীন হত তখনই তাদের যথাযথভাবে পরিচালনা করার উপযুক্ত সংঘবন্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব অনুভূত হত। গতিতেও তুর্কিবাহিনী রাজপুত সেনানীদের পরাস্ত করত। বস্তুত, তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনীর খ্যাতি তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। এক অঞ্চল থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের অন্য অঞ্চলে পাঠানো অনেক সহজসাধ্য ছিল। পক্ষান্তরে রাজপুত প্রতিরোধ ছিল বীরত্বব্যঞ্জক কিন্তু তুলনায় দুর্বল। অনেক ঐতিহাসিক রাজপুত সামন্ততন্ত্রের মধ্যে এই দুর্বলতার উৎস খুঁজে পেয়েছেন। অসংখ্য ছোট মাঝারি-বড় মাপের সামন্তপ্রভুদের মধ্যে প্রজাদের, বিশেষ করে সেনানীদের আনুগত্য বিভক্ত হয়ে থাকার ফলে এককেন্দ্রিক আনুগত্য গড়ে উঠতে পারেনি। এক্ষেত্রে তুর্কিরা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তাছাড়া অনেকে সমকালীন হিন্দুদের আত্মকেন্দ্রিকতার কথাও উল্লেখ করে থাকেন। হিন্দুদের কূপমণ্ডুকতার জন্য তারা বহির্বিশ্বে বিশেষত যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে বা রণনীতির প্রয়োগগত দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এ বিষয়ে অন্যত্র যে সব পরিবর্তন ঘটছিল সে সম্পর্কেও তারা সবিশেষ অবগত ছিল না। তুর্কিদের কাছে রাজপুতদের পরাজয়ে এই আত্মকেন্দ্রিক কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা ভূমিকা অবশ্যই ছিল।

সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রাজপুত ব্যর্থতার কারণ অনুধাবন করা সহজ হয়। সামরিক অথবা

সাংগঠনিক দুর্বলতার পেছনে লুকিয়ে ছিল সামাজিক বিন্যাসের বিচ্যুতি, যার ফলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সর্বোপরি বহির্বিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে তারা তাল রেখে চলতে পারেনি। ফলে প্রতিরোধের বৃহত্তর পরিধি সম্পর্কে, বিশেষ করে বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাকে কিভাবে বুখতে হবে সে সম্পর্কে রাজপুতদের অজ্ঞতা পরাজয়কে প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিল।

১ক.৭.৮ অনুশীলনী

১। মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের সামগ্রীক পরিস্থিতির একটি পরিচয় দিন।

ছোট প্রশ্ন (Short answer type) :

২। সুলতান মামুদ কেন বার বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন?

৩। দিল্লি-সুলতানি বলতে কী বোঝায়?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type) :

৪। ইসলামের সঙ্গে ভারতের প্রথম পরিচয় কোন্ শতকে হয়?

৫। আল বেরুনির লেখা ভারত-বিষয়ক বইটির নাম কি?

৬। কোন্ যুদ্ধের পরিণতিতে এদেশে তুর্কি-শাসন প্রতিষ্ঠা হয়?

১ক.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। M. Habib and K. A. Nizami (edi) : *The Comprehensive History of India* Vol. V, 2 parts, 1970.

২। Tarachand : *Influence of Islam on Indian Culture,* 1954.

৩। H. C. Ray : *Dynastic History of Northern India,* 1931.

৪। R. S. Sharma : *Indian Feudalism,* 1965.

৫। Romila Thapar : *A History of India,* 1966.

৬। Satish Chandra : *Medieval India, Part-I–* অনুবাদ বৈদ্যনাথ বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪ (মধ্যযুগে ভারত)—সতীশচন্দ্র।

একক ১খ ❑ দিল্লি-সুলতানির বিকাশ : আইবক থেকে বলবন

গঠন

১খ.০ উদ্দেশ্য
১খ.১ প্রস্তাবনা
১খ.২ দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা : দাসবংশ অভিধা নিয়ে বিতর্ক
  ১খ.২.১ কুতুবউদ্দিন আইবক
  ১খ.২.২ তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা
  ১খ.২.৩ ইলতুৎমিস
  ১খ.২.৪ সুলতানা রাজিয়া
  ১খ.২.৫ নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন বলবন
১খ.৩ সুলতানি শাসনের চরিত্র : রাষ্ট্র ধর্মপ্রিয় ছিল কিনা?
১খ.৪ রাজতন্ত্রের আদর্শ বিষয়ে বলবনের তত্ত্ব
  ১খ.৪.১ শাসক হিসাবে বলবনের কৃতিত্ব
১খ.৫ দিল্লি-সুলতানির অর্থনৈতিক ভিত্তি
১খ.৬ অনুশীলনী
১খ.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- কতুবউদ্দিন আইবকের রাজত্বকাল
- ইলতুৎমিসের শাসন
- সুলতানা রাজিয়ার স্বল্পকালীন শাসন
- নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন বলবনের সুলতানি শাসনের চরিত্র
- দিল্লি-সুলতানির অর্থনৈতিক ভিত্তি

১খ.১ প্রস্তাবনা

আগের এককটিতে আপনারা ভারতে তুর্কি আক্রমণ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে জেনেছেন। আপনারা আরও দেখেছেন ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রসার সমকালীন রাজনীতিকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে প্রসারমান ইসলামের এই অভিঘাত বিভিন্ন পর্বে অনুভূত হলেও প্রধানত সুলতান মামুদ এবং মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের কথা ঐতিহাসিকরা বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। এই দুই আক্রমণের

উদ্দেশ্য এক ছিল না, এই দুই আক্রমণের অভিঘাতও অভিন্ন ছিল না। তবে এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই যেপ্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি ভারতবর্ষের ইতিহাসের এমন একটি নির্ণায়ক ঘটনা, যার প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে রাজপুত রাজন্যবর্গ এই নির্ণায়ক ঘটনার প্রগাঢ় তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার জন্য তাঁদের অত্যন্ত চড়া দামও দিতে হয়েছিল।

বর্তমান এককে আমরা মহম্মদ ঘুরির আক্রমণের পর দিল্লি-সুলতানির প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করব। এই পর্বের মুখ্য ঘটনা হল ঘুরির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবকের নেতৃত্বে সুলতানির প্রতিষ্ঠা। আমরা ইতিপর্বে আইবকের প্রথম জীবনের কথা উল্লেখ করেছি। আপনারা জানেন, আইবক ছিলেন ঘুরির আস্থাভাজন এবং প্রিয় ক্রীতদাস। তরাইনের যুদ্ধে এবং তারপর উত্তর ভারতে তুর্কি সামরিক অভিযানেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে তিনি ভারতবর্ষে ঘুরির জয় করা অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কথাও ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই এককে ঘুরির মৃত্যুর পর আইবকের রাজত্বকাল থেকে বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত সুলতানির ইতিহাসের কথা আপনারা জানতে পারবেন।

১খ.২ দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠা : দাসবংশ অভিধা নিয়ে বিতর্ক

১২০৬ সালে মহম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন আইবক গজনী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতে যে স্বাধীন তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তা দিল্লি-সুলতানি নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্য ১২০৬ থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত ৩২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবকের আমল থেকে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল (১২৬৬-১২৮৪) পর্যন্ত সময়কে ভারতে তুর্কিবিজয় সংহত করে একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে। প্রস্তুতিপর্বে সুলতানি শাসকদের যে সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে হয়েছিল সেগুলি হল : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আক্রমণ, দিল্লির মসনদের বিরুদ্ধে তুর্কি অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্র, পূর্বভারতে বিদ্রোহ এবং রাজপুতদের বিরোধিতা। প্রথম পর্বের শাসকরা একদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির মোকাবিলা ও অন্যদিকে শিশু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট শাসনকাঠামো নির্মাণ—এই দুটি কাজই কৃতিত্বের সঙ্গে করেছিলেন।

কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে গিয়াসুদ্দিন বলবন পর্যন্ত দিল্লি-সুলতানির শাসকদের একসঙ্গে দাসবংশ নামে অভিহিত করেছেন এলফিনস্টোন, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ সাবেক ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ্। এই নামকরণের কারণ সুলতান কুতুবউদ্দিন, সুলতান ইলতুতমিস এবং সুলতান বলবন—প্রথম জীবনে তিনজনেই ছিলেন ক্রীতদাস। কেউ কেউ এঁদের ইলবারি বা আলবারি তুর্কি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিন থেকে বলবন পর্যন্ত সব সুলতান আলবারি বংশোদ্ভুত ছিলেন না। আর দাসবংশ অভিধাটি তো অনৈতিকহাসিক, কারণ ইসলাম রীতি অনুসারে দাসত্ব থেকে মুক্তি (manumission) পেলে তবেই কেউ সিংহাসনে বসতে পারতেন। অনেকে আবার এঁদের মামেলুক সুলতান নামেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'মামেলুক' শব্দটির অর্থ এমন ক্রীতদাস যে মুক্ত পিতামাতার সন্তান। তাই এই অভিধার সঙ্গেও দাসত্বের ব্যঞ্জনা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং বংশগত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এঁদের সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রথম পর্বের শাসক হিসেবে উল্লেখ করাই ভাল।

১খ.২.১ কুতুবউদ্দিন আইবক

১২০৬ থেকে ১২১০ পর্যন্ত স্বাধীন রাজত্বকালের চার বছর কুতুবউদ্দিন আইবক প্রধানত উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। গজনী মসনদে মহম্মদ ঘুরির উত্তরসূরীদের ভারত আক্রমণের চেষ্টা ঠেকাতে কতুবউদ্দিন সীমান্তের নিকটবর্তী লাহোরে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়েন। ১২১০ সালে লাহোরেই তাঁর মৃত্যু হয়। নতন রাজ্যজয় কিংবা শাসন সংগঠন, সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে কোনও দিকেই তিনি সেভাবে মন দিতে পারেননি। তাঁর সেরা কৃতিত্ব দিল্লিকে কেন্দ্র করে মধ্য এশিয়ার প্রভাবমুক্ত একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।

১খ.২.২ তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

সদ্যোজাত একটি রাষ্ট্রের নায়ক কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লাহোরের উচ্চপদস্থ তুর্কি অভিজাতবর্গ বা আমির-ওমরাহরা প্রয়াত সুলতানের পুত্র হিসাবে কথিত আরম শাহকে সিংহাসনে বসান (১২১০)। অবশ্য আরম শাহ আইবকের পুত্র ছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। সতীশচন্দ্রের মতে আইবকের তিনকন্যা থাকলেও কোনও পুত্র ছিল না। এই মনোনয়ন দিল্লির ওমরাহদের না পসন্দ হওয়ায়, তাঁরা কুতুবউদ্দিনের জামাই বদায়ুনের শাসনকর্তা ইলতুতমিসকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ইলতুতমিস তাঁর অনুগত ওমরাহদের সাহায্যে আরম শাহকে পরাজিত ও বন্দি করে ১২১১ সালে দিল্লির মসনদে বসেন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর উত্তারাধিকার সমস্যা মেটাতে তুর্কি অভিজাতদের তৎপরতা থেকে বোঝা যায় রাজা গড়ার কারিগর হিসেবে তাঁদের আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এই আমলেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মহম্মদ ঘুরির সঙ্গে ভারতে আসা এই আমির-ওমরাহদের অধিকাংশই আদিতে ছিলেন কুতুবউদ্দিনের মতো ক্রীতদাস। জাতিতে তুর্কি এই নেতারা রাষ্ট্রের প্রায় সব উঁচু পদগুলি দখল করে রেখেছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা রাজস্বের একটা বড় অংশের ভোগ-দখলের অধিকারী এই তুর্কি শাসকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ছিল একমাত্র সুলতানের সঙ্গেই তুলনীয়। সুলতান বলবনের আমলে এঁদের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়নি।

১খ.২.৩ ইলতুতমিস

দিল্লির অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করে ইলতুতমিস স্বাভাবিকভাবেই এঁদের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আমিরদের দল 'বন্দেগান-ই-চহেলাগান' অর্থাৎ চল্লিশ-চক্র তাঁর সময়েই গড়ে ওঠে। তবে অভিজাতবর্গের ক্ষমতাবৃদ্ধির থেকেও গুরুতর বিপদ নিয়ে ইলতুতমিসকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। বাংলায় আলিমর্দান খানের বিদ্রোহ, মূলতানে নাসিরুদ্দিন কুবাচার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা, পূর্ব রাজস্থানে রাজপুত শক্তিগুলির প্রতিরোধ সামাল দিয়ে শিশু সুলতানি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান ইলতুতমিস। এর ওপর আবার তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ-র আক্রমণের আশঙ্কা। চেঙ্গিস খাঁ সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য এশিয়ার খওয়ারিজমি সাম্রাজ্য ধ্বংশ করে ১২২০ সালে ভারত সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। মোঙ্গল সমরনেতার তাড়া খেয়ে ভারতে পালিয়ে আসা খওয়ারিজমির শাসক জালালউদ্দিন মঙ্গাবরনিএই সময় দিল্লির কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী কূটনীতিক ইলতুতমিস মঙ্গাবরনিকে আশ্রয় দিয়ে মোঙ্গল নেতার বিরাভাজন হতে চাননি। শেষ পর্যন্ত মঙ্গাবরনি পারস্যে চলে গেলে এবং ১২২৭ সালে চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হলে মোঙ্গলভীতি তখনকার মতো দূর হয়। এরপর ইলতুতমিস পূর্বভারতে দৃষ্টি ফেরান। বাংলায় এক অভিযান পাঠিয়ে সেখানে দিল্লির শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া রণথম্ভোর, ঝালোর যোধপুর, গোয়ালিয়র, গুজরাত ইত্যাদি রাজপুত রাজ্যগুলি কৌশলে জয় করে সুলতানি সাম্রাজ্যের হারানো অংশগুলি পুনরুদ্ধার করেন। ১২৩৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় সুলতানি সাম্রাজ্য পশ্চিমে

সিন্ধু অঞ্চল থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহম্মদ ঘুরির পৃষ্ঠপোষকতায় কুতুবউদ্দিন আইবক যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার ভিত্তি সুদৃঢ় করে স্থায়িত্বদানের কৃতিত্ব ইলতুতমিসের প্রাপ্য। ভারতে তুর্কিবিজয়ের প্রকৃত সংগঠক তিনিই। ঐতিহাসিকরা তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। তাঁর রাজত্বকালেই সুলতানি গজনী অথবা ঘুরির প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে স্বাধীন সত্তায় আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর রাজত্বকালে ১২২৯ খিস্টাব্দে তুরস্কের খলিফার প্রতিনিধি ভারতে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে স্বীকৃতি জানালে মুসলিমদের দৃষ্টিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এটি ছাড়াই তিনি তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও খলিফার স্বীকৃতির প্রতীকী তাৎপর্যকে অবহেলা করা যায় না। তিনি দিল্লিকে সুলতানি শাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে এই শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১খ.২.৪ সুলতানা রাজিয়া

ইলতুতমিস তাঁর কন্যা রাজিয়াকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কন্যাসন্তানের এহেন উত্তরাধিকার ইসলামি নির্দেশের পরিপন্থি এই যুক্তিতে তুর্কি অভিজাত তথা ওমরাহরা এর বিরুদ্ধাচারণ করেন। ইলতুতমিসের উজির নিজাম-উল-মুল্‌ক্ জুনিয়াদির নেতৃত্বে তাঁরা সুলতানের পুত্র রুকনউদ্দিন ফিরোজকে সংহাসনে বসান। রুকনউদ্দিনের সঙ্গে অভিজাতবর্গের মধুচন্দ্রিমার পর্ব অবশ্য খবই সংক্ষিপ্ত। ১২৩৬ সালে ওমরাহদের একাংশের সমর্থনে সিংহাসনে বসেন রাজিয়া। শসকশ্রেণী আশা করেছিল নতন সুলতান হবেন তাদেরই হাতের পুতুল। স্বাধীনচেতা রাজিয়া উল্টে তুর্কিগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য ধ্বংস করে রাজপদে অন্যদেরও নিয়োগ করা শুরু করেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার রাজিয়া তুর্কি অভিজাতদের কোনও শক্তিশালী গোষ্ঠীরই সমর্থনপুষ্ট ছিলেন না। ফলে তাঁর পক্ষে অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নেবার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। দরবারে বসে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করে ও পুরুষের বেশে প্রকাশ্যে বেরিয়ে সুলতানা রাজিয়া সনাতনপন্থী ধর্মীয় নেতাদেরও বিরাগভাজন হন। অচিরেই মোল্লা ও তুর্কিগোষ্ঠীর যৌথ চক্রান্তে রাজিয়ার পতন হয়। ১২৪০ সালে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

১খ.২.৫ নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ ও গিয়াসুদ্দিন বলবন

সুলতানা রাজিয়ার চার বছরের রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাজতন্ত্রের সঙ্গে আমিরচক্রের প্রকাশ্য সংঘর্ষের সূচনা। ১২৪০ সালে রাজিয়ার হত্যা থেকে ১২৬৬ সালে বলবনের মসনদে আরোহণ পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এই অভিজাতবর্গেরই কোনও না কোনও গোষ্ঠীর হাতে। এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় ছাব্বিশ বছরের মধ্যে তিনজন শাসক যথা মুইজুদ্দিন বহরম শাহ (১২৪০-৪২), আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ (১২৪২-৪৬) এবং নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ (১২৪৬-৬৫) মসনদে বসেন। এঁদের মধ্যে শেষজন, ইলতুতমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ, সিংহাসন লাভ করেছিলেন আমিরাচক্রের মধ্যমণি উলুঘ খানের মদতে। এঁরই অনুমোদনে নাসিরুদ্দিনের শাসনকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুলতান বলবন নামে পরিচিত উলুঘ খাঁ প্রথমে ছিলেন সুলতান নাসিরুদ্দিনের প্রধান প্রাসাদরক্ষী। ওই পদে থেকে নিজের কন্যার সঙ্গে তরুণ সুলতানের বিবাহ দিয়ে উলুঘ তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। শান্তিপ্রিয়, অনভিজ্ঞ সুলতানের শাসনকালের শেষের দিকে অন্য তুর্কি আমিরদের কোণঠাসা করে উলুঘই হয়ে ওঠেন দরবারে সর্বেসর্বা। কিন্তু সম্ভবত জনমতের ভয়েই সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর আগে

পর্যন্ত উলুঘ মসনদ দখল করেননি। ১২৬৬ সালে গিয়াসুদ্দিন বলবন নাম নিয়ে তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

১২৮৬ সাল পর্যন্ত কুড়ি বছর বলবনের শাসনকাল সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাফল্যের সঙ্গে বহিরাক্রমণ মোকাবিলা করে ও আমিরচক্রের ক্ষমতা খর্ব করে বলবন রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। বেতনভুক্ত সামরিক বাহিনীর শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত একটি কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক শাসনকাঠামো তাঁর আমলে গড়ে ওঠে।

১খ.৩ সুলতানি শাসনের চরিত্র : রাষ্ট্র ধর্মপ্রিয় ছিল কিনা

সুলতানি শাসনব্যবস্থার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তৎকালীন ইসলামি দুনিয়ার রীতিরেওয়াজ অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিল্লির সুলতানদেরও মুসলিম বিশ্বের প্রধান বাগদাদের খলিফার প্রতি আনুগত্য জানতে হত। কিন্তু এই আনুগত্য জানানোর বিষয়টি ছিল একেবারেই আনুষ্ঠানিক ও প্রতীকী। কোনও কোনও ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন, দিল্লি-সুলতানি ছিল একটি ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র (theocratic state) । সুলতানি আমলের সমকালীন সেরা ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি এই যুগের শাসনব্যবস্থার চরিত্র বোঝাতে 'জাহানদারি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তাঁর 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি' নামে বিখ্যাত গ্রন্থে। 'জাহানদারি' শব্দটির অর্থ পার্থিব শাসন এবং যে শাসন ধর্মীয় আধিপত্য থেকে আলাদা। কিন্তু হাল আমলে ঐতিহাসিকদের একাংশ যথা ঈশ্বরীপ্রসাদ, শ্রী রাম শর্মা, আশীর্বাদীলাল শ্রীবাস্তব প্রমুখ সুলতানি শাসনের ধর্মীয় ভিত্তির ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান। অন্যদিকে কুনওয়ার মহম্মদ আসরফ, ইসতিরাফ হুসেন কুরেশি, মহম্মদ হাবিব, খলিফ নিজামি প্রমুখ সুলতানি শাসনকে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র আখ্যা দিতে রাজি নন। যাঁরা বলেন সুলতানি আমলে রাষ্ট্র ছিল ধর্মাশ্রয়ী তাঁদের মতে, তুর্কি শাসকেরা পবিত্র কোরান মেনে দেশ শাসন করতেন। রাষ্ট্রের ধর্ম ছিল ইসলাম। কোনও সুলতানই ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আলাদা করেননি। এই রাষ্ট্রে ধর্মীয় নেতৃত্বে বা উলেমাদের আধিপত্য ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক গবেষণায় দেয়া যাচ্ছে, দিল্লি-সুলতানির শাসকেরা যে কোরানের নির্দেশ মেনে অথবা ধর্মীয় নেতৃত্বের আজ্ঞায় রাষ্ট্র চালাতেন এমন কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। ভারতে ইসলামের বিজয়ের প্রথম পর্বেও খলিফা নয়, সুলতানই ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে। কুতুবউদ্দিন বা ইলতুতমিস ইসলামি ধর্মগুরুরপ্রতি যে আনুগত্য জানিয়েছিলেন তা প্রধানত রাজনৈতিক তাগিদপ্রসূত। সুলতানি সাম্রাজ্যে রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই তাঁদের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল।

খলিফার অনুগত শাসক হিসেবে নিজেকে জাহির করার অভিপ্রায়ে ইলতুতমিস প্রধান ধর্মগুরুর কাছে দূত পাঠান। খলিফা খুশি হয়ে তাঁকে 'সুলতান-ই-আজম' অর্থাৎ প্রধান সুলতান অভিধায় ভূষিত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী আমির-ওমরাহদের চোখে রাজপদটিকে বৈধতা ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ইলতুতমিসের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, খলিফার নৈতিক সমর্থন তাঁর দরকার হয়েছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। উলেমাদের নির্দেশে ইলতুতমিস রাজ্য চালাননি। ভারতে ইসলামের রাজ্য (দার-উল-ইসলাম) স্থাপনের পরামর্শেও তিনি কর্ণপাত করেননি। আবার ১২৬৬ সালে মসনদে বসে গিয়াসুউদ্দিন বলবন যখন বাগদাদের অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করলেন তখন তার পিছনেও কাজ করেছিল বৈধতা আদায়ের রাজনৈতিক তাগিদ। চল্লিশ আমিরচক্রের অন্যতম নায়ক থেকে ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে ওঠা বলবনের পক্ষে কেবল খলিফার অনুমোদনই যথেষ্ট হয়নি। ঈর্ষান্বিত অন্য আমিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামাল দিয়ে রাজপদটি সুরক্ষিত রাখতে বলবন নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেও ঘোষণা করেন। বস্তুত ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রস্থাপনের জন্য নয়, ক্ষমতার

কেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে রাজতন্ত্রকে যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাগালের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে বলবন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

১খ.৪ রাজতন্ত্রের আদর্শ বিষয়ে বলবনের তত্ত্ব

সুলতানি শাসকদের মধ্যে একমাত্র বলবনই রাজ-তন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সুলতানের ঐশ্বরিক ক্ষমতার ধারণাটি পেয়েছিলেন পারস্যের ঐতিহ্য থেকে। নিজেকে তিনি পারস্যের পৌরাণিক নৃপতি আফ্রাসিয়াবের (Afrasiyab) বংশধর বলেও দাবি করেন। পারস্যের দরবারের বহু আদবকায়দা ও রীতিনীতিও বলবনের আমলে দিল্লিতে চালু হয়েছিল। সুলতানি পদের মর্যাদা যে আমির-ওমরাহদের অনেক ওপরে তার প্রতি জোর দিতে বলবন দরবারে সুলতানের পদচুম্বনের পারসিক রীতি প্রচলন করেন। এই রেওয়াজ ইসলাম অনুমোদিত না হলেও সুলতানের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য জরুরি ছিল। রাজপদকে ঘিরে একটি সম্ভ্রমের আবহ গড়ে তুলতে তিনি দরবারে নাচ-গান ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করে দেন। খাপখোলা তলোয়ার হাতে দীর্ঘদেহী রক্ষীদের দ্বারা বেষ্টিত সুলতান নিজেকে ঘিরেও একটি ভীতির প্রচীর গড়ে তুলেছিলেন।

তবে নবগঠিত রাষ্ট্রে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মোকাবিলা করে রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সুলতানের প্রধান হাতিয়ার ছিল অবশ্যই সেনাবাহিনী। বেতনভুক্ত সৈন্যদের নিয়ে গড়া সামরিক বিভাগকে বলবন সম্পূর্ণভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসেন। সেনা নিয়োগ ও বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব দেন 'দেওয়ান-ই-আরজ্' উপাধিধারী বিশ্বস্ত কর্মচারীর ওপর। সামরিক শক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী শাসনের প্রধান স্তম্ভ গুপ্তচর বিভাগকেও বলবন সুসংগঠিত করেন।

বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বংশকৌলীন্য ও তুর্কি আভিজাত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ। অভিজাত কুলোদ্ভব নয় এমন কাউকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে নিয়োগ করতে রাজি ছিলেন না। এর পরিণতিতে ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলিমরা সুলতানি সাম্রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু মজার কথা, নিজেকে তুর্কি অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জাহির করলেও, বলবন কারও সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষমতা ভাগ করে নিতে রাজি ছিলেন না, এমনকি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও নয়। একদা যে চল্লিশ চক্রের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন সে তুর্কি অভিজাতবর্গের ক্ষমতা তাঁর আমলেই চূড়ান্তভাবে খর্ব করা হয়। রাজতান্ত্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে প্রধান বাধা এই তুর্কি নেতাদের অনেকের জায়গির বাজেয়াপ্ত করেন সুলতান। কয়েকজনকে হত্যাও করা হয়। এইভাবে ইলতুতমিসের আমলে গড়ে ওঠা আমিরচক্র ভেঙে যায় এবং সুলতানের স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠার পথে সামরিক বাহিনী ও গুপ্তচর বিভাগের পাশাপাশি বলবনের আরও একটি হাতিয়ার ছিল বিচারব্যবস্থা। শাস্তি দেওয়া ক্ষমতা করায়ত্ত করে বলবন যে কোনও বিরোধিতা কড়া হাতে দমন করতেন। মসনদের কর্তৃত্ব অমান্য করার অপরাধে অভিজাত, উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও চরম দণ্ড থেকে রেহাই মিলত না।

১খ.৪.১ শাসক হিসেবে বলবনের কৃতিত্ব

শাসক হিসেবে বলবন যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এ কথা ঠিক যে তিনি নতুন কোনও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তার সম্ভাবনাও ছিল না, কারণ তাঁর পুত্র বুঘরা খাঁ-র সেই যোগ্যতাও ছিল না। বঘুরা তরুণ কাইকোবাদের হাতে দিল্লির শাসনক্ষমতা সমর্পণ করে নিজে লখনৌতির শাসন

নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। কাইকোবাদের মধ্যেও যোগ্যতার ছিটেফোঁটা ছিল না। শাসনক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এই শূন্যতার পূর্ণ সুযোগ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন জালালউদ্দিন খলজি। তিনি এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর নাম খলজি বংশ।

তবে তাঁর জীবদ্দশায় বলবন অসামান্য যোগ্যতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের আগে ওমরাহরা যেভাবে শাসনব্যবস্থাকে কুক্ষীগত করেছিল তা বলবন মেনে নেননি। সুলতানের সঙ্গে অভিজাতরা যে সমতুল্য নন,—সুলতানের অবস্থান যে তাঁদের অনেক ঊর্ধ্বে—সেকথা তিনি শুধু ঘোষণাই করেননি, বাস্তবে রূপায়িত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। আইন-শৃঙ্খলাকে শক্ত হাতে প্রয়োগ করে উত্তর দোয়াব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এই শান্তি স্থাপনের ফলে বণিকের যাতায়াত নির্বিঘ্ন হয়, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং ভবিষ্যতে সুলতানির সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মৌলিক কোনও পরিবর্তন না করলেও যেভাবে তিনি ইকতাদারদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন তা নিঃসন্দেহ তাঁর যোগ্যতার পরিচায়ক। চিহালগানি বা তার সমতুল্য কোনও গোষ্ঠীর পক্ষে সুলতানকে চাপে রাখার সম্ভাবনার তিনি মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কাকে দূর করে তিনি সুলতানির ভিত আরও মজবুত করে তুলেছিল। তাঁর শাসন সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল না, নানাক্ষেত্রে অনেক অসম্পূর্ণতাও ছিল। তার অনেকগুলিই পরবর্তী খলজি শাসকরা দূর করে দিল্লি সুলতানিকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১খ.৫ দিল্লি-সুলতানির অর্থনৈতিক ভিত্তি

১২৮৬ সালে বলবনের মৃত্যুর সময় দিল্লি-সুলতানির শাসনকাঠামোর রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদ থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত এই কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রাক্-সুলতানি আমলের মতোই ছিল প্রধানত কৃষি। রাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছলতা ও স্থিতিশীলতার জন্য নিয়মিত ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা চালু রাখা সুলতানি শাসকদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন রাষ্ট্র এবং তার নতুন শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে নতুনভাবে উদ্বৃত্ত আহরণের দরকার হয়েছিল। প্রথমে লুঠের মাল, ধনরত্ন, পরে উপঢৌকন ও অন্য নানাধরনের কর এই কাজে সহায়ক হয়েছিল। তবু যতদিন না ভূমিরাজস্ব স্থায়ী এবং নিদিষ্ট হয়েছে, সুলতানি শাসনের ভিত্তিও ততদিন সুদৃঢ় হয়নি, তা শাসকদের যতই সামরিক শক্তি থাক। ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও শসকশ্রেণীর মধ্যে তা বণ্টনের নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনেই সুলতানি আমলের সূচনাপর্বে উত্তর ভারতে ইকতা-ব্যবস্থা চালু হয়। ‘ইকতা’ বলতে নির্দিষ্ট অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করার অধিকার বোঝায়। শাসনব্যবস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এক-একজন ব্যক্তিকে এইভাবে বেতনের বদলে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়ার প্রথার উদ্ভব হয় দিল্লি-সুলতানির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ইলতুতমিসের আমল থেকে। ত্রয়োদশ শতকেই ইকতা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। গোড়ার দিকে ইকতার শাসক বা মুকতিদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া বা নিজের অধীনে নিদির্ষ্ট সংখ্যক সৈন্য রাখা বাধ্যতামূলক ছিল না। কিন্তু ক্রমশ মুকতিদের এই দুটি কর্তব্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সুলতানি শাসকেরা নিজেদের অধীনস্ত খালসা জমি বাড়ানোর দিকেও মনোযোগ দেন। ইলতুতমিস রাষ্ট্রের খাস জমির তদারক করার জন্য একজন ক্রীতদাসকে নিয়োগ করেন। দিল্লি ও তার আশপাশের জেলাগুলি, দোয়াবের অংশবিশেষ ইলতুতমিসের আমলে খাস জমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জিয়াউদ্দিন বরানির সাক্ষ্য অনুসারে বলবনের আমলেই ইকতা থেকে সংগৃহীত উদ্বৃত্ত রাজস্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পাঠানোর প্রথা চালু করা হয়। এই উদ্বৃত্ত হিসাব করার

রেওয়াজ দেখে বোঝা যায়, প্রতিটি ইকতা থেকে কত আদায় হত বা রাজস্ব বাবদ সংগৃহীত হত এবং সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য কত ব্যয় হত তার ওপর নজরদারিও বলবনের আমলে শুরু হয়েছিল। এই নজরদারির কাজের জন্য বলবন 'খাজা' পদটি সৃষ্টি করেছিলেন।

নতুন রাষ্ট্রের নতুন উদ্বৃত্তের প্রয়োজনে সুলতানি আমলে যেমন ভূমি সম্পর্কের বিন্যাস পাল্টে গিয়েছিল, তেমনই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অন্যান্য ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছিল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। ত্রয়োদশ শতক থেকে উত্তর ভারতে নগরায়ণের নতুন জোয়ার, শিল্প ও কারিগরিতে বৈচিত্র্য এবং বাণিজ্যের প্রসার এই পরিবর্তন সূচিত করেছিল। দিল্লিতে সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার পর ভারতের নানা অঞ্চলে অনেক নতুন নগর গড়ে ওঠে। এই নগরগুলি একদিকে যেমন ছিল প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি, তেমনি শিল্প ও বাণিজ্যেরও কেন্দ্র। উত্তর ভারতে এই নবপর্যায়ের নগরায়ণের প্রধান দৃষ্টান্ত দিল্লি। কতুবউদ্দিন আইবকের অধিকারের আগে দিল্লি স্থানীয় একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল মাত্র। ইলতুতমিস দিল্লি নগরীকে সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজধানী করার পর বিশাল শহর হিসেবে এর সমৃদ্ধির সূচনা হয়। ইবন বতুতার সাক্ষ্য অনুসারে দিল্লি সেকালে কেবল ভারতবর্ষেরই সবচেয়ে বড় নগর নয়, মুসলিম শাসিত পূর্বাঞ্চলে বৃহত্তম ছিল। নগর হিসেবে দিল্লিকে গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব সুলতান ইলতুতমিসের। দূর-দূরান্ত থেকে যেসব মানুষ এখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যশস্বী ও সুপণ্ডিত। ফলে দিল্লি অচিরেই ইসলামি সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে লাহোর ছিল আর একটি বড় নগরকেন্দ্র।

সুলতানি আমলেই পরের দিকে ক্যাম্বে প্রভৃতি বন্দর-শহর ও দৌলতাবাদ নগরীর সমৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহিরাগত নতুন শাসকশ্রেণীর জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল এই নব পর্যয়ের নগরায়ণে। তবে নগরকেন্দ্রগুলির শ্রীবৃদ্ধির পিছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল অবশ্যই শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার। নানা দেশের বণিকেরা এই নতুন নগরগুলিতে যাওয়া-আসা করতেন। অনেকেই স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। নতুন মানুষ, নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে দৈনন্দিন লেনদেন ভারতীয় সমাজজীবনে প্রাণশক্তি ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। অন্যদিকে নগরগুলির কারিগর ও বণিককুল সাধারণত সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে বঞ্চিত হতেন না। এর প্রধান কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরের শ্রীবৃদ্ধি রাজকোষে বাড়তি রাজস্বের পথ সুগম করেছিল ঠিক সেই সময় যখন রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের জন্য সম্পদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।

১খ.৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন (Long answer type)

১। দিল্লি-সুলতানির শাসনকে আপনি কি একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র (centralised monarchy) বলবেন?

ছোট প্রশ্ন (Short answer type)

২। সুলতানি শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি কী ছিল?

৩। সুলতান ইলতুতমিস ও সুলতান বলবনের শাসন কি ধর্মাশ্রয়ী ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন (Objective type)

৪। দিল্লি-সুলতানির প্রতিষ্ঠাতা কে?

৫। ইকতা কী?

৬। চল্লিশ চক্র কী?

১খ.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। M. Habib and K. A. Nizami (edited) : *The Comprehensive History of India* Vol. V, 2 parts, 1970

২। I. H. Qureshi : *The Adiministration of the Sultanate of Delhi,* 1945.

৩। A. B. M. Habibullah : *Foundation of Muslim Rule in India,* 1945.

৪। Irfan Habib and Tapan Roychowdhury (edited) : *The Cambridge Economic History of India,* Vol. I, 198265

একক ২ক ❑ খলজি বিপ্লব ও তুঘলক শাসন

গঠন

২ক.০ উদ্দেশ্য

২ক.১ প্রস্তাবনা

২ক.২ খলজি বিপ্লব

২ক.৩ জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রিঃ)

২ক.৪ আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৪ খ্রিঃ)

২ক.৪.১ আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রশাসনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য

২ক.৪.২ অর্থনৈতিক সংস্কার : রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ

২ক.৪.৩ বাজার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ

২ক.৫ খলজি সাম্রাজ্যবাদ

২ক.৫.১ গুজরাট অভিযান

২ক.৫.২ রাজস্থান অভিযান

২ক.৫.৩ মালব অভিযান

২ক.৫.৪ মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারত অভিযান (প্রথম পর্যায়)

২ক.৫.৫ মহারাষ্ট্র (দেবগিরি) অভিযান (দ্বিতীয় পর্যায়)

২ক.৫.৬ খলজিদের পতন

২ক.৬ তুঘলক রাজত্ব : গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ)

২ক.৭ মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

২ক.৭.১ শাসন সংস্কার

২ক.৭.২ রাজধানী পরিবর্তন

২ক.৭.৩ মুদ্রানীতি

২ক.৭.৪ সামরিক পরিকল্পনা

২ক.৭.৫ মূল্যায়ন

২ক.৮ ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ)

২ক.৮.১ কর ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

২ক.৮.২ সৈন্যবাহিনীর সংগঠন

২ক.৮.৩ বিচারব্যবস্থা

২ক.৮.৪ জনহিতকর কার্যাবলী

২ক.৮.৫ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

২ক.৮.৬ ধর্মনীতি

২ক.৮.৭ সামরিক কৃতিত্ব

২ক.৮.৮ শেষ জীবন
২ক.৮.৯ মূল্যায়ণ
২ক.৯ অনুশীলনী
২ক.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- কীভাবে খলজি সুলতানরা বলবনের পর রাষ্ট্রশাসনের নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন।
- কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা অর্জন করেছিল।
- কীভাবে সামরিক রাষ্ট্রে প্রয়োজনে অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়েছিল।
- কেন পরবর্তীকালে মুহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।
- কেন ফিরোজ শাহ তুঘলকের চেষ্টা সত্ত্বেও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

২ক.১ প্রস্তাবনা

আইবক থেকে বলবন যে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খলজি। সামরিক প্রয়োজনে তিনি অর্থনৈতিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার পরেই খলজিদের পতন ও তুঘলকদের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ বিন তুঘলকের অনেক চমকপ্রদ পরিকল্পনা বাস্তব প্রতিকূলতার দরুণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর ফিরোজ তুঘলক জনমুখী নানা পরিকল্পনা নিয়ে রাষ্ট্রকাঠামো টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তবুও তার পর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। বর্তমান এককে সুলতানি রাষ্ট্রের এই গতি-প্রকৃতিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

২ক.২ খলজি বিপ্লব

জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ খলজি ১২৯০ সালে জুন মাসে ইলবারী তুর্কী বা মামেলুক শাসনের অবসান ঘটিয়ে খলজি শাসনের সূচনা করেন। ১২৯০-১৩২০ এই সময়কালে খলজি শাসন দিল্লির সুলতানি সাম্রজ্যের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিল। রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং রাজনীতি বিষয়ে এই সময়ে কতকগুলি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। পরিবর্তনগুলির সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বিবেচনা করে ঐতিহাসিকেরা খলজিদের অভ্যুত্থানকে খলজি বিপ্লবের সূচনা বল মনে করেছেন। এই পরিবর্তন নিছক তথাকথিত দাস বংশের পরিবর্তে খলজি বংশের শাসন অর্থাৎ নিছক রাজবংশের পরিবর্তন ছিল না। বলা যেতে পারে, সুলতানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে খলজিদের শাসনকালে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। পূর্ববর্তী শাসকবর্গের শাসন এবং সাম্রাজ্য বিষয়ক যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গিয়েছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গির আমূল

পরিবর্তন ঘটায় খলজিরা। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারায় উন্মেষ এই সময়ে লক্ষণীয়। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃতি পালটে যায়। তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর একচেটিয়া একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ শেষ হয়। ঐতিহাসিক হবিবুল্লাহ, হাবিব ও নিজামী প্রত্যেকেই খলজি যুগকে ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা বলে মনে করেছেন। সেই কারণে খলজিদের উত্থান এক বংশের পরিবর্তে আরেক বংশের সিংহাসন দখলের সাধারণ ঘটনা না বলে খলজি বিপ্লব বলা হয়েছে। জালালউদ্দিন এই বিপ্লবের সূচনা করেন এবং আলাউদ্দিনের সময়ে বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিণত রূপ পায়।

খলজিরা তুর্কি-বংশোদ্ভূত ছিলেন কিনা এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আধুনিক গবেষকরা বলেছেন, ঘুরির পার্শ্ববর্তী গরমসার অঞ্চলে বসবাসকারী খলজিরা তুর্কি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আধুনিক গবেষকেরা সম্ভবত ঈস্তাখরি এবং বসওয়ার্থ খলজিদের তুর্কি-বংশোদ্ভূত সম্পর্কিত বক্তব্যের ভিত্তিতে নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খলজিদের তুর্কি-বংশোদ্ভূত বলে কেউ মনে করতেন না। ইরফান হাবিব বলেছেন, খলজিরা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা কোনো গোষ্ঠী নয়। খলজি অভিজাতদের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন দেখা গেছে, তেমনি সাধারণভাবে ব্যাপক সংখ্যায় সুলতানের সৈন্যবাহিনীতেও দেখা গেছে। অবশ্য ইরফান হাবিব, তুর্কি-বংশোদ্ভূত শাসকগোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্যের কথাও স্বীকার করেছেন। খলজি অভ্যুত্থানের গুরুত্ব বোঝা যাবে, যদি আমরা পরিবর্তনগুলির গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করি।

ঐতিহাসিক হাবিবুল্লাহের মতে, জালাউদ্দিনের সুলতান পরে অধিষ্ঠান একটি পুরানো যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের নীতির ওপর ভিত্তি করে মামেলুক তুর্কিরা যে শাসনকাঠামোটি গড়ে তুলেছিলেন, সেই কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লো। এই তুর্কি-শাসকগোষ্ঠীর বাইরে থেকে খলজিরা শাসমক্ষমতা দখল করে এই আধিপত্যের অবসান ঘটান। খলজিদের জয়লাভ প্রমাণ করে যে একটি জাতিগত গোষ্ঠীর স্বৈরতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তার জায়গায় প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়ে গঠিত একটি সুপরিকল্পিত প্রশাসন। বলবনের রাজত্বকালের শেষের দিকে বোঝা যাচ্ছিল, তুর্কিদের একচেটিয়া স্বৈরতন্ত্র তৎকালীন সময় এবং পরিস্থিতির দাবির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলতে পারছে না। দাবি ছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন সামাজিক কাঠামো। এই দাবির রূপায়ণ খলজিদের শাসনকালে লক্ষ করা গেছে। ড. কে. এস. লাল তাঁর 'History of the Khaljis' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, খলজিদের ক্ষমতাদখলের ফলে কেবল একটি নতুন সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা হয়নি। এর ফলে অবিরত রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার, শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সূচনা হয়েছে। এ যুগে সাহিত্যের জগতেও নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে।

জালালউদ্দিন অত্যন্ত সর্তকতা ও সাবধানতার সঙ্গে খলজি শাসনের সূচনা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, দীর্ঘস্থায়ী তুর্কী আধিপত্যের অবসান দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষেরা সহজে মেনে নেবে না। তিনি তাই যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলেছিলেন এবং অভিজাত সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। জালালউদ্দিন প্রথম বারো মাস রাজধানীতে প্রবেশ করেননি, পরিবর্তে কাইলুঘরী (Kailugarhi) তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। বলবনের বন্ধু ফখ্‌র-উদ্দিনকে দিল্লির কোতোয়াল পদে বহাল রেখেছিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র চাজ্জুকে কারা প্রদেশের দায়িত্বে রেখে দিয়েছিলেন। আসলে জালালউদ্দিন তাঁর উদারতা ও দান-ধ্যানের দ্বারা জনগণের মধ্যে খলজি শাসনের ভীত দৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন। কালক্রমে সুলতানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তিনি বিনা বাধায় রাজধানী দিল্লিতে পদার্পণ করেন। ধীরে-ধীরে তাঁর শাসনকাঠামো পায়ের নিচে শক্ত মাটি খুঁজে পায়। তবে খলজি শাসনের কাঠামো আলাউদ্দিনের সময়ে আরো পরিণত হয়ে উঠেছিল। নিজামী এবং হাবিব জালাউদ্দিন শাসন বিষয়ে বলেছেন যে, তাঁর রাজত্বকাল

মামেলুকদের পরীক্ষামূলক যুগের সঙ্গে আলাউদ্দিনের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সেতু রচনা করেছিল। তিনি তুর্কিদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে রচিত প্রতিক্রিয়াশীল অবাস্তব রাজনৈতিক কাঠামোর অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা করেছিলেন। জালালউদ্দিন যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, সেই বিপ্লব আলাউদ্দিনের সময়ে পরিণতি লাভ করে। এই অর্থে খলজি বিপ্লবকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

ত্রিপাঠীর মতে, আলাউদ্দিন খলজি বিপ্লবে এক নতুন মাত্রা এনেছিলেন। তিনি খলজিদের সমরবাদী উন্মাদনার যোগ্য প্রতিভূ ছিলেন। আলাউদ্দিন বলবনী রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বলবনের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তিনি বলবনের চেয়ে চিন্তাভাবনায় অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। তিনি বলবনের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে পারেননি। কে. এস. লালের মতে, আলাউদ্দিন বলবন অপেক্ষা বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। যেখানে বলবন সীমান্ত নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ সংহতির জন্যে রাজ্যবিস্তার থেকে বিরত ছিলেন, সেখানে আলাউদ্দিন ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিল্লির ইতিহাসে তিনি প্রথম মুসলমান সুলতান, যিনি সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি একই সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন এবং আভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে মজুবত করেন। আলাউদ্দিন সামগ্রিকভাবে সুলতানি ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার করেছিলেন। সুতরাং, কেবলমাত্র খলজি পরিপ্রেক্ষিতে নয়, গোটা সুলতানি ইতিহাসে আলাউদ্দিন অনন্যসাধারণ।

আলাউদ্দিন সাম্রাজ্যকে ধর্মের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, রাষ্ট্র নিজের বিষয় নিজেই পরিচালিত করবে এবং উলেমাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বৈরতন্ত্র থেকে এসেছিল, কারণ তাঁর মতো ক্ষমতাপ্রিয় শাসক, সকল ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার পরিচায়ক। ধর্ম রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, এই ধরণের মানসিকতা আধুনিক রাষ্ট্রেরই একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আলাউদ্দিন ধর্মবিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি অনেকের কাছ থেকে ইসলামের রক্ষক হিসাবে প্রশংসা পান।

খলজিরা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন অথবা খলিফার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তাঁরা রাজতন্ত্রকে সামরিক শক্তি ও দক্ষতার ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় পৃথক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারবর্ষে মুসলমান রাজতন্ত্রের ইতিহাসে একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ। ত্রিপাঠীর মতে, খলজিদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। খলজিরা দেখিয়েছিলেন রাজতন্ত্র কোনো একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হাতে নেই। যাদের হাতে ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, কেবলমাত্র তারাই রাজতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। খলজিদের দ্বিতীয় অবদান এই যে, সুলতানের পক্ষে ধর্মের ওপর নির্ভরতার প্রয়োজন নেই।

আলাউদ্দিনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল—অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা। আমরা এখানেও আলাউদ্দিনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। যদিও এখানে আলাউদ্দিন স্বৈরতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অধীনে রাষ্ট্র বাজার ও মুল্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখানে আলাউদ্দিনের মধ্যে মধ্যযুগের স্বৈরতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছিল বলে অনেকে মনে করেন। আবার অন্যদিকে অলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক নীতিতে কল্যাণকর রাষ্ট্রের দায়িত্ব ফুটে ওঠে বলে অধ্যাপক সাক্সেনা মনে করেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম মূল্য-নিয়ন্ত্রণজনিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যদিও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। তথাপি আলাউদ্দিন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা তুলে ধরেছিলেন।

খলজি বিপ্লবের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য হল আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদ। আলাউদ্দিন ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর জন্যে তিনি সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই সামরিক শক্তি আলাউদ্দিনকে একটি ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে তুলেছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল

আলাউদ্দিনের সবথেকে বড় কীর্তি। এই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি ছিল সামরিক। এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসে স্থায়ী হয়নি। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না।

দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত খলজি বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে অতীতের অবসান না ঘটালেও বেশকিছু নতুন বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছিল, যা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল।

২ক.৩ জালাউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ খলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রিঃ)

বলবন সুলতান নাসিরুদ্দিনের পুত্রদের সরিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন এবং এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে অভিজাত শ্রেণী ও সেনাবিভাগের সমর্থন থাকলে প্রতিষ্ঠিত বংশের উত্তরাধিকারীদের হঠিয়ে সিংহাসন দখল করা যায়। ঠিক একইভাবে জালালউদ্দিন খলজির নেতৃত্বে খলজি অভিজাতদের একটি দল ১২৯০ খ্রিঃ বলবনের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের সরিয়ে দিল্লির আধিপত্য লাভ করেন। জালাউদ্দিন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন। অভিজাতদের মধ্যে অ-তুর্কি গোষ্ঠী খলজিদের এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে। খলজিরা শাসনক্ষমতায় এলে তুর্কি প্রাধান্যের অবসান হয়। তবে জালালউদ্দিন সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্রের শাসন প্রচলন করেননি। বলবনের সময়কার অনেক তুর্কি অভিজাত এবং অমাত্য যাঁরা জালালউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদের তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বসিয়েছিলেন। এমনকি বলবনের ভ্রাতুস্পুত্র মালিক চাজ্জুকে কারার শাসক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। চাজ্জু যখন বিদ্রোহী হয়ে পরাজিত হয় তখনও তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়নি।

জালালউদ্দিন বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ে উদার ধারণার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বলবনের শাসনের কঠোরতা বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে বলেন যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সদিচ্ছার ও সমর্থনের উপরই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করা এবং প্রজাদের মঙ্গল কামনাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। তিনি নিজে ধার্মিক মুসলমান ছিলেন কিন্তু সমস্ত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা যে অবস্তাব তা বুঝেছিলেন। ভারতের জন-সংখ্যার বৃহদংশ হিন্দু, সুতরাং ভারত কখনও ইসলামিক রাষ্ট্র হতে পারে না—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। আহমদ চাপের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হিন্দুদের নিজস্ব ধর্মাচরণের পক্ষে মত দেন। তাঁর প্রাসাদের সামনে দিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় শোকযাত্রায় কোনো বাধা তিনি দেননি। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের সমর্থনকে তিনি ইসলাম-বিরোধী বলে মনে করতেন। কঠোর শাস্তি না দিয়ে সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করে তিনি অভিজাতদের সদিচ্ছা লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদার নীতিকে তাঁর সমর্থকসহ অনেকেই দুর্বলের নীতি বলেছিলেন। ঐ দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এই ধরনের নীতি কার্যকরী হওয়া মুস্কিল ছিল। দেশে নিরপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল— ঘরে ও বাইরে শত্রু থাকার জন্যে। আলাউদ্দিন দিল্লির সিংহাসনে বসে জালালউদ্দিনের নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

২ক.৪ আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৪ খ্রিঃ)

আলাউদ্দিন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ পিতৃব্য ও শ্বশুর জালালউদ্দিন খলজিকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন তিনি দেবগিরি ও দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। দেবগিরি থেকে লুণ্ঠিত সোনা বিতরণ করে অভিজাত ও সৈন্যদের বশীভূত করে তাদের

সমর্থন লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁকে পরপর কয়েকটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়।

আলাউদ্দিন তাঁর পিতৃব্যের রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে উদার ও মানবিক নীতি বর্জন করেন। তাঁর ধারণায় এই নীতি বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণের প্রেক্ষাপটে একেবারেই সময়োপযোগী ছিল না। তাছাড়া এই নীতি দুর্বলতার সামিল বলে সকলেই ধরে নিতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল।

২ক.৪.১ আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রশাসনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

শাসিতের মনে ভীতির সঞ্চার করে রাষ্ট্র চালনার যে নীতি বলবন গ্রহণ করেছিলেন, আলাউদ্দিন সেই নীতি অনুসরণ করেন। কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর ও বলিষ্ঠ নীতির প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব দেন। রাজত্বের প্রথমদিকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আকত খান, ভাগিনেয় ওমর খাঁন ও মাংগু খান নয়া মুসলমানদের ও হাজি মেল্লার বিদ্রোহ আলাউদ্দিনকে কঠোর হাতে দমন করতে হয়। কিন্তু যাতে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্যে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে চারটি কারণে বিদ্রোহ হয় ঃ (১) সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হয় না এবং সুলতান নিজ কার্যে অবহেলা করেন, (২) মদ্যপানের ফলে অভিজাতদের উচ্চাভিলায় বৃদ্ধি পায়, (৩) পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ও মেলামেশা করে দরবারের আমির-অমাত্যরা সুলতানকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয়, (৪) প্রজাদের অর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার প্রবণতা বাড়ে।

বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সুলতান ভবিষ্যতে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য কয়েকটি কঠোর নির্দেশনামা জারি করেন। (১) সাম্রাজ্যের সমস্ত রকম সংবাদ যাতে সুলতানের নিকট যথাসময়ে পৌঁছায় তার জন্যে তিনি অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। অভিজাতদের গতিবিধি এমনকি ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সম্পর্কেও গুপ্তচরেরা সুলতানকে অবহিত করত। (২) আমীর-ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যে তিনি অভিজাতদের কাছ থেকে ওয়াকফ্ বা ইনাম হিসাবে প্রাপ্ত বাড়তি জমি কেড়ে নেন। (৩) তিনি মদ্যপান বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। তিনি স্বয়ং মদ্যপান ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। (৪) তাঁর অনুমতি ছাড়া আমীর-ওমরাহরা পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক বা মেলামেশা করতে পারবে না—এই আদেশ দেওয়া হয়। একসঙ্গে মিলিত হতে হলে, আগে থেকে সুলতানের অনুমতি নিতে হ'ত। ঐতিহাসিক কে. এস লাল বলেছেন যে বারাণী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা অভিজাতদের প্রতি আলাউদ্দিনের আচরণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অতিরঞ্জিত। তবে একথা ঠিক যে, আলাউদ্দিন অভিজাতদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পেরেছিলেন।

বারাণী জানিয়েছেন যে, আলাউদ্দিন হিন্দু, বিশেষ করে হিন্দু জমিদারদের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্যে ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সংস্কার সাধন করেছিলেন। হিন্দুদের কাছ থেকে নানাধরনের কর আদায় করে তাদের অর্থিক ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। এই নীতিগুলির মধ্যে আলাউদ্দিনের হিন্দু-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন বলে বারাণী যে কথা বলেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে (চৌধুরী, খুত, মুকদ্দম্) হিন্দুরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন বলেই আলাউদ্দিন তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছিলেন—এখানে ধর্মের কোনো ভূমিকা ছিল না। আলাউদ্দিন আর এক অভিনব নিষ্ঠুর পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন, নব মুসলমানদের বিদ্রোহ দমন করার সময়। তিনি বিদ্রোহী নব মুসলমানদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সকলকে বন্দী করেছিলেন। বিদ্রোহীদের পরিবার-পরিজন কঠোর শাস্তি পেয়েছিল।

আলাউদ্দিন কিন্তু জালালউদ্দিনের একটি ধারণার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানে প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব নয়। সুলতানের একচ্ছত্র ক্ষমতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই ক্ষমতার

অংশীদার অভিজাত ও উলেমা—কেউ-ই হতে পারবে না। রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে গেলে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব হয়। শরিয়ৎ বা ইসলামীয় আইনে যে শাস্তির বিধান নেই, পরিস্থিতির দাবিতে সেই শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। ধর্ম কোনভাবেই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র সম্পর্কিত ধারণায় আলাউদ্দিনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যশাসন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তিনি কাজী মুঘিসুউদ্দিনের কাছে স্পষ্টভাবে বলেছেন ''...যে সব আদেশ রাষ্ট্রের মঙ্গল ও জনগণের উপকার সাধন করবে তা আমি জারি করে থাকি। লোকে আমার নির্দেশের প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা দেখালে আমি বাধ্য হয়ে তাদের বশে আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমি জানি না শরিয়ৎ অনুযায়ী এটা আইনি কি বেআইনি, তবে রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর অথবা জরুরি প্রয়োজনের উপযোগী বলে মনে করি সেই নির্দেশ জারি করি। আমি একথাও জানি না, শেষ বিচারের দিনে ঈশ্বর আমার বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেবেন।'' রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে তিনি নিজে যা সঠিক বলে মনে করতেন সেই অনুসারে চলতেন। তিনি কেন্দ্রে সুলতান-নির্ভর একটি শক্তিশালি সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং কোনো ধর্মীয় প্রভাবে স্বীয় সিধান্ত থেকে বিচ্যুত হতেন না।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে অ-তুর্কি বংশোদ্ভূত যোগত্যাসম্পন্ন ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ পদ পেতেন। তাঁর দুই বিখ্যাত সেনাপতি জাফর খান নসরৎ খান অ-তুর্কি ছিলেন। অ-তুর্কি ক্রীতদাস মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের দক্ষিণভারত বিজয়ের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সামানা ও সুনামের শাসনকর্তা মালিক নায়েক নামে এক হিন্দু ছিলেন। তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাতে বহু মুসলমান সেনাপতি ছিলেন। আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীতে বহুসংখ্যক ভারতীয় মুসলমান ছিল। খলজিদের উত্থানের পূর্বে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যে তুর্কি প্রধান্য ছিল আলাউদ্দিনের সময় তা একেবারে বিলুপ্ত হয়।

২ক.৪.২ অর্থনৈতিক সংস্কার : রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরে দিল্লির সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে অর্থাৎ উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পূর্ব রাজস্থানে মোটামুটি সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সুশাসনের জন্য সুলতান নানা আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সমর্থ হয়। একদিকে সরকার ও গ্রামের চাষীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে শাসনব্যবস্থার উন্নতি এবং অন্যদিকে শহরের অধিবাসীদের সুখ-সুবিধা এই ছিল আভ্যন্তরীণ সংস্কারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে মোঙ্গলদের বিরুধে এবং সুলতানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার কারণে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। সুশাসন ও নিরপত্তা—এই দুই-কারণে আলাউদ্দিন বিভিন্ন সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন।

আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম জমির খাজানা হিসেবে কৃষকেরা ঠিক কি দেয় তা জানবার জন্যে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রধানেরা কৃষকদের কাছ থেকে যাতে বেশি করে অর্থ বা শস্য জোর করে আদায় করতে না পারে আলাউদ্দিন তা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। আলাউদ্দিন দীপালপুর ও লাহোর থেকে কারা অর্থাৎ আধুনিক এলাহাবাদের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত সমস্ত গ্রামগুলি 'খালসা' অর্থাৎ সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই অঞ্চলের কোনো গ্রামকেই ইক্‌তা হিসাবে কোনো আমির বা ওমরাহকে দেওয়া হল না। যে জমিগুলি দান হিসাবে ব্যক্তি বা সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল, সব আবার ফিরিয়ে নেওয়া হল। এই অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের (খরজ্) পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। জরিপ করে জমির পরিমাণ দেখে রাজস্ব নির্ধারণ করা হত। এছাড়া 'চরাই' ও 'ঘরাই' নামে দুটি কর ছাড়া আর অন্য কোনো কর কৃষকদের ওপর চাপানো চলত না। উৎপন্ন শস্যের ওপর ভূমিরাজস্ব ঠিক করা হলেও মুদ্রায় এই রাজস্ব দাবি করা হত।

ফলে কৃষকরা উৎপন্ন শস্য বানজারাদের কাছে অথবা স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করত।

আলাউদ্দিন রাজস্ব সংগ্রকারী খুত্, মুকদ্দম্ (মুকাদ্দম) ও চৌধুরীদের অর্থ, বিত্ত ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধে কমিয়ে দেবার জন্যে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। খুত্ ও মুকদ্দম্ গ্রামের রাজস্ব এবং চৌধুরীরা পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। এইসব রাজস্ব সংগ্রহকারীরা বিত্তবান ও সুবিধাভোগী ছিল। আলাউদ্দিনের নির্দেশে খুত্, মুকদ্দম্ ও চৌধুরীদের সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল এবং কৃষকদের সমান হারে রাজস্ব দিতে বলা হল। এরা যাতে কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতে না পারে বা তাদের করের বোঝা কৃষকের ওপর চাপাতে না পারে সরকার থেকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হত।

নায়েব উজির শরফ্ কোয়ি গ্রামের হিসাবরক্ষক বা পাটোয়ারীর খাতা থেকে সরকারের পাওনা রাজস্বের প্রতিটি 'জিতল' রাজস্ব সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের কাছে থেকে আদায় করতেন। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জোরজুলুম করা হত। রাজস্ব কর্মচারীদের নির্যাতন করা হত। রাজস্ব আদায় বিন্দুমাত্র গাফিলতিতে তাদের শাস্তি দেওয়া হত। বারাণী বলেছেন যে, লোকে এদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইতো না।

কৃষকদের দেয় পরিমাণের মোটা অংশ রাজকোষে জমা পড়ুক—এই ছিল আলাউদ্দিনের লক্ষ্য। কৃষকদের শোষণ করে খুত, মুকদ্দমা, চৌধুরীরা যাতে ধনী হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখ হয়েছিল। যেহেতু এই পদাধিকারীরা হিন্দু ছিল তাই সুলতান হিন্দুবিরোধী নীতি গহণ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। সুলতানের নীতিই ছিল কি হিন্দু, কি মুসলমান কেউ-ই যেন বিত্তবান হয়ে সুলতানের বিরোধিতা করতে না পারে। এদের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা বর্ণনা বারাণী এইভাবে দিয়েছেন : খুত্ ও মুকদ্দমরা সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারত না বা পানও চিবোতে পারত না। তারা এত দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের গৃহিণীরা মুসলিম পরিবারে কাজ নিতে বাধ্য হয়। বারাণীর এই বিবরণ নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। এদের প্রভাব একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

জমি জরিপ করার ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্তভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা ও গ্রামস্তরে পাটোয়ারীদের লেজার বই ধরে রাজস্ব আদায়ের হিসাব পরীক্ষা করা—আলাউদ্দিনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব সংস্কার শেরশাহ ও আকবর অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কৃষি-বিষয়ক সংস্কারের ফলে গ্রামীণ স্তরে বাজার অর্থনীতির (Market economy) বিকাশ ঘটিয়েছিল।

২ক.৪.৩ বাজার ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ

ড. সতীশচন্দ্র মনে করেন যে, আলাউদ্দিন প্রশাসন ও সামরিক প্রয়োজনে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং এই সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করেছিলেন। আলাউদ্দিনের বাজাদর নিয়ন্ত্রণ এবং তার প্রয়োগ সাফল্য সেই সময়ে সকলকে বিস্মিত করেছিল। বারাণী বলেছেন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল বিশাল সৈনবাহনী গড়ে তোলে। মোঙ্গলরা দিল্লি অবরোধ করলে এই সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন জরুরী হয়ে পড়ে। প্রচলিত হারে বেতন দিয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখা ঐ সময়ে আর্থিক সংকটের দরুণ সম্ভব ছিল না। মুদ্রাস্ফীতি তো ছিলই তাছাড়া মজুত অর্থভাণ্ডার এমন ছিল না যে যথাযথ বেতন দিয়ে বেশিদিন সৈন্য রাখা যাবে। কাজেই বারাণীর মতো, সুলতান প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দর বেঁধে দিলেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজারে এক দাম চালু করা হল কেননা তার ফলে কম খরচে বিশাল সৈনবাহিনী রাখা আলাউদ্দিনের পক্ষে সহজ হয়। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য কম থাকার ফলে সুলতান একজন ঘোড়াসওয়ারকে (ঘোড়াসহ) ২৩৮ টংকা বছরে বেতন দিয়ে এবং দুটি ঘোড়া থাকলে একজন ঘোড়াসওয়ারকে অতিরিক্ত ৭৫ টংকা বেতন দিয়ে রাখতে পারলেন। আলাউদ্দিন

সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সামরিক সংস্কারক একজন daring political economist-এ পরিণত হয়েছেন।

বারাণী অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের দ্বিতীয় কারণ দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুদের জব্দ করার উদ্দেশ্যেই আলাউদ্দিন বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। কেননা তখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা ছিল হিন্দু এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যে মুনাফা অর্জনের দিকেই তাদের ঝোঁক দিতে দিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্থলপথে বাহির্বাণিজ্য খোরাসানী ও মূলতানীদের হাতে ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম ছিল। বাজার-নিয়ন্ত্রণ হিন্দুদের জব্দ করার জন্যে বারাণীর এই তত্ত্ব খাটে না।

প্রজাদের মঙ্গলচিন্তায় আলাউদ্দিন এই সংস্কার প্রবর্তন করেছেন বলে খয়েরউল মজলিসে যে উল্লেখ আছে এবং আমীর খসরু যে বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন তা মেনে নেওয়া শক্ত। ড. কে. এস. লাল যথার্থই বলেছেন যে, আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি তৎকালীন রাতনৈতিক প্রয়োজনেরই ফলশ্রুতি এবং এর পিছনে প্রজাহিতৈষণার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তবে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট ছিল এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বারাণী জানিয়েছেন যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সাধারণ বাজারদরের নিচে নির্ধারণ করে তাকে ধরে রাখার জন্য এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি বিধি জারি করেছিলেন। (১) শস্য কেউ ব্যক্তিগতভাবে গুদামজাত করতে পারবে না; (২) দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে খাদ্য ঘাটতি যাতে না হয় তার জন্যে দিল্লিতে শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলো। ঘাটতির সময়ে রেশন-ব্যবস্থা চালু করা; (৩) প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য-তালিকা দোকানে টাঙ্গিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক; (৪) লাইসেন্স বা সরকারি অনুমতি পত্র ছাড়া চাষিদের কাছ থেকে শস্য ক্রয় নিষিদ্ধ; (৫) সকল ব্যবসায়ীর (বহিরাগত সহ) নাম রেজিস্ট্রী করার নির্দেশ; (৬) নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দাম নিলে কঠোর শাস্তি; ওজনে কম দিলে বিক্রেতার শরীর থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেওয়া; (৭) চোরা কারবারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি।

বারাণসী বিবরণী থেকে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন দিল্লিতে কয়েক ধরণের বাজার বসিয়েছিলেন এবং বাজারগুলির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেছিলেন। (১) ‘ মাণ্ডি’ বা প্রধান শস্যের বাজার বসিয়েছিলেন। প্রধান বাজারের সঙ্গে আবার দিল্লির বিভিন্ন মহাল্লায় সরকার নিয়ন্ত্রিত দোকান বসানো হয়, প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্যে। (২) ‘সেরা-ই-আদল’ নামে দিল্লির বদাউন তোরণের কাছে যে বাজার খোলা হয় সেখানে বস্ত্র, চিনি, ঔষধপত্র, শুকনো ফল, মাখন, তেল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। (৩) ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্রীতদাস-এর বাজার এবং (৪) অন্যান্য ধরনের জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য সাধারণ বাজারও বসানো হয়ছিল। বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ, সাহানা-ই-মাণ্ডি, বারিদ-ই-মাণ্ডি প্রমুখ অফিসার নিযুক্ত হয়েছিল।

কয়েকটি দ্রব্যের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের তালিকা দেওয়া হল।

খাদ্যশস্য

গম (প্রতিমণ)—৭ ১/২ জিতল
বার্লি (প্রতিমণ)—৪ জিতল
উচ্চমানের চাল (প্রতিমণ)—৫ জিতল
ছোলা (প্রতিমণ)—৫ জিতল

বস্ত্র

৪০ গজ মোটা কাপড়
২০ গজ সুক্ষ্ম কাপড়
} এক টঙ্কা
১ সের মোটা চিনি—১১/২ জিতল
১/২ সের ঘি—১ জিতল
৩ সের তিল তৈল্য—১ জিতল

ঘোড়া

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঘোড়া—১০০-১২০ টংকা
দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া—৮০-৯০ টংকা
তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়া—৬৫-৭০ টংকা
টাট্টু ঘোড়া—১০-২৫ টংকা

ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী

গৃহকর্মে নিযুক্তা বালিকা ক্রীতদাসী—৫-১২ টংকা
সুদর্শনা ক্রীতদাসী—২০-৪০ টংকা
ক্রীতদাস বালক —২০-৩০ টংকা
সাধারণ মানের ক্রীতদাস—৭-৮ টংকা

আলাউদ্দিন অত্যন্ত কঠোরভাবে বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে চোরাচালান ও চোরাকারবারীদের একেবারে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

আলাউদ্দিনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিধি কেবল দিল্লিতেই প্রযোজ্য ছিল কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। বারাণী বলেছেন যে, দিল্লির জনসাধারণই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিধির ফলে উপকৃত হয়েছে। ড. কে. এস. লাল বারাণীর মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। ফিরিস্তা আলাউদ্দিনের প্রশংসা করে জানিয়েছেন যে সারাদেশে জিনিসপত্রের দাম একই ছিল, এমনকি খরা ও অজন্মার সময়েও দাম একই ছিল। কে. এস. লালের মতে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে ব্যবসায় ও কৃষি উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক শরণ বলেছেন যে, বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কেবল সৈন্যবাহিনীর উপকার হয়েছে। সমগ্র দেশে এই ব্যবস্থা সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। মোরল্যাণ্ডেও এই একই ধরণের মতামত দিয়েছেন। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র বারাণীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, যদি শুধু দিল্লিতেই মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হত তাহলে দোয়াব অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কোনও দরকার হত না। তাছাড়া সৈন্য বা তার পরিবারবর্গ কেবল দিল্লি শহরে বসবাস করত না, লাহোর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে শহর ও শহরতলীতে বাস করত। বারাণী নিজেই তো বলছেন যে, দিল্লিতে অনুসৃত আইন-কানুন অন্যান্য শহরগুলিতেও চালু হত। তথ্যের অভাবে অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না যে, দিল্লির বাইরের অঞ্চলে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতখানি কার্যকরভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল।

আলাউদ্দিন যতদিন বেঁচেছিলেন এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। তবে জটিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ফলে এই ব্যবস্থা দুর্নীতিরও জন্ম দিয়েছিল। গোপনে কালোবাজারিও চলেছিল। কেবল সৈনবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রিণে সন্তুষ্ট না থেকে সুলতান সব রকমের দ্রব্যের মূল্য বেঁধে দিয়েছিলেন। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকরীভাবে বজায় রাখা আলাউদ্দিনের মত সুলতানের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাজার-নিয়ন্ত্রণ নীতির বিলুপ্তি ঘটে।

২ক.৫ খলজি সাম্রাজ্যবাদ

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক উলসী হেগ বলেছেন যে, আলাউদ্দিনের রাজত্বের সঙ্গে শুরু হয় সুলতানি সাম্রাজ্যবাদী

যুগ। তিনি জালালউদ্দিনের পর সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন, যা উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের এই পরিধি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তিনি কেবল উত্তর ভারতের অবিজিত অঞ্চলগুলিই নয়, দক্ষিণ ভারতের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে পেরেছিলেন। বলবন পর্যন্ত সুলতানেরা সাম্রাজ্য রক্ষা ও তার নিরাপত্তা বিধান করার দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের জন্য আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করাতে তাঁরা অপরাগ হয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খলজির নেতৃত্বে খলজি আমলেই দেখা গেল আগ্রাসী গ্রহণের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশ জুড়ে চতুর্দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। দিল্লি-সুলতানির স্বার্থে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র দেশ বিজয় সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর। দিল্লি-সুলতানি সাম্রজ্যের ইতিহাসে এই সর্বব্যাপী সামরিক আগ্রাসন ও বিস্তারকে 'খলজি-সাম্রাজ্যবাদ' বলা হয়েছে।

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণের প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীদের অবদানের কথাও মনে রাখতে হবে। তাঁর আগে বলবন সাম্রাজ্য বিস্তারের গ্রহণ করেননি ঠিকই কিন্তু সুলতানি শাসনকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন, যার ফলে আলাউদ্দিনের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। মানসিক গঠনের দিক থেকে দেখলে আলাউদ্দিনের মধ্যে ধর্মীয় ও সামরিক সর্বব্যাপী সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার বীজ সুপ্ত ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় গুজরাট বিজয়ের পর। গুজরাটে সাহজ সাফল্য তাঁর এই সুপ্ত মানসিক আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করে তোলে, যখন, তিনি বিশ্ব-বিজয়ের কথা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে "দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ" বলে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রফেটের মতো এক নতুন ধর্মের প্রবক্তাও হতে পারেন এইরকম বিশ্বাসও তাঁর জন্মায়। এই দুটি বিষয়েই তাঁর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে যখন দিল্লির কোতেয়াল তাঁকে জানালেন তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্ব-বিজয়ের পরিবর্তে ভারত-বিজয় পরিকল্পনা রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। আসলে এই ধর্মীয় সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে লক্ষ করা গেছে। আলাউদ্দিনও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বাস্তব পরিস্থিতি তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষাকে উস্কে দিয়েছিল। করার শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর দুঃসাহসিক দেবগিরি আক্রমণ, সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীসহ প্রভূত সম্পদ লাভ—সুলতান হবার পদকে যেমন মসৃণ করে দিয়েছিল, তেমন সুলতান হবার পর এই সহজ সাফল্য তাঁকে আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দেবগিরির অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। গুজরাট, রণথম্ভোর, মেবার, মাড়োয়ার, মালেয়া, রাজপুত বংশীয় শাসকদের অধীনে ছিল। স্বাধীন এই অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব সুলতানি সাম্রাজ্যের পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। আশ্চর্যের বিষয়, এই রাজপুত শাসকরা সুলতানি সাম্রাজ্যের অবস্থিতির গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করেননি, এবং প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে গেছেন ঐ অঞ্চল জুড়ে নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইলতুতমিস যখন গুজরাট আক্রমণ করেন, তখন মালোয়া এবং দেবগিরির শাসকেরা দক্ষিণ দিক থেকে গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। কেবল উত্তর ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কাকতীয় রাজ্য, কর্ণাটক অঞ্চলে হোয়সল রাজ্য এবং সুদূর দক্ষিণে অর্থাৎ তামলিনাড়ু অঞ্চলে পাণ্ড্য রাজ্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত ছিল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহজেই সাম্রাজ্যবাদী আলাউদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করার পেছনে ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সুবিধালাভের কথা উল্লেখ করেছেন। গুজরাট, রাজপুতানা এবং দক্ষিণ ভারতে যে অঞ্চলগুলি আক্রান্ত হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে আলাউদ্দিনের পক্ষে একই যুক্তি দেখানো যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পেছনে অনেক সময় নানা ধরনের যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মূল কথাই হল অন্য

স্বাধীন রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ এবং তাকে নিজের কুক্ষিগত করা। আলাউদ্দিনের আগ্রাসনের মূল কথাই ছিল উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিল্লি-সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা।

তাঁর সাম্রাজ্যবাদ দুটি দিকে বিস্তার লাভ করে, একটি উত্তর ভারত ও অন্যটি হল দক্ষিণ ভারত। উত্তর ভারতের বিরুধে অভিযান চালান ১২৯৭ থেকে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ ভারতের বিরুধে অভিযান চালান ১৩০৬ থেকে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

২ক.৫.১ গুজরাট অভিযান

মহম্মদ ঘুরির সময় থেকেই তুর্কি সুলতানদের নজর গুজরাটের ওপর ছিল। গুজরাট যে কেবল উর্বর এবং জনাকীর্ণ ছিল তাই নয়, হস্তশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের জন্যও এর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গুজরাটের প্রধান বন্দর খাম্বাট (কাম্বে)-এর মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্খ স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু, জৈন, বোহ্‌রা ব্যবসায়ী ছাড়া আরব ব্যবসায়ীরাও খাম্বাট বন্দরে আস্তানা গেড়েছিল। গুজরাটের এই সমৃদ্ধির ফলে শাসকেরা প্রচুর সোনা-রূপা সঞ্চয় করেছিলেন। এমনকি মন্দিরগুলির সম্পদের পরিমাণও কম ছিল না। গুজরাট ও মালবের অন্য ধরনের গুরুত্বও ছিল। এই দুটি অঞ্চলের শাসকেরা পশ্চিমের সমুদ্র-বন্দরগুলি ও ভাঙ্গা উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত বাণিজ্যপথগুলির ওপর তারা কর্তৃত্ব করত। দিল্লির সুলতানদের গুজরাটের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অন্য কারণও ছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন গুজরাটের ওপর কর্তৃত্ব থাকলে তাঁদের সেনাবহিনীর জন্য অশ্ব সরবরাহ করা অধিকতর সুবিধাজনক হবে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় মোঙ্গলদের অভ্যুত্থানে এবং দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষে ঐসব অঞ্চল থেকে দিল্লিতে ভাল জাতের ঘোড়া আমাদানি করা কষ্টসাধ্য ছিল। খ্রিস্টিয় ৮ ও ১২ শতকের মধ্যে পশ্চিমের সমুদ্র-বন্দর থেকে ভারতে আরবি, ইরাকি ও তুর্ক ঘোড়া আমদানি বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ ছিল।

আলাউদ্দিন কর্তৃক গুজরাট অক্রমণ প্রায় নিশ্চিত ছিল। অজুহাতও পাওয়া গেল। গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের নতুন শাসক বাঘেলা বংশীয় রায়করণ-এর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে আলাউদ্দিনকে গুজরাট আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁকে সাহায্যও করেন। আলাউদ্দিন খলজির দুজন সুদক্ষ সেনাপতির (উলুঘ খান এবং নসরৎ খান) অধীনে এক সেনাবাহিনী রাজস্থানের পথ ধরে গুজরাটের দিকে অভিযান করে। গুজরাট শাসক রায়করণ আকস্মিক আক্রমণে যুধ্ব না করেই পলায়ন করেন। এই আক্রমণের ফলে প্রধান প্রধান নগর লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হয়। খ্রিস্টিয় ১২ শতকে নির্মিত প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দিরও লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হল। খাম্বাট বন্দরে হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী কেউই লুণ্ঠন থেকে রেহাই পেল না। এখানেই মালিক কাফুরকে বন্দী করা হয়েছিল এবং এই মালিক কাফুরই পরে দক্ষিণ ভারত অভিযানে নেতৃত্ব দেন। আলাউদ্দিন উপহার হিসেবে কাফুরকে পেয়েছিলেন। রাণী কমলাদেবী তুর্কি সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন। আলাউদ্দিন কমলাদেবীকে সসম্মানে নিজের হারামে স্থান দিয়েছিলেন। গুজরাট আলাউদ্দিনের সহজ জয়লাভের কারণ হিসেবে বলা যায়; রায়করণ জনপ্রিয় ছিলেন না এবং গুজরাটের সেনাবাহিনী ও শাসনব্যবস্থা সম্ভবত সেকেলে ছিল। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের সাহায্যে রায়করণ দক্ষিণ গুজরাটের কিছু অংশ ধরে রাখতে সমর্থন হন। এর ফলে দেবগিরীর যাদবের সঙ্গে দিল্লির যুধ্ব আসন্ন হয়ে ওঠে। গুজরাটের বাকি অংশে তুর্কি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ক.৫.২ রাজস্থান অভিযান

গুজরাট বিজয়ের পর আলাউদ্দিন রাজস্থানের ওপর কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করবার চেষ্টা চালান। রাজস্থানের নগৌর এবং

মান্দোর ছাড়া তাঁর পূর্বসূরীরা রাজস্থানের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেননি। জালালউদ্দিন রণথম্ভোর দখল করার চেষ্টা করেও বিফল হন। গুজরাটকে নিজের দখলে আনার পর আলাউদ্দিনের কাছে রাজস্থান এবং মলের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাঁর দৃষ্টি প্রথমে পড়ল রণথম্ভোরের ওপর। আলাউদ্দিনের গুজরাট অভিযানের পর দিল্লি ফেরার পথে আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মোঙ্গল সৈন্যরা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ নিয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আলাউদ্দিন সেই বিদ্রোহ দমন করেন। দুজন মোঙ্গল অভিজাত পালিয়ে গিয়ে রণথম্ভোরের শাসক হামীরদেব-এর কাছে আশ্রয় নিলেন। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হামীরদেব আশ্রিতদের রক্ষা করা কর্তব্য ও নিজ দুর্গ ও সৈন্যবাহিনীর ওপর আস্থা স্থাপন করে আলাউদ্দিনের নির্দেশমত ঐ দুজন বিদ্রোহীকে হত্যা অথবা বহিষ্কার কিছুই করলেন না। আলাউদ্দিন হামীরদেবের রাজ্য আক্রমণের জন্য উলুঘ খান এবং নসরৎ খানকে পাঠালেন। যুদ্ধে নসরৎ খান নিহত হন এবং উলুঘ খান পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন স্বয়ং সসৈন্যে রণথম্ভোর আক্রমণ করেন। আলাউদ্দিনের সঙ্গে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আমির খসরু। তিনি দুর্গ এবং দুর্গ অবরোধের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন। তিন মাস ধরে অবরোধ চলার পর দুর্গে খাদ্য এবং জলের অভাব দেখা যায়। দুর্গের মধ্যে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হল। রাজপুত রমণীরা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন এবং পুরুষেরা দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। রাজপুতদের পক্ষে যুদ্ধ করে মোঙ্গলরাও নিহত হল। এইভাবে রণথম্ভোরের পতন হল।

রণথম্ভোর বিজয়ের পর মোবারের দিকে আলাউদ্দিন দৃষ্টি দিলেন। মেবারের রাজধানী ছিল চিতোর। মেবারের রাণা রতন সিংহ সুলতানি সেনাবাহিনীকে মেবারের ভিতর দিয়ে গুজরাট আক্রমণের অনুমতি না দেওয়ায় সুলতান তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাছাড়া আজমীর এবং মালব পথের ওপর চিতোরের নিয়ন্ত্রণ ছিল। রণথম্ভোর বিজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী আলাউদ্দিনের দৃষ্টি চিতোরের ওপর পড়বে এটা ছিল স্বাভাবিক। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী আলাউদ্দিন রতন সিংহের অনন্যা সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে লাভ করবার জন্যই চিতোর আক্রমণ করেছিলেন। তবে বহু আধুনিক ঐতিহাসিক পদ্মিনী কাহিনীর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অনেকেই এই কাহিনীকে সত্য বলে মানেননি। কোনো সমসাময়িক লেখায় এই কাহিনীর উল্লেখ নেই। একশ বছর পরে মালিক মহম্মদ জাইসির পদ্মাবৎ কাব্যে এই কাহিনির উল্লেখ রয়েছে। আলাউদ্দিন চিতোর অবরোধ করলেন। কয়েকমাস ধরে অবরুদ্ধ রাজপুতগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করলেও শেষ রক্ষা করা গেল না। পরাজয় নিশ্চিত জেনে রাজপুত রমণীগণ জহরব্রত উদ্‌যাপন করলেন। রাজপুত যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিজর্সন দিলেন। চিতোরের পতন হল। চিতোরের শাসনভার দেওয়া হল আলাউদ্দিন পুত্র খিজির খাঁ-কে।

চিতোর বিজয়ের পর রাজস্থানের প্রায় অপর সব রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মারওয়ার, বুন্দি সুলতানের আধিপত্য মেনে নেয়। মান্দোর এবং জয়শলমীর ইতিপূর্বেই সুলতানের দখলে এসেছিল। গুজরাটের পার্শ্ববর্তী সিওয়ানা এবং জালোর প্রতিরোধের চেষ্টা করেও বিফল হয়। ১৩০৮ এবং ১৩১১ সালের মধ্যে দুটি অঞ্চল সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

এইভাবে দশ বছরের মধ্যেই সমগ্র রাজস্থান সলতানি সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হল। আজমীর, রণথম্ভোর এবং চিতোর ছাড়া আলাউদ্দিন অন্যান্য রাজপুত অঞ্চলগলির ওপর প্রত্যক্ষ শাসনভার চাপিয়ে দেননি। বস্তুত আলাউদ্দিন রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বলা হয়েছে, জালোরের শাসকের ভাই মালদেও পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের বাহিনী নিয়ে আলাউদ্দিনকে সাহায্য করেছিলেন এবং ১৩১৩ সাল নাগাদ আলাউদ্দিন খিজির খাঁর পরিবর্তে মালদেওকে চিতোরের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। স্থানীয় প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করে রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতি আলাউদ্দিন পরবর্তীকালে দেবগিরি এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শাসকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।

২ক.৫.৩ মালব অভিযান

চিতোর দখলের পরই আলাউদ্দিন মালবের দিকে নজর দেন। আমির খসরু জানিয়েছেন যে, মালব অঞ্চল এত বিস্তীর্ণ ছিল যে জ্ঞানী ভৌগোলিকেরাও এর সীমানা নির্দেশ করতে পারেননি। আলাউদ্দিনের পক্ষে মালব দখল প্রয়োজন ছিল কেননা মালব দখল করলে গুজরাট যাওয়ার পথ এবং দক্ষিণ ভারতে ঢোকার পথ এই দুটির ওপরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হত। সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী খুব সহজেই মালব অধিকার করল। মালবকে সুলতানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হল এবং সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হল। এইভাবে বাংলা ছাড়া প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এল। ওড়িশা গিয়াসুদ্দিনের আমলেই অধীনতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু ওড়িশাকে সুলতানি সাম্রাজের অধীনে আনা হয়নি।

২ক.৫.৪ মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারত অভিযান (প্রথম পর্যায়)

আলাউদ্দিন সাফল্যের সঙেগ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং সামরিক বাহিনীতে সংস্কার সাধন করে একে আরো শক্তিশালী করে তোলেন। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রশাসনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন এবং সুলতান হিসেবে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির পর আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিকে নিজের অধীনে আনার জন্য দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারত সোনা এবং অন্যান্য সঞ্চিত সম্পদের জন্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই অঞ্চলের বিখ্যাত বন্দরগলির মধ্য দিয়ে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তার ফলে প্রচুর সোনা এই অঞ্চলের শাসকেরা বছরের পর বছর ধরে সঞ্চয় করেছিলেন। এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি সঞ্চিত সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই অঞ্চলগুলি দখল করলে সম্পদ এবং গৌরব দুটিই অর্জন করা সম্ভব ছিল। আলাউদ্দিনের এই অভিযানের দ্রুত সাফল্য সবাইকেই বিস্মিত করে। সুলতানের বিজয় সম্ভব হয়েছিল কেননা দক্ষিণের রাজ্যগুলি একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অবস্থানকে তাঁরা গুরুত্ব দেননি। গুরুত্ব দিলে তুর্কি আক্রমণের আশঙ্কায় অন্তত তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করে রাখতেন।

মহারাষ্ট্র : আলাউদ্দিন কারার শাসনকর্তা থাকাকালীন হঠাৎ দেবগিরি আক্রমণ করে যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্র ও তার পুত্র সিংহানাকে পরাজিত করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দেন বাৎসরিক কর প্রদানের।

মালব এবং চিতের বিজয়ের পর আলাউদ্দিন পুনরায় দেবগিরির দিকে দৃষ্টি দিলেন। অজুহাত ছিলই। রামচন্দ্র গুজরাটের শাসক রায়করণের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন। পরাজিত গুজরাট শাসক মালব সীমান্তে বগলানা অঞ্চলটুকু ধরে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, রামচন্দ্র বাৎসরিক কর দিচ্ছিলেন না।

১৩০৮ খ্রিঃ আলাউদ্দিন মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরিতে অভিযান পাঠান। ইতিমধ্যে আর এক অভিযানে রায়করণকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা হয়। রামচন্দ্র খুব সহজেই পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। আমীর খসরু জানিয়েছেন যে, আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন ভাবেই যাতে রামচন্দ্র বা তার পরিবারবর্গের প্রতি কোন অসম্মান দেখানো না হয়। রামচন্দ্রকে সসম্মানে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল। কিছুদিন পর তাঁকে রায় রায়ান উপাধি দিয়ে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। গুজরাটের একটি জেলাও তাঁকে দেওয়া হয়। রামচন্দ্র তাঁর কন্যা ঝাত্যাপালির সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিবাহ দেন। দেবগিরির সঙ্গে এই মৈত্রী আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানে খুবই সহায়ক হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারত : দক্ষিণ ভারতের গরুত্বপূর্ণ দুটি রাজ্য ছিল—কাকতীয়দের অধীনে বরঙ্গল (আধুনিক তেলেঙ্গানা) এবং হোয়সলদের নিয়ন্ত্রণে দ্বারসমুদ্র (মহশূর অঞ্চল, আধুনিক কর্ণাটক)। সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যবংশীয় শাসকদের অধীনে মাবার এবং মাদুরাই (তামিলনাড়ু)। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থেকে নিজেদের শক্তিক্ষয় করছিল।

১৩০৯ ও ১৩১১ খ্রিঃ মধ্যে মালিক কাফুর দুটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন—এইটি তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বরঙ্গালের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি দ্বারসমুদ্র ও মাবারের বিরুদ্ধে। এই রাজ্যগুলি সরাসরি দখলের কোন ইচ্ছা আলাউদ্দিনের ছিল না। বাৎসরিক কর প্রধান ও সুলতানের আনুগত্য মেনে নিলেই দক্ষিণের শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যে শাসক হিসাবে বহাল থাকতে পারবেন—এই নির্দেশ আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দিয়েছিলেন। তিনি ভালই জানতেন যে, দিল্লি থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব করা সুলতানের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসামী এবং বারাণী কাফুরকে আলাউদ্দিন যে এই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তা উল্লেখ করেছেন।

বরঙ্গালের বিরুদ্ধে মালিক কাফুরের অভিযান প্রায় ছয় মাস ধরে চলেছিল। অবরুদ্ধ বরঙ্গালের দুর্গের পতন অনিবার্য দেখে বরঙ্গালের শাসক সন্ধি করেন। তিনি সুলতানের প্রতি আনুগত্য মেনে নিলেন এবং বাৎসরিক কর প্রদানে সম্মত হলেন। মালিক কাফুরের কাছে প্রভূত ধনসম্পত্তি সমর্পণ করতে হ'ল। এক হাজার উঠের পিঠে চাপিয়ে সেই সম্পদ দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আলাউদ্দিন পরের বছর আবার মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দ্বারসমুদ্র ও মাবারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রামচন্দ্রের মারাঠা সর্দারদের সাহায্য নিয়ে কাফুর দ্রুত দ্বারসমুদ্র পৌঁছে গেলেন। অপ্রস্তুত বল্লালদেবের পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় রইল না। বরঙ্গালের মতোই সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করতে হল। সমস্ত সম্পদ সমর্পণ করলেন মালিক কাফুরকে। বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিতে হল। বীর বল্লাল দিল্লি গিয়ে সুলতান আলাউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর দশলাখ টাকা, খিলাত, ছত্র দিয়ে সম্মান জানিয়ে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর কাফুর মাবার আক্রমণ করেন। পাণ্ড্য শাসক সরাসরি যুদ্ধে মালিক কাফুরের মুখোমুখি হননি। তিনি মাবারের বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। চিদাম্বরম ও মাদুরাইয়ের বেশ কয়েকটি ধনরত্ন সমৃদ্ধ মন্দির লুণ্ঠন করেন। শেষ পর্যন্ত তামিল সৈন্যদের পরাস্ত করতে তিনি পারেন নি।

দক্ষিণ ভারতের এই অভিযানগুলি থেকে প্রভূত পরিমাণে ধনরত্ন লাভ হয়েছিল এবং সুলতানের সম্মান ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে হেরে গিয়েছিল। দুঃসাহসিক অভিযানের কৃতিত্বে কাফুর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ফলে আলাদ্দিন তাঁকে সাম্রাজ্যের মালিক নায়েব বা সহকারী শাসক পদে নিযুক্ত করেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এই অভিযানগুলি খুব একটা সুফল প্রসব করেনি। পরাজিত রাজন্যবর্গ কর প্রদানে সম্মত হলেও এই কর আদায় করতে বার্ষিক অভিযানের প্রয়োজন হত। রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুণ অভিযানের ফলে বাণিজ্যেরও সম্প্রসারণ হয়নি। তবে সফল এই অভিযানগুলি ভবিষ্যত দক্ষিণ ভারতে সরাসরি মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

২ক.৫.৫ মহারাষ্ট্র (দেবগিরি) অভিযান (দ্বিতীয় পর্যায়)

সঙ্গত কারণেই আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না আনার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে তাঁকে এই নীতি পুনর্বিবেচনা করে দেবগিরিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনতে হয়েছিল। দেবগিরির রামচন্দ্র মারা যাবার পর তাঁর পুত্র মাসিংঘানা

(শঙ্করদেব) আলাউদ্দিনের আনুগত্য মানতে অস্বীকার করেন। সুলতানের নির্দেশে মালিক কাফুর দেবগিরি দখল করেন এবং মারাঠা-প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত না করে দেবগিরি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আলাউদ্দিনের পক্ষে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির ওপর বাধা সৃষ্টির জন্য দেবগিরিকে প্রত্যক্ষ শাসনে আনার প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ ভারতের দেশগুলিকে সরাসরি সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

২ক.৫.৬ খলজিদের পতন

একনায়কতন্ত্রের যা স্বাভাবিক পরিণতি আলাউদ্দিনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর রাজতন্ত্র, সামরিক শক্তি ও অত্যধিক কঠোরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর শাসনকালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সাফল্যের পিছনে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছিল না। যে সন্ত্রাস তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার ফলে সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। কঠোরতা, নিপীড়ন ও গুপ্তচরের আধিক্যের ফলে সর্বস্তরের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সুলতানের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল এই শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে আলাউদ্দিন মারা যাবার পরেই। এইজন্যেই বলা হয়েছে, 'তিনি যে সামরিক রাজতন্ত্রের ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, তা বালির ওপর স্থাপিত হয়েছিল।' যা সহজেই ভেঙে পড়েছিল তিনি মারা যাবার অব্যবহিত পরে। আলাউদ্দিনের কঠোর শাসননীতিতে পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নতুন যে শাসকগোষ্ঠী গড়ে উঠল তাঁরা দিল্লির সিংহাসনে যিনিই বসতে পারবেন তাঁকে গ্রহণ করার নীতি মেনে নিলেন। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়পাত্র মালিক কাফুর সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আলাউদ্দিনের এক নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে অন্য পুত্রদের হয় বন্দী, না হয় অন্ধ অথবা হত্যা করলেন। এই নির্মম কাজে অভিজাতরা বাধা দেয়নি। অবশ্য অল্পকাল পরেই প্রাসাদরক্ষীরা মালিক কাফুরকে হত্যা করে এবং খসরু নামে এক ধর্মান্তরিত হিন্দু সিংহাসনে বসেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা খসরুকে ইসলাম-বিরোধী এবং নানা অপরাধমূলক কাজের নায়ক বলে সমালোচনা করলেও দিল্লির জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানগণ জাতিগত বিচার-বিবেচনার দ্বারা আর প্রভাবিত না হয়ে যে কোন বংশের সুলতানের আজ্ঞাবহ হতে রাজি ছিলেন। শীঘ্রই খসরুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৩২০ খ্রিঃ গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান হয় তারই ফলে খসরু নিহত হন এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তুঘলক বংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

২ক.৬ তুঘলক রাজত্ব (১৩২০-১৪১২) : গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-২৫ খ্রিঃ)

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রিঃ) স্বল্প সময়ের জন্য রাজত্ব করলেও তিনি প্রশাসনে শৃঙ্খলা ও সারা দেশে সুলতানি সাম্রাজ্যের সম্মান ও গৌরব আনার চেষ্টা করেছিলেন। কঠোর ও নরম নীতি গ্রহণ করে তিনি সকলের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতির কঠোরতা তিনি হ্রাস করেছিলেন তবে রাষ্ট্রের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কিছু করেননি। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে সরাসরি সুলতানি সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে চেষ্টা করেন। বরঙ্গলে দিল্লির আধিপত্য পুনরায় স্থাপনের জন্য তাঁর পুত্র জুনা খানকে পাঠান। গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান।

নিজে বাংলাদেশকে পদানত করতে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সফল অভিযান থেকে ফেরার পথে তাঁর পুত্র জুনা খান তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কাঠের যে মণ্ডপ বানিয়েছিলেন, তা ভেঙে পড়ায় সুলতান গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয় (১৩২৫)। আধুনিক গবেষকরা স্বীকার করেন না যে তাঁর পুত্রের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে অথবা বাজ পড়ে সুলতান মারা যান। সম্ভবত দ্রুত কাঠের মণ্ডপ বানাতে হয়েছিল এবং এই মণ্ডপের সামনে হাতির দলের প্যারেডের ফলে মণ্ডপ ভেঙে পড়ে।

২ক.৭ মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তংার পুত্র যুবরাজ জুনা খাঁ, মহম্মদ-বিন-তুঘলক উপাধি নিয়ে দিল্লির মসনদে বসেন (১৩২৫ খ্রিঃ)। মধ্যযুগের সুলতানদের মধ্যে তাঁর ক্ষমতা ও দক্ষতা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। তুর্কো-আফগান যুগের সুলতানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সচেতন। তাঁর সহজাত ও বহুমুখী প্রতিভা সমকালীন পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। কাব্য, শিল্প-সংস্কৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক ছিল স্ব-বিরোধিতা। এই অভিযোগই তাঁকে মধ্যযুগীয় সু লতানদের মধ্যে বিতর্কিত করে তুলেছে। ইবন বতুতার মতো সমকালীন ঐতিহাসিক তাঁকে ‘‘রক্তপিপাসু’’ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ঐ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত রাজদ্রোহী ও অন্যান্য অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আসলে সুলতান তাঁর কঠোর ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে প্রগতিশীল শাসনতন্ত্রের এক সমন্বয় তৈরি করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন শাসন-সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর চরিত্রের বিশেষত্বকে অনুধাবন করতে পারি। অবশ্য এর আগে সুলতানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁর সমস্ত সংস্কার এবং পরিকল্পনাগুলিই নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক এক অসাধারণ মৌলিকত্ব ও সৃজনীশক্তির অধিকারী ছিলেন, ফলে সমাজ বা শাসন ব্যবস্থা—যে কোন ক্ষেত্রেই তিনি গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তিনি মনে-প্রাণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে একই শাসনব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে সম্রাট অশোকের পর মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছাড়া কোন শাসকই রাজনৈতিক দিক থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে একই দেশ হিসাবে দেখেননি। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যে, সুলতান মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ঐ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। অধ্যাপক নিজামী একে ‘‘উচ্চ সাম্রাজ্যবাদ’’ (High Imperialism)-এর সূচনা বলে মনে করেছেন। তাছাড়া কূটনৈতিক দিক থেকে সুলতান বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে তাঁর রাজনৈতিক উদ্যোগ ও দূরদৃষ্টি পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রগাঢ় জ্ঞান প্রসিদ্ধ ছিল। ইসলামের অনুশাসনগুলিকে তিনি একদিকে যথাযথভাবে মেনে চলতেন। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁর সহনশীলতা ছিল এবং হিন্দুদের ‘হোলি’ উৎসবে তাঁর অংশগ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর রাজ্যে অনেক হিন্দুযোগীর মুসলমান শিষ্যও ছিল। এসব কারণে সমকালীন ঐতিহাসিক ইসামী সুলতানকে ‘বিধর্মী’ বলতেও দ্বিধা করেননি। সুফী সম্প্রদায়ের প্রতি সুলতান ছিলেন উদার। জৈন পণ্ডিতদের সাথেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক মধ্যযুগের অন্যান্য সুলতানদের থেকেএকেবারে স্বতন্ত্রভাবেই রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে ধর্ম অপেক্ষা প্রতিভাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে রাজ্য পরিচালনার জন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য মানুষদেরই প্রয়োজন। সে কারণে রাজ্যের উচ্চপদগুলিতে তিনি হিন্দুদের নিয়োগ করতে দ্বিধা করেননি।

সিংহাসনে আরোহণের পর ১৩২৭ খ্রিঃ মহম্মদ-বিন-তুঘলক মোঙ্গল নেতা তারমাসিরিনকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ভারতবর্ষকে মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে বাঁচান। অতঃপর সুলতান কালাসুর ও পেশোয়ারে এক অভিযান পরিচালনা করেন। অবশ্য শস্যজাত খাদ্যের অভাবহেতু ঐ অঞ্চল দুটি বেশিদিন সুলতানের দখলে রাখা সম্ভব হয়নি।

সিংহাসনে বসার পর সুলতান কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রথম বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল সুলতানের নিকটাত্মীয় বাহাউদ্দিন গুরসাম্প-এর নেতৃত্বে (১৩২৬-২৭ খ্রিঃ)। গুরসাম্পকে কাম্পিলিরাজ ও পরে হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল আশ্রয় দিলে সুলতান ঐ দুটি রাজ্যই দখল করেন। বন্দি গুরসাম্প-এর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর দেবগিরিতে অবস্থানকালে সুলতান বহরম আইবা কিসলু খাঁনের বিদ্রোহের সংবাদ পান। ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে সুলতানের গুরসাম্পের প্রতি বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিদ্রোহকেও কঠোর হাতে দমন করার হয়। এই বিদ্রোহের প্রায় একই সময়ে লক্ষ্ণৌতীর শাসক গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর (বীরা) সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। অবশ্য সুলতানের বাহিনীর হাতে তিনি ধরা পড়েন ও তাঁরও কঠোর শাস্তি হয় (১৩৩০-৩১ খ্রিঃ)।

২ক.৭.১ শাসন সংস্কার

মহম্মদ-বিন-তুঘলক প্রথম থেকেই শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন।
দোয়াবের কর ব্যবস্থা : শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েই সুলতান গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। বারাণীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সুলতানের এই নীতির ফলে জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি দেখা যায়। সুলতান প্রচলিত রাজস্বহার দশ থেকে কুড়ি গুণ বৃদ্ধি করেছিলেন। সরকারি কর্মচারীরা এসব পাওনা কঠোরভাবে আদায় করতে শুরু করেন। ফলে চারিদিকে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং আবাদযোগ্য জমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চাষবাসের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দিল্লি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং যারা পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে সুলতান সেনাদল নিয়োগ করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কৃষিক্ষেত্রে চাষীর অভাব দেখা দেয়। চাষযোগ্য জমি পড়ে থাকে।

বাদাউনী ও স্যার উলসী হেগের মত ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, দোয়াবের কর বৃদ্ধির পেছনে সুলতানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসন বিভাগের দক্ষতা ও সামরিক বিভাগের উপকরণ বৃদ্ধি। তবে এ নীতির ফলে ঐ অঞ্চলে চাষীদের ওপর যে দারুণ চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। অবশ্য চাষীদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরে সুলতান তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য ঋণদান, কূপ-খনন, শস্যদান ও খাজনা মকুব প্রভৃতির নির্দেশ দেন।

দোয়াব অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে সুলতান বিশেষ শিক্ষা নিয়ে দেশের সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও অধিক পরিমাণ শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনবোধ করেন। বারাণীর বক্তব্য অনুযায়ী সুলতান কৃষির উন্নতিকল্পে

যে সমস্ত অনুশাসন জারি করেন, সেগুলি অধিকাংশই কল্পনাপ্রবণ। অবশ্য জনসাধারণ যদি এই নির্দেশগুলিকে অবাস্তব বলে মনে না করতেন তাহলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির সীমা থাকত না। তাই বারাণীর মতে, সুলতানের পরিকল্পনার আতিশয্য দেখা গেলেও এতে সুলতানের ঐকান্তিকতা প্রশংসার দাবি রাখে।

২ক.৭.২ রাজধানী পরিবর্তন

সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির মধ্যে দেবগিরিতে দ্বিতীয় শাসনকেন্দ্র স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুলতানের এই পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বারাণীর মতে, দেবগিরি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল বলেই সুলতান এখানে রাজধানী স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ইবন বতুতা অবশ্য বলেছেন যে, দিল্লির অধিবাসীরা সুলতানের নামে কুৎসা রটনা করতেন ও সেইজন্যই সুলতান তাদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজধানী দিল্লি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইসামী ও ইবন বতুতার বক্তব্যকে সমর্থন করেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে, গুরসাস্পের বিদ্রোহের পরই সুলতান দাক্ষিণাত্যের শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় করার আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণে তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করতে চান, যেখান থেকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহগুলি দ্রুত দমন করা যেত। অধ্যাপক হাবিবও নিজামীর মতই এই পরিকল্পনার পেছনে সুলতানের বিশেষ যুক্তি ছিল বলেই মনে করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, সুলতানের আদেশে একই সাথে দিল্লির সমস্ত অধিবাসীদেরই দেবগিরি যেতে বাধ্য করা হয়। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, সে সময় সমাজের উঁচুতলার অধিবাসীরাই (যেমন—উলেমা, শেখ প্রভৃতিরা) প্রথমদিকে দেবগিরি রওনা হন। দিল্লির আপামর জনসাধারণ বিশেষত হিন্দুদের এ সময়ে দেবগিরি যাওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মনে করেন, আইনি বাধবাধকতা না থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে দেবগিরিতে পাঠানোর একটা প্রচ্ছন্ন চাপ অবশ্যই ছিল। দেবগিরিতে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার তাগিদেই সুলতান প্রথমদিকে প্রশাসনের সঙেগ জড়িত ব্যক্তিদের ঐ স্থানে যাওয়ার আদেশ দেন। দেবগিরির নতুন নাম হয় দৌলতাবাদ।

দিল্লির অধিবাসীদের তাদের ইচ্ছার বিরুধে পূর্বপুরুষের বাসভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করায় এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। দিল্লির সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া দিল্লিবাসীর পক্ষে সুলতানের এই আদেশ মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়েছিল। বারাণীর বর্ণনায় দেখা যায় যে সুলতানের এই পরিকল্পনার ফলে দিল্লি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। তবেবারাণীর এই অভিমত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। অল্-কল্কাসান্দির বর্ণনা অনুযায়ী এ কথা বোঝা যায় যে, সুলতান দৌলতাবাদকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। যদিও প্রচলিত ধারণা এই যে মহম্মদ দিল্লি থেকে তাঁর রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

সুলতানের এই রাজধানী স্থানান্তরের সদর্থক ও নঞর্থক দু'ধরনের ফলই দেখা যায়। নঞর্থক দিকটি এই যে, জোর করে দিল্লি ত্যাগে বাধ্য করায় সুলতান বিশেষ একশ্রেণীর মানুষের আস্থা হারান। সুলতানের জনপ্রিয়তাও নষ্ট হয়। সদর্থক দিক থেকে বলা যায় যে, সুলতানের এই পদক্ষেপের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ব্যবধান ঘুচে এই দুই অঞ্চল ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়। নিজামীর মতে, উত্তর ভারত থেকে দৌলতাবাদে জনসমাগমের পরোক্ষ ফলই হল বাহমনী রাজ্যের সৃষ্টি।

২ক.৭.৩ মুদ্রানীতি

সুলতানের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মুদ্রানীতির সংস্কার। তিনি দেশে প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন এক ধরনের 'প্রতীক মুদ্রা' (তাম্র মুদ্রা) প্রচলন করেন। এই যুগের প্রচলিত মুদ্রার নাম ছিল 'তঙ্কা'। সুলতান নতুন তাম্রমুদ্রা বা 'জিতল'-কে রৌপ্যমুদ্রার সমমূল্যের বলে ঘোষণা করে বাজারে ছেড়েছিলেন।

এশিয়া মহাদেশে এর আগে চীনের কুবলাই খান (১২৬০-৯৪ খ্রিঃ) ও পারস্যের কাই কাতু খান (১২৯৪ খ্রিঃ) প্রচলিত ধাতুমুদ্রার বদলে কাগজের মুদ্রা বা 'নোট' চালু করেছিলেন। চীনে এ ধরনের নোটের নাম ছিল 'চাউ'। মহম্মদ-বিন-তুঘলক এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। তবে কাগজের টাকার পরিবর্তে তিনি কমদামি ধাতু অর্থাৎ তামা ব্যবহার করেছিলেন।

বারাণীর মতে, ভারতের বাইরে রাজ্যজয় ও অনেক দান-খয়রাতি প্রভৃতির ফলে রাজ্যে এক অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। তাই সুলতান এই নতুন মুদ্রানীতির আশ্রয় নেন। নিজামীর মতে, যুদ্ধে প্রভূত ব্যয় ছাড়াও সে সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও রূপার অভাব দেখা দেয়। সেইজন্য সুলতান তাঁর মুদ্রানীতিতে এই মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।

সুলতানের এই সংস্কার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। আসলে এই পরীক্ষা যুগোপযোগী ছিল না। জনসাধারণ তামা বা পিতলকে মূল্যবান ধাতু হিসেবে গণ্য করত না। ফলে তারা মুদ্রার যথার্থ মূল্য হিসেবে তামাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাছাড়া সুলতান তাম্রমুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা বা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেননি। এই ব্যবস্থাটিকে সরকার একচেটিয়া অধিকারে রাখারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এডওয়ার্ড টমাসের মতে, সরকারি টাকশালে নির্মিত তামার নোট এবং দক্ষ বেসরকারি শিল্পীর তৈরি তাম্রমুদ্রার মধ্যে সঠিক প্রভেদ করার ব্যবস্থা না থাকায় অল্পদিনের মধ্যে দেশে জাল তামার নোট ভীষণভাবে চালু হয়ে যায়। সুলতান আশা করেছিলেন যে, সোনা বা রূপা গ্রহণ করার মতোই তামার নোট গ্রহণের ক্ষেত্রেও জনসাধারণ ধাতু পরীক্ষা করে নেবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয়নি। ফলে সারাদেশ জালনোটে ভরে যায়। বারাণী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অতিশয়োক্তি করে লিখেছিলেন যে, প্রতিটি হিন্দুর বাড়ি এক-একটা টাকশালে পরিণত হয়। খুত্, মুকদ্দম প্রভৃতি কর্মচারীরা এই জাল নোটের সুযোগে বেশ বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। বিদেশি বণিকরা জাল তাম্রমুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে সুলতান তাঁর মুদ্রানীতির এই পরিণাম দেখে তামার নোট প্রত্যাহারের ও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন। রাজকোষ থেকে সোনা ও রূপার বিনিময়ে আসল ও নকল—সব ধরনের তামার মুদ্রাকেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। বারাণীর মতে, তুঘলকাবাদের কাছে তামার মুদ্রা জমে পর্বতের আকার নেয়।

স্যার উলসী হেগের মতে, মহম্মদ-বিন-তুঘলক এ ধরনের নোট প্রচলনের কথা জানলেও এর উদ্দেশ্য অথবা প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। সঠিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারলে সুলতানের এই নীতি হয়তো সাফল্যমণ্ডিত হতে পারত।

২ক.৭.৪ সামরিক পরিকল্পনা

জিয়াউদ্দিন বারাণীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ-বিন-তুঘলক খোরাসান ও ইরাক জয়ের উদ্দেশ্যে প্রায় ৩,৭০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। তবে সামরিক অভিযানে ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে তিনি চিন্তার মধ্যে আনেননি। হিমালয় ও হিন্দুকুশের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ঐ অঞ্চলে সমরসজ্জা পাঠানো যে যথেষ্ট দুরূহ কাজ তা সুলতান প্রথমে বুঝতেই পারেননি। যাই হোক, এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হয়নি।

সুলতান হিমালয়ের কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলের কারাচল নামক স্থানটিকে দখলেরও পরিকল্পনা করেন। ইবন বতুতার মতে, চীনের আগ্রাসনের হাত থেকে এই রাজপুত রাজ্যটিকে বাঁচাবার তাগিদেই তিনি এই পরিকল্পনা নেন। অন্যদিকে বারাণীর মতে। সুলতানের এই অভিযান তাঁর খোরাসান পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। শেষ পর্যন্ত দুর্গম পথে সুলতানি বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং সুলতান ঐ পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা পাওয়ার শর্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। এই অভিযান পুরোপুরি সফল না হলেও বিফল বলা যয় না।

এছাড়াও ১৩৩৭ খ্রিঃ সুলতান হিমালয়ের কাংড়া অঞ্চলের নগরকোট দুর্গটি দখল করেন। ১৩৩৭-৩৮ খ্রিঃ নাগাদ সুলতানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সেখানকার শাসক ফক্‌রউদ্দিন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা—সোনারগাঁও ও লখ্‌নৌতি মহম্মদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। বহু প্রচেষ্টাতেও সুলতান ঐ অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। ১৩৪০-৪১ খ্রিঃ নাগাদ সুলতান অযোধ্যার শাসক আইন-উল-মুলুকের বিদ্রোহ দমন করেন। ১৩৪২ খ্রিঃ মহম্মদ সিন্ধুদেশে অরাজকতা ও রাহাজানি দমন করে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

সিংহাসন লাভের পর মাবার দ্বারসমুদ্র, বরঙ্গাল প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে জয় করায় প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যই মহম্মদ-বিন-তুঘলকের অধীনে চলে আসে। তবে মাবার রাজ্যের বিদ্রোহ, বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও কৃষ্ণনায়েকের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাষ্ট্রগুলির জোটের ফলে অনেক অঞ্চলই আবার সুলতানকে হারাতে হয়। অবশেষে দৌলতাবাদে বিদ্রোহ শুরু হলে সে বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। তবে ইতিমধ্যে গুজরাটে বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় তিনি সেদিকে নজর দিলে বিদ্রোহীরা দৌলতাবাদের দুর্গ দখল করে নেয়। অন্যদিকে গুজরাটের তাখীরের বিদ্রোহ দমনে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়েন ও হঠাৎ মারা যান (২০ মার্চ, ১৩৫১খ্রিঃ)।

২ক.৭.৫ মূল্যায়ন

রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। অবশ্য বাস্তব জ্ঞানের অভাবহেতু ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল দিল্লির অধীনে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। তিনি অবশ্য বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধিকারীও হয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লি থেকে এই বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বলেই তিনি দেবগিরিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির বলে সুলতানের পক্ষে সে যুগের ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না।

এ কথা ঠিক যে, সুলতানের পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতার দরুন তিনি জনসাধারণের আস্থা হারান এবং অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সারাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে। তাঁর কঠোর নীতি সারাদেশে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা এবং সুলতান-বিরোধী কাজীরা সুলতানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেও সফল হননি। দীর্ঘ ২৭ বছরের রাজত্বকালে সুলতান কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনসাধারণের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হননি।

সুলতানের চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের লেখক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। শিয়াবউদ্দিন-অল-উমরী, সালাউদ্দিন সাফাদী প্রমুখ বিদেশি ইতিহাসবিদ্‌রা সুলতানের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। ইবন বতুতা তাঁর দানশীলতা, বিদ্যাবুদ্ধি ও উদারতার প্রশংসা করলেও তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। ইসামী সুলতানকে বিধর্মী ও অত্যাচারী বলতেও দ্বিধা করেননি। এমনকী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। জিয়াউদ্দিন বারাণী সুলতানের বিভিন্ন শাসন-সংস্কারের

কঠোর সমালোচনা করেছেন। ব্রিটিশ লেখক এলফিনস্টোন সুলতানকে ‘‘বিকৃত মস্তিষ্ক’’ বলে বর্ণনা করেছেন এবং হ্যাভেল, এডওয়ার্ড, টমাস ও স্মিথ তাঁকে সমর্থনও করেছেন। অন্যদিকে গার্ডনার ব্রাউন সুলতানের কাজকর্মের মধ্যে কোন অসঙ্গতি লক্ষ্য করেননি।

এইসব ঐতিহাসিক বিতর্ক সত্ত্বেও মহম্মদ-বিন-তুঘলক মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অত্যন্ত বর্ণময় চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি অস্থিরচিত্ত, হঠকারী এবং সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদের তিনি মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁর সংস্কারগুলি অধিকাংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার গ্লানিকে অতিক্রম করেও ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর কৃতিত্ব ঐতিহাসিকদের সপ্রশংস স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

২ক.৮ ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ)

সিন্ধুতে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুর পর সুলতানি সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। দিল্লির সিংহাসনে দুদিন কোন শাসনকর্তা ছিল না। আমির, ওমরাহ, ওলেমা, সুফিরা থাট্টায় রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হয়ে সমবেতভাবে ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতান হিসেবে মনোনীত করেন। অধ্যাপক নিজামীর মতে, মুসলিম রাজতন্ত্রে এই ধরনের মনোনয়নের বিধি ছিল। কাজেই ফিরোজ শাহের নির্বাচন বিধিসম্মত ছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জালালউদ্দিন খলজি প্রজাহিতৈষণা ও উদারনীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রব্যবস্থার যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছিলেন ফিরোজ তুঘলক তাকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে নানা কারণে অভিজাতগণ, প্রশাসক, সৈন্য, উলেমা, কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, ফিরোজ তুঘলক সমস্ত অংশের মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য উদার ও শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা না পেয়ে, যুদ্ধনীতি বা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রজার উন্নতি ও মঙ্গলের স্বার্থে প্রয়োগ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ফিরোজ ধর্মীয় মনোভাবের দিক থেকে ক্রমশ সংকীর্ণমনা হয়ে উঠেছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরোজের ছিল না। ফলে গোঁড়ামির বশে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের অনেকের বিরুদ্ধে নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই নীতি তাঁর প্রজাহিতৈষণার ধারণাকে সংকুচিত করেছিল। শাসন-বিষয়ে যে সংস্কারগুলি ফিরোজ করেছিলেন তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছিল, সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে এই সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

সিংহাসনে বসে ফিরোজ প্রজাসাধারণের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট হন। তিনি সরকারি ঋণ মুকুব করার আদেশ দেন। প্রজাদের বৈষয়িক উন্নতির দিকে নজর দেন ও এ বিষয়ে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন। বারাণীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুলতান ‘শিয়াস্তের’ নিষিদ্ধকরণের মধ্যে দিয়ে জনসমর্থন লাভ করেন। তাঁর আমলে এই শব্দটির অর্থ ছিল মৃত্যুদণ্ড। তাছাড়াও মুসলমানদের ওপর প্রচলিত অন্যান্য নৃশংস শাস্তিও তিনি নিষিদ্ধ করেন। সুলতান দোষী মুসলমানদের সঠিক বিচারের দায়িত্ব কাজীকে দেন। কিন্তু নির্যাতনমূলক শাস্তির পরিবর্তে কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তাঁর আমলে বহু রাজস্ব বিভাগের কর্মী তহবিল তছরূপ করেও সাজা পায়নি। এমনকি সে সময় রাজনৈতিক অপরাধীদের ঠিকমত কারাগারে রাখার ব্যবস্থাও চালু করা যায়নি।

২ক.৮.১ কর ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতে, ফিরোজের দীর্ঘ রাজত্বকালে আপেক্ষিক সমৃদ্ধির কারণ হল দেশের উৎপাদনের সাথে 'খরজ' বা ভূমিরাজস্ব এবং 'জিজিয়া' বা অমুসলমানদের ওপর করের সামঞ্জস্য বিধান। আফিফের বর্ণনায় জানা যায় যে, সুলতানের আদেশে খাজা হাসিমুদ্দিন জুনিয়াদ প্রায় ছ-বছর সারাদেশে ভ্রমণ করে রাজ্যের বার্ষিক আয় ছ'কোটি পঁচাত্তর লক্ষ তঙ্কা স্থির করেন। তবে মোরল্যাণ্ডের মতে, যেহেতু দীর্ঘসময়ে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণেই বেড়েছিল, সেহেতু সরকারের আয় দীর্ঘকাল এর থাকার কথা নয়। বস্তুত, জুনিয়াদ তাঁর অধীনস্থ বিরাট সংখ্যক কর্মচারীদের মোটামুটি একটা হিসেবের ওপর ওই অঙ্ক স্থির করেছিলেন। সে আমলে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে উৎপাদন অবশ্যই যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা শস্যের স্থানীয় দামের ওপর নির্ভর করেই সরকারী পাওনার অর্ধেক, তঙ্কায় আদায় করতেন। অন্যদিকে পাওনার পুরোটাই শস্যে আদায় করার প্রথাও চালু ছিল।

আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ফিরোজ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেতনের পরিবর্তে সমপরিমাণ রাজস্বের জমি সরকারি কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিলি করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলন। অবশ্য অধ্যাপক নিজামীর মতে, সুলতান যাদের মধ্যে জমি বিলি করতেন তারা সরকারি খাজনা আদায়কারীদের কাছ থেকে মোট আদায়ের অর্ধেক টাকাই পাওনা হিসেবে পেতেন। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে জমির ভোগকারীদের প্রত্যক্ষ কোন অধিকার ছিল না। যাই হোক, যে সমস্ত অঞ্চল সেনাবাহিনীর মধ্যে বিলি করা হত সেগুলি শাসনের কোন অধিকার তাদের ছিল না। তবে অসামরিক কর্মচারীরা যে সমস্ত অঞ্চলগুলির রাজস্ব অধিকার পেতেন সেই অঞ্চলগুলির শাসনভার তাদের হাতে থাকত।

অধ্যাপক নিজামীর মতে, এই রাজস্ব বিলি-ব্যবস্থা কর্মচারীদের অবাধ দুর্নীতি ও কৃষকদের ওপর শোষণের পথকে প্রশস্ত করে। এই ব্যবস্থা সুলতানি সাম্রজ্যের পতনের কারণ ছিল।

ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের আইন অনুসারেই বেশকিছু প্রচলিত কর-ব্যবস্থার সংস্কার করেন। বিভিন্ন নির্যাতনমূলক কর বা খাজনা তুলে দেওয়া হয়। 'ফুতুহাত্-ই-ফিরোজশাহী'-তে ফিরোজ নিজে শহরাঞ্চলের তেইশটি কর বন্ধ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইসলামের বিধি অনুসারে তিনি কেবলমাত্র ছয়টি করের প্রচলন করেন—'খরজ', 'জাকাত', 'জিজিয়া', 'খামস্' 'উসর' এবং 'তারাকাত্'য যুদ্ধজয়ের পর প্রাপ্ত সমস্ত বনসম্পদ পবিত্র আইনানুসারেই রাষ্ট্র এবং সেনাদলের মধ্যে বণ্টন করা হত। ফিরোজের এ নতুন কর-ব্যবস্থা বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে হলেও সহায়ক হয়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও ছিল কম।

২ক.৮.২ সৈন্যবাহিনীর সংগঠন

সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর ফিরোজের সামরিক সংগঠন গড়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে যে, সৈন্যদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়েছিল, যার রাজত্ব দিয়ে তারা জীবিকা-নির্বাহ করতেন। অবশ্য অনিয়মিত সৈন্যদের সরকারি কোষাগার থেকেই পারিশ্রমিক দেওয়া হত। রাজকীয় বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮০ থেকে ৯০ হাজার। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক সামন্তপ্রভুদের অধীনস্থ সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দুইলক্ষ। সুলতান সৈন্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদা নজর রাখতেন। অবশ্য সুলতানের অতিরিক্ত দাক্ষিণ্যের ফলে বৃদ্ধ এবং দুর্বল মানুষও সৈন্যবাহিনীতে থেকে যেতেন, যারা মোটেই সামরিক দিক থেকে রাষ্ট্রের সেবা করার যোগ্য ছিলেন না। অবশ্য ফিরোজ বয়স্ক সৈন্যদের অবসর দিয়ে তাদের পুত্রদের সৈনবাহিনীতে নিয়োগেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

২ক.৮.৩ বিচারব্যবস্থা

বিচার বিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে সুলতান এক গোঁড়া মুসলমানের মতো কোরানের বিভিন্ন নিয়মাবলীকে অনুসরণ করতেন। আইন প্রণয়নের জন্য 'মুফতি'কে নিয়োগ করা হয়। বিচারের দায়িত্বভার অর্পিত হয় 'কাজী'র ওপর।

ফিরোজের আমলে তাঁর রাজ্যে দাসব্যবস্থার প্রসার ঘটেছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সরকারি কর্মচারীরা বিভিন্ন কাজে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করতেন এবং রাষ্ট্র এই ক্রীতদাসদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছিল। সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে মোট ক্রীতদাসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৮০,০০০। এই বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাসদের নিয়ন্ত্রণের জন্য 'দিওয়ান-ই-বন্দাগানী' নামে একটি পৃথক সরকারি বিভাগও চালু করা হয়।

২ক.৮.৪ জনহিতকর কার্যাবলী

ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর শাসনতন্ত্রকে প্রজাকল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছিলেন। যেহেতু সে-যুগে কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূল ভিত্তি, যেহেতু তিনি কৃষির উন্নতি সাধনে জলসেচের গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' থেকে জানা যায় যে, ফিরোজ দীপালপুরের শতদ্রু নদী থেকে ঘর্ঘরা নদী পর্যন্ত এবং যমুনা নদী থেকে মাণ্ডভী ও সিরমুরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত দুটি বড় খাল খনন করেছিলেন। দ্বিতীয় খালটির সঙ্গে আরো সাতটি ছোটো খাল যুক্ত করে প্রধান খালটিকে হানসী পর্যন্ত বাড়ানো হয়। পরে হানসী থেকে আরাসীন এবং পুনরায় খালটিকে হিসার ফিরুজা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এইসব সেচখাল খননের ফলে দোয়াব অঞ্চলের প্রায় ১৬০ মাইল চাষের জমি দুটি বৃহৎ খালের জলে সিঞ্চিত হয়েছিল এবং গম, আখ ও অন্যান্য ধরনের শস্যের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া সুলতান প্রচুর কূপও খনন করেছিলেন। আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কৃষি উৎপাদন থেকে সুলতানের ব্যাক্তিগত আয় দাঁড়ায় বার্ষিক প্রায় দু লক্ষ তঙ্কা।

কৃষির উন্নতি ছাড়া ফিরোজের অপর এক কীর্তি হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নগর নির্মাণ। প্রায় সাঁইত্রিশ বছরের রাজত্বকালে সুলতান তাঁর রাজ্যে যে-সমস্ত নগরগুলি গড়ে তোলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফিরোজাবাদ, হিসার, জৌনপুর ও ফিরোজপুর। অফিফের বর্ণনায় দিল্লির কাছে যমুনার তীরে গড়ে ওঠা ফিরোজাবাদ নামক শহরটির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তৈমুরের আক্রমণে এই শহরটি ধ্বংস হয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ অভিযানের সময় ফিরোজ পাণ্ডুয়ার নতুন নাম দেন ফিরোজপুর। শহরগুলির নির্মাণের সঙ্গে সুলতান নগরবাসীদের সুবিধার্থে বেশকিছু সরাইখানা, স্মৃতিস্তম্ভ, জলাশয়, হাসপাতাল ও কূপ খনন করান। রাজধানীতে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য বেশকিছু দাতব্য হাসপাতাল (দার-উস্-সাফা) নির্মাণ করা হয়েছিল। দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় এক হাজারের বেশি বাগান তৈরি করা হয়েছিল।

সুলতানের অপর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি দরিদ্র বালিকাদের সরকারি খরচে বিবাহের আয়োজন করা। 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে নতুন একটি সরকারি বিভাগ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে সুলতান দরিদ্র পিতামাতাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের বিবাহযোগ্য কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। 'দেওয়ান-ই-ইস্তিহক' নামে অপর এক সরকারি বিভাগের কাজ ছিল যোগ্য ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য দেওয়া। সরকারি তহবিল থেকে এই খাতে প্রতি বছর ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

বেকার যুবকদের কর্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক আজকের দিনের মতোই কর্ম বিনিয়োগ সংস্থা (Employment Exchange) স্থাপন করেন। দিল্লির কোতোয়াল কর্মপ্রার্থীদের সুলতানের কাছে হাজির করতেন। সুতরাং স্বয়ং তাদের যোগ্যতা ও আর্থিক অবস্থা বুঝে চাকরিতে বহাল করতেন।

২ক.৮.৫ শিক্ষার পৃষ্টপোষকতা

ফিরোজ দেশে জ্ঞানচর্চার প্রচারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষিত সমাজকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজ প্রাসাদে আপ্যায়ন করতেন। এঁদের আর্থিক সমৃদ্ধি, ভাতা প্রভৃতির দিকেও তিনি দৃষ্টি রাখতেন। ইতিহাস চর্চার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রাহ ছিল। উদাহরণ হিসেবে তাঁর ‘ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী’ গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। শামস-ই-সিরাজ আফিফ ও জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতো ঐতিহাসিকরা তাঁর আমলেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি রচনা করেন। আজাজউদ্দিন খালিদখানি নামে জনৈক ব্যক্তি নগরকোট থেকে প্রাপ্ত প্রায় তিনশো সংস্কৃত গ্রন্থ পারসিতে অনুবাদ করেন। এই অনুদিত গ্রন্থটির নাম ‘দালাইল-ই-ফিরোজশাহী’। ফিরোজের আমলে ‘তারিখ-ই-ফিরোজশাহী’ রচিত হয়। ফিরোজ বহু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে মসজিদ নির্মণের ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হত।

২ক.৮.৬ ধর্মনীতি

ফিরোজ শাহ্ তুঘলক সম্ভ্রান্ত অভিজাত ও উলেমাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসনে বসেন। ফলে তাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। তাছাড়া হিন্দু নারীর গর্ভজাত সন্তান হওয়ার ফলে নিজেকে তুর্কি মুসলমানদের সমকক্ষ প্রমাণ করার একটা তাগিদও তাঁর ছিল। ফলে তিনি উলেমাদের ক্ষমতা ও মর্যাদাকে পুনরায় শক্তিশালী ভিত্তি দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন রাজানৈতিক ও ধর্মনৈতিক বিষয়ে তিনি ইসলাম জগতের বিভিন্ন প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপদেশ নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতেন। এর ফলে তাঁর ধর্মনীতি গোঁড়া ইসলাম আদর্শের প্রভাবে কিছুটা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তিনি হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। ধর্মান্তরকরণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি ‘জিজিয়া’ কর তুলে দেওয়া, জায়গীর ও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্মান দান প্রভৃতি পুরস্কারের ঘোষণা করেন। তাঁর ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তাঁকে ‘শিয়া’ ও অন্যান্য ‘অ-সুন্নী’ মুসলমানদের বিরুধ্বেও কঠোর করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মতো একজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম শাসক খলিফার সুনজরে পড়েছিলেন। তিনি দু-বার খলিফার স্বীকৃতিপত্র লাভ করেছেন। ফিরোজের মুদ্রাতেও খলিফার নাম মুদ্রিত রয়েছে।

২ক.৮.৭ সামরিক কৃত্বিত

সামরিক দিক থেকে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করেননি। তিনি বাংলাদেশ, কাঙড়া ও সিন্ধুদেশে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। ১৩৫৩ থেকে ১৩৫৮ খ্রিঃ মধ্যে সুলতান বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার শাসক সিকান্দারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেই তিনি ক্ষান্ত হন। অবশ্য সিকান্দারের মিত্র ওড়িশার জাজনগরের রাজা গজপতি ফিরোজের কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিলেন। সুলতান কটক দখল করেন ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বংসসাধন করেন। এরপর সুলতান কাঙড়া অঞ্চলের নগরকোট আক্রমণ করেন ও সেখানকার শাসককে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য

করেন। ফিরোজের পরবর্তী অভিযান ছিল সিন্ধুদেশের থাট্টা অঞ্চলে। প্রথমদিকে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত ফিরোজ এই অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন।

২ক.৮.৮ শেষ জীবন

ফিরোজের রাজত্বকালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৩৮৭ খ্রিঃ নাগাদ সুলতান অবসর নিয়ে যুবরাজ মহম্মদ জুনা-খাঁকে অভিষিক্ত করেন। মাত্র দু-মাস পরে ফিরোজের অধীনস্থ প্রায় দু-লক্ষ ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মহম্মদ জুনা খাঁ পলায়নে বাধ্য হন। এরপর ফিরোজ তাঁর দৌহিত্র দ্বিতীয় তুঘলক শাহ-কে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেন। এক বছর বাদে ১৩৮৮ খ্রিঃ ৮২ বছর বয়সে ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যু হয়।

ফিরোজের মৃত্যুর পর দিল্লি-সুলতানির ভাঙ্গান শুরু হয় এবং উত্তর ভারত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যদিও তুঘলকরা ১৪১২ খ্রিঃ পর্যন্ত শাসন করেন, ১৩৯৮ খ্রিঃ তৈমুরের অভিযান তুঘলক সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

২ক.৮.৯ মূল্যায়ন

ফিরোজ শাহ তুঘলককে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে আফিফ বারাণী তাঁকে প্রজাহিতৈষী ও দয়ালু বলে বর্ণনা করেছেন। হেনরি এলিয়ট ও এলফিনস্টোনের মতো বিদেশি ঐতিহাসিকরা ফিরোজকে “সুলতানি যুগের আকবর” বলে আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য ড. ভিনসেন্ট স্মিথ এবং ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ আকবরের তুলনায় ফিরোজকে একশ ভাগের একভাগও মনে করেননি। স্যার উলসী হেগের মতে, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ক্ষেত্রে আকবরের পূর্বে একমাত্র ফিরোজের রাজত্বকালই ছিল সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল।

বস্তুত ফিরোজ ছিলেন সৎ এবং নিজের দায়িত্বের প্রতি সচেতন। তাঁর আগে দিল্লির আর কোনও সুলতান প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এতটা নজর দেননি। তাঁর কর-ব্যবস্থা, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, কর্ম-বিনিয়োগের সংস্থা স্থাপন, ‘ দেওয়ান-ই-খয়রাত’ প্রভৃতি সংস্কার তাঁকে প্রচুর জনসমর্থন এনে দিয়েছিল। কিন্তু সামরিক ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে সুলতান বিশেষ গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর আমলে ক্রীতদাসরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তাছাড়া ফিরোজের ধর্মনৈতিক আদর্শ ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। সুলতানি যুগে প্রথমবারের জন্য তাঁর আমলেই রাষ্ট্র হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের মানুষদের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার তত্ত্বাবধায়কে পরিণত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় উচ্চ আসনে উলেমাদের স্থাপন অনেক ক্ষেত্রে সুলতানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক স্বার্থকে বিঘ্নিত করেছিল। ড. ত্রিপাঠীর মতে ইতিহাসের পরিহাস এই যে, যে-সমস্ত গুণগুলি ফিরোজ শাহ তুঘলককে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেগুলিই দুর্ভাগ্যবশত দিল্লি-সুলতানির দুর্বলতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২ক.৯ অনুশীলনী

ক.

১। খলজি বিপ্লবের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। খলজি সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝেন? আলাউদ্দিন খলজির সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণ পর্যালোচনা করুন।

৩। আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সংস্কার আলোচনা করুন। তিনি কি সফল হয়েছিলেন?

৪। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য সহ আলোচনা করুন।

৫। ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলীর বিবরণ দিন। তাঁকে কী 'সুলতানি যুগের আকবর' বলা যায়?

খ.

১। জালালউদ্দিন খলজির রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণা কি ছিল?

২। জালালউদ্দিন কেন শান্তি নীতি অনুসরণ করেছিলেন?

৩। আলাউদ্দিনের রাজতন্ত্র-বিষয়ক ধারণা কেমন ছিল?

৪। আলাউদ্দিন কেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন?

৫। ধর্ম বিষয়ে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

৬। মহম্মদ-বিন-তুঘলক কী সত্যিই 'পাগলা রাজা' ছিলেন?

৭। ফিরোজ তুঘলকের ধর্মনীতি ও ক্রীতদাস-প্রীতি রাষ্ট্রের পক্ষে কেন ক্ষতিকর হয়েছিল?

৮। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলককে সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের জন্যে কতখানি দায়ী করা যায়?

গ.

১। কোন্ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে খলজি বংশের উত্থান হয়?

২। আলাউদ্দিন কিভাবে সুলতান হয়েছিলেন?

৩। আলাউদ্দিন গুজরাট আক্রমণের একটি কারণ দেখান।

৪। মালিক কাফুর কে ছিলেন?

৫। 'দার-উস্-সাফা' কি?

৬। 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' কাকে বলে?

২ক.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। K.S. Lal. (Allahabad, 1950)—*History of the Khaljis.*

২। Mahdi Husain. (Calcutta, 1963)—*Tughlug Dynasty.*

৩। R.C. Mazumdar, Ed. (Bharatiya Vidya Bhavan, 1980)—*The Delhi Sultanate.*

৪। Mohammad Habib, Vol-V — *The Delhi Sultanate. K. A.* Nizami, Ed. 1970–*A Comprenhensive History of India.*

৫। Ishwari Prasad—*A Shorty History of Medieval India.*

৬। অনুবাদ বৈদ্যনাথ বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৮৪ : *মধ্যযুগে ভারত (Medieval India, Part-I : সতীশচন্দ্র)।*

৭। অসিত কুমার সেন, ১৯৯৮ : *তুর্কি ও আফগান যুগে ভারত।*

একক ২খ ❑ বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব ও বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান

গঠন

২খ.০ উদ্দেশ্য
২খ.১ প্রস্তাবনা
২খ.২ বক্তিয়ার খলজির বাংলা জয়
 ২খ.২.১ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
 ২খ.২.২ সিকন্দর শাহ
 ২খ.২.৩ গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ
 ২খ.২.৪ হামজা শাহ
 ২খ.২.৫ ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান
২খ.৩ রাজা গণেশ ও তাঁর (ধর্মান্তরিত) বংশধর (১৪১৫-১৪৪২ খ্রিঃ)
 ২খ.৩.১ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ
 ২খ.৩.২ বাংলায় হাবসী শাসন
 ২খ.৩.৩ হাবসী শাসনের অবসান
২খ.৪ ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান
 ২খ.৪.১ সমাজ-সংস্কৃতি
 ২খ.৪.২ সাহিত্য
 ২খ.৪.৩ শিল্প-সাহিত্য
২খ.৫ হুসেন শাহী বংশ
 ২খ.৫.১ হুসেন শাহের প্রথম জীবন
 ২খ.৫.২ হুসেন শাহের রাজ্যবিস্তার
 ২খ.৫.৩ হুসেন শাহী বংশ : নসরৎ শাহ
 ২খ.৫.৪ হুসেন শাহী বংশের অবক্ষয়
 ২খ.৫.৫ বঙ্গ জীবনে হুসেন শাহী বংশের অবদান
২খ.৬ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
২খ.৭ সঙ্গম বংশ
 ২খ.৭.১ প্রথম দেবরায়
 ২খ.৭.২ দ্বিতীয় দেবরায়
 ২খ.৭.৩ শালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৩ খ্রিঃ)
২খ.৮ তুলুব বংশ (১৫০৫-১৫৭০ খ্রিঃ) : কৃষ্ণদেব রায়
 ২খ.৮.১ তুলুব বংশের পতন : তালিকোটার যুদ্ধ
২খ.৯ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা
২খ.১০ বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগর
২খ.১১ অনুশীলনী
২খ.১২ গ্রন্থপঞ্জি

২খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে বিষয়গুলোর ওপর মূল জোর দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হল—

- কী পরিস্থিতিতে বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।
- বাংলায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও শিল্প-সংস্কৃতিতে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের অবদান কি ছিল।
- দিল্লির সুলতানি শাসনের অবক্ষয়ের সুযোগে দক্ষিণ ভারতে কীভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।
- দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল।

২খ.১ প্রস্তাবনা

ফিরোজ শাহ তুঘলকের পর দিল্লির কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-কাঠামোয় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। ঐ সময়ে যে দুটো অঞ্চলে বড় আঞ্চলিক রাষ্ট্র স্থাপনের ঝোঁক দেখা যায়, সে দুটো হল পূর্ব ভারতের বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর। কুতুবউদ্দিন আইবকের বিশ্বাসভাজন সমরনায়ক বখ্‌তিয়ারই প্রথম বাংলাদেশে দিল্লির নিয়ন্ত্রণের বাইরে শাসন-কাঠামো গঠনের পথ দেখিয়েছিলেন, তবে এ ব্যাপারে মূল কৃতিত্ব ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে একই কাজ করেছিলেন বেশ কয়েকজন শাসকের একটি ক্রমিক গোষ্ঠী। কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে অস্বীকার করে বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রবণতার পর্যায় বর্তমান এককের প্রস্তাবিত বিষয়।

২খ.২ বখ্‌তিয়ার খল্‌জির বাংলা জয়

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেন (১২০২-১২০৩)। লক্ষ্মণ সেন নদিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গে সেন বংশের রাজত্ব আরো কিছুকাল টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবকের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বখ্‌তিয়ার খলজি কুতুবউদ্দিনের প্রাধান্য স্বীকার করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে নেননি। মুসলমান শাসনের প্রথমদিকে দিল্লির সুলতানের পক্ষে প্রভুত্ব চাপিয়ে দেওয়া সম্ভবও ছিল না। সম্পূর্ণ নিজের শক্তি ও দক্ষতার জোরেই বখ্‌তিয়ার বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর সুলতানি শাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের যে ঐতিহ্য রেখে যান, তা পরবর্তীকালে গৌরবময় স্বাধীন গৌড় সুলতানিতে পরিণত হয়। বাংলার মুসলমান শাসকেরা প্রায়ই দিল্লির প্রাধান্য অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। দিল্লির বিরুধ্বে বাংলার শাসকদের বিদ্রোহের কতকগুলি কারণ ছিল। (১) দিল্লি থেকে বাংলাদেশের দূরত্ব বাংলার শাসকদের বিদ্রোহ করতে প্রলুব্ধ করেছে। দিল্লির শাসকদের পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করে দ্রুত বিদ্রোহ দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। বিদ্রোহ দমন করে মনোমত শাসক বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে সুলতানেরা ফিরে গেলেই বাংলা বিদ্রোহ ঘোষণা করত। (২) বাংলার ধনসম্পদ এবং ভৌগোলিক পরিবেশ বাংলার শাসকদের বার বার বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। সুলতানি যুগের প্রথম থেকেই বাংলায় দিল্লির কর্তৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জিয়াউদ্দিন বারাণী বলেছেন যে, লখ্‌নৌতির (লক্ষ্মণাবতী) লোকেরা বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত ছিল এবং এই শহরকে বুলঘাকপুর বা বিদ্রোহের শহর বলা হত।

এই সময় বাংলা চারটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—লখ্নৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম। দিল্লির সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে বাংলার ওপর কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ সুলতানের ছিল না। লখ্নৌতি ও সোনারগাঁও-এর দুই শাসনকর্তার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে দারুণ গোলযোগের সূত্রপাত হয়। বাংলার বেশকিছু জমিদার নিজ নিজ এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকেন। বাংলার এই রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইলিয়াস খান লখ্নৌতি এবং সোনারগাঁও দখল করে নেন। অনতিবিলম্বে তিনি শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করে সুলতানি শাসনের সূচনা করেন।

২খ.২.১ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

ইলিয়াস শাহের পূর্ব-ইতিহাস বিশেষ কিছুই আমরা জানতে পারি না। সমসাময়িক আরবি ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর আদি নিবাস ছিল পূর্ব-ইরানের সিজিস্তানে। দিল্লি থেকে বাংলায় এসে ইলিয়াস প্রথমে দক্ষিণ বাংলার কোথাও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এক সৈন্যদল গঠন করেন। ১৩৪২ মতান্তরে ১৩৪৫ সালে লখ্নৌতি বা লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বাংলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বের সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জিয়াউদ্দিন বারাণীর তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী, নিজামুদ্দিন বখসী'র তবাকাৎ-ই-আকবরী, মহম্মদ কাশিম ফিরিস্তা লিখিত তারিখ্-ই-ফিরিস্তা, শাম্স্-ই-সিরাজ আফিসের তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক ব্যক্তির লেখা সিরাজ-ই-ফিরোজশাহী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ জানা যায়। তবে বেশিরভাগ লেখাতেই ইলিয়াস শাহের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

লখ্নৌতির সিংহাসন দখল করেই ইলিয়াস শাহ বাংলায় নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রথমে সম্ভবত সাতগাঁও অধিকার করেন এবং পরে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির দিকে হাত বাড়ান। ত্রিহূত অধিকার করে হাজিপুর পর্যন্ত জয় করেন। চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশি প্রভৃতি অঞ্চলও তিনি জয় করেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তিনি সোনারগাঁও অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। কামরূপেরও কতকাংশ ইলিয়াসের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। ইলিয়াস উড়িষ্যা আক্রমণ করে চিল্কাহ্রদের সীমা পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালন এবং সেখানে ৪৪টি হাতি সমেত অনেক সম্পত্তি লুঠ করেন। নেপালের বিরুদ্ধেও তিনি সফল অভিযান প্রেরণ করেন। নেপালের বহু মন্দির ধ্বংস করে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। তাঁর সফল সামরিক অভিযানগুলির ফলে প্রথমত, বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের পূর্বপ্রান্তে শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় দিল্লির সুলতানের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

ইলিয়াসকে দমন করার জন্য দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়া দখল করলে ইলিয়াস দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দুর্গ অবরোধ করেও ইলিয়াসের পতন ঘটানো সম্ভব হল না। অবরোধ তুলে নিয়ে স্বসৈন্যে ফিরোজ ফিরে যাচ্ছেন এই ভান করায় ইলিয়াস দুর্গ থেকে বেরিয়ে সুলতানি বাহিনীকে আক্রমণ করেন। পাইক সর্দার সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ দেন। ইলিয়াস পরাজিত হলেন। কিন্তু তিনি আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরোজ তুঘলক ৪৫টি হাতি ও কিছু অর্থসম্পদ দখল করে দিল্লি ফিরে যান। বারাণী, ইসামি এই যুদ্ধে সুলতানের জয় হয়েছে বললেও যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। দিল্লির বাহিনী বাংলা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াস পুনরায় তাঁর হারানো অংশগুলি দখল করে নেন। দিল্লির সুলতানের সঙ্গে ইলিয়াসের যে সন্ধি হয় তাতে কার্যত ফিরোজ তুখলক বাংলার স্বাধীন

মর্যাদা স্বীকার করে নেন। ইলিয়াসও মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে দিল্লির সঙ্গে শান্তি বজায় রাখেন।

প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল থেকেই বাংলা দু'শ বছর ধরে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল—বাংলার জনজীবনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল। শাম্‌স-ই-সিরাজ আফিফ্ তার তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই-বাঙালা, সুলতান-ই-বাঙালা, শাহ-ই-বাঙালিয়ান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বাঙালি পাইকদেরই কেবল সাহায্য পেয়েছিলেন তাই নয়, বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাদুড়ি ও সান্যাল জামিদারেরাও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। ইলিয়াস শাহ বাঙালি হিন্দু অভিজাত ও সাধারণ বাঙালিজনের শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যও রূপ পাচ্ছিল। রিয়াজ-উস্-সালাতিনের লেখক ইলিয়াস শাহকে ভাঙ্গরা বা ভাঙ্গের নেশাখোর বলে উল্লেখ করেছেন। বারাণী তাঁকে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বক্তব্যগুলিকে 'ইলিয়াসের শত্রুপক্ষের লোকের বিদ্বেষ প্রণোদিত মিথ্যা উক্তি' বলে উপহাস করেছেন।

২খ.২.২ সিকন্দার শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম তিনজন শাসকই যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ আবার বাংলা আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের কারণ—(১) তিনি বাংলা অভিযানের ব্যর্থতা ভুলতে পারেননি এবং (২) ইলিয়াস শাহের কাছে পরাজিত সোনারগাঁও-এর শাসকের জামাতার আবেদনে বাংলার শাসককে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলা আক্রমণ করেন। সিকন্দর পিতার মতোই একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু একডালা দুর্গের পতন ঘটানো দিল্লির সুলতানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উভয়পক্ষই ক্লান্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। বাংলা ছেড়ে ফিরোজ চলে যান এবং বাংলার ওপর সিকন্দরের সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেন। সিকন্দরের কেবল যোদ্ধা ও প্রশাসক হিসাবেই খ্যাতি ছিল তা নয়, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক রূপেও সুনাম ছিল। তাঁরই সময়ে 'স্থাপত্য কৌশলের' দিক দিয়ে অতুলনীয় পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। তাঁর শেষ জীবন সুখের ছিল না। তাঁর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ বাঁধে। তাঁর প্রিয় পুত্র গিয়াসউদ্দিন বিমাতার চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে সন্দেহের বশে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যুদ্ধে সিকন্দরের মৃত্যু হয়।

২খ.২.৩ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

পরবর্তী শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯১-১৪১০ খ্রিঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তবে দিল্লির সুলতানের পক্ষ থেকে বাংলা আক্রমণের সম্ভাবনা না থাকায় তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করেন। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিনি কামতা রাজ্যের একাংশ দখল করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অহোম ও কামতা রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে তাঁকে কামতা রাজ্য থেকে সরে আসতে হয়েছিল। সমসাময়িক রচনাগুলিতে তাঁকে 'ন্যায়পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী' বলে প্রশংসা করা হয়েছে। বিহারের দরবেশ মুজফ্‌ফর বল্‌খি এবং প্রখ্যাত সন্ত নূর কুতব আলমের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিনের পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং তাঁকে স্বীয় দরবারে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কিন্তু হাফিজের পক্ষে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বিদেশের সঙ্গে বাংলার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আজম শাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সময়ে চীনের সঙ্গে বহুবার দূত বিনিময় হয়েছিল। চীন সম্রাট ইয়ং লুর কাছে গিয়াসউদ্দিন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ সালে দূত পাঠিয়েছিলেন। চীনা সম্রাট এদেশ থেকে বৌদ্ধ ভ্রমণদের স্বদেশে আমন্ত্রণ

করেছিলেন। ১৪১০-১১ খ্রিঃ মহারত্ন উমরাজ নামে একজন ভিক্ষু এদেশ থেকে চীনে প্রেরিত হয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। এই সময় মা-হুয়ান চীন থেকে বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে তৎকালীন বাংলা ও বাঙালিদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

২খ.২.৪ হামজা শাহ

গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাঈফ্উদ্দিন হামজা শাহ (১৪১০-১২) সিংহাসনে বসেন। সাঈফ্উদ্দিন চীনের সঙ্গে মৈত্রী ও যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী সিহাবুদ্দিন বা বায়োজি শাহ (১৪১৩-১৪) ও পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৪১৪-১৫) রাজত্বকালে ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের একজন ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা গণেশ দরবারে শক্তিশালী অভিজাত হিন্দুগোষ্ঠীর নেতা হিসাবে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিকদের মতে রাজা গণেশ ফিরোজ শাহকে হত্যা করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিলেন।

২খ.২.৫ ইলিয়াস শাহী বংশের অবসান

প্রায় দুশো বছর নিরবচ্ছিন্ন মুসলিম শাসনের পর হিন্দু বংশের অভ্যুত্থান আশ্চর্য মনে হলেও তা অবাস্তব ছিল না। ইলিয়াস শাহীদের রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার আমির-ওমরাহদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। উমেলা ও মুসলিম প্রশাসকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজা গণেশ তথা হিন্দু অমাত্যদের অভ্যুত্থানের পথ সহজ করে দেয়। রাষ্ট্রনীতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম সাধু-সন্তদের হস্তক্ষেপের অনেক নজীর আছে। মুজফফ্র শাহ বল্খী, আজম শাহকে প্রশাসনের কোনো বিভাগে বিধর্মীদের নিয়োগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহের আমলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সহযোগিতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল, আজম শাহের আমলে তা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবত এই কারণে হিন্দু সামন্ত, জমিদার ও অমাত্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এবং রাজা গণেশের অভ্যুত্থান সহজ হয়।

২খ.৩ রাজা গণেশ ও তাঁর মুসলমান (ধর্মান্তরিত) বংশধর (১৪১৫-১৪৩৭)

দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় মুসলমান শাসনের মধ্যে স্বল্পকালের জন্য রাজা গণেশের হিন্দুশাসন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে তাঁর রাজত্বকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। কয়েকটি বিষয় এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। রাজা গণেশের নামে কোন মুদ্রা আজও পাওয়া যায়নি। যতগুলি তথ্য আজ অবধি পাওয়া গেছে, কোনো তথ্যই রাজা গণেশের সিংহাসন আরোহণের যথাযথ ও সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য দিতে পারেনি। অবশ্য (১৪১৭-১৯) সালের মধ্যে দনুজমর্দনদেব নামে এক রাজার মুদ্রা পাওয়া গেছে। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী রাজা গণেশেরই আর এক নাম দনুজমর্দনদেব বলে জানিয়েছেন। অনেকে অবশ্য এই মত সমর্থন না করলেও গণেশ ও দনুজমর্দনদেব অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। রাজা গণেশের সিংহাসন আরোহণে বাংলার মুসলমান সাধু-সন্তরা অসন্তুষ্ট হন। তাঁদের নেতা নূর কুতুব-আলম জৌনপুরের বিখ্যাত সুফী আসরাফ-উল-সিমনানির সাহায্য চান। সিমনানির অনুরোধে জৌনপুরের মুসলিম শাসক ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করেন। গণেশ প্রায় বিনাযুদ্ধে শর্কির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গণেশের পুত্র যদু পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলিম শিবিরে যোগ দেন।

তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মুসলমান উলেমা ও আমীর-ওমরাহরা তাঁকে সিংহাসনে বসান। তাঁর নাম হয় জালালউদ্দিন। বাংলায় ইসলামি শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। জালালউদ্দিনের মৃত্যর পর তাঁর পুত্র শামসউদ্দিন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে রাজধানী গৌড়ে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে ওঠে। তাঁর দুই ক্রীতদাস শাহী খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র করে আহমদ শাহকে হত্যা করেন। এই দুই ক্রীতদাস ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে অভিজাতবর্গ ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহকে সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে বসান। ইলিয়াস শাহী বংশের পরবর্তী বংশধরদের রাজত্ব শুরু হল।

২খ.৩.১ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকাল শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে কেটেছিল বলে সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা জানিয়েছেন। অন্তত জৌনপুরের শর্কিরা বাংলার দিকে তখন নজর দেয়নি। দিল্লির লোদিদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা লিপ্ত ছিল। তবে উড়িষ্যা ও মিথিলার রাজার সঙ্গে বাংলার যুদ্ধ বেঁধেছিল। তাঁর রাজত্বকালেই সম্ভবত পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। রিয়াজ বলেছেন, নাসিরুদ্দিন উদার ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ফিরিস্তা তাঁর প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, প্রজারা তাঁর রাজত্বে সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। এই সময়ে বাংলার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুকনদ্দীন বরবক শাহ শান্তিপূর্ণভাবে সিংহাসনে আরোহণ (১৪৫৮) করেন। বরবক শাহ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁর সময় বাংলাদেশের সীমান্ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর সেনাপতি ইসমাইল গাজী এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। মান্দারণ দুর্গকে কেন্দ্র করে তিনি উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। বরবক শাহ ত্রিহূত জয় করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সিলেট পুনরায় নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেছিলেন। যশোর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ তাঁর শাসনাধীনে ছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। তিনি নিজেও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসুকে সুলতান গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুদের দরবারে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অনন্ত সেন, কেদার রায়, নারায়ণ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২খ.৩.২ বাংলায় হাবসী শাসন

পরবর্তী ইলিয়াস শাহীদের দুর্বলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, দরবারী ষড়যন্ত্রের ফলে প্রশাসন যন্ত্র প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার জন্য তাঁর নিজেদের ক্রীতদাস ও অমাত্যদের ওপর ভরসা করতে পারছিলেন না। তাঁরা প্রায় দশ হাজার হাবসী (আবিসিনিয়) ক্রীতদাস আমদানি করেন এবং দেহরক্ষী ও রাজপ্রাসাদের রক্ষী হিসাবে নিয়োগ করেন। সুলতান বরবক শাহ সর্বপ্রথম হাবসী ক্রীতদাসের আমদানি করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, হাবসী ক্রীতদাসরা প্রাধান্য পেলে স্থানীয় প্রভাবশালী অমাত্যরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় রাজঅন্তঃপুরে এবং বাইরে হাবসী ক্রীতদাস ও সেনারা প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজার ছত্রছায়ায় তারা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। হাবসীদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য এই বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহ প্রয়াসী হলে হাবসীরা তাঁকে হত্যা করে এবং সিংহাসন দখল

করে (১৪৮৭)। ইলিয়াস শাহদের হাবসী প্রীতি এতদূর পৌঁছেছিল যে পূর্বতন অভিজাত ও অমাত্যরা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল এবং সুলতানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিল না। এইসঙ্গে প্রজাশক্তিও হীনবল হয়ে পড়েছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটল।

২খ.৩.৩ হাবসী শাসনের অবসান

হাবসীরা ১৪৯৩ পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। হাবসীদের শেষ সুলতান মুজফ্ফর শাহ-এর অত্যাচার ও কুশাসন শুধুমাত্র আমীর-ওমরাহদের অসন্তুষ্ট করেননি, জনসাধারণকেও শত্রু বানিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম জমিদার ও অভিজাতদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন। চড়া হারে রাজস্ব আদায় করেন, এবং সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে দেন। ফলে আমীর-ওমরাহ, সেনাবাহিনী ও সাধারণ প্রজা সবাই সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হয়। 'বাংলার শাসকের বিরুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের এটাই হল প্রথম দৃষ্টান্ত।' এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মুজফ্ফর শাহের উজির হুসেন শাহ। মুজফ্ফর শাহ নিহত হলে হুসেন শাহ অভিজাত ও হিন্দু পাইকদের সমর্থনে সিংহাসনে বসে হুসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

২খ.৪ ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান

ইলিয়াস শাহী সুলতানদের প্রচেষ্টায় বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সত্তার জন্ম হয়। সাতগাঁও, সোনারগাঁও চট্টগ্রাম-এর শাসকদের পরাভূত করে লক্ষণাবতী বা লখনৌতির অধীনে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়ে তুললেন ইলিয়াস শাহীরা। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের চরম বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে তারা বাংলার স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। পর পর দু'বার দিল্লির সম্রাট বাংলা আক্রমণ করেও বাঙ্গালীদের পরাজিত করতে পারেননি। বাংলার স্বাধীনতাকে কার্যত তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে বাংলার প্রভাব ও কর্তৃত্ব জাহির করতে পেরেছিলেন বাংলার সুলতানেরা। ইলিয়াস এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যারা প্রায় দেড়শত বছর ধরে গৌরবের সঙ্গে বাংলার রাজত্ব করেন। ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলা ও বাঙ্গালির আশা-আকাঙক্ষার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলেছিলেন। সমসাময়িক লেখক আফিফ সঙ্গত কারণেই ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই বাঙালিয়ান বা শাহ-ই-বাঙলা বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন যে, মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগে বাংলা বলতে যে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে দেশকে বুঝি তাঁর সৃষ্টি এই সুলতানি বংশের শাসনকালেই। শশাঙ্ক বা পালরাজাদের আমলের বাংলার সঙ্গে আমাদের পরিচিত বাংলার অনেক প্রভেদ।

২খ.৪.১ সমাজ-সংস্কৃতি

রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সাম্প্রদায়িক ঐক্যও সুদৃঢ় হয়। ইলিয়াস শাহী সুলতানরা এমন এক উদার শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যাতে খুব সহজেই হিন্দুরা অভিজাত ও সাধারণ মানুষ ইলিয়াস শাহী সুলতানদের আপনজন ভাবতে পারে। পাইক নেতা সহদেব দিল্লির সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। যোগ্যতা ও গুণানুযায়ী বাঙালি হিন্দুরা সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'পঞ্চদশ শতকে বাংলার প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু কর্মচারীরা বাংলায় ভূমিভিত্তিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে।' এই হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠী দরবারি রাজনীতি ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে। পরিণতিতে দেখা যায় হিন্দুরাজা

গণেশের বাংলার শাসক হিসাবে উত্থান। ইলিয়াস শাহী আমলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য; উদার রাষ্ট্রনীতি, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ইত্যাদির ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দীনেশচন্দ্র সেন, তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে এই পরিবেশের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। 'মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মজজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। ......এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন, বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল।' এই সময় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাঙালি বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে বাংলার খ্যাতি সারা ভারতে তো বটেই এমনকি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুলতানেরা যেমন স্বদেশে জৌনপুরের রাজদরবারে এবং দিল্লির দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন তেমনি আরবদেশের মক্কা ও চীনদেশের সঙ্গে দূত বিনিময় করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। আজম শাহের আমলে চীনা দূত মা-হুয়ান এসেছিলেন, তাঁর লেখা থেকে বাংলার অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় জানা যায়। ইবন বতুতাও এই সময়ে বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিবরণ থেকে জানা যায় বহির্বিশ্বে বাংলায় বয়নশিল্পের খ্যাতির কথা ও জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক কম দামের কথা।

২খ.৪.২ সাহিত্য

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালের গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে। সুলতানদের প্রচেষ্টায় লক্ষণাবতী, গৌড় ও পাণ্ডুয়া বাংলার সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে পরিণত হয়। ইলিয়াসে শাহী বংশের প্রথম তিনজন সুলতান এবং পরবর্তী ইলিয়াসে শাহী বংশের বরবক শাহ—প্রত্যেকে বিদ্যোৎসাহী এবং পণ্ডিত ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তাঁর স্ব-রচিত কবিতার একটি পংক্তি পূরণের জন্যে ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজের কাছে পাঠান এবং হাফিজ তা পূরণ করে পাঠিয়ে দেন। বরবক শাহের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে 'অল্-ফাজিল' ও 'অল-কামিল'-এই দু'টি উপাধি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করা হ'ত। এই সময় চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির আবির্ভাব হয়েছিল। কৃত্তিবাস জানিয়েছেন যে, তিনি গৌড়াধিপতির নির্দেশে রামায়ণ রচনা করেছেন। সম্প্রতি সুলতান বরবক শাহের নির্দেশেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর লেখক মালাধর বসুকে বরবক শাহ গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন। জালালউদ্দিনের আমলে বৃহস্পতি মিত্রের মতো মহাপণ্ডিত সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে চর্যাপদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এ বাংলা ভাষার উত্তরণ ঘটেছিল।

২খ.৪.৩ শিল্প-স্থাপত্য

কেবলমাত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয় এই সময় শিল্প ও স্থাপত্যে স্বতন্ত্র এক ধরনের বাঙালি ঘরানার সৃষ্টি হয়। ইট ও পাথর মিশিয়ে ছোট ছোট স্তম্ভের ওপর গম্বুজ নির্মাণ ও দোচালা ও চারচালা বিশিষ্ট কুটিরের আদলে মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মাণ স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন রীতির প্রচলন করেছিল। সুলতান সিকন্দর শাহ নির্মিত আদিনা মসজিদ এই শিল্পরীতির উদাহরণ। ভারতবর্ষে এতবড় মসজিদ আর কখনও নির্মিত হয়নি। এই মসজিদ দামাস্কাসের মসজিদের সঙ্গে তুলনীয়। এই মসজিদের ভেতরে সমবেত প্রার্থনাগৃহ স্থাপত্য-সৌন্দর্যে

অসাধারণ। পার্সী ব্রাউন এই মসজিদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই আমলে তৈরি গৌড়ের বিখ্যাত লোটন মসজিদ, রামকোটি মসজিদ ও তাঁতিপাড়া মসজিদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফ্রাঙ্কলিন লোটন মসজিদের শিল্প-সুষমার প্রশংসা করেছেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

২খ.৫ হুসেন শাহী বংশ

হাবসী রাজত্বের বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে হুসেন শাহ (১৪৯৪—১৫১৯) বাংলায় হুসেন শাহ বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। এই বংশ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করে এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য গৌরবময় অবদান রাখেন। ইলিয়াস শাহীরা রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, তা হুসেন শাহী আমলে অব্যাহত ছিল।

২খ.৫.১ হুসেন শাহর প্রথম জীবন

হুসেন শাহের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের বিবরণ চালু রয়েছে। কেউ কেউ বলেন তিনি আরবদেশ থেকে এসেছিলেন। আবার স্থানীয় কাহিনী অনুসারে তিনি রংপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁকে মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়ার লোক বলেও দাবি করা হয়েছে। তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে কিভাবে হাবসী শাসক মুজফ্‌ফর শাহের উজিরের স্থান লাভ করেছিলেন—এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হুসেন শাহ প্রথমেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর সিংহাসনারোহণের সুযোগ নিয়ে রাজধানীতে ব্যাপক লুঠপাঠ চলেছিল এবং সুলতানের নিষেধ অমান্য করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। সুলতানের আদেশে তাদের অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। পাইক সৈন্যদের মধ্যে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল তাদের তিনি বরখাস্ত করেন। পাইক বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তিনি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। হাবসীদের তিনি রাজ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করেন। হিন্দু ও মুসলিম অমাত্যদের আবার গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরিয়ে আনেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুলতান দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে নিজের শক্তি সংহত করেছিলেন। বংশের নিরাপত্তা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য হুসেন শাহুকে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির দিকে নজর দিতে হয়েছিল।

দিল্লির সুলতান সিকন্দর লোদীর সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য জৌনপুরের শর্কি সুলতানদের বিরোধের সূত্রে হুসেন শাহ ও দিল্লির সুলতানের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয়। জৌনপুরের শর্কি সুলতানকে বাংলায় আশ্রয় দেওয়ায় সিকন্দর লোদী বাংলার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হুসেন শাহ তাঁর পুত্র দানিয়েলকে দিল্লির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাঠালেন। উভয় বাহিনী বিহারের রাঢ় নামক স্থানে মুখোমুখি হল। কিছুদিন ঐ অবস্থায় থেকে উভয়পক্ষই যুদ্ধ না করে আপোষে বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য সন্ধি করল। এই সন্ধির ফলে উভয়পক্ষই অপরপক্ষের শত্রুকে ভবিষ্যতে আশ্রয় না দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। দিল্লির পরাক্রান্ত সুলতানের সঙ্গে এই সম্মানজনক সন্ধি হুসেন শাহের গৌরব বাড়িয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক আব্দুল করিম বাংলার সুলতান ও দিল্লির সুলতানের মধ্যে আদৌ কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল কিনা—এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে মুঙ্গের ও সারণ জেলায় প্রাপ্ত লিপি অনুসারে হুসেন শাহ সমগ্র উত্তর বিহার ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২খ.৫.২ হুসেন শাহর রাজ্যবিস্তার

হুসেন শাহ তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর থেকেই মুদ্রায় নিজেকে 'কামরূপ-কামতা-জাজনগর-উড়িষ্যা-বিজয়ী' বলে ঘোষণা করে—এই অঞ্চলগুলিকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করতে থাকেন। কামতা-কামরূপ রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সুলতানদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করে আসছিল। হাবসী শাসনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কামতার রাজা করতোয়া নদীর তীর বরাবর ঘোরাঘাট পর্যন্ত রাস্তা বানিয়েছিলেন। সামরিক প্রয়োজনে এই রাস্তা কাজে লাগানো হচ্ছিল। ফলে গৌড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কামতাপুরের খেন বংশীয় শাসক নীলাম্বরের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী নীলাম্বরের সঙ্গে বিরোধ করে তাঁর মন্ত্রী হুসেন শাহকে কামতাপুর আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী কৌশল অবলম্বন করে কামতাপুর রাজ্য দখল করে। হাজো পর্যন্ত তাদের দখলে চলে আসে। কামতা-কামরূপ অভিযান সফল হতে হুসেন শাহ আসাম ও উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিযান শুরু করেন। রিয়াজ-উস্ সালাতিনের মতে হুসেনের আসাম অভিযান প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। অসমীয়া বুরঞ্জীর বক্তব্য অনুসারে হুসেনের আসাম অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আসামের সৈন্যবাহিনী গৌড়ের বাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নিরুপায় হয়ে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। সমসাময়িক লেখকদের বিবরণ ও অসমীয়া বুরঞ্জীর বিবরণে কিছু পার্থক্য থাকলেও হুসেন শাহের আসাম জয়ের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

উড়িষ্যার সঙ্গেও হুসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়েছিল। হুসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, রিয়াদ-উস্-সালাতিন এবং ত্রিপুরার রাজমালার সাক্ষ্য অনুসারে হুসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন সূত্রমতে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র হুসেন শাহকে পরাজিত করেছিলেন। উড়িষ্যার সীমানা তখন সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সমগ্র মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার একাংশ উড়িষ্যার অধিকারে ছিল। জগন্নাথ মন্দিরের মাদলাপঞ্জী অনুযায়ী ১৫০৮-১৫০৯ সালে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী আরামবাগ জেলার মান্দারণ ঘাঁটি থেকে উড়িষ্যা অভিযান শুরু করেন। তিনি কটক জাজপুর ও অন্যান্য স্থান ও মন্দির লুণ্ঠন করে পুরী পৌঁছে যান। এই সাফল্যকে স্মরণ করে এই সময় গৌড়ীয় মুদ্রায় জাজনগর উড়িষ্যার নাম লেখা হয়। প্রতাপরুদ্রদেব ইসমাইল গাজীর এই অভিযানের খবর পেয়ে দক্ষিণ ভারত অভিযান স্থগিত রেখে দ্রুত সসৈন্যে ফিরে এসে বাংলার সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং তাদের মান্দারণ ঘাঁটি অবরোধ করেন। অবশ্য এই অবরোধ সফল হয়নি। দুপক্ষের কেউ সফল হতে পারেননি। চৈতন্যদেবের জীবনী লেখকেরা জানিয়েছেন যে, বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্ত-বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

হুসেন শাহ এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যেও অনেকদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল। বাংলার সুলতানদের সঙ্গে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে ত্রিপুরার সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ ত্রিপুরার কিছু অংশ দখল করেছিলেন। সুলতান হুসেন শাহ ত্রিপুরা দখল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লিখিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত রাজমালাতে বলা হয়েছে যে, হুসেন শাহ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পর পর চারটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হুসেন শাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিলেন বলে জানানো হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অভিযান চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানে হুসেন শাহের বাহিনী প্রাথমিক সাফল্য পেয়ে ত্রিপুরার রাজধানী রঙ্গমতীর দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতি সুকৌশলে বাংলার সৈন্যবাহিনীর গতিরোধ করে তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখার ফলে যে চড়া পড়ে, সেই চড়া অতিক্রম করে

হুসেন শাহী সৈন্যবাহিনী যখন এসেছিল তখন ত্রিপুরীরা বাঁধ কেটে নদীর জল ছেড়ে দেয়, ফলে সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ জলের তোড়ে ভেসে যায়। চতুর্থ অভিযানে কালিয়াগড় দুর্গের কাছে উভয়পক্ষে তীব্র যুদ্ধ হয় কিন্তু এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকে। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বলা যায় হুসেন শাহ ত্রিপুরাকে পদানত করতে পারেননি। সোনারগাঁও-এর লিপির ওপর ভরসা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, সুলতান ত্রিপুরার একাংশ দখল করতে পেরেছিলেন। এই বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

হুসেন শাহ আরাকানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। গৌড়-ত্রিপুরার সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে আরাকান অধিপতি চট্টগ্রাম দখল করে নিয়েছিলেন। আরাকান অধিপতি নিজের স্বার্থে গৌড়ের বিরুদ্ধে ত্রিপুরারাজ ধনমানিক্যকে সাহায্য করেছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরগল খাঁ এবং পরে তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মগেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম হুসেন শাহের করতলগত হয়। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী ডি বরোজ জানিয়েছেন যে, চট্টগ্রাম বাংলার সুলতানের অধিকারে ছিল ও আরাকানের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

হুসেন শাহের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে তিনি বাংলাকে রক্ষা করেন। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাতে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়। দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশের সীমানাও চতুর্দিকে বাড়াতে পেরেছিলেন। সারাজীবন তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি, চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন তাঁর রাজত্বকালের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত যশোরাজ খানের মতো সাহিত্যিক এই সময়ের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরগল খান পরমেশ্বরকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করতে বলেছিলেন। তাঁর পুত্র ছুটি খানের উৎসাহে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেছিলেন। সুলতান ও তাঁর আমলাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের মতো হুসেন শাহ যোগ্য হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন। রূপ সাকর মালিকের পদে আসীন ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা সনাতন ছিলেন সুলতানের দবিরখাস। গোপীনাথ বসু ও মুকুন্দদাস ছিলেন যথাক্রমে সুলতানের মন্ত্রী ও চিকিৎসক। দেহরক্ষী ছিলেন কেশবচন্দ্র ছত্রী এবং টাঁকশালের প্রধান ছিলেন অনুপ। সুলতান চৈতন্যদেবকে যেমন শ্রদ্ধা দেখাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি মুসলমান শেখ ও সুফীরাও সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। লোকপ্রিয় এই সুলতানকে সঙ্গত কারণেই লোকেরা 'নৃপতিকুল তিলক' ও 'জগৎভূষণ' নামে অভিহিত করেছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় হুসেন শাহের কৃতিত্ব বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হুসেন শাহের ধর্মীয় উদারতা এবং সাহিত্যপ্রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বকে খাটো করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের গ্রন্থ, 'দুশ বছরের স্বাধীন বাংলার ইতিহাস'-এ একইভাবে হুসেন শাহের সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যে তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সবদিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহের রাজত্বকাল নানাদিক দিয়ে স্মরণীয় এবং গৌরবোজ্জ্বল।

২খ.৫.৩ হুসেন শাহী বংশ : নসরৎ শাহ

হুসেন শাহ মারা যাবার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২) বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার মতই দক্ষ প্রশাসক ও সমরবিদ্ ছিলেন। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তার নীতি তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। নসরৎ শাহের সময় উত্তর ভারতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হচ্ছিল। মুঘল বাবরের

ভারত আক্রমণ এবং ইব্রাহিম লোদীর প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যে রাজনৈতিক ঘূর্ণচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল—তার মধ্যে নসরৎ শাহকেও পড়তে হয়েছিল। তিনি অবশ্য দক্ষতার সঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। মুঘল আক্রমণের পূর্বেই পূর্ব ভারতের আফগানদের সঙ্গে দিল্লির সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর সংঘর্ষ চলছিল। এই বিবাদের সুযোগ নিয়ে তিনি ত্রিহুত দখল করেন। প্রথম পাণিপথের যুদ্ধের পর বাবর দিল্লি ও আগ্রা দখল করে আফগানদের দোয়াব অঞ্চল থেকেও বিতাড়িত করেন। নসরৎ শাহের পক্ষে বাবর ও আফগান এই দুই শক্তির হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। কূটনীতির সাহায্যে তিনি বাবর ও আফগান শক্তিকে কিছু সময় দূরে রাখতে পারলেও বাবরের সঙ্গে ঘর্ঘরার যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান ও বাংলার বাহিনী পরাজিত হয়। নসরৎ শাহ অত্যন্ত দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বাবরের সঙ্গে সন্ধি করলেন। বাংলা রক্ষা পায়। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের তোড়জোড় করলে নসরৎ শাহ মুঘলদের পরম শত্রু গুজরাটের বাহাদুর শাহের কাছে দূত পাঠিয়ে মৈত্রী-বন্ধনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহে তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক। তবে মৈত্রী-বন্ধনের পূর্বেই নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ত্রিপুরা এবং আসামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

নসরৎ শাহ তাঁর পিতার অনুসৃত উদার নীতি প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। সরকারি কাজে ও সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দিয়েছিলেন। সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। উচ্চপদস্থ কর্মী কবিরঞ্জনের লেখায় সুলতান নসরৎ শাহের সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে ১৫২৬ সালে গৌড়ে বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ তৈরি হয়। গৌড়ের সমস্ত মসজিদের চেয়ে এই মসজিদ আয়তনের বড় ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রমাণ মেলে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও শহর এবং গঞ্জে নির্মিত মসজিদ ও সৌধের স্থাপত্যে। এই প্রসঙ্গে ১৫২৯ সালে সাতগাঁওতে, ১৫২৩ সালে সোনারগাঁওতে এবং ১৫২৪ সালে অজয় নদীর তীরবর্তী মঙ্গলকোটে নির্মিত মসজিদের নাম করা যায়।

২খ.৫.৪ হুসেন শাহী বংশের অবক্ষয়

নসরৎ শাহের মৃত্যুকালে হুসেন শাহী বংশের দ্রুত অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। গিয়াসউদ্দিন মাসুদ শাহের আমলে এই বংশের পতন ঘটে। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ বাংলার এক জমিদার গোষ্ঠীর সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করলে পিতৃব্য মাসুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮) তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। হুসেন শাহ গুণসরৎ শাহ অভিজাতদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু রাজপরিবারে ক্ষমতার লড়াইয়ে তারা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সীমান্তের শাসনকর্তারা স্বাধীন আচরণ শুরু করেন। উত্তর-পশ্চিমে হাজীপুরের শাসনকর্তা মকদুম আলম বিরোধী হয়ে শের খাঁ শূরের দলে যোগ দেন। বিহারে শের খাঁর নেতৃত্বে বাংলার পক্ষে বিপজ্জনক এক শক্তিজোটের উদ্ভব হয়। শের খাঁ প্রথমবার বাংলা আক্রমণ করলে ভীতসন্ত্রস্ত মাসুদ শাহ প্রচুর অর্থসম্পদ ক্ষতিপূরণ দিয়ে শের খাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু শের খান দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করলে মাসুদ শাহ পালিয়ে গিয়ে সম্রাট হুমায়ুনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শের খাঁ মাসুদ শাহের দুই পুত্রকে হত্যা করে বাংলা দখল করেন। এই ঘটনার পর মাসুদ শাহ দেহত্যাগ করেন। বাংলায় হুসেন শাহী বংশের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

২খ.৫.৫ বঙ্গ জীবনে হুসেন শাহী বংশের অবদান

বঙ্গজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হুসেন শাহী বংশের শাসনকাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছে। রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ ইত্যাদি বিভাগের কথা লোকে একেবারে ভুলে না গেলেও বাংলাদেশ বলতে এই সময় চট্টগ্রাম থেকে মান্দারণ, বঙ্গোপসাগর থেকে আসামের পার্বত্য এলাকার সীমা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকেই বোঝানো হ'ত। আফগান ও মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুলতানদের সংগ্রামের সঙ্গে বাঙালির সংহতির বোধও জড়িয়েছিল। আপামর বাঙালি হুসেন শাহ তার উত্তরাধিকারীর সমর্থনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের আমলে বাংলায় যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, যথাযথ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে তাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশাসনিক কাঠামোতে হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে, দেশ প্রভূত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ বাংলা ও বাঙালির জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাকে অনেকেই ইউরোপীয় রেনেশাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঐতিহাসিক তরফদার সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেশাঁসের কথা বলেছেন।

হুসেন শাহীরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই নীতি গ্রহণ অপরিহার্য ছিল। বাংলা ছিল শত্রু পরিবেষ্টিত। দিল্লিতে লোদী বংশের পতনের পর মুঘলদের আবির্ভাব বাংলার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর হুসেন শাহীদের নির্ভর করতে হয়। হুসেন শাহীদের মনে কোন বহির্ভারতীয় প্রেম বা আনুগত্য ছিল না। তাঁরা বাংলাকে ভালবেসেছিলেন, বাংলার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উদার রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার সম্ভব হয়েছিল। এই যুগেই হিন্দু ও মুসলিম মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে এবং দুই সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় বাঙালি সংস্কৃতি বিশিষ্টতা লাভ করে।

উত্তর ভারতের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বাংলা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছিল। ঐতিহাসিক আবদুল করিম বলেছেন যে, হুসেন শাহী যুগের শাসকরা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জনসংযোগের এই মাধ্যমকে জনপ্রিয়তার অন্যতম বাহন বলে মনে করতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী ও স্থানীয় সাহিত্যের বিকাশে সুলতানি ও তাদের হিন্দু-মুসলমান প্রশাসকদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এই যুগে ফার্সী ও আরবি ভাষাও অবহেলিত হয়নি। সকল ধর্মের প্রতি উদারতা ও সমন্বয় নীতি এ যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সহজ করেছিল। মনসামঙ্গলের লেখক বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক' বলে অভিহিত করেছেন। কবি যশোরাজ, দ্বিজ বিপ্রদাস প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকেরা হুসেন শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সাহিত্যচর্চার বাতাবরণে সংস্কৃত সাহিত্যও গুরুত্ব পেয়েছিল। সংস্কৃতি সাহিত্যের এই সময়ে মূলত চৈতন্যজীবনী ও রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনী কেন্দ্রিক ছিল। এই প্রসঙ্গে মুরারী গুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃত এবং রূপ গোস্বামীর রাধাকৃষ্ণ লীলা নিয়ে দানকেলী কৌমুদী, ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকগুলির নাম করা যায়। এই যুগে নব্যন্যায় চর্চা, রঘুনন্দনের ধর্মবিষয়ক আলোচনা, রঘুনাথ শিরোমণির তর্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন হয়। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতেরা প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা ও নিয়মগুলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাতে ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাঠামোটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও হুসেন শাহী বংশের অবদান কম নয়। ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলাদেশে শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে বাঙালি বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল, সেই ধারা হুসেন শাহী আমলে অব্যাহত থাকে। তবে এই সময় প্রচলিত শিল্পধারার মধ্যে অলঙ্করণের প্রবর্তন করা হয়েছিল। হুসেন শাহী বংশের শিল্প-স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, নতুন মসজিদ, কদমরসুল, দাখিল দরওয়াজা, একলাখি সমাধি মন্দির প্রভৃতির নাম করা যায়। হুসেন শাহী আমলে যে সব স্থাপত্যশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তাদের গঠন-বৈচিত্র্যে নতুনত্বের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না, তবে অলঙ্করণের মধ্যে বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। হুসেন শাহী আমলে ইঁট ও পাথর দিয়ে তৈরি—ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এই আমলে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বাইরেও মসজিদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। পার্সী ব্রাউন হুসেন শাহী বংশের শিল্প-স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি বিচার করে বলেছেন যে, এদের শিল্পকলাকে খুব উচ্চশ্রেণীর না বলা গেলেও এর গঠনাকৃতিতে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের এক নতুন ধারা দেখা যায়। বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা স্থাপত্যালঙ্কারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে। চালারীতির সহজবোধ্য সরল রূপের রমনীয়তা বাংলার মসজিদের অন্যতম চরিত্র- লক্ষণ।

প্রান্তলিপি

বাংলার স্বাধীন সুলতানি বংশ

(ক) ইলিয়াস শাহী বংশ-লতিকা (প্রথম পর্যায়)	***(খ) রাজা গণেশের বংশ-লতিকা***
(১) শামসুদ্দিন ইলিয়াস (১৩৩৯-৫৯)	*(১) রাজা গণেশ (আঃ ১৪১৫)*
(২) সিকান্দার (১৩৫৯-৮৯)	*(২) জালালউদ্দিন মহম্মদ (১৪১৫-৩১)*
(৩) গিয়াসুদ্দিন আজম (আঃ ১৩৮৯-১৪১০)	*(৩) শামসুদ্দিন আহমদ (১৪৩১-৩৫)*
(৪) সৈয়ফুদ্দিন হামজা (১৪১০-১২)	
(৫) শিহাবুদ্দিন বৈয়াজিদ্ (১৪১৩-১৪)	
(৬) আলাউদ্দিন ফিরোজ (১৪১৪-১৫)	
(গ) ইলিয়াস শাহী বংশ (দ্বিতীয় পর্যায়)	***(ঘ) আবিসিনীয় শাসন***
(১) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৩৭-৫৯)	*(১) সৈফউদ্দিন ফিরোজ (১৪৮৭-৯০)*
(২) রুকনুদ্দিন বরবক (১৪৫৯-৭৪)	*(২) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৯০-১৪৯১)*
(৩) শামস্উদ্দিন ইউসুফ (১৪৭৪-৮১)	*(৩) শামসুদ্দিন মুজফ্ফর (১৪৯১-৯৩)*
(৪) জালালউদ্দিন ফতথ্ (১৪৮১-৮৭)	
(ঙ) হুসেন শাহী বংশ-লতিকা	
(১) আলাউদ্দিন হুসেন (১৪৯৩-১৫১৯)	*(৪) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ (১৫৩৩-৩৮)*
(২) নসরৎ (১৫১৯-৩২)	
(৩) আলাউদ্দিন ফিরোজ (১৫৩২-৩১)	

সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে হুসেন শাহী বংশের গৌরবজনক ভূমিকা সম্ভব হয়েছিল সেই সময় বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য। বাংলার সমৃদ্ধির কারণ বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি ও আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। বহুলোক কারিগর ও শিল্পী হিসাবে শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। বাঙালি শিল্পীর দক্ষতা দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিল। বাংলার মসলিন পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। দেশে প্রচুর রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। বাংলায় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল লবণ ও দামী হীরা-জহরৎ এবং রপ্তানির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল চাল, গম,

তুলা, বস্ত্র, চিনি এবং রেশমবস্ত্র। বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের ফলে প্রচুর সোনার আমদানি হয়েছিল বাংলায়। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণে এবং এই সময়ের প্রবাদ ও প্রচলিত কাহিনীতে বাংলার সওদাগরদের বিদেশযাত্রার কথা বলা হয়েছে। এই সময় পর্তুগীজ বণিকেরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের আমলে পর্তুগীজরা খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি। তাদের আচার-আচরণ, দুর্ব্যবহার এবং জলদস্যুতার জন্য সুলতানেরা এদের কড়া শাসনে রেখেছিলেন। পর্তুগীজরা এই বংশের রাজত্বের শেষদিকে চট্টগ্রাম, সাতগাঁও অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ ও শুল্ক আদায়ের অধিকার পেয়েছিল। পর্তুগীজ বারোসের মতে, গৌড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিপণ্যের প্রাচুর্যও বিদেশি ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চীনা পর্যটকেরা পোষাকে ও অলঙ্কারে বাঙালিদের জাঁকজমক দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে কবিকঙ্কন চণ্ডী ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় সাহিত্য-পাঠে জানা যায় যে প্রাচুর্যের পাশাপাশি ছিল দারিদ্র্য ও অনটন। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ-দুর্দশার বর্ণনায় সাধারণ মানুষের দিনযাপনের কষ্টের প্রতিফলন দেখা যায়। সবদিক থেকে বিচার করলে হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

২খ.৬ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অবনতি ও ভাঙ্গনের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে বাহমনী রাজ্যেরও জন্ম হয়। এই দু'টি রাজ্যই দু'শ বছরের অধিক কাল ধরে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে। উত্তর ভারতে যখন রাজনৈতিক অনৈক্যের ছবি স্পষ্ট তখন দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়ী শক্তিশালী বিজয়নগরের অস্তিত্ব ছিল। স্থায়ী শান্তিরক্ষা, অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য ও সর্বোপরি দেশজুড়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে বিজয়নগর সাম্রাজ্য মধ্যযুগের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে প্রতিবেশী বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামে বিজয়নগর ও বাহমনী উভয় রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে। বাহমনী রাজ্য ভেঙ্গে যে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলির সঙ্গে তালিকোটা পানিহাট্টির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত হতে পারেননি। ঐতিহাসিক সিওয়েল (Sewell) বিভিন্ন প্রচলিত মতের উল্লেখ করে সঙ্গমের পাঁচ পুত্রের বিশেষ করে হরিহর ও বুক্কার প্রয়াসের ফলে বিজয়নগর স্থাপিত হয়েছিল বলে অভিমত দিয়েছেন। দেবগিরির যাদববংশীয় সঙ্গমের পুত্র হরিহর ও বুক্কাকেই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা হয়। বিজয়নগর শহরটি তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে স্থাপিত হয়। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে হরিহর ও বুক্কা ছিলেন বরঙ্গলের কাকতীয়-বংশীয় শাসকদের অধীনে সামন্ত। পরে তাঁরা বর্তমান কর্ণাটকের অন্তর্গত কাম্পিলি রাজ্যের মন্ত্রীপদে বৃত হয়েছিলেন। এক মুসলমান বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মহম্মদ-বিন-তুঘলক যখন কাম্পিলি রাজ্য দখল করেন তখন এই দুই ভাই বন্দী হ'ন। হরিহর ও বুক্কাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়। এই সময় মাদুরাই-এর মুসলিম শাসক নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং মহীশূরের হোয়সাল এবং বরঙ্গলের কাকতীয় শাসকেরাও নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এদিক হরিহর ও বুক্কা গুরু বিদ্যারণের অনুরোধে পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে হরিহরের রাজ্যাভিষেক হয়।

দিল্লিতে তুঘলক শাসনের অবসানে দক্ষিণ ভারতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুরনো রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরের হোয়সাল-বংশের শাসন বজায় থাকে কিন্তু বেশ কিছু নতুন স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে মাদুরাই-এর সুলতানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বরঙ্গলের ভালেমা এবং তেলেঙ্গানায় রেড্ডীদের শাসন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। বিজয়নগরের উত্তরদিকে শক্তিশালী বাহমনী রাজ্যের উত্থান হয়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে। যে যার সুবিধেমত একে অন্যের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। মাদুরাইয়ের সুলতানের সঙ্গে হোয়সাল শাসক তৃতীয় বল্লালের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে হোয়সালরাজের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হরিহর এবং তার ভাইয়েরা আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে এবং সমগ্র হোয়সাল রাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইবার মাদুরাইয়ের সুলতানেরা প্রায় চারদশক ধরে বিজয়নগরের সঙ্গে লড়াই চালায়। ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মাদুরাই বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণে তামিল ও চের (কেরালা) সহ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। রাজ্যের উত্তরে অবশ্য বিজয়নগরকে এক শক্তিশালী শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়। এই শত্রু হল মুসলিম শাসিত বাহমনী রাজ্য। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান নামে এক আফগান বীর বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে লড়াই চলে তার পেছনে যেমন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল তেমন দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল দখলে রাখার অর্থনৈতিক কারণও ছিল। তুঙ্গভদ্রা-দোয়াব, কৃষ্ণা-গোদাবরীর বদ্বীপ অঞ্চল এবং মারাঠাওয়াড়া দেশ—এই তিনটি পৃথক ও সুস্পষ্ট অঞ্চলে স্বার্থ নিয়ে বিজয়নগর শাসক ও বাহমনী সুলতানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তুঙ্গভদ্রা দোয়াব ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। অর্থনৈতিক সম্পদ নিয়ে এই অঞ্চলে পূর্বে পশ্চিম চালুক্য এবং চোলদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে যাদব ও হোয়সালদের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে। কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকা অত্যন্ত উর্বর এবং অনেকগুলি বন্দর থাকায় এই অঞ্চলের বহির্বাণিজ্যের ওপরও এর কর্তৃত্ব ছিল। বেশিরভাগ সময় তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াবের সংগ্রামের সঙ্গে কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম যুক্ত হয়ে পড়ত। মারাঠাওয়াড়া বা মারাঠা দেশে বিরোধের প্রধান কারণ ছিল কোঙ্কন (পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশ) ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে। গোয়া বন্দরটি ছিল এই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করার এবং ইরান ও ইরাক থেকে ঘোড়া আমদানি করার প্রধান কেন্দ্র ছিল গোয়া।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত দু'টি রাজ্যে সামরিক সংঘর্ষ চলেছিল। এই সংঘর্ষের ফলে যুদ্ধক্ষেত্র সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত, বহুলোক প্রাণ হারাত এবং প্রভুত সম্পদ নষ্ট হত। উভয়পক্ষই চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা দেখাত। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে বন্দী করে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করত। এই নিষ্ঠুরতার প্রমাণ মেলে প্রথম বুক্কার তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াবে মুদকল দুর্গ আক্রমণের সময়। একজন ছাড়া সমস্ত দুর্গবাসীকে হত্যা করা হয়। এই সংবাদ পেয়ে বাহমনী সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ বিজয়নগর আক্রমণ করে প্রায় একলক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণী অনুসারে প্রথম বুক্কাকে পরাজিত করে বাহমনী সুলতান বিজয়নগরে প্রবেশ করেছিলেন। উন্নততর গোলন্দাজ বাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যেই বাহমনী সুলতান জয়লাভ করেছিলেন। কয়েকমাস ধরে যুদ্ধ চললেও বিজয়নগরের রাজা বা তার রাজধানী সুলতান দখল করতে পারেননি। শেষে উভয়পক্ষ ক্লান্ত হয়ে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে প্রত্যেক রাজ্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং দোয়াব অঞ্চল দুপক্ষের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। সন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল কোন পক্ষ যুদ্ধে অসহায় নিরস্ত্র অধিবাসীকে হত্যা করবে না। মাঝে মধ্যে এই শর্ত লঙ্ঘিত হলেও এর মানবিক দিক যে সন্ধিতে গুরুত্ব পেয়েছিল সে কথা ভুললে চলবে না।

২খ.৭ সঙ্গম বংশ

প্রথম বুক্কার পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭-১৪০৬) বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য মাদুরাইয়ের সুলতানি ধ্বংস করে পূর্ব উপকূলের দিকে রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিন্দু রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে অবশ্যই খ্যাতমান ছিলেন রেড্ডিরা এবং বরঙ্গমের শাসকেরা। উত্তরে উড়িষ্যার শাসকদের এবং পূর্বে বাহমনী সুলতানদের এই অঞ্চলের উপর নজর ছিল। বরঙ্গলের রাজা দিল্লির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসানকে সাহায্য করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বংশধরেরা বরঙ্গালের কাছ থেকে কৌলুস ও গোলকোণ্ডার দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে বরঙ্গমের সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মিত্রতা পঞ্চাশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। এর ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্য তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াব অঞ্চলে সুদৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি বা এই অঞ্চলে বাহমনীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। বাহমনী-বরঙ্গল জোট সত্ত্বেও দ্বিতীয় হরিহর সাম্রাজ্যে নিজ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। তিনি বাহমনীদের কাছ থেকে পশ্চিমে বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করেন এবং উত্তর শ্রীলঙ্কায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন।

২খ.৭.১ প্রথম দেবরায়

১৪০৬ সালে দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যু হলে কিছুকাল বিশৃঙ্খলার পর তাঁর পুত্র প্রথম দেবরায় (১৪০৬-১৪২২) সিংহাসনে বসেন। রাজত্ব শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুঙ্গভদ্রা-দোয়াবের অধিকার নিয়ে বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। বাহমনী সুলতান ফিরোজ শাহ যুদ্ধে দেবরায়কে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। দেবরায়কে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হয় দশলক্ষ মুদ্রা, মুক্তা ও হস্তী। তিনি সুলতানের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন এবং ভবিষ্যতে বিরোধ যাতে আর না হয় সেইজন্য দোয়াব অঞ্চলের বাঁকাপুর বিবাহের যৌতুক হিসাবে সুলতানকে প্রদান করেন। তিনদিন ধরে বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত করেও এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকার প্রশ্নে-বিজয়নগর বাহমনী ও উড়িষ্যার মধ্যে নতুন করে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সময় রেড্ডি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রেড্ডি রাজ্যটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া যাবে—এই প্রস্তাব দিয়ে দেবরায় বরঙ্গালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। বাহমনী জোট থেকে বরঙ্গল বেরিয়ে আসায় দাক্ষিণাত্যে শক্তিসাম্যের পরিবর্তন হয়। বিজয়নগরের দিকে পাল্লা ভারি হল। দেবরায় ফিরোজ শাহকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চল নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

২খ.৭.২ দ্বিতীয় দেবরায়

কিছুদিন বিশৃঙ্খলার পর দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-১৪৪৬) সিংহাসনে বসেন। সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্যে তিনি সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক মুসলমান নিয়োগ করেন। ফিরিস্তা জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় দেবরায় বুঝেছিলেন যে বলিষ্ঠ ঘোড়া ও দক্ষ তীরন্দাজ থাকার জন্যেই বাহমনী সৈন্যবাহিনী এত শক্তিশালী হয়েছে। তাই তিনি সৈন্যবাহিনীতে মুসলমান নিয়োগ করে তাদের কাছ থেকে ধনুর্বিদ্যা শেখার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৈন্যবাহিনীর সংস্কার সাধন করলেও বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। নতুন সেনাবাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় দেবরায় তুঙ্গভদ্রা নদী পার হয়ে মুদকল, বাঁকাপুর প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই অঞ্চলগুলি ছিল কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে এবং বাহমনীদের অধীনে। দুই রাজ্যের মধ্যে তিনটি

তুমুল যুদ্ধ হয়। কারো পক্ষেই চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সম্মত হয়। দ্বিতীয় দেবরায় শ্রীলঙ্কা অভিযান করেছিলেন। ১৪২০ ও ১৪৪৩ সালে যথাক্রমে ইতালীয় পরিব্রাজক নিকোলো কন্তি এবং পারস্যের রাজদূত আব্দুর রজ্জাক বিজয়নগর পরিদর্শন করেছিলেন এবং তাঁরা উভয়েই এই রাজ্যের সমৃদ্ধির বর্ণনা করেছেন। ১৪৪৬ সালে দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সিংহাসনের দাবি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে পরপর কয়েকটি গৃহযুদ্ধ ঘটে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বিজয়নগরের সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে যায়। রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রকৃত অর্থে দেশের কর্ণধার হয়ে ওঠেন। রাজারা বিলাসব্যসনে ডুবে থাকতেন। বিজয়নগর রাজ্যের কর্তৃত্ব কর্ণাটক ও পশ্চিম-অন্ধ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে বিজয়নগর রাজ্যের সিংহাসন রাজমন্ত্রী নরসিংহ শালুভ অধিকার করেন। এইভাবে বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গম রাজবংশের অবসান ঘটে।

২খ.৭.৩ শালুভ বংশ (১৪৮৬-১৫০৩)

শালুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহ শালুভ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বাহমনী সুলতান ও উড়িষ্যার অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বিজয়নগরে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিজয়নগরে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ১৫০৫ সালে শালুভ বংশের শেষ নরপতিকে হত্যা করে বীর নরসিংহ বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শুরু হয় নতুন তুলুব বংশের রাজত্ব।

২খ.৮ তুলুব বংশ (১৫০৫-১৫৭০) : কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫৩০) তুলুব বংশের রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে বিজয়নগরের সকল বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি খুব দ্রুত দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বিজয়নগরের নিরাপত্তা বিধান করেন।

তাঁর সময়কালে বাহমনী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। বাহমনী সুলতানের ক্ষমতা কেবলমাত্র রাজধানী বিদর ও তার উপকণ্ঠে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৫২৬ সালে বাহমনী সাম্রাজ্য একেবারেই ভেঙে পড়ে এবং পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা—বেরার (ইমাদশাহী বংশ), আহমদনগর (নিজামশাহী বংশ), বিজাপুর (আদিলশাহী বংশ), গোলকুণ্ডা (কুতুবশাহী বংশ) এবং বিদর (বারিদশাহী বংশ)। কৃষ্ণদেব রায়কে বিজয়নগরের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী বাহমনী রাজ্য থেকে উদ্ভূত রাজ্যগুলির এবং উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। তাঁকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। এসময় পর্তুগীজরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। সমুদ্রের ওপর আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে তারা সমুদ্র উপকূলের বিজয়নগরের ছোট ছোট সামন্তরাজ্যকে বাগে আনতে চেষ্টা করত। তারা বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া পুনরুদ্ধার ও ঘোড়া সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার লাভের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজয়নগরের রাজাকে এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার প্রস্তাব দেয়। অসামান্য দক্ষতায় কৃষ্ণদেব রায় প্রতিবেশী রাজ্য ও পর্তুগীজদের মোকাবিলা করেছিলেন।

প্রায় সাত বছর ধরে উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়কে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল। উড়িষ্যার রাজাকে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল বিজয়নগরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। কৃষ্ণদেব

রায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে তুঙ্গাভদ্রা-দোয়াবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। বাহমনী-উড়িষ্যা-বিজয়নগরের মধ্যে এই অঞ্চল নিয়ে যে সংগ্রাম ইতিপূর্বে চলেছিল—সেই সংগ্রাম আবার নতুন করে দেখা দিল। বিজাপুর ও উড়িষ্যা দুটি প্রধান বিরোধী রাজ্য মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কৃষ্ণদেব রায় এই পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। রাইচুর ও মুদকল দখল করে কৃষ্ণদেব রায় প্রথম সংগ্রাম শুরু করেন। যুদ্ধে বিজাপুরের সুলতান পরাজিত হন। কোনরকমে কৃষ্ণানদী পার হয়ে বিজাপুরের সুলতান আত্মরক্ষা করেন। বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী বিজাপুর অধিকার করে লুণ্ঠন করে এবং সন্ধি স্থাপিত হবার পূর্বে গুলবর্গা ধ্বংস করে।

কৃষ্ণদেবের অধীনে বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কৃষ্ণদেব রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে মিত্রাতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পর্তুগীজরা আরব ও পারসিক বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল। ফলে মধ্যযুগের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আরব ও পারস্যের যুদ্ধের ঘোড়া বিদেশ থেকে সরবরাহের একচেটিয়া বাণিজ্য পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কৃষ্ণদেব রায় এই ঘোড়া পর্তুগীজদের কাছ থেকে কিনে নিতেন। বলা যায় তিনিই একমাত্র ক্রেতা ছিলেন। পর্তুগীজরাও তাঁর কাছ থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অজস্র নগর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে নানারকম সুযোগ-সুবিধে লাভের চেষ্টায় থাকতেন। তিনি পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ককে ভাটকলে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে পর্তুগীজরা গোয়া দখল করে নিলে তাদের অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজরা যখন গোয়ার নিকটবর্তী মূল ভূখণ্ড অধিকার করতে অগ্রসর হয়, তখন তিনি প্রতিবাদ করে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ছোট সৈন্যদল পাঠান। তবে তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় যোদ্ধা ও সেনানায়ক হিসাবে প্রতিভার স্বাক্ষর যেমন রেখেছিলেন, তেমনি শাসক হিসাবেও অসামান্য গুণের অধিকারী ছিলেন। পর্যটক পায়েস্ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন যে, তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী নৃপতি তৎকালে বিরল ছিল। তাঁর রাজসভায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর ছিল। তাঁর চরিত্রে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখা যায়। সর্বধর্মে সমভাব ও উদারতা, আহত সৈনিকদের পরিচর্যা, পরাজিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রজাসাধারণের প্রতি দাক্ষিণ্য, বিদেশি পর্যটকদের সমাদর, সুশাসন, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিনয় ইত্যাদি গুণের জন্য কৃষ্ণদেব রায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে সারা দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই সময় বিজয়নগর গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। তিনি বিজয়নগরের কাছে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন এবং এক বিরাট পুষ্করিণী খনন করেন। জলসেচের কাজে এই পুষ্করিণীকে কাজে লাগানো হত। তাঁর রাজ্যে ধর্মীয় উদারতার যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে পর্যটক বারকারোসা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন : 'রাজা সকলকে এতখানি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে তাঁর সাম্রাজ্যে যে কেউ আসতে পারত, এখান থেকে যেতে পারত এবং নিজ নিজ ধর্মপালন করে শান্তিতে বাস করতে পারত। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করত না যে সে খ্রিস্টান, ইহুদি বা ধর্মহীন ব্যক্তি কিনা।' বিজয়নগর রাজ্যে ন্যায়বিচার ও সমদর্শিতা প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণদেবের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

কৃষ্ণদেব রায় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ও কবি ছিলেন। সংস্কৃত সহ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার উন্নতির জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। বিশেষ করে তেলুগু সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ সুবিদিত এবং এর ফলে এই সাহিত্যের নবযুগের সূত্রপাত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ না করে তেলুগু ভাষার স্বাধীন রচনার সূত্রপাত হয়। তিনি 'আমুক্ত মাল্যাড়া' (Amukta-malyada) নামক কাব্যের রচয়িতা ছিলেন। 'অস্টদিগ্‌গজ' নামে খ্যাত আটজন বিখ্যাত তেলুগু কবি তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। কৃষ্ণদেব রায়ের সামরিক

ও প্রশাসনিক দক্ষতা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর জন্য তাঁর আমলে বিজয়নগর সাম্রাজ্য গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল।

২খ.৮.১ তুলুব বংশের পতন : তালিকোটার যুদ্ধ

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বাধে। শেষ পর্যন্ত সদাশিব রায় সিংহাসনে বসেন (১৫৪৩ খ্রিঃ) এবং ১৫৬৭ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু রাজ্য শাসনের আসল ক্ষমতা থাকে আরবিড়ু বংশীয় মন্ত্রী রামরায়ের হাতে। রামরায় দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে বিজয়নগরের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে তিনি বাণিজ্যিক চুক্তি করেন। ফলে বিজাপুরের সুলতানকে পর্তুগীজরা ঘোড়া সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বিজাপুর সুলতানকে পরাস্ত করেন। এইবার তিনি গোলকুণ্ডা ও আহমদনগরের বিরুদ্ধে বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। বিজয়নগরের প্রাধান্য বিস্তারে মুসলিম রাজ্যগুলির নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে দেখে নিজেদের বিরোধ মুলতুবী রেখে আহমদনগর, গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর জোটবদ্ধ হয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৫৬৫ খ্রিঃ তালিকোটার কাছে পাণিহাট্টিতে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে বিজয়নগর চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে তালিকোটার যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে রামরায় নিহত হন। বিজয়নগর সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তালিকোটার যুদ্ধের ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ-ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিনষ্ট হয়। বিজয়নগরের প্রাধান্য ধ্বংসের পর দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলি নিজেদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের শক্তিক্ষয় করতে থাকে। ফলে মুঘলদের পক্ষে এই অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন সহজ হয়েছিল।

তালিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। আরবিড়ু বংশের শাসকেরা আরো একশ বছর এই রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। কিন্তু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডসমূহ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। দক্ষিণভারতের রাজনীতিতে বিজয়নগরের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে না।

২খ.৯ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা রীতি অনুযায়ী রাজা স্বৈরাচারী ক্ষমতা ভোগ করতেন। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রশক্তির উৎস। জনকল্যাণের ওপর দৃষ্টি রেখে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পরিচালিত হ'ত। রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী ছিল না। বিজয়নগর রাজাদের রাজতন্ত্র সম্পর্কে এক উচ্চ ধারণা ছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁর রাষ্ট্রবিষয়ক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাজা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং নিজ শক্তি অনুসারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করবেন। তিনি যা দেখবেন বা শুনবেন তার কোনটিই উপেক্ষা করবেন না। প্রজাদের নিকট থেকে রাজা পরিমিত কর আদায় করবেন—এই উপদেশও তিনি দিয়েছেন।

বিজয়নগর রাজ্যে সম্রাটকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি মন্ত্রীসভা ছিল। রাজ্যের উচ্চ অভিজাতরাই মন্ত্রীসভার সদস্য হতেন। বিজয়নগর রাজ্য কয়েকটি মণ্ডলম্ বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মণ্ডলম্ আবার কয়েকটি নাড়ু বা জিলা এবং নাড়ু আবার স্থল বা মহকুমা এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, চোলদের মত গ্রাম্য-স্বায়ত্বশাসন ঐতিহ্য বিজয়নগর রাজ্যে প্রচলিত ছিল। গ্রামই ছিল শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে ছোট সংগঠন। এগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল গ্রাম্যসভার ওপর। গ্রাম্য-প্রধানগণ স্থানীয় বিচার ও শান্তিরক্ষার কাজ পরিচালনা করতেন। মহানায়কাচার্য নামে সরকারি কর্মচারী গ্রাম্যসভার কাজের ওপর নজর রাখতেন। কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিনিধি হিসাবে মহানায়াকাচার্যরা গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। গ্রামীণ স্বাধীনতা ও কর্মোদ্যোগ হ্রাস পেতে থাকে যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা নায়ক পদ বংশগত হয়ে যায়।

প্রতিটি প্রদেশ 'নায়ক' উপাধিকারী শাসনকর্তার হাতে ন্যস্ত থাকত। প্রথমদিকে রাজকুমাররা প্রদেশের শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত হতেন। পরে সামন্ত ও অভিজাত পরিবারের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া ছিল। তাঁদের নিজেদের দরবার ছিল, তাঁরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন এবং তাঁদের সেনাবাহিনীও ছিল। এঁদের কার্যকালের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। সামর্থ ও শক্তির ওপর তাঁদের কার্যকাল নির্ভর করত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা নতুন কর ধার্য করতে পারতেন এবং পুরাতন কর মকুব করতে পারতেন। তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হত। বিজয়নগর রাজ্যের যে আয় ছিল তার অর্ধেক পেত কেন্দ্রীয় সরকার।

বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা। রাজাকে বিচারকার্যে সাহায্যের জন্যে অন্যান্য বিচারকও নিযুক্ত হতেন। সারা দেশজুড়েই বিচারালয় ছিল। রাজা বিচারকদের নিযুক্ত করতেন। গ্রাম্য-প্রধানরা গ্রাম্য বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। গ্রাম্য বিচারের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় সংস্থার সাহায্যে বিচারকগণ এই নিষ্পত্তি করে দিতেন। দেশের রীতিনীতি, চিরাচরিত প্রথাই ছিল বিজয়নগরের আইন-ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। অপরাধীর কঠোর শাস্তি হত। মৃত্যুদণ্ড চালু ছিল।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এই অপ্রতিহত ক্ষমতাই কালক্রমে বিজয়নগরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

২খ.১০ বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিতে বিজয়নগর

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন। তাঁদের বর্ণনায় বিজয়নগরের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্তি ১৪২০ খ্রিঃ বিজয়নগর পরিভ্রমণে আসেন। তিনি বিজয়নগরের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। 'এই শহরটির পরিধি ছিল ষাট মাইল, এর প্রাচীর ছিল পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং পর্বতের পাদদেশে উপত্যকাগুলিও প্রাচীরবেষ্টিত।....এই শহরে নব্বই হাজার লোক ছিল যুদ্ধ করবার উপযুক্ত।....এখানকার রাজা ছিলেন ভারতের অন্য যে কোন রাজা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।' আব্দুর রজ্জাক দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে বিজয়নগর এসেছিলেন। এই শহর সম্বন্ধে আব্দুর রজ্জাক লিখেছেন : 'সারা পৃথিবীতে বিজয়নগরের মত শহর চোখে দেখিনি, কানেও শুনিনি। একটি প্রাচীরের মধ্যে আর একটি প্রাচীর তৈরি করে এরকম সাতটি প্রাচীর দিয়ে নগরটি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাচীর দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত। নগরের মধ্যস্থলে রয়েছে সপ্তম দুর্গটি—সপ্তম প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত।....রাজপ্রাসাদের নিকটেই চারটি বাজার—একটির বিপরীত দিকে আর একটি।....শহরে সবসময় টাটকা ফুল পাওয়া যায়, আর এই ফুল ছাড়া নগরের লোকেরা থাকতে পারে না বলে ফুলকে জীবনধারণের উপায় বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক পৃথক দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের দোকানগুলি পাশাপাশি থাকে। জহুরী খোলা বাজারেই তাদের মণিমুক্তা বিক্রয় করে।

রাজপ্রাসাদের মনোরম অঞ্চলে শানবাঁধানো মসৃণ খাল দিয়ে নদীর মত জলস্রোত প্রবাহিত হয়।....রাজার রাজকোষের কক্ষের গর্তগুলিতে সোনা জমাট বেঁধে সোনার পিণ্ডের আকারে থাকে।'

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বিজয়নগরের সঙ্গে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে। এই সূত্রে বিজয়নগরে পর্তুগীজ বণিকদের আগমন হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে দুইজন পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনগোস্ পায়েস ও ফেরনাও নুনিজ বিজয়নগরে আসেন। পায়েস-এর ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের বর্ণনা আর নুনিজের বর্ণনায় আছে ঐতিহাসিক ঘটনা।

বিজয়নগর সম্পর্কে পায়েস লিখেছেন, 'রাজপ্রাসাদটি একটি শক্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই ঘেরা জায়গাটির আয়তন লিসবনের সমস্ত দুর্গের আয়তনের চেয়ে বেশি।....এই নগরের লোকসংখ্যা অসংখ্য।....শহরটির আয়তন বিশাল।....শহরটি রোমনগরীয় মতই বড়, দেখতেও সুন্দর। এই শহরটির মত খাওয়া-পরার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন শহরে নেই। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।'

বিজয়নগর শহরটির বর্ণনাতে ঐ সময়কার শান্তি ও সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। সমগ্র বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেরও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় পর্যটকদের বর্ণনাগুলি থেকে। অবশ্য পর্যটকদের লেখায় অতিরঞ্জনের প্রবণতা রয়েছে। অন্যান্য তথ্য ও লিপি ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা সম্ভব।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। পর্যটকেরা গ্রামীণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন না, ফলে তাঁদের বিবরণী থেকে স্পষ্ট ছবি পাওয়া শক্ত। তাঁরা গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে একটি সাধারণ চিত্র এঁকেছেন। এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকই কৃষিনির্ভর ছিল এবং গ্রামে বাস করত। জমির মালিকানা পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ছিল। অন্তত ছোটখাটো জমির মালিকানা পেতে কৃষকেরা চেষ্টা করত। রাজ্যের বহু জায়গায় কিছুকাল অন্তর-অন্তর চাষযোগ্য জমির পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল। এই সময় ভূমিহীন চাষীদের একাংশ ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। সমাজে প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন চাষীদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের কত অংশ রাজস্ব দিতে হতো জানা যায় না। এক শিলালিপিতে নিম্নরূপ রাজস্বের হার দেওয়া হয়েছে :

শীতকালে কুরুভয়ি (একপ্রকার ধান) উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ তিল, রাগী, ছোলা প্রভৃতির এক-চতুর্থাংশ। জোয়ার ও শুকনো জমিতে উৎপন্ন অন্যান্য শস্যের এক-ষষ্ঠ্যাংশ, কাজেই শস্যভেদে, মৃত্তিকাভেদে, জলসেচভেদে রাজস্বের হার বিভিন্ন রকমের ছিল।

ভূমিরাজস্ব ব্যতীত প্রজাদের অন্যান্য কর দিতে হ'ত, যেমন—সম্পদ কর, বিক্রয় কর, পেশা কর, সামরিক কর, বিবাহ কর ইত্যাদি। ষোলো শতকের পর্যটক নিকিতিন জানিয়েছেন যে, 'রাজ্যে বহু লোকের বাস ছিল। পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা ছিল শোচনীয় কিন্তু অভিজাতরা ছিলেন অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও বিলাসিতায় তৃপ্ত'। অবশ্য এই ধরনের সাধারণ বিবৃতি মধ্যযুগের যে কোন দেশ সম্বন্ধেই খাটে।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজয়নগর প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শিল্পোৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। ভ্রাম্যমান বণিক ও বণিকসংঘগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন প্রধান শিল্পগুলির অন্যতম ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন বন্দর থেকে নানা ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্রের রপ্তানির কথা বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। ধাতুশিল্প ও অলঙ্কার নির্মাণশৈলী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। লবণ উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ছিল সরকারের এবং এর ফলে সরকারের প্রচুর লাভ হ'ত। বস্ত্রবয়ন, ধাতুশিল্প, খনিজ শিল্পের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদন। বণিক সংঘগুলির ভূমিকার কথা আব্দুর রজ্জাক ও পায়েস্ উভয়েই বলেছেন।

বাণিজ্যের জন্যে বিজয়নগর রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বন্দর ছিল। মালাবার উপকূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, কালিকট। আফ্রিকা ও আরব দেশগুলির পক্ষে কালিকট ছিল নিরাপদ পোতাশ্রয়। ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, চীন, আরবদেশ, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ও পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বিজয়নগরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কাপড়, চাল, লোহা, সোরা, চিনি, মশলাপাতি রপ্তানি হত। বিজয়নগর বিদেশ থেকে আমদানি করত ঘোড়া, হাতি, মুক্তা, তামা, গালা, পারদ, চীনাসিল্ক প্রভৃতি। বাণিজ্যিক পণ্যের পরিবহন করা হ'ত জাহাজে। বার্বোসা বলেছেন, মালদ্বীপে জাহাজ নির্মাণ করা হত।

বিজয়নগরে সোনা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। অল্পসংখ্যক রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনও ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারী হওয়ায় নানাধরনের মুদ্রা চালু ছিল। বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা চালু থাকায় অসুবিধের সৃষ্টি হ'ত।

বিজয়নগরের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও বিদেশিদের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণভিত্তিক সামাজিক কাঠামো বিজয়নগরে প্রচলিত ছিল। সঙ্গত কারণেই ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মহিলারা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতেন। নুনিজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহিলারা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দপ্তরে চাকরিতে নিযুক্ত হতেন। বাল্যবিবাহ ও পুরুষদের বহুবিবাহ এ যুগে বিজয়নগরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথাও চালু ছিল। বিজয়নগরে ইউরোপীয় পর্যটকেরা অবাক হয়েছিল রাজাদের অসংখ্য পত্নী দেখে। নিকোলো কন্তি রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের রানীদের সম্পর্কে লিখেছেন—'তাঁর বারো হাজার পত্নী, তাদের মধ্যে চার হাজার তিনি যেখানেই যান তাঁর সঙ্গে হেঁটে যান।' আব্দুর রজ্জাক লিখেছেন—দ্বিতীয় দেবরায়ের অন্তঃপুরে ছিল সাতশ' রানী ও উপপত্নী। আব্দুর রজ্জাক ও পায়েস জানিয়েছেন বিজয়নগরে গণিকাবৃত্তি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। গণিকারা যে কোন সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত এবং সম্মান আদায় করে নিত। মন্দিরগুলিতে দেবদাসী প্রথা চালু থাকার কথাও পর্যটকেরা বলেছেন।

পর্যটকেরা বিজয়নগরের বেশ কয়েকটি উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে রথযাত্রা উৎসব, নববর্ষ ও মহানবমী উৎসব প্রধান। উৎসবে রাজপরিবার অমাত্য ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করত।

বিজয়নগরের প্রজাসাধারণের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে পর্যটকেরা জানিয়েছেন যে, তারা খালি পায়ে সাধারণত চলাফেরা করত এবং কোমরের উপরিভাগে পরনে তাদের কিছুই থাকত না। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা কখনো দামি জুতো পরত, তাদের মাথায় থাকত সিল্কের পাগড়ী, কিন্তু কোমরের উপরিভাগে তারাও কিছু পরত না। সকল শ্রেণীর লোকেরা অলঙ্কার পরতে ভালবাসত।

বিজয়নগর সাম্রাজ্য শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তেলুগু, তামিল ও কন্নড় ভাষা তাঁদের বদান্যতায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে। বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন ও তাঁর ভাই মাধব বিদ্যারণ্য বুক্কার রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। কৃষ্ণদেবের আমলে দক্ষিণ ভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছিল। তাঁর সভায় অষ্টদিগ্‌গজ নামে আটজন পণ্ডিত উপস্থিত থাকতেন। স্থাপত্যশিল্পেও বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যে এক বিশেষ স্থাপত্য-রীতির প্রচলন করেছিল। ড. এস. কে. সরস্বতী বিজয়নগরের প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির সৌন্দর্য বিচার করতে গিয়ে বলেছেন যে, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যশিল্প উভয়েরই অলংকরণ অত্যন্ত শিল্পরীতি সম্পন্ন ছিল। এ প্রসঙ্গে হাজারা

মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্যশিল্পের মত সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পও শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সময়কালে দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃতির এক সমন্বিত রূপ দেখা গিয়েছিল।

২খ.১১ অনুশীলনী

(ক)

১। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের অবদান আলোচনা করুন।

২। বাংলার ইতিহাসে হুসেন শাহী বংশের গুরুত্ব বিষয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমলে কিভাবে হিন্দুরাজা গণেশ এবং আবিসিনিয় শাসকের আবির্ভাব হয়েছিল? কেন এই দুই বংশের পতন হয়েছিল?

৪। বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের মধ্যে সংগ্রামের পটভূমিকা ও গুরত্ব আলোচনা করুন।

৫। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যালোচনা করুন।

(খ)

১। ইলিয়াস শাহ বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য কিভাবে এনেছিলেন?

২। ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বকালে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের বিবরণ দিন।

৩। হুসেন শাহের আমলে সাহিত্যচর্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪। বাংলায় স্বাধীন সুলতানির অবসান হয়েছিল কিভাবে?

৫। কোন পরিস্থিতিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬। কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৭। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বিজয়নগরের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা বর্ণনা করুন। এই বর্ণনা কি বিশ্বাসযোগ্য?

(গ)

১। মা হুয়ান কে ছিলেন? কার রাজত্বকালে তিনি বাংলায় এসেছিলেন?

২। যদু কে ছিলেন?

৩। 'একডালা' দুর্গ কি জন্যে বিখ্যাত?

৪। কোন দিল্লির সুলতান বাংলা আক্রমণ করে বিফল হয়েছিল?

৫। চৈতন্যদেব কার রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন?

৬। রূপ ও সনাতন কে ছিলেন?

৭। বিজয়নগর এসেছিলেন এমন দু'জন পর্তুগীজ পর্যটকের নাম লিখুন।

৮। তালিকোটার যুদ্ধ কেন বিখ্যাত?

২খ.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১। J. N. Sarkar (ed.) : *History of Bengal,* Vol. VI.

২। R. C. Majumdar (ed.) : *Delhi Sultanate.*

৩। আব্দুল করিম : *বাংলার ইতিহাস, সুলতানি যুগ।*

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) : *বাংলার ইতিহাস (মধ্যযুগ)।*

৫। অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত : *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি।*

৬। K. A. Nilkanta Sastri : *A History of South India.*

৭। Habib & Nizami (ed.) : *Comprehensive History of India,* Vol. V, *Delhi Sultanate,* 1970.

৮। Burson Stein : *Vijayanagar, The New Cambridge History of India,* 1997.

৯। ননীগোপাল চৌধুরী : *বিদেশী পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত।* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

১০। বৈদ্যনাথ বসু : *মধ্যযুগের ভারত* (অনুবাদ)।

একক ৩ক ❑ সুলতানি শাসনে কৃষি ও বাণিজ্য

গঠন

৩ক.০ উদ্দেশ্য
৩ক.১ প্রস্তাবনা
৩ক.২ সুলতানি শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩ক.৩ সুলতানি যুগের কৃষি-ব্যবস্থা
৩ক.৩.১ কৃষি উপাদান ও উৎপাদন
৩ক.৩.২ ভূমি রাজস্ব
৩ক.৩.৩ কৃষি সম্পর্ক
৩ক.৪ ইকতা প্রথা
৩ক.৫ শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের বিকাশ
৩ক.৬ বাণিজ্যের বিস্তার
৩ক.৬.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
৩ক.৬.২ বহির্বাণিজ্য
৩ক.৭ সারাংশ
৩ক.৮ অনুশীলনী
৩ক.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- তুর্কিদের পূর্বপরিচয় ও দিল্লি থেকে তুর্কি সুলতানদের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- সুলতানি আমলের আগে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা এবং সুলতানি আমলে ওই ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্তন হয়।
- ইক্তা প্রথা কাকে বলে এবং এই প্রথার বৈশিষ্ট্য।
- সুলতানি আমলে ভারতে ছোট-বড় শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের নানা দিক।
- সুলতানি যুগে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিস্তার এবং ঐ সময় জলপথে ও স্থলপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ।

৩ক.১ প্রস্তাবনা

আফগানিস্তানের ঘুর প্রদেশের তুর্কি শাসনকর্তা মহম্মদ ঘোরী ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধে দিল্লির চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের নেতৃত্বে মিলিত রাজপুত রাজাদের পরাজিত করে ভারতে স্থায়ী মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হলে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক ভারতে

মহম্মদ ঘোরীর বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব পান। এইভাবে দিল্লির সুলতানি শাসন শুরু হয়। তুর্কি রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করার আগে আপনারা তুর্কিদের আদি পরিচয় জেনে নিন।

পাহাড়, পর্বত, নদী, মরুভূমি, মরূদ্যান, পশু-বিচরণ ক্ষেত্র (Steppes) প্রভৃতি নিয়ে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের দেশ মধ্য এশিয়া বা তুর্কিস্তান। তুর্কিরা প্রথমে ছিল যাযাবর। মধ্য এশিয়ার ওপর দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপ, মেসোপটেমিয়া হয়ে চীন পর্যন্ত পণ্য চলাচলের পথ, রেশম পথ (Silk Road) বিস্তৃতি ছিল। এই পথে ভারত থেকেও বাণিজ্য হত। তুর্কিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য (দুগ্ধজাত খাবার, চামড়া, মধু, ফার ইত্যাদি) বিদেশীদের পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করত। এইভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে এই যাযাবর জাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। তুর্কিরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুব ভাল যুদ্ধ করতে পারত। আরব সাম্রাজ্যের সীমানা তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তুর্কিদের সামরিক খ্যাতি পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন আরব এবং পারস্যর সুলতানরা তুর্কিদের দাস হিসাবে কিনে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করে। তুর্কি সৈনিকরা তাদের বিশ্বস্ততার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বড় বড় রাজপদ লাভ করে। পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন আফগানিস্তানের গজনীর শাসনকর্তা মহম্মদ ছিলেন এমনি এক তুর্কি ক্রীতদাস সবুক্তিগীনের পুত্র। গজনীর মহম্মদ পরে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। গজনীর সুলতান মহম্মদের মৃত্যুর পর ঘুর প্রদেশের শাসন কর্তা মহম্মদ ঘোরী গজনীর কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে ভারতে রাজ্য বিস্তারের পথে বেছে নেন।

তুর্কিরা যখন এদেশে আসে তখন শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেনি, ইসলামিক জগতের আইন-কানুন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যথেষ্টভাবে পরিচিত হয়ে এসেছিল। তারা ভারতের অবস্থা অনুসারে সেইসব প্রথা পরিবর্তন করে প্রচলন করার চেষ্টা করে। সুলতানি আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক, ঐ সময়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহুগুণ বেড়ে যায়।

৩ক.২ সুলতানি শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধের পর মহম্মদ ঘোরী তাঁর একান্ত অনুগত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে ভারতে বিজিত রাজ্যগুলির শাসনের দায়িত্ব দেন। কুতুবউদ্দিন লাহোর থেকে তাঁর রাজ্য শাসন শুরু করেন। পরে তাঁর উত্তরাধিকারীরা দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। এইভাবে দিল্লি সুলতানি কথাটার প্রচলন হয়।

কুতুবউদ্দিন নিজে প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এবং পরবর্তী আরও কয়েকজন বিখ্যাত সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে তিনি যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে দাস বংশ বলে। দাস বংশের (১২০৬-১২৯০) পর খলজী (১২৯০-১৩২০), তুঘলক (১৩২০-১৪২২), সৈয়দ (১৪১২-১৪৫১) এবং লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬) মুঘলদের দিল্লি জয় করার আগে পর্যন্ত দিল্লি থেকে রাজত্ব করে। দাস, খলজি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী এই পাঁচ বংশের শাসনকালকে (১২০৬-১৫২৬) সুলতানি শাসন বলে।

সুলতানি শাসনের গোড়ার দিকে বেশিরভাগ সময় মহম্মদ ঘোরীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং পরাজিত রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কেটে যায়। ইলতুতমিস (১২১৩-১২৩৬) ও গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) সুলতানি রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। আলাউদ্দিন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬) রাজত্বকালের আগে পর্যন্ত সুলতানি শাসন উত্তর ভারতে কিছু অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। আলাউদ্দিন নতুন রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে গুজরাট, মালব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা

বিস্তৃত হয়। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের নতুন কিছু এলাকা পূর্বে জাজনগর (উড়িষ্যা) উত্তর-পশ্চিমে পেশোয়ার এবং উত্তরে কুরাচল (কাংড়া উপত্যকা) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহম্মদ তুঘলকের সময় তুর্কি সাম্রাজ্যের সীমানা চরম সীমায় পৌঁছয়, কিন্তু ঐ রাজত্বকালের শেষ দিক থেকে ভাঙন শুরু হয়। পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলকের পর (১৩৫১-১৩৮৮) সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়। সৈয়দ ও লোদীদের সময়ে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই তুর্কি সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করলে তুর্কি সুলতানির অবসান হয়, মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

৩ক.৩ সুলতানি যুগের কৃষি ব্যবস্থা

সুলতানি যুগের কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনারা ধারণা করতে পারবেন যদি ঐ সময়ের কৃষি উৎপাদনের উপকরণ, উৎপন্ন ফসলের বিবরণ, ভূমি-রাজস্ব এবং গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারেন। নীচের এই সমস্ত বিষয়ই পরপর আলোচনা করা হয়েছে।

৩ক.৩.১ কৃষি উপাদান ও উৎপাদন

ভারতে কৃষি উৎপাদনের উৎস হল জমি ও তার উর্বরা শক্তি, এবং জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন বলদ, লাঙ্গল, কাস্তে, কোদাল, বীজ ইত্যাদি। চাষবাস বৃষ্টি নির্ভর ছিল। সেচের ব্যবহার কমই হত। লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছিল অপর্যাপ্ত। জমির মালিকানা প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যেহেতু চাষী নিজেই উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক-এর মালিক সেইহেতু উৎপাদনের কমবেশি নির্ভর করত বৃষ্টিপাতের ওপর। সুলতানি যুগে যে সব ফসল উৎপন্ন হত তার প্রায় সবগুলিই প্রাক্-সুলতানি যুগে হত। বছরে সাধারণত দুবার ফসল হত—শরৎকালে খারিফ এবং বসন্তকালে রবি। সেচের বহুল প্রচলন না হওয়ায় এবং শীতকালে জলের যথেষ্ট যোগান না থাকায় রবি ফসল কমই হত।

আগেই জেনেছেন, লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছিল অপর্যাপ্ত। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় গঙ্গা-যমুনার উর্বর দোয়াব অঞ্চলেরও বহু জায়গা জঙ্গলে ভরে ছিল। কর আদায়কারীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বহুলোকে জঙ্গলে পালাত। চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চাষ নিবিড় প্রথায় (intensive) না হয়ে আয়তনে বাড়ানো হত (extensive)।

প্রাক্-সুলতানি যুগে সেচের ব্যবহার একেবারে হত না তা নয়। বৃষ্টির জল ধরে রেখে কোথাও কোথাও সেচ হত, কোথাও কোথাও পরপর কলসির কানায় দড়ি বেঁধে কপিকলের সাহায্যে কূপ থেকে জল তুলে সেচ হত। এই প্রথাকে 'অড়ঘট' বলে। কিন্তু এইভাবে জলের সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন না হওয়ায় বেশি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব ছিল না।

আপনারা প্রাক্-সুলতানি যুগের কথা জানলেন, এবার দেখা যাক সুলতানি যুগে কি কি পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে সেচের প্রসার। তুর্কিরা কূপ থেকে জল তোলার এক নতুন প্রযুক্তি পারস্য থেকে এদেশে নিয়ে আসে। নতুন প্রথায় কয়েকটা খাঁজ কাটা চাকা একসঙ্গে চালিয়ে মাটির কলসীর বদলে ধাতুনির্মিত কলসীর কানা পরপর দড়িতে বেঁধে অবিচ্ছিন্নভাবে জল তোলা যেত। একে বলে সাকিয়া (Saqiya) প্রথা। এই প্রথায় আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হল।

তাছাড়াও সুলতানি যুগে খাল থেকে জল নিয়ে সেচের প্রসার হয়। চতুর্দশ শতকে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক প্রথম এ কাজে হাত দেন। পরে ফিরোজ তুঘলকের সময় বিশাল বিশাল খাল কাটা হয়। তাঁর সময়ের দুটি বিখ্যাত খালের নাম রজবওয়াহ ও উলুঘখানি। যমুনা নদী থেকে হিসার পর্যন্ত এগুলি বিস্তৃত ছিল। খালের দু পাশে প্রায় দুশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সেচের সাহায্যে চাষ শুরু হয়। ফিরোজ তুঘলকের কাটানো আর একটা বড় খালের নাম ফিরোজশাহী। শতদ্রু নদী থেকে কাটা হয়েছিল। এছাড়াও ছোট বড় অনেক খালের কথা জানা যায়। মুলতান অঞ্চলে কয়েকটা খাল স্থানীয় লোকেরাই কাটে এবং তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে।

সুলতানি আমলে নতুন কোন শস্যের চাষ শুরু হয়েছিল বলে জানা যায় না। মুঘল আমলে অবশ্য নতুন ফসল যেমন তামাক, টম্যাটো লঙ্কা প্রভৃতির চাষের প্রচলন হয়। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে জানা যায় ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে ভারতে অন্তত পঁচিশ রকমের কৃষিজপণ্য উৎপন্ন হত। প্রধান কৃষিজ পণ্য ছিল গম, যব, ধান, ডাল, জোয়ার, আখ ও তুলো। সবচেয়ে বেশি চাষ হত যবের। নীলের উল্লেখ নেই, তবে নীল চাষ যে হত তার প্রমাণ আছে। ইবন বতুততা লিখেছেন কৃষকরা এক জমিতে দুবার ফসল ফলাত—খারিফ ও রবি মরসুমে। এটা সাধারণভাবে সত্যি নয়। দুবার চাষ ছোট কোন এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। অবশ্য দুবার চাষের সুযোগ এসেছিল পরের দিকে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে। সেচের সাহায্যে শীতকালে জল সরবরাহ নিশ্চিত হলে আখ, গম, ডাল প্রভৃতির উৎপাদন বাড়ে। তুর্কি শাসনে শহরে অভিজাতদের উচ্চমানের জীবন যাপনের জন্য তথা রপ্তানির জন্য চিনির চাহিদা বাড়ে, ফলে আখ চাষ বৃদ্ধি পায়। তুর্কিরা এদেশে সূতো কাটার জন্য পারসীয়ান চড়কার প্রচলন করে। এর দ্বারা সূতোর উৎপাদন বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বোনার পদ্ধতিরও উন্নতি হওয়ায় তুলোর চাহিদা বাড়ে। ফলে তুলোর চাষ বেড়ে যায়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি শুরু হয়। প্রাক্ ইসলামি যুগে অন্যান্য ধরনের রেশম যেমন তসর, মুগা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। গুটিপোকা থেকে তৈরি করা রেশম চীন থেকে ঘুরপথে খোটান পারস্য হয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দেশে আসে। চীনা-পরিব্রাজক মা-হুয়ান ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে গুটিপোকার চাষ ও রেশম উৎপাদনের কথা লিখেছেন।

ইবন বতুতার লেখায় পাওয়া যায় ভারতে আমের খুব কদর ছিল এবং উৎপাদনও প্রচুর হত। তবে কলমের পরিবর্তে বীজ থেকেই গাছ তৈরি করা হত। এছাড়া আঙুর, খেজুর প্রভৃতিরও চাষ ছিল। দিল্লির সুলতানরা ফলের উৎকর্ষ বাড়াতে যত্নশীল ছিলেন, ফিরোজ তুঘলক দিল্লির আশেপাশে ১২০০ ফলের বাগান তৈরি করেন। এগুলিতে সাতটি বিভিন্ন রকমের আঙুর ফলানো হত। চাহিদার তুলনায় আঙুর খুব বেশি উৎপন্ন হতে থাকায় আঙুর-এর দাম পড়ে যায়।

সমসাময়িক বিবরণীতে সুলতানি আমলের জিনিষপত্রের দাম সম্পর্কে ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। ঐতিহাসিকদের লেখায় দুর্ভিক্ষ ও অনটনের দ্রব্যমূল্যের উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি আছে অতি উৎপাদনের মরসুমে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকরকম নেমে যাওয়ার বিবরণ। সাধারণভাবে বলা যায় যান-বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ধরনের ওপর পণ্য নির্ভর করত। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হলে স্বভাবতই দাম খুব নেমে যেত। আমরা আলাউদ্দিন, মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের আমলে পণ্যমূল্যের যে বিবরণ পাই তাতে দেখা যায় আলাউদ্দিনের সময়ে পণমূল্য মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, মহম্মদ তুঘলকের সময় দাম বেড়ে গিয়েছিল এবং ফিরোজ তুঘলকের সময় দাম কমে এসে মোটামুটি আলাউদ্দিনের সময়ের মূল্যস্তরে পৌঁছেছিল।

অবশেষে বলতে হয়, জমি ও জঙ্গল অনেক থাকার ফলে পশুচারণ ক্ষেত্রের অভাব ছিল না এবং চাষীদের ঘরে প্রচুর সংখ্যায় গবাদি পশু ছিল। প্রচুর পরিমাণ ঘি ও দুগ্ধজাত জিনিস তৈরি হত, এগুলি চাষীদের আয়ের

মূল্যবান উৎস ছিল। বলদের সাহায্যে শুধু চাষই হত না, দূর দূর অঞ্চলে বলদের পিঠে করে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া হত।

৩ক.৩.২ ভূমি রাজস্ব

সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার আগে ভারতে কি হারে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত তা নিশ্চিন্তভাবে জানা যায় না। প্রাক্-সুলতানি আমলের ভূমি ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক বলা যায় কিনা, এ নিয়েও বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে ঐ সময়ে ইউরোপীয় সামন্তশ্রেণীর অনুরূপ এক অভিজাত শ্রেণী ভারতের গ্রামাঞ্চলে বাস করত। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তাদেরকে রাষ্ট্র রাণা বা তাদের সেনাপতিদের রাওয়াত বলে বর্ণনা করেছেন। এরা তুর্কি আক্রমণের বিরোধিতা করে, পরে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। রাই, রাণা, রাওয়াতরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের এক অংশ কর হিসাবে আদায় করত। সুলতানি শাসনের গোড়ার দিকে পুরানো ব্যবস্থা চলতে থাকে। দিল্লির সুলতানরা রাই, রাণা, রাওয়াতদের কাছ থেকে নিয়মিত 'থোক' টাকা আদায় করতেন। যে সব অঞ্চল সুলতানদের পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার করেনি (যেমন, গঙ্গা থেকে রোহিলখণ্ড, দোয়াব, অযোধ্যা, বিহার ইত্যাদি) সে সব অঞ্চল থেকে সুলতানি সৈন্যরা লুঠ করে গবাদি পশু ও দাসদাসী নিয়ে আসত।

ইসলামিক জগতে নিয়ম ছিল ভূমি কর হিসাবে 'খারাজ' আদায় করা। খলজিদের আগে পর্যন্ত দিল্লির সুলতানরা এই ধরনের কোনো কর আদায় না করে রাই, রানা, রাওয়াতদের কাছ থেকে থোক টাকা আদায় করত। ইলতুতমিস, বলবন এবং পরে আলাউদ্দিনের চেষ্টায় সুলতানি শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন হয়। আপনারা নীচে আলাউদ্দিনের সময় থেকে রাজস্বের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা পরপর জানতে পারবেন।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব সংস্কার জানার আগে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করে নিন। যে সব জমির খাজনা সরাসরি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা পড়ত তাকে 'খালিসা' বলা হত। আলাউদ্দিনের সময়ে দিল্লি ও আশেপাশের অঞ্চল ও দোয়াব এলাকা খালিসার অন্তর্ভুক্ত হয়। খালিসা ছাড়া অন্য অঞ্চলের রাজস্ব রাই, রাণা, রাওয়াতদের হাত হয়ে রাজকোষে আসত। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করত খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরী নামের রাজস্ব আদায়কারী। এরা গ্রামেই বাস করত। ওই সময় সাধারণভাবে তিনটি কর আদায় করা হত উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ যা ইসলামী আইনে খারাজ নামে পরিচিত। তাছাড়া গবাদি পশুর ওপর কর যার নাম ছিল চরাই, এবং বাড়ি পিছু একটা কর 'ঘরি' বা ঘরাই আদায় হত।

আলাউদ্দিন প্রথম থেকেই কঠোরভাবে রাজস্ব সংস্কারে হাত দেন। তিনি দেখলেন খুত, মুকদ্দম ও চৌধুরীরা নিজেদের জমির ওপর খাজনা দেয় না, কৃষকদের ভূমি-করের ওপর একটা বাড়তি কর (কিসমৎ-ই-খোটি) আদায় করে এবং নিজেদের দেয় 'চরাই' ও 'ঘরি' অন্য কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়। আলাউদ্দিন খোট, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের সাধারণ কৃষকের মত খারাজ দিতে বাধ্য করলেন, ঐ সঙ্গে কিসমৎ-ই-খোটি আদায় নিষিদ্ধ করলেন ও খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের ওপরও 'চরাই' ও 'ঘরি' কর ধার্য করলেন। আলাউদ্দিন সমস্ত জমি জরীপ করিয়ে বিশওয়া প্রতি (১ বিঘার ১/২০ ভাগ) উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক (৫০%) ভূমি কর ধার্য করলেন। মধ্যযুগে এই হারই ছিল সবচেয়ে বেশি হারে কৃষি কর। সাধারণত নগদ টাকায় খাজনা আদায় করা হত। আলাউদ্দিন জিনিসপত্রের দাম কম রাখার জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করেন। ওই সময় খালসা অঞ্চল থেকে জমির খাজনা নগদ অর্থের পরিবর্তে শস্য আদায় করা হত। তাঁর কর আদায় ব্যবস্থা এমনি কঠোর

ছিল যে খালসা এলাকার বাইরে প্রজারা ফসল উঠলেই বিক্রি করে খাজনা দিয়ে তবে বাকি ফসল ঘরে তুলত। আলাউদ্দিনের রাজস্ব সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ ঐতিহাসিক বারাণীর লেখায় পাওয়া যায়। বারাণী লিখেছেন আলাউদ্দিনের ভূমি-সংস্কার পাঞ্জাবের দিনালপুর ও লাহোর থেকে উত্তর প্রদেশের কারা এবং কাটেহার ও পূর্ব রাজস্থান পর্যন্ত চালু হয়। বারাণী আরও লিখছেন, আলাউদ্দিনের কর ব্যবস্থায় খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীরা তাদের দেয় কর আর গরীব কৃষকদের ওপর চাপাবার সুযোগ পেল না। তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো, সিল্কের জামা-কাপড় পরা বা পান খাওয়ার মত বিলাসিতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। তারা এমন গরীব হয়ে গেল যে, অনেক সময় তাদের স্ত্রীলোকেরা অভিজাত মুসলমান পরিবারে ঝি-এর কাজ নিতে বাধ্য হয়।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক আলাউদ্দিনের কর ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন করেন। খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীরা চরাই ও ঘরি কর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পেল। তাদের নিজেদের জমির ওপর দেয় করও মুকুব করা হয়। কিসমৎ-ই-খোটির পরিবর্তে তাদের নিয়মিত রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্য বরাদ্দ করা হয়।

মহম্মদ তুঘলকের সময় আবার কর ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। পুনরায় অভিজাতদের কাছ থেকে চরাই ও ঘরি আদায় শুরু হয়। ঐ সময় জমি জরিপ করিয়ে, সরকারিভাবে ফসলের গড় উৎপাদন স্থির করে, ফসলের মূল্য ঘোষণা করা হয় এবং সেইমত কর আদায় হয়। সরকারিভাবে স্থিরীকৃত উৎপাদন ও শস্যমূল বাস্তব থেকে ফারাক হত। ফলে কৃষকদের বোঝা এবং অসন্তোষ বাড়ে। দোয়াব অঞ্চলের অভিজাতরা বিদ্রোহ করে, হিন্দুরা তাদের শস্যগোলায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সাধারণ কৃষকরাও বিদ্রোহ সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। সরকারি কর্মচারী ও সৈন্যরা বিদ্রোহীদের ওপর প্রচণ্ড উৎপীড়ন চালায়। দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহের খবর পেয়ে দূর অঞ্চলের কৃষকরাও চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। মহম্মদ তুঘলকের সেনাবাহিনী জঙ্গল ঘিরে ফেলে বিদ্রোহীদের হত্যা করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছারখার হয়ে যায়। বারাণীর বিবরণ থেকে এসব জানা যায়। বারাণী লিখেছেন বিদ্রোহ অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। ফলে চাষবাস বিপর্যস্ত হয়, দিল্লিতে ফসল আনা বন্ধ হয় এবং রাজধানী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। প্রায় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলেছিল (খ্রিঃ ১৩৩৪-৩৫ থেকে ১৩৪১-৪২)।

বারাণী বেশিমাত্রায় ভূমি রাজস্ব আদায়কেই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেছেন। মহম্মদ তুঘলক শেষ পর্যন্ত তাঁর ভুল নীতি বুঝতে পারেন এবং কৃষি সম্প্রসারণের জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি চাষীদের কূপ খনন, বীজ, লাঙল প্রভৃতি কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সুলতানি আমলে এই ঋণকে সোন্ধার (Sondhar) বলত। মহম্মদ তুঘলক চাষবাসের উন্নতি ঘটানোর জন্য একজন দেওয়ান-এর অধীনে "দিওয়ান-ই-আমীর কোহী' নামে নতুন এক কৃষিদপ্তর স্থাপন করেন। তিনি চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য আদেশ দেন। যেখানে যব চাষ করা হত সেখানে গম হবে, অথবা যেখানে গম চাষ হত সেখানে আখ হবে, যেখানে আখ চাষ করা হত সেখানে আঙুর, খেজুর প্রভৃতির চাষ হবে। সবশেষে 'শিকদার' নামে একশ জন কর্মচারী নিয়োগ করে তাদের মাইনের উপরি লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে চাষের উন্নতির কাজে পাঠানো হল। প্রত্যেককে "তিরিশ গুণিত তিরিশ" করোহ (এক করোহ = প্রায় ১$^{১}/_{২}$ মাইল) এলাকায় চাষ বাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু লোভী অসৎ এই কর্মচারীরা হাজারের এক অংশও উন্নতির কাজে ব্যয় না করে টাকা আত্মসাৎ করে। মহম্মদ তুঘলক এই সময় সিন্ধুপ্রদেশে অভিযানে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন এবং পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সময়মত ফিরে এলে অসাধু কর্মচারীদের ভাগ্যে নিশ্চিত শাস্তি ছিল। যাই হোক মহম্মদ তুঘলকের বিশাল পরিকল্পনা তদারকির অভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সময় মহম্মদ তুঘলকের সব পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। যারা সোন্ধার নিয়েছিল বা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে রাজকর্মচারীরা রাজকোষ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়েছিল,

তা সবই মকুব করা হয়। ফিরোজ খারাজ ছাড়া সব রকম বাড়তি কর আদায় (আবওয়াব) বন্ধ করে দেন। অর্থাৎ এখন থেকে 'চরাই' ও 'ঘরি' কর আদায় পরিত্যক্ত হল। অবশ্য তিনি হিন্দুদের কাছ থেকে নতুন একটা কর, 'জিজিয়া' আদায় করা শুরু করেন। স্ত্রীলোক এবং শিশু ছাড়া প্রত্যেক হিন্দুকেই এই কর দিতে হত। আপনারা আগেই ফিরোজ তুঘলকের সময় নতুন নতুন খাল কাটার বিবরণ জেনেছেন। যারা খালের জল নিয়ে চাষ করত তাদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ বাড়তি কর বসানো হল। এই করের নাম দেওয়া হয়েছিল 'কিসমৎ-ই-সরাব।'' সাধারণভাবে হরিয়ানা অঞ্চলে এই কর বসানো হয়।

ফিরোজের পর রাজস্ব আদায়ের ইতিহাস খুব বেশি জানা যায় না। লোদীদের আমলে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়েই সোনা-রূপার যোগান কমে যায়। ভারতেও মুদ্রার প্রচণ্ড অভাব হয়। ফলে জিনিসপত্রের দাম খুব কমে গিয়েছিল, প্রজাদের পক্ষে ফসল বিক্রি করে নগদ টাকায় কর দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইব্রাহিম লোদী উৎপন্ন ফসলের কর নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আদেশ দেন। ষোড়শ শতকে আমেরিকা থেকে সোনা-রূপা আমদানি হতে থাকলে এবং ভারতেও সোনা-রূপার যোগান বাড়লে শেরশাহ আবার অর্থমূল্যে কর নেওয়া শুরু করেন। আকবরের সময় কেবল অর্থমূল্যেই কর আদায় করা হত।

৩ক.৩.৩ কৃষি সম্পর্ক

আলোচ্য অনুচ্ছেদে আপনারা সুলতানি যুগে গ্রামীণ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা জানতে পারবেন।

প্রাক্-সুলতানি যুগের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে খুব বেশি কথা জানা যায় না। তবে একটা বিষয়ে পণ্ডিতরা নিশ্চিত যে ঐ সময়ের শাসকশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করত এবং কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব বা অন্য কোনো নামে কর আদায় করত। এই অভিজাতরা তুর্কি আক্রমণের বিরোধিতা করে। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ এবং বারাণী এদের রাই, রাণা বা তাদের সেনাপতিদের রাওয়াত নাম দিয়েছেন। রাই, রাণা, রাওয়াতরা তুর্কিদের কাছে পরাজিত হলে নিয়মিত থোক টাকা উপঢৌকন হিসাবে দিতে স্বীকৃত হয়। পুরনো শাসকশ্রেণী তাদের নিজস্ব কর আদায়কারীদের দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত। ঐতিহাসিক আফিসের লেখায় তার পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দিপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক তার এলাকার এক রাজা রাণা মালভট্টকে এক বছরের রাজস্ব আগাম দেবার জন্য জোর করে। মালভট্ট ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে গাজী মালিক সেখানকার মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের টাকা দেবার জন্য উৎপীড়ন শুরু করে। সারা এলাকার সন্ত্রাস নেমে আসে। বাধ্য হয়ে রাণা মালভট্ট মালিক গাজীর প্রস্তাবে রাজি হন। এই ঘটনা থেকে অনুমান হয় যে পুরনো শাসকশ্রেণী আগের মতই খুত, মুকাদ্দম, চৌধুরীদের দিয়ে কর আদায় করত এবং আলাউদ্দিনের ভূমি সংস্কারের আগে পর্যন্ত গ্রামের শাসন কাঠামোয় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

কৃষক শ্রেণী :

গ্রামকে কেন্দ্র করে কৃষিকাজ গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক আফিফের মতে এক-একটা গ্রামে পুরুষ লোকের সংখ্যা ছিল দুশ থেকে তিনশ। তারা নিজেরাই বীজ, লাঙ্গল ও অন্যান্য চাষের যন্ত্রপাতির মালিক। লোকসংখ্যার তুলনায় জমি অপর্যাপ্ত থাকায় জমির মালিকানার প্রশ্ন উঠত না। চাষীরা নিজেদের ফসল নিজেরাই বিক্রি করতে পারত। আপাতদৃষ্টিতে কৃষকরা স্বাধীন মনে হলেও বাস্তবে তারা পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না। উৎপন্ন ফসলের অংশ বিশেষ কর হিসাবে দিতে বাধ্য থাকত। তারা ইচ্ছা করলেই গ্রাম ছেড়ে গিয়ে অন্যত্র বাস করতে পারত না।

চাষীদের মধ্যে উঁচু-নীচু ভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। নীচের তলার চাষীদের বলা হত বালাহার। তাদেরও নীচে ভূমিহীন কৃষক বাস করত—তাদেরকে অন্ত্যজ বলা হত। অন্ত্যজদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে তাদের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। বালাহারদের ওপরে ছিল গ্রামের মোড়ল। খুত, মুকাদ্দম এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে পাটোয়ারী থাকত। পাটোয়ারীদের কাজ ছিল গ্রামে কোন্ প্রজা কত খাজনা দিচ্ছে লিখে রাখা। তাদের হিসাব বই পরীক্ষা করলে বোঝা যেত প্রজাদের কাছ থেকে বে-আইনি কর আদায় করা হচ্ছে কিনা, গ্রামের লোকেরাই পাটোয়ারীদের নিয়োগ করত—তারা সরকারি কর্মচারী ছিল না।

অভিজাত শ্রেণী :

আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন রাই, রাণা, রাওয়াতরা প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত খুত, মুকাদ্দম ও চৌধুরীদের মারফৎ। ত্রয়োদশ শতকের লেখায় চৌধুরীদের উল্লেখ বেশি পাওয়া যায় না। চতুর্দশ শতকে বারাণী বারবার তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। একদিক থেকে খুত, মুকাদ্দমরা কৃষকশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা নিজেরা জমি চাষ করত এবং তাদের নিজেদের নামের জমির জন্য খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। তাছাড়া অন্য কর ‘চরাই’ ও ‘ঘরি’ও তাদের দেয় ছিল। কিন্তু কার্যত তারা জমির খাজনা এবং ‘চরাই’ ও ‘ঘরি’ কর নিজেরা না দিয়ে গ্রামের প্রজাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। এছাড়াও তারা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের পারিশ্রমিক বাবদ ‘‘কিসমৎ-ই-খোটি’’ নামক কর আদায় করত। বারাণী লিখেছেন খুত, মুকাদ্দমরা বেশ বড়লোক। তারা ভাল ভাল জামা-কাপড় পরে, ঘোড়ায় চড়ে, পান খায়। কিন্তু আলাউদ্দিন যখন তাদের দেয় কর অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ করলেন এবং নিজেদের কর নিজেদেরকেই দিতে বাধ্য করলেন, তখন খুত, মুকাদ্দমরা খুব গরীব হয়ে পড়ল এবং অনেক সময় জীবন ধারণের জন্য তাদের স্ত্রীলোকদের মুসলমান অভিজাতদের বাড়িতে বাধ্য হয়ে ঝি-এর কাজ নিতে হয়। আলাউদ্দিনের কঠোর ব্যবস্থার পরেও খুত, মুকাদ্দমরা খালসা এলাকার বাইরে কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং খালসা এলাকাতেও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল।

সাধারণত খুতরা এক-একটা গ্রামের কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত ছিল। কয়েকটা গ্রাম নিয়ে এক-একটা পরগণা হত। পরগণার দায়িত্বে ছিল মুকাদ্দম। ইবন বতুতা লিখেছেন চৌধুরীরা ১০০টা পরগণার কর আদায়ের দায়িত্বে ছিল। গুর্জর-প্রতিহার এবং চালুক্যদের সময় এক ধরনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী চুরাশিটি পরগণার দায়িত্বে ছিল। সম্ভবত চৌধুরীরা এদেরই উত্তরপুরুষ, তবে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী। ভারত চৌরাশী পরগণার জমিদারের ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে চুরাশি পরগণার অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। ফিরোজ তুঘলকের রাজস্ব সংস্কারের পর গ্রামের অভিজাতদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। কালক্রমে চৌধুরীদের জমিদার বলা হতে থাকে।

৩ক.৪ ইকতা প্রথা

দিল্লি সুলতানি রাজ্যসীমা বাড়তে থাকলে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বিজিত রাজ্যগুলি শাসনের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইকতা প্রথার প্রচলন হয়।

বহুদিন থেকেই ইসলামিক জগতে কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি-কর আদায় এবং কর থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত আয় শাসক শ্রেণীর মধ্যে বিতরণের জন্য ইকতা প্রথার চল ছিল। অনুগত কর্মচারীদের পুরস্কৃত করাও এই প্রথার

উদ্দেশ্য। ইকতার দায়িত্বে যারা থাকত তাদের নাম ছিল মুকতি বা ওয়ালি। একাদশ শতাব্দীর এক লেখায় মুকতি বা ওয়ালিদের কাজ এবং দায়িত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে—এদের কাজ হচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা। খাজনা দিয়ে দিলে কৃষকরা বা তাদের পরিবার ও ধন-সম্পত্তি মুকতিদের সব রকম দাবী থেকে মুক্ত থাকবে। মুকতিরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করলে প্রজারা সুলতানের কাছে নালিশ জানাতে পারে। সুলতান মুকতিদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন, প্রয়োজনে তাদের ইকতা বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। মুকতির দায়িত্ব কেবল রাজস্ব আদায়ের—দেশ ও কৃষকরা সুলতানের অধিকারে।

ঘোরীরা উত্তর ভারত জয় করলে সেনানায়করা বিজিত এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পরাজিত রাজা বা অভিজাতরা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করলে সেনানায়করা তাদের কাছ থেকে থোক টাকা কর নিত। যে এলাকা রাজার বশ্যতা স্বীকার করেনি সে এলাকা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে লুঠ করে গবাদি পশু ও দাসদাসী নিয়ে আসত। ঐ সেনা নায়করাই কালক্রমে নিজেদের মুকতি বা ওয়ালি বলতে থাকে। তাদের এলাকাকে ইকতা বা কখনও কখনও ওয়ালিৎও বলা হয়। মুকতিরা তাদের আয় থেকে অধীনস্থ সৈন্যদের ভরণপোষণের এবং নিজেদের খরচ মেটাত। তারা প্রয়োজনে সুলতানকে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করত।

দিল্লি সুলতানির গোড়ার দিকে ইকতাগুলির আয় এবং সেখানে কত সৈন্য রাখা হচ্ছে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো ধারণা ছিল না। সুলতানি শাসন দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইকতার ব্যাপারে নজর দেওয়া হয়। এবং ইকতা প্রথার পরিবর্তন শুরু হয়। ইলতুতমিস মুকতিদের এক ইকতা থেকে অন্য ইকতায় বদলি করতেন। ক্রমে তিন-চার বছর অন্তর মুকতিদের বদলি ইকতা প্রথার অঙ্গ হিসাবে গণ্য হল। ফিরোজ তুঘলকের সময় পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা চলে। বলবন প্রতিটি মুকতির সঙ্গে একজন হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য, ইকতাগুলির প্রকৃত আয়-ব্যয় অনুসন্ধান করা।

ইকতাগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় রকমের হস্তক্ষেপ শুরু হয় আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক (দেওয়ান-ই-উজারাত) প্রত্যেক ইকতার আনুমানিক আয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত করে। হিসাব পরীক্ষকরা আয়-ব্যয় খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, গরমিল পাওয়া গেলেই দায়ী কর্মচারীদের শাস্তি এবং মুকতিদের নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা হত। আয়ের তালিকা তৈরি হলে নানা অজুহাতে আয় বাড়ানো হতে থাকে। আপনারা আগেই জেনেছেন কিভাবে খুত মুকাদ্দমদের কর ফাঁকি বন্ধ করা হয় এবং উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক ভূমি কর ধার্য করা হয়। আলাউদ্দিনের সময় সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়তে থাকলে দূরবর্তী এলাকায় নতুন নতুন ইক্‌তা গঠন করা হয় এবং দিল্লির আশপাশ ও দোয়াব অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে খালিসার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সময় ইকতা প্রথায় কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি, শুধু করের বোঝা কমানোর চেষ্টা হয়েছে। বলা হল এখন থেকে একসঙ্গে ইকতার আয় $^{১}/_{১০}$ বা $^{১}/_{১১}$ অংশের বেশি বাড়ানো হবে না।

মহম্মদ তুঘলকের সময় ইকতাগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আরও বাড়ানো হয়। প্রত্যেক ইকতায় মুকতির সঙ্গে একজন করে আমীর বা সেনানায়ক নিয়োগ করা হল। মুকতি ইকতার আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগ নিজেদের পারিশ্রমিক ও খরচের জন্য রেখে বাকী টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে জমা দেবে। সেনানায়কদের মাইনে বাবদ ইকতার একটি এলাকার আয় নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হল। সাধারণ সৈনিককে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে মাইনে দেবার ব্যবস্থা হয়।

ফিরোজ তুঘলক ক্ষমতায় এসেই অভিজাতদের সমর্থন আদায় করার জন্য মন্ত্রী, আমীর প্রভৃতির মাইনে অনেক বাড়িয়ে দিলেন। অনেক সময় মাইনের পরিবর্তে ইকতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। সৈন্যদের নগদ মাইনে

দেবার পরিবর্তে গ্রাম থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার দেওয়া হল, একে ওয়াজা বলে। যারা ওয়াজা পেল না তাদের নগদ অর্থে মাইনে দেওয়া হত। ফিরোজ তুঘলকের সময় ইকতার আয় নতুন করে নির্ধারণ করা হয়। সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ (৬,৭৫,০০০,০০) টঙ্কা। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ করা হল। ফিরোজ তুঘলকের সময়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে উত্তরাধিকারের স্বত্ত্ব মেনে নেওয়া। অর্থাৎ এখন থেকে মুকতি, সেনানায়ক, সাধারণ সৈন্য সকলেই পুরুষানুক্রমে জমির দখল রাখতে পারবে ও আয় ভোগ করবে।

ফিরোজ তুঘলকের পর ইকতার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আর চেষ্টা হয়নি। লোদীদের রাজত্বকালে ইকতা কথাটার ব্যবহার কমে আসে। এখন থেকে ইকতার পরিবর্তে সরকার ও পরগণা কথাগুলির প্রচলন হয়।

৩ক.৫ শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের বিকাশ

নীচের অংশ পাঠ করলে আপনারা সুলতানি যুগে নতুন নতুন শহরের উদ্ভব ও শহর জীবনের বিকাশের কথা জানতে পারবেন।

সবার আগে আপনার শহর বলতে কি বুঝবেন জেনে নিন। সাধারণত কোনো সীমিত স্থানে যদি পাঁচ হাজার বা তার বেশি লোক পাশাপাশি বাস করে অথবা যদি কোনো সীমিত স্থানে লোকসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) বা তার বেশি অ-কৃষি পেশায় নিযুক্ত থাকে তবে সেই স্থানকে শহর বলে। ছোট শহরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্তটিই বেশি প্রযোজ্য। দুটি শর্তই একসঙ্গে প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রাচীন ভারতে অনেক শহরের নাম পাওয়া যায়। যেমন, কাশি, কোশল, কৌশাম্বী, কপিলাবস্তু, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি সবই গুপ্তোত্তর যুগে অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। অনেক ছোট-বড় শহর একেবারে লোপ পায়। খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে শহরগুলির অবক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন গুপ্তোত্তর যুগে বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে গেলে রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়, ছোট ছোট রাজা এবং অভিজাতরা বেশির ভাগ গ্রামেই বাস করে, যে কয়েকটি শহর টিকে থাকে সেগুলি তীর্থস্থান, প্রশাসনিক কেন্দ্র বা সৈন্য ছাউনি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক যেমন রামশরণ শর্মা বলেন গুপ্তোত্তর যুগে রাজারা মন্দির, ব্রাহ্মণ ও অনুগত কর্মচারীদের জমি দান করতেন। জমি গ্রহীতারাই কালক্রমে ভূস্বামী বা ইউরোপের অনুরূপ সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়। তারা গ্রামে বাস করত এবং গ্রামগুলি স্বনির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন হয়। এর সঙ্গেই নগরের অবক্ষয় জড়িত। রামশরণ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচনের পক্ষে কারণ হিসাবে দেখান যে সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীতে মুদ্রার প্রচলন খুবই কমে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে কোথাও কোনো রাজার মুদ্রা বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়নি, বা এক জায়গায় মুদ্রা অন্যত্র বা বিদেশি মুদ্রার বেশি খোঁজ পাওয়া যায়নি। এগুলিই ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচনের প্রমাণ। সপ্তম প্রথার উদ্ভব বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু একটা বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত যে সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীতে ভারতে শহর এবং শহর জীবনের অবক্ষয় হয়।

সুলতানি যুগের ঐতিহিসিক বিবরণীতে অনেক বড় বড় শহরের উল্লেখ আছে। যেমন লাহোর, মুলতান, দিল্লি, অনহিলওয়ারা, কাম্বে, কারা, হান্সী, দৌলতাবাদ প্রভৃতি। এই শহরগুলির কোনও কোনটি খুবই বড় মাপের।

ইবন বতুতা বলেছেন দিল্লি প্রাচ্যে ইসলামি জগতের সবচেয়ে বড় শহর। দৌলতাবাদও প্রায় একই রকমের বড়। এছাড়াও অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে যেমন আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে পূর্ব রাজস্থানে ছেইন বা ঝেইন শহর। ক্যারাভান (Caravan) পথ বা যে পথ দিয়ে বণিকরা দলবেঁধে পণ্য নিয়ে চলাচল করত সে পথেও ছোট ছোট শহরের উত্থান হয়।

আপনারা এর পরে জানবেন সুলতানি যুগে কি কি কারণে নগরায়ণের বিস্তার হয়।

সুলতানি যুগে নগরায়ণের বিস্তারের একটা বড় কারণ ইকতা প্রথা। তুর্কি আমলের গোড়ার দিকে শাসকশ্রেণীর লোকেরা নতুন পরিবেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পরিবর্তে একসঙ্গো থাকতে চাইত। তারা ইকতার সদর দপ্তর যেখানে অবস্থিত, সেখানে মুকতি ও ওয়ালিরা অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাস করত, সেইসব জায়গাতেই থাকা পছন্দ করত। আগেই জেনেছেন ইকতা প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। আলাউদ্দিনের সময় থেকে উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে নগদ টাকায় কর আদায়ের ফলে শাসকশ্রেণীর হাতে সে যুগের মাপকাঠিতে প্রচুর অর্থ আসতে থাকে। শাসকরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়। তারা পারস্য বা বাগদাদ থেকে কবি, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, কারিগর, চিকিৎসক বা স্থপতি নিয়ে আসে। ভারতীয় মিস্ত্রি এবং মজুরের সাহায্যে খিলান দেওয়া বাড়ি তৈরি শুরু হয়। বিদেশ থেকে বিলাসী ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হতে থাকে। বিদেশি কারিগরের সাহায্যে কার্পেট, সিল্কের কাপড় প্রভৃতি উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়। ভারতীয় কারিগররা বিদেসি কারিগরের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে খাদ্যদ্রব্য ও উচ্চমানের হস্তশিল্প আমদানি হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমুখী ছিল। গ্রামগুলিতে বিক্রি করার মত জিনিস শহরে উৎপন্ন হত না। গ্রাম থেকেই জিনিস আসত শহরে। অনেক সময়ে দেশের ভিতরে দূরবর্তী শহরগুলোর মধ্যে ব্যবসা হত। এইভাবে আমরা দেখি ইকতা প্রথা শহরের উত্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। ইকতাকে কেন্দ্র করে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল, হান্সী, কারা, অনহিলওয়ারা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোট শহর খুব বড় হয়, আবার ছোট ছোট শহরেরও উত্থান হয়। জলপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে গুজরাটের উপকূলে বাণিজ্য শহরগুলি কাম্বে, ব্রোচ প্রভৃতি আরও বড় হয়। স্থলপথে বাণিজ্যের ফলে মুলতানের মত ছোট শহর খুবই বড় হয়। তাছাড়া পণ্য চলাচলের রাস্তার ধারে, অর্থাৎ যে পথে দিয়ে বণিকরা দল বেঁধে গরুর গাড়িতে বা বলদের পিঠে মাল চড়িয়ে যাতায়াত করত (Caravan) সে পথের ধারেও ছোট ছোট শহর গড়ে উঠে। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য কেনাবেচা করতে বা পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে এইসব শহরের উদ্ভব। মালব হয়ে গুজরাটের পথে এই ধরনের অনেক শহর গড়ে উঠে।

তৃতীয়ত, সুলতানরা অনেক সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে শহর স্থাপন করেন। মহম্মদ তুঘলক দৌলতাবাদ এবং ফিরোজ তুঘলক ফতেহাবাদ, হিসার, জৌনপুর, ফিরোজাবাদ প্রভৃতি শহরের পত্তন করেন।

৩ক.৬ বাণিজ্যের বিস্তার

সুলতানি আমলে ব্যবসার পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। দূরপাল্লার পথ তৈরি হয় যার মধ্যে দূরত্ব মাপার জন্য মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। কিছু দূরে দূরে সরাইখানা তৈরি হয়। বাংলার গিয়াসুদ্দিন খলজী উঁচু বাঁধের পথ তৈরি করেছিলেন যা দিয়ে বর্ষাকালে এমনকি বন্যার সময় যাতায়াত করা যেত।

৩ক.৬.১ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

আপনারা ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকে নগরায়ণের প্রসার সম্পর্কে জেনেছেন। শহরে বসবাসকারী লোকেদের স্বভাবতই খাদ্য—চাল, গম, ডাল তৈলবীজ প্রভৃতি সরবরাহ করতে হত। শহরে স্থাপিত কারখানাগুলিতেও নিয়মিত কাঁচামালের (যেমন তুলো, রেশম প্রভৃতি) যোগানের প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিনের সময় থেকে নগদ টাকায় কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় শুরু হলে কৃষকরা ফসল উৎপাদনের পরই শস্য-বণিকদের (তাদের কারওয়ানি বা নায়ক বলত) শস্য বিক্রি করে দিত। কারওয়ানিরা এইসব শস্য শহরে নিয়ে এসে বিক্রি করত। এইভাবে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক ধরনের বাণিজ্য গড়ে উঠে। সাধারণত অল্প দূরত্বের মধ্যে এই ধরনের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধরনের বাণিজ্যের আর একটা বৈশিষ্ট্য, শহরে-উৎপন্ন জিনিসের বিশেষ চাহিদা গ্রামে ছিল না, গ্রাম থেকে শহরে একতরফা জিনিস যেত। আর এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হল, এক শহরের কারখানায় উৎপন্ন বিলাসী দ্রব্য অন্য শহরে, অনেক সময় দূরবর্তী শহরে নিয়ে গিয়ে কেনাবেচা। যেমন দৌলতাবাদ থেকে মসলিন কাপড়, লখ্নৌতি থেকে ছিট কাপড় এবং অযোধ্যা থেকে গরিবদের জন্য মোটা কাপড় দিল্লিতে আসত। দিল্লি থেকে লাহোর, মুলতান প্রভৃতি শহরে মিছরি চালান যেত। ইবন বতুতার বিবরণ থেকে এগুলি জানা যায়। অনেক সময় বিদেশ থেকে সীমান্তবর্তী শহরে জিনিস আমদানি করা হয়, তারপর দেশের দূর দূর প্রান্তে সরবরাহ করা হত।

৩ক.৬.২ বহির্বাণিজ্য

আপনারা আগেই জেনেছেন গুপ্তোত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। বস্তুত নবম-একাদশ শতকে ভারতের সঙ্গে আরব দেশগুলির জলপথে বাণিজ্যের চরম বিকাশ হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গ থেকে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও বাণিজ্য অব্যাহত ছিল।

সুলতানি যুগে বহির্বাণিজ্য সাধারণত গুজরাটের বন্দরগুলির সঙ্গে দুই ধারায় বিকশিত হয়। পারস্য উপসাগর দিয়ে হরমুজ কারার পথে এবং লোহিত সাগর হয়ে এডেন, মোকা, জেড্ডা, আলেকজান্দ্রিয়ার পথে। পারস্য উপসাগরের পথে খাদ্য শস্য ও কাপড় রপ্তানি হত, আর লোহিত সাগরের পথে ভূমধ্যসাগর ও ইউরোপের দেশগুলির জন্য মশলা রপ্তানি হত। গুজরাটের বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাপড় রপ্তানি হত এবং পরিবর্তে ঐসব অঞ্চল থেকে মশলা আমদানি করে পশ্চিম এশিয়া এবং আলেকজান্দ্রিয়ার পথে ইউরোপে রপ্তানি হত। দক্ষিণবঙ্গের বন্দর থেকে সাধারণত মালাক্কা, চীন ও দূর প্রাচ্যে সূতী ও সিল্কের বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি জিনিস রপ্তানি হত। ঐসব দেশ থেকে মশলা ও সোনা-রূপা আসত। হরমুজ থেকে নুন এবং মালদ্বীপ থেকে কড়ি আসত। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কড়ি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হত।

জলপথে ভারতের উপকূল এলাকার মধ্যেও বাণিজ্য হত। সিন্ধু থেকে গুজরাটের বন্দর হয়ে মালাবার, করমণ্ডল ও বঙ্গদেশের বন্দরে বাণিজ্যপোত যাতায়াত করত। স্থানীয় উৎপন্ন জিনিস কেনা এবং বিদেশি দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো এইসব বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ছিল।

মুলতান হয়ে স্থলপথে মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের সম্পর্ক বহুদিনের। সুলতানি যুগে মধ্য এশিয়া ও পারস্যের ওপর ক্রমাগত মোঙ্গল আক্রমণ হতে থাকলে স্থলপথে বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। তবে আরবদেশ ও খোরাসান থেকে ঘোড়া আসা বন্ধ হয়নি এবং ভারত থেকে নিয়মিত ক্রীতদাস রপ্তানি হত।

পরিশেষে মনে রাখা দরকার জলপথে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের ভূমিকা আরব বণিকদের তুলনায় নগণ্য ছিল। সুলতানি আমলের শেষের দিকে (১৪৯৮ খ্রিঃ) পর্তুগীজরা জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছালে ভারতীয় ও আরব বণিকদের ভূমিকা আরও কমে গেল। পর্তুগীজরা তাদের উন্নত ও সামরিক দিক থেকে সুসজ্জিত নৌপোত নিয়ে সমুদ্রপথে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। নানা শর্তে এবং ফি দিয়ে (Charges) এক ধরনের অনুমতি পত্র (Cartaz) নিয়ে তবেই ভারতীয় বা অন্য বিদেশিরা জলপথে ব্যবসা করতে পারত।

৩ক.৭ সারাংশ

ভারতে তুর্কি সুলতানি শাসন তিনশ বছরেরও বেশি (১২০৬-১৫২৬) স্থায়ী হয়েছিল। সুলতানি রাজত্বকালে সেচের সম্প্রসারণ হয় এবং চাষবাসের প্রসার ঘটে। কিন্তু রাজস্ব ব্যবস্থা এমনি কঠোর ছিল যে প্রজাদের বাড়তি উৎপাদনের প্রায় সবটুকু রাষ্ট্রকে খাজনা হিসাবে দিয়ে দিতে হত। তুর্কিরা মুসলিম দুনিয়ার অনেক প্রথা এদেশে এনেছিলেন। ইকতা প্রথা এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইকতা প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হত এবং বাড়তি রাজস্ব অভিজাতদের মধ্যে বিতরণ করা হত।

গুপ্তোত্তর যুগে শহর জীবনের অবক্ষয় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তুর্কি শাসনে রাস্তাঘাট তৈরির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তার হয়। ঐ সময় ছোট বড় অনেক নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহর জীবনের বিস্তারের অনেক কারণ থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অন্যতম কারণ।

৩ক.৮ অনুশীলনী

১। সংক্ষেপে ইকতা প্রথা ব্যাখ্যা করুন।
২। সুলতানি যুগে নগরায়ণের প্রসারের কারণ আলোচনা করুন।
৩। সুলতানি শাসনে কেন্দ্রীয় সরকার ইকতা শাসনে (administration) কিভাবে হস্তক্ষেপ করে?
৪। তিন লাইনে সংজ্ঞা লিখুন :
(ক) খালিসা; (খ) কিসমৎ-ই-খোটি; (গ) সোন্ধার; (ঘ) মুকাদ্দম ও (ঙ) ওয়াজা।

৩ক.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Ed. R. C. Majumdar : *The Delhi Sultance (The History and Culture of India Vol. VI) Bombay, 1960.*
2. Ed. Tapan Roychoudhury and Irfan Habib : *The Cambridge Economic History of India–(2 Vol.) Vol.-1 1982.*
3. অনিরুদ্ধ রায় : *সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলকাতা ১৯৯৭।*
4. অনিরুদ্ধ রায় : *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর কলকাতা, ১৯৯৯।*
5. Ram Saran Sharma : *Urban Dacay in India. Delhi, 1987.*

একক ৩খ ❑ ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামের প্রভাব—সুফিবাদ—ভক্তি আন্দোলনে—ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর ভূমিকা।

গঠন

৩খ.০ উদ্দেশ্য

৩খ.১ প্রস্তাবনা

৩খ.২ সুলতানি শাসনের ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামীয় প্রভাব

৩খ.৩ সুফিবাদ

 ৩খ.৩.১ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য

 ৩খ.৩.২ ভারতে সুফিবাদের বিস্তার

৩খ.৪ হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ী ভাবনা

৩খ.৫ ভক্তি আন্দোলন

 ৩খ.৫.১ দক্ষিণ ভারতে প্রাক্ মুসলিম যুগের ভক্তি আন্দোলন

 ৩খ.৫.২ সুলতানি যুগে উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিরোধী ভক্তি আন্দোলন

 ৩খ.৫.৩ বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন

 ৩খ.৫.৪ উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ বিরোধী ভক্তি আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

৩খ.৬ ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য শৈলী ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়

৩খ.৭ সারাংশ

৩খ.৮ অনুশীলনী

৩খ.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৩খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- সুলতানি শাসনে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তনের কয়েকটি ধারা।
- সুফিবাদ বলতে কি বুঝায়, ভারতে সুফিবাদের বিস্তার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে সুফিবাদের ভূমিকা।
- ভক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা ও বৈশিষ্ট্য।
- ভারতে ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর বিকাশ এবং কিভাবে ভারতীয় ও ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটে।

৩খ.১ প্রস্তাবনা

আগের এককে আপনারা সুলতানি যুগে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং শহরের বিকাশের কথা পাঠ করেছেন। আলোচ্য এককে সুলতানি আমলে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কয়েকটি ধারা জানতে পারবেন।

ভারতের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও বর্ণভেদভিত্তিক হিন্দু সমাজে পরিবর্তন শিল্পভিত্তিক সমাজের পরিবর্তনের মত দ্রুত ও স্পষ্ট নয়। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন মন্থর গতিতে চলায় বাহ্যত অনেক সময় চোখে পড়ে না। ফলে মুঘল আমলের শুরুতে বাবরের চোখে অথবা আরও পরে কার্ল মার্কসের মনে হয়েছিল ভারতীয় সমাজ অপরিবর্তনীয়। নীচের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন এই ধারণা ঠিক নয়।

৩খ.২ সুলতানি শাসনে ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামীয় প্রভাব

তুর্কিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং স্থানীয় রাজা-মহারাজা, বিশেষভাবে রাজপুত রাজাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হলে গুপ্ত-পরবর্তী যুগ থেকে ব্রাহ্মণরা যে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিল তার অবসান হতে থাকে। এর ফলে বর্ণভিত্তিক হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রভাব শিথিল হয়েছিল কিনা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক যে নিম্নবর্ণের লোকেরা ইসলাম ধর্মের সমতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধে আকৃষ্ট হতে থাকে। এই সময়ে নতুন শহরগুলিতে গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক কারিগর ও মিস্ত্রি চলে আসে। প্রাক্ মুসলিম যুগে রাজা-রাজড়া সামন্ত ও হিন্দু মন্দিরগুলি নানাভাবে এদের কর্মসংস্থান করত। নতুন শহরে জীবনধারণের সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বেশি হওয়ায়, শহরগুলির লোকসংখ্যা বাড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকেদের ওপর উচ্চ বর্ণের প্রভাব আগের মত কঠোর হওয়া সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত লোকেদের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য সুলতানি আমলে সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের প্রসার হয়। আপনারা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে নীচে জানতে পারবেন।

সুলতানি শাসনে আদায়ীকৃত রাজস্বের এক বড় ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শহরবাসী ইকতাদার বা মুক্তি ও আমীর ওমরাহ এবং উলেমাদের হাতে চলে যায়। তারা আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করত, অনেকেই বিলাসী পণ্য উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করে বহুসংখ্যক ক্রীতদাস নিয়োগ করে। ভারতীয় সমাজে উচ্চধনীদের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য আগেও ছিল, সব সমাজেই থাকে, কিন্তু মধ্যযুগে এই পার্থক্য আরও ব্যাপক ও উগ্রভাবে প্রকাশ পায়। ক্রীতদাস প্রথার কথাই ধরা যাক। ভারতীয় সমাজে আগেও ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু তুর্কি আমলে এদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করা হত। শহরাঞ্চলের বাজারেও বাইরের দেশ থেকে ক্রীতদাস আমদানি করে কেনা-বেচা হত। অনেকসময় শিশু ক্রীতদাস কিনে তাদের নপুংসক করে ভবিষ্যতে হারেমে কাজ দেওয়া হত। সুন্দরী ক্রীতদাসীদের ভোগের সামগ্রী হিসাবে অন্য কদরও ছিল। বেশি সংখ্যায় পরিচারক-পরিচায়িকা এবং ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী রাখা অভিজাতদের সামাজিক মর্যাদার পরিচয় ছিল। মুসলমান অভিজাতদের দেখাদেখি হিন্দু অভিজাত ব্যক্তিরাও গার্হস্থ্য কাজে বহুসংখ্যায় ক্রীতদাস নিয়োগ করা আরম্ভ করলেন। লোকের এমন ধারণা হল যে ক্রীতদাসরা কায়িকশ্রম করবে আর অভিজাতরা মানসিক বা যা কিছু চিন্তা-ভাবনার কাজ করবে। অবশ্য তারা যুদ্ধেও যেত। সাধারণভাবে বলা যায় কায়িক শ্রম বিমুখতা ও মানুষকে যথোচিত মর্যাদা দানের নীতিজ্ঞানের অভাব মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে ঋগবেদের যুগে স্ত্রীলোকেরা সংসার-পরিচালনায় পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। শাস্ত্রকাররা স্ত্রীলোকের ভূমিকা সম্পর্কে লেখেন, পুত্রলাভের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ঘোমটা দেওয়া রীতি প্রচলিত হয়। মুসলমান শাসনের আগে ভারতীয় নারীরা ঘোমটার ব্যবহার করত। সুলতানি শাসনে পর্দার ব্যবহার শুরু হয়।

পর্দা কথাটার অর্থ আড়াল। অভিজাত মুসলমানেরা তাদের সম্ভ্রান্ততার প্রতীক হিসাবে হারামে পর্দার ব্যবহার করত। ইসলাম ধর্মে একের বেশি বিয়ে স্বীকৃত ছিল। বিত্তবানেরা একাধিক স্ত্রী ছাড়াও বহু দাসী-বাঁদী রাখত। পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে এদের লুকিয়ে রাখার জন্য হারামে পর্দার প্রয়োজন হয়। হিন্দু অভিজাত পরিবারও অভিজাত মুসলমানের অনুকরণে পর্দা ব্যবহার শুরু করে, অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি শাসনের অনিশ্চয়তা ও বিধর্মীদের হাত থেকে আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদে। তবে মনে রাখতে হবে যে চাষী বা খেটে খাওয়া পরিবারের সাধারণ মেয়েরা কি হিন্দু কি মুসলমান লম্বা ঘোমটা ব্যবহার করত না বা পর্দার আড়ালে নিজেদের গোপন রাখত না। অবশ্য অনেক সময় সাধারণ মুসলমান পরিবারের মেয়েরা বোরখা পরে গ্রামে বা শহরে ঘুরত।

আপনারা সবশেষে জানুন হিন্দুদের জনপ্রিয় আমোদ-উৎসবের ওপর ইসলামের প্রভাব এবং ইসলামী উৎসবের ওপর ভারতীয় প্রভাবের কথা।

হিন্দুদের জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে পড়ে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। নীচে ভক্তি আন্দোলনের আলোচনা পড়তে গিয়ে দেখবেন ভক্তিসাধকদের প্রভাবে এই দুই মহাপুরুষের প্রতি মুসলমানেরাও ভক্তি নিবেদন করছে। হিন্দুদের অন্যান্য জনপ্রিয় আমোদ-উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসন্ত উৎসব, হোলি, শিবরাত্রি, দেওয়ালি প্রভৃতি। রাজনৈতিক পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ব্যক্তিগত দুর্দশা সত্ত্বেও ঐ সব উৎসবের ধারা বন্ধ হয়নি বা লোকের আনন্দ-উৎসবে ভাঁটা পড়েনি। ইসলামের আবির্ভাবে হিন্দু জনপ্রিয় উৎসবের প্রকৃতি বদলায়নি, বরং বহিরাগতরা হিন্দুদের উৎসবাদিকে আরও বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলে। এর কারণ বোধহয় অল্প লোকই উৎসবে ধর্মীয়ভাবের মূল্য দেয়। বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে এগুলির আবেদন এই কারণেই যে এইগুলি সামাজিক মেলামেশা ও হই-হুল্লোড়ের সুযোগ দেয়। সুলতানি আমল থেকেই মুসলমান রাজা থেকে অনেক সাধারণ মুসলমানও হোলি, দেওয়ালি উৎসবে অংশ নিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইসলাম ধর্মে সাধারণত সব ধর্মীয় উৎসবেরই পরিবেশ ছিল গুরুগম্ভীর ও অনাড়ম্বর। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে এইসব অনুষ্ঠানের পরিবেশ বদলাতে থাকে। নওরোজ হত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়—নদীতীরে বিশাল বাগিচায়, ফুলে ফুলে, গানে গানে আতসবাজি জ্বালিয়ে। বড়লোকদের উৎসব হলেও এর বাহ্যিক আড়ম্বর সব শ্রেণীর লোককে আকৃষ্ট করত। শবেবরাত বা পাপপুণ্য লিপিবদ্ধ করার রাত হল মুসলমানদের পবিত্র অনুষ্ঠান। অনেকের মতে হিন্দুদের শিবরাত্রির অনুকরণেই এই অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ঐ দিন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়ে রাত কাটাত, কিন্তু সাধারণত মুসলমানেরা উল্লাস ও আতসবাজি ফাটিয়ে ঐ উৎসব পালন করত। মহরমের বিষণ্নতা এক বিশেষ শ্রেণীর মুসলমানদেরই প্রভাবিত করে। অধিকাংশই শোভাযাত্রাসহ আড়ম্বর ও উল্লাসের মধ্যে ঐ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করত এবং হিন্দুরাও তাতে অংশ নিত। বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনে বিখ্যাত পীরদের সমাধিস্থল দর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উরস উৎসবের অঙ্গ। যেহেতু খ্যাতনামা পীরদের হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকেরাই সম্মান করত, সেইহেতু উরসকে কেন্দ্র করে মুসলমানেরা যে সামাজিক মেলামেশা ও আনন্দ-উৎসব করত তাতে হিন্দুরাও যোগ দিত। এছাড়াও সুলতানি আমলে হিন্দুরা মুসলমানদের বেশভূষা ও খানাপিনার অনুকরণ শুরু করেছিল। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে রাজনৈতিক বিদ্বেষ সত্ত্বেও বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে সুলতানি আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক সমন্বয় গড়ে উঠে।

৩খ.৩ সুফিবাদ

এই অংশটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে সুফিবাদের উদ্ভব হয়, সুফি সাধকদের ধর্মমত, সুফরের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের প্রচারের ধারা, সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফিদের বিস্তার ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের বিবরণ। পণ্ডিতেরা 'সুফি' কথাটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন কথাটা এসেছে 'সাফা' বা পবিত্রতা থেকে, কেউ বলেন 'সুফি' এসেছে 'সাফ্‌ফা' থেকে যার অর্থ কম্বলপরিধানকারী ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী সন্ত। সুফিবাদের উদ্ভব হয় ইসলাম ধর্মের মধ্যে থেকেই। সুফিরা ধর্মগুরু মহম্মদ ও ধর্মগ্রন্থ কোরাণকে মেনে নেয় কিন্তু মুসলমান ধর্মাচার্যদের (উলেমা) দেওয়া কোরাণ এবং শরিয়তের বহু শ্লোকের ব্যাখ্যায় একমত নয়। সুফি দর্শনের মূল কথা ঈশ্বর উপলব্ধি। প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুভূতিই সুফিবাদের মূল লক্ষ্য। তারা অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism)-এ বিশ্বাস করত।

আরব, পারস্য, বাগদাদ, খোরাসান প্রভৃতি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সুফিবাদের জন্ম হয় খিস্টিয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে। ক্রমে সুফিরা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে, সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই তারা ভারতবর্ষে আসা শুরু করে। সুফিদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল, যেমন সুরাবর্দি চিস্তি, কাদিরি নকসা বন্দী প্রভৃতি। এক এক গুরু বা পীরের নেতৃত্বে এক এক সম্প্রদায় বা সিলসিলাহ্ গঠিত হয়েছিল। এদের সকলেরই উদ্ভব ভারতবর্ষের বাইরে।

সুরাবর্দি সিলসিলাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেখ শিহাবুদ্দিন সুরাবর্দি (মৃত্যু ১২৩৪ খ্রি.)। চিস্তি সিলসিলাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা শেখ মইনুদ্দিন চিস্তি (মৃত্যু ১২৩৬ খ্রিঃ)। কাদিরি সিলসিলাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন শেখ আবদুল কাদের জিলানী (মৃত্যু ১১৬৮ খ্রিঃ) ও নকসাবন্দী সিলসিলাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাহাউদ্দিন নকসাবন্দী (মৃত্যু ১৩৯৮)।

৩খ.৩.১ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য

আপনারা এবার সুফিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নিন।

প্রত্যেক সুফি সম্প্রদায়ই মনে করতেন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন বা অনুভূতি পেতে হলে কতকগুলি ধারা (তারিখা) মানতে হবে। প্রথম যিনি সম্প্রদায়ে যোগ দিচ্ছেন তাঁকে কতকগুলি পর্যায়ের (দশা) মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একজন পীর (বা মুর্শেদ) এর কঠোর তত্ত্বাবধানে পর্যায়গুলি অতিক্রম করে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে। অধিকাংশ সুফিই ধর্মীয় গান (সামা) গাওয়াতে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা অনেক সময় গান গাইতে গাইতে ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হয়ে জ্ঞান হারাতেন। গোঁড়া উলেমারা সামা বিরোধী ছিলেন। সুফি সাধকরা যেখানে অবস্থান করতেন সেগুলিকে বলা হত খানকাহ। খানকাহগুলো বেশিরভাগই শহরের প্রান্তে স্থাপিত হত। এক-এক জন পীরের এক-একটা পৃথক খানকাহ। ভক্তরা এখানে ভীড় করত পীরদের মুখ থেকে ধর্মের বাণী শোনার জন্য। ব্যক্তিগত দান বা রাষ্ট্রের বদান্যতার ওপর নির্ভর করে খানকাহ-এর ব্যয় সঙ্কুলান হত।

৩খ.৩.২ ভারতে সুফিবাদের বিস্তার

নীচের অংশটি পাঠ করলে জানতে পারবেন এদেশে বিশেষ যে সুফি সম্প্রদায়গুলি প্রভাবশালী বা জনপ্রিয় হয়ে উঠে তাদের কথা।

দ্বাদশ শতকের মধ্যেই ইরান, ইরাক খোরাসান প্রভৃতি দেশে সুফি সম্প্রদায়গুলি সুসংগঠিত হয়। এরপর

এক-একটি সিলসিলাহ তাদের প্রচারক পাঠাতে থাকে দেশে-বিদেশে। ভারতে যে সিলসিলাহ বিশেষ প্রভাবশালী হয় সেটি ছিল সুরাবর্দি সিলসিলাহ। ভারতে এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (১১৮২-১২৬২)। শেখ বাহাউদ্দিন দিল্লির সুলতান ইলতুতমিসের সময় প্রথমে মুলতানে আসেন। মুলতান তখন ইলতুতমিসের প্রতিদ্বন্দ্বি কুবাচার দখলে। কুবাচার শাসনের সমালোচনা করায় কুবাচার সঙ্গে বাহাউদ্দিনের বনিবনা হয়নি। তিনি তখন ইলতুতমিসের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। সুরাবর্দি সিলসিলাহ প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার চেষ্টা করে। ইলতুতমিস তাঁকে শেখ-উল-ইসলাম (ইসলাম ধর্মের নেতা) পদবী দেন। সুরাবর্দি সিলসিলাহ সিন্ধু, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লি প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ভারতে মুসলিম ধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। এদের এক শিষ্য শেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজি বঙ্গে খানকাহ স্থাপন করেন। বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনে তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। এদের খানকাহ-এর সঙ্গে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। গরীব লোকেরা সেখানে নিয়মিত খাবার পেত। সুরাবর্দি সিলসিলাহ-এর এক শাখার নাম ফিরদৌসী। এদের নেতা শেখ শরীফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী চৌদ্দ শতকে বিহারের রাজগীরে খানকাহ স্থাপন করে বিহারে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

সুরাবর্দি সিলসিলাহ প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভ করেছিল এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। এদের ঠিক বিপরীত নীতি নিয়েছিল চিস্তি সিলসিলাহ। ভারতে চিস্তি সিলসিলাহ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দানের ওপর নির্ভর করে এই সিলসিলাহ গড়ে উঠে। ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ভারতীয় ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথা বলতে গেলে এদের নাম সবার আগে করতে হবে।

চিস্তি সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথমে আফগানিস্থানের হিরাটে। এদের নেতা খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের পর এদেশে আসেন এবং আনুমানিক ১২০৬ সালে আজমীর-এর স্থায়ীভাবে খানকাহ স্থাপন করেন। খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির উদার চিত্ত এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে আকৃষ্ট করে। মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁকে নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে।

মইনুদ্দিন চিস্তির দুই শিষ্য খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি এবং শেষ হামিদউদ্দিন নাগৌরি যথাক্রমে দিল্লি ও রাজস্থানের নাগোরে খানকাহ স্থাপন করেন। নাগৌরি সাধারণ রাজস্থানী কৃষকের মত জীবনযাপন করতেন, নিরামিষ ভক্ষণ করতেন ও সব সময়ে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের পরিহার করে চলতেন। তিনিই প্রথম পার্শী ভাষায় লেখা সুফি কবিতা হিন্দাভিতে (উর্দুর আদিরূপ) অনুবাদ করেন।

দিল্লিতে খাজা কুতুবউদ্দিন কাকির উত্তরাধিকারী ছিলেন খাজা ফরিদউদ্দিন মাসুদ (১১৭৫-১২৬৫)। তিনি বাবা ফরিদ নামেই বেশি পরিচিত। বাবা ফরিদ তাঁর পূর্বসূরীদের মত ক্ষমতাসীন ও ধনী লোকেদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। তিনি দিল্লি থেকে চলে এসে পাঞ্জাবে তাঁর খানকাহ স্থাপন করেন। নাথপন্থী যোগীরা প্রায়ই তাঁর আস্তানায় আসতেন এবং মরমীবাদ (mysticism) নিয়ে আলোচনা করতেন। পাঞ্জাবে বাবা ফরিদ এমনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন যে তিনশ বছর পর যখন শিখদের ধর্মপুস্তক আদিগ্রন্থ রচনা করা হয় তখন তাঁর অনেক দোঁহা এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ও তাঁর কবরস্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

চৌদ্দ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত চিস্তি শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫) ফরিদের শিষ্য ছিলেন। খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সময় দিল্লির চিস্তি খানকাহ-এর খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক বারাণী এবং কবি আমীর খসরুর লেখায় সে বিবরণী পাওয়া যায়। আমীর খসরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া সাতজন সুলতানকে (নাসিরুদ্দিন থেকে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক) দিল্লির সিংহাসনে বসতে দেখেছেন কিন্তু তিনি কোনদিন রাজদরবারে যাননি, বা কোন রাজপুরুষের আনুকূল্য গ্রহণ করেননি। তার

লঙ্গরখানায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই আহার গ্রহণ করত। নাথপন্থী যোগীরা তাঁর খানকাহ্য় নিয়মিত যেত— চিস্তিরা নাথেদের অনেক যৌগিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মহম্মদ তুঘলকের সময় দিল্লির খানকাহ্গুলো কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং চিস্তি সাধকদের জোর করে দৌলতাবাদে পাঠান হয়। এক চিস্তি সাধক শেখ বাহাউদ্দিন ঘারীব দৌলতাবাদে তাঁর খানকাহ্ স্থাপন করেন।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর এক শিষ্য নাসিরুদ্দিন মাহমুদ দিল্লিতে খ্যাতিলাভ করেন। দিল্লির লোকেরা তাঁকে 'চিরাগ-ই-দিল্হী' (দিল্লির প্রদীপ) বলে সম্মান জানাত। নাসিরুদ্দিন চিস্তিদের উপাসনার ধারায় কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। উলেমাদের তিনি সামা গানের বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত করারও চেষ্টা করেন।

সুরাবর্দ্দি, ফিরদৌসী ও চিস্তি সম্প্রদায় ছাড়া আর যে সব সম্প্রদায় ভারতে সুফিবাদ প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় তাদের মধ্যে কাদিরি সিলসিলাহ্-এর নাম করতে হয়। বাগদাদে শেখ আবদুল কাদির জিলানি প্রতিষ্ঠিত কাদিরি সিলসিলাহ্ ভারতে খানকাহ্ স্থাপন করে চৌদ্দ শতকে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে এরা ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় অবস্থানে এদের সঙ্গে গোঁড়া উলেমাদের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। কাদিরিরা শাসকশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত এবং রাষ্ট্রের আনুকূল্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করত না।

কাশ্মীরে সুফি সাধকরা প্রথমে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নামেন মীর সৈয়দ আলি হামদানির নেতৃত্বে চৌদ্দ শতকে। কিন্তু তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। পরে স্থানীয় এক সুফি-সন্ত শেখ নুরউদ্দিন ওয়ালি (মৃত্যু ১৪৩০) সুফি ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হন। নুরউদ্দিন ওয়ালির মতবাদের সঙ্গে কাশ্মীরী শৈব সাধিকা লালদেদের মতবাদের বহুলাংশে মিল ছিল। তাই কাশ্মীরের গ্রাম্য পরিবেশে নুরউদ্দিন সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

৩খ.৪ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ী ভাবনা

আপনারা জেনেছেন যে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় অষ্টম-দ্বাদশ শতকে ইসলাম ধর্মের মধ্য থেকেই সুফিবাদের উদ্ভব হয় এবং ক্রমে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সব দেশে সুফিবাদের প্রসার হয় ঐ সমস্ত দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুফিবাদ এক-এক দেশে এক-একভাবে বিকাশলাভ করে। ভারতে সুলতানি আমলে সুফিবাদ সারাদেশে শত-শত খানকাহ্-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগ ছাড়াই জনসাধারণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে বড় ভূমিকা নেয়। সুফি সাধকদের অনাড়ম্বর, পবিত্র ও আধ্যাত্মিক জীবন-প্রণালী ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত খানকাহ্গুলিতে গরিব লোকেরা ভিড় করত তাদের ধর্মীয় বাসনা চরিতার্থ করার আশায়। খানকাহ্-এর সাধকরা গরীবদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা সাধারণের ভাষা আয়ত্ত করে এবং স্থানীয় গল্প-গাথা ও প্রতীকীর (imageries) সাহায্যে ধর্মের তত্ত্ব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। ভক্তদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই থাকত। এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দুরত্ব কমে আসে।

সুফিরা ভারতীয় ধর্মাচরণের অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। পীর এবং গুরুর ভূমিকা তুলনীয়। প্রথম যারা শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আসত খানকাহ্তে তাদের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হত। নাথ যোগীরা প্রায়ই খানকাহ্তে যাতায়াত করত। সুফিরা অনেকে নাথদের প্রাণায়াম পদ্ধতি গ্রহণ করে। উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মাচরণে মরমীবাদ (mysticism) প্রাধান্য পায়। 'সাম্য' গানের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম সঙ্গীত গাইবার পদ্ধতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গান গাইতে গাইতে ভগবদ চিন্তায় বিভোর হয়ে চেতনা হারানো হিন্দু-মুসলমান ধর্মচর্চার অঙ্গ হয়।

সামাগান থেকে কাওয়ালি সঙ্গীতের উদ্ভব হয়। আমীর খসরু এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেন। স্থানীয় ভাষায় ধর্ম প্রচারের ফলে সুফি প্রচারক বিশেষভাবে চিস্তি সাধকদের মাধ্যমে হিন্দাভি ভাষা গড়ে উঠে। হিন্দাভি থেকেই উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দীতে লেখা মুসলমান কবি মোল্লাদাউদ-এর (চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা) 'চান্দায়ণ'-এর পার্শী ভাষায় অনুবাদ হয়।

এইভাবে সুলতানি আমলে সুফিবাদ প্রচারের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে উঠে।

৩খ.৫ ভক্তি আন্দোলন

মোক্ষলাভের জন্য অথবা উপাস্য দেবতার প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য ভক্ত তার দেবতার কাছে একান্তভাবে যে আত্মনিবেদন করে তাকেই ভক্তি বলে। সব ধর্মের মধ্যেই ভক্তির ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দুদের শাস্ত্র-গ্রন্থে বিশেষভাবে গীতায় ভক্তির আলোচনা আছে। দক্ষিণ ভারতে সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে সমাজের উঁচু-নীচু সব শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে প্রথম ভক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতকের পর এই আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয় এবং একাদশ শতকে রামানুজ এবং পরে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য আচার্যগণ ভক্তি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা শুরু করেন। সুলতানি আমলে সুফি সাধকদের চেষ্টায় ইসলাম ধর্মের বিস্তার হয়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শহরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে কারিগর মিস্ত্রিরা এসে শহরে ভিড় করে। স্বভাবতই তাদের ওপর উচ্চবর্ণের সামাজিক কর্তৃত্ব কঠোর হওয়া সম্ভব ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ভারতে বিভিন্ন ভক্তি মতবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কবীর, রুইদাস, দাদুদয়াল, নানক প্রভৃতি সাধকরা এইসব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা একেশ্বরবাদ (monotheism) ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-আচরণের বিরোধিতা (non-conformism)। প্রাক্-মুসলমান যুগের দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে কিছু কিছু মিল থাকলেও উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন ছিল নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র। একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিরোধী ভক্তি আন্দোলন ছাড়াও পূর্বভারতে ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আর এক ধরনের ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হয় যাকে আমরা বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন বলতে পারি। নীচের আলোচনা থেকে আপনারা প্রাক্-মুসলিম যুগের দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন, সুলতানি আমলে উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলন ও বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবেন।

৩খ.৫.১ দক্ষিণ ভারতে প্রাক্-মুসলিম যুগে ভক্তি আন্দোলন

সপ্তম থেকে দশম শতকে দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন দুটো ধারায় প্রভাবিত হয়েছিল—বৈষ্ণব আলভার বা আলোয়ার আন্দোলন ও শৈব নায়নার আন্দোলন। আলভার আন্দোলন বিষ্ণুর উপাসনাকে কেন্দ্র করে এবং নায়নার শিবের উপসনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। আলভার ও নায়নার আন্দোলন দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত ভক্তিবাদের প্রচারকরা সমাজের নীচুস্তরের লোকেদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের কথ্য ভাষায় প্রচার করতেন এবং নাচ-গান করতে করতে ভাবাবিষ্ট হয়ে সমাজের উঁচু-নিচু, স্ত্রী-পুরুষ সব লোকেদেরকেই ধর্মের বাণী শোনাতেন। ধর্মানুষ্ঠানের গোঁড়ামি তারা অস্বীকার করেন এবং নিম্নবর্ণের লোকেদেরও ধর্মাচরণের অধিকার দেন। সকল বর্ণের লোকেদেরই বেদপাঠের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। এইসব ভক্তি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের

প্রভাব খর্ব করা। তবে আলভার ও নায়নাররা ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সমতা আনার চেষ্টা করলেও বেদ-ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করেননি বা মূর্তিপূজাও বাতিল করেননি। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা সাধারণের ভাষা তামিলভাষা ব্যবহার করে, সকলকে ধর্মাচরণের অধিকার দিয়ে, পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকে আরাধ্য দেবতার কাছে ভক্তি নিবেদনের পদ্ধতি প্রচার করেন। দক্ষিণ ভারতের এই আন্দোলন দশম শতাব্দীতে গতি হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে যায়। একাদশ শতকে রামানুজ এবং পরে নিম্বার্ক, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ আচার্যরা দার্শনিক স্তরে ভক্তির ব্যাখ্যা দেন। ঈশ্বর উপাসনার অঙ্গ হিসাবে ভক্তি নতুন করে স্বীকৃতি পায়। এইসব আচার্যরা ভাগবত পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) ও জীবের সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। তাঁদের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠে।

দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন এবং উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন রামানন্দ। এবারে আপনারা উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩খ.৫.২ সুলতানি আমলে উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিরোধী ভক্তি আন্দোলন

সুলতানি আমলে চৌদ্দ ও পনের শতকে উত্তর ভারতে যে ভক্তিবাদের প্রচার হয় তার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের প্রায় সব সাধকই কোন না কোনওভাবে দক্ষিণের সাধকদের কাছে ঋণী ছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই সামাজিক সমতার ভিত্তিতে ও প্রেম-ভক্তি দ্বারা উপাস্য দেবতার আরাধনার কথা প্রচার করা হয়। উভয়ই সাধারণের বোধগম্য ভাষার ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু মিল ঐ পর্যন্তই। উত্তর ভারতে এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব। ফলে উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন ভিন্নপথে এগিয়ে চলে।

আগেই জেনেছেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিলেন রামানন্দ। রামানন্দ দক্ষিণ ভারত থেকে এসে বারাণসীতে তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন। বারাণসীতে তখন সাধু-সন্তদের ভিড়। রামানুজীয় ভক্তিতত্ত্বে তাঁর গভীর জ্ঞান তাঁকে সহজেই বারাণসীর সাধু সমাজে জনপ্রিয় করে তোলে। রামানন্দের ভক্তিবাদ উদারতা ও মানবতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ চলতি ভাষা হিন্দীতে তিনি রামভক্তি প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য, বিদ্বান, নিরক্ষর নারী ও পুরুষ সব মানুষই তার শিষ্যত্বের অধিকারী ছিলেন। উত্তর ভারতের অধিকাংশ ভক্তিবাদী ও মরমিয়া সাধক তাঁর ভাবধারায় প্রভাবিত হন। রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান জোলা কবীর, চর্মকার রুইদাস (বা রবিদাস), ক্ষৌরকার সেন, জাঠ সাধক ধন্না এবং মহিলা সাধকদের মধ্যে পদ্মাবতী, সুরেশ্বরী প্রভৃতি। বিশিষ্ট হিন্দীকবি ও সাধক তুলসীদাস রামানন্দের উত্তরসাধক। সব সাধকই হিন্দীর নানা উপভাষায় শিষ্যদের উপদেশ দিতেন এবং সহজবোধ্য ছোট ছোট কবিতায় (দোঁহা) বাণী রচনা করেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন কবীরদাস। কবীরই রামানন্দের উদার ধর্মমত উত্তর ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন।

বারাণসীর এক গরিব মুসলমান জোলার ঘরে কবীরের জন্ম। বাবা নিরু ও মা নিমা কাপড় বুনে কোনওভাবে সংসার চালান। উত্তর ভারতের এই জোলারা কয়েকপুরুষ আগেও ছিলেন হিন্দু, নাথ-যোগীদের শিষ্য। পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। পরিবারে আগের ধর্মজীবনের ঐতিহ্য কিছুটা থেকেই যায়।

বারাণসীতে তখন বহু সাধু-সন্তদের আনাগোনা। ছেলেবেলা থেকেই ধর্মপ্রাণ কবীর এদের সঙ্গ পাবার চেষ্টা করতেন। এইভাবেই তিনি উদার সাধক রামানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামানন্দ তাঁকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা

দেন। কবীরের জীবনে আসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। তিনি ভগবতপ্রেমে বিভোর হয়ে দিনরাত নাম জপ করতে থাকেন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সাধনা শুরু করেন। রামানন্দের শিষ্য হলেও কবীরের রামভক্তি রামানন্দের রামভক্তি থেকে ছিল স্বতন্ত্র। কবীরের রাম অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম নন, কবীরের রাম নির্গুণ ঈশ্বর। সেখানে 'রাম' 'রহিমে'র পার্থক্য নেই। কবীর একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, সমসাময়িক দুই প্রধান ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। নিরন্তর নাম জপের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব, এমনি এক মরমিয়াবাদ কবীর প্রচার করেন। কবীর অসংখ্য দোঁহা বা 'সাথী' রচনা করে গেছেন। হিন্দিতে লেখা এই দোঁহাগুলি সাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। এইসব দোঁহাতে সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ এবং পুরোহিত ও উলেমাদের নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই শ্লেষাত্মক রচনাগুলি হিন্দি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবীর উত্তর ভারতের বহুস্থান ঘুরে বেড়ান এবং বহু আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে নানা অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দ ও সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সমসাময়িক সাধকদের মধ্যে কবীরের স্থান খুব উঁচুতে। রুইদাস, দাদুদয়াল প্রভৃতি সাধক কবীরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। শিখ ধর্মের আদি গ্রন্থেও কবীরের দোঁহা স্থান পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় গুরু নানকও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

গুরু নানক ছিলেন কবীরের পরবর্তী প্রজন্মের লোক। পাঞ্জাবের লারকানা জেলার তালওয়ান্দী গ্রামে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) এক সাধারণ ক্ষত্রিয় পরিবারে নানক জন্মগ্রহণ করেন। কবীরের মতই তিনি ভক্তিবাদী মরমী সাধক এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন। নামক যে ঈশ্বরের ভজনা করতেন তিনি নির্গুণ, নিরাকার, অন্তহীন, বর্ণনাতীত নিরংকার, অকাল ও অলখ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। গুরু নানকের ধর্মচর্চার উপায় হল নিরন্তর ঈশ্বরের ভক্তিমধুর ভজনা ও নামজপ করে যাওয়া। তিনি সমকালীন বহু ভক্তি ও সুফি সাধকদের সঙ্গ লাভ করেন ও ভারতের তীর্থস্থানগুলি ঘুরে বেড়ান। মুসলমান তীর্থস্থান মক্কা, মদিনাও ঘুরে আসেন। শিষ্যদের প্রতি তাঁর উপদেশগুলি পরবর্তীকালে পঞ্চম গুরু অর্জুন আদিগ্রন্থ নামক ধর্মগ্রন্থে একত্রিত করে প্রকাশ করেন। আদিগ্রন্থে বহু ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে। এর থেকে অনুমান করা হয় নানক ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। নানক সম্প্রদায়ের লোকেরা 'শিখ' এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সংগঠিত হয়। নানক তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে অঙ্গকে গুরুরূপে মনোনীত করেন। তখন থেকে শিখধর্মে গুরু পরম্পরাবাদ চলে আসছে।

কবীর নানক ছাড়াও উত্তর ভারতে একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিরোধী মরমী সাধকদের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন রুইদাস ও দাদু তাঁদের অন্যতম। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে শিষ্যরা রুইপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় গড়ে তোলে।

৩খ.৫.৩ বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন

আপনারা সাধক রামানন্দের কথা পড়েছেন। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য—সব মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অধিকার দান এবং সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে সাধারণের কথিত ভাষায় ধর্মপ্রচার—রামানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। তাই রামানন্দকেই বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুলতানি আমলে বঙ্গদেশে, আসামে, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বৈষ্ণব-ভক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আপনারা পরপর এইসব আন্দোলনের ইতিহাস জানতে পারবেন।

বঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন : চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩)

বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রেরণা আসে 'ভাগবত পুরাণ' গ্রন্থ থেকে। চৈতন্যর জন্মের আগেই গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা বঙ্গদেশে কাব্য ও গানের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতকে জয়দেব তাঁর সুললিত সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ রচনা করেন। বঙ্গে সুলতানি আমলে সমাজের নীচুস্তরের লোকেদের মধ্যে নাথপন্থী ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল। তাছাড়া বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হয়ে সহজিয়া ধর্মরূপে জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। এরা নানারূপ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধর্মাচরণ করত। অতীন্দ্রিয়বাদের নামে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিয়েছিল। নাথপন্থী ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব চৌদ্দ ও পনের শতকে যথাক্রমে বাংলাভাষায় লেখা চণ্ডীদাসের ও মৈথিলি ভাষায় লেখা বিদ্যাপতির কাব্যে গানে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এইভাবে রাধাকৃষ্ণ ভক্তির একটা ঐতিহ্য বঙ্গে গড়ে উঠেছিল। চৈতন্য জয়দেব—বিদ্যাপতির কাব্য-গানে আকৃষ্ট হলেও নাথপন্থী, সহজিয়া বা সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ভাগবত পুরাণকে ভিত্তি করেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যর জন্ম। পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। সংসার আশ্রমে চৈতন্যর নাম ছিল গৌরাঙ্গ ও নিমাই। তিনি ছিলেন সুদর্শন, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করে চৈতন্যর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাগবত পুরাণের বৈষ্ণব ধর্ম ও চৈতন্যর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণভক্তির আলোচনা আছে। চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমভক্তি। তিনি মনে করেন রাধা ছাড়া কৃষ্ণ অভাবনীয়। চৈতন্যর ভক্তিবাদ প্রচার পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক হল ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণনাম প্রচার, শোভাযাত্রাসহ নগর কীর্তন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার। এই ধর্মে গুরুর স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জাতি-ধর্ম, উচ্চ-নীচ, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে এই ধর্ম গ্রহণের অধিকারী। চৈতন্য শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন মুসলমান হরিদাস।

চৈতন্য প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে অস্বীকার করেননি, সমাজে ব্রাহ্মণদের উচ্চস্থানে মেনে নিয়েছিলেন। দেব-দেবীর পূজা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান চলতে থাকে। চৈতন্য নিজের জীবন-কালেই শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে পূজিত হন।

চৈতন্যর ভক্তি আন্দোলন বঙ্গের বাইরে বিশেষভাবে উড়িষ্যায় প্রসার লাভ করে। উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলন বড় শহর কেন্দ্রিক হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন ছোট ছোট শহর ও গ্রামে বেশি জনপ্রিয় হয়। গ্রামের ভূস্বামীরা নিজেরা দীক্ষিত হয়ে এই ধর্মের অনুগামীদের সাহায্যে চাষবাসের বিস্তার ঘটায়। এই সময়ের বৈষ্ণবীয় মন্দির নির্মাণ ও গ্রামে গঞ্জের বৈষ্ণব মেলা অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে।

আসামে ভক্তি আন্দোলন :

উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, রুইদাস, পাঞ্জাবে গুরুনানক, বঙ্গে ও উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব যেমন ভক্তি ধর্মের জোয়ার এনেছিলেন, তেমনি শঙ্করদেব তাঁর ধর্মপ্রচার ও অধ্যাত্ম সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনগ্রসর ও বহু-বিচ্ছিন্ন আসামে ভক্তিধর্মের বিপুল জোয়ার আনেন।

শঙ্করদেবের জন্ম হয় এক অ-ব্রাহ্মণ ভুঁইয়া পরিবারে, আসামের নওগাঁর কাছে। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে মতভেদ আছে। তাঁর একমাত্র জীবনীকার অনিরুদ্ধের মতে তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবী—জন্ম ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে। শঙ্কর বার বছর ধরে ভারতের তীর্থস্থানগুলি ঘুরে এসে আসামে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলকথা এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষ হচ্ছেন বিষ্ণু বা তাঁর অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই অদ্বিতীয় পরমপুরুষের চরণেই নিতে হবে 'একান্ত শরণ'। আসামে বিভিন্ন স্থানে সত্র বা মঠ প্রতিষ্ঠা করে 'একান্ত শরণ' ধর্ম প্রচার

করা হয়। সত্রগুলির নাম-ঘরে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ধনী, নির্ধন মিলিত হয়ে নাম-কীর্তন করত। পরে সত্রগুলি সামাজিক মিলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। শঙ্কর অসমীয়া ভাষায় ভাগবত-পুরাণের সহজবোধ্য ও সুললিত অনুবাদ করেন। এই ভাগবত পুরাণ ও তাঁর লেখা অসংখ্য নাম-কীর্তন অসমীয়া সাহিত্যের উৎসরূপে গণ্য করা হয়।

শঙ্করের সমকালীন আসাম ছিল তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্র। তবে তন্ত্রধর্ম মূলত রাজপুরুষ, পুরোহিত ও উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমিত ছিল। তন্ত্রসাধকেরা প্রায়ই সাধনার নামে ভোগ-ব্যভিচারে লিপ্ত হত। শঙ্কর গভীর মানবতাবোধ প্রচার করেন। তাঁর সংগঠন-নিপুণ প্রচার-কুশল শিষ্যরা জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করেন। স্বাভাবিকভাবেই শঙ্করদেবকে উচ্চবর্ণ ও পুরোহিতদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়ে ধর্ম প্রচারে নানাভাবে সাহায্য করেন।

মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলন

তেরো শতকে মারাঠাদের ধর্মজীবনে দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়—এক, নাথগোষ্ঠীর সাধকদের শৈব প্রভাব; দুই, পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব-ভক্তি প্রভাব। জ্ঞানদেব (১২৭৫-১২৯৬) এই দুই প্রভাবের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন এক ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর পবিত্র জীবন, অলৌকিক প্রতিভা ও তাঁর রচিত অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ মহারাষ্ট্রের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপান্তর ঘটায়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে ভাগবত পুরাণের ভাষ্য রচনা করেন। 'অমৃতানুভব' তাঁর এক মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ। এই বই থেকে জ্ঞানদেবের ওপর নাথযোগীদের প্রভাব জানা যায়। তাঁর ভক্তিবাদের পরিণত রূপ পাওয়া যায় 'অভঙ্গ' বা ভক্তিরসাশ্রিত অসংখ্য পদাবলীতে।

পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করে ভক্তির যে জোয়ার জ্ঞানদেব বইয়ে দিয়ে যান তা মহারাষ্ট্রের জনজীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানদেবের ভক্তি সাধনার ধারা বয়ে একের এক আত্মপ্রকাশ করেন নামদেব (১২৭০-১৩৫০), একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯) ও তুকারাম (১৫৯৮-১৬৫০)।

সুলতানি আমলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাশ্মীরে লালদেদের শৈব ভক্তি প্রচার এবং গুজরাটে কবি-সাধক নরসিংহ মেহতার বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার। লালদেদের প্রচার কাশ্মীরে সুফিবাদ প্রচারে সাহায্য করেছিল, নরসিংহ মেহতার প্রচার বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল গুজরাটের জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেদের।

৩খ.৫.৪ উত্তর ভারতের একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ বিরোধী ভক্তি আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

উত্তর ভারতের একেশ্বরবাদী ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ বিরোধী ভক্তি আন্দোলনগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আপনারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচের অংশ পাঠ করে জেনে নিন।

প্রথমত, ঐ সময়ের বহু সাধকই সমাজের নীচুস্তর থেকে উঠে এসেছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কবীর, রুইদাস, ধন্না, পিপা একে অপরকে চিনতেন এবং অপরের বাণীর উদ্ধৃতি দিতেন। এর থেকে বোঝা যায় এই সাধকদের ধর্মীয় মনোভাবের যথেষ্ট মিল ছিল।

দ্বিতীয়ত, এই সময়ের সাধকরা বৈষ্ণব ধর্ম, নাথ-যোগী ধর্ম বা সুফিবাদের দ্বারা কোনও না কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও সাধকই ঐ সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেননি।

তৃতীয়ত, উত্তর ভারতের সাধকরা বৈষ্ণব ভক্তি সাধকদের মতএকেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু বৈষ্ণব সাধকরা সগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করতেন আর উত্তর ভারতের সাধকরা নির্গুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন।

চতুর্থত, উত্তর ভারতের একেশ্বরবাদীরা সমকালীন দুই প্রধান ধর্মের আচার-আচরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বর্ণভেদ বা পৌত্তলিকতা মানতেন না।

পঞ্চমত, এঁরা সাধারণের কথিত ভাষায় তাঁদের উপদেশ দিতেন। তাঁরা তাঁদের বাণী ছোট ছোট কবিতা বা দোঁহা আকারে লেখার সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত শব্দ, উপমা ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন যাতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তরা তাঁদের উপদেশ সহজে বুঝতে পারে। তাঁরা প্রত্যেকেই উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর সমাজের নীচু স্তরের লোকেরাই বেশি সংখ্যায় তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর মানুষ শত শত বৎসর ধরে তাঁদের স্মরণ করে আসছে।

ষষ্ঠত, উত্তর ভারতের সাধকরা কেউই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাননি। সকলেই গার্হস্থ জীবন যাপন করেছেন। তাঁরা পরস্পরকে এবং শিষ্যরা তাঁদেরকে সন্ত বা ভগত বলতেন। শিখদের ধর্মপুস্তক আদিগ্রন্থ-এ কবীর, রুইদাস, ধন্না, পিপা, নামদেব সবাইকে 'ভগত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তমত এবং সবশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, কবীর রুইদাস, দাদুদয়াল বা নানকের ভক্তরা কালক্রমে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় বা পন্থ-এ সংগঠিত হয়। এঁদের মধ্যে কেবল নানকপন্থীদের সংখ্যাই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কবীর, রুইদাস বা দাদুপন্থীদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসে।

৩খ.৬ ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়

আপনারা ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামের প্রভাব এবং সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ী ভাবনার কথা জেনেছেন। এখন ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সঙ্গে ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে সুলতানি আমলে যে নতুন শিল্পধারা গড়ে উঠেছিল, যাকে পণ্ডিতেরা অনেক সময় ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী বলে থাকেন তার ইতিহাস জানুন। প্রথমে ইসলামীয় স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ও উপাদান এবং পরে ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভুত শিল্পরীতির ক্রমিক বিকাশের কথা আলোচনা করা হবে।

ইসলামীয় স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ও উপাদান :

তুর্কিরা আরব-পারস্য-বাগদাদের স্থাপত্য রীতি ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। মরুভূমির দেশ আরবে স্থাপত্যশৈলীর খুব একটা উন্নতি হয়নি। সেখানে নির্মাণকার্য মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে বাগদাদ ও পারস্যে স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। মুসলমানরা আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার যে সব দেশ জয় করেছিল সেইসব দেশের উন্নত স্থাপত্য রীতি বাগদাদ পারস্যে নিয়ে এসেছিল। তখন এই বাগদাদ-পারস্যের স্থাপত্য রীতি ভারতে আনা হল। ইসলামীয় স্থাপত্যের যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হল খিলান (arch), খিলান যুক্ত ছাদ (vault) এবং গম্বুজের (dome) নির্মাণ। ভারতীয়রা বড় বড় বাড়ির প্রবেশপথে থাম, কাঠ বা পাথরের কড়ি এবং জানলা দরজার গাঁথনির উপর লম্বা পাথর (lintel) ব্যবহার করত। থাম-কাঠ লিনটেল তৈরির প্রথাকে ইংরেজিতে traleeate বলে। তুর্কীরা এই traleeate প্রথার পরিবর্তে archuate অর্থাৎ খিলান, ভল্ট, গম্বুজের ব্যবহার নিয়ে আসে। ভারতীয় স্থাপত্য রীতিতে ছাদ ছিল সমতল (flat)। এর পরিবর্তে খিলানের সাহায্যে তৈরি

ছাদ ভল্ট এবং গম্বুজের ব্যবহার শুরু হয়। থামের ব্যবহার কমে আসায় ধর্মীয় সমাবেশের জন্য বড় বড় হলঘর তৈরি সহজ হয়।

তুর্কিরা গাঁথনির জন্য এক নতুন আস্তর বা সংমিশ্রণ নিয়ে আসে। চুন, সুরকি ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে বিশেষভাবে এই আস্তর তৈরি হত। ভারতে সাধারণত কাদা দিয়ে ইঁট গাঁথা হত বা পাথর টুকরো টুকরো করে কেটে পাশাপাশি বা ওপর ওপর রেখে বড় বড় প্রাসাদ বা মন্দির তৈরি হত। তুর্কিদের ব্যবহৃত আস্তর ভারতীয় আস্তর তুলনায় আরও উঁচুমানের। ফলে খিলান বা গম্বুজ তৈরি সহজ হয়।

সুলতানি আমলে কখনও কখনও মন্দির কিছুটা ভেঙে তার ওপরই মসজিদ তৈরি হত। কখনও কখনও হিন্দু জৈন মন্দির ভেঙে থাম বা বাড়ির অংশবিশেষ এনে তার ওপর মসজিদ বা বাড়ি তৈরি হত। কিন্তু এইভাবে সংগৃহীত উপকরণের জোগান কমে গেলে ছোট ছোট পাথর (pebbles) বা পাথরের চাঁই এনে (boulder) নতুন বাড়ির ভিত্তি নির্মাণ করা হয় এবং পাথর টুকরো টুকরো করে কেটে গাঁথনির কাজে লাগানো হয়। খলজী আমল থেকে লাল বেলে পাথরের প্রচলন হয়। লাল পাথরের ওপর অলংকরণের সুবিধা ছিল। তুঘলক আমল থেকে দেওয়ালের গায়ে পলেস্তরার (plaster) প্রচলন হয়। জিপসাম অথবা চুনের বিশেষ সংমিশ্রণে এই পলেস্তরা তৈরি হত। পলেস্তরা ব্যবহারে বাড়িগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

অলংকরণের কাজেও ইসলামী স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। হিন্দু-জৈনদের মন্দিরে দেব-দেবী, মানুষ বা পশুর মূর্তি আঁকা হয়। কিন্তু ইসলামে দেব-দেবী নেই। পশু ও মানুষের মূর্তি আঁকাও নিষিদ্ধ। তাই ইসলামী স্থাপত্যে সুন্দর হস্তাক্ষরে কোরানের বাণী লেখা হয় (Calligraphy)। অনেক সময় লতাপাতা ফুল এঁকে দেওয়াল সাজানো হত। লতাগুলো শুরু হয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে নানা শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে আবার মূল লতায় মিশে যেত (foliage)। তাছাড়া নানা জ্যামিতিক আকার—যেমন বৃত্ত থেকে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বহুভুজ—আবার বৃত্তে মিশে যাওয়া অলংকরণে ব্যবহার হত। আপনারা ইসলামী স্থাপত্যরীতির উপাদান ও অলংকরণের কথা জানলেন এবারে এই স্থাপত্য রীতির সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের বিবরণ পাঠ করুন।

তুর্কিরা এদেশে পশ্চিম এশিয়া থেকে স্থপতি বা বাড়ি তৈরির কারিগর কদাচিৎ আনতেন। তাদের ভারতীয় কারিগর-মিস্ত্রির ওপরই বেশি করে নির্ভর করতে হত। ভারতীয় মিস্ত্রিরা পুরুষানুক্রমে অর্জিত নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রাসাদ বা মসজিদ গড়ত। ফলে অনিবার্যভাবে মুসলমানী স্থাপত্য রীতির ওপর ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ পড়ে। উভয় স্থাপত্য রীতিতেই অলংকরণের প্রাচুর্য ছিল। ধীরে ধীরে তুর্কিরা ভারতীয় অলংকরণ পদ্ধতি যেমন পদ্মফুলের ব্যবহার অনুকরণ করে। তুর্কি আমলের শেষের দিকে প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে যে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ হয় তাতে স্থানীয় উপকরণ এবং ভাবধারার সঙ্গে সমন্বয় আরও গভীর হয়। বঙ্গদেশে কুটিরে বা মন্দিরে দো-চালা চৌ-চালার ব্যবহার হত। মসজিদ গঠনের আঙ্গিকে পরিবর্তন হয়ে বঙ্গে দো-চালা, চৌ-চালার অনুকরণে মসজিদ তৈরি হতে লাগল। জৌনপুরের স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু স্থাপত্য রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে মসজিদগুলির গম্বুজে হিন্দুরীতির প্রভাব চোখে পড়ে। কাশ্মীরের স্থাপত্য শিল্পের প্রধান উপাদান স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কাঠ। সুলতানি আমলের পূর্বেই গুজরাটে এক নূতন স্থাপত্য রীতি গড়ে উঠেছিল। সুলতানি যুগের স্থাপত্যে আগেকার স্থাপত্য রীতির ছাপ—যেমন অধিক সংখ্যায় স্তম্ভ নির্মাণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

সবশেষে আপনারা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতি বিকাশের পর্যায়গুলি জেনে নিন।

প্রথম পর্যায় শুরু হয় দাস-সুলতানদের সময়ে দিল্লী বিজয়-এর পরে (১১৯২) খ্রিঃ)। রায় পিথৌরা কেল্লা দখল করে দিল্লীর উপকণ্ঠে নতুন দিল্লী শহর নির্মাণে হাত দেওয়া হয়। এখানে কুতুবউদ্দিন কু-ওয়াটুল মসজিদ নির্মাণ করেন। শোনা যায় সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ভেঙে, তাদের অংশবিশেষ দিয়ে এটি গঠিত। হিন্দু মিস্ত্রিরাই তৈরি করে ফলে সমগ্র স্থাপত্য কীর্তির ওপর ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। মন্দিরের

ভাঙা অংশের অলংকরণ ঢাকার জন্য অনেক সময় উল্টো করে গাঁথা হত। অনেক সময় পুরনো অলংকরণের পাশেই কোরানের বাণী লেখা হত। এই সময়ের দুটি বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন—আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া ও ২২৫ ফুট উঁচু কুতুব মিনার। ইলতুতমিস কুতুব মিনার নির্মাণ করান সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাফির স্মরণে।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্য বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় খলজি সুলতানদের আমলে। এই সময়ের বিখ্যাত কীর্তির মধ্যে পড়ে আলাউদ্দিনের দ্বিতীয় দিল্লী শহর। কুতুব মিনারের চত্বরে 'আলাই-দরওয়াজা' এবং চিস্তি সাধক নিজামুদ্দিনের সমাধির কাছে 'জামাইত-খানা' মসজিদ। উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। খলজী স্থাপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল—প্রথম, ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে ছুঁচালো খিলান তৈরি। দ্বিতীয়, খিলানের ওপর গম্বুজ নির্মাণ। তৃতীয়, অলংকরণের সুবিধার জন্য লাল বেলে পাথরের ব্যবহার। চতুর্থ, খিলানের নীচে পদ্মকুঁড়ির ব্যবহার। পঞ্চম, প্রবেশদ্বারে পর্যায়ক্রমে সরু ও চওড়া খিলানের ব্যবহার।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় তুঘলক আমলে। তুর্কী আমলের প্রথম দিকের স্থাপত্য ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। তুঘলক আমলে এই আড়ম্বর স্তিমিত হয়ে আসে। তুঘলকদের শিল্পরীতি অনেক সাদামাটা। এই বংশের প্রথম তিনজন সুলতান স্থাপত্য কীর্তির জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক যমুনা নদীর ধারে তৃতীয় দিল্লী শহর 'তুঘলকাবাদ' নির্মাণ করেন। এটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। মহম্মদ তুঘলক চতুর্থ দিল্লী শহর 'জাহানপনাহ' নির্মাণ করেন। এটিও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। জাহানপনাহ ছাড়াও তিনি তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী দৌলতাবাদ শহরটি গড়েছিলেন। স্থাপত্য কীর্তিতে ফিরোজ শাহ তুঘলক বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তিনি পঞ্চম দিল্লী শহর ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এখানেই তাঁর বিখ্যাত প্রাসাদ ও দুর্গ ফিরোজশাহ কোটলা অবস্থিত ছিল। এছাড়াও ফিরোজ শাহ ফতেহাবাদ, হিসার, জৌনপুর প্রভৃতি শহর পত্তন করেন। শহর, প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি, জলাধার, খাল, সেতু, সরাই, বাগান প্রভৃতি অসংখ্য নির্মাণ কাজের সঙ্গে ফিরোজ শাহ তুঘলকের নাম জড়িত আছে।

আমরা এখানে তুঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নেব। বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথম, এই সময় দেওয়ালগুলিতে পলেস্তরা (plaster) করা হত। দ্বিতীয়, দেওয়ালগুলি কিছুটা কাত করে (battered) গাঁথা হত। তৃতীয়, এ সময়ে খলজি আমলের ছুঁচালো (pointed) খিলানের পরিবর্তে আরও প্রশস্ত খিলানের ব্যবহার হয়। প্রবেশপথ চওড়া করার জন্য এইসব খিলান গাঁথা হত। চওড়া খিলান গাঁথার জন্য থাম ও বিম (beam)-এর সাহায্য নেওয়া হত। চতুর্থ, গম্বুজগুলি পুরোপুরি গোলাকার না হয়ে শিখরদেশে একটা ভাঁজ দিয়ে (stifled) গাঁথা হত। সবশেষে লক্ষণীয় যে সমাধি সৌধগুলি এখন থেকে অষ্টভুজ আকৃতিতে গড়া হয়।

তুঘলকদের পর সৈয়দ ও লোদী বংশের রাজত্বকালে দিল্লী সাম্রাজ্যের সীমা সংকুচিত হয়ে দিল্লী ও আশেপাশেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময় দিল্লীর আশেপাশে বহু সংখ্যক মসজিদ ও কবর তৈরি হয়। এগুলি এতই চোখে পড়ার মত যে দিল্লীকে লোকে কবরীস্থান (graveyard) আখ্যা দেয়।

৩খ.৭ সারাংশ

সুলতানি আমলে রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও বহুদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতীয় সমাজের ওপর ইসলামীয় প্রভাব ব্যবহারিক জীবনে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, বেশভূষা, খানা-পিনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। ওই সময়ে হিন্দুরা সুফি সাধকদের প্রতি এবং অনেক মুসলমান ভক্তি সাধকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে একটা সমন্বয়ীভাব গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক

ক্ষেত্রে এই সমন্বয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে স্থাপত্য শিল্পে। তুর্কীরা পশ্চিম এশিয়া থেকে এদেশে স্থাপত্য শিল্পে উন্নত আস্তরের (mortar) ব্যবহার এবং খিলান-গম্বুজ নির্মাণ ও অলংকরণ পদ্ধতি নিয়ে আসে। ভারতে স্থাপত্য- শৈলী ইতিপূর্বে যথেষ্ট উন্নত ছিল। ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী এবং ভারতীয় শৈলীর সংমিশ্রণে সুলতানি যুগে এক নতুন স্থাপত্যশৈলীর, যাকে অনেক ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশৈলী বলেন, উদ্ভব হয়। সুলতানি আমলের স্থাপত্য কীর্তি শত শত বৎসর ধরে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের প্রশংসা পেয়ে আসছে।

৩খ.৮ অনুশীলনী

১। ভারতে চিস্তি সিলসিলাহ-এর জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করুন।
২। ভক্তি আন্দোলনের কারণগুলি আলোচনা করুন।
৩। বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
৪। সুফি সিলসিলাহ বলতে কি বোঝায়?
৫। খলজি স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
৬। তুঘলক আমলের স্থাপত্য আগের সুলতানি স্থাপত্য কোনদিক থেকে পৃথক?
৭। নীচের ব্যক্তি/বিষয়ের ওপর তিন লাইন করে লিখুন :
(ক) জ্ঞানেশ্বর, (খ) "এক ধর্ম শরণ", (গ) সামা, (ঘ) খানকাহ, (ঙ) সুলতানি স্থাপত্যে অলংকরণ।

৩খ.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. K. M. Ashraf : *Life and Condition of People of Hindustan.* *(বাংলা অনুবাদ : হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্যা, কলিকাতা, ১৯৯৪)।*
2. Tarachand : *Influence of Islam on India. Allahabad. 1946.*
3. Yusuf Hussain : *Glimpses of Medieval Indian Culture, Kolkata 1957.*
4. রমাকান্ত চক্রবর্তী : বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, কলকাতা ১৯৯৬।
5. Percy Brown : *Indian Architecture (Islamic Period) Bombay. 1968.*

একক ৪ক ❑ সুলতানি শাসনের পতন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা— বাবর— মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা—শেরশাহ

গঠন

৪ক.০ উদ্দেশ্য
৪ক.১ প্রস্তাবনা
৪ক.২ সুলতানি শাসনের পতনের কারণ
৪ক.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
 ৪ক.৩.১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি
 ৪ক.৩.২ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি; পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ
৪ক.৪ বাবর
৪ক.৫ মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা
৪ক.৬ শেরশাহ
 ৪ক.৬.১ শেরশাহের সংস্কার
৪ক.৭ সারাংশ
৪ক.৮ অনুশীলনী
৪ক.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন—

- দিল্লী সুলতানির ভাঙনের কারণ।
- ষোড়শ শতকের শুরুতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলির রাজনৈতিক বিবরণ ও বাবর কর্তৃক পৈতৃক রাজ্য ফরগণার সিংহাসন লাভ ও সিংহাসনচ্যুত হওয়ায় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- বাবরের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা।
- পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগানদের পরাজয় ও বাবর কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার।
- মুঘল-আফগান ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিভিন্ন পর্যায় ও অবশেষে আফগানদের চূড়ান্ত পরাজয়।
- শেরশাহ-এর উত্থান ও দিল্লীর সিংহাসন লাভ।
- শেরশাহ-এর সংস্কার ও সংস্কারের মূল্যায়ন।

৪ক.১ প্রস্তাবনা

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। মুঘল সাম্রাজ্য যে তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়। পাণিপথের যুদ্ধের পরও বাবর ও

তাঁর পুত্র হুমায়ুনকে সিংহাসন রাখার জন্য চিতোর, গুজরাট, মালব এবং বিহার ও বঙ্গদেশের আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আফগান নেতা শেরশাহের হাতে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পনের বছর দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিরহিন্দের যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এর পরও আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁকে আফগান সুলতান আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) পরাজিত করতে হয়। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আপনারা মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়ার আগে দিল্লি-সুলতানির পতনের কারণগুলি জেনে নিন।

৪ক.২ সুলতানি শাসনের পতনের কারণ

দীর্ঘ তিনশ' বছরেরও বেশি সময় (১২০৬-১৫২৬) সুলতানি শাসন দিল্লিতে টিকে ছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই সুলতানরা কতকগুলি সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হন। এই সমস্যাগুলিই সুলতানি শাসনে ভাঙন সৃষ্টি করেছিল। সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথম হচ্ছে উত্তরাধিকারের সমস্যা। ইসলামি আইনে উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসনে বসার অধিকার স্বীকৃত হয়নি। ফলে প্রত্যেক সুলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে বিবাদ দেখা দিত। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র আরাম শাহ-এর পরিবর্তে কুতুবউদ্দিনের অনুগত ক্রীতদাস ও জামাই ইলতুতমিস সিংহাসনে বসেন। ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে দীর্ঘ বিরোধের পর ইলতুতমিসের ক্রীতদাসদের নিয়ে গড়া ''চল্লিশ আমীর গোষ্ঠী''-র সভ্য বলবন সিংহাসন দখল করেন। বলবন রাজবংশকে দৃঢ় করার জন্য ও রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে রক্তস্রোত বয়ে যায়। বলবন কাইখসরুকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। কিন্তু কাইখসরুর পরিবর্তে কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসান হয়। কাইকোবাদও গদী রাখতে পারেননি। জালালউদ্দিন খলজি তাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নতুন খলজি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার জালালউদ্দিন নিজে ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিনের হাতে নিহত হন। পরাক্রান্ত সুলতান আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নতুন রাজবংশ, তুঘলক বংশের সূচনা করেন। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। অভিজাতদের চক্রান্তে সৈয়দরা ক্ষমতা দখল করে ও সৈয়দ বংশের রাজত্বকাল শুরু হয়। এইভাবে উত্তরাধিকারের নির্দিষ্ট আইনের অভাবে তরবারিই ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগে সুলতানের আত্মীয়স্বজন ও অভিজাতরাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিত। সিংহাসন নিয়ে হানাহানিতে বহু দক্ষ শাসককে হারিয়ে রাষ্ট্র ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। লোদীদের শাসনকালে এক নতুন সমস্যা দেখা দেয়। লোদীরা ছিল আফগান। আফগান অভিজাতরা রাজাকে তাদেরই একজন মনে করত। ফারমুলী, মারওয়ানি, লোহানী, নিয়াজী প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত আফগানরা সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার দাবী জানাত। এজন্যই ইব্রাহিম লোদী তাঁর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করলে তাঁর পিতৃব্য আলম খাঁ, পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ প্রভৃতি আফগান নেতারা বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়।

দ্বিতীয় যে সমস্যা সুলতানি শাসনের পতন ঘটিয়েছিল সেটি হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বাঁটোয়ারা নিয়ে অভিজাত ও সুলতানদের মধ্যে ক্রমাগত লড়াই। পরাক্রান্ত সুলতানরা কখনও কখনও লোভী স্বার্থপর অভিজাতদের বশে রাখতে পারলেও তাদের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না।

ইলতুতমিস বিরোধীদের দমন করে অনুগত ক্রীতদাসদের নিয়ে 'তুরকান-ই চিহিলগানি' বা 'চল্লিশের আমীর গোষ্ঠী তৈরি করেন। তারাই রাষ্ট্রের সব সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করত। ক্ষমতাহীনেরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ইলতুতমিসের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। রাজিয়া আবিসীনীয়দের উচ্চপদ দিতে থাকলে রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। বলবন 'চল্লিশ আমীর গোষ্ঠী'র সভ্য হলেও সিংহাসন দখল করে ঐ গোষ্ঠীর সব প্রভাবশালী সদস্যদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন। এবং অনুগতদের নিয়ে নতুন করে অভিজাত গোষ্ঠী, 'বলবনী', সংগঠিত করেন। 'চল্লিশ আমীর গোষ্ঠী'র সব সদস্যই শাসনকার্যে দক্ষ ছিল। রাষ্ট্র তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বলবনের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই দাসবংশকে উচ্ছেদ করে খলজীরা ক্ষমতা দখল করে। আলাউদ্দিন খলজী দক্ষ লোকেদের, তারা যে গোষ্ঠীরই হোক না কেন, উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত করতেন। তাঁর সময়ে আবিসীনিয়রা (যেমন মালিক কাফুর) উঁচুপদ লাভ করেছিল। দক্ষতা দেখালে ভারতীয় মুসলামানদেরও বিশেষ অনুগ্রহ দেখনো হত। আলাউদ্দিন নতুন করে অভিজাত গোষ্ঠী তৈরি করেন। তাদের বলা হত 'আলাই'। কিন্তু স্বার্থান্বেষী আলাইরাও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং আলাউদ্দিনের মৃত্যুর (১৩১৬) চার বৎসরের মধ্যেই তুঘলকরা ক্ষমতা দখল করে।

তুঘলক বংশের সুলতান মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক উভয়েই সুলতানি সাম্রাজ্য ভাঙনের জন্য নানাভাবে দায়ী। মহম্মদ তুঘলক নতুনভাবে অভিজাত সম্প্রদায় করার চেষ্টা করেন। তাঁর সময়ে বিদেশিরা বিশেষভাবে খোরাসানীরা (যাঁদের তিনি 'আইয়্যা' বা 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করতেন) অনেক উঁচুপদ লাভ করে। দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় মুসলমান এবং হিন্দুরাও বিশেষ অধিকারভোগী অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পুরনো অভিজাতরা অসন্তুষ্ট হয়। মহম্মদ তুঘলকের সময় বাইশবার বিদ্রোহ হয় এবং দক্ষিণে বাহমনী রাজ্য সুলতানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরোজ তুঘলক সিংহাসনে বসেই মহম্মদ তুঘলকের সময় অভিজাতদের হারানো ক্ষমতা ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। যারা ঐ সময় মোটা টাকার ঋণ নিয়েছিল তাদের ঋণ মকুব করা হয়, যারা ইকতা শাসন করত তাদের পুরুষানুক্রমে ইকতা ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। এমনকি উঁচু রাজপদ ও সেনাবাহিনীর পদও পুরুষানুক্রমে ভোগের অধিকার দেওয়া হল। রাজকর্মচারী ও সাধারণ সৈনিকদের মাইনের পরিবর্তে জায়গির অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব আদায় ও ভোগের অধিকার দেওয়া হল। ফিরোজ তুঘলক প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে মোটামুটি রাজ্যে শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু ঐ সময় অভিজাতরা প্রচুর ক্ষমতা এবং অর্থ সঞ্চয় করে। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরই তাদের অনেক বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফিরোজ তুঘলক সামরিক বাহিনীতে উত্তারধিকার সূত্রে পদ ভোগ করার অধিকার দিয়ে এবং কার্যত আলাউদ্দিন প্রবর্তিত 'দাগ' প্রথার অবসান ঘটিয়ে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দেন। তুর্কি সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ডই ছিল সামরিক বাহিনী। এই মেরুদণ্ডই দুর্বল হওয়ায় সাম্রাজ্যও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। লোদীরা ছিল আফগান। আফগানদের প্রবল স্বতন্ত্র্যবোধ এবং সর্দারদের অধীনে উপজাতিভিত্তিক সেনাবাহিনী গঠন কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীকে আরও দুর্বল করে। ফলে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী বহিরাক্রমণ রোধের ক্ষমতা হারায়।

সবশেষে দিল্লি সুলতানির আর একটা সমস্যার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম থেকেই সুলতানি সাম্রাজ্য বহিরাক্রমণ অর্থাৎ মোঙ্গলদের আক্রমণে বিব্রত ছিল। আলাউদ্দিনের সময় অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর, তুর্কি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা পরিষ্কার হয়ে গেলে, মঙ্গোল নেতা তৈমুরলঙ দিল্লি আক্রমণ করেন। তিনি শুধু অগণিত নিরীহ লোকেদের হত্যাই করেননি, দিল্লি থেকে অগাধ ধনসম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে যান। তৈমুরলঙের আক্রমণের ফলে দিল্লি-সুলতানির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, কঙ্কালসার দেহটি পড়ে থাকে। বাবরের পক্ষে চূড়ান্ত আঘাত হানতে বেগ পেতে হয়নি।

৪ক.৩ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন। মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ জানার আগে আপনারা ষোড়শ শতকের শুরুতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি জেনে নিন।

৪ক.৩.১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ষোড়শ শতকের শুরুতে ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুটো বড় দেশ ছিল—একটি ইরান ও অন্যটি তুরান। ইরানের অন্য নাম পারস্য। মধ্য-এশিয়ার সির ও আমু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে তুরান বলা হত। তুরানের অন্য নাম ট্রান্স-অক্সিয়ানা (Trans-Oxiana)। আমরা যে সময়ের ইতিহাস আলোচনা করছি ঐ সময়ে তুরানের অধিবাসীদের উজবেগ বলা হত। 'উজবেগ' কথাটা এসেছে চেঙ্গিজ খাঁনের এক বংশধর উজবেগ খাঁর (রাজত্বকাল ১৩১২-১৩৪০ খ্রিঃ) নাম থেকে। উজবেগরা চাগতাই ভাষায় কথা বলত। ধর্মে তারা ছিল গোঁড়া সুন্নি।

ইরান বা পারস্যে যে রাজবংশ রাজত্ব করত তার নাম সাফাভি। আদি থেকে পারস্যরই অধিবাসী। ধর্মে শিয়া মুসলমান। ইরানের সাফাভি সাম্রাজ্য আয়তনে বাড়তে থাকলে স্বভাবতই তুরানের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। ধর্মের দিক থেকে পার্থক্যও এই বিরোধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

তৈমুরলঙ মধ্য-এশিয়া থেকে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশধররা এই সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারেনি। উত্তারাধিকারের নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব, পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যতা তাদের মধ্যে অবিরত কলহের কারণ ছিল। বাবর ছিলেন তৈমুরলঙের প্রত্যক্ষ বংশধর, আবার মাতৃকুলে চেঙ্গিজ খাঁর বংশের সঙ্গেও সম্পর্কিত। তৈমুরলঙের বংশধরদের মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগিতে বাবরের বাবা ওমর শেখ মির্জার ভাগে পড়ে ফরগণা নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে ওমর শেখের মৃত্যু হলে বাবরের ওপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আসে। বাবরের বয়স তখন মাত্র বার। এদিকে উজবেগ সম্রাট সাইবানু খাঁ তৈমুরলঙের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলি একে একে গ্রাস করছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ফরগণাও দখল করেন। বাবর পৈতৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরানের সাফাভি রাজাদের আশ্রয়ে চলে যান। সাফাভিরা তাঁকে কাবুল দখল করতে সাহায্য করে। কাবুলের দখল মজবুত করে বাবর ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে সাফাভিরাজ শাহ-ইসমাইলের সাহায্য নিয়ে আবার ফরগণা দখলের চেষ্টা করেন। এবার ফরগণা তাঁর দখলে আসে। কিন্তু ফরগণার অধিবাসীরা (যাঁরা ধর্মে সুন্নী) শিয়া পারস্যের সহায়তা পছন্দ করেনি, বরং তারা সুন্নী উজবেগদের শাসনই পছন্দ করল। ফলে অচিরেই ফরগণা বাবরের হাতছাড়া হয়ে যায়। উজবেগের কাছে পরাজিত হয়ে বাবর কাবুলের অধিকার আরও দৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। ক্রমে তাঁর নজর পড়ে ভারতের ওপর।

৪ক.৩.২ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি; পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ

ষোড়শ শতকের শুরুতে উত্তর ভারতে লোদীরা রাজত্ব করেছিলেন। লোদী বংশের সবচেয়ে সফল সুলতান সিকান্দার শাহ (১৪৮৯-১৫১৭) দিল্লি-সুলতানির হৃতগৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহী আফগান সমস্ত অভিজাতরা সিকান্দারের

নেতৃত্ব মানতে বাধ্য হন। সিকান্দার-এর পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে বসলে আফগান স্বাতন্ত্র্যবোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। রাজ্যের প্রভাবশালী আফগান নেতাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ করতে ইব্রাহিম তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার নীতি নেন। জৌনপুরের শাসনকর্তা জালাল খান, সেনাপতি আজম শেরওয়ানি ও আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী একে একে নিহত হলে আফগান সর্দাররা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান এদের নেতৃত্ব দেন। বিহারের জায়গিরদার শেরখান শূর (পরে ইনিই শেরশাহ নামে বিখ্যাত হন) এবং পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়।

মধ্য ভারতে ঐ সময় তিনটি বড় রাজ্য ছিল—গুজরাট, মালব ও মেবার। মালবের সুলতান মহম্মদ দ্বিতীয় খলজীর অবস্থা তুলনায় দুর্বল। গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজফ্‌ফর এবং মেবারের সিসোদিয়া বংশের রাণা সঙ্গ (সংগ্রাম সিংহ) উভয়েই মালব দখল করার চেষ্টা করছিলেন। উত্তর ভারত থেকে গুজরাটের বন্দরে পণ্য চলাচল হত মালবের ওপর দিয়ে। কৃষির দিক থেকেও মালব ছিল বেশ উন্নত। তাছাড়া লোদী সাম্রাজ্য এবং গুজরাট ও মেবারের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (buffer state) মালব সামরিক দিক থেকেও গুরত্বপূর্ণ অঞ্চল। মালবের প্রধান মন্ত্রী মেদিনীরাই অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও লোদী সাম্রাজ্য, গুজরাট ও মেবার-এর চাপ থেকে রাজ্য সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন, রাণা সঙ্গ রণথম্ভোর ও চান্দেরী জয় করে গুজরাট, মালব ও উত্তর ভারত তিন দিকেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুটি উত্তর ভারতের রাজনীতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। (বাবরের আত্মচরিত 'বাবরনামা' গ্রন্থে ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সুন্দর বিবরণ আছে।) ওপরের বিবরণ বাবরের আত্মচরিত 'বাবরনামা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবর লিখেছেন ভারতের রাজ্যগুলি ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে দিল্লির সাম্রাজ্য দখল করে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করার চেষ্টায় ছিল। বাবরের এ ধারণা ভুল। হিন্দু রাই, রাণারা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজাদেরই অনুগত ছিল। আবার মুসলমান হাসান মেওয়াটি বাবরের বিরুধে রাণা সঙ্গাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। অতএব ধর্মের ভিত্তিতে ভারতে রাজনৈতিক বিভাজনের ধারণাটা ভুল।

কাবুল থেকে বাবর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি উজবেগদের হাতে পরাজিত হয়ে মধ্য-এশিয়ায় পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের আশা তখনকার মত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনুর্বর আফগানিস্তান নিয়েও তার ক্ষুধা মেটেনি। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকেই তাঁর নজর। তাছাড়া বাবর মনে করতেন তৈমুরলঙের উত্তরাধিকারী হিসাবে ভারতের ওপর তাঁর অধিকার আছে। বাবরের সামনে সুযোগ উপস্থিত হল যখন পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান বাবরকে ইব্রাহিমের বিরুধে যুধ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। সম্ভবত রাণা সঙ্গাও বাবরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

পাণিপথের বিখ্যাত যুধের আগে বাবর চারবার ভারত আক্রমণ করেন। প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশপথ ভীরা (১৫১৯-২০), পরে শিয়ালকোট (১৫২০) বেং লাহোর (১৫২৪) অধিকার করেন। এরপর কুরুক্ষেত্রের কাছে পাণিপথের প্রথম যুধ শুরু হয় (১৫২৬) খ্রিঃ)। এই যুধে ইব্রাহিম লোদীর পক্ষে ছিল এক লক্ষ সৈন্য এবং সহস্রাধিক হস্তী। অন্যদিকে বাবর এনেছিলেন বার হাজার অশ্বারোহী এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী। 'রুমি' প্রথায় বাবর যুধ করেন। এই প্রথায় সামনা-সামনি যুধ না করে মোঘল সৈন্য দুই পাস দিয়ে আফগানদের আক্রমণ করে এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে আফগানদের ঘিরে ফেলে। পরে গোলন্দাজ বাহিনী সামনে থেকে জানা যায় যে পাণিপথের প্রথম যুধে প্রায় কুড়ি হাজার আফগান সৈন্য প্রাণ হারায় এবং স্বয়ং লোদী মারা যান। যুধের পর মুঘল সৈন্যরা দিল্লী এবং লোদীদের রাজধানী আগ্রায় সঞ্চিত অগাধ ধনরত্ন

লুট করে। লুটের পরিমাণ এতই বিপুল ছিল যে বাবর তাঁর সৈন্য ও অনুচরদের পুরস্কৃত করেও বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন কাবুলে নিয়ে যান এবং মুসলমান দুনিয়ার প্রভাবশালী সুলতানদের উপঢৌকন পাঠান।

আপনারা আগেই জেনেছেন যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি। কেন না রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে রাজপুতরা ভারতে স্থায়ী মুঘল রাজত্বের ঘোর বিরোধী ছিল এবং পূর্ব ভারতে আফগানরা পাণিপথের পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাবরের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মেবারের রাণা সঙ্গাকে পরাজিত করা।

রাণা সঙ্গ মালবের মেদিনীরাই, হাসান খাঁ মেওয়াটি এবং বহু বিক্ষুব্ধ আফগান সর্দারদের সহয়তা পান। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার প্রান্তরে মুঘল সৈন্য রাজপুত-আফগান মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। 'বাবরনামা' এবং মুঘল যুগের দুই ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ও বদাউনির লেখায় খানুয়ার যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনী জেনে এবং তাদের বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে মুঘল সৈন্য ভীত হয়ে পড়ে। বাবর তখন তাদের উন্মাদনাময় বক্তৃতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। নাটকীয়ভাবে পান-পাত্র ভেঙে ফেলে আর জীবনে মদ স্পর্শ করবেন না শপথ নেন। সৈন্যদেরও তিনি কোরাণ ছুঁইয়ে আপ্রাণ যুদ্ধ করার শপথ নেওয়ান। মুঘলরা এখানেও 'রুমি' প্রথায় যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত রাজপুতরা পরাজিত হয়। রাণা সঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যান কিন্তু হাসান খাঁ মেওয়াটি প্রাণ দেন। এরপর বাবর চান্দেরীর যুদ্ধে মেদিনীরাইকে পরাজিত করেন। এইভাবে রাজপুত প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

বিহারে সিকান্দার লোদীর পুত্র, ইব্রাহিম লোদীর ভাই মহম্মদ লোদীর নেতৃত্বে আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। বঙ্গের শাসনকর্তা নসরৎ খাঁ এদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। পাটনার উত্তরে গঙ্গা-ঘর্ঘরার মিলন স্থান ঘর্ঘরা বা ঘাগরায় ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল বাহিনী আফগানদের সম্মুখীন হয়। এখানেও বাবরের কাছে আফগানরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এইভাবে পাণিপথ, খানুয়া, চান্দেরী এবং ঘাগরার যুদ্ধে মুঘল-বিরোধীদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি তখনও সুদৃঢ় হয়নি। ঐ কাজে হাত দেওয়ার আগেই বাবরের মৃত্যু হয় (১৫৩০ খ্রিঃ)। পুত্র হুমায়ুনের ওপর আরব্ধ কাজ শেষ করার দায়িত্ব আসে।

৪ক.৪ বাবর

জহিরউদ্দিন মহেম্মদ বাবর ছিলেন তৈমুরলঙের প্রত্যক্ষ বংশধর ওমরশেখ মির্জার পুত্র। জন্ম ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে। তৈমুরলঙের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য আত্মীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি হলে ওমরশেখের ভাগে পড়ে ট্রান্স-অক্সিয়ানার (সাধারণ নাম তুর্কিস্থান) ফরগণা নামে ক্ষুদ্র রাজ্য। বাবরের বয়স যখন মাত্র বাবো বছর তখন ওমরশেখের মৃত্যু হয়। বাবরের উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব আসে। কৈশোরেই বাবর যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৪৯৬ ও ১৪৯৭ সালে দুবার তিনি সমরখন্দ দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুবারই ব্যর্থ হন। ঐ সময় উজবেগ সুলতান সাইবানু খান তুর্কীস্থানের রাজ্যগুলি একে একে জয় করেছিলেন। ফরগণার অভিজাতদের চক্রান্তে ফরগণা রাজ্যও সাইবানু দখল করেন। রাজ্যহারা হয়ে কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে বাবর একবছর ভ্রাম্যমান অবস্থায় কাটান। পরে ইরানের সাফাভিরাজ ইসমাইল শাহ-এর সহয়তায় ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল দখল করেন। তুরানী অধিপতি শাহবানুর মৃত্যু হলে ইরানের সহায়তায় বাবর ফরগণা পুনরুদ্ধার করেন এবং সমরখন্দ ও বুখারাও জয় করেন। কিন্তু ফরগণার অভিজাতদের চক্রান্তে পৈতৃক রাজ্য এবং তুর্কীস্থানের অন্য বিজিত অঞ্চলও বাবরের হাতছাড়া হয়। বাবর কাবুলের অধিকারই মজবুত করতে থাকেন। ঠিক ঐ সময় ভারতবর্ষ থেকে ইব্রাহিম

লোদীকে আক্রমণ করার আমন্ত্রণ আসে। আপনারা ওপরে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ও ঘাগরার যুদ্ধে বাবরের জয়লাভ ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা পড়েছেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়। তাঁরই ইচ্ছামত কাবুলের নির্জন পর্বতগাত্রে অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়।

যোদ্ধা হিসাবে বাবর তৈমুরলঙের দিগ্বিজয়ের ঐতিহ্য বহন করে চলেছিলেন। মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ করা ছাড়াও বাবরের চরিত্রের এক মহত্তর দিক ছিল। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের প্রকৃতি প্রেমিক লেখক। মধ্য-এশিয়া ও পারস্যের সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক। তুর্কীভাষায় লেখা তাঁর আত্মচরিত 'বাবরনামা' (গ্রন্থের অন্য নাম তুজুক-ই-বাবরী) তাঁকে অমরত্ব দান করার পক্ষে যথেষ্ট। সহজ সাবলীল ভাষায় লেখা এই বই-এ বাবর নিজের দেশের ফল, ফুল, জীবজন্তু, জলবাতাস সম্পর্কে তাঁর গভীর ভালবাসার কথা লিখেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর ভাল লাগে না। এখানে আঙুর, খরমুজ পাওয়া যায় না, এখানকার আবহাওয়া ভাল নয়, এখানকার মানুষের পোশাক তাঁর পছন্দ নয়। এসব কথা খুব সহজ ভাষায় তিনি লিখে গেছেন। বাবরের আত্মচরিত থেকে ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা জানা যায়। লেখক ছাড়াও বাবর ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। তুর্কী ও ফারসী ভাষায় তিনি বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেছেন।

স্বল্পস্থায়ী জীবনে বাবর শাসন-সংস্কার বা প্রজাহিতৈষী আইন-কানুন রচনা করে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। তবে তিনি ঢোলপুর ও আগ্রার আশেপাশে এবং আফগানিস্তানে বহু উদ্যান স্থাপন করেছিলেন এবং আরও অনেক উদ্যানের নকশা রচনা করেছিলেন। বাবরের ভারত-বিজয়ের পর মধ্য-এশিয়া এবং ভারতের মধ্যে আবার নতুন করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

৪ক.৫ মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা

মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস আপনারা তিনটি পর্যায়ে পাঠ করবেন। প্রথম পর্যায় শুরু হয় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান ও ইব্রাহিম লোদির পিতৃব্য আলম খান কর্তৃক বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানানো থেকে, শেষ হয় পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ও ঘাগরায় আফগানদের পরাজয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণ থেকে (১৫৩০), শেষ কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০) শেরশাহের হাতে হুমায়ুনের পরাজয়ে। এরপর পনের বছরের (১৫৪০-১৫৫৫) বিরতি। ঐ সময় শেরশাহ ও তাঁর পুত্র ও আত্মীয়রা দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিল। তৃতীয় ও শেষ পর্যন্ত আরম্ভ হয় হুমায়ুনের দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা থেকে (১৫৫৪ খ্রিঃ), শেষ হয় পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে বৈরাখ খাঁর হাতে হিমুর পরাজয় ও মৃত্যুতে (১৫৫৬ খ্রিঃ)।

আপনারা মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস ইতিমধ্যেই পাঠ করেছেন। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ইতিহাস জানুন।

হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করে (১৫৩০ খ্রিঃ) নানা বিপদের সম্মুখীন হন। প্রথম বিপদ আসে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও আমীর-ওমরাহ-এর কাছ থেকে। বাবরের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়া থেকে তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিলেন। বাবর তাঁদের উচ্চ রাজপদ দেন। এঁরা এবং অন্যান্য আমীর-ওমরাহরা হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। আত্মীয়দের মধ্যে একজন, মহম্মদ সুলতান মির্জা নিজেকে তৈমুরলঙের বংশধর বলতেন। তিনি এখন দিল্লির সিংহাসনের দাবি জানান দ্বিতীয়ত, হুমায়ুনের ভাইরা হুমায়ুনের শত্রুতা করে। হুমায়ুন বড় ভাই কামরানকে কাবুল, কান্দাহার এবং পাঞ্জাবের হিসার পর্যন্ত রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরের ভাই আসকারিকে

দিয়েছিলেন সাম্ভালপুর, আর ছোট ভাই হিন্দালকে মেওয়াট শাসনের ভার দেন। এদের মধ্যে কামরান ছিলেন সবচেয়ে লোভী এবং কুচক্রী। যে সব জায়গা থেকে মুঘল সেনাবাহিনীতে সেরা সেপাই সংগ্রহ করা হত সেগুলি কামরানের হাতে পড়ে। ফলে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই অবস্থাতেই হুমায়ুনকে আফগানদের মোকাবিলা করতে হয়। আফগানরা লোদী সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখত। ইব্রাহিম লোদীর ভাই মহম্মদ লোদী এবং গুজরাটের সুলতান বাহাদুর খান বিক্ষুব্ধ আফগানদের নেতৃত্ব দেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন ভারতীয় রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মালব দেশ অধিকার করেন এবং চিতোর আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। হুমায়ুন তখন চুণার দুর্গ অধিকারে ব্যস্ত। মধ্য ভারতের অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আগ্রায় ফিরে আসেন। বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় তৈরি ছিলেন না। দূত পাঠিয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং হুমায়ুনের শত্রুদের আশ্রয় দেবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মহম্মদ মির্জাকে আশ্রয় দেন এবং চিতোর অধিকার করেন। চিতোর থেকে গুজরাট ফেরার পথে পড়ে মাণ্ডু। হুমায়ুন দ্রুত মাণ্ডু পৌঁছে বাহাদুরের ফিরে যাওয়ার এবং গুজরাট থেকে সাহায্য আসার পথ অবরোধ করেন। বাধ্য হয়ে বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পন করেন, কিন্তু পরে গোপনে দিউদ্বীপে পালিয়ে যান। হুমায়ুন গুজরাট দখল করে আসকারিকে শাসনের দায়িত্ব দিয়ে আগ্রা ফিরে যান। গুজরাটের বিপুল সম্পদ মুঘল সৈন্যরা অবাধে লুঠ করে। এতে গুজরাটবাসী ক্ষিপ্ত হয়। এই সুযোগে বাহাদুর শাহ দিউ থেকে ফিরে এলে পুরোনো সৈন্যদের সাহায্যে আসকারিকে গুজরাট থেকে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাহাদুর শাহ নিজে পর্তুগীজদের হাতে নিহত হন। গুজরাটে হুমায়ুনের বড় বাধা দূর হয়।

বাহাদুর শাহ-এর মৃত্যুর পর বিক্ষুব্ধ আফগান সর্দাররা বিহারের শেরখানের নেতৃত্বে গ্রহণ করে। সাসারামের সামান্য জায়গিরদার শেরখান নিজের দক্ষতা বলে বিহারে দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। হুমায়ুন চুণার দুর্গ অবরোধ অসমাপ্ত রেখে আগ্রা ফিরে গেলে (১৫৩১ খ্রিঃ) শেরখান চুণার দখল করেন। তিনি বঙ্গের সুলতান নসরৎ খান এবং পরে সুলতান মাহমুদ শাহ-এর সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে প্রচুর ধনসম্পত্তি হস্তগত করেন ও গোরক্ষপুর থেকে বেনারস অঞ্চল লুটপাঠ করে বেড়াতে থাকেন। হুমায়ুনের কাছে সব সংবাদই পৌঁছে যাচ্ছিল। তিনি শেরখানকে জব্দ করার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিহারের দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে শেরখান বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় আক্রমণ করে বসলেন।

হুমায়ুন প্রথমে চুণার দুর্গ অবরোধ করেন। চুণার দুর্গ এমনিতেই দুর্ভেদ্য। শেরখান সেখানে যে সৈন্যদল রেখেছিলেন তারা ছয় মাস পর্যন্ত দুর্গের দখল ছেড়ে দেয়নি। ফলে চুণার জয় করতে হুমায়ুনের বড্ড বেশি সময় লেগে যায়। ঐ সময়ে শেরখান গৌড় জয় করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে মুঘল সৈন্য এড়িয়ে বিহারে রোটাসগড় দুর্গে রেখে দেন এবং বিহারে ফিরে গিয়ে অবাধে লুঠপাট করে ঘুরে বেড়ান। হুমায়ুন চুণার জয় করে গৌড়ে যান এবং গৌড় জয় করে প্রচুর ধনরত্ন লুঠ করে বিহারের মধ্য দিয়ে আগ্রায় পাঠান। পরে গৌড়ে চারমাস ধরে বিজয় উল্লাসে মত্ত হন। শেরখান হুমায়ুনের পাঠানো ধনরত্ন বিহারে লুঠ করেন এবং আগ্রা থেকে মুঘল সৈন্যকে সাহায্যের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেন। হুমায়ুন এবার গৌড় থেকে আগ্রায় ফেরার পথে বক্সার-এর কাছে চৌসায় শেরখানের সৈন্যের সম্মুখীন হন। ইতিমধ্যেই তাঁর আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হুমায়ুন নদী পার হয়ে শেরখানকে আক্রমণ করতে গেলে শেরখান তাঁকে সহজেই পরাজিত করেন। হুমায়ুন কোনওভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু শেরখান ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। কনৌজের কাছে আবার হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন (১৫৪০)। হুমায়ুন সিন্ধুপ্রদেশে পালিয়ে যান আর শেরখান 'শেরশাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসেন। মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বিতীয় পর্যায় এখানেই শেষ হয়।

শেরশাহ আফগান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ

কালে বারুদের স্তুপে আগুন লাগার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। শেরশাহ-এর পুত্র ইসলাম খান পিতার সাম্রাজ্য অটুট রেখেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই (১৫৫৪ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলামের মৃত্যুর পর আফগান স্বাতন্ত্র্য আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। শেরশাহ-এর আত্মীয়দের মধ্যে আদিলশাহ শূর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। পাঞ্জাবে সিকান্দার শূর এবং গুজরাটের ইব্রাহিম খান প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে। এদেরও দৃষ্টি ছিল দিল্লীর সিংহাসনের ওপর।

কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন সিন্ধু প্রদেশে পালিয়ে যান। সিন্ধু জয় করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাইয়েদের কাছ থেকে কোনওরূপ সাহায্য না পেয়ে ব্যর্থ হন। এরপর কিছুদিন সিন্ধুর মরু অঞ্চলে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে ইরানের শাহ তামাহস্প (Tamahsp)-এর আশ্রয় নেন। তামাহস্প তাঁকে কাবুল ও কান্দাহার উদ্ধার করতে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধে কামরান পরাজিত ও বন্দী হন। কাবুল ও কান্দাহার হুমায়ুনের দখলে আসে। কামরানকে অন্ধ করে মক্কায় পাঠান হয়। পরে আসকারিকেও মক্কায় পাঠানো হয়। ছোট ভাই হিন্দাল হুমায়ুনের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। এইভাবে ভাইদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হুমায়ুন কাবুলে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। ভারতে শূরদের বিবাদের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে সিকান্দার শূরকে আক্রমণ করলে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার তৃতীয় ও শেষ পর্যায় শুরু হয়। লাহোরে জয়লাভ করে মুঘল সৈন্য এগিয়ে গিয়ে আবার সিরহিন্দ-এ আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে। হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয় (জানুয়ারি ১৫৫৬)। হুমায়ুনের নাবালক পুত্র আকবর তখন পাঞ্জাবের কালানোরে। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে আকবরকে 'বাদশাহ' ঘোষণা করা হয়। দিল্লীর শাসনকর্তা তখন মুঘল প্রতিনিধি তার্দিবেগ। আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমু তার্দিবেগকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে নেয়, এবং হিমু নিজেকেই দিল্লীর বাদশাহ রূপে ঘোষণা করে। পাঞ্জাব থেকে বৈরাম খাঁ স্বসৈন্যে এসে হিমুকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) পরাজিত ও নিহত করলে মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪ক.৬ শেরশাহ

ছেলেবেলায় শেরশাহ-এর নাম ছিল ফরিদ। জন্ম ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে (অনেকের মতে ১৪৮৬ খ্রিঃ)। তাঁর বাবা হাসান খান শূর ছিলেন বিহারের সাসারাম, হাজীপুর ও বেনারসের কাছে ভাণ্ডার জায়গিরদার। প্রথম জীবনে বিমাতার দুর্বব্যহারে ফরিদ জৌনপুর চলে যান এবং সেখানে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করেন। এক সময়ে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খান লোহানীর অধীনে চাকরী করেন। বাহার খান ফরিদের বীরত্বে (তিনি নিজ হাতে বাঘ শিকার করেছিলেন) খুশি হয়ে তাঁকে শেরখান নাম দেন।) পিতার মৃত্যুর পর শেরখান বাদশাহ-এর ফরমান নিয়ে পৈতৃক জায়গিরের উত্তরাধিকার ফিরে পান।

সামান্য জায়গিরদার থেকে দিল্লীর মসনদ দখল করা অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয়। শেরখানের এই সাফল্যের মূলে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। প্রথম, অল্পদিনের মধ্যে আগাধ সম্পত্তি লাভ, দ্বিতীয়, দক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন এবং তৃতীয়, তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্য।

লোদী আমল থেকে আফগান সর্দাররা সামরিক বাহিনীতে কাজ করে অথবা ইকতাদার হিসাবে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হয়েছিল। অনেক সময় সর্দাররা তাদের সম্পদ পত্নীদের হাতে গচ্ছিত রেখে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে প্রাণ হারাত। তখন তাদের বিধবা পত্নীরা ঐ সম্পত্তির মালিক হয়ে বসতেন। শেরখান তিনজন সম্ভ্রান্ত আফগান বিধবার বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করেন। এঁরা হলেন বাহার খান লোহানীর বিধবা পত্নী গহর

গুঁসাই, চুণার দুর্গের অধিপতি তাজখান-এর বিধবা পত্নী লাড মালিকা এবং অযোধ্যা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গিরের বিধবা পত্নী বিবি ফতে মালিকা। প্রথম দুইজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে শেরখান শত শত মণ সোনা ও হীরে-জহরৎ লাভ করেন। ফতে মালিকা তাঁকে বিয়ে না করলেও শেরখান কৌশলে তাঁর অগাধ ধনরত্ন (কেবল সোনা-ই ছিল ৩০০ মণ) হস্তগত করেন। এছাড়াও দুবার বঙ্গদেশের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে তিনি তাঁদের ধনরত্ন লুঠ করেন এবং গৌড় আক্রমণ করে প্রথমবার ১৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দ্বিতীয়বারে অপরিমেয় ধনরত্ন বিহারে নিয়ে আসেন। শেরখানের পর হুমায়ুন আবার গৌড় আক্রমণ করে ৫০০ খচ্চরের পিঠে ধনরত্ন বোঝাই করে মুঘল সৈন্যের পাহারায় আগ্রা পাঠান। কিন্তু বিহারের ওপর দিয়ে যাবার সময় শেরখান ঐ সম্পদ লুঠ করে নেন। লক্ষণীয় যে হুমায়ুন যখন প্রায়ই আর্থিক অনটনে ভুগতেন তখন শেরখানের কোনওদিন আর্থিক টান পড়েনি।

শেরখানের অর্থবল তাঁকে একটা অনুগত সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। লোদী আমলে প্রচুর যুদ্ধবাজ আফগান সেনাবাহিনীতে এসে যোগ দেয়। তারা সাধারণত উপজাতিভিত্তিক কোন সর্দারের অনুগত থেকে যুদ্ধ করত। ফলে বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তার পৃথক পৃথক নেতার নির্দেশে চলত। শেরখানের কৃতিত্ব যে, তিনি সাসারাম অঞ্চলের সাধারণ আফগান ও হিন্দু-কৃষকের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন। সৈন্যরা তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে নিয়মিত নগদ অর্থে মাইনে পেত, এবং সময় সময় লুঠপাটের অর্থেরও ভাগ পেত। শেরখানের সেনাবাহিনী কখনও সামন্ততান্ত্রিক সেনাবাহিনীর রূপ নেয়নি। এই দক্ষ, অনুগত, শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাবাহিনীই শেরখানের সাফল্যের বড় কারণ।

'হুমায়ুন' কথাটার অর্থ ভাগ্যবান। কিন্তু হুমায়ুনের প্রতি ভাগ্য কখনও সুপ্রসন্ন ছিল না। অন্যদিকে শেরখান বিভিন্ন সময়ে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। হুমায়ুন গুজরাটে বাহাদুর খানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শেরখান বিহারে নিজের অধিকার দৃঢ় করতে সুযোগ পান। হুমায়ুন যখন চুণার দুর্গ অবরোধ করতে ছয়মাস কাটিয়ে দেন তখন সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে শেরখান অবাধে গৌড় লুঠ করেন। আবার হুমায়ুন বঙ্গদেশে গৌড় বিজয়ের উল্লাসে মত্ত থাকলে শেরখান মুঘলদের আগ্রার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। চৌসায় ভুল করে হুমায়ুন নদী পার হয়ে আক্রমণ করতে গেলে শেরখান সহজেই মুঘল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারেন।

আপনারা শেরখানের সাফল্যের কারণগুলি পাঠ করলেন। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে (১৫৪০) তিনি 'শেরশাহ' উপাধি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। মাত্র পাঁচ বছর তিনি রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি মালব ও রাজপুতানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং পাঞ্জাব নিজের রাজ্যভুক্ত করতে পারেন। তাছাড়া রাজ্য শাসনে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন। আপনারা এখন শেরশাহর সংস্কারগুলি জানুন।

৪ক.৬.১ শেরশাহের সংস্কার

শেরশাহ কেন্দ্রীয়করণ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য একার পক্ষে শাসন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্থানীয় ভিত্তিতে দেশ শাসন প্রচলন করেন। শেরশাহ সমগ্র সাম্রাজ্যকে গ্রাম থেকে প্রদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে এক মসৃণ শাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। গ্রাম শাসনের ভার ছিল মুকাদ্দাম নামে গ্রামের মোড়লদের ওপর। তারা গ্রামের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক রক্ষা করে চলত। মুকাদ্দমরা সরকারি কর্মচারী না হয়েও গ্রামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করত। পাটোয়ারী নামক

কর্মচারীরা গ্রামের লোকেদের দিয়েই নিযুক্ত হত। প্রজারা যে কর-খাজনা দিত পাটোয়ারীরা তার হিসাব রাখত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে পরগনা গঠিত হয়। পরগনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শিকদার ও মুনসেফ নামক কর্মচারীর ওপর। শিকদাররা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করত ও রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করত। মুন্সেফ বা আমিনরা জমি মাপজোপ, রাজস্ব আদায় এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করত। কতকগুলি পরগনা নিয়ে সরকার গঠিত হয়। সমগ্র দেশে ৬৬টি সরকার ছিল। প্রতি সরকারের প্রধান দুই কর্মচারী হল শিকদার-ই-শিকদারান এবং মুনসেফ-ই-মুন্সিফান। শিকদার-ই-শিকদারান-এর কাজ ছিল পরগণার শিকদারদের কাজের তদারকি করা আর মুন্‌সেফ-ই-মুন্সিফানের কাজ ছিল সরকারি স্তরে রাজস্ব আদায় ও হিসাব রক্ষা করা। শেরশাহ তুর্কি সুলতানদের মতো মন্ত্রী নিয়োগ না করে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদগুলির জন্য সচিব নিয়োগ করতেন। এইভাবে তিনি এক সুসংহত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

দিল্লী-সুলতানরা কেউ কেউ (যেমন, আলাউদ্দিন ও মহম্মদ তুঘলক) রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি জরিপ করাতেন। কিন্তু শেরশাহই প্রথম সমগ্র রাজ্যের ভূমি জরিপ করিয়ে প্রজাদেরকে পাট্টা দান করেন। প্রজারাও সরকারকে কবুলিয়ত লিখে দিত। পাট্টাতে প্রজাদের জামির বিবরণ এবং খাজনার হার লেখা থাকত আর কবুলিয়তে প্রজারা সরকার নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার অঙ্গীকার লিখে দিত।

শেরশাহের ভূমিরাজস্ব সংস্কার-এর মূল নীতি ছিল, উৎপাদনের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা। তুর্কি-সুলতানদের আমলেও অনেকটা এই ধরনের প্রথা ছিল, একে বলত ঘাল্লাবক্‌স (Ghallabaksh)। এই প্রথায় ফসল কাটার সময় দাঁড়িয়ে থেকে খাজনা আদায় করতে হত। এটি ব্যয়সাপেক্ষ এবং এতে দুর্নীতির সম্ভাবনা বেশি ছিল। শেরশাহ ঘাল্লাবক্‌স প্রথার পরিবর্তন করলেন। প্রথমে সমস্ত কর্ষিত জমিকে উৎপাদনশীলতা (productivity) অনুসারে ভাল, মাঝারি ও কম ফসলের জমি এই তিনভাগে ভাগ করে, প্রত্যেক ভাগ থেকে এক-এক অংশ নিয়ে গড় উৎপাদনের হার নির্ধারণ করা হল। তারপর গড় উৎপাদনের $^{১}/_{৩}$ ভাগ খাজনার হার ঘোষণা করা হল। এই ব্যবস্থাকে বলে 'কানকুট' (কানকৃত)। একবার খাজনার হার নির্ধারিত হলে ধীরে স্থিরে নগদ অর্থে বা ফসলে খাজনা আদায় করা যেত। কিন্তু এই প্রথাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না—ফসল না কাটা পর্যন্ত প্রজাদের খাজনার হার জানার জন্য অপেক্ষা করতে হত। তাই পরের ধাপে, 'কানকুট' ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন করে ফসল উঠার আগেই অনুমানের ভিত্তিতে গড় উৎপাদন স্থির করে $^{১}/_{৩}$ অংশ খাজনা ঘোষণা করা হল। এই দ্বিতীয় প্রথা 'জাবতি (Zabti)' প্রথা নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে আকবর 'জাবতি' প্রথা সামান্য পরিবর্তন করে 'দহ্‌শালা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে বিশদ আপনারা পরে পাঠ করবেন।

আপনারা ইতিমধ্যেই শেরশাহের সামরিক সংস্কার সম্বন্ধে জেনেছেন। দিল্লীর মসনদে বসার আগে শেরশাহ যে প্রথায় সৈন্যবাহিনী গঠন করতেন, সেই প্রথায় পরে বহাল থাকে। লুঠপাট থেকে আর সম্পদ না এলেও ভূমিরাজস্বের দরুন নিয়মিত বিপুল অর্থ রাজকোষে জমা হতে থাকে। ফলে নগদ মাইনে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ কৃষকদের মধ্য থেকে অনুগত, দক্ষ সৈন্য নির্বাচন করতে শেরশাহের অসুবিধা হয়নি।

সবশেষে আপনারা শেরশাহের আর্থিক সংস্কার সম্পর্কে জানুন। শেরশাহ-এর সময়ে সোনা, রূপা ও তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা ''রুপেয়া''-ই প্রধান মুদ্রা হিসাবে গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যের স্থানে স্থানে টাকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা তৈরি করা হত। সাধারণ লোকও 'ফি' দিয়ে (Charge) তাদের সোনা-রূপা (bullion) মুদ্রায় পরিণত করতে পারত। 'ফি' মারফৎ সরকারের নিয়মিত আয় হত। নির্দিষ্ট ওজনের মুদ্রা ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। আকবরের সময়েও ''রুপোয়া'' প্রধান মুদ্রা হিসাবে চলে থাকে। শেরশাহ যেখানে সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর আদায় বন্ধ করেন। কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট এলাকা পার হওয়ার সময় শুল্ক সংগ্রহ করা হত।

সামরিক প্রয়োজনে শেরশাহ যে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। আপনারা সকলেই জানেন শেরশাহ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁ বন্দর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও আগ্রা থেকে দাক্ষিনাত্যের বুরহানপুর পর্যন্ত, আগ্রা থেকে যোধপুর হয়ে চিতোর পর্যন্ত এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে পুরনো রাস্তা মেরামত বা প্রশস্ত করা হয়। রাস্তার ধারে নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে শেরশাহ ১৭০০ সরাই নির্মাণ করেছিলেন। সরাইগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের থাকার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক সরাই-এর পাশে বাজার বসত এবং ওখানে দেশি-বিদেশী বণিকরা কেনা-বেচা করত। সরাইগুলি পোষ্ট-অফিসের মতো ছিল এবং গুপ্তচরেরা এখান থেকে রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাস্তাগুলি নির্মিত হওয়ায় গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের সঙ্গে মুলতান হয়ে কাবুল-কান্দাহার ও মধ্য-এশিয়ার বাণিজ্য সুগম হয়। বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এতদিন জলপথে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বেশি হত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বঙ্গদেশের বিপুল সঞ্চিত সম্পদ উত্তর ভারতের কাছে উন্মুক্ত হয়। এইজন্যই মুঘল সম্রাটরা বঙ্গ দেশকে সব সময় করায়ত্ত রাখতে চেষ্টা করতেন।

শেরশাহ-এর শাসন-সংস্কার, রাজস্ব-সংস্কার, মুদ্রাসংস্কার, হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমভাব নীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে মুঘল সম্রাটরা ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন।

৪ক.৭ সারাংশ

সুলতানি শাসনে প্রথম থেকেই উত্তরাধিকারের সুষ্ঠু নিয়মের অভাব এবং সুলতান ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের সমস্যা রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া প্রথম থেকেই দিল্লী সুলতানিকে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হত। ফিরোজ তুঘলকের সময় সেনাবাহিনীর লোকেদের এবং উচ্চ রাজ-কর্মচারীদের উত্তরাধিকার স্বত্বে পদ ভোগ করার অধিকার দেওয়ায় শাসনব্যবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তুঘলক রাজত্বের শেষের দিকে তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ সাম্রাজ্যে বড় ধরনের ভাঙন সৃষ্টি করে। ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে মুঘল আক্রমণ সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়।

তুর্কিস্তানের ফরগণা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে বাবর কাবুল অধিকার করেন। ফরগণার লোকেরা নিজেদের মুঘল বলত। কাবুল থেকে বাবরের নজর ছিল ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। তাঁর কাছে সুবর্ণ সুযোগ আসে যখন বিক্ষুব্ধ আফগান নেতারা তাঁকে দিল্লী আক্রমণের আহ্বান জানায়। বাবর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ভারত আক্রমণ করেন এবং পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী-আগ্রা দখল করেন। ভারতে মুঘল অধিকার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হয়নি। ১৫২৬ সাল থেকে ১৫৫৬ সাল পর্যন্ত মুঘল-আফগান ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। বাবরের পুত্র হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়ে সিংহাসন হারান। শেরশাহ দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শেরশাহ খুব অল্পদিন (১৫৪০-১৫৪৫ সাল) রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই অল্পসময়েই নানাবিধ শাসন-সংস্কার করে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। শেরশাহের পুত্র ইসলাম শূরের মৃত্যুর পর (১৫৫৪) খ্রী:) আফগান নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হুমায়ুন তখন কাবুলে। সুযোগ বুঝেই তিনি আফগান সম্রাট আদিল শূরকে সিরহিন্দ-এর যুদ্ধে পরাজিত করে (১৫৫৫ খ্রিঃ) দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুনের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর (১৫৫৬ খ্রিঃ) পুত্র আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ আদিল শূরের হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রিঃ) পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

৪ক.৮ অনুশীলনী

১। সুলতানি শাসনের ভাঙনের কারণ আলোচনা করুন।
২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যখ্যা করুন।
৩। শেরশাহের সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি উল্লেখ করুন।
৪। শেরশাহের ভূমিরাজস্ব সংস্কার আলোচনা করুন।
৫। নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর তিন লাইন করে লিখুন :
(ক) বাবরনামা, (খ) রুমিপ্রথা, (গ) উজবেকিস্তান, (ঘ) খানুয়ার যুদ্ধ এবং (ঙ) শেরশাহের মুদ্রা-সংসংস্কার।

৪ক.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. R. P. Tripathi : *Rise and Fall of The Mughal Empire, Allahabad 1956.*
2. A. L. Srivastava : *The Mughal Empire–1526-1803, Agra, 1977.*
3. K. R. Kanungo : *Sher Shah And His Times, Bombay, 1965.*
4. Ed. J. F. Richards : *Mughal Empire (The New Cambridge History of India) Cambridge University Press, 1993.*
5. Ed. Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam : *The Mughal State, Oxford, 1998*

একক ৪খ ❑ আকবরের নেতৃত্বে সুসংহত মুঘল সাম্রাজ্য

গঠন

৪খ.০ উদ্দেশ্য
৪খ.১ প্রস্তাবনা
৪খ.২ আকবরের প্রথম জীবন
৪খ.৩ আকবরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ
৪খ.৩.১ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ
৪খ.৩.২ তত্ত্বাবধান থেকে ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা
৪খ.৩.৩ আকবরের রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি
৪খ.৪ আকবরের রাজপুত নীতি ও হিন্দুনীতি
৪খ.৫ আকবরের প্রশাসনিক সংস্কার : ভূমি রাজস্ব নীতি
৪খ.৬ মনসবদারী নীতি
৪খ.৭ সারাংশ
৪খ.৮ অনুশীলনী
৪খ.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি আকবরের

- রাজত্বকাল সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রাজপুত ও হিন্দু নীতি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- প্রশাসনিক সংস্কার ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা বুঝতে পারবেন।
- মনসবদারী নীতির রূপরেখা পাবেন।

৪খ.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় প্রজন্ম আকবর সম্পর্কে জানতে পারা যায়। তিনি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত আগ্রা ও দিল্লীর শিথিল রাজ্যখণ্ডকে এক বিশাল ভূখণ্ডে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার বিস্তৃতি ছিল হিমালয় থেকে নর্মদা আর হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চল এবং দাক্ষিনাত্যের বেশকিছু অংশ। বাবর কিংবা হুমায়ুন মুঘল শাসনের কোনও স্থায়ী কাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি। বহুবিধ সমস্যায় আকীর্ণ দুর্বল মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের সুযোগ্য নেতৃত্বে এমনই রূপ ধারণ করে যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল যুগ একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পেরেছে।

৪খ.২ আকবরের প্রথম জীবন

আকবরের পিতামহ বাবর প্রথম মুঘল শাসক যিনি ১৫২৬ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ ব্যাপী চার বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার করতে সমর্থ হন। বাবরের পুত্র হুমায়ুন, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে আফগান সর্দার শেরশাহ কর্তৃক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন। ভাগ্যবিড়ম্বিত হুমায়ুন যখন আশ্রয়ের সন্ধানে সিন্ধুপ্রদেশে মরু অঞ্চলে ভ্রমণরত, সেই সময়ে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। আকবরের বাল্যজীবনে বলাই বাহুল্য কোনও স্থিতিশীলতা ছিল না। হুমায়ুন স্বজন বিদ্বেষে ব্যথিত ও ভারতবর্ষে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই পিতার এই ভাগ্যবিড়ম্বনা আকবরের বাল্যকালে শৈশবসুলভ নিরাপত্তাবোধ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেয়নি। ফলে আকবর হয়ে উঠেছিলেন কষ্টসহিষ্ণু এবং বাস্তববাদী। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব যখন তিনি কৈশোরেই আকবরকে নিতে হয়েছিল তখন তাঁকে যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি অতিক্রম করা আকবরের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়নি।

৪খ.৩ আকবরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে নাবালক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাঞ্জাবের কালানৌরে আকবরের অভিষেক হয়। কারণ এই সময়ে হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সহযোগী বৈরাম খাঁর সঙ্গে আকবর গুরুদাসপুরে এক আফগান বিরোধী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। বৈরাম খাঁ সত্বর আকবরের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন পাঞ্জাবে। পরবর্তী চার বৎসর বৈরাখ খাঁর তত্ত্বাবধানে আকবর তাঁর শাসনপর্ব চালিয়েছিলেন।

৪খ.৩.১ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর মুঘল শাসনের সূচনা করেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পুনরায় আফগানদের পরাস্ত করে আকবরকে ভারতবর্ষের ওপর তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সাম্রাজ্য আকবর লাভ করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই ভঙ্গুর। মুঘলদের সম্পর্কে ভারতীয়রা সন্দিগ্ধ ছিল কারণ তারা ছিল নবাগত। বাবর কিংবা হুমায়ুন কেউই ভারতবর্ষে প্রকৃত ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেননি। কাজেই আকবরের নাবালকত্বের সুযোগে পুনরায় ভারতবর্ষে মুঘলবিরোধী শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আফগানরা ছিল অন্যতম প্রধান বিরোধী শত্রুগোষ্ঠী।

মুঘলদের এই সময়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হিমু। তিনি আদিল শাহর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আফগান সেনাপতি হলেও হিমু মূলত হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু দিল্লি থেকে দূরে পাঞ্জাবে আকবরের অভিষেকের ফলে দিল্লিতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য হিমু এগিয়ে আসেন। আগ্রার শাসনকর্তা ইস্তান্দার খানকে পরাজিত করে হিমু দিল্লিতে উপস্থিত হন। তার্দিবেগ সেই সময়ে দিল্লির শাসক ছিলেন। তুঘলকাবাদের যুদ্ধে তার্দিবেগ পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে আকবরের শরণাপন্ন হন। সাময়িকভাবে দিল্লি-আগ্রা হিমুর দখলে আসে। তিনি ‘রাজা বিক্রমাদিত্য’ উপাধি নেন।

মুঘলরা পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়। অধিকাংশ মুঘল অভিজাতদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তাঁরা স্বদেশভূমি মধ্য-এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে বৈরাম খাঁর নেতৃত্ব ছিল প্রশংসনীয়। সকল প্রতিকূলতাকে মাথায় রেখে তিনি আকবরকে নিয়ে হিমুর মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর পাণিপথের যুদ্ধে হিমু পরাজিত হন। প্রথম পর্যায়ে হিমু অবশ্য মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে হিমু তীরবিদ্ধ হন। পরবর্তী পর্বে বৈরাম খাঁর নির্দেশে হিমুকে হত্যা করা হয়। ফলে আফগান বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুঘল শাসনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিমুর মৃত্যু মুঘলদের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীর শেষ বলে গণ্য করা হয়। হিমুর মৃত্যুর পরে আফগানদের নেতৃত্ব দিতে আর কেউ এগিয়ে আসতে পারেননি। অন্যান্য আফগান নেতারা যেমন সিকান্দার শাহ, আদিল শাহ এবং ইব্রাহিম শূর ক্রমে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে আফগানদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আকবরকে আর তেমন কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। বাবর আফগানদের পরাস্ত করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে যে মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেছিলেন ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেই আফগান শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

৪খ.৩.২ তত্ত্বাবধান থেকে ক্ষমতা সরাসরি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করা

১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবরকে সাম্রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করেন বৈরাম খাঁ। কিন্তু আকবর দীর্ঘদিন বৈরাম খাঁর নির্দেশে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না—যদিও হুমায়ুন ও তাঁর পরিবারের প্রতি বৈরাম খাঁর আনুগত্য ছিল সকল সন্দেহের উর্দ্ধে। বৈরাম খাঁর সময়োচিত পরামর্শ আকবরকে সাম্রাজ্য শত্রুমুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে বৈরাম খাঁ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত। প্রশাসনে তিনি সর্বেসর্বা হতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন আকবর শুধুমাত্র তাঁর অনুগত থাকবেন। স্বাভাবিকভাবেই বৈরাম খাঁ ও আকবরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে এক 'ফরমান' বা রাজকীয় নির্দেশ জারী করে আকবর বৈরাম খাঁকে অভিভাবকত্বের পদ থেকে সরিয়ে দেন। বৈরাম খাঁ মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাত্রাপথে আফগান আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৫৬০ থেকে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের শাসনকালকে 'অন্তঃপুরিকার শাসনকাল' বলে অভিহিত করা হয়। আকবরের ধাত্রীমাতা মহাম আনাঘা আকবরের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। প্রশাসনে মহাম অনাঘা ও তাঁর পুত্র আধম খাঁ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই আকবর পুনরায় এই চক্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। মহাম আনাঘাকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য করেন এবং আধম খাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। অতঃপর আকবর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন।

৪খ.৩.৩ আকবরের রাজ্যবিস্তার ও তার প্রকৃতি

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন কৌশলে আকবর এক বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মুঘল শাসক, যিনি ভারতবর্ষে এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে না। অর্থাৎ সামরিক শক্তির ওপর আশ্রয় করে রাজ্যসীমা বিস্তার করলেও

তার গঠন হয় সুদৃঢ় ও সুসংহত। এবং তার জন্য দরকার প্রজাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এইখানেই ছিল আকবরের বিশেষত্ব। তিনি একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আরো একজন দূরদর্শী বাস্তবমুখী চরিত্রের সন্ধান পাই। ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুঘল শাসন গড়ে তুলতে হলে, তার জন্য প্রয়োজন ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যতা, সহযোগিতা ও বিশ্বাস। আকবর এই লক্ষ্যে অনেকটাই এগুতে পেরেছিলেন। এটাই তাঁর চরম কৃতিত্ব; আর তার ফলে ভারতবর্ষে এমন এক প্রশাসন গড়ে উঠল যার ব্যপ্তি ছিল কমবেশি তিনশ বছর। শুধু তাই নয়—এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমাজের বিভিন্ন স্তরে পারস্পরিক লেনদেনে গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তার ফলে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে একটি মিশ্র শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

ভারতে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতির মূল সুত্র ছিল চারটি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে পারস্পরিক বিবাদমান রাজ্যগুলিতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া আকবরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আকবর তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতাকে প্রশাসনের মূল নীতি করেছিলেন। অন্যথায় হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত ভারতে কোনও একক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যে সম্ভব নয় সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আকবর তাঁর শাসক জীবনের প্রাথমিক পর্বে আজমীর, গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আফগানদের উচ্ছেদ করে নিজের আধিপত্যাধীনে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি মালব দখল করেন। এরপর আকবর মধ্যভারতের গণ্ডোয়ানা রাজ্যে তার ক্ষমতা বিস্তার করেন। গণ্ডোয়ানা ও মালব অধিকারে আকবরের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটিই ছিল প্রবল। সম্ভবত এই দুই রাজ্যের অর্থসম্পদ আকবরকে রাজ্য দুটি অধিকারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নচেৎ মালব বা গণ্ডোয়ানার সাথে মুঘল রাজশক্তির কোনও বিরোধ ছিল না।

রাজপুতানা সম্পর্কে আকবরের রাজ্যবিস্তার নীতিতে প্রগতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি সাম্রাজ্য গঠনের জন্য রাজপুতদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। যেখানে তাদের মধ্যে যারা আনুগত্য স্বীকার করেননি একমাত্র আকবর সেখানেই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। উপরন্তু পরাজিত রাজার আনুগত্য লাভের পর তাঁকে নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অম্বরের রাজা বিহারীমল আকবরের আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। উপরন্তু বিহারীমলের কন্যা মনিবাঈ আকবরের প্রধানা মহিষী হন।

মেবারের সঙ্গে আকবরের সংগ্রাম সুদীর্ঘকাল চলে। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় আকবরকে অবশেষে মেবার লাভ করতে সাহায্য করে। রণথম্ভোর, যোধপুর, বিকানীর এবং জয়সলমীরও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তবে প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ পুনরায় আকবরের বিরোধিতা শুরু করেন। আকবর অমর সিংহের বিরুদ্ধে মেবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে হয়ে ওঠেনি।

রাজপুতনার পরে আকবর গুজরাট ও বঙ্গদেশ বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ইতিপূর্বে হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ ও জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বিজয় ছিল সাময়িক। তাঁর মৃত্যুর পর গুজরাট পুনরায় বিভিন্ন কারণে মুঘল শাসন নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসে। সম্ভবত ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে আকবর গুজরাট সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে প্রভৃতি বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অথচ সেই সময়ের গুজরাটের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আকবরকে গুজরাট জয়ে কিছুটা উৎসাহিত করেছিল। সেখানকার শাসক তৃতীয় মুজফ্ফর শাহ ছিলেন অযোগ্য এবং অপদার্থ। ফলে গুজরাটের ‘মির্জা’ অভিজাতরা অনেকটা গুজরাটের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আকবর এই পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে উদ্যোগী হন। অরাজকতায় পূর্ণ এই সমৃদ্ধশালী প্রদেশটি অধিকার করে রাজ্যসীমা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তিনি বিবেচনা

করেছিলেন। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর অনায়াসে মুজফ্‌ফর শাহ’র আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু ‘মির্জা’ অভিজাতরা এতো সহজে আকবরের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পুনরায় আকবর গুজরাট আসেন এবং গুজরাটকে সরাসরি মুঘল সম্রাটের নিয়ন্ত্রাধীনে এনে একটি পৃথক সুবায় পরিণত করেন।

গুজরাট অভিযান আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গুজরাট মুঘল সুবায় পরিণত হওয়ার ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ মুঘলদের হাতে চলে আসে। ফলে মুঘল অর্থনীতি আরও মজবুত হয়ে উঠেছিল। আরব সাগরে পর্তুগীজদের আনাগোনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আকবর তাদের মুখোমুখি হন। উপরন্তু গুজরাট বিজয়ের ফলে তার মধ্যে দিয়ে দাক্ষিণাত্য অভিযানের সহজতম পথটি গড়ে উঠে।

গুজরাট বিজয়ের পর আকবর বাংলার আফগান শাসক দাউদ কররাণীর বিদ্রোহ দমন করতে প্রস্তুত হন। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে তুকরাই বা তুর্কার যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়ে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে দেন। অতঃপর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে আকবরের নির্দেশে মুজফ্‌ফর খান, খান-ই-জাহান ও টোডরমল দাউদকে পরাজিত ও নিহত করেন।

দাউদের মৃত্যু বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের সুলতানি শাসনের অবসান ঘটায়। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও আকবর কখনই এখানে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কারণ বাংলার বারো ভুঁইয়ারা, যাঁরা জাহাঙ্গীরের আমল থেকে নিজ নিজ এলাকায় ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা সহজে আকবরের কাছে নতিস্বীকার করতে চাননি। তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। তবে আকবর যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাঁদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন।

গুজরাট ও বাংলা জয়ের পর আকবরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যবিস্তারে নজর দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক চিত্রটি এই সময়ে অত্যন্ত অস্থির ছিল। একজন মুঘল হিসাবে কাবুলের ওপর তাঁর দুর্বলতা ছিল। উপরন্তু আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মীর্জা হাকিম এবং সেখানকার গোঁড়া মুসলমানরা আকবরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তবে মীর্জা হাকিমের জীবদ্দশায় আকবর কাবুল অধিকার করেননি। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মৃত্যুর পর আকবর আনুষ্ঠানিকভবে কাবুল দখল করেন।

কাশ্মীরের শাসক ইউসুফ শাহ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতেন। এই কারণে রাজপুতনার অম্বরের রাজা ভগবান দাসের নেতৃত্বে আকবর কাশ্মীরে অভিযান পাঠান। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইত্যবসরে সিন্ধুপ্রদেশেও মুঘল নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সিন্ধুপ্রদেশের গুরুত্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার দিক দিয়ে ছিল অসীম। এর ফলে কান্দাহার সহজেই আকবরের অধীনে চলে আসে। কান্দাহারের মধ্য দিয়ে মধ্যএশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিদ্রোহী উজবেগ-উপজাতিরাও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

আকবরের দক্ষিণ ভারত অভিযান তাঁর ভারতবর্ষব্যাপী অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত ছিল। তাঁর দক্ষিণ ভারত অভিযান বিশ্লেষণ করলে সাম্রাজ্যব্যাপী আকাঙ্খা ছাড়াও কিছু প্রগতিমূলক চিন্তাধারারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তালিকোটা যুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চরম অব্যবস্থার সূচনা হয়। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সর্বক্ষেত্রে এখানকার রাজ্যগুলি পারস্পরিক কলহ ও অন্তর্দন্দ্বে লিপ্ত থেকে নিজেদের ধ্বংস করে চলেছিল। এই অবসরে আরব সাগরে পর্তুগীজদের প্রাধান্য ও ঔদ্ধত বেড়ে চলে। আরব সাগরের ভারতীয় বণিক ও মক্কাগামী তীর্থযাত্রীদের ওপর পর্তুগীজদের উৎপীড়নের সীমা ছিল না। দক্ষিণী রাজ্যগুলি পর্তুগীজদের এই ঔদ্ধত্য দমনে ব্যর্থ হয়। কারণ দক্ষিণ ভারত তখন দক্ষিণী ও পরদেশী বা আফাকি এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিরোধে জর্জরিত। শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বও তখন দক্ষিণকে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এনে

ফেলেছিল। এই সুযোগে গোয়া পর্তুগীজদের দখলে চলে আসে। এমতাবস্থায় আকবর নিশ্চয় সাম্রাজ্যবাদের আকাঙ্খায় দাক্ষিণাত্য অভিযানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। দক্ষিণের ধর্মীয় বিভেদ বা জাতিগত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব উত্তর ভারতকে স্পর্শ করতে পারার সংশয় সম্ভবত আকবরের মধ্যে কাজ করেছিল। স্বভাবতই প্রগতিশীল আকবর এই ধরনের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। উপরন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের আধিপত্য মুঘল সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষেও বিপজ্জনক। কাজেই তাদের দমন করতে হলে দক্ষিণ ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা আশু কর্তব্য ছিল। ফলে দাক্ষিণাত্য অভিযান আকবরের পক্ষে জরুরি ছিল।

বাহমনি সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের ওপর যে পাঁচটি সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে উল্লেখযোগ্য ছিল—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও খান্দেশ। আকবর প্রথমেই এই রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে চাননি। এদের সহযোগিতাই তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু খান্দেশ ব্যতীত আর কোনও রাজ্য আকবরের মৈত্রী আহ্বানে সাড়া দেননি।

এই সময়ে আহম্মদ নগরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সুযোগে আকবর দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসেন। আহম্মদনগরের শাসক বুরহান নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভগ্নী ও বিজাপুরের আদিল শাহ’র বিধবা পত্নী চাঁদবিবির নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি হননি। মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রামে চাঁদবিবি জয়ী হন এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে এক সন্ধিতে মুঘলরা বাহাদুর শাহকে আহম্মদনগরের সুলতান হিসাবে মেনে নেন ও পরিবর্তে চাঁদবিবি মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন। সন্ধির শর্ত হিসাবে বেরার প্রদেশটি আহম্মদনগর মুঘলদের দিয়ে দেয়। কিন্তু অভিজাতদের একাংশ এই সন্ধি মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাঁরা চাঁদবিবিকে ক্ষমতাচ্যুত করে মুঘলদের বিরোধিতা করে এবং বেরার থেকে মুঘলদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে অস্তির যুদ্ধে মুঘল বাহিনী আহম্মদনগরকে পরাস্ত করে। তবে এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে আকবরের প্রাধান্য বিশেষ বিস্তৃত করতে পারেনি। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ চাঁদবিবি নিহত হওয়ার পর মুঘলরা আহম্মদ নগরের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা এরপর আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে খান্দেশের অন্তর্গত দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গটি দখল করে আকবর তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান সমাপ্ত করেন। অনুমান করা হয় আকবর সরাসরি এই দুর্গ দখল করতে অসমর্থ হওয়ায়, কিছুটা শঠতার আশ্রয় নিয়ে আসিরগড় দুর্গ দখল করেন।

আকবর দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন, তার ফলে মুঘল সীমানা দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে আকবর দক্ষিণ ভারতে তাঁর অধিকারকে বিশেষ সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লীর অবস্থান ছিল বহু দূরে। কাজেই দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় কর্মচারীদের আনুগত্য লাভ করা মুঘল সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল বলা যেতে পারে। তাছাড়া দাক্ষিণাত্য অভিযান সুদৃঢ় করার পর্যাপ্ত সময় আকবর পাননি। আসিরগড় দুর্গ জয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

৪খ.৪ আকবরের রাজপুত নীতি ও হিন্দু নীতি

আকবর সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনই এটাও অনস্বীকার্য যে নিছক বাহুবলে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। আকবরের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছিল যে ভারতবর্ষে মুঘলদের স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হলে হিন্দু তথা রাজপুতদের সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা

করা প্রয়োজন। আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, এককভাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও বাহুবলের ওপর নির্ভর করে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কোনও সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায় না। তাই হিন্দু এবং রাজপুতদের সম্পর্কে আকবরের পদক্ষেপ ছিল উদার এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ। একজন যথার্থ সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে আকবরের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোধহয় এইখানে।

আকবর সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে সব বিরোধিতা, চক্রান্ত ও অবিশ্বস্ততার পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সহয়তা লাভের কথা তাঁকে চিন্তা করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছিল আকবরের হিন্দুনীতি তথা রাজপুতনীতি।

আকবর রাজপুতদের মৈত্রীলাভের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত, রাজপুত পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। অম্বরের রাণা বিহারীমলের কন্যা মনিবাঈকে আকবর বিবাহ করেন। বিকানীর ও জয়পুরের সাথেও আকবরের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবর তাঁর পুত্র সেলিমের সাথে উদয় সিংহের কন্যা যোধাবাঈয়ের বিবাহ দেন। ফলে যোধপুরের সাথেও আকবরের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আকবরের পূর্বেও মুসলমান শাসকের সাথে রাজপুত পরিবারের বিবাহ সম্পর্কের কথা জানতে পারা যায়। কিন্তু এই ধরনের বিবাহের পশ্চাতে কোনও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কাজ করেনি। ফলে ভারতের রাজনীতিতে তার কোনও স্থায়ী প্রভাবও পড়েনি। কিন্তু আকবরের রাজপুতদের সঙ্গে বৈবাহিক নীতি গড়ে তোলার পশ্চাতে সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা ছিল। ফলে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়েছিল। বিবাহের ফলে রাজপুত রাণাদের সখ্যতা ছাড়াও আকবর লাভ করেছিলেন মানসিংহ, বিহারীমল, টোডরমলের মতো দক্ষ রাজপুত রাজকর্মচারী যাঁদের অনলস পরিশ্রমের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সকল রাজপুত রাজারা যে নিঃশর্তভাবে আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল এ কথা বলা যায় না। তাদের কারুর কারুর বিরুদ্ধে আকবরকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। মালব, রণথম্ভোর, বিকানীর এবং জয়সলমীরের বিরুদ্ধে আকবরকে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু আকবর যুদ্ধ করলেও পরাজিত রাজাদের সঙ্গে কখনও অসম্মানজনক ব্যবহার করেননি। তাদের ব্যক্তিগত ধর্মেও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। ফলে রাজপুতরা পরাজিত হলেও তাঁরা আকবরের উদার ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারে অনুগত হয়ে পড়েন। এইসব অনুগত রাজারা আকবরের কাছ থেকে বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি রাজপুত রাণাদের এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন যা এতদিন পর্যন্ত একচেটিয়াভাবে কেবলমাত্র মুসলিম অভিজাতরাই ভোগ করত। উদাহরণস্বরূপ অম্বরের ভগবান দাসকে লাহোরের যুগ্ম শাসকরূপে নিযুক্ত করা হয়। মানসিংহ প্রথমে কাবুল এবং পরে বাংলা-বিহারের দায়িত্বে আসেন। অন্যান্য সুদক্ষ রাজপুত কর্মচারীদের ওপর গুজরাট, আজমীর, আগ্রা প্রভৃতি প্রদেশের প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এমনকি তাদের বংশগত জায়গীর ছাড়াও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জায়গিরদারী লাভ করার ফলে রাজপুতদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা সমকালীন মুঘল অভিজাতদের থেকে প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় কোনও অংশে কম ছিলেন না। এইভাবে মুঘল রাজনীতিতে রাজপুতদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গড়ে ওঠে।

একমাত্র মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ ব্যতিরেকে সমগ্র রাজপুতানা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ মুঘলদের কাছে পরাজিত হন। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র অমর সিংহ আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যান। রাজপুত নীতির বন্ধনে আকবর মেবারকে আবদ্ধ করতে অসমর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজপুতনীতি এবং হিন্দুনীতির মূল কথা ছিল বিজেতা ও বিজিতের সম অধিকার।

তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে 'জিজিয়া' কর তুলে দেন। আকবর এই কর রহিত করে প্রমাণ করেন যে ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই। হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করার প্রথা আকবর নিষিদ্ধ করেন এবং হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করাও আকবর পছন্দ করতেন না। এইভাবে আকবর মধ্যযুগে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে হিন্দু সমাজ আকবরের অনুগত হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলায় আকবর একজন জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

৪খ.৫ আকবরের প্রশাসনিক সংস্কার : ভূমি-রাজস্ব নীতি

প্রশাসন বলতে এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান বোঝায় যার মাধ্যমে রাষ্ট্র কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড আকবরের শাসন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে বাস্তব বলে মনে করেন। কারণ আকবরের প্রশাসনিক সংস্কারের মূল কাঠামো ছিল ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা। যদিও সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা তথা ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাতে শেরশাহের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তথাপি আকবরই প্রথম মুঘল সম্রাট যিনি ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে শেরশাহ প্রবর্তিত পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে রাজস্ব-ব্যবস্থাকে উন্নততর ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য চেষ্টা করেন। প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবার পরিবর্তে আকবর পরাজিত রাজাদের মর্যাদা ও স্বায়ত্বশাসনের অধিকার মেনে নিতেন। আবার তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনেও উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ রাজস্ব-ব্যবস্থার লাগাম সরাসরিভাবে সম্রাটের হাতে ছিল।

আকবরের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মূল লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ। রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। আকবর যদিও শেরশাহকে অনুসরণ করেছিলেন, কারণ মুসলমান শাসকদের মধ্যে শেরশাহ সর্বপ্রথম রাজস্বনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও শেরশাহর নীতিতে বেশকিছু ত্রুটি ছিল। প্রথমত, দেয় রাজস্বকে নগদ মূল্যে রূপান্তরিত করতে অনেক সময় লাগতো। যার ফলে রাজকোষে অর্থাগম হতো দেরী করে। দ্বিতীয়ত, ফসলের পরিমাণ নগদ মূল্যে রূপান্তরিত করার সময়ে বাজারদর একটা সমস্যা ছিল। কারণ দেশের নানা অংশে বাজারদরের তারতম্য ছিল। উপরন্তু দিল্লীর বাজারদরের সঙ্গে দূরবর্তী অঞ্চলের বাজারদরের অনেক পার্থক্য ছিল। এছাড়া জমির যথার্থ মাপ এবং প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপারটি বিবেচনা সাপেক্ষ ছিল।

আকবর প্রথমে বাৎসরিক রাজস্ব নিরূপণের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে দেওয়ান নিযুক্ত হন খাজা আব্দুল মজিদ। আকবর বিভিন্ন 'সরকার'-এর খালিসা জমির উৎপাদনের গড় নির্ধারণ করেন এবং তৎকালীন বাজার নিরীক্ষণ করে উৎপাদিত ফসলের ওপর বার্ষিক রাজস্ব বসান। এই কাজের জন্য তিনি কানুনগোদের নিযুক্ত করেন। এদের ওপর নিজ নিজ এলাকার জমির প্রকৃত উৎপাদন এবং ফসলে স্থানীয় বাজারদর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রকে ওয়াকিবহাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ কানুনগোই নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। কাজেই আকবরের এই ব্যবস্থা ফলপ্রসু হতে পারেনি।

আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বৎসরে দেওয়ান নিযুক্ত হন মুজফ্‌ফর তুরাবতী। তুরাবতীর তত্ত্বাবধানে মুঘল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনেকটা কার্যকরী হয়ে ওঠে। তিনি প্রথমে দশজন কানুনগোর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। স্থির হয় এই কমিটি সমগ্র দেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত কার্যবিধি জানিয়ে কেন্দ্রকে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেবেন। কিন্তু এখানেও সততার প্রশ্নটি আবার ঘুরে-ফিরে চলে আসে। বলা যেতে পারে যে, প্রকৃত তথ্যের অভাবে আকবরের প্রচেষ্টা পুনরায় ব্যর্থ হয়।

১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল রাজস্ব সম্পর্কে একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেন। বাংলা, বিহার ও

গুজরাট বাদ দিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যকে খালিসা জমিতে পরিণত করা হয় এবং জায়গীর প্রথা তুলে দেওয়া হয়। ক্রোরি নামে একদল রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীর ওপর ১৮২ টি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। টোডরমল আশা করেছিলেন, যে প্রতিটি পরগণা থেকে এক কোটি 'দাম' অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু ক্রোরিও ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে টোডরমল ক্রোরিদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বন্ধ করে দেন।

আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় পরবর্তী পদক্ষেপ তাঁর বিখ্যাত 'দহশালা'র (Ten years assessment) প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের ফসলের দশ বৎসরের গড় হিসাবে ধরা হোত। এবং আকবর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন উৎপাদনের গড়ের এক-দশমাংশকে বাৎসরিক উৎপাদন হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তার এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হবে। সেই আমলে রাজস্ব আদায়ে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হতো বলে সরকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বাজার দরের গড়পরতা ভিত্তি অনুযায়ী ফসলের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন। আকবর প্রবর্তিত 'দহশালা' ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী তাই তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত হবে না। তবে আকবর প্রবর্তিত এই বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্ধারণ ব্যবস্থা সরল করে দেওয়ার ফলে সরকার ও কৃষক উভয়পক্ষের সুবিধা হয়। যেটুকু জমি চাষ করা হতো তার ওপর রাজস্ব নির্ধারিত হতো বলে কৃষক সম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা হতো না। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সরকার থেকে কৃষকদের কর রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

আকবরের 'দহশালা' ব্যবস্থা মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল কাঠামো হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারী করেন। একে বলা হতো 'দস্তুর-অল্-অমল'। এটিকে সাধারণ্যে টোডরমলের বন্দোবস্তও বলা হয়ে থাকে। টোডরমলের বন্দোবস্তের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল— (১) জমি জরিপ, (২) জমির গুণগত মান নির্ণয়, (৩) দেয় রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। টোডরমলের রাজস্ব-সংক্রান্ত নির্ধারণ ব্যবস্থা জাবত্ পদ্ধতি নামে সমধিক পরিচিত। সম্ভবত জরিপ-এর সমার্থক জাবত শব্দটি।

টোডরমল জমির উৎপাদন ও উর্বরতার ওপর ভিত্তি করে জমিকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন— পোলজ, পরৌতি, চাচর এবং বঞ্জর। যে জমিতে প্রতিববছর চাষ হত তাকে বলা হত পোলজ। মাঝে মাঝে যে জমি পতিত পড়ে থাকে তাকে বলা হতো পরৌতি। তিন বা চার বৎসর পতিত রাখা জমির নাম ছিল চাচর। যে জমিকে পাঁচ বৎসর বা আরো বেশি সময়ের জন্য ফেলে রাখতে হতো তাকে বলা হতো বঞ্জর। পোলজ ও পরৌতি শ্রেণীভুক্ত জমিকে আবার উর্বরতা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট, ভালো, নিকৃষ্ট এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে আনুমানিক উৎপাদনের গড় হিসাব করা হতো এবং তার এক-তৃতীয়াংশকে রাজস্ব হিসাবে ধরা হতো।

আকবরের সমকালীন রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে এক ধরনের রাজস্ব নীতি প্রচলিত ছিল না। টোডরমলের রাজপুত জাবত্ পদ্ধতি ব্যতীত সাম্রাজ্যে আর যে দু-ধরনের রাজস্ব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা হলো গাল্লা বখশী বা বাটাঈ অথবা ভাওলি, দ্বিতীয়টি হলো নসক। অনেকে মনে করেন কানকূত বা দানাবন্দী নসক ব্যবস্থাই ইঙ্গিত করে।

গাল্লা বখশী মূলত ফার্সী শব্দ। ভারতবর্ষে ভাগচাষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে তিনভাবে উৎপাদন ও সরকারের প্রাপ্য স্থির করা হতো। (১) করার—দাদ পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার ও কৃষকের উপস্থিতিতে খামারে চুক্তি অনুযায়ী শস্য ভাগ করা হতো। (২) ক্ষেত—কটাঈ ব্যবস্থায় শস্য কাটার আগেই শস্য ভাগ করে নেওয়া হতো। (৩) লাঙ্গ বটাঈ পদ্ধতি ছিল শস্য কাটার পর মাঠে স্তূপাকারে রাখা হতো এবং তারপর ভাগের ব্যবস্থা হতো। গাল্লা বখশী রাজস্ব আদায়ের যথাসম্ভব ন্যায্য পদ্ধতি বলা যেতে পারে। তবে এর উপযোগিতা নির্ভর

করত সরাসরি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সততার ওপর। এই পদ্ধতি সিন্ধু, কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর অঞ্চল প্রচলিত ছিল।

আকবরের আমলে প্রচলিত নসক পদ্ধতি সম্পর্কে সবিস্তারে কিছু জানা যায় না। প্রশাসন ঐতিহাসিক ব্লখম্যানের মতে, নসক এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে রায়ত ও রাজস্ব আদায়কারীরা ভূমি রাজস্ব স্থির করে। মনে করা হয় যে, নসক বলতে পৃথক কোনও রাজস্ব পদ্ধতি বোঝায় না। বরং এটা কৃষক ও রাজস্ব সংগ্রহকারীদের রাজস্ব হিসাব করার একটি সরকার পদ্ধতি। বাংলা, কাথিয়াবাড় এবং গুজরাটের বেশকিছু অঞ্চলে নসক পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

কানকূত বা দানাবন্দী ব্যবস্থা বলে আর একটি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার কথা জানতে পারা যায়, যাকে অনেকেই মনে করেন নসক ব্যবস্থার অভিন্ন। এই ব্যবস্থায় দড়ি বা পা ফেলে জমি মাপ করা হতো। তারপর সেই অঞ্চলের উৎপাদনী ক্ষমতা থেকে বিচার-বিবেচনা করে রাজস্বের হার নির্ধারণ করা হতো। এই ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাজস্ব নগদ অর্থে দেওয়া আবশ্যক ছিল না। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, কানকূত ব্যবস্থা অনেক দক্ষ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। এতে প্রশাসনিক দুর্নীতির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম ছিল।

আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব-ত্রুটিহীন বলা যেতে পারে। আকবর চাষের জমি সম্প্রসারণের জন্য চাষীদের উৎসাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগে সেচখাল খনন বা অন্যান্য সংস্কারের কার্যেও আকবর উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। আকবর এ কথাও বুঝেছিলেন যে চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা উচিত নয়। এর ফল ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো নয়। প্রয়োজনের সময়ে কৃষকদের তক্‌বি বা কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আকবরের আমলে প্রচলিত হয়েছিল। সম্ভবত এই ঋণের জন্য কোনও সুদ দিতে হতো না। যে জমিতে নতুন চাষ করা হতো সেখানে আকবরের নির্দেশে প্রচলিত হারের চেয়ে কম রাজস্ব আদায় করা হতো। জমিতে ভোগ্য শস্যের (ধান, বাজরা, গম) পরিবর্তে অর্থকরী শস্যের উৎপাদন হলে, যেমন—তুলো, পাট, কম হারে রাজস্ব নেওয়ার রীতি ছিল। ঋণ মকুব করে দেওয়ার কথাও জানতে পারা যায়। অর্থাৎ আকবরের রাজস্ব নীতিতে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও তার জনকল্যাণমুখী দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। অনেকের মতে, আকবরের একতৃতীয়াংশ ভূমি-রাজস্ব আদায় একটু বেশি ছিল। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তিনি জিজিয়া, জাকাত, তীর্থকর এবং অন্যান্য বহু ধরনের শুল্ক রদ করে সাধারণ লোককে স্বস্তি দিয়েছিলেন। রাজস্ব ব্যতিরেকে অন্যান্য অতিরিক্ত কর আদায় যাতে না হয় তার প্রতি তিনি যত্নবান ছিলেন। সার্বিকভাবে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট আধুনিক ও কার্যাকরী ছিল বলা যেতে পারে।

৪খ.৬ মনসবদারী নীতি

স্থিতিশীল আমলাতান্ত্রিক সরকার গঠন ব্যতীত আকবরের অপর একটি কীর্তি হল মনসবদারী সংগঠন। মুঘল রাজত্বকালে সামরিক ও বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল এই মনসবদারী প্রথা। এঁরাই ছিলেন মুঘল আমলের প্রধান শাসকগোষ্ঠী।

অনুমান করা হয় পারস্য দেশে মনসবদারী প্রথা বহু পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। আকবর এর অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। মূঘল প্রশাসনিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ছিল সম্রাটের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। আকবরের

পূর্বে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা বিশেষ হয়নি বললেই চলে। উপরন্তু শেরশাহ প্রবর্তিত জায়গীরদারী প্রথাতেই কিছু কুফল দেখা গিয়েছিল। আমীররা বিশাল জায়গীর লাভ করার ফলে এবং সামরিক প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ার সুবাদে উচ্চাকাঙ্খী হয়ে ওঠেন। আমীররা দুর্নীতিগ্রস্থ ও অর্থলোভী হয়ে পড়েন। অথচ এদের ওপরেই সামরিক প্রয়োজনে সম্রাটকে নির্ভর করতে হতো। যথেচ্ছভাবে জায়গীর বিতরণ করার জন্য সরকারি খালিসা ভূমি কমে এসেছিল। রাজকোষে এর ফলে অর্থাগম কমতে থাকে। জায়গীরদাররা সাধারণত দক্ষ সৈন্য ও উন্নতমানের ঘোড়া রাখতেন না। ফলে যুদ্ধের সময়ে নিম্নমানের ঘোড়া ও অপদার্থ সৈন্য সম্রাটের প্রয়োজনে পাঠিয়ে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হতো। আকবর এই ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কাজেই সেনাবাহিনীকে এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত করে তিনি একটা সুদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

'মনবস' শব্দটির অর্থ পদমর্যাদা। অধ্যাপক আতাহার আলি 'মনসব' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে 'মনসব' হল কোনও ব্যক্তির পদমর্যাদা এবং একই সঙ্গে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তি। মনসবদারী ব্যবস্থা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অধ্যাপক কুরেশী বলেছেন যে, সামরিক ও বে-সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই 'মনসব' প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কাউকে সামরিক ও বে-সামরিক দু-ধরনের কাজই দেখতে হতো আবার কেউ নির্দিষ্ট কোনও কাজের দায়িত্বে থাকতেন। কিন্তু মনসবদাররা কে কি ধরনের কাজ করবেন তা স্থির করতেন সম্রাট স্বয়ং। অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ও বলেছেন যে, মনসবদারদের ক্ষেত্রে সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে যে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো এ কথা ঠিক নয়।

১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর তাঁর প্রিয় মীরবক্সী শাহবাজ খানের সাহায্যে মসবদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা মীরবক্সী প্রস্তুত করে সম্রাটের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতেন। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মনসবদারের সাক্ষাৎ নিতেন এবং তাদের পদমর্যাদা যোগ্যতা অনুয়ায়ী স্থির করতেন। বদাউনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কর্তব্য পালনে গাফিলতি হলে মনসবদারদের পদের অবনতি ঘটতে পারত। আবার মনসবদারদের দক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতিও ঘটত।

মুঘল আমলে, আকবরের রাজত্বকালে সম্রাট জাতি-ধর্ম বা বর্ণকে কখনই মনসবদার নিয়োগের সময়ে গুরুত্ব দিতেন না। সতীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মুঘল সম্রাটরা এই ধরনের সংকীর্ণতা মনসবদার নিয়োগের সময়ে কখনই দেখাননি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, অভিজাতদের পক্ষে উচ্চপদস্থ মনসবদার রূপে নির্বাচিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

পদমর্যাদা অনুযায়ী মনসবদাররা বহু ভাগে বিভক্ত ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল বলেছেন যে, মনসবদাররা ৬৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। অধ্যাপক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, সম্ভবত আকবর ৬৬টি শ্রেণীতে মসবদারদের বিভাজনের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৩৩টি শ্রেণী গঠন করা সম্ভবপর হয়েছিল। বলা হয় যে, সর্বনিম্ন মনসবদারের অধীনে দশজন এবং সর্বোচ্চ মনসবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকত। আরও বেশি সংখ্যক সৈন্যের দায়িত্বে থাকতেন যে সব মনসবদাররা তাঁরা সাধারণত রাজপরিবারের সদস্য হতেন। যেমন, মানসিংহ বা টোডরমল সাত হাজারী মনসবদার ছিলেন।

বলা হয় যে, এক হাজারী ও তার বেশি মনসবদাররা 'ওমরাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। বার্ণিয়ে বলেছেন যে, মুঘল প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিলেন এই ওমরাহরা।

মনসবদারী ব্যবস্থার সাথে সাথে 'জাট' ও 'সওয়ার' এই দুটি শ্রেণীর কথা চলে আসে। ব্লখম্যান বলেছেন যে, 'জাট' শব্দটির অর্থ একজন মনসবদারের অধীনে কত সৈন্য রয়েছে। 'সওয়ার' শব্দটি বলতে বোঝায় পদমর্যাদার অতিরিক্ত সেনা। ড. ত্রিপাঠী মনে করেন যে, 'সওয়ার' ছিল মনসবদারদের পদের অতিরিক্ত মর্যাদার

ইঙ্গিত এবং এর জন্য তাঁরা রাজকোষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ পেতে পারতেন। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, আকবরের মনসবদারী ব্যবস্থা একদিনে গড়ে ওঠেনি। তাঁর সুদীর্ঘকালের চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এই মনসবদারী প্রথা। প্রথম কুড়ি বছর মনসবদারদের মধ্যে 'সওয়ার' পদটি ছিল না। আকবর খেয়াল করেন যে, মনসবদাররা যতটা সৈন্য রাখা প্রয়োজন তা রাখেন না, তখনই তিনি 'সওয়ার' পদটির কথা চিন্তা করেন। তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন যে, 'সওয়ার' পদ অনুযায়ী সৈন্য পোষণ করতে মনসবদাররা বাধ্য এবং এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হবে। তবে সকল মনসবদারই যে 'সওয়ার' পদের অধিকারী হবেন তা নয়। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, আকবরের রাজত্বকালের শেষ পর্বে প্রায় সব মনসবদারই 'জাট' ও 'সওয়ার' দুটি পদেরই অধিকারী ছিলেন।

'জাট' ও 'সওয়ার' সংখ্যার ওপর নির্ভর করে মনসবদাররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর মনসবদার তাঁকেই বলা হতো যিনি সমসংখ্যক 'জাট' ও 'সওয়ার' রাখতেন। 'সওয়ারের সংখ্যা যদি 'জাটের' অর্ধেক হয়, তবে সেই মনসবদাররা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য হতেন। যে সব মনসবদারদের অধীনে কোনও 'সওয়ার' থাকত না, অথবা 'সওয়ার' সংখ্যা যদি 'জাট' সংখ্যার অর্ধেকেরও কম থাকত তবে তাঁরা তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার বলে বিবেচিত হতেন।

মনসবদারদের বেতন দেওয়া হতো নগদে কিংবা জমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে। যাঁরা সরকার থেকে বেতন পেতেন তাঁদের বলা হতো মনসবদার-ই-নগদি। আর যাঁরা সরকার থেকে নির্দিষ্ট জমি লাভ করতেন নিজের ও সৈন্যদের খরচ চালানোর জন্য তাঁদের বলা হতো 'জাগিরদার'। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম দিকে মনসবদারী প্রথা আদৌ বংশানুক্রমিক ছিল না। মনসবদারের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করতেন। ফলে মনসবদাররা অমিতব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়তেন। যদিও আকবর চেয়েছিলেন যে মনসবদাররা উত্তরাধিকারীর জন্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করতে যাতে না পারেন, সেইজন্য মনসবদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি সম্রাট বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নিতেন—কার্যত ফল হয়েছিল বিপরীত। উপরন্তু এই ব্যবস্থার ফলে স্বনির্ভর কোনও অভিজাত সম্প্রদায় মুঘল আমলে গড়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কালে এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। সেই যুগে রাজ্য রক্ষার জন্য বা শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোনও শক্তিশালী অনুগত রাজকর্মচারীর দল এগিয়ে আসেনি।

আকবর মনসবদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোর ভিতরে এক বিরাট সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তবে আকবরের আমলে মনসবদারী ব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হলেও কালক্রমে এই ব্যবস্থার মধ্যে নানা অসুবিধার উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিকদের একাংশ মনে করেন যে, মনসবদারী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তার সংগঠন ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত ছিল, তবে আকবরের সহজাত ব্যক্তিত্বের জন্য সেগুলি সেইযুগে তেমনভাবে প্রতীয়মান হয়নি। মনসবদাররা যে সকলেই সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিলেন তা নয়। দক্ষ প্রশাসক মনসবদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এদের বিদ্রোহ করার সুযোগ ছিল সর্বাধিক। কারণ তাদের অধীনে সৈন্য থাকত, তেমনই তাদের আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সাধারণ লোক সম্রাটের সম্পর্কে যতটা না অনুগত ছিল তার থেকে বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তারা মনসবদারদের সম্পর্কে বলে মনে করা হয়—কারণ তারা ছিল স্থানীয় প্রভু। মনসবদারদের এই ধরনের স্থানীয় প্রতিপত্তি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। আবুল ফজল নিজেও লিখে গিয়েছেন যে, মনসবদারদের একটি বিরাট অংশ ছিলেন অসৎ এবং সুযোগসন্ধানী। তারা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈন্য বা ঘোড়া সব সময়ে রাখতেন না। আকবর যদিও 'সওয়ার' ব্যবস্থার মাধ্যমে এই দুর্নীতি রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং 'দাগ' (Branding) ও 'চেহারা' (Descriptiveroll) প্রথা চালু করেছিলেন। অর্থাৎ ঘোড়ার গায়ে চিহ্ন দেওয়া

হতো, এবং প্রতিটি সৈনিক সম্পর্কে প্রশাসন বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখত—তা সত্ত্বেও মনসবদারদের দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মনসবদারী ব্যবস্থা মুঘল সেনাবাহিনীর ঐক্য ক্ষুণ্ণ করে তুলেছিল। কারণ মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্যদের সাথে মনসবদারদের যে সংযোগ ও আনুগত্যের বন্ধন ছিল তা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। কারণ মুঘল সেনাপতিদের আঞ্চলিক সৈন্যদলের ওপর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। ফলে মুঘল সেনাবাহিনীর সামগ্রিক সংহতিতে ফাটল দেখা যায়। আকবর তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে মনসবদারী প্রথাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মসবদারী প্রথার সহজাত ত্রুটিগুলি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ে মসবদারদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতেও দেখা গিয়েছিল।

৪খ.৭ সারাংশ

এই এককটিতে আকবরের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে মূল বিষয় করা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে আকবর যে রাজ্য উপহার পেয়েছিলেন সেখানে সংহতি, স্থিতিশীলতা, আনুগত্য শব্দগুলি ছিল অনুপস্থিত। একক প্রয়াসে, উদ্যম ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে, কখনও যুদ্ধ করে, কখনও মৈত্রীর পথ ধরে আবার কখনও বা প্রশাসনিক সংগঠনের মাধ্যমে আকবর এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন—যা মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা এবং মনসবদারী সংগঠন মুঘল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল পদক্ষেপ বলে স্বীকৃত। পরবর্তী পর্বে সুদীর্ঘকাল এই দুটি ব্যবস্থা ভারতবর্ষের প্রশাসনের অঙ্গ ছিল।

৪খ. ৮ অনুশলীনী

১। মুঘল সাম্রাজ্য গঠনের পর্বে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব কতটা ছিল?

২। গুজরাট ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ের ক্ষেত্রে আকবরের মনোভাব কি একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ছিল?

৩। আপনি আকবরের রাজপুত নীতির মূল্যায়ন কিভাবে করবেন?

৪। আকবরের পক্ষে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কতটা কৃতিত্বের ছিল?

৫। মনসবদারী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে এই প্রথার যথার্থতা বিচার করুন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—

(ক) পর্দা শাসন বা অন্তঃপুরিকার শাসন বলতে কি বোঝায়?

(খ) বৈরাম খাঁ কে ছিলেন?

(গ) হিমু কে ছিলেন?

(ঘ) মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে চাঁদবিবির ভূমিকা।

(ঙ) ‘দহশালা’ কি?

(চ) ‘মনসবদার’ বলতে কি বোঝায়?

(ছ) ‘জাট’ ও ‘সওয়ার’-এর পার্থক্য কোথায়?

মনে রাখুন :

দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ—১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (আকবর ও হিমুর মধ্যে)।

মহাম আনাঘা—আকবরের ধাত্রীমাতা।
হলদিঘাটের যুদ্ধ—১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে (মেবারের রাণা প্রতাপ ও আকবরের সেনাপতি মানসিংহের মধ্যে)।
মুজফ্‌ফর তুরাবতী—আকবরের দেওয়ান।
ক্রোরি—রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী।
দস্তুর-অল্‌-অমল—টোডরমলের রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত।
গাল্লা-বখ্‌শী—ফার্সী শব্দ, ভাগচাষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।
পোলজ—যে জমিতে প্রতিবছর চাষ হয়।
পরৌতি—যে জমি মাঝে মাঝে পতিত পড়ে থাকে।
চাচর—যে জমি তিন বা চার বছর পতিত পড়ে থাকে।
বঞ্জর—যে জমি পাঁচ বছর বা আরও বেশি সময়ের জন্য ফেলে রাখা হয়।
আবুল ফজল—'আইন-ই-আকবরী'র প্রণেতা।
'দাগ'—ঘোড়ার গায়ে 'চিহ্নিতকরণ' (Branding)।
'চেহরা'—সৈনিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখার প্রশাসনিক ব্যবস্থা (Descriptive roll)

৪খ.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Bharatiya Vidyabhavan : *The Mughal Empire.*
2. Iswari Prasad : *A Short History of Muslim Rule in India.*
3. Vincent Smith : *Akbar The Great Mughal 1542-1605.*
4. ইরফান হাবিব (সম্পাদিত) : *মধ্যযুগে ভারত (দুই খণ্ড)।*

পর্যায়-৪

একক ১ক ❑ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ— মুঘল শাসকশ্রেণীর সুদৃঢ়করণ

গঠন

১ক.০ উদ্দেশ্য

১ক.১ প্রস্তাবনা

১ক.২ প্রারম্ভিক কথা

১ক.৩ ১৬১২ : বাংলার বিদ্রোহ দমন

১ক.৪ ১৬১৪ : মেবার দমন : সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তর সংহতিকরণ

১ক.৫ ১৬১৬ : আহমদনগর জয় : দাক্ষিণাত্য নীতি

১ক.৬ ১৬২০ : কাংগ্রা বিজয় : উত্তর পার্বত্যাঞ্চলে অভিযান

১ক.৭ ১৬২২ : কান্দাহারের হস্তচ্যুতি : পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে মোগল সম্পর্ক

১ক.৮ পূর্বে ও উত্তর পূর্বে রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টা : উত্তরের ক্ষুদ্র রাজ্যজয়

১ক.৯ শিখ-মোগল সম্পর্ক : গুরু অর্জুনের আত্মত্যাগ

১ক.১০ জাহাঙ্গীরের প্রয়াণ : সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণে শাহজাহানের নুতন প্রয়াস

১ক.১০.১ আভ্যন্তরীণ সীমার সংহতিকরণ : রাজধানীর পরিবর্তন : শাহজাহানবাদ দিল্লী

১ক.১০.২ পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যজয়

১ক.১০.৩ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে রাজ্যবিস্তারের প্রয়াস : মোগলদের মধ্য-এশীয় নীতি

১ক.১০.৪ উত্তর ও উত্তর পূর্বে রাজ্যজয় ও পূর্বে শাসনবিস্তারের প্রয়াস

১ক.১০.৫ আদিলশাহী ও কুতুবশাহী শাসনের অবসান

১ক.১১ মোঘল রাজশক্তির সংহতিসাধন : শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠন

১ক.১১.১ মনসবদার ও জাগিরদার

১ক.১২ সারাংশ

১ক.১৩ অনুশীলনী

১ক.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগলদের—

- বাংলা ও মেবারের বিদ্রোহ দমন
- দাক্ষিণাত্য নীতি
- পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক
- শিখ-মোগল সম্পর্ক
- শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠন

১ক.১ প্রস্তাবনা

মোগল যুগের ইতিহাস পড়ার অর্থ হল প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানা। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাস শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের ঐক্যও রচিত হয়েছিল দীর্ঘকাল আগেই। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিবর্তনের একটি পর্যায় হল মোগল সাম্রাজ্য। তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্তান থেকে আগত মানুষরা ভারতবর্ষে এসে কেমন করে এদেশের মানুষদের সঙ্গে মিশে একটি মহামানবের সম্মিলন ঘটিয়েছিল, কেমন করে বাইরে থেকে আনা ভাবধারা আমাদের দেশে চৈতন্য-চিন্তার সাথে মিশে একটা বৃহত্তর সার্বভৌম জীবনবোধ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছিল তারই কাহিনী আমরা জানতে পারি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে। এর সঙ্গে জানতে পারি আরও বড় একটি কথা। অনেক মানুষ ভারতবর্ষে এসেছে বাইরে থেকে। তারা কেউই শেষপর্যন্ত ভারতীয় জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেনি। নানা ভাষা, নানা পথ, নানা মত, নানা পরিধানের মধ্যেও একটা জাতীয় ঐক্য, আবহমানকাল ধরে ভারতীয় জীবনধারার অন্তর্লীন বিষয় হয়ে রয়েছে। এই নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কেমন করে গড়ে উঠল তার ইতিহাস আমরা পাই মোগল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের কাহিনীর মধ্যে। আবার, ইতিহাস পড়তে গেলে তার একটা দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার। মোগলদের ইতিহাস পড়তে গেলে আমাদের এই দৃষ্টিকোণকে একটু বুঝে নিতে হবে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঘাতপ্রতিঘাত থাকে, সবদেশে থাকে, আমাদের দেশেও ছিল। আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উঠে এসেছে একটা সার্বজনীন, সার্বভৌম জাতীয় স্বত্বা, যার অংশ হিসাবে দেশের প্রত্যেক মানুষ তার বিশিষ্টতা পেয়েছে। মোগল সেনাবাহিনীতে যেমন পাঠান সৈন্যরা ছিল, সেইরকম মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে রাজপুতরাও ছিল। মহামতি আকবর যেমন ইসলাম ধর্মের বাণীকে অন্তর গ্রহণ করেছিলেন, সেইরকমভাবে অন্য ধর্মের প্রেরণাকেও ভারতীয় জাতিসত্ত্বার মধ্যে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এই সামগ্রিক সম্পৃক্তির ধারার মধ্যে কাউকে বিদেশি, বিজাতি, বিধর্মী বলে চিহ্নিত করা যাবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠের এই দৃষ্টিকোণ হল একটি সংশ্লেষের দৃষ্টিকোণ (integrationist outlook)। এটি ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টিকোণ দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বোঝা যাবে না। আমরা এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের ইতিহাস পড়ব।

১ক.২ প্রারম্ভিক কথা

আকবর মুঘল সাম্রাজ্যকে তিনটি ধারা দিয়ে গিয়েছিলেন—এক, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ধারা, দুই, রাজস্বব্যবস্থার সংহতিকরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ়করণের ধারা এবং তিন, সহাবস্থান ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার ধারা। এই তিন ধারার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছিল। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মোটামুটিভাবে এই পরিকাঠামোর মধ্যেই কাজ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৬০৫ সালের ৩ নভেম্বর। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬২৭ সালের ২৮ অক্টোবর—তাঁর রাজত্বের বাইশতম বছরে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান তথ্য আমরা যে সব থেকে পাই তাদের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী—**তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি**। এই গ্রন্থ এবং আরও কয়েকটি সহযোগী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সমস্ত যুদ্ধের ফল হয়েছিল পাঁচটি—১৬১২ সালে বাংলার বিদ্রোহ

দমন, ১৬১৪ সালে মেবার দমন, ১৬১৬ সালে আহমদনগর জয়, ১৬২০ সালে কাংড়া বিজয় এবং ১৬২২ সালে কান্দাহারের হস্তচ্যুতি।

১ক.৩ ১৬১২ : বাংলার বিদ্রোহ দমন

১৬০৬ সালে সুবে বাংলা থেকে রাজা মানসিংহের প্রত্যাবর্তন এবং সেখানকার সদ্যনিযুক্ত শাসক কুতুবুদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যু পূর্বভারতে মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে। বিহার ও বাংলায় আফগান অভিজাতরা শক্তিশালী থাকায় সেখানে আফগান শক্তির শিকড় তখনও মজবুত ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাদের বৈরী মনোভাব এই অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যকে কখনো সুস্থিত হতে দেয়নি। সাম্রাজ্যের এইরকম অসংগঠিত অবস্থার মধ্যেই বাংলা থেকে মানসিংহকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে আফগানদের মধ্যে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়। কুতুবুদ্দিনের উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর কুলি খান ছিলেন বৃদ্ধ এবং অথর্ব—অতএব শাসক হিসাবে অসহায়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোন উদ্যোগ নেবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাংলার শাসক হয়ে আসেন ইসলাম খাঁ। পূর্বাঞ্চলীয় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত থেকে কেন্দ্রে আসার নীতি গ্রহণ করে তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

প্রান্তলিপি

এই গ্রন্থটি আলেকজাণ্ডার রজার্স **(Alexander Rogers)** এবং হেনরি বেভারিজ **(Henry Beveridge)** মেময়ার্স অফ জাহাঙ্গীর **(Memoirs of Jahangir)** নামে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১৪ সালে দুই খণ্ডে এই গ্রন্থটি ছাপা হয়। পরে ১৯৬৮ সালে মুন্সিরাম নামে পুস্তকবিক্রেতা ভারতীয় মুদ্রণ হিসাবে বইটি ছাপেন।

ইতিমধ্যে ১৬১১-১২ সালে উসমান খাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে আফগানরা বিদ্রোহ করে। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন যে, আফগান বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে আকবরের সময় থেকেই চলছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে হিন্দুরাজা ও জমিদারদের কার্যকলাপের ফলে তা আরও জটিল হয়ে পড়ে। আফগানরা নতুন রাজধানী ঢাকা জয় করার চেষ্টা করে। ইসলাম খাঁ কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। ১৬১২ সালে উসমান খাঁর মৃত্যু হয়। সমকালীন কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে "শেষ আফগান'—"the last of the Afghans"—বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের আফগান বিদ্রোহ দমনের আনুষঙ্গিক ঘটনা হল বারভুঁইয়াদের বশীভূত করার প্রয়াস। সোনারগাঁওয়ের মুসা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করার কাজ এই সময়ে শুরু হয়। প্রতাপাদিত্যের মত কয়েকজন বারভুঁইয়াদের হাতে ছিল শক্তিশালী নৌবহর। তপন রায়চৌধুরী বলেছেন যে, নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌবহর (flotilla) কত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিপক্ষের হাতে তা কত বিপজ্জনক তা বুঝতে পেরেই বারভুঁইয়া দমনের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। প্রতাপাদিত্যের নৌবহর ধ্বংস করা হয়েছিল। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর কাসিম খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ সুবাদার হিসাবে বারভুঁইয়াদের দমন করেন।

বিদ্রোহ দমনের সঙ্গে সঙ্গে বশীকরণের নীতি গ্রহণ করতে হয়। আফগানদের সম্বন্ধে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন জাহাঙ্গীর। **মখজান-ই-আফগান**-তে বলা হয়েছে যে, জাহাঙ্গীর "তাদের (আফগানদের) ক্ষমতার বাইরে যাওয়ার প্রাক্তন প্রয়াসকে ক্ষমা করে তাদের নিজের উদার্যে বাঁধতে চেয়েছিলেন যাতে তারা নিজেদের শুভ কাজের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ ওমরাহ পদে উন্নীত হয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যের শাসকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার

যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এইভাবে বারভুঁইয়াদের নৌবহর ভেঙ্গে দেওয়া এবং আফগানদের দমন ও আলিঙ্গা নের নীতি দ্বারা বশীভূত করার ফলে বাংলাদেশ তথা পূর্বভারতে মুঘল শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১ক.৪ ১৬১৪ মেবার দমন : সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সংহতিকরণ

বাংলার বিদ্রোহ দমন প্রমাণ করেছিল যে, জাহাঙ্গীর তাঁর সাম্রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সংহতিসাধনের বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সংহতিসাধনের প্রথম পদক্ষেপ হল মেবার দমন। রাজপুত জাতির শিশোদিয়া শাখার সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রশক্তি ছিল মেবার। স্বাধীনতা রক্ষার ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের যে ঐতিহ্য রাজপুতজাতি দীর্ঘদিন ধরে বহন করে আসছিল তার শেষ শিখাকে অন্তরে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ ও তার পুত্র অমর সিংহ। ফলে এই দুই প্রজন্মের শিশোদিয়া শক্তির বিরুদ্ধে আকবর থেকে জাহাঙ্গীর এই দুই প্রজন্মের মোগলদের লড়াই করতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ লিখেছেন যে, মেবারের রাজশক্তি নিজের ভৌগোলিক অবস্থানের খুঁটিনাটি জানত। কোথায় পাহাড় দুর্গম, কোথায় গিরিপথ সঙ্কীর্ণ, কোথায় অজানা পাহাড়ের বুক চিরে সংগোপন পথ আছে কোথায় সাধারণের অগোচরে আছে চলাচলের পথঘাট তা তাদের জানা ছিল। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে বলা হয়েছে যে, রাণা অমর সিংহ ও তাঁর পূর্বপুরুষরা কেউই হিন্দুস্থানের কোন শাসকের কাছে নতি স্বীকার করেননি কারণ তাঁদের পার্বত্য অবস্থানের ঘেরাটোপে তাঁদের নিরঙ্কুশ অবস্থান ছিল নিশ্চিত।

আকবরের সময় থেকেই জাহাঙ্গীর মেবার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেই বাদশাজাদা পারওয়াজের নেতৃত্বে মেবারে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু যুবরাজ বিদ্রোহ এবং ঐতিহাসিক জন এফ. রিচার্ড্স-এর মতে, শিশোদিয়াদের এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতার জন্য এ অভিযান ব্যর্থ হয়। এর পর থেকে অভিযান প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৬০৮ সালে মহাবত খাঁর অধীনে এবং ১৬১৩ সালে যুবরাজ খুররামের নেতৃত্বে শক্তিশালী অভিযান প্রেরিত হয়।

মেবারের বিরুদ্ধে মোগলরা দু-ধরনের সামরিক নীতি গ্রহণ করেছিল। এক, মেবারের চারপাশের বসতি ছারখার করে মানবশক্তি সঞ্চালনের দ্বারা শত্রুবাহিনীকে অগ্রগতি প্রতিরোধ দেবার যে ক্ষমতা মেবারের ছিল তা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক সামরিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (military checkpoints) স্থাপন করে মোগল বাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে পশ্চাৎঘাঁটির শৃঙ্খল বিন্যাসিত যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দুই, মেবারের চারপাশের সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে মেবারের সরবরাহের উৎস ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এইরকম অবরোধের পরিস্থিতি তৈরি করে মোগলবাহিনী নিরন্তর অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা আক্রমণের চাপকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং মর্যাদাসম্পন্ন শিশোদিয়া পরিবারের লোকজনকে ধরে এনে বন্দী করে রাখা হয়।

এই চাপকে দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করা যায় না। অবশেষে রাণা অমর সিংহ সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করতে রাজী হলেন। ১৬১৫ সালের চুক্তির দ্বারা রাণা মোগলদের 'আনুগত্য ও বশ্যতা' ('obedience and loyalty') প্রদান করলেন। জাহাঙ্গীর 'রাণার ঔদ্ধত্য' ক্ষমা করলেন এবং তাঁকে একটি 'মর্যাদাসম্পন্ন ফারমান' প্রদান করা হল, যার ওপর বাদশাহ লিখেছেন, 'আমার কল্যাণ হস্তের ছাপ মুদ্রিত ছিল।' রাণাকে চিতোর দূর্গ ফেরত দেওয়া হল, তাঁর পরিবারের কোন কুমারী কন্যাকে মোগল হারেমে যাওয়ার নীতি পরিহার করা হল এবং রাণার বার্ধক্যহেতু তাঁর পরিবর্তে তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী করণকে জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করা হল। বাদশাহর দরবারে তাঁকে উচিত মর্যাদায় সম্রাটের ডানদিকে বসার ব্যবস্থা করা হয়। যে কদিন তিনি সম্রাটের দরবারে

ছিলেন সে কদিনই তাঁকে কোন না কোন নতুন উপহার সম্রাট দান করেছিলেন। মোট তাঁকে ২,০০,০০০ টাকা, ১১০ টি অশ্ব, পাঁচটি হাতি প্রদান করা হয়েছিল। জাহাঙ্গীর লিখেছেন 'যেহেতু অমর সিংহ ছিলেন অমার্জিত প্রকৃতির, যেহেতু তিনি কখনো সভাসমিতি দেখেননি এবং যেহেতু তিনি পাহাড়ে পাহাড়েই কাটিয়েছেন সেহেতু তাঁর হৃদয়কে জয় করার জন্য আমি প্রতিদিনই তাঁকে কিছু না কিছু উপহার দিয়েছি।'' প্রতিপক্ষকে উপহার ও উপঢৌকনের মাধ্যমে বশীভূত করার এই নতুন নীতি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল।

১ক.৫ ১৬১৬ : আহমদনগর জয় : দাক্ষিণাত্য নীতি

আকবরের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল। সেখানকার মুসলিম সুলতানদের স্বাধীনতাকে চূর্ণ করার যে নীতি আকবর শুরু করেছিলেন তার ফলে খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগরের উত্তরাঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। হঠাৎ করে উত্তর ভারতে পুত্র সেলিমের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ১৬০১ সালে আকবরকে অসিরগড়ের অবরোধ তুলে নিতে হয়। সেই সময় থেকে শুরু হয় মালিক অম্বর নামে এক হাবসী দাস সৈনিকের তৎপরতা। পাহাড়-দুর্গ দৌলতাবাদের থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে সুলতান মুরতাজা নিজাম শাহের (১৫৯৯-১৬৩১) রাজধানী খাড়কি বা খিড়কিকে ভিত্তি করে মালিক অম্বর তার প্রভাবাধীন এলাকা বাড়িয়ে চলেছিলেন। তিনি মারাঠাদের সামরিক প্রতিভার বিশেষ দিকগুলি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন এবং রাজা টোডরমলের অনুকরণে নিজের রাজস্ব ব্যবস্থাকে সাজিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা ও নিজ রাজ্যের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যাদব সম্প্রদায়ের মানুষ ও মারাঠা পরিবারগুলির কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে নিজামশাহী রাজ্য দাঁড়িয়েছিল।

আহমদনগরের বিরুদ্ধে অভিযানে মোগলদের মূল ঘাঁটি হয়েছিল বুরহানপুরে। সেখান থেকে পর পর কয়েকটি ব্যর্থ অভিযান চালানোর পর ১৬১৬ সালে যুবরাজ পারভেজ-এর নেতৃত্বে জালনার যুদ্ধে আহমদনগরের বাহিনী পরাজিত হয়। মোগলবাহিনী খাড়কি (খিড়কি) শহর লুঠ করে। আহমদ নগরের স্থায়ীবাহিনীর অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শত্রু সংহারের এইটুকু কৃতিত্ব অর্জন করতে মোগলবাহিনীর আটবছর সময় লেগেছিল—কারণ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আহমদনগরের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান ১৬০৮ সালে মোগল সেনাপতি খান-ই-খানানের নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল। অথচ আট বছরের চেষ্টায় কোন স্থায়ী সাফল্য আসেনি। মালিক অম্বর মোগলদের কাছে পরাজিত হয়ে দৌলতাবাদ দুর্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শুরু হয় তাঁর গেরিলা যুদ্ধ। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, দক্ষিণ ভারতে গেরিলা যুদ্ধের প্রকৃত প্রবর্তক তিনি। তাঁর কাছ থেকেই মারাঠারা নিখুঁতভাবে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখে নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করে। অতর্কিত আক্রমণের পটুত্ব তাঁর ছিল বলেই যতদিন মালিক অম্বর জীবিত ছিলেন ততদিন মোগলদের শান্তি ছিল না। ১৬২৬ সালে মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। অতএব জালনার যুদ্ধের পর দশ বছর লঘু মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনীকে পরিচালনা করে তিনি মোগল স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করেন। দুটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। এক, দাক্ষিণাত্যে মোগলবাহিনীকে এগিয়ে দিতে স্বয়ং সম্রাট মাণ্ডু পর্যন্ত (Mandu) পর্যন্ত এসেছিলেন এবং পরে গুজরাত হয়ে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ সম্মুখভাবে যে মোগলবাহিনী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তার পশ্চাৎভূমিতেই বিরাট মোগল শক্তি স্বয়ং সম্রাটের নেতৃত্বেই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। বোঝা যায় যে, আহমদনগরকে সহজে বশীভূত করা যাবে না এ সচেতনতা দিয়েই মোগল প্রস্তুতি তৈরি হয়েছিল। দুই, মোগল

সম্রাটের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পরে পরেই মালিক অম্বর আহমদনগরের ওপর আরোপিত মোগল চুক্তিকে অস্বীকার করে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে দাক্ষিণাত্য থেকে মোগল বিতাড়নের কাজ শুরু করেন। যুবরাজ খুররামের নেতৃত্বে ছয়মাস বিপুল অভিযান চালিয়ে আহমদনগরকে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে এক দীর্ঘ সময় ধরে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে অস্থিরতা কায়েম হয়েছিল। এই অস্থির সময়ের মধ্যে আহমদনগর কখনো বশীভূত, কখনো বিদ্রোহী—কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অংশ বা তার করদ রাজ্য কোনটিই ছিল না। কখনো বিদ্রোহ, কখনো আত্মসমর্পণ—এই দুই বিপরীত ধারার মাঝে থেকে মারাঠা প্রধানরা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে—যেমন রাজ্য বাড়ানো, লুঠ করা, নিজেদের ঐশ্বর্য ও স্বয়ংক্রিয়তার সীমাকে অবিরত বাড়িয়ে যাওয়া ইত্যদি। এরই মধ্যে ১৬২১ সালের মাঝামাঝি খবর আসে যে জাহাঙ্গীর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অতএব সব দৃষ্টি নিবন্ধ হল উত্তরে। দাক্ষিণাত্যে মোগল রাজনৈতিক তৎপরতায় ভাটা পড়ল। রিজভি লিখেছেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগলদের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধগুলি খুব ফলপ্রসু হয়নি। দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল ছিল তাদের দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের শেষ সীমা, তার দক্ষিণে নয়।

১ক.৬ ১৬২০ : কাংড়া বিজয় : উত্তর-পার্বত্যঞ্চলে রাজ্যবিস্তার

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যজয় হল কাংড়া বিজয়। এই দুর্গটি আকবরও জয় করতে পারেননি। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে অবস্থিত এই দুর্গটির ভৌগোলিক সংস্থানই তার নিরঙ্কুশ প্রতিরক্ষার কাজ করেছিল। শাস্-ফাত্-ই-কাংগ্রার (Shash Fat-i-Kangra) বর্ণনা অনুযায়ী পাহাড়ের এত উচ্চ চূড়ায় এটি অবস্থিত ছিল যে কোনদিনই বহিঃশত্রু এই দুর্গ দখল করতে পারেনি। জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত মোট ৫২ বার একে আক্রমণ করা হয়েছিল, কিন্তু কোনবারই তাকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে একই রাজবংশের হাতেই রয়ে গিয়েছিল এই দুর্গ। প্রাচীনকালে কোন সময় তা নির্মিত হয়েছিল তা কারও জানা ছিল না। ফলে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন স্বাধীন দুর্গগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

শুধু স্বাধীনতার দর্পচূর্ণ করার জন্য জাহাঙ্গীর এর দিকে হাত বাড়াননি। মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ-শীলতার মধ্যবর্তী পর্বে উত্তর ভারতের ভূ-রাজনীতি (geopolitics) ও পার্বত্যাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপ বিশেষভাবে কাজ করেছিল। নিউ কেমব্রিজ ঐতিহাসিক রিচার্ডস দেখিয়েছেন যে, আকবর ছোট-বড় সমস্ত রাজপুত রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করেও তাদের আভ্যন্তরীণ স্বশাসনের (autonomy) অধিকার দিয়ে তাদের অধীন করদরাজ্যে পরিণত করার নীতি। এইসব রাজারা সম্রাটের আধিপত্য (supremacy) মেনে নিয়ে তাঁকে বাৎসরিক কর ও সামরিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করে নিজেদের স্ব-শাসনের অধিকার বজায় রাখতে পারতেন। প্রয়োজনবোধে তাদের উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্রাট নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। এর ফলে কাশ্মীরের সীমানা থেকে বাংলাদেশের সীমানা পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশের একটানা দীর্ঘ অঞ্চল মোগলদের উত্তর-অভিযানের বুনিয়াদি ভূমি হিসাবে কাজ করতে পারত। তার মধ্যে কয়েকজন পার্বত্য রাজা সাম্রাজ্যের মনসবদাররূপে রাজসেবায় নিযুক্ত ছিল। এটি ছিল উত্তরে সমরাভিযানের ভূ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল।

এই ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্বত্যঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। হিমালয়ের গিরিপথগুলি দিয়ে বণিক ও যাযাবররা চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু কোন সামরিক তৎপরতা সেখানে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আকবর হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যগুলিতে সারিবদ্ধ ফৌজদার বা

সামরিক প্রশাসকদের বসিয়ে দিয়ে পাহাড়ে একটা সুসংবদ্ধ সামরিক বেষ্টনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এইবার আকবরের অর্ধসমাপ্ত এই কাজকে সম্পূর্ণ করে সাম্রাজ্যের উত্তর সীমাকে সুরক্ষিত করার দরকার হল। যুবরাজ খুররামের নেতৃত্বে কাংগ্রাবিজয় এই কাজ সমাপ্ত করে।

কাংড়া-অভিযানের যুবরাজ খুররাম প্রায় একই সামরিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যা মেবার জয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছিল। দুর্গকে অবরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রসদ সরবরাহের সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। মজুত করা খাদ্য ও সঞ্চিত জলে দুর্গের মানুষ চারমাস বেঁচে ছিল। তারপর মৃত্যু অনিবার্য জেনে নিরুপায় দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করে। জাহাঙ্গীর স্বয়ং এই বিজিত দুর্গ পরিদর্শন করেন এবং প্রথানুযায়ী একটি গো-বলিদান করে একটি বড় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

১ক.৭ ১৬২২ : কান্দাহারের হস্তচ্যুতি : পারস্য ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে মোগল সম্পর্ক

মোগল-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার ইসলামিক রাজ্যগুলি সম্বন্ধে শুরু থেকেই মোগলরা স্পর্শকাতর ছিল। উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষে অবিরত নেমে এসেছে বিদেশি আক্রমণের ধারা। এই ধারাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত একটি সামরিক সীমারেখা (Scientific Military line of frontier) টানার দরকার ছিল। মোগল শাসকরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে বহুমানবসমন্বিত, সুপরিচালিত, সুসংবদ্ধ মধ্যএশিয়া অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রিচার্ডস্ লিখেছেন যে, এর জন্যই তাঁদের কাবুল এবং পেশোয়ার এবং সম্ভব হলে কান্দাহার ও গজনী দখল রাখার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও তার ওপারে সঙ্ঘবদ্ধ বণিকগোষ্ঠীর যে বাণিজ্য চলত [যাকে ঐতিহাসিকরা ক্যারাভান বাণিজ্য বলেছেন] তার ফসলকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নও জড়িত ছিল। মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা পারস্য ও মধ্য-এশিয়া থেকে আগত এবং মোগল প্রশাসকদের মধ্যে এক বিরাট কৌমগোষ্ঠী (ethnic group) হিসাবে তারা চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখত। পরিশীলিত মুসলিম সংস্কৃতির ধারক পারস্যের কাছে মোগলভারত ছিল অধস্তন সংস্কৃতির অঞ্চল। মোগলরা না চাইলেও দুঃখের সঙ্গে এ ধারণাকে তাদের মেনে নিতে হয়েছিল। অতএব ভারতীয় মোগলদের লক্ষ্য ছিল তাদের অসামান্য সামরিক শক্তিকে জাহির করে তাদের সাংস্কৃতিক হীনমন্যাতাকে অপনোদন করা। আয়তনের দিক থেকে পারস্য সাম্রাজ্য ছিল মোগল সাম্রাজ্য থেকে ছোট অথচ তাদের আস্ফালন ছিল অনেক বেশি। সাফাভি (Safavi) পারস্যের সঙ্গে তিমুরি (Timurid) [তৈমুর থেকে তৈমুরি বা তিমুরি] ভারতের সংঘাত ছিল এইখানে।

এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির মধ্যে কান্দাহার নিয়ে মোগল-পারসিক লড়াই। ১৫২২ সালে বাবর এ রাজ্য দখল করেন। তারপর হুমায়ুনও কামরান এ দখল বজায় রেখেছিলেন। ১৫৫৮ সালে একবার হস্তচ্যুত হয়ে কান্দাহার আবার মোগল সাম্রাজ্যে ফিরে আসে ১৫৯৪ সালে যখন আকবর তাকে জয় করেন। যুবরাজ খুসরু যখন বিদ্রোহ করে তখন পারস্যের শাসক শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯) খোরাসান ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রধানদের কান্দাহার আক্রমণের জন্য উস্কে দিয়েছিলেন। ১৬২০ সালে যখন সম্রাট জাহাঙ্গীর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর প্রভাবশালী রানী নুরজাহান ও যুবরাজ খুররাম-এর (পরে শাহজাহান) মধ্যে দরবারে আধিপত্য নিয়ে লড়াই বাধে। এই সুযোগে পারস্যের শাসক শাহ আব্বাস স্বয়ং এক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়ে কান্দাহার দখল করে নেন। এই দখলের পরে শাহ আব্বাস জাহাঙ্গীরকে লিখলেন যে কান্দাহার

পারস্যের রাজ্যাংশ; জাহাঙ্গীরের উচিত ছিল অনেক আগেই তা প্রত্যর্পণ করা। এতদ্‌সত্ত্বেও দুই সম্রাটের বন্ধুত্ব ও মিলনের যে "বসন্তকালীন ফুল" ('the ever vernal flower of union and cordiality) তা নিরন্তর প্রস্ফুটিত থাকবে। জাহাঙ্গীর পারস্য সাম্রাজ্যকে প্রত্যাঘাত করতে চেয়েছিলেন—অভিযানের রথকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত। কিন্তু যুবরাজ খুররামের বিদ্রোহ এই মোগল প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দিল।

১ক.৮ পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টা : উত্তরের ক্ষুদ্র রাজ্যজয়

জাহাঙ্গীরের সময়ে বৃহৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘটনার পাশে পাশে চলেছিল ছোট রাজ্যজয়ের অবিরত প্রয়াস। ১৬১১ সালে রাজা টোডরমলের পুত্র রাজা কল্যাণ খুরদা রাজ্য জয় করেন। এর ছয় বছর বাদে ১৬১৭ সালে খুরদার রাজা পুরুষোত্তম দেব বিদ্রোহ করলে খুরদা রাজ্যটি সরাসরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা দক্ষিণ-পূর্বে গোলকোণ্ডার সীমানা স্পর্শ করে। ১৬১৫ সালে নূরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ দুর্জন সালকে পরাজিত করে খোখারা (Khokhara) রাজ্যটি অধিকার করেন। এর ফলে একটা বড় হীরাখনি মোগল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে এল। ১৬১৭ সালে কচ্ছের জাম ও ভারা অঞ্চলের উগ্র উপজাতিদের দমন করা হয়। ১৬২০ সালে কাশ্মীরের দক্ষিণে কিস্তওয়ার (Kishtwar) নামে ছোট রাজ্যটি দখল করে নেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব আহোমদের সঙ্গে মোগলদের একাধিকবার লড়াই হয়েছিল। আহোমরা এসেছিল ব্রহ্মদেশ থেকে। তারা পুষ্ট হয়েছিল বাধাহীন রাজ্যজয়ের ঐতিহ্যে। জাত-ধর্ম কোনকিছুর বালাই তাদের ছিল না। ফলে তারা অনায়াসে মানবশক্তি সঞ্চালনের ক্ষমতা অর্জন করেছিল। প্রয়োজন হলে তারা তাদের সমস্ত পুরুষদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিত। রাস্তা নির্মাণ, আল বাঁধা, সেচের ব্যবস্থা করে তারা যেমন অর্থনৈতিক উজ্জীবনের দিকে নজর দিত সেইরকমভাবে শ্রম ও ফসলের মধ্য দিয়ে কর আদায় করে নিজেদের লড়াই করার ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখত। এইরকম সংগঠনের পাশে তারা গড়ে তুলতে পেরেছিল সঙ্কল্পবদ্ধ শক্তিশালী পদাতিক বাহিনী তীক্ষ্ণ তীরধনুকের অসামান্য ব্যবহারে যারা ছিল পটু। তারা ভারতবর্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমরপ্রযুক্তিকে বহন করে এনেছিল যার সঙ্গে মোগলরা লড়াই করে পেরে ওঠেনি। রাতের অতর্কিত ঝটিকা আক্রমণে তারা দক্ষ ছিল বলে দিবালোকের গোলাবারুদ ও সৈন্য সঞ্চালনের যুদ্ধে অভ্যস্ত মোগলবাহিনী তাদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিতে পারেনি। তারা মোগল শক্তির অগ্রসরকে উত্তর-পূর্বে রুখে দিয়েছিল।

১ক.৯ শিখ-মোঘল সম্পর্ক : গুরু অর্জুনের আত্মত্যাগ

আহোমদের থেকে অনেক বেশি সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েও উত্তর-পশ্চিমের শিখ শক্তি মোগলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ধারাকে রোধ করতে পারেনি। মোগল শক্তির কেন্দ্র দিল্লি-আগ্রা থেকে আহোমরা ছিল অনেক দূরে, শিখরা ছিল অনেক কাছে—মোগলদের নাগালের মধ্যে। তাই ১৬০৫ সালে শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন বিদ্রোহী যুবরাজ খুসরুকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন বলে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় (১৬০৬)। মনে রাখতে হবে, যে শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছিল তা দেশদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের অপরাধে, বিধর্মী হওয়ার অপারাধে নয়। গুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখদের ষষ্ঠগুরু হিসাবে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অমৃতসরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং দুদিকে কৃপাণ ঝুলিয়ে সভাসদদের নিয়ে দরবার করতেন। তাঁর এই

রাজার মত ভাব দেখে জাহাঙ্গীর তাঁকে বারো বছর (১২ বছর) গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখেন। পরে মুক্ত হয়ে তিনি হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলে শিখদের ঘাঁটি সরিয়ে নেন।

অনুশীলনী ১

১। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (✗) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :
   (ক) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান তথ্য আমরা যে সব বই থেকে পাই তাদের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ হল জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী।
   (খ) জাহাঙ্গীর মেবারের বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরণ করেননি।
   (গ) আকবরের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য সম্প্রসারণের শুরু হয়েছিল।
   (ঘ) মোগলভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার ইসালামিক রাজ্যগুলি সম্বন্ধে শুরু থেকেই মোগলরা উদাসীন ছিল।
   (ঙ) উত্তর-পূর্ব আহোমদের সঙ্গে মোগলদের একাধিকবার লড়াই হয়েছিল।

২। পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে মোগলদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? (দশ লাইনের মধ্যে উত্তর লিখুন)

১ক.১০ জাহাঙ্গীরের প্রয়াণ : সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণে শাহজাহানের নতুন প্রয়াস

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে জাহাঙ্গীর প্রয়াত হন। তাঁর প্রয়াণকালে সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল এবং একটি শাসকবংশ হিসাবে মোগলদের পারিবারিক মর্যাদা ও ঐতিহ্য হয়ে উঠেছিল অপরিসীম। একরকম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। যুবরাজ শাহরিয়র লাহোরে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত যুবরাজ খুররাম আসফখানের সহযোগিতায় তাঁকে পরাজিত করে শাহজাহান উপাধি গ্রহণ করে দিল্লির মসনদে উপবিষ্ট হন (২ জানুয়ারী ১৬২৮)। সেই মুহূর্তে তিনি হলেন উপমহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক এবং একটি প্রাচীন ও নিশ্ছিদ্র রাজকীয় শাসন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। রিচার্ডস-এর ভাষায়—He was heir to an ancient and impeceable royal lineage.

এইরকম রাজকীয়তাকে নিষ্কণ্টক করা আর নিজের সাম্রাজ্যের সীমাকে বাড়িয়ে নিজের অপ্রতিহত প্রতাপকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে শাহজাহান দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এক, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে, নূরজাহানকে বৃত্তিভোগী করে এবং তাঁর সুহৃদ আসফ খাঁকে ভকীল (wakil) পদে নিযুক্ত করে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিলেন। দুই, ১৬২৯ থেকে ১৬৩১ সালের মধ্যে বলিষ্ঠ আফগান নেতা খান-ই-জাহান লোদীকে পরাজিত ও হত্যা করে ভারতবর্ষে আফগান শক্তির পুনর্জাগরণের সম্ভাবনাকে বিনাশ করেন। খান-ই-জাহান মোগল সম্ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রথমে দাক্ষিণাত্য এবং পরে বেরার ও আহমদনগরের শাসকও হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্রাটের আস্থাভাজন হতে পারেননি।

১ক.১০.১ অভ্যন্তরীণ সীমার সংহতিকরণ—রাজধানীর পরিবর্তন : শাহজাহানাবাদ দিল্লি

অভ্যন্তরীণ সীমানা সংরক্ষণের কাজে শাহজাহানের একটি বড় পদক্ষেপ হল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে

নতুন রাজধানীর পত্তন। পুরনো রাজধানী আগ্রা ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দিল্লি ছিল যমুনা নদীর ওপর সনাতন হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র। সেখানে অনেক মুসলিম ধর্মীয় নেতার সমাধি থাকায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে তা ছিল একটি পবিত্র অঞ্চল। আঠারো শতকের একজন লেখক হাকিম মহরত খান ইসফাহানি (Hakim Maharat Khan Isfahani) তাঁর গ্রন্থ **বাহ্‌জত অল-আলম-এ** (Bahajat al-Alam) লিখেছেন যে দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লি ছিল মুসলমানদের কাছে **দার-অল-মূলক** (dar-al Mulk) বা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান (seat of empire) এবং **মরকজ-ই দায়রা ইসলাম** (markaz-i dairah Islam) ফলে সঙ্গতভাবেই সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল।

১ক.১০.২ পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যজয়

রাজপুত রাজ্যগুলির স্বাধীনতাকে হরণ করে উত্তরে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তারের কাজকে মোগল কর্মসূচির মধ্যে রেখেছিলেন আকবর এবং জাহাঙ্গীর। সেই কর্মসূচির প্রসার ঘটে শাহজানের রাজত্বকালে। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাগ্‌লানার (Baglana) ছোট রাজপুত রাজ্যটিকে গ্রাস করে তাকে খান্দেশ প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সুরাট এবং পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সংযোগরেখার মাঝখানে ছিল বাগ্‌লানা। বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন উভয়কে সুরক্ষিত করতে হলে উপজাতীয় রাজনীতির (Tribal) ছোট ছোট কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করার দরকার ছিল। বালুচ ও রাজপুতদের অসংখ্য অশান্ত উপজাতিদের অরাজকতার ওপর উচ্ছৃঙ্খলতার ধারাবাহিক ঐতিহ্য ভেঙে সেখানে সাম্রাজ্যের শক্তিকাঠামো (authority structure) এবং একীভূত সাম্রাজ্য শাসন (standard-ized imperial administration) কায়েম করার জন্য সিন্ধুপ্রদেশে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছিল। সেওয়ান-নাসাপুর-টাট্টা থেকে অভিযান চালিয়ে সারিবন্ধ ছোট থানা এবং ছোট কেল্লা তৈরি করে বিরাট অঞ্চলের দস্যুবৃত্তিপ্রবণ উট ও অশ্বারোহী কৃষিজীবী এবং যাযাবর জাতিদের স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে এক বিরাট অঞ্চল থেকে রাজস্ব আসতে শুরু করে। এর পর থেকে উপজাতীয় দস্যুতা (Tribal banditry) একবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বুন্দেলীদের পরাজয় :

রাজস্ব আদায় ও উপজাতীয় দস্যুতা নিবারণ এবং সাম্রাজ্যের অধস্তন শক্তির সার্বভৌমত্বের সংহারসাধন—এই তিনকে লক্ষ্য করে বুন্দেলীদের বিনাশ করেছিলেন শাহজাহান। আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্যের মাঝখানে এক বিরাট অঞ্চলকে বুন্দোলখণ্ড বলা হত। বুন্দেলীরা ছিল নিম্নবর্গীয় রাজপুত। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে আবুল ফজলকে হত্যা করার পর বুন্দেলী প্রধান বীরসিংহদেব বুন্দেলাকে মোগল আমীর করা হয় এবং তাকে সর্বোচ্চ রাজপুত রাজাদের সমান মর্যাদায় তাঁর ওয়াতান জাগীর নিজ আয়ত্তে রাখার অধিকার দেওয়া হয়। তাঁর পুত্র জুঝার সিংহ প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করে নিজের ঐশ্বর্য ও রাজ্যসীমা বাড়ানোর চেষ্টা করলে তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করা হয়। বুন্দেলখণ্ডের মত মধ্যভারতের গোণ্ডয়ানার ওপরেও এই সময়ে মোগল শাসন কায়েম করা হয়। ফলে মধ্যভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল মোগল শাসনের অধীনে চলে যায়। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে শাহজাহানের সময়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও ভারত মানচিত্রের আবছায়া অঞ্চলগুলিতে মোগলবাহিনী পা রাখার চেষ্টা করেছিল। সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের তত্ত্বকে বেশ জোরের সঙ্গেই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শাহজাহানের মধ্যে একটা প্রাক্-আকর প্রতিহিংসা কাজ করত। অনেক সময়ে বিরাট আয়তনের মোগলবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পেরে প্রতিপক্ষ

বাহিনী গেরিলা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করত, যেমন করেছিল খান জাহান লোদীর সার্থকরা বা বুন্দেলীরা। কিন্তু খান জাহান দীর্ঘকাল ধরে মোগলশক্তির সম্ভ্রান্ত বর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গেরিলা যুদ্ধের প্রকরণ তার জানা ছিল না। কিন্তু বুন্দেলী গেরিলা বাহিনী মোগলদের কখনো শান্ত থাকতে দেয়নি।

১ক.১০.৩ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে রাজ্যবিস্তারের প্রয়াস : মোগলদের মধ্য-এশীয় নীতি

তিনটি কারণে মধ্য-এশিয়ার ওপর মোগলদের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল। প্রথমত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত রোশনাই, উজবেক, বালুচ প্রভৃতি উপজাতিদের উপদ্রব মোগল সাম্রাজ্যের প্রান্তিক একটি এলাকাকে প্রায় স্থায়ী অশান্তির মধ্যে নিবন্ধ রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, মধ্য-এশিয়া ছিল মোগলদের উৎপত্তিস্থল যার সম্বন্ধে কোন মোগল শাসকই তাঁদের স্বপ্নময় রোমান্টিক উৎসাহকে কোনদিন বিলীন হতে দেননি। তৃতীয়ত, মধ্য-এশিয়ার উজবেক শাসকরা ছিলেন সুন্নী মুসলমান। অক্ষু নদের উত্তরে বুখারা ও সমরখন্দ এবং বলখ্ ও বদকশান প্রদেশ নিয়ে উজবেকদের রাজ্য গঠিত হয়েছিল। উজবেকরা ছিল সুন্নী মুসলমান। আবার তারাই ছিল মোগলদের সনাতন শত্রু। ফলে উজবেক শক্তি সম্বন্ধে যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই-ই অনুভব করত মোগলরা। কাবুল ও পেশোয়ার যখন মোগলদের হাতে এল তখনই হয়ত উত্তর-পশ্চিমে একটা স্থায়ী সীমান্তরেখা টানা যেত। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমিতে অস্থির উজবেক শক্তির অবস্থান মোগলদের স্থির থাকতে দেয়নি। এই ভূ-রাজনৈতিক (geopolitical) সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অক্ষু নদ (oxus) যা পামির মালভূমি থেকে উত্থিত হয়ে উত্তর-পশ্চিমে অরার হ্রদ বা অরাল সাগরের দিকে ১৪০০ মাইল প্রবাহিত হয়েছে। অরাল সাগর (Aral Sea) পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিমে, কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে ২৬,২৬৬ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট একটি হ্রদ। এই অঞ্চলটি মধ্য-এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। (অক্ষুনদকে আমুদরিয়া বলেও উল্লেখ করা হয়।) পরপারের (Trans-oxiana) রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষের হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন। বদকশান (Badakshan) এবং তার থেকেও দূরে বলক্ প্রদেশ (Balkh) দখল করে এককথায় সমরকন্দকে (Samarqand) কেন্দ্র করে অক্ষু-পরপারের সমস্ত অঞ্চলকে ভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে এক বিরাট এশিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর পূর্বপুরুষদের মত শাহজাহানও দেখতে শুরু করেছিলেন। ঠিক এই সময়েই উজবেক রাজ্যে গোলযোগ শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও উজবেক শাসককে গদিচ্যুত করার ঘটনা সে দেশে এক বিরাট অরাজকতা ডেকে আনলে সেখানকার শাসক পরিবার থেকে মোগল সম্রাটের কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুবরাজ মুরাদ বক্স আলি মর্দন খানের সহযোগিতায় ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বদকশান এবং বলক্ প্রদেশ দুটি দখল করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুবরাজ মধ্য-এশিয়ার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। ফলে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। অক্ষু নদের অববাহিকা অঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়ে, আর সেই সুযোগে উজবেকরা মোগলদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা বলক্ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৩৬৯ থেকে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মধ্য-এশিয়ায় লড়াই করতে গিয়ে মোগলবাহিনী ৫০০০ সৈনিক এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে। গেরিলা যুদ্ধে অপটু মোগলবাহিনী পাহাড়েও যুদ্ধ করতে অক্ষম। তাই মধ্য-এশিয়ার অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার শীতল, জনবিরল তৃণভূমির থেকে যৎসামান্য রাজস্ব আসতে পারত একথা জেনেও শাহজাহান ৪ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন পূর্বপুরুষদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। মোগল চাঘতাইরা উজবেক ও তুর্কোমানদের পরাজিত করতে আগেও পারেনি—এখনও পারল না। স্থানীয় মানুষদের সঙ্কল্পবদ্ধ প্রতিরোধ, ভৌগোলিক দূরত্ব, জনবিরলতা, রসদের অপ্রাচুর্য মধ্য-এশিয়ায় মোগল সার্বভৌমত্ব বিস্তারের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিল।

ঠিক একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল মোগলদের কান্দাহার জয়ের প্রচেষ্টা। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময়ে শাহজাহান পারস্য সম্রাটের কাছ থেকে তিনি কোন সাহায্য পাননি। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি কাবুলের মোগল শাসককে কান্দাহার জয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কান্দাহারের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হয়নি। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহারের সামরিক শাসক আলি মর্দন খান পারস্য সম্রাটের অত্যাচারে ভীত হয়ে মোগলদের হাতে এই দুর্গ তুলে দেন। এর পরিবর্তে তিনি কাশ্মীরের শাসক নিযুক্ত হন এবং তাকে ৬০০০ মনসাবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোগলরা কান্দাহারকে বেশিদিন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইরানীবাহিনী তা দখল করে নেয়।

কান্দাহার হাতছাড়া হওয়া মোগলবাহিনীর দুর্বলতার ফল। কাবুল ছিল মোগল ঘাঁটি—ভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে অনেক দূরে—যেখান থেকে সরবরাহ রেখাকে (line of supply) অক্ষুণ্ণ রাখা ছিল কঠিন। মোগলবাহিনীর অবরোধকৌশল—শত্রুর ঘাঁটিকে ঘিরে ফেলার কায়দা (siege tactics)—ছিল দুর্বল। মোগল গোলন্দাজ বাহিনী এ দুর্বলতাকে ঢেকে দিতে পারেনি। তারা সমতলে লড়তে অভ্যস্ত ছিল—দুর্গম অঞ্চলে চলাফেরার অস্বাচ্ছন্দ তারা জানত না। অন্যদিকে পারসকিবাহিনী ছিল সংকল্পবদ্ধ—তাদের গোলন্দাজরা তুরস্কের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দুর্জয় হওয়ার কৌশলকে আয়ত্ত করে ফেলেছিল। ফলে মোগলবাহিনী অকারণ অর্থক্ষয় ও জনক্ষয় ছাড়া মধ্য-এশিয়াতে আর কিছুই ঘটতে পারেনি।

১ক.১০.৪ উত্তর ও উত্তর পূর্বে রাজ্যজয় ও পূর্বে শাসনবিস্তারের প্রয়াস

পাহাড়ে প্রলম্বিত যুদ্ধ (prolonged warfare) করার ক্ষমতা মোগলবাহিনীর না থাকলেও শাহজাহান পাহাড়ের কোল ঘেষা অলক্ষ্যের (obscure) ছোট রাজ্যগুলিকেও নিষ্কৃতি দেননি। হিমালয়ের পাদদেশে গাড়োয়াল নামে ছোট রাজ্যটিকে সম্রাটের নির্দেশে আক্রমণ করেন কাশ্মীরের শাসক জাফর খাঁ। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ২০০০ অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিক বাহিনী নিয়ে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল ভেদ করে তিনি রাজ্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই অঞ্চলটিকে ইতিহাসে 'ছোট তিব্বত' ও (Lesser Tibet) বলা হয়। (বাল্টিক পাহাড়মালার পাদদেশে বলে এই অঞ্চলকে বাল্টিক স্থানও বলা হয়।) জনবিরল এই অঞ্চলের মানুষ মেষপালক। সামান্য কৃষি-বাগিচার কাজে যুক্ত থেকে বল্টিক পাহাড়ের ধূলিশয্যা-থেকে অনেক কষ্টে যৎসামান্য সোনা নিষ্কাশন করে বেঁচে থাকত। এইরকম অনগ্রসর অঞ্চলকে সাম্রাজ্যভুক্ত করার প্রয়াস থেকে বোঝা যায় যে, মোগল সম্রাট তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্যকে একটি প্রান্তিক বন্ধনীর মধ্যে বেঁধে ফেলতে চাইছিলেন।

উত্তর-পূর্বে এই বন্ধনীর প্রসার কুচবিহার ও কামরূপের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন শাহজাহান। হাজো (Hajo) ছিল কামরূপের রাজধানী। সেটিই ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মোগল সীমানার শেষ ঘাঁটি। এর বাইরে ছিল অহম্ (Ahom) রাজ্য। অহমদের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধে লাগে ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কাজলির যুদ্ধে (Battle of Kajali) মোগলরা পরাজিত হয়। তখন মোগল ফৌজদার অহম্ রাজার সঙ্গে সন্ধি করে। অহম্ রাজা মোগল বশ্যতা মেনে নেন, আর মোগলরা অহম্ রাজ্যকে স্ব-শাসিত বলে স্বীকার করে নেয়। এইভাবে দূরবর্তী জোট রাজ্যের আনুষ্ঠানিক বশ্যতা ও বাস্তব স্বাধীনতা মেনে নিয়ে মোগল সাম্রাজ্য উত্তর পূর্বে তার সীমানা বেঁধে ফেলে।

পূর্বদিকে মোগল শাসনকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের নেতৃত্বে বাংলার শাসক কাশিম খাঁ হুগলী বন্দর থেকে পর্তুগিজদের উচ্ছেদ করেন। পর্তুগিজরা এ দেশের মানুষকে ধরে নিয়ে ক্রীতদাসে

পরিণত করছিল এবং ক্রীতদাসের ব্যবসার সঙ্গে তারা জুড়ে দিয়েছিল ধর্মান্তকরণের পরিকল্পনা। কিন্তু তাদের দমন করা যাচ্ছিল না কারণ তারা সরকারের অনুমতি নিয়েই লবণের ব্যবসা করত। আর তারা ছিল হারমাদ, তাদের ছিল শক্তিশালী নৌবহর, যার ফলে জলবিহারে তারা হয়ে উঠেছিল দুর্বার। পাহাড়ের যুদ্ধে বা অবরোধের যুদ্ধে মোগলবাহিনী ছিল যেমন দুর্বল ঠিক তেমনি জলযুদ্ধে তারা ছিল অতিশয় হীনবল। ইউরোপীয়দের বন্দুক ও গোলাবারুদকে তারা এতটা ভয় করত যে ৩০০ ইউরোপীয় এবং ৬০০ বা ৭০০ দেশীয় খ্রিস্টানদের নিয়ে গড়ে তোলা পর্তুগিজ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১, ৫০, ০০০ সৈন্যের মোগলবাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই বিপুল বাহিনী হুগলি থেকে পর্তুগিজদের উৎখাত করে।

১ক.১০.৫ আদিলশাহী ও কুতুবশাহী শাসনের অবসান

শাহজাহান উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে রাজ্যজয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ে দাক্ষিণাত্যের শাসক ছিলেন শাহাজাহান নিজেই। তখনই তিনি দাক্ষিণাত্যে অবশিষ্ট মুসলিম রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ও কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের ক্রমপ্রসারশীল মোগল সাম্রাজ্যের সামনে দাঁড়িয়েছিল তিনটি মুসলিম রাজ্য—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে আহমদনগরের নিজামশাহী রাজ্য, পূর্বদিকে গোলকোণ্ডার (হায়দ্রাবাদের) কুতুবশাহী রাজ্য এবং পশ্চিমের মারাঠি ও কন্নাড় ভাষাভাষি অঞ্চলে বিজাপুরে আদিলশাহী রাজ্য। ১৬৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে যখন খান জাহান লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছিল তখনই আহমদনগর এই অভিযানের শিকার হয়। তখন দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ চলছিল। কিছুটা সেই কারণে এবং কিছুটা সম্রাটের প্রিয় বেগম মমতাজ মহলের মৃত্যুর (৭ জুন, ১৬৩১) জন্য সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যের খাঁটি বুরহানপুর ত্যাগ করতে হয়।

বুরহানপুর ত্যাগ করার সময়ে শাহজাহান দাক্ষিণাত্য শাসনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মহবত খানের ওপর। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহবত খান দৌলতাবাদ দুর্গতি অধিকার করেন। দীর্ঘদিন ধরে আহমেদনগরের নিজামশালী রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক ও প্রশাসক—নাম মালিক অম্বর। ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। তখন শাহজাহান প্রলোভন দেখিয়ে ও কৌশল প্রয়োগ করে আহমদনগরের কয়েকজন মারাঠা প্রধানকে নিজের দলে সরিয়ে আনেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি হলেন শাহজী ভোঁসলে। ঠিক একই সময়ে আহমদনগরের সিংহাসন নিয়ে রাজশিবিরে অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়। এই অন্তর্বিপ্লব ও অন্তর্ঘাতে আহমদনগর দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিক অম্বরের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে নিজামশাহী রাজ্যটি তার সংহতি হারায়।

১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান দৌলতাবাদে আসেন। এরপর নতুন করে শুরু হয় তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান। প্রথম অভিযান প্রেরণ করেন নিজামশাহী রাজ্যের বিরুদ্ধে। এই সময়ে শাহজী মোগল বিরোধিতা শুরু করেছিলেন বলে দ্বিতীয় অভিযান তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। তৃতীয় অভিযান এগিয়ে যায় বিজাপুরের দিকে। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী রাজ্য আহমদনগর ও বিজাপুরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে চতুর্থ অভিযানটি তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। আহমদনগর, দুর্বল রাজ্য, সরাসরি মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা সম্রাটের সঙ্গে চুক্তি করে মোগল বশ্যতা মেনে নেয়। তৈমুর বংশের উপাধি ও সম্রাটের নাম মুদ্রায় ছাপানো হবে, শুক্রবারের দ্বিপ্রহরের উপাসনায় খুতবায়—সুন্নী মতের প্রার্থনাকে গ্রহণ করা হবে, সম্রাটকে বাৎসরিক রাজস্ব দিতে হবে—এইসব শর্ত আদিলশাহী ও কুতুবশাহী শাসকরা মেনে নিলেন। এর পাশাপাশি শাহজীকে মোগল ও বিজাপুর বাহিনী তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে। খান্দেশ, বেরার, তেলিঙ্গানা ও দৌলতাবাদকে চারটি মোগল প্রদেশে রূপান্তরিত করা হল। চৌষট্টিটি

পাহাড়ি দুর্গ থেকে সমস্ত দক্ষিণাত্যের ওপর মোগল শাসনকে কায়েম করা হল। ভবিষ্যৎ কয়েক দশকের জন্য দাক্ষিণাত্যে মোগল শাসনের সীমানা স্থির হয়ে গেল।

ক্রমপ্রসারমান মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন শাহজাহানের সময়ে যা দাঁড়িয়েছিল তা এইরকম—উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু প্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শ্রীহট্ট পর্যন্ত, আবার উত্তরে বলক্ রাজ্য থেকে দাক্ষিণাত্যের শেষ পর্যন্ত—একটানা বিরাট ভূখণ্ড যার মধ্যে ছিল বাইশটি প্রদেশ ও চার হাজার তিনশ পঞ্চাশটি পরগণা। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথম দুই দশকের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আব্দুল হামিদ লাহোরী লিখেছেন যে, আগ্রা বা লাহারের মত বড় প্রদেশের দু চারটি পরগণা থেকে যে রাজস্ব আসত তা বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকারও বেশি। সমস্ত বদকশান রাজ্যের যে বাৎসরিক বাজেট ছিল তার থেকেও এই কয়েকটি পরগণা-ওয়াড়ি আদায় বেশি ছিল বলে আব্দুল হামিদ লাহোরী মন্তব্য করেন।

অনুশীলনী ২

১। নীচের বক্তব্যগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল (✓) অথবা (✗) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) অভ্যন্তরীণ সীমানা সংরক্ষণের কাজে শাহজাহানের একটি বড় পদক্ষেপ হলো দিল্লিতে নতুন রাজধানীর পত্তন।

(খ) সম্রাট শাহজাহান বুন্দেলাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন।

(গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরপারে উজবেক শক্তি সম্পর্কে মোগলদের কোন স্থায়ী চিন্তা ছিল না।

(ঘ) কান্দাহার কোনদিন মোগলদের হাতছাড়া হয়নি।

(ঙ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা শাহ্‌জাহানের আমলে মোগল বশ্যতা মেনে নিয়েছিল।

২। সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণের জন্য শাহ্‌জাহান কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। (দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন)

৩। পর্তুগিজদের হাত থেকে শাহজাহান হুগলি বন্দরকে কিভাবে উদ্ধার করেন? (পাঁচ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন)

৪। শাহজাহান উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে রাজ্যজয়ে অনেক বেশি সফল হয়েছিলেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। দীর্ঘদিন ধরে মালিক অম্বর, আহমদনগরে কতুবশাহী রাজ্যকে রক্ষা করেছিলেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

১ক.১১ মোগল রাজশক্তির সংহতিসাধন : শাসকশ্রেণীর নতুন সংগঠন

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যবিস্তার—এই দুই কাজের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবেই চলেছিল একটি তৃতীয় কাজ—রাজশক্তির সংহতিসাধন। আকবর ও তাঁর প্রশাসকেরা প্রথম থেকেই একটি কেন্দ্রায়িত প্রশাসন (centralizing administration) গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ প্রশাসনের এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) ছিল যাতে রাজ্যবিজয়ের ধারার তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে একটি স্থিতিশীল অথচ প্রসারকামী রাজশক্তির জন্ম দিতে পেরেছিল। ভারতীয় মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে যে পারসিক-প্রশাসনিক

ধারা ছিল তার সঙ্গে আকবর মিশিয়েছিলেন মধ্য-এশিয়ার তুর্কো-মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিজয়ের ধারার মধ্যে নিহিত শোষণধর্মী শাসন-সংগঠনের ঐতিহ্য। যে শাসনব্যবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড তৈরি করেছিল তার চারটি বৈশিষ্ট্য ছিল—এক, তা ছিল কেন্দ্রায়িত, যার মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের স্বরূপ ধরা পড়ত। দুই, তা ছিল ক্রম-কাঠামোভিত্তিক (hierarchical)। তিন, তার একটা আমলাতান্ত্রিক বিন্যাস (bureaucratic) ছিল এবং চার, তা ছিল শোষণমূলক (extractionist)।

এই সমস্ত কাঠামোর পুরোভাগে ছিল মোগল সম্ভ্রান্ত সমাজ (The Mughal Nobility)। সম্রাটের হুকুম তালিম করে সাম্রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন এক বিরাট সৈনিক অভিজাত (warrior-aristocrats) সমাজ। এই সমাজের সদস্য ছিলেন সমস্ত যুবরাজ, রাজপরিবারের সমুদয় সদস্য, এবং তুর্কিস্থান—ইরাক—ইরান—আফগানিস্তান—হিন্দুস্তান থেকে আহৃত অসংখ্য সম্ভ্রান্ত প্রশাসক ও যুদ্ধবাজ মানুষ যাদের বলা হত **আমীর**। এঁরাই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হতেন এবং প্রশাসনিক ওপরতলার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের যোগান দিতেন। এইরকম প্রশাসনিক মানুষ যারা অন্যদিকে তারাই হতেন সেনাবাহিনীর পরিচালক, স্তরে স্তরে বিভক্ত সৈনিকদের অধিকর্তা এবং আরও এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি। শাসন ও লড়াই এই দুই বিপরীতের অবিমিশ্র ভেদকে মুছে দিয়ে সৈনিক ও প্রশাসককে একটা ঐক্যবদ্ধ সমারোহের মধ্যে এনেছিল মোগল সাম্রাজ্য। এর ফলে যে মোগল সম্ভ্রান্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তা ছিল বহুজাতিক, আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক। এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে আশ্রয় পেয়েছিল রাজপুত, আফগান, ভারতীয়, আরব, পারসিক, মধ্য-এশিয়ার উজবেক, চাঘতাই ইত্যাদির। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল সুন্নী মুসলমান; তা হলেও শিয়া মতাবলম্বী এবং হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থানও ছিল অব্যাহত। এইভাবে গড়ে ওঠা বহুজাতিক, বহুধর্মীয় বঙ্গাভাষাভাষি বহু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী মানুষের তিন ধরনের শক্তি ও সম্পদকে সমবায়িত করতে হত—এক, তাদের লড়াই করার শক্তি ও সামরিক সম্পদ, দুই, তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং তিন, তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা (entrepreneurial strength)। এদের সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠত মোগল পিতৃতান্ত্রিকতা। এই দিক থেকে বিচার করে সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরা মোগল রাষ্ট্রকে 'পিতৃতান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক' (patrimonialbureaucratic) বলে অভিহিত করেছেন।

১ক.১১.১ মনসবদার ও জাগিরদার

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরই একটি মনসাব ছিল, কিন্তু প্রত্যেক **মনসবদার** তা বলে সম্ভ্রান্ত (noble) ব্যক্তি ছিলেন না। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে **মনসাব** মানে—খুব আনুষ্ঠানিক অর্থে—একটা পদমর্যাদা (rank)—অর্থাৎ সরকারনির্দিষ্ট মর্যাদার ক্রমকাঠামো(hierarchy) একটি অবস্থানমাত্র। সাধারণত যে সমস্ত কর্মচারী ৫০০ **জাট** (zat) বা তদূর্দ্ধ **জাটের** অধিকারী ছিলেন তাদেরই বলা হত সম্ভ্রাত (noble)। সপ্তদশ শতাব্দীতে ১০০০ বা তার চেয়ে বেশি জাটের (zat) অধিকারীকে সম্ভ্রান্ত বলা হত। সাম্রাজ্যের উচ্চতর প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তি কত বেতন পাবেন তার একটা সারণি ছিল। বেতনভিত্তিক পদমর্যাদার এই সারণি ছিল আসলে বেতনের মধ্য দিয়ে দশমিক সংখ্যায় নির্ণয় করা অভিজাত-ক্রম কাঠামো একজন সম্ভ্রান্ত মানুষের অবস্থান মাত্র (decimal rank) অর্থাৎ ১০, ২০, ২০০, ৫০০, ১০০০ এইরকম সংখ্যায় নির্ণীত বেতনভিত্তিক মর্যাদার সোপানকে **জাট** (zut) বলা হত। **আল্লাহ** শব্দের মধ্যে যে কটি বর্ণ আছে, আরবি বর্ণমালায় তাদের ক্রমিক সংখ্যা যা (তা যথাক্রমে ১ + ৩০ + ৩০ + ৫; 'আল্লাহ' শব্দে আরবি বর্ণমালা ও তাদের ক্রমিক সংখ্যা এইরকম—আলিক—১, লাম—৩০, লাম—৩০, হে—৫) তার যোগফল যা হবে (এক্ষেত্রে ৬৬) ঠিক ততগুলি হবে **জাট** বা সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিদের স্তর। কিন্তু এই নিয়ম আকবর চালু করলেও তাঁর সময়ে নিম্নতম সংখ্যা ১০ আর উর্দ্ধতম সংখ্যা, ১০, ০০০ ধরে মোট ৩৩ টি স্তরে বিভক্ত **মনসবদার** বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পদবিন্যাস করা হয়েছিল।

আকবরনামায় বলা আছে যে, ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে আকবর নির্দেশ দেন যে সাম্রাজ্যের কাজে নিযুক্ত সমস্ত অশ্বকে চিহ্নিত করে—**দাগ** (dagh) দিয়ে পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। এর সাথেই নির্ণীত হবে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অবস্থানগত মর্যাদা। রাষ্ট্র বা **মরতিব** (maratib)-এর অন্তর্ভুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের এই প্রক্রিয়ায় নির্ণীত অবস্থানই হল **মনসাব**। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে যে **মনসবদারদের** সোপান ছিল **দহবাশি** (১০-এর অধিকর্তা) থেকে **দহ হাজারি** (১০,০০০-এর অধিকর্তা)। কিন্তু ৫০০০-এর ওপর মনসাবগুলি সব দেওয়া হত শুধুমাত্র যুবরাজদের। কখনো কখনো সম্রাটের পরিবারের বা রাজরক্তসম্ভূতরা এই মনসাব পেতেন। তবে মোটের ওপর ৫০০০-এর ওপর মনসাব ছিল সংরক্ষিত। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোট ১,৮২৩ জন ব্যক্তি **মনসব** লাভ করেছিলেন। তাদের অধীনে ১,৪১,০৫৩ জন মানুষ শক্তিশালী অশ্বারোহী হয়ে এবং যথেষ্ট হাতিয়ার সম্বলিত থেকে সাম্রাজ্যের সেবা করত। এদের জন্য খরচও ছিল বিপুল। আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে **মনসবদার** ও তাদের অনুচরেরা সাম্রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের ৮২ শতাংশ আত্মসাৎ করত—অর্থমূল্যে তা ছিল নয় কোটি নব্বই লক্ষের মধ্যে আট কোটি দশ লক্ষ টাকা।

১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সম্ভ্রান্তদের পদমর্যাদা **জাট** (zut) এবং **সওয়ার** (sawar) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। **জাট** বলতে বোঝাত বেতনসারণি অনুযায়ী নির্ধারিত মর্যাদার ক্রমকাঠামো। আর **সওয়ার** বলতে বোঝাত কোন কর্মচারী তার অধীনে কত অশ্বারোহী বাহিনী মজুত রাখছেন তার ভিত্তিতে নির্ধারিত মর্যাদা (rank)। মিরজা শহরুক (Mirza Shahruk) ছিলেন প্রথম উল্লিখিত **আমীর** যিনি ৫০০০ **জাট** এবং ২০০০ **সওয়ারের** অধিকর্তা হয়েছিলেন। সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত এই দু-ধরনের মর্যাদার জন্য পৃথক পৃথক খাতে সম্ভ্রান্তদের অর্থ দেওয়া হত। শাহজাহানের সময় থেকে যে বেতনসারণি আমাদের হাতে এসেছে তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, **জাট** (zut) এবং **সওয়ার** (sawar) মর্যাদার বেতন ভিন্ন ছিল। **জাট** মর্যাদার জন্য যে বেতন একজন **মনসবদারকে** দেওয়া হত তার অন্তর্ভুক্ত হত তার ব্যক্তিগত বেতন এবং অশ্ব, হস্তী, উট ও শকটের খরচ। এর বাইরে অন্য খরচ ছিল সওয়ারভুক্ত। ঔরংজেবের সময়ে দেখা গেছে যে একজন মনসবদারের **সওয়ার-মর্যাদা** (sawar rank) তার **জাট-মর্যাদার** (zat rank) থেকে বেশি ছিল। ফলে **সওয়ার** বেতন **জাট** বেতনের থেকে বেশি ছিল। একজন **মনসবদার** তার অধীনে মজুত সৈন্যের ভিত্তিতে **সওয়ার** মর্যাদা পেতেন। তাহলে **সওয়ার**-বেতন বেশি হওয়ার অর্থই হল যে রাষ্ট্র অনেক বেশি সৈন্য-নির্ভর হয়ে পড়েছিল। প্রশাসক যখন সৈনিক হিসাবে বেশি মর্যাদা পান তখন বোঝাই যায় যে রাষ্ট্র অনেক বেশি আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে।

প্রথম দিকে যে সমস্ত ইংরাজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিক মোগল সৈন্যবাহিনী ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা কিন্তু **জাট ও সওয়ার** মর্যাদার অন্তর্নিহিত রূপ নিয়ে একমত হতে পারেননি। ব্লকম্যান (Blochmann) একসময়ে লিখেছিলেন যে **জাট** হল একজন **মনসবদারের** অধীনে কত সৈন্য থাকবে তার মাপ আর **সওয়ার** হল তার অধীনে অশ্বারোহীর হিসাব। আরভিন (Irvine) বললেন **জাট** হচ্ছে প্রকৃত অশ্বারোহী বাহিনীর মাত্রাচিহ্ন, আর সওয়ার হল সাধারণ মর্যাদা। অনেকটা একই ধরনের মত পোষণ করেছিলেন আর. পি. ত্রিপাঠী (R.P. Tripathi)। তিনি মনে করতেন **সওয়ার** হচ্ছে অতিরিক্ত সম্মান। তার সাথে অশ্বারোহী বাহিনী সংরক্ষণের কোন যোগ নেই। আব্দুল আজিজ (Abdul Aziz) বললেন যে **জাট** বলতে বোঝাত একজন **মনসবদারের** নিয়ন্ত্রণাধীন হস্তী, অশ্ব, ভারবাহী পশু, শকট ইত্যাদি, আর **সওয়ার** ছিল **মনসবদারের** অধীনে সংরক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনীর মাপ। মোটের ওপর যে কথাটা বুঝতে হবে তা হ'ল এই যে **জাট** কথাটা কোন

অভিজ্ঞাসূচক (Symbolic) নয়। রিজভি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, **জাট** শব্দটির দ্বারা সম্ভ্রান্তদের কোন অগ্রাধিকার বোঝাত না। বরং **'জাট'** ও **'সওয়ার'** শব্দ দুটির দ্বারা বোঝাত একটি সমাহৃত মর্যাদা যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত দায়িত্ব, কর্তব্য এবং বেতন। রিচার্ডশ-এর (Richards) লেখায় দেখি জাট ও সওয়ার হল গাণিতিক মর্যাদা-বিন্যাসের দুটি নিরিখ যার মধ্য দিয়ে **মনসবদারদের** সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য (uniformity) , শৃঙ্খলা (discipline) এবং অভ্যন্তরীণ বন্ধন দৃঢ় হত।

মনসবদাররা ছিল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সামরিক স্তম্ভ। সমরনায়ক ছিল বলে তাদের কেন্দ্রীয় সেনানি-সচিব (army minister) মীর বক্‌শির অধীনে রাখা হত। **মীর বক্‌শি** সেনাপতি ছিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে রণকৌশল, রণনীতি ও সৈন্য পরিচালনা তাঁর কাজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সেনাপতি ছিলেন সম্রাট নিজেই। **মীর বক্‌শির** কাজ ছিল বিধিসম্মত নিয়োগের ব্যবস্থা করা (recruitment), মর্যাদার সুচারু বিন্যাসকে সুপারিশ করা (recommendations for proper ranks) এবং যথাযথ বেতন ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

এইভাবে **মীর বকশির** অধীনে সংগঠিত সমস্ত **মনসবদার** শেষ পর্যন্ত ছিলেন সম্রাটের সেবক। তাদের অধীনে যাবতীয় মানুষ, পশু ও সাজসরঞ্জাম ছিল সম্রাটের সম্পদ। ফলে মনসবদারদের নিয়মমাফিক সম্রাটকে আনুগত্য জানাতে হত—এবং তার মধ্য দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করতে হত—যে তারা যে সৈন্যবাহিনী রেখেছেন তা পূর্ণমাত্রায় হাতিয়ার ও সরঞ্জাম সম্বলিত হয়ে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত। যে **অশ্ব মনসবদারদের** রাখতে হত তা ছোট মাপের দেশীয় ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি নয়। তা মধ্য-এশিয়ার এবং পারস্যের প্রজায়িত (Central Asian and Persian breeds) ঘোড়া। নিজেদের অধীনে সেনাবাহিনীর সমজাতীয়তা (homogeneity) রাখার জন্য **মনসবদাররা** বেশিরভাগ সময়ে নিজেদের ধর্ম ও নিজেদের গোষ্ঠী (ethnicity) থেকে লোক নিয়োগ করতেন। পরে এবিষয়ে আইন তৈরি হয়েছিল—**মনসবদাররা** একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজেদের কৌমগোষ্ঠীর বাইরে মানুষ নিয়োগ করতে পারবেন। অর্থাৎ একজন রাজপুত মনসবদার তার অধীনে অধিকাংশ রাজপুতদেরই নিয়োগ করতে পারবেন, ভারতীয় মুসলমানরা পারবেন ভারতীয় মুসলমানদের নিয়োগ করত। স্বাভাবিক নিয়মে মনসবদাররা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে লোক নিয়োগের চেষ্টা করতেন। প্রত্যেক বড় শহরেই দক্ষ সৈনিক ও অশ্বারোহী মানুষ থাকত যাদের ক্ষমতা ভাড়া করা যেত। এইসব মানুষদের বেতন কি হবে মনসবদার নিজেরাই পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে স্থির করতেন। অশ্বারোহী সৈনিকের বেতন মোগল দলিল-দস্তাবেজে বলা আছে। সাধারণত একজন অশ্বারোহী নগদে বেতন পেতেন এবং তাকে প্রতিমাসে ২০ টি রৌপ্য মুদ্রা দেওয়া হত।

কোন কোন **মনসবদারকে** কেন্দ্রীয় রাজকোষ থেকে নগদে বেতন দেওয়া হত। কিন্তু প্রথানুযায়ী প্রত্যেক **মনসবদার** বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগদ অর্থের বদলে **জাগিরলাভ** করতেন। বেতনের পরিবর্তে মনসবদারকে জমি (Territory) প্রদত্ত হলে সেই প্রদত্ত জমিকে (Assigned territoy) **জাগির** বলা হত। **জাগির** লাভ করে মনসবদার হতেন **জাগিরদার**। মনসবদার ছাড়াও উচ্চপদস্থ **জাগির** পেতেন। অতএব জাগিরদার মানেই মনসবদার একথা ভাবার কোন কারণ নেই। কোন **জাগিরদার** তাকে প্রদত্ত **জাগিরের** সমস্ত রাজস্বটুকু আত্মসাৎ করতেন, কিন্তু সেই **জাগিরের** অন্তর্ভুক্ত জমির মালিক হতেন না। অর্থাৎ **জাগিরদার** কখনো সেই **জাগিরের জমিদার** ছিলেন না। মোগল যুগে **জাগিরদাররা** বদলি হতেন। তিন-চার বছর বাদেবাদেই **জাগির** হস্তান্তরিত হত। জাগিরদাররা স্থির থাকতেন—প্রজন্ম পরম্পরায় **জমিদারি** পারিবারিক দায়িত্ব বোঝাত।

প্রাক্-মোগল যুগে যাকে ইক্‌তা (Iqta) বলা হত **জাগির** ছিল অনেকটাই তাই। **জাগির** ছিল নিঃসন্দেহে এক-একটি রাজস্ব—একক (Revenue unit) কিন্তু রাজস্বের দিক থেকে সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা এক-একটি

রাজস্ব বিভাগ (Revenue Divisions) নয়। **জাগিরের** প্রশাসনে নিযুক্ত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা, **জাগিরদারের** কর্মচারী নয়। **জাগিরদারের** কর্মচারী হয়ত জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব কিংবা কখনো কখনো কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় [এই কাজটি ছিল মূলত জমিদারের] করতে পারত, কিন্তু কোন সময়েই তারা সম্রাটের বিধিবন্ধ রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো বা রাজস্ব নীতি ও আইনকে লঙঘন করতে পারত না। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের একটি হিসাবে দেখা গেছে যে সাম্রাজ্যের মোট নির্ধারিত রাজস্বের [তাকে বলা হত **জমা** (Jumma)]। ৬০ শতাংশ ৫০০ ও তদূর্দ্ধ মর্যাদার (rank) ৪৪৫ জন মনসবদারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত সম্পদের সিংহভাগ পাঁচশতরও কম পরিবারের হাতে জমা হয়েছে। মোগল যুগে ধনবণ্টন এইরকম ছিল।

মনে রাখতে হবে যে **মনসবদারের** যে বেতন তা এক জটিল সারণি থেকে তৈরি হত। নিয়ম অনুযায়ী একজন মনসবদারের যে বেতন তার সমপরিমাণ রাজস্ব যে **জাগির** থেকে আসত সেইরকম **জাগিরই** তাকে দেওয়া হত। কিন্তু সবসময়ে এ নিয়ম প্রতিপালিত হত না। প্রায়ই দেখা যেত যে, সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যে **মনসবদার** যেমন আকবরের সময়ে আবদুর রহিম খান-ই-খানান, কিংবা শাহজাহানের সময়ে যুবরাজ দারা, শুকো, তারাও তাদের বেতন নিয়ে অসন্তুষ্ট। অনেক সময়ে **জাগিরের** হাত বদল হত, কিংবা **জাগিরদারকে** স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি করা হত। তখন **জাগিরদারদের** মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিত। **জাগিরদারদের** মধ্যে একটা প্রবণতা গড়ে উঠছিল যে তারা সবাই পছন্দমত জাগির চাইতেন। **দিওয়ান-ই-কুলকে** (Diwan-i-kull) চাপ দিয়ে কি করে সবচেয়ে কৃষিযোগ্য জমিসমেত, সবচেয়ে বেশি রাজস্ব উৎপাদনকারী গ্রাম যা সহজে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তা আয়ত্ত করা যায় সেই দিকে তাদের নজর ছিল। অথচ সরকারি নীতি ছিল **মনসবদার** যেখানে কর্মক্ষেত্র সেখানে থাকবেন, আর তার আশেপাশে সম্ভাব্য **জাগির** তা যেমনই হোক তাকে দেওয়া হবে।

অনেক সময়ে যেমন **মনসব** এবং **জাগিরের** সমতা থাকত না সেইরকম **মনসবদার** আর **মনসবদারের** মধ্যে বৈষম্য দেখা যেত। তাতে তাদের বেতনের হেরফের হত। যেমন, রাজপুত সৈন্যরা মোগল, আফগান ও ভারতীয় মুসলমানদের থেকে কম বেতন পেত। এটি জাতিগত বৈষম্যের ফল কিনা বলা যাবে না। হয়ত এমন হতে পারে যে রাজপুত সৈন্যদের প্রয়োজনের তুলনায় যোগান অনেক বেশি ছিল। সৈন্যদের মধ্যে অনেক সময়েই অতিমাত্রায় দক্ষ সৈনিক থাকত। তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে বলিষ্ঠ আর অনুগতদের সম্রাট নিজের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। আকবর এ প্রথা চালু করেছিলেন এবং তাঁর বংশধরেরা তা অব্যাহত রাখেন। এই সৈন্যরা সচরাচর **মনসবদারের** তালিকাভুক্ত হত না। এদের বলা হত **আহাদি** (Ahadi)। **'আহাদ'** শব্দটির অর্থ হল 'এক'। আকবর ঐশী একত্বে (divine unity) বিশ্বাস করতেন, **'আহাদ'** শব্দটি তারই প্রতিফলন। প্রত্যেক **আহাদিকে** ৫০০টি মুদ্রা বেতন দেওয়া হত। তাদের অধীনে থাকত ৫টি উৎকৃষ্ট ঘোড়া এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম। তাদের দেখাশোনা করতেন একজন স্বতন্ত্র **দেওয়ান** ও **স্বতন্ত্র বকশি**। প্রত্যেক চারমাস বাদে বাদে তাদের জমায়েত করা হত। তখন তারা সঙ্গে নিয়ে আসত তাদের অস্ত্র ও অশ্ব। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে **আহাদিরা** অলস হয়ে পড়ে। যে সব সৈন্যরা লড়াই করে বিঘ্ননাশ করত (crack troops) তাদের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তখন থেকেই তারা **অকর্মা** (Idler) বলে অভিহিত হতে থাকে। প্রথমদিকে **আহাদির** সংখ্যা কম ছিল, পরে বেড়ে যায়। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন ২,৯৪১ জন **মনসবদারের** প্রভুত্ব। এঁরা ২০ থেকে ৫০০ মর্যাদা-অঙ্কে বিভক্ত ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের বিংশতিতম বছরে মোগল রাজকোষ থেকে বেতন পেত ৭০০০ আহাদি এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী। এছাড়া ছিল ৮০০০ **মনসবদার**। এই **মনসবদারদের** অনেকেই শেষপর্যন্ত ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

অনুশীলনী-৩

১। মোগল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল? (চার লাইনে উত্তর দিন)

২। মনসবদার সম্পর্কে দশ লাইনের মধ্যে আলোচনা করুন।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) বেতনের পরিবর্তে মনসবদারকে জমি দেওয়া হল সেই জমিকে——বলা হত।

(খ) 'আহাদ' শব্দটির অর্থ হ'ল——।

(গ) মনসবদারদের অনেকেই শেষপর্যন্ত—— ——ও ——এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

৪। সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী এক সাম্রাজ্যের সর্বভারতীয়ত্ব হল মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

১ক.১২ সারাংশ

আপনারা যে আলোচনা পড়লেন তার মধ্যে দুটি দিক আছে যা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। এক, মোগল সাম্রাজ্য যেমন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম চারদিকে রাজ্যবিস্তার করছিল ঠিক সেইরকম একই সঙ্গে মোগল শাসকসমাজকেও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছিল। দুই, ভারতবর্ষের বাইরে মধ্য-এশিয়ার স্থায়ী রাজ্যবিস্তার যেমন সম্ভব হয়নি ঠিক সেইরকম ভাবেই সম্ভব হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে মোগল সীমানাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। এই যে সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী এক সাম্রাজ্যের **সর্বভারতীয়ত্ব**, এটি মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। কাশ্মীর থেকে কামরুপ, গুজরাত থেকে বঙ্গ দেশে কিংবা হিমালয় থেকে দাক্ষিণাত্যের শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় ভূখণ্ড এক শাসনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একটি কথা দেশীয় শাসকদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ক্রমপ্রসারশীল মোগল শক্তির সামনে যে অন্তরায় সৃষ্টি করবে সেই নিশ্চিহ্ন হবে। এই নিরবচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য নির্মাণ (empire building) সপ্তদশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মেবারের পতন, আহমদনগরের বিনাশ, বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার আত্মসমর্পণ প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, মোগল শক্তিকে প্রতিরোধ করে লাভ নেই। সঙ্গে সঙ্গে মোগল সম্রাটরাও রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে নিজেদের উচ্চাকাঙক্ষা আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে শিখেছিলেন। সমতলের অবরোধ-টেকনিকে মোগলবাহিনী যতই পারদর্শী হোক পাহাড়ে, দুর্গম অঞ্চলে বা অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে হিংস্র উপজাতীয় মানুষদের পেরিয়ে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় সেখানে যুদ্ধ করার হিম্মৎ (stamina) যে তাদের নেই তা অনেক অর্থ ও মানবসম্পদের অপচয় ঘটিয়ে মোগল শাসকদের শিখতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকে মোগল শক্তি সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অটল ছিল। হুগলির পর্তুগিজদের বে-আদবি বা খান জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করে মোগল শাসকরা প্রমাণ করেছিলেন যে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তারা কোথাও আপোষ করতে রাজি নন। এই আকাশচুম্বি সার্বভৌমত্বের স্পর্ধাকে অটুট রাখার জন্য তাদের গড়ে তুলতে হয়েছিল **মনসবদার** আর **জাগিরদারের** আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক দুর্দান্ত শাসক ও সৈনিক বাহিনী যারা সাম্রাজ্যের সংহতিকে বজায় রাখতে নিরঙ্কুশ শোষণের পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। দেশের সিংহভাগ রাজস্বকে আত্মসাৎ করে শেষপর্যন্ত তারা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই রাজস্বের টান পড়ে, জাগিরদারদের মধ্যে বেসামাল লড়াই শুরু হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

যে কথাটি লক্ষণীয় তা হল জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ে ধর্ম নিয়ে কোন উত্তেজনা দেখা দেয়নি, শিখ ও রাজপুত জাতিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যের এমন কোন মরণপণ লড়াই আরম্ভ হয়নি। কোন সম্রাটকে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়ে সেখানে অবস্থা করে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য ও মানবসম্পদকে উজাড় করে দিতে হয়নি। এর অনেক কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হল যে প্রথমদিকের সম্রাটরা ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও অন্য ধর্মের প্রতি কিছুটা সহিষ্ণু মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। সহিষ্ণুতা থেকে এসেছিল ঔদার্য, আর ঔদার্য রাষ্ট্রকাঠামোকে একটা সংহতি দিতে পেরেছিল। মোগল সামরিক সাফল্য অনেকটা এই সংহতির ওপর নির্ভর করত। কিন্তু এই সামরিক সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করে ভাবা ঠিক হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শাহজাহানের সময়ে কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়া এবং তাকে উদ্ধার করতে তিনটে অভিযান ব্যর্থ হওয়া মোগল সৈন্যবাহিনীর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও তার নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অভাবকে সূচিত করে।

১ক.১৩ অনুশীলনী

১। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোগলদের দাক্ষিণাত্য নীতি বর্ণনা করুন।

২। পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন?

৩। শিখ-মোগল সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৪। আভ্যন্তরীণ সীমার সংহতিকরণে শাহজাহান কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

৫। মনসবদারী ও জাগিরদারি ব্যবস্থা কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

১ক.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Beniprasad : History of Jahangir.
2. Sharma. S. P. : Mughal Empire in India.
3. Smith, V.A. : The Oxford History of India.
4. Macecliffe : The Sikh Religion.
5. Moosvi, S. : The Economy of the Mughal Empire.
6. Irvine, W. : The Army of the Indian Moguls.

একক ১খ ❑ ঔরংজেবের ইতিহাস—দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক সম্প্রসারণ—মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব—রাষ্ট্র ও ধর্ম

গঠন

১খ.০ উদ্দেশ্য
১খ.১ প্রস্তাবনা
১খ.২ প্রারম্ভিক কথা
১খ.৩ সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরের সংস্কার
১খ.৪ উত্তরভারত : প্রথম দশবছর : সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের গৌরব
  ১খ.৪.১ রাজ্যশাসনের দীনতা ও সম্প্রদায়গত উত্তেজনার শুরু : মোগল বিপন্নতার আরম্ভ : জাঠ ও সৎনামি বিদ্রোহ
  ১খ.৪.২ মোগল নিপীড়ণ ও শিখজাতির আত্মত্যাগ
  ১খ.৪.৩ আফগানদের সঙ্গে বিরোধ
  ১খ.৪.৪ রাজপুত বিদ্রোহ
  ১খ.৪.৫ যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ
১খ.৫ দক্ষিণ ভারত : ঔরংজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধ
  ১খ.৫.১ ঔরংজেবকে দক্ষিণভারতে যেতে হল কেন?
  ১খ.৫.২ বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা বিজয়
  ১খ.৫.৩ দাক্ষিণাত্য বিজয় কি ভ্রান্ত হয়েছিল?
১খ.৬ মারাঠাদের উত্থান : শিবাজীর নেতৃত্বে নতুন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি : মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব
  ১খ.৬.১ শিবাজীর উত্থানের প্রথম পর্যায় : ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
  ১খ.৬.২ শিবাজীর উত্থানের দ্বিতীয় পর্যায় (১৬৬০-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ)
  ১খ.৬.৩ মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের উত্তর-শিবাজী পর্যায়
১খ.৭ রাষ্ট্র ও ধর্ম
১খ.৮ সারাংশ
১খ.৯ অনুশীলনী
১খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন ঔরঙ্গজেবের—

- সাম্রাজ্য শাসনের ও সম্প্রসারণের প্রাথমিক গৌরবোজ্জল অধ্যায়
- সাম্রাজ্য শাসনের ও সম্প্রসারণের প্রাথমিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

- রাজ্যশাসনের দীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও তার ফলস্বরূপ শিখ, আফগান, রাজপুত, জাঠ প্রভৃতির বিদ্রোহ
- দক্ষিণভারত অভিযান
- মারাঠাদের তথা শিবাজীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব
- রাষ্ট্র ও ধর্ম

১খ.১ প্রস্তাবনা

ইতিহাস পড়ার একটা উদ্দেশ্য হল ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ করা। ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্মান্ধতা, একদেশদর্শিতা, মদান্ধতা ভারতবর্ষের মত বহু ধর্ম, বহুজাতিক, বহুভাষাভাষী মানুষের দেশে কোন মঙ্গলের সূচনা করে না। মোগল সাম্রাজ্য ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল ঔরংজেবের রাজত্বকালেই। শাসকরূপে ব্যক্তির ব্যর্থতা এক্ষেত্রে ইতিহাসের একটি অনস্বীকার্য সত্য। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষাও আমাদের লাভ করতে হবে যে, মোগল সাম্রাজ্য ছিল একটি বড় প্রতিষ্ঠান। কোন ঐতিহ্যবাহী, শতাব্দীলালিত প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তির একক ব্যর্থতায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। আসলে ঔরংজেবের রাজত্বকালে যুগশক্তির পরিবর্তন হচ্ছিল। ইতিহাসের বড় বড় অধ্যায় জুড়ে এরকম যুগশক্তির পরিবর্তনকে না বুঝলে মানবসমাজের রূপান্তরকে বোঝা যায় না। মধ্যযুগের শেষ পর্বে এই রূপান্তরের ধারা ভারতবর্ষে কিরকমভাবে কাজ করেছিল তা বোঝা যায় ঔরংজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস পড়লে। সেই ইতিহাসই আমরা পড়ব।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য একটি সতত সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্টানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্রাট ঔরজেবের সময়ে তা পরিণতি লাভ করে। এই প্রথম মোগল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে তার চরম (final) সীমা লাভ করল। এই সীমানা সম্প্রসারণ আর রাজ্য সংগঠনের অবিরল ধারার মধ্যে দমনপীড়ন অনিবার্য রাষ্ট্রিক নীতির অঙ্গীভূত ভাব রূপে যেমন প্রকাশ পায় তেমন জাতিসত্তার গভীরে তিল তিল করে জমে ওঠা ক্ষোভও আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রিক স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দেয়। রাষ্ট্র সম্প্রসারণের শাসকের সন্তোষ আর তার প্রতিক্রিয়ায় জনরোষ এই দুইয়ের অপব্যাখ্যা হয়েছে নানাভাবে নানা সাম্প্রদায়িক খণ্ডিত ও একদেশদর্শী দৃষ্টিকোণ থেকে। এই পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস চর্চার বাইরে ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ককে স্থির রেখে বস্তুগ্রাহ্য, তথ্যনির্ভর, নিরপেক্ষ ইতিহাসকে আমাদের পাঠ করতে হবে। কোন তত্ত্ব বা মডেলকে চোখের সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হব না। তথ্য আমাদের নিয়ে যাবে তত্ত্বে। আসুন আমরা সেই ইতিহাস পড়ি।

১খ.২ প্রারম্ভিক কথা

ঔরংজেবের রাজত্বকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮-১৭০৭)। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ আকার ধারণ করেছিল। ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় সাম্রাজ্যই এত বৃহদাকার ধারণ করতে পারেনি। অথচ রাজ্যে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি কমেছিল। সম্রাট নিজে অনেকখানি তার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই কিছুটা তাঁর ভ্রান্ত নীতির জন্য, কিছুটা যুগের পরিবর্তনশীল ধারার জন্য মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। এর ফলে সম্রাটের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। মোগল সাম্রাজ্য কিভাবে গৌরবের শিখরে উঠল আর কিভাবেই বা তার সবচেয়ে

ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের রাজত্বকালে ভাঙ্গনের মধ্যে ঢলে পড়ল তার ইতিহাস আমরা এখন পড়ব। শুধু এখানে মনে রাখা দরকার—যে কথা যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, ঔরংজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস হল সমস্ত ভারতের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে ভাগ করা যাবে না। একে বুঝতে হবে সামগ্রিকতার প্রেক্ষিতে। ঔরংজেবের শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রায় পঞ্চাশ বছরের (১৬৫৮-১৭০৭) কালানুক্রমিক ইতিহাসের দুটি ভাগ আছে—প্রথম ভাগ ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় ২৩ বছর। দ্বিতীয় ভাগ ১৬৮১ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় ২৭ বছর। তাঁর রাজত্বের প্রথমভাগে সম্রাট উত্তরভারতে ছিলেন। তাঁর রাজধানী, রাজসভা, পরিবার, ব্যক্তিগত উপস্থিতি, রাজ্যপ্রসার, সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র, রাজস্বব্যবস্থা সব নিয়ে যে রাজ্যপাট তার কেন্দ্রে ছিল উত্তর ভারতে। রাজত্বের প্রথমার্ধ উত্তর ভারতে থাকার পর পরের পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়—একটি শতাব্দীর সিকিভাগের বেশি সময়—সম্রাট রইলেন দক্ষিণ ভারতে। ফলে তখন দক্ষিণ ভারত হল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র—উত্তরভারত অবহেলায় ডুবে গেল।

১খ.৩ সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরের সংস্কার

ঔরংজেব সিংহাসন লাভ করার অব্যবহিত পরে কিছু সংস্কারকার্যে হাত দেন। নিজের অবস্থানকে সংহত করার জন্য সব শাসকই এ কাজ করেন—ঔরংজেবও করেছিলেন। অর্থদপ্তর ও রাজস্ব দপ্তরে হিন্দু প্রশাসকদের বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম প্রচার করেছে এই অভিযোগে বারাণসিতে ব্রাহ্মণদের ওপর তিনি উৎপীড়ন করেন এবং হিন্দুমন্দির ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। রিজভি অবশ্য বলেছেন যে, ধর্মান্ধ জনতা বারাণসীর মন্দির ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল, সম্রাট স্বয়ং তা বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামের অনুশাসন মেনে তিনি নতুন মন্দির সেখানে গড়তে দেননি।

১৬৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে মেবারকে কেন্দ্র করে রাজস্থানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন কিছুটা বাধ্য হয়ে সম্রাট কৃষকদের দেয় কর (taxes and casses) ও খাজনা সাময়িকভাবে মকুব করেন। প্রায় আশি রকমের কর তিনি মকুব করেছিলেন এবং তার আদায়ের ওপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত এই নিষেধাজ্ঞায় কাজ হয়নি। কাফি খাঁ—যিনি ঔরংজেবের রাজত্বকালের সবচেয়ে প্রধান সমসাময়িক ঐতিহাসিক—বলেছেন যে, দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া এই 'রাজকীয় নিষেধাজ্ঞায় কোন ফল হয়নি'—('the royal prohibitation had no effect')। আঞ্চলিক প্রভু আর স্থানীয় কর্মচারীরা সবাই প্রচলিত করগুলি থেকে নিজেদের ফায়দা তুলে নিত।

ঔরংজেব তার রাজত্বে একটা গোঁড়া সুন্নী মুসলমানের ভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সিংহাসেন আরোহণের পরেই তিনি আকবর প্রবর্তিত **ইলাহি** কালগণনা (Ilahi era) তুলে দিয়ে ইসলামীয় চান্দ্র কালগণনার (Muslim lunar calendar) পদ্ধতি চালু করেন। তাতে বাস্তব অসুবিধা দেখা দিলেও তাকে বহাল রাখা হয়। একজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনসবদারকে **মুহাতসিব-রূপে** (Muhatasib) নিযুক্ত করা হয়। তাঁর কাজ ছিল দেশে ইসলামীয় নৈতিকতাকে কায়েম করা। আসলে দেশে মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতা কমানোর জন্য তিনি **শারিয়া** (sharia) নিয়মকে ও কোরআন সম্মত নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপাতভাবে তা খারাপ ছিল না, কারণ সম্ভবত অন্য ধর্মের মানুষকে তা স্পর্শ করেনি। কিন্তু তার বাড়াবাড়িটুকু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক। এতদিন ধরে মোগল সাম্রাজ্যে ইরানীয় **নৌরাজ** বা নববর্ষের যে অনুষ্ঠান প্রথা চালু ছিল তা তুলে দেওয়া হল। মুদ্রার মধ্যে **কলিমা** (Kalima) বা ধর্মবিশ্বাসের যে বাণী লিপিবদ্ধ থাকত তাও তুলে দেওয়া হল পাছে বিধর্মীদের হাতে পড়ে তার ধর্মীয় পবিত্রতাই নষ্ট হয়। এই সমস্ত সংস্কার আকবর

প্রবর্তিত ঔদার্যের ও সহিষ্ণুতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। হয়ত তিনি সাম্রাজ্যের রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে প্রশমিত করে তাঁর রাজ্যশাসনের সুচনাপর্বকে স্থিতিশীল করতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে হলে ক্ষমতার আশেপাশে উত্তেজনাপ্রবণ জনগোষ্ঠীগুলিকে ধর্ম, কূটনীতি, উপহার ও উপঢৌকন প্রদান ইত্যদির মধ্য দিয়ে প্রশমিত রাখতে হয়। ঔরংজেব চিরায়ত এই রাজ্যশাসন নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা এক সর্বধর্মীয় দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন। ঔরংজেব গ্রহণ করেছিলেন একধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। ফলে শেষ পর্যন্ত ঔরংজেবের সমস্ত সংস্কার যতখানি হয়েছিল সাম্রাজ্যের পক্ষে সংহতি সহায়ক তার থেকে অনেক বেশি হয়েছিল সাম্রাজ্যের সংহারের কারণ।

ঔরংজেবের সংস্কার কার্যগুলি মূলত চালু হয়েছিল তঁরা রাজত্বকালের প্রথম পঁচিশ বছরে—তাঁর উত্তরভারতে অবস্থানকালে। এই সময়ে তিনি মক্কা আর মদিনার পবিত্র মানুষদের উপহার পাঠিয়েছিলেন। রিজভি বলেছেন যে, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের কষ্ট কমানো এবং পণ্যের ওপর আরোপিত করের বোঝা হ্রাস করা। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে বণিকদের দ্বারা আমদানি করা সমস্ত পণ্যের ওপর ধার্য কর কি হবে তা স্থির করে দিয়েছিলেন। মুসলমান বণিকরা যা আনবেন তার মোট মূল্যের ২১/২ শতাংশ হবে কর। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হবে পাঁচ শতাংশ। দু বছর পরে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্ত কর তুলে দেওয়া হল। এই ধরনের সংস্কারকার্যের মধ্যে বৈষম্য ছিল। এই বৈষম্য আকবর প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতার নীতিকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

১খ.৪ উত্তরভারত : প্রথম দশ বছর : সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের গৌরব

এইরকম ধর্মান্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কারকার্য দিয়ে যে রাজত্বের সূচনা সে রাজত্বে শান্তি থাকে না। ঔরংজেবের রাজত্বে তাই শান্তি ছিল না। শুধু রাজত্বের প্রথম দশ বছর তিনি যতটুকু সামরিক ও কূটনৈতিক সাফল্য পেয়েছিলেন সেটুকুই ছিল তাঁর গৌরব। তার বাইরে পুরোটাই ছিল বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আয়োজন আর নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে শান্তিহীন সংগ্রাম। এইজন্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, ঔরংজেবের জীবন এক দীর্ঘ ট্র্যাজেডি, অদৃশ্য ও অমোঘ ভাগ্যের বিরুদ্ধে একজন মানুষের যুদ্ধ যার উপাখ্যান শেষ পর্যন্ত এক শ্রেষ্ঠ পুরুষকারের যুগশক্তির দ্বারা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস মাত্র।

ঔরংজেব সিংহাসনে বসেছিলেন **'আলমগীর'** উপাধি নিয়ে—এর অর্থ হল **'বিশ্ববিজেতা'** (World-seizer)। এই উপাধি নিয়ে তাঁর পঞ্চাশ বছর রাজত্বের প্রথম তিরিশ বছর তিনি দুটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন—এক, একটি সুসংবদ্ধ ইসলামীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দুই, সাম্রাজ্যের সীমানাকে এক আক্রমণশীল সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে চলমান ও প্রগতিশীল রাখা। ছোটখাটো বিদ্রোহকে তিনি শুরুতেই দমন করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বিকানীরের রাজা রাও করণ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এর দুবছর পরে তাঁর আদেশে বিহারের শাসনকর্তা ছোটনাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গলঘেরা পালামৌ নামক স্থানটি দখল করেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী চম্পৎ বুন্দেলাকে সম্রাটের নির্দেশে তাড়া করেন রাজ-অনুগত আরেক বুন্দেলী—শুভ করণ। বিদ্রোহী চম্পৎ শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়ে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আত্মহত্যা করেন। সেই একই বছরের শেষদিকে মীরজুমলা কুচবিহার দখল করেন এবং একের পর এক দুর্গ দখল করতে করতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অগ্রসর হন এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ঘাঁটি (military outposts) স্থাপন করেন। মীরজুমলার এই অভিযান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুটি কারণে—এক, বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য তখন উত্তর-পূর্বেও বাড়ছিল আর তার সঙ্গে

বাড়ছিল সেই অঞ্চলের মুসলমান বসতি-সীমান্ত ("settler frontier")। দুই, কুচবিহারের রাজা প্রেম নারায়ণ বিদ্রোহ করেছিলেন এবং অহম রাজা (Ahom king) জয়ধ্বজ সিংহ কামরূপ অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন। এদের দমন করার জন্য ও বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চল দখলের জন্য মীরজুমলা রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। রিচার্ড বলেছেন যে, বাংলার অর্থনীতির কেন্দ্র তখন পূর্ব দিকে সরে গিয়েছিল এবং জনপ্রবাহের ধারাও ছিল পূর্বগামী।

মীরজুমলা অহম রাজধানী গড়গাঁও (বর্তমান গুয়াহাটি) পর্যন্ত অগ্রসর হলেও এই রাজ্যজয় স্থায়ী হয়নি। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে গড়গাঁও মোগলদের হস্তচ্যুত হয়। এদিকে দক্ষিণে জলপথে আরাকানের মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুরা হিন্দু-মুসলমানদের লুঠ করে তাদের ক্রীতদাস করে বিক্রি করে দিত। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা, সম্রাটের মাতুল, শায়েস্ত খাঁ একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করে জলদস্যুদের দমন করেন। এরপর আরাকানের কাছ থেকে চট্টগ্রাম মোগলরা জয় করে নেয়। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের মোগল শাসকের চাপে পড়ে লাডাকের বৌদ্ধ শাসক সম্রাটের বশ্যতা (suzeranity) স্বীকার করে নেন। কুমায়ুনের রাজা বাহাদুর চাঁদকেও ঔরংজেব বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন (১৬৭৩)।

১খ.৪.১ রাজ্যশাসনের দীনতা ও সম্প্রদায়গত উত্তেজনার শুরু : মোগল বিপন্নতার আরম্ভ : জাঠ ও সৎনামি বিদ্রোহ

ঔরংজেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বছরের সাফল্য তাঁর রাজত্বের সার্থকতার মাপকাঠি নয়। সাম্রাজ্যের জনদুর্দশার ছবিটি আরম্ভ হয়েছিল প্রায় এই সাফল্যের সাথে সাথে। ইসলাম ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁকে ধর্মান্ধ করেছিল ঠিকই কিন্তু ধর্মান্ধ মানুষ রক্ষণশীল হলে অন্যের বেশি ক্ষতি হয় না যদি তিনি আগ্রাসী না হন। ঔরংজেব আগ্রাসী হয়েছিলেন হিন্দু ও ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর। এইখানেই তিনি ভুল করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক—যেমন যদুনাথ সরকার মনে করেন যে, ঔরংজেব একরকম সুপরিকল্পিতভাবেই হিন্দুবিদ্বেষের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। আজকালকার ঐতিহাসিকরা বলেন যে, ঔরংজেব ইসলামীয় হানাফি (Hanafi) মতবাদের বশবর্তী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা সচেতন ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রকর্তৃক ঘোষিত এই ধর্মীয় চাপ শেষপর্যন্ত আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে দিয়ে জনগণের ওপর নামতে শুরু করল। যেমন মথুরার ফৌজদার আব্দুন্নবি-র অত্যাচারে মথুরা আর আগ্রার চারপাশের জাঠরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গোকুল নামে এক জমিদারের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষকরা আব্দুন্নবিকে হত্যা করে। তারপর দুজন ফৌজদারও এই বিদ্রোহকে দমন করতে পারেনি। অবশেষে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং সসৈন্যে বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হলেন। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। গোকুল ও সাত হাজার কৃষককে বন্দী করা হয়। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় গোকুলকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়। তার পুত্র ও কন্যাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

জাঠ-বিদ্রোহের দুবছর পরে—১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে সৎনামিরা বিদ্রোহ করে। দিল্লির থেকে পঁচাত্তর মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নারনোল শহরের চারপাশে চার-পাঁচ হাজার সৎনামি পরিবার বসবাস করত। নারনোল থেকে মেয়াটের মধ্যেই ছিল তাদের বসতি। তারা ছিল কৃষিজীবী। অল্পস্বল্প শস্যের ব্যবসাও তারা করত। তারা ছিল কবীরের ভক্ত, একেশ্বরবাদী। সমস্ত বাহুল্য ও বিলাসকে বর্জন করে সাদামাটা কঠোর জীবনযাপন করত। তাদের নীতি ছিল ভিক্ষা করবে না, কারও দান গ্রহণ করবে না, জমিদার থেকে রাজা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কোন সংযোগ

রাখবে না এবং সবাই পরিশ্রম করে শুধুমাত্র উপার্জিত অর্থের দ্বারা জীবনযাপন করবে। ইরফান হাবিব লিখেছেন যে, শিখজাতিও এই কঠোর জীবনচর্যা ও একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করত বলে সৎনামি ও শিখদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সৎনামিদের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ বাধল যখন একটি মোগল পদাতিক সৈন্য সামান্য কথা কাটাকাটির পর হাতের গদা দিয়ে সেই কৃষকের মাথা চুরমার করে দিল। অনেকদিনের অত্যাচারে—হয়ত ধর্মীয় অত্যাচারে—সৎনামিরা বিক্ষুব্ধ ছিল। হয়ত ধর্মীয় অত্যাচারই ছিল বিদ্রোহের কারণ। আজকাল অবশ্য ঐতিহাসিকরা সরাসরিভাবে ধর্মের কারণে সাম্প্রদায়িক উত্থান না বলে একে কৃষক বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেন। রিজভি লিখলেন যে, অকারণে এই উত্থানের ওপর অবাস্তব ধর্মীয় রং (''unrealistic communal colour'') চড়ানো হয়। শত শত সৎনামি কৃষক যখন তাদেরই একজনকে হত্যা করার অপরাধে গর্জে উঠল—সশস্ত্র ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াল তখন এই **''গাঁওয়ার''**-দের গণজাগরণ দেখে তখনকার ঐতিহাসিক সাকি মুস্তাদ খাঁ চমকে উঠেছিলেন। আর এযুগের ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বিহ্বল হয়েছিলেন মেহনতী মানুষের উত্থান দেখে। এ দৃশ্য, তিনি বললেন, ভূমিতল মানুষের দৃশ্য (The sight of the plebian mass)—মোগলশক্তিকে একহাত নেওয়ার জন্য কোটি গাঁওয়ারের জেগে ওঠার দৃশ্য ('' 'an army of a crore of villagers [**ganwars**]'—taking on the armed might of the Mughal empire....'')। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল কিন্তু সৎনামিদের বীরত্ব তাদের শত্রুদেরও মুগ্ধ করেছিল।

১খ.৪.২ মোগল নিপীড়ন ও শিখজাতির আত্মত্যাগ

শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রিঃ)। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদির উচ্চতম আদর্শ ও সহতম নীতিগুলি নিয়ে শিখধর্মের উদ্ভব হয়। তাই গুরুদাস বলেছিলেন, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের কসংস্কার ও গোঁড়ামি বাদ দিলে যে স্বচ্ছতা থাকে তা নিয়ে শিখধর্মের জন্ম। বাবা নানক থেকে শুরু গোবিন্দ পর্যন্ত দশজন শিখগুরু ছিলেন। তাঁদের কার্যকাল ১৪৬৯ থেকে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় বাবর থেকে ঔরংজেবের সময়কালের সমান। দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গাদ (১৫৩৯-৫২) ছিলেন সম্রাট হুমায়ুনের সমসাময়িক (১৫৩০-৫৬)। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ খুসরুকে সাহায্য করার ফলে জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর পুত্র হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫) সমস্ত শিখ সম্প্রদায়কে সৈনিকের মত সুসংবদ্ধ করেন। ''আমার দুটি তরবারি'', তিনি বলেছিলেন, ''একটি ধর্মের অন্যটি ঐহিক কর্তৃত্বের''। মাথা তুলে দাঁড়ানোর এই চেষ্টার জন্য বারো বছর তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী থাকতে হয়।

শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রথমদিকে একটি রাজকীয় শিকার বাহিনীর সঙ্গে শিখদের বিরোধ ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়। অমৃতসরের কাছে সংগ্রাণা (Sangrana) নামক স্থানে সম্রাটের অভিযান শিখদের কাছে পরাজিত হয়। এর পরেই শিখদের ওপর নেমে আসে বিপুল ও নির্মম সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন। হরগোবিন্দ পলায়ন করেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের পাহাড়ি অঞ্চলে কিরাতপুর (Kiratpur) পরলোক গমন করেন।

শিখদের সপ্তম গুরু ছিলেন হররায় (হরি রায়, ১৬৪৫-১৬৬১)। [গুরু গোবিন্দ গুরু-পদে তাঁরই দুই জীবন্ত পুত্রের দাবিকে অস্বীকার করে তাঁর অকালমৃত জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তান হররায়কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।] এই গুরু হররায়ের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন দারাশিকো। হয়ত ঔরংজেব যখন সিংহাসনের জন্য লড়াই করছিলেন তখন হররায় তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করে

হররায়কে এই কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বললেন। তিনি হররায়কে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরায়কে (Ram Rai) সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। ঔরংজেব জানতেন যে, পঞ্চম গুরুর সময়েই ঢাকা থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা শিখদের দানে একটা অর্থভাণ্ডার অমৃতসরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া, গুরু হরগোবিন্দের সময়েই উত্তরভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক শিখঘাঁটি তৈরি হয়েছিল যা সহজে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। তাই ঔরংজেবের লক্ষ্য ছিল দুটি— এক, শিখগুরুর পদে উত্তরাধিকারের সমস্ত প্রশ্নটিকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করবেন, এবং দুই, শিখদের সম্ভাব্য গুরুকে মোগল রাজসভায় এনে নতুন সাম্রাজ্যবাদী মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিক্ষাদান করবেন। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি শিখগুরুকে প্রলুব্ধ করার জন্য শিবালিকা পার্বত্য অঞ্চলে কিছু জমিও দান করেন। সম্রাটের এই চাতুরি বুঝতে পেরে হররায় ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময়ে রাম রায়ের গুরুপদের দাবি খারিজ করে তাঁর অপর পুত্র হরকিষেণকে পরবর্তী গুরু বলে মনোনীত করলেন।

এইভাবে গুরুপদের দুই দাবিদার দেখা দিল—বিদায়ী গুরু কর্তৃক মনোনীত হরকিষেণ এবং সম্রাট কর্তৃক সমর্থিত রামরায়। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে অকস্মাৎ হরকিষেণ পরলোক গমন করেন। তখন শিখরা দ্রুত গুরু হররায়ের ভ্রাতা ও গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগবাহাদুরকে গুরু বলে ঘোষণা করেন। সম্রাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইতে যাওয়াটা গুরু তেগবাহাদুর যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। তিনি বাংলা, আসাম ও উত্তরভারতে ধর্মপ্রচারে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি ফিরে আসার পর তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ আনা হয়। ঔরংজেব শিখদের গুরুদ্বার ও হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। আগ্রায় গুরুকে বন্দী করে দিল্লিতে চালান করে দেওয়া হয়। সেখানে ধর্মদ্রোহিতার (blasphemy) অপরাধে তাঁর বিচার হয়। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হয়। যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়। সে আদেশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন পাঁচদিন একটানা অত্যাচারের পর তাঁকে হত্যা করা হয়। এর ফলে এক মুহূর্তে উত্তরভারতের লক্ষ লক্ষ জাঠ ও ক্ষত্রিয় শিখ মোগলদের শত্রুরূপে কৃপাণ হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধর্মদ্রোহীর ভাগ্য কি হয় তা দেখানোর জন্য নিথর গুরুর দেহটি দিল্লির রাজপথে প্রদর্শন করা হয়। গুরু নাকি মরবার সময়ে বলেছিলেন, 'আমি মাথা দিয়েছি, কিন্তু সম্মান বা সার্বভৌমত্ব দান করিনি।' কানিংহাম বলেছেন যে, মরবার আগে তেগবাহাদুর তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁর হাতে হরগোবিন্দের অসি প্রদান করে যান। পিতা ও গুরুকে 'শহিদ' হতে দেখে গুরু গোবিন্দের মনে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে এবং তিনি সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়ার অঙ্গীকার করেন। গল্পে আছে যে, সম্রাট শিখগুরুকে হত্যা করার আগে বলেছিলেন যে, গুরু নাকি সম্রাটের অন্তঃপুরিকাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিলেন। গুরু তখন হেসে বলেছিলেন : ''সম্রাট ঔরংজেব! আমি যখন বন্দীশালায় সর্বোচ্চ তলে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমার দৃষ্টি আপনার অন্তঃপুরিকাদের উপর পড়েনি, পড়েছিল দূরে যেখানে সমুদ্রের পরপার থেকে ইউরোপীয়রা আসছে, যারা এসে আপনার পর্দা ছিন্ন করে সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে।''

শিখদের আন্দোলন কি কৃষক আন্দোলন? এই প্রশ্ন নিয়ে আজকাল আলোচনা হচ্ছে। ইরফান হাবিব সুন্দর করে এই প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শিখগুরুরা এসেছেন পাঞ্জাবের ক্ষত্রিয় জাতি [caste অর্থে জাতি] থেকে যারা সেই সময়ে ছিল মূলত বণিক শ্রেণীর মানুষ। তাদের অনুচরেরা ছিল জাঠ, যারা ছিল কৃষক— বৈশ্যদের মধ্যে সবথেকে নিম্নসোপানের মানুষ। সপ্তদশ শতাব্দীর শিখদের একটি বর্ণনায় বলা আছে যে জাঠরা হল গ্রামের মানুষ—একেবারে গেঁয়ো (rustic)। শিখগু(রা (ত্রিয়দের এই জাঠদের অধীনস্থ করতে সাহায্য করেছিল। এইভাবে শিখদের মধ্যে কৃষকদের উত্থান হয়। কিন্তু শিখগু(দের সঙ্গে মোগলদের যে বিবাদ তা হল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। গু(হরগোবিন্দ (মৃত্যু ১৬৪৫ খ্রিঃ) প্রথম গু(যাঁর সময়ে শস্ত্রধারী

অনুচর রাখার কাজ শু(হয়। শেষ গু(গোবিন্দ সিংহের (১৬৭৬-১৭০৮) সময়ে শিখদের মোগল-বিরোধী সংগ্রাম সবচেয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়। অথচ গু(গোবিন্দ সিংহ ঔরংজেবের বি(দ্ধে যে অভিযোগপত্র পেশ করেন সেখানে কৃষকদের ওপর অত্যাচারের কোন কথা নেই। অতএব, ইরফান হাবিব লিখলেন, নেতৃত্বের মধ্যে কৃষক চরিত্র থাকলেও কৃষকমুক্তি(শিখ নেতাদের সচেতন বা ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল না।

১খ.৪.৩ আফগানদের সঙ্গে বিরোধ

আফগানদের মধ্যে অনেক উপজাতি ছিল, যেমন ইউসুফজাই, আফ্রিদি, খটক ইত্যাদি, যাদের মোগলরা কোনদিনও সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ঔরংজেবের রাজত্বকালে এই উপজাতিগুলি একের পর এক মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। দীর্ঘকাল ধরে এইসব উপজাতি নেতাদের অর্থ উপঢৌকন দিয়ে বশীভূত রাখা হত। কখনো কখনো এদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে হত। ঔরংজেবের রাজত্বকালে এদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু প্রভৃতি অঞ্চলে খটক উপজাতির মধ্যে বেড়ে ওঠা অসন্তোষকে মোগলরা বুঝতে পারেনি। তাই সৈন্য চালিয়েও তাদের উত্থানকে দমন করতে সম্রাটের অনেকদিন সময় লেগেছিল। তাদের নেতা ছিল খুশহাল খান (Khushal Khan)। তিনি ছিলেন একজন **মনসবদার**। ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে তার উপজাতির মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তাঁকে বন্দী করা হয়। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে খটকদের চিরশত্রু ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে যখন মোগলবাহিনী প্রেরিত হল তখন তাঁকেও তার সাথে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে আফ্রিদিদের উত্থান হলে তিনি মোগলদের ত্যাগ করে আফ্রিদিদের সঙ্গে হাত মেলান। খুশহাল খান পুস্তু ভাষায় কবিতা লিখে আফগানদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। পরে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন কোন মোগল নেতা ও সামরিক প্রধান আফগানদের দমন করতে পারল না তখন স্বয়ং ঔরংজেব ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে সসৈন্যে রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারের মাঝখানে হাসান আব্দাল নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। এবার তিনি বাহুবলের বদলে কূটনীতি বেশি প্রয়োগ করতে লাগলেন। এই কূটনীতি ছিল এক উপজাতিকে অন্য উপজাতির বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার নীতি। এই নীতিকে তিনি বলতেন, ''দুই হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে তাদের ভেঙ্গে ফেলা'' ['breaking two bones by knowing them together']। এইভাবে দুর্দান্ত আফগানদের নিরস্ত করার পর তিনি কাবুলের মোগল শাসনকর্তা আমীর খানের ওপর দায়িত্ব দিয়ে চলে আসেন। ১৬৮৭ থেকে ১৬৯৮ পর্যন্ত আমীর খাঁ প্রবল বুদ্ধি ও কূটনীতির দ্বারা আফগান উপজাতিগুলিকে প্রশমিত করে রাখেন। এতে তাঁকে সাহায্য করেছিল সাহিবজী নামে তাঁর অতিশয় বুদ্ধিমতী স্ত্রী।

যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, আফগান যুদ্ধ ঔরংজেবের রাজকোষকে শুষে নিয়েছিল। রাজনৈতিকভাবে তার ফল হয়েছিল বিপজ্জনক। এর ফলে আসন্ন রাজপুত যুদ্ধে আফগানদের ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল যদিও আফগানরাই ছিল সেই শ্রেণীর সৈনিক যারা রাজপুতনার দুর্গম ও ঊষর অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য ছিল যোগ্য। আফগানদের সঙ্গে লড়বার জন্য ঔরংজেবকে দাক্ষিণাত্য থেকে সৈন্যদের সরিয়ে আনতে হয়েছিল। ফলে সেখানে সামরিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে সেখানে শিবাজী রাজ্যবিস্তার করেন।

১খ.৪.৪ রাজপুত বিদ্রোহ : উত্তরভারতে মোগলদের সবচেয়ে বড় সঙ্কট

ঔরংজেব যে নতুন জঙ্গী রক্ষণশীলতা ('new militant orthodoxy'–Richards) তৈরি করেছিলেন তার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয়েছিল তাঁর রাজপুতনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে। রাজপুতরা ছিল অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়, অন্যদিকে তারাই ছিল সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভ। আবার রাজপুতরা ছিল মোগল সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, উচ্চ

মনসবের অধিকারী মোগল সম্ভ্রান্তদের অনস্বীকার্য অংশ। এদের ওপর বলপ্রয়োগ করতে গিয়েই ঔরংজেব তাঁর উত্তরভারতে অবস্থানকালের সবচেয়ে বড় সঙ্কট তৈরি করেছিলেন যাকে রিজভি বলেছেন 'Aurangzeb's most desperate crisis'।

আপাতভাবে মোগলদের বিরুধ্বে অভিযোগ করার কোন কারণ রাজপুতদের ছিল না। আতহার আলি দেখিয়েছেন যে মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে তখনও রাজপুতরা প্রভাবশালী ছিলেন। সাম্রাজ্যের অন্যতম সবচেয়ে বড় **মনসবদার** ছিলেন মির্জা রাজা জয়সিংহ। [কচ্ছওয়া পরিবারের]। তাঁর পদমর্যাদা ছিল ৭০০০ জাঠ ও ৭০০০ **সওয়ার**। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের সময়ে তিনিই ছিলেন ঔরংজেবের সবচেয়ে প্রধান সমর্থক। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হন যে পদ শুধুমাত্র যুবরাজ বা সম্রাটের পরিবারের কেউ পেতে পারত। তাছাড়া ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের পর রাজকার্যে নিযুক্ত রাজপুতদের জিজিয়া (jiziya) দেওয়া থেকে মুক্ত করা হয়েছিল—যদিও তাদের প্রজারা মুক্ত ছিল না।

ঔরংজেবের রাজত্বের বিংশতিতম বছরে—১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে—রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়ওয়ার রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা যশোবন্দ সিংহ সুন্দর আফগানিস্তানের একটি অখ্যাত উপজাতীয় অঞ্চল জামরুদের মোগল **থানাদর** রূপে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। কিন্তু তাঁর দুই রানী সেই সময়ে সন্তানসম্ভবা ছিলেন, ফলে তাঁদের সহমরণে যেতে হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই দুই রানীরই দুটি পুত্রসন্তান হয়—একটি জন্মের পর মারা যায়, আরেকটি— যেদি যশোবন্ত সিংহের শিশোদিয়া বংশজাত মহিষীর গর্ভে জন্মেছিল—সেটি বেঁচে যায়। এই শিশুর নাম অজিত সিংহ।

অজিত সিংহের জন্ম হয় লাহোরে। রাজপুতদের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির কথা। আবার সর্বোচ্চ শক্তি (paramount power) রূপে ঔরংজেব এই দুই সন্তানের যে কোন একটিকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারতেন। অথবা রাজপরিবারের কোন বর্ষীয়ান পুরুষকে রাজপুত কৌমের (clan) প্রধান বলে মেনে নিয়ে তাকে সিংহাসন দান করতে পারতেন। প্রথম পর্বে ঔরঙ্গজেব অজিত সিংহকে রাজপুতদের রাজা বলে মানলেন না। যোধপুরের সিংহাসন নিয়ে গোলযোগ শুরু হল এইখানে।

প্রথমত, ঔরংজেব প্রয়াত মহারাজার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (escheated) করে নিলেন এবং সমস্ত মাড়ওয়ারকে 'খালিসা' (crownland) বলে ঘোষণা করলেন। এর অর্থ মাড়ওয়ারের সাম্রাজ্যভুক্তি (annexation) নয়। এর অর্থ হল মাড়ওয়ারকে ভবিষ্যতে **জাগির** রূপে বণ্টন করার অধিকারকে হাতের মধ্যে নিয়ে রাখা। দ্বিতীয়ত, ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আজমীরে এলেন—তাঁর আপাত উদ্দেশ্য খাজা মৈনুদ্দিনের সমাধিতে এসে তীর্থ করা, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজপুতদের ভীত প্রদর্শন করা। ঔরংজেবের তৃতীয় পদক্ষেপটি আরও মারাত্মক। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে ফিরে তিনি হিন্দুদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জিজিয়া কর স্থাপন করলেন, যোধপুর শহরটিকে সরাসরি মোগল প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত করলেন, সেখানকার সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং প্রয়াত মহারাজা যশোবন্তের অগ্রজ ভ্রাতার পৌত্র, নাগোরের প্রধান ইন্দ্রসিংহকে যোধপুরের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। গাড়ি বোঝাই করা হিন্দুদের মন্দির ও বিগ্রহের ধ্বংসাবশেষ দিল্লিতে আনা হল এবং সেখানে পুণ্যলোভী মুসলমানরা তা যথেচ্ছভাবে পদদলিত করে পুণ্যলাভ করল। এইভাবে ঔরংজেব রাজপুত ও হিন্দুমননের ওপর ছুরিকাঘাত করেছিলেন।

এখন ইন্দ্রসিংহকে রাজা বলে ঘোষণা করার দুটো দিক আছে—একদিকে তিনি যোধপুরের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর রাজ্যলাভের অধিকারকে খারিজ করে আইনকে লঙ্ঘন করেছিলেন। অন্যদিকে যোধপুরের প্রকৃত উত্তরাধিকারকে তিনি তুলে ধরে আইনসঙ্গত কাজ করেছিলেন। ব্যাপারটি এইরকম। শাহজাহানের রাজত্বকালে

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাড়ওয়ারদের রাজা এবং পদস্থ মোগল আমীর গজসিংহ পরলোক গমন করেন। আগ্রায় মোগল দরবারে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন শাহজাহান প্রয়াত গজ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসনের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র যশোবন্ত সিংহের কপালে অভিষেকসূচক লাল টিকা পরিয়েছেন। এর চল্লিশ বছর পর যখন যশোবন্ত সিংহ মারা যান তখন ঔরংজেব তাঁর উপেক্ষিত ভাইয়ের পৌত্রকে রাজা বলে মেনে নিলেন।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মাড়ওয়ারের রাজপুতরা (রাজপুতনার পশ্চিমাংশের জনগণ) বিদ্রোহ করল (একে Richands 'a full-scale revolt' বলে বর্ণনা করেছেন।) যশোবন্ত সিংহের অনুগত কর্মচারী ও সেনাপতি দুর্গাদাস রাঠোর মাড়ওয়ারের সমস্ত রাঠোরদের ঐক্যবন্ধ করে সম্রাটের কাছে আবেদন করলেন যে তিনি যেন অজিত সিংহকে স্বীকার করে নেন। দুর্গাদাস ছিলেন একজন কঠোর পুরুষ। তাঁকে ঐতিহাসিক টড (Tod) রাঠোরদের ইউলিসিস (ulysses) বলে বর্ণনা করেছেন। এহেন দুর্গাদাসের আবেদনকে ঔরংজেব অস্বীকার করলেন। ঔরংজেব সবসময়ে বাহুবল ও কুটনীতিকে পাশাপাশি ব্যবহার করতেন। তিনি দুর্গাদাসকে জানিয়ে দিলেন যে **ওয়াতন** (Watan) [কোন রাজার বা মানুষের নিজের দেশ, জন্মস্থান, পূর্বপুরুষের তালুক-মুলুক] কোন রমণীর বা কোন ভৃত্যের হাতে দেওয়া যায় না। আইনের দিক থেকে একথা অর্থবহ হলেও রাজনৈতিকভাবে এ যুক্তি ছিল বিপজ্জনক কারণ তা রাজপুতদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছিল। সম্রাট তাঁর অভিলাষও রাজপুতদের জানিয়ে দিলেন—অজিত সিংহ মোগল হারেমে লালিত হবে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সম্রাট তার দাবি পর্যালোচনা করে দেখবেন। তবে তার একটা শর্ত ছিল—অজিত সিংহকে মোগল হারেমে মুসলমানরূপে বড় হতে হবে।

যখন এই আলাপ-আলোচনা চলছিল তখনই অজিত সিংহের অনুজ দ্বিতীয় শিশুটি মারা যায়। এইবার দুই পক্ষেরই তৎপরতা শুরু হয়। দুর্গাদাস যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নীদ্বয় ও শিশু অজিত সিংহকে সম্রাটের হাতে সঁপে দিতে রাজী হলেন না। ঔরংজেব তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণ করে শাহজাহানাবাদের রাঠোর প্রাসাদে যেখানে যশোবন্তের রানী ও শিশু অবস্থান করছিলেন তা অবরোধ করেন। ঔরংজেবের ধারণা ছিল রাজপুতরা সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল ভুল। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঔরংজেব যখন খান-ই-জাহান বাহাদুরের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী পাঠিয়ে রাজাহীন অনাথ মাড়ওয়ারকে লুঠ করে সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে, মহারাজার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে যোধপুর শহরে ও তার চারপাশের জনপদগুলিতে **ফৌজদার, কিল্লাদার, কোতোয়াল** এবং আমিন নিয়োগ করেছিলেন তখনই মাড়ওয়ারের রাঠোর রাজপুতরা সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। এইবার তারা দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল।

অবরুদ্ধ রাঠোর প্রাসাদে রাজপুতরা দুই দাসীকে রানী সাজিয়ে তাদের কোলে শিশু রাজপুতদ্বয়ের অবিকল নকল দুই শিশুকে বসিয়ে অজিত সিংহ ও যশোবন্তের রানীদের নিয়ে পলায়ন করে। এই রাজকীয় অন্তর্ধানের সম্পূর্ণ ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দুর্গাদাস রাঠোর। এই অন্তর্ধানের আগে যশোবন্তের রানী অজিত সিংহের মা—ঔরংজেবকে এই প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে অজিত সিংহকে রাজা বলে সম্রাট যদি মেনে নেন তবে সব মন্দির তিনি নিজেই ভেঙ্গে ফেলবেন। ঔরংজেব কাউকে বিশ্বাস করতেন না। এই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

দুর্গাদাস অজিত সিংহকে নিয়ে যোধপুরে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আবু পাহাড়ের নির্জনতায় রাঠোরদের নিজস্ব পরিবেশে তাকে মানুষ করা হয়। ঔরংজেব এইবার তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এক, তিনি পিছনে পড়ে থাকা বিপুল রাঠোর রাজপুতদের হত্যা করলেন। দুই, তিনি বন্দী হওয়া দাসীপুত্রকে আসল অজিত সিংহ বলে ঘোষণা করেন এবং প্রকৃত অজিত সিংহকে অবাঞ্ছিত নকল বলে অস্বীকার করেন। তিন,

তিনি স্বয়ং আজমীরে যাত্রা করেন। এইখান থেকে দ্বিতীয়বার মাড়ওয়ার আক্রমণের জন্য তিনি তাঁর চতুর্থ পুত্র যুবরাজকে নির্দেশ দেন। বিপুল মোগলবাহিনী পুষ্কর হ্রদের কাছে রাজসিংহের অধীনে রাজপুতদের সবচেয়ে যোদ্ধাবাহিনী মৈর্‌তিয়া (Mairtia) রাঠোরদের হত্যা করে। রাজসিংহ এত প্রাণপণ লড়েছিলেন যে ঐতিহাসিকরা তাঁকে গ্রীক ইতিহাসের থার্মোপাইলি যুদ্ধের নায়ক লিওনিডাস (Leonidas)-এর সঙ্গে তুলনা করেন। এরপর মাড়ওয়ারের প্রত্যেক পরিবার লড়াইয়ের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক রাঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সঙ্কল্পবদ্ধ সৈনিক। বলা হয়েছে যে আকাশ থেকে যেমন জল পড়ে মাটিতে সেইরকম ঔরংজেব তাঁর সৈন্যবাহিনী বর্ষণ করেন মাড়ওয়ারে।

মাড়ওয়ারের এই বিপর্জয় আসলে সমস্ত রাজপুতনার বিপর্যয়—এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন মেবারের মহারাণা রাজসিংহ। যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, মাড়ওয়ার জয় হল মেবার আক্রমণের প্রস্তুতিমাত্র। মন্দির ভাঙ্গার দুর্বার স্পৃহা আরবল্লি পাহাড় আটকাতে পারবে না একথা রাজপুতরা বুঝে গিয়েছিল। তাছাড়া মহারাণার কাছ থেকেও **জিজিয়া** দাবি করা হয়েছিল। রাজা অজিত সিংহের মা ছিলেন মেবার-দুহিতা। অতএব মেবারের শিশোদিয়ারা মাড়ওয়ারের রাঠোরদের সঙ্গে জোট বাঁধল। যশোবন্ত সিংহের প্রধান মহিষী, রানী হাদির (Rani Hadi) ডাক মহারাণা রাজসিংহ ফেলতে পারলেন না। রাজপুতরা সঙঘবদ্ধ হলেও তাদের যথেষ্ট পরিমাণ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না। ফলে মোগলদের মূল সমরবাহিনীকে ('main Mugal battle force') রুখে দেওয়া তাদের সম্ভব হয়নি। মোগলরা অচিরেই মেবারের রাজধানী উদয়পুর অধিকার করে এবং দ্বিতীয়বার যথেষ্ট লুঠতরাজ ও মন্দির ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়। মেবারের মহারাণা ও অবশিষ্ট শিশোদিয়া যোদ্ধারা পাহাড়ে পলায়ন করেন। সেখান থেকে শুরু হয় তাদের গেরিলা যুদ্ধ।

ইতিমধ্যে ঔরংজেব মোগল শিবিরে অজিত সিংহের নকল যাকে দাঁড় করিয়েছিলেন তাকে মহম্মদীরাজ নাম দিয়ে তার চারপাশে রাঠোরদের সমবেত করতে চেয়েছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বলে বাহুবলে তিনি মাড়ওয়াড়কে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু রাঠোরদের পর্যুদস্ত করতে পারেননি। এইবার বাহুবলে মেবার ধ্বংস করেও শিশোদিয়াদের শায়েস্তা করতে পারলেন না। পাহাড় আর জঙ্গালের অদৃশ্য আস্তানা থেকে বের হয়ে এসে শিশোদিয়া গেরিলাবাহিনী ১০,০০০ শকটে বয়ে নিয়ে যাওয়া রাজস্ব ও মোগল সৈন্যদের জন্য প্রেরিত শস্য লুঠ করে পলায়ন করে। মোগল সেনাপতি যুবরাজ আকবর সম্রাটকে জানালেন—"আমাদের সৈন্যবাহিনী ভয়ে অনড় হয়ে রইল" (Our army is motionless through fear)।

পরাজয়ের এই নিঃসীম স্বীকারোক্তির পর ঔরংজেব তৃতীয়বার মাড়ওয়ার আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। মেবার-মাড়য়ারের জোটকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যুবরাজ আকবরকে প্রেরণ করা হল মারওয়ারে। মেবার ধ্বংসের দায়িত্ব দেওয়া হল যুবরাজ আজমকে (Azam)। স্থির হল যুবরাজ আজম অগ্রসর হবে চিতোর থেকে, যুবরাজ মুয়াজ্জম যাবেন রাজসমুদ্র থেকে আর যুবরাজ আকবর যাবেন দেওসরি (Deosuri) থেকে। কিন্তু এই ত্রিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব স্বয়ং আজমীরে দ্বিতীয়বার এলেন সমগ্র অভিযানের পরিচালনা জন্য। সেই একই বছর মেবারের মহারাণার স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়। তবুও রাজপুতরা তাদের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছিল। ইতিমধ্যে সম্রাটের পুত্র আকবর রাজপুতদের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করে। উত্তরভারতে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড় সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়ায়। এইরকম এক জটিল মুহূর্তে মহারাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ—পিতার শৌর্য থেকে বঞ্চিত এক দুর্বল শিশোদিয়া—সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করেন। ফলে মাড়ওয়ারের গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়বার ভার আজমীরের শাসনকর্তার ওপর প্রদান করে ঔরংজেব দক্ষিণভারতে প্রস্থিত তাঁর বিদ্রোহী পুত্রকে শায়েস্তা করতে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তাঁর রাজত্বের উত্তরভারত পর্ব শেষ হয়।

যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ যেমন সম্রাটের মনকে অন্যদিকে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করেছিল সেইরকম রাজপুতদের ওপর থেকে সামরিক চাপকে সরিয়ে নিতেও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। রাজপুতদের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে বহু সৈন্যকে দক্ষিণে নিয়ে যেতে হয়েছিল কারণ সেখানে বিদ্রোহী যুবরাজের সঙ্গে মারাঠাদের একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এইভাবে মোগল সৈন্য বেশিকিছুটা অপসারিত হওয়ার ফলে পরবর্তী এক প্রজন্ম রাঠোর গেরিলারা মোগলদের সঙ্গে লড়াই চালাতে পেরেছিল। পলাতক রাজা অজিত সিংহ যেভাবে এক গোপন আস্তানা থেকে অন্য আস্তানায় আত্মগোপন করে মোগলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন তার কাহিনী ভারতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এরপর অজিত সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন এবং তখনও মাড়ওয়ারের সঙ্গে লড়াই চলেছিল। প্রায় কুড়িবছর এভাবে লড়াই করার পর রাঠোরদের সঙ্গে মোগলদের সন্ধি হয়েছিল। আর এই দীর্ঘ সময় ধরে মোগল সাম্রাজ্য ও সৈন্যবাহিনী বীর রাঠোরদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, রাজপুতদের নিজস্ব স্পর্শকাতরতার জায়গাগুলি যদি ঔরংজেব বুঝবার চেষ্টা করতেন তবে হয়ত রাঠোর ও শিশোদিয়াদের সঙ্গে বিরোধ এড়ানো যেত। কিন্তু ঔরংজেব সন্দেহ করতেন যে, দারাশিকোর সঙ্গে যশোবন্ত সিংহের যে দেওয়া-নেওয়া ছিল তা ঔরংজেবের স্বার্থবিরোধী। তিনি এও মনে করতেন—হয়ত বা কিছুটা সন্দেহের বশে যে যশোবন্তের সাহায্য ছাড়া শিবাজী পলায়ন করতে পারত না। কিন্তু সত্য যাই থাক শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অযাচিত প্রতিহিংসাস্পৃহাকে জাগিয়ে তোলা রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়নি। একেই তো তিনি আফগান শক্তির সহয়তা হারিয়েছিলেন। এবার হারালেন দুর্ধর্ষ রাজপুতদের সহায়তা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্য, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মোগলবাহিনী। রাজপুতদের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক স্থাপন করার মূলে ছিল ঔরংজেবের জঙ্গী ইসলামীয় ধর্মচেতনার দৃষ্টিকোণ যা তাঁকে আকবরের উদারনীতির থেকে যেমন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেইরকমভাবে রাজপুত-মোগল বন্ধনকেও শিথিল করে দিয়েছিল।

১খ.৪.৫ যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ

রাজপুতরা মোগলদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ে এক অভিনব কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তারা প্রথমে যুবরাজ মুয়াজ্জামকে এবং সেখানে ব্যর্থ হয়ে যুবরাজ আকবরকে উস্কানি দিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। দুর্গাদাস রাঠোরই ছিলেন এই কৌশলের প্রবক্তা। প্রথমে রাজপুতরা যুবরাজ আকবরকে বোঝাল যে তাঁর পিতা কিভাবে হিন্দুদের অত্যাচার করছেন, কিভাবে তিনি রক্ষণশীল ও আগ্রাসী ইসলাম ধর্ম পালন করে সাম্রাজ্যের কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলেছেন। যুবরাজকে বোঝান হল যে একমাত্র তিনিই পারেন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে। দুর্গাদাস রাঠোর যুবরাজকে এই বলে প্ররোচিত করেন যে, যুবরাজ যদি সম্রাট হতে চান তবে রাজপুতরা তাঁকে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে। যুবরাজ আকবরের বয়স ছিল তখন তেইশ। তিনি প্ররোচিত হয়ে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। চারজন মোল্লা ফতোয়া দিলেন যে, ঔরংজেব ইসলামীয় শরিয়ত আইন লঙঘন করেছেন। (যদুনাথ সরকারের ভাষায় "Violation of the Islamic canon law")। তাঁরাই আকবরকে সম্রাটের পোশাক পরিয়ে দেন। দুর্গাদাস রাঠোর তিরিশ হাজার রাজপুত সৈন্য নিয়ে তাঁকে সমর্থন করেন।

এই বিদ্রোহের পর ঔরংজেবের প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল যে তড়িঘড়ি করে রাজপুত যুদ্ধকে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মেবারের রাণার সঙ্গে সন্ধি করে মোগলরা জিজিয়া

আদায়ের দাবি পরিত্যাগ করল। এর বদলে রাণাকে এক বিরাট রাজ্যাংশ ছেড়ে দিতে হল। অবশ্য মাড়ওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ থামল না। তিরিশ বছর পর ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দের ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মোগলরা যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহকে মাড়ওয়ারের শাসক বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

আকবর বিদ্রোহ করেছিলেন প্রধানত রাঠোরদের সাহায্য নিয়ে। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি বিদ্রোহী যুবরাজ আজমীরে পৌঁছালেন। যদিও এক বিশাল মুসলিম রাজপুত সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বে তিনি ছিলেন, তবে তাঁর গতি ছিল মন্থর। ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে তাঁর আজমীরে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল দু সপ্তাহ। স্পষ্টতই তাঁর অটল পিতার অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বের বিরুধে লড়তে গিয়ে তিনি প্রতি পদে দ্বিধান্বিত ছিলেন। ১৫ জানুয়ারী বিকেলে যুবরাজ মুয়াজ্জম অত্যন্ত পরিশ্রমশীল জবরদস্ত দৌড় করিয়ে পিতার হেফাজতে এনে দিলেন এক বিরাট বাহিনী। নিমেষে সম্রাটের বাহিনী দ্বিগুণ হয়ে গেল। এইবার প্রথমে বাহুবল প্রয়োগ করার আগে সম্রাট মনস্তাত্ত্বিক যুধে নামলেন। এই যুদ্ধপক্রিয়া ছিল ঔরঙ্গজেবের সহজাত প্রবণতার দান। তিনি আকবরকে একটা চিঠি লিখলেন। তাতে আকবর ও তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজপুতদের পিষে ফেলার নির্মম কিন্তু সফল পরিকল্পনা করার জন্য তিনি পুত্রকে বাহবা দিলেন, তাঁর সেনানায়কত্বের প্রশংসা করলেন। এ সমস্ত কিছুই ছিল আসলে মিথ্যা। এই মিথ্যা পত্রটি সম্রাটের চক্রান্তে যথানিয়মে দুর্গাদাস রাঠোরের হাতে পৌঁছে গেল। রাজপুতরা ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করে তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মাড়ওয়ারের দিকে পলায়ন করলেন। আকবরের অনেক সেনাপতি, পদস্থ কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনী সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পণ করল। যুবরাজ কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে দ্রুত পলায়ন করলেন। ঔরংজেব যুবরাজ মুয়াজ্জমকে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুতরা সম্রাটের কৌশলকে বুঝতে পেরে যুবরাজ আকবরকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছিলেন। দুর্গাদস রাঠোর যুবরাজকে নিয়ে নানা ঘুরপথে বিপদসঙ্কুল যাত্রার মধ্য দিয়ে দক্ষিণে নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মারাঠা শাসক শম্ভুজির দরবারে উপস্থিত হন। কাফিখান—একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বলেছেন যে, যুবরাজ মুয়াজ্জম ও খান জাহান বাহাদুর ইচ্ছা করলেই যুবরাজ আকবরকে ধরতে পারত, কিন্তু বিদ্রোহী যুবরাজ সম্বন্ধে তাঁদের সহানুভূতি ছিল বলে তারা তাদের নিরাপদ দূরত্ব থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ ছিল এক স্থানসীমিত (localised) বিদ্রোহ— উত্তরাধিকারকে জোর করে আত্মসাৎ করার (to usurp) আইন বহির্ভূত ঘটনা। এইবার যুবরাজের দক্ষিণভারতে যাওয়ার ফলে এই স্থানসীমিত ঘটনা সাম্রাজ্যের একটা পূর্ণ সঙ্কটে রূপান্তরিত হল।

অনুশীলনী ১

১। নীচের বক্তব্যগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (✗) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) ঔরংজেবের রাজত্বকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ছিল।

(খ) ঔরংজেব এক সর্বধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছিলেন।

(গ) ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বছর ছিল এক সাফল্যের অধ্যায়।

(ঘ) ঔরংজেব ইসলামীয় হানাফি মতবাদের বশবর্তী হয়ে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা সচেতন ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

(ঙ) জাঠ এবং সৎনামিদের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক ছিল মধুর।

২। শিখদের আন্দোলন কি কৃষক আন্দোলন ছিল? (দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন)

৩। ঔরংজেবের সময় মোগল-আফগান যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

৪। উত্তরভারতে মোগলদের সবচেয়ে বড় সঙ্কট ছিল রাজপুত বিদ্রোহ।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। দুর্গাদাসকে ঐতিহাসিক টড (Tod) রাঠোরদের ইউলিসিস বলে বর্ণনা করেছেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) মেবারের রাণা রাজসিংহের বীরত্বের জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁকে গ্রীক ইতিহাসের থার্মোপাইলি যুদ্ধের নায়ক—এর সঙ্গে তুলনা করেন।

(খ) মোগলদের সঙ্গে রাঠোরদের যুদ্ধ চলেছিল প্রায়——বছর।

(গ) রাজপুতদের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক স্থাপন করার মূলে ছিল——জঙ্গী——ধর্মচেতনার দৃষ্টিকোণ।

১খ.৫ দক্ষিণভারত : ঔরংজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধ (১৬৮১-১৭০৭ খ্রিঃ)

১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী পুত্র যুবরাজ আকবরকে তাড়া করে সম্রাট ঔরংজেব দক্ষিণভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি যখন দক্ষিণভারতের দিকে পা বাড়ালেন তখন অদৃশ্য নিয়তির তাড়নায় প্রকৃত অর্থেই তিনি তাঁর সম্ভাব্য কবরের দিকেই পা বাড়িয়েছিলেন। এর আগে যুবরাজ থাকাকালীন

প্রায় দশবছর তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসক (viceroy) ছিলেন। তখন তিনি দক্ষিণভারতকে জয় করার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতিকে কার্যকরী করে এক আসন্ন সাফল্য-প্রাপ্তির মুহূর্তে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাজকে অসম্পূর্ণ রেখে তাঁকে উত্তরভারতে চলে যেতে হয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য। ১৬৫৭ থেকে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরভারতে থাকার ফলে গোলকোণ্ডা, বিজাপুর ও শিবাজীর অধীনে মারাঠা রাজ্য নিজেদের কিছুটা স্থিতিশীল করতে পেরেছিল। বিশেষ করে শিবাজীর রাজ্যজয় অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল ঔরংজেবের দক্ষিণভারতে অনুপস্থিতির ফলে। কারণ সিংহাসনের দাবিদার হিসাবে লড়াই করার জন্য ঔরংজেব দক্ষিণভারতের তার সমস্ত শক্তিশালী সৈন্যকে উত্তরভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন ফলে দক্ষিণে একটা সামরিক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। শিবাজী সেই সুযোগ নিয়েছিলেন।

১খ.৫.১ ঔরংজেবকে দক্ষিণভারতে যেতে হল কেন?

উত্তরভারতে রাজপুত বিদ্রোহের অনুষঙ্গে দেখা দিয়েছিল যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ। এই আকবর যখন দক্ষিণভারতে গিয়ে মারাঠাদের কোলে ঢলে পড়লেন তখন মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্কট বিরাট আকার ধারণ করল। আজমীরের মরুভূমিতে যখন আকবর তাঁর পিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁর পেছনে ছিল বিশাল রাজপুত এবং রাজপুতদের মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমর্থন। ঔরংজেবের সিংহাসনচ্যুতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এবার আকবর গেলেন দক্ষিণে, বসলেন মারাঠা ছায়াছত্রের নীচে আর তার সঙ্গে ছিল দুর্গাদাস রাঠোরের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ রাজপুত সমর্থন। তিনি ইশারা করলেই মোগল আক্রমণে জর্জরিত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মোগল-বিরোধী মুসলিম রাজ্যগুলি নেচে উঠতে পারত। রিচার্ডস বলেছেন যে, তৈমুরবংশীয় যুবরাজ হিসাবে আকবরের আকর্ষণ (“charisma”) কম ছিল না। তাঁকে কেন্দ্র করে একটা প্রতিপক্ষ মোগল শক্তি জেগে উঠতে পারত দক্ষিণে। বিশেষ করে গোলকোণ্ডার শাসনের হাল ধরেছিলেন দুই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি, জাঠ-মারাঠাদের অসি, আর মুসলিম শাসকদের অর্থ যদি ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটাতে পারত তাহলে বিপদ সম্রাটের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারত। উত্তরভারতে রাজপুতরা গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। গেরিলা যুদ্ধে অপটু মন্থর মোগলবাহিনী তাদের শায়েস্তা করতে পারেনি। এদিকে দক্ষিণে মারাঠারা লঘু অশ্ব (light horse) ও দ্রুত সঞ্চারের (quick mobility) রণনীতি নিয়ে অকস্মাৎ এত সাফল্য পেতে শুরু করেছিল যে তাদের গতিবিধি দেখে মোগলবাহিনী স্তম্ভিত হয়ে পড়ছিল। দীর্ঘদিন ধরে মন্দির ভাঙ্গার রাজনীতিতে হিন্দুরা যে আশঙ্কিত হয়েছিল তা সম্রাটের অজানা ছিল না। ঔরংজেবের অনুসৃত রক্ষণশীল নীতির বিরোধিতা করে হিন্দুরা তাঁকে **জিরিয়া** কর তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। সম্রাট তা শোনেননি। সম্রাটের এই রক্ষণশীল আগ্রাসী ইসলামের বিরোধিতা করেই আকবর মাথা তুলেছিলেন। এইসব আশঙ্কা হল যে দক্ষিণের শিয়া মুসলমানরা বিশেষ করে শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলিকে এই সদ্য জেগে ওঠা হিন্দুদের মদত দেয় তাহলে সাম্রাজ্যকে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বিপুল পরিমাণ আফগান সৈন্য ছিল। সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিমে আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সম্রাট ভারতবর্ষের আফগানদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। দক্ষিণে একটা নতুন আফগান প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। বিশেষ করে ভারতবর্ষে আফগানদের মোগল-বিরোধিতা রাজনৈতিক সংস্কৃতির আর ঐতিহ্যের মধ্যেই ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা দক্ষিণভারতে লড়াই করতে গিয়ে সম্রাট লড়াই করবেন কাদের নিয়ে? রাজপুত ও আফগানদের তিনি দূরে ঠেলে দিয়েছেন, দক্ষিণাত্যের মোগল শাসকদের ওপর তিনি আস্থা হারিয়েছেন এবং সেখানে মোগলবাহিনীর অকর্মণ্যতা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। বার্ণিয়ে একজন বহিরাগত পর্যটক হয়েও বুঝতে

পেরেছিলেন যে, দক্ষিণে মোগলবাহিনীর কতখানি ঘুণ ধরে গেছে। তিনি লিখেছেন যে, মোগলবাহিনী প্রত্যেকটি সামরিক সঞ্চালনকে (operation) আলস্যের সঙ্গে গ্রহণ করত যাতে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ দীর্ঘস্থায়ী হলেই যুদ্ধ থেকে তাদের ফায়দা আসত আর যোদ্ধা হিসাবে তাদের মর্যাদা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত। অর্থাৎ ব্যাপারটা ছিল এইরকম যে হিন্দুস্তানের অর্থাৎ উত্তরভারতের সৈনিকদের রুজিরোজগার হত দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে। ফ্রায়ার (Fryer) লিখেছেন যে, উত্তরভারতের **ওমরাহদের [আমীর** শব্দের বহুবচন] আলস্যের জন্য ঔরংজেবের সমস্ত লড়াই ব্যর্থ হত। প্রত্যেক আমীরের একটাই কথা ছিল—"সৈনিকের রুটি আসবে দাক্ষিণাত্য থেকে" ("they term the Deccan the bread of the military men")।

এইরকম পরিস্থিতিতে ঔরংজেব স্থির করলেন যে, তিনি নিজেই দাক্ষিণাত্য যাবেন। হয়ত সম্রাটের উপস্থিতি অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ দমন, দক্ষিণী সুলতানৎগুলির বিজয় এবং মারাঠাদের ঔদ্ধত্যের বিনাশ ঘটানো—এই তিন লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলেন।

১খ.৫.২ বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা বিজয়

১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যাত্রা করে নভেম্বর মাসে ঔরংজেব বুরহানপুরে পৌঁছান। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঔরঙ্গাবাদে যান এবং ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে আহমদনগরে সম্রাটের ছাউনি (pitched camp) বিছানো হয়। এরকম এক-একটা অভিযানে ছাউনি বিছিয়ে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে বসতি গড়ে তোলা হত সম্রাট, তার পরিবার, পরিষদ ও সেনাবাহিনীর জন্য। আহমদনগরের এইরকম এক ছাউনি থেকে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শোলাপুর (Sholapur) যাত্রা করেন। সেখানে মারাঠাদের বিরুদ্ধে কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অভিযান চালিয়ে এবং যুবরাজ আকবরকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে সম্রাট নষ্ট করলেন দু বছরের সময়, আর তার সাথে অনেক অর্থ ও মানবসম্পদ। এবার তাঁর অর্থ পূরণের দরকার ছিল,—দরকার ছিল নষ্ট সম্মান পুনরুদ্ধারের। তাছাড়া সম্রাট হওয়ার আগে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা বিজয়ের যে কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখেছিলেন তার পরিসমাপ্তিরও দরকার ছিল। ঔরংজেব খুব সঙ্কল্পবদ্ধ মানুষ ছিলেন। যে লক্ষ্য একবার স্থির করতেন তা যতই দূরে সরে যাক তার পিছনে একাগ্রচিত্ত মানুষের মত তাঁর সমস্ত শক্তি ও অভিলাষকে নিয়োগ করতেন। গোলকোণ্ডা বিজয়ের ভার তিনি দিয়েছিলেন যুবরাজ মুয়াজ্জমের ওপর কিন্তু তিনি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করলেন। যুবরাজের এই কাজ মোগলরা সরকারিভাবে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট তাকে স্বীকার করেননি।

১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ মুয়াজ্জমের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী শাসনের সঙ্গে মোকাবিলা করার। সেই বছরই যুবরাজ আজম এবং যুবরাজ শাহ আমলের নেতৃত্বে ৮০,০০০ সৈন্য দিয়ে সম্রাটের নির্দেশে মোগলরা বিজাপুর শহর ও দুর্গ অবরোধ করে। ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে বিজাপুরের তরুণ সুলতান সিকন্দর আদিল শাহ অবরোধের মধ্যে থেকেও দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন। কিন্তু অবরোধ নীতিতে মোগলবাহিনী ছিল দক্ষ। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বিনষ্ট শস্যক্ষেত্রে প্রায় অনশন ও মহামারীকে সহ্য করেও যখন মোগলবাহিনী অবরোধ তুলল না তখন দেখা গেল আদিলশাহী প্রতিরোধও স্তিমিত হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিকন্দর আদিল শাহ আত্মসমর্পণ করেন। বিজাপুরকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিকন্দর শাহকে কারাগারে বন্দী করা হয়। সেখানে পনের বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। বিজাপুরের আফগান ও ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মোগল সম্ভ্রান্তদের (nobility) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিজাপুর শহর শ্মশানে পরিণত হয়। সম্রাট সেখানে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তা, একজন

দেওয়ান, কয়েকজন **ফোজদার ও কিল্লাদার** নিয়োগ করলেন। উলেমারা ঔরংজেবকে প্রশ্ন করেছিল যে একজন ধর্মভীরু মুসলমান হয়ে কোন অপরাধে তিনি আরেকজন মুসলমান শাসককে শাস্তি দিলেন। ঔরংজেব উত্তর দিয়েছিলেন যে, কাফেরদের (মারাঠাদের) সাহায্য করার অপরাধে।

ঔরংজেব মনে করতেন যে, এই একই অপরাধ করেছিল গোলকোণ্ডা। আবুল হাসান কুতুবশাহ (১৬৭২-৮৭) আকন্না ও মদন্না নামক জনৈক ব্রাহ্মণদ্বয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং শম্ভুজীকে অর্থদান করেছিলেন। মদন্না ছিলেন মারাঠাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আবার বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের সঙ্গে গোলকোণ্ডার কুতুবশাহী শাসকের যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল যা সম্রাট ভাল চোখে দেখেননি। বিজাপুর-গোলকোণ্ডা-মারাঠা সংযোগ দক্ষিণভারতে মোগল স্বার্থের অন্তরায় এটি সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন। তাছাড়া গোলকোণ্ডার ধন প্রজন্ম পরম্পরায় রক্ষিত ছিল। সেই ঐশ্বর্যকে লুঠ করার বাসনাও সম্রাটের মনে দীর্ঘদিন ধরে জেগেছিল।

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সম্রাট গোলকোণ্ডার সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। গোলকোণ্ডা অবরুদ্ধ হল। গোলকোণ্ডার সুলতান এক বিরাট প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। আব্দুর রজ্জাক (Abdur Razzak) নামে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন এই প্রতিরোধের নায়ক। এই প্রতিরোধকে ভাঙ্গার জন্য মোগলবাহিনী সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছিল—জমিতে মাইন পুঁতে রাখা, গোলাবর্ষণ করা, দেওয়াল টপকে দুর্গে প্রবেশ করা (escalads) সবই। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঔরংজেব চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন যা প্রায়ই তিনি নিয়ে থাকতেন। দুর্গের রক্ষীবাহিনীকে ঘুষ আর উপঢৌকন দিয়ে তিনি বশ করলেন। বিশ্বাসঘাতকরা গোলকোণ্ডা দুর্গের দরজা খুলে দিল। আব্দুর রজ্জাক অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পতিত হ'লেন। ঔরংজেব তাঁর বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সযত্নে তাঁর চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তোলেন এবং তাঁকে মোগল শানব্যবস্থায় উচ্চপদ দান করেন। কাফি খাঁ বলেছেন যে, ঔরংজেব বন্দী সুলতানকে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং দৌলতাবাদ দুর্গে 'প্রয়োজনীয় বৃত্তি' (suitable allowance) দিয়ে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোলকোণ্ডার পতনের সঙ্গে সঙ্গে কুতুবশালী শাসনের অবসান হয়।

১খ.৫.৩ দাক্ষিণাত্য-বিজয় কি ভ্রান্ত হয়েছিল?

১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান যখন দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হলেন তখন দক্ষিণের সুরতানৎগুলির ধারণা হয়েছিল যে, তাদের ধ্বংস করে সেখানে সরাসরি মোগল শাসন কায়েম করা হবে। কিন্তু শাহজাহান তা করেননি। তিনি বিজাপুর ও গোলকোণ্ডাকে শুধু করদ রাজ্যে (tributary states) পরিণত করেন এবং তাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করেন। ঔরংজেব সরাসরি এই রাজ্যগুলিকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন যার ফলে দক্ষিণের স্বাধীন মুসলিম সুলতানৎগুলির অবসান হল। এই বিজয়ের জন্য ঔরংজেব ধ্বংস করেছিলেন বিপুল অর্থ, বিশাল মানবসম্পদ আর সৈন্যবাহিনীর পদচারণায় নষ্ট হয়েছিল বিপুল শস্যভাণ্ডার। গোলকোণ্ডা অবরোধের সময়ে বিপুল মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট ঐশ্বর্যও লুঠ করেছিলেন অনেক। শুধু গোলকোণ্ডার থেকে ৭০ কোটি টাকা (70 milion rupees), প্রায় অন্তহীন মণিমুক্ত, সোনা-রূপার বাসন এবং ২ কোটি ৮৭ লক্ষ (2,87,00,000) টাকার পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব তিনি পেয়েছিলেন। আর তিরিশ বছর ধরে দক্ষিণ বিজয়ের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের সার্থকতাও তিনি পেয়েছিলেন।

এই অপর্যাপ্ত লাভ ছিল শেষ পর্যন্ত বড়ই আপাতলাভ। এর অন্তরালে ক্ষত যা হয়েছিল তার নিরাময় সম্ভব ছিল না। দক্ষিণের সুলতানৎগুলি ছিল উত্তরের মারাঠা আর দক্ষিণের প্রসারশীল মোগল শাসনের মধ্যে

বাফার অঞ্চল (Buffer region) যা দক্ষিণের সমস্ত অরাজকতাকে শোষণ করে মোগল সীমান্তকে রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত করতে পারত। উত্তরে ক্ষিপ্ত জাঠ, বৈরী রাজপুত ও আগ্রাসী মারাঠারা যখন একটু হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে দানা বাঁধানোর চেষ্টা করছে তখন একটি মুসলিম শক্তি হিসাবে অপর দুটি মুসলিম শক্তির বিরোধিতা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি। দক্ষিণের সুলতানৎগুলি ভেঙ্গে গেলে বিপুল পরিমাণ সৈন্যবাহিনী কর্মহীন হয়ে পড়ে। তারাই গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান উপদ্রব হিসাবে জীবন ছারখার করতে শুরু করে। বিপুল সংখ্যক পদস্থ মানুষ ও সম্ভ্রান্তরা কর্মহীন হয়ে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রটি হারিয়ে ফেলে। এতে সমাজজীবনে নেমে আসে অসন্তোষ ও মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। আঞ্চলিক সুলতানৎগুলি মারাঠাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। দূরাগত মোগল শক্তির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সেকথা সম্রাটের জীবদ্দশাতেই বারবার প্রতিপন্ন হয়েছিল। এ তথ্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সম্রাট বুঝতে পারেননি। মারাঠাদের শক্তি এক আকার ধারণ করেছে তা আত্মমদমত্ত সম্রাটের চোখে ধরা পড়েনি। দক্ষিণের থেকে সম্ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত করে মনসবদার করা হয়েছিল। এমনিতেই মোগল **মনসবদারদের** মধ্যে সুসামঞ্জস্য (homogeneity) ছিল না। এবার বৈষম্য ও বৈসাদৃশ্য গেল বেড়ে। **মনসবদের** সংখ্যা বাড়ল, অনেক বেশি **জাগিরের** দাবী উঠল, আর তা নিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের ভেতর দ্বন্দ্ব ও বৈরিতার বিষ ছড়াতে লাগল। বিজাপুর আর গোলকোণ্ডা জয় করে সাম্রাজ্যের সীমানা বেড়েছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের সংহতি ও আভ্যন্তরিক শক্তির ক্ষয় হয়েছিল। এইটিকেই ভিনসেন্ট স্মিথ ''impolicy of conquest'' বলে চিহ্নিত করেছেন।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু সে উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়নি। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আকবর ইরাণ যাত্রা করেন। আর তিনি ভারতবর্ষে ফেরেননি। দুর্বিনীত পুত্রকে শাস্তি দিতে না পারলেও ঔরংজেব সাত বছরে দক্ষিণের প্রায় সব শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন—একথা লিখেছেন রিজভি। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। ঔরংজেব সেই সুযোগে দক্ষিণে গিয়ে মারাঠাদের দমন করতে চেয়েছিলেন। সাত বছরে মারাঠাদের অনেক ক্ষতি করলেও তারা নিশ্চিহ্ন হয়নি। রিজভির মতে সমস্যা ছিল ছোট—জিঞ্জিতে রাজারামের নেতৃত্বে মারাঠারা একজায়গায় আবদ্ধ ('concentrated') হয়েছিল। আর বিজাপুর, গোলকোণ্ডার বিজয়কে সংহত করার (consolidation) যে সমস্যা তা এখন প্রায় প্রাদেশিক সমস্যার মতন ছিল। একথা বুঝতে পেরে সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁ (Asad Khan) সম্রাটকে উত্তরভারতে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন, তাঁর ধারণা ছিল সম্রাট চলে গেলে দক্ষিণভারতের ক্ষতের ওপর প্রলেপ পড়বে। সম্রাট সে পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেন। তিনি তখনও মারাঠাদের নির্মূল করার স্বপ্ন দেখছিলেন। মারাঠা গেরিলাদের শক্তি তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন যে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তিনি তাঁর আগ্রাসী নীতি চালিয়ে মারাঠাদের নানাবিধ আক্রমণের মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিতে পারবেন। আত্মগরিমায় অন্ধ থাকায় যুগশক্তিকে তিনি বুঝতে পারেননি। উত্তরভারতে ফিরে যাওয়ার শেষ সুযোগ তিনি হারিয়েছিলেন। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার লুঠের সম্পদ তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালানোর বিপুল খরচের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের সাময়িক যোগান দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর শেষ পর্বের লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপরিমেয় ভাণ্ডার তাঁর ছিল না। দাক্ষিণাত্য ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের ক্ষত (Deccan ulcer)। ''স্পেনের ক্ষত' (Spanish ulcer) যেমন নেপোলিয়নকে রসাতলে পাঠিয়েছিল সেইরকম দাক্ষিণাত্যের ক্ষত মোগল বিনাশের কারণ হয়েছিল।

অনুশীলনী ২

১। ঔরংজেবকে কেন দক্ষিণভারতে যেতে হয়েছিল? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

২। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিকে কেন দাক্ষিণাত্য ক্ষত বলা হয়? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

৪। উত্তরভারতে সৈনিকদের রুজিরোজগার হতো দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে।

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। গোলকোণ্ডার প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন আব্দুর রজ্জাক নামে এক দুর্ধর্ষ সেনাপতি।

হ্যাঁ ☐ না ☐

১খ.৬ মারাঠাদের উত্থান : শিবাজীর নেতৃত্বে নতুন সাম্রাজ্যের সৃষ্টি :মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্ব

ঔরংজেব সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক নতুন প্রতিরোধ দক্ষিণভারতে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। এই প্রতিরোধ দিয়েছিল মারাঠারা। তাদের নেতা ছিলেন শিবাজী ভোঁসলে (Shivaji Bhonsle) [১৬২৭-১৬৮০]—পৃথিবীর ইতিহাসে তরুণতম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তিনি পিতা শাহজী ভোঁসলে ও মাতা জিজাবাই-এর দ্বিতীয় পুত্র। শাহজী ছিলেন আহমদনগর সুলতানদের (Sultanate) অধীনে একজন মারাঠা সেনানায়ক ও উচ্চরাজকর্মচারী। তাঁর স্ত্রী জিজাবাই ছিলেন একই সুলতানাতের কর্মচারী এক সম্ভ্রান্ত মারাঠা নায়কের কন্যা। আহমদনগর সুলতানৎ মোগলরা গ্রাস করে নেওয়ার পর শাহজী বিজাপুর সুলতানতের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং **জাগির** লাভ করেন।

শিবাজী বিজাপুরের সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতির অন্তর্লীন পারসিক আদব-কায়দায় মানুষ হননি। তিনি মানুষ হয়েছিলেন পশ্চিমঘাট পর্বতের কোলে পুনার দেশীয় ও একান্তভাবে চিরায়ত ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে—মায়ের নিশ্চিন্ত ও নিবিড় আশ্রয়ে। ফলে দরবারি আদবের দ্বারা তিনি কখনো আড়ষ্ট হননি। ছোটবেলা থেকে স্বাধীন বিচরণের ফলে পর্বতের অলিগলি চিনেছিলেন, স্বায়ত্তশাসনে রাখতে পেরেছিলেন তাঁর স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙক্ষাকে, আর মাওয়ালি নামে একদল রুক্ষ, কঠিন, দুর্দান্ত পার্বত্য মানুষদের নিয়ে নিজের দল গড়তে পেরেছিলেন।

এই দল নিয়েই আঠারো বছর বয়সে তাঁর অনুপস্থিত (Absentee) পিতার **জাগির** নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এর পরেই উনিশ বছর বয়সে তিনি পুনার দক্ষিণ-পশ্চিমে কুড়ি মাইল দূরে তোরণা নামক পার্বত্য দুর্গটি অধিকার করেন। এইবার এই অভূতপূর্ব নেতৃত্বে আকৃষ্ট হলেন মহারাষ্ট্রের দু ধরনের উচ্চাকাঙক্ষী মানুষ যাদের উচ্চাকাঙক্ষা চরিতার্থতার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এসেছিল—তারা হল মারাঠা যোদ্ধশ্রেণীর মানুষ ও শিক্ষিত মারাঠা ব্রাহ্মণরা। একটি ছোট রাজ্যের ভ্রূণ এইভাবে তৈরি হয়ে গেল দাক্ষিণাত্যে।

১খ.৬.১ শিবাজীর উত্থানের প্রথম পর্যায় : ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

উদীয়মান রাজ্যবিজেতা শিবাজীর কাজ সহজ হয়েছিল তিনটি কারণে। প্রথমত দাক্ষিণাত্যের সুবেদার যুবরাজ ঔরংজেব ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন নিয়ে লড়াই-এর জন্য উত্তরভারতে চলে যান। তিনি এরপর প্রায় পঁচিশ বছর আর দক্ষিণে ফেরেননি। তিনি উত্তরে যাওয়ার সময়ে সমস্ত শক্তিশালী মোগল যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে দাক্ষিণাত্যে পাহারাদার মোগলবাহিনী নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে বিজাপুর রাজ্যটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একটি ক্ষয়িষ্ণু সুলতানতের জীর্ণ কাঠামোকে ভেদ করা শিবাজীর মতো উদ্যোগী, স্বপ্নাবিষ্ট, ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে কঠিন ছিল না। ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর প্রায় এক দশক তিনি শক্ত হাতে রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম ছিলেন। শিবাজী এই সুযোগ নিয়ে ১৬০৫-এর দশকের শেষের দিকে বিজাপুরের সুলতানের অধীনতাকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, শিবাজীর অনুচর মাওয়ালি নামে পার্বত্য উপজাতির মানুষরা পাহাড়ের গোপন পথ, ঘাঁটি গাড়ার জঙ্গল, জলাশয়, উৎরাই-চড়াই সব জানত। তারা কাঠ ও বাঁশের কাজে ছিল পরম্পরাগতভাবে দক্ষ। আর স্বভাবে ছিল তারা কষ্টসহিষ্ণু-রুক্ষ। এই জ্ঞান ও দক্ষতাকে শিবাজী একটি সম্মিলিত শক্তি হিসাবে মোগলদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন।

এইরকম প্রায় প্রতিরোধহীন পরিবেশে এক দুর্বার মানবগোষ্ঠী ও দুর্দান্ত আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে শিবাজী একের পর এক দুর্গ দখল করে নেন। তারপর তাঁর নজর পড়ে কোঙ্কনের দিকে। কোঙ্কন ছিল পশ্চিমঘাট পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে এক সমতলভূমি। সেইখানে কল্যাণ নামক স্থান তিনি দখল করেন। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে জাওলির (Jaoli) রাজাকে হত্যা করে তার রাজ্য তিনি অধিকার করে নেন। এইবার তিনি বিজাপুরের সুলতানকে অস্বীকার করে সম্রাটকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে বিজাপুরি জেলা উত্তর কোঙ্কনের শাসকরূপে স্বীকার করে নেওয়া হোক।

১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের একটি বিজাপুরি **ফরমানে** স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, 'শিবাজীরাজ' সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করেছেন ('Shivaji Raje had turne disloyal to the Shah')। ১৬৬০-এর দশকের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, শিবাজীর নিয়ন্ত্রণে ছিল ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০,০০০ পদাতিক বাহিনী। কি করে এই বিপুল বাহিনী তাঁর অধীনে এল? সেই সময়ে দক্ষিণী সুলতানৎগুলি এবং এমনকি মোগল শাসকরাও অনেক সময়ে সৈন্যদের অর্থ বকেয়া রেখে দিত। ফলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা ভাগ্যান্বেষী ভাড়াটে (mercenary) সৈন্য তারা নগদ বেতন যারা দিতে পারত তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করত। এইরকম ভাড়াটে বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সঙ্কল্পবদ্ধ মারাঠা যোদ্ধৃশ্রেণীর পরাক্রম ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সাজানো প্রশাসন। শিবাজীর রসদ অর্জনের প্রাথমিক উপায় ছিল লুঠ—সরকারি রাজস্ব, শত্রুশাসিত অঞ্চলের সম্পদ ও পরাজিত শত্রুসৈনিকের ফেলে যাওয়া অস্ত্রসম্ভার। এর পরের উপায় ছিল কর প্রতিষ্ঠা—বিজিত রাজ্যের ওপর কর স্থাপন করে নিয়মিত অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করা। উর্বর কোঙ্কন অঞ্চল ছিল তার রাজস্ব ও শস্য ভাণ্ডার। এরপরে যখন তিনি কল্যাণ অধিকার করলেন তখন একটা ঐশ্বর্যশালী বাণিজ্য শহর তাঁর হাতে এল। তিনি বিতাড়িত করলেন তাঁর বিজিত রাজ্যের বিজাপুরি **জাগিরদারদের,** আর তাদের রাজস্ব আর ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে নিলেন। কোঙ্কন জয় করার পর সমুদ্রে যাওয়ার পথ তাঁর সামনে খুলে গেল। তখন তিনি কিছু জাহাজ জোগাড় করলেন। এই জাহাজ দিয়ে কখনো আরবসাগরে জলদস্যুতা কখনও বা পারস্য উপসাগর বা লোহিত সাগরে বাণিজ্যের কাজে তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের তিনি প্রেরণ করতেন। এইভাবে যে বিপুল ধনভাণ্ডার তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তা দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সৈন্যবাহিনী ও রাজগড় নামক স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী এবং নির্মাণ করেছিলেন প্রতাপগড় নামক এক পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর আরাধ্য দেবী ভবানীর মন্দির। ক্ষমতা অর্জনের পর থেকেই তিনি বন্দুক, কামান, গোলাগুলি, নৌ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র ও কারিগরি সাহায্যের জন্য পর্তুগিজ ও ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা করতেন।

এইভাবে ক্ষয়িষ্ণু সুলতানৎগুলির পাশে হঠাৎ করে শিবাজী জাগিয়ে তুললেন এক তরুণ রাজ্য—উদ্যোগী শাসনের নিয়ন্ত্রণে বলশালী, সঙ্কল্পবদ্ধ অনুচরদের তৎপরতায় প্রসারশীল এবং চতুর ব্রাহ্মণদের পরিচালনায় সংহত। এই রাজ্যকে দমন করার জন্য প্রথম বড় প্রয়াস গ্রহণ করা হয় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে)। ঔরংজেব তখনও তাঁর সিংহাসনের জন্য লড়াই শেষ করেননি। বিজাপুরের নতুন সুলতান আলি আদিল শাহ তাঁর অতি দক্ষ ও অনুগত সেনাপতি আফজল খাঁকে ১০,০০০ সৈন্য দিয়ে শিবাজীকে দমন করতে প্রেরণ করলেন। এই অভিযান অনেকটাই ঔরংজেবের অভিযানের রূপ নিয়েছিল। পথপার্শ্বের মন্দির ধ্বংস করে, তুলজাপুরের (Tuljapur) ভবানী মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে এ অভিযান অগ্রসর হয়েছিল। অতএব এই অভিযান সম্পর্কে শিবাজী প্রথম থেকেই সতর্ক ছিলেন। ফলে আফজল খাঁর অনুরোধে তিনি যখন আলাপ-আলোচনার জন্য বিজাপুরি সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন তখন অতর্কিত আক্রমণের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাই যখন আলিঙ্গন করার ছলে আফজল খাঁ তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার চেষ্টা করলেন তখন এই সতর্ক মারাঠা সাম্রাজ্য বিজেতা তাঁর লুকিয়ে রাখা 'বাঘ নখ' (লোহার তীক্ষ্ণ নখ) দিয়ে আফজলের

উদর ছিন্ন করে দেন। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্কেত পেয়ে লুকিয়ে থাকা মারাঠাবাহিনী বিজাপুরি সেনাপতির দেহরক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইভাবে কৌশলগত উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা শিবাজী বিজাপুরি অভিযানকে পরাস্ত করেন। পরাজিত বিজাপুরিদের কাছ থেকে মারাঠারা ৪,০০০ অশ্ব দখল করে নেয়।

১খ.৬.২ শিবাজীর উত্থানের দ্বিতীয় পর্যায় (১৬৬০-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

বিজাপুরি সৈন্যবাহিনীর এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর মোগলরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের এই 'দ্রুতগামী শত্রুকে' ('Swiftly moving foe') সহজে পরাজিত করা যাবে না। তাই আর কালক্ষেপ না করে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেব তাঁর মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন শিবাজীকে দমন করার জন্য। বর্ষার মুখোমুখি শায়েস্তা খাঁ যখন মারাঠাদের দ্রুত চলাফেরার সঙ্গে তাল রাখতে পারলেন না তখন কিছু প্রাথমিক ছোটখাটো সাফল্যের পর তিনি পুণায় বর্ষাকালটা কাটানোর জন্য মনস্থির করলেন। শিবাজীর ছিল গেরিলা লড়াই। তাই তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক কাজ করা ছিল খুব কঠিন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক দুঃসাহসী নৈশ অভিযান করে শিবাজী অল্পকিছু বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে শায়েস্তা খাঁর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। শত্রুকে অপ্রস্তুত মুহূর্তে আটকে ফেলার রণকৌশল প্রথম থেকেই শিবাজী আয়ত্ত করেছিলেন। ভারী সরঞ্জাম ব্যবহার করা মোগলবাহিনী ছিল চলাফেরায় মন্থর। তাই শিবাজীর আক্রমণের মোকাবিলা করা শায়েস্তা খাঁর সম্ভব হয়নি। তিনি কোনক্রমে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। তাঁকে হারাতে হয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমেত হাতের তিনটি আঙ্গুল। তাঁর পুত্রও নিহত হয়। ঔরংজেব অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শায়েস্তা খাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন সেখানকার **সুবেদার** করে। কিন্তু তাঁর দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করার আগেই ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১৭ থেকে ২১ তারিখ শিবাজী সুরাট নামক বন্দর নগরটি লুঠ করেন। মাত্র ৪০০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দুই লক্ষ মানুষের বসতি এই শহরটি আক্রমণ করলে সেখানকার মোগল **সুবেদার** পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। ফলে বাহারজী বোরার মত অত্যন্ত ধনী ইসমেইলি (Ismaili) বণিকের কুঠীও মারাঠারা লুঠ করে। এক কোটি টাকার অধিক নগদ অর্থ ও বিপুল পরিমাণ সোনারূপা ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে মারাঠারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এর পরেই মারাঠারা মক্কাযাত্রীদের জাহাজ লুঠ করে এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজধানী ঔরঙ্গাবাদের চারপাশের বসতিকে ছারখার করে অপরিমিত ঐশ্বর্য নিয়ে চম্পট দেয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের মুখোমুখি মোগল প্রতিরোধ ছত্রখান হয়ে যায়। মারাঠারা এর পর বিজাপুরের একটি আক্রমণও প্রতিহত করে।

শক্তিশালী মোগলবাহিনী নিয়ে কেন শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে পারলেন না তার উত্তর সমকালীন লেখক কাফি খাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। পরাজিত মোগলদের প্রতি সমবেদনা নিয়ে তাদের শত্রু শিবাজী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "দুঃসাহসী লুঠেরা শিবাজী তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিলেন যে যেখানেই আমীর-উল-উমারার মালপত্র দেখবে সেখানেই তা লুঠ করবে। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমীর [শায়েস্তা খাঁ] তাঁর দক্ষ সেনাপতিদের অধীনে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে মারাঠাদের দমন করতে প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রত্যেক দিন, মোগলবাহিনীর প্রত্যেক অগ্রযাত্রায় (march) শিবাজীর দক্ষিণীরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের মালপত্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কশাকদের [Cossacks—দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ার একটি উপজাতি] তারা ঘোড়া, উট, মানুষ যাকে ধরতে পারত তা নিয়ে পলায়ন করত।" এই ধরনের গেরিলা যুদ্ধ ঠেকানোর পদ্ধতি মোগলদের জানা ছিল না।

ঔরংজেব অবশ্য মনে করতেন যে, মোগল শিবিরে বিশ্বাসঘাতকতা ঘটেছে তা না হলে অত বিশাল বাহিনী নিয়ে মোগলরা কেন মারাঠাদের ঘিরে ফেলতে পারল না। শায়েস্তা খাঁর পরাজয়কে মোগলদের

নিঃসীম অপমান ধরে নিয়ে তিনি শায়েস্তা খাঁর স্থানে যুবরাজ মুয়াজ্জমকে দাক্ষিণাত্যের **সুবেদার** নিযুক্ত করলেন। আর যুবরাজের সঙ্গে দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি জয়পুরের রাজা মির্জারাজা জয়সিংহ কচ্ছোয়াকে। ঔরংজেব মনে করতেন যে, বিজাপুরের কাছ থেকে শিবাজী মোগল-বিরোধী উস্কানি পেয়েছে এবং মোগল সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ রাঠোরের কাছ থেকে পেয়েছে গোপন প্রশ্রয়। তাই মির্জারাজা জয়সিংহের ওপর হুকুম হল যশোবন্ত সিংহের স্থলাভিষিক্ত হয়ে একদিকে মারাঠাদের দমন করতে এবং অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিজাপুর দখল করে নিতে।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে জয়সিংহ—তখন তাঁর ষাট বছর বয়স—বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুণায় উপস্থিত হলেন এবং যশোবন্ত সিংহ রাঠোরের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলেন। এরপর শিবাজীকে দমন করার জন্য তিনি চারটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এক, তিনি বিজাপুরের সুলতানকে জানিয়ে দিলেন যে, শিবাজীর সাথে হাত মিলিয়ে মোগল-বিরোধিতা করলে পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। দুই, পশ্চিমের সমুদ্র-উপকূলের বিদেশি ঘাঁটিগুলিকে সতর্ক করে দিলেন যে, তাদের সহায়তায় শিবাজীর নৌবহর যেন কার্যকরী না হতে পারে। তিন, শিবাজীর কাজে যে সব মারাঠা দেশমুখ বিরক্ত হয়েছিলেন তাদের কাছে ব্রাহ্মণদের দূতরূপে প্রেরণ করে বলা হল যে, তারা মোগলদের সহায়তা করলে তাদের নানাবিধ পুরস্কার দেওয়া হবে। পদ, অর্থ, মর্যাদা, জমি, খেতাব ইত্যাদির লোভে অনেক মারাঠা দেশমুখ মোগলদের সাহায্য করেছিল।

এইভাবে শিবাজীকে কূটনৈতিক তৎপরতার দ্বারা ঘিরে ফেলার পরই জয়সিংহ চতুর্থ পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন। তিনি বিরাট সৈন্য নিয়ে পুরন্দর দুর্গটি অবরোধ করেন। মোগল অবরোধের যে রণকৌশল তা এখানেও প্রয়োগ করা হয়। গ্রামাঞ্চল ধ্বংস করা হয়, শস্যক্ষেত্র ছারখার করা হয় এবং অবাধ লুঠের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। দু মাস প্রতিরোধের পর বাধ্য হয়ে শিবাজী আত্মসমর্পণ করেন।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে শিবাজীর সঙ্গে মোগলদের চুক্তি সম্পাদিত হয়। একে বলা হয় পুরন্দরের চুক্তি। শিবাজী ২৩টি দুর্গ ও বিস্তীর্ণ রাজ্যাংশ মোগলদের প্রত্যর্পণ করেন, নিজের হাতে রেখে দেন ১২টি দুর্গ এবং তাঁর নিজস্ব রাজ্য ও **ওয়াতান** [পিতৃপুরুষের জমি]। তিনি হলেন মোগলদের **'ভ্যাসাল'**—অধস্তন আঞ্চলিক করদ প্রধান। তবে অন্যান্য **মনসবদারদের** মত সশরীরে মোগল শাসকের সামরিক সেবা করার দায়িত্ব থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। স্থির হল যে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে ৫০০০ জাঠ-এর মর্যাদা দেওয়া হবে। শিবাজী প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যে মোগলবাহিনী বিজাপুর আক্রমণ করবে শিবাজী সসৈন্যে তাতে অংশগ্রহণ করবেন মোগলদের প্রতি তাঁর সখ্যতার নিদর্শনস্বরূপ। এর বদলে বিজাপুরে যে রাজ্য জয় করা হবে তার থেকে রাজ্যাংশ শিবাজীকে দান করা হবে।

পুরন্দরের চুক্তির দ্বারা সাময়িকভাবে হলেও শিবাজীকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল—নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে, মোগল-ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়ে অসংখ্য স্থানীয় প্রভুদের মত মোগল কর্তৃত্বকে আইনের কাঠামোর মধ্যে মোগল শাসনকে বিধিসম্মত শাসন বলে মেনে নিতে হয়েছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে, রাজা জয়সিংহের পরামর্শকে মেনে নিয়ে মোগল তহবিল থেকে পথ-খরচ হিসাবে নগদ এক লক্ষ টাকার অনুদান গ্রহণ করে তাঁকে আগ্রাতে সম্রাটের দরবারে হাজির হতে হয়েছিল।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে, ঔরংজেবের ৫০ তম চান্দ্র জন্মদিনে শিবাজী মোগল সম্রাটের সভায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন জয়সিংহের পুত্র কুমার রামসিংহ যিনি ছিলেন সম্রাটের দরবারে তাঁর পিতার প্রতিনিধি। শিবাজী ভেবেছিলেন তিনি সেখানে মারাঠাদের সার্বভৌম শাসকরূপে হাজির হয়েছেন। সম্রাট মনে করতেন যে, শিবাজী অন্য যে কোনও জমিদারের মত পদস্থ, সম্মানিত কিন্তু অধীন, শাসক-স্বীকৃত স্থানীয় নেতা। শিবাজী স্বীয় মর্যাদার এই অবমূল্যায়নের প্রতিবাদ করলেন। ফলে সম্রাটের দেয় উপহার যা ছিল মর্যাদার

অভিজ্ঞান তার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হল। শিবাজী পেলেন না সম্রাটের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, আর তার সঙ্গে হস্তী, মুক্তা ও সম্ভ্রান্তের মূল্যবান পোষাক। কুমার রামসিংহের কুঠীতে বন্দী অবস্থা থেকে শিবাজী একদিন পলায়ন করলেন এবং অনেক কষ্টে মথুরায় এসে সেখান থেকে এক মারাঠা ব্রাহ্মণের সহায়তায় ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইউসুফজাই বিদ্রোহ চলছিল। তাই ঔরংজেব ঠিক সেই মুহূর্তেই শিবাজীর বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠাতে পারেননি।

দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করে শিবাজী মোগল সুবেদার যুবরাজ মুয়াজ্জমের সঙ্গে শান্তি রক্ষা করে চলতে লাগলেন। তাঁর পুত্র শম্ভুজীকে ৫০০০ **মনসব** দান করা হল এবং শিবাজীকে বিজাপুর দখল করার স্বাধীনতা দেওয়া হল। শিবাজী ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগলদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখলেন। এর মধ্যে মারাঠা রাজ্যে সুশৃঙ্খল প্রশাসনের জন্য আইন প্রণয়ন করে তিনি তাঁর রাজ্যশাসনকে সংহত করেন।

১৬৭০ থেকে শুরু হল শিবাজীর নতুন অভিযান। পুরন্দরের চুক্তির দ্বারা হস্তচ্যুত সমস্ত দুর্গগুলি তিনি পুনরায় দখল করলেন। সেই বছরেই তিনি সুরাট লুণ্ঠন করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করলেন এবং প্রমাণ করলেন যে মোগল কর্তৃত্ব আর তার রাজ্যরক্ষায় সমর্থ নয়। এরপর থেকে সুরাটের পতন ঘটে। এর পরে খান্দেশের কিছু অঞ্চল তিনি দখল করে নেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই মোগলদের সঙ্গে তাঁর আবার লড়াই হয়। এবার ৫০০০ সৈন্য নিয়ে সম্মুখ সমরে শিবাজী মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রায়গড়ে ফিরে আসেন। মোগলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে শিবাজীর সেনানায়করা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে সমান-সমান অধিকারে লড়াই করা ক্ষমতা তারা অর্জন করেছে। মোগলদের ছিল ভারী অশ্বারোহী বাহিনী ও ভূমি-নির্ভর গোলন্দাজ বাহিনী (field artillery)। আর মারাঠাদের ছিল দ্রুত সঞ্চালনের ক্ষমতা ও উচ্চ মনোবল। তা নিয়েই পরবর্তী চার বছর মারাঠারা মোগল খান্দেশ ও বিজাপুরি কোঙ্কনে লুঠতরাজ করে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী তাঁর অধিকৃত মোগল রাজ্যাংশ চৌথ দাবি করেন। তার থেকে তাঁর বছরে চার লাখ টাকা রাজস্ব আসতে লাগল। রিজভি বলেছেন যে এই করকে ব্ল্যাকমেল বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। তিনি জনসাধারণকে তাদের দেশের নিরাপত্তায় অংশীদার করতে চেয়েছিলেন। মোগল প্রজাদের ব্ল্যাকমেল করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ১৬৭২-এর ডিসেম্বর মাসে শিবাজী পানহ্‌লা ও সাতারা দুর্গ দুটি অধিকার করেন। এর দু বছর পরে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন রাজগড় দুর্গে তিনি **'ছত্রপতি'** উপাধি নিয়ে নিজেকে সার্বভৌম শাসকরূপে ঘোষণা করেন। কিন্তু এর অনেক আগেই ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং সম্রাট রাজা জয়সিংহ ও যুবরাজ মুয়াজ্জামের অনুরোধে শিবাজীকে রাজা বলে মেনে নেন।

নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা—একটি স্বতন্ত্র জাতির স্বরাট শাসক বলে ঘোষণা করার এই ঘটনা সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ঘটনাগুলির অন্যতম বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। যখন ঔরংজেবের মতন দোর্দণ্ড-প্রতাপ সম্রাট সমস্ত প্রতিরোধকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন মোগল শিবিরে বন্দী থাকার পরেও নিজেকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করার যে সাহস ও ঔদ্ধত্য, নিজেকে ক্ষমতায় কায়েম রাখার যে কৌশল ও সামর্থ্য শিবাজী দেখিয়েছিলেন তা সমসাময়িক ভারত ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁর অভিষেকের অর্থ রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি গগ্গ ভট্ট (Gagga Bhatta) নামে বারাণসীর এক বেদবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দিয়ে প্রথমে নিজের বংশগত কৌলিন্য ও বর্ণগত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে, সম্পূর্ণ বৈদিক হিন্দুমতে দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও মাসাধিককাল যথোচিত শুদ্ধতার ব্রত পালন করে রাজমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এর জন্য তাঁকে তৈমুরবংশীয় শাসকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়নি। এইটিই গুরুত্বপূর্ণ। কোনও স্থানীয় প্রধানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে না পারার ব্যর্থতা মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়ী গ্লানি হয়ে রইল। অন্যদিকে যেখানে সমস্ত উপমহাদেশব্যাপী হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত সংস্কৃতি

গড়ে উঠছিল মুসলিম শাসনের বাতাবরণে সেখানে কোণঠাসা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুত্বের অপরিম্লান বৈভবকে রাজনৈতিক্ উচ্চাঙক্ষার পাদপীঠে প্রতিষ্ঠা করে এক জঙ্গী হিন্দু রাষ্ট্রসাধনার ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শিবাজী। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রসংগঠনের ঐতিহ্যে হিন্দুদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (empire building) ধারা খুব কম। এই অসম্পাদিত ধারার বাইরে শিবাজী নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা করলেন। শিবাজীর নিজ রাজ্যের সীমানার মধ্যে প্রাচীনতম সম্ভ্রান্ত মারাঠা পরিবারগুলির কাছে নতুন রাজ্য একটি নতুন অঙ্গীকার নিয়ে এল। নিজ রাজ্যের সীমানার বাইরে ভোঁসলা রাজপরিবারের মর্যাদার সম্প্রসারণ হল এবং ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র তাঁর বংশধরেরা বিধিসম্মত রাজবংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার লাভ করল। সাময়িকভাবে মোগল সাম্রাজ্যে ভেতরে হয়েও চিরায়তভাবে তার বাইরে—এইরকম এক বিচিত্র শক্তির আধার তৈরি করলেন শিবাজী। এই শক্তির আধার থেকেই আঠারো শতকে জেগে উঠেছিল মোগল শাসনের বিকল্প মারাঠা-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের জনক হলেন **'ছত্রপতি', 'পাদশাহ'** নয়। তৈরি হল সেই মানবিক বিন্দু যাকে ঘিরে মোগল-বিরোধিতার উপকরণগুলি একটি অবয়বে মূর্ত হতে পারে।

১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী তাঁর দক্ষিণভারত অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানকে গ্র্যান্ট ডাফ (Grant Duff) "তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান" ("the most improtant expedition of his life") বলে ব্যক্ত করেছেন। এই অভিযানে তাঁর লক্ষ্য ছিল বিজাপুর সরকারের অধীনস্থ্ যে সব **জাগির** তাঁর পিতার দখলে ছিল এবং অধুনা তাঁর ভ্রাতা ভেঙ্কাজীর (Venkajee বা Vyankaji) দখলে আছে তার পুনরুদ্ধার করা। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গোলকোণ্ডা প্রবেশ করেন। সেখানে সুলতান তাঁর সাথে সন্ধি করে মিত্রশক্তিরূপে গ্রহণ করেন এবং আরও দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁকে গোলন্দাজ বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। এইরকম অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর শীর্ষে থেকে তিনি দক্ষিণ আর্কটের শক্তিশালী দুর্গ জিঞ্জি অধিকার করেন। ভেলোর ও অন্যান্য অঞ্চলও তাঁর অধীনে আসে। তাঁর ভাই-এর কাছ থেকে তাঞ্জোর রাজ্যের অর্ধেক ছিনিয়ে নেন। তারপর দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে অধিকার করেন বেলারি (Bellary) এবং সখ্যতা করলেন তাঁর প্রাচীন শত্রু বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে। ঔরংজেব এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমে আফগানদের সঙ্গে লড়াইতে ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণে শিবাজীর রাজ্যজয় সম্ভব হয়েছিল। শিবাজীর দক্ষিণভারত অভিযানের স্বল্পকালের মধ্যেই ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

১খ.৬.৩ মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের উত্তর-শিবাজী পর্যায়

শিবাজী তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ শুরু হয় তাঁর দুই পুত্র শম্ভুজী ও রাজারামের মধ্যে। রাজারামের বয়স তখন মাত্র দশ। তাঁর সমর্থকরা তাঁকে রাজা রূপে ঘোষণা করলেও শেষপর্যন্ত শম্ভুজীই পানহালা ও রাজগড় দুর্গ অধিকার করে, ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী নিজেকে মারাঠা রাজ্যের রাজা ও শাসক বলে ঘোষণা করেন। রাজা হয়েই শম্ভুজী বুরহানপুর আক্রমণ করেন। উত্তরভারত থেকে পলতাক বিদ্রোহী যুবরাজ আকবরকেও তিনি আশ্রয় প্রদান করেন।

এই দুই ঘটনা মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের নতুন পর্যায় সৃষ্টি করল। বুরহানপুর লুঠ করে মারাঠারা বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করে। সেখানে ছিল বড় বড় বণিকদের বাস। তাদের কুঠীতে আর দপ্তরে লুকানো ছিল সোনা-রূপা, মণিমুক্তার গোপন ভাণ্ডার। এছাড়া বাহাদুরপুর ইত্যাদি শহরের বণিকদের গোলায় আর গুদামে মজুত ছিল নানারকম বাণিজ্যের সম্ভার। এই সমস্ত ঐশ্বর্য আর সম্ভার মারাঠাদের দখলে চলে যায়। মোগল সেনাপতি

খান জাহান বাহাদুর শম্ভুজীকে তাড়া করে সৈন্য নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বুরহানপুরে, কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেননি। জনশ্রুতি আছে যে শম্ভুজীর কাছ থেকে অনেক উপঢৌকন তিনি লাভ করেছিলেন, তাই কৌশলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। শিবাজী সুরাট লুঠ করে যেমন সেই বন্দর-নগরটির ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছিলেন সেই রকম শম্ভুজীর বুরহানপুর লুণ্ঠনের ফলে সড়কপথে দূর বাণিজ্য ও তার সঙ্গে বিপণন, বিনিয়োগ ও বিনিময় ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সবথেকে বড় কথা সেখাকার মুসলমান সমাজ পুরো ব্যাপারটিকে ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে একটি ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির পর্যালোচনা করে সেখানকার **উলেমা** ও মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঔরংজেবকে লিখলেন যে, জনৈক কাফের মুসলমানদের সম্পত্তি ও সম্মান নষ্ট করেছে এবং জুম্মাবারের (শুক্রবারের) **নমাজ** পড়ার ব্যাখাত ঘটিয়েছে। একথা বলার অর্থই হল সম্রাটকে বোঝানো যে শম্ভুজীর আক্রমণ কোনও আইন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রীক সংগঠন বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা নয়—তা বৃহত্তর অর্থে ধর্মের ওপর আঘাত। যদি মুসলমানদের ধর্ম ও সম্পত্তি সম্রাট রক্ষা না করতে পারেন তবে শাসকরূপে তাঁর প্রজার আনুগত্য দাবী করার কোনও অধিকার নেই।

বলাবাহুল্য যে, এ সংবাদ পেয়ে ঔরংজেব যারপরনাই উত্তেজিত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যের সামনে দুটো বিপদ—এক, জনৈক বিধর্মীর দ্বারা আক্রান্ত ইসলামের বিপজ্জনক ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ায় সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ধ্বসে যেতে পারে। দুই, বিদ্রোহী যুবরাজ আকবর দাক্ষিণাত্য থেকে যদি একদিকে উদীয়মান মারাঠা শক্তির সঙ্গে হাত মেলায় কিংবা বিক্ষুব্ধ মুসলিম মানবশক্তিকে দলে টেনে আনে তবে সাম্রাজ্যের সর্বনাশ রোধ করা যাবে না। অতএব ঔরংজেব সশরীরে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হলেন। উত্তরভারতে সরাসরি তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে যে প্রধান ও কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী ছিল তাকে দক্ষিণে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন তিনজন যুবরাজ, বিশিষ্ট সেনাপতিরা, বিরাট গোলন্দাজ বাহিনী, অসংখ্য বন্দুকবাজ পদাতিক বাহিনী, তাঁর হারেম, তাঁর গার্হস্থ্য ব্যবস্থা (household), অন্তহীন করণিক (clerks), সভাসদ, কর্মচারী, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, দাস-বান্দা-বাঁদী, কায়িক শ্রমিক, অশ্ব, হস্তী, পাল্কী, তাঁবু অন্যান্য পণ্যসম্ভার, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি—এককথায় সাম্রাজ্যের চলমান রাজধানীর যাবতীয় উপকরণ।

ওরংজেব যখন মহাসমারোহে দক্ষিণে যাত্রা করলেন তখন দক্ষিণে বসে যুবরাজ আকবর শম্ভুজীকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে, তাঁর অধীনস্থ দলছুট মোগলবাহিনী, শম্ভুজীর নিয়ন্ত্রণাধীন মারাঠা সৈন্য এবং সম্ভব হলে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সাহায্য নিয়ে দক্ষিণের অরক্ষিত মোগল প্রতিরক্ষা ভেদ করে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বাহিনীর উত্তরদিকে অভিযান করা দরকার। কিন্তু ভয়, সতর্কতা ও অব্যবস্থিত চিত্ততা এই তিনের মিশ্র প্রভাবের মধ্যে থেকে শম্ভুজী বৃথা কালক্ষেপ করলেন—সুযোগ দিলেন সম্রাটকে এগিয়ে আসার। চার বছর ধরে জাঞ্জিরার সিদ্দিদের বিরুদ্ধে, এবং তার সাথে বম্বের ইংরাজ ও গোয়ার পর্তুগিজদের বিরুধে লড়াই করে বৃথা অর্থ, সময়, মানবশক্তি ও সাজসরঞ্জাম নষ্ট করলেন। বড় মাপের ফল কিছু পেলেন না। বিদ্রোহী যুবরাজ শম্ভুজীর দুর্বলতায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে পারস্যের দিকে যাত্রা করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সামনে থেকে দুটি বিপদের মধ্যে একটি বিপদ অপসারিত হল। বাকী রইল শুধু মারাঠা বিপদ।

যে কথাটি লক্ষণীয় তা বল এই যে, ঔরংজেব শম্ভুজীকে কোনও বড় যুদ্ধে, কোনও ফল-নির্ণয়কারী সম্মুখসমরে টেনে আনতে পারেননি—এমন কোনও যুদ্ধ জয়-পরাজয়ের ওপর মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বের সমাপ্তি নির্ভর করবে। শম্ভুজী দুটি কাজ করেছিলেন—একটি ঠিক, আরেকটি ভুল। ঠিক কাজটি হল এই যে, তিনি পিতার রণকৌশল অবলম্বন করে বিকেন্দ্রিকৃত দুর্গব্যবস্থা বহাল ("decentralized network of strong points") রেখেছিলেন। মোগলদের মুখোমুখি মারাঠা জনগণের কার্যকরী ও প্রয়োজনীয় অংশকে এই সমস্ত

ছড়ানো ঘাঁটিগুলিতে রাখা হত। এর মধ্যে যেগুলি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আনা হত। এর ফলে মারাঠা প্রতিরক্ষার খরচ কমত আর মোগলদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে হত। এটি ছিল বিকেন্দ্রায়িত সমরব্যবস্থা যা গেরিলা যুদ্ধের সহায়ক। এটি ছিল ঠিক ব্যবস্থা। কিন্তু এই ঠিক ব্যবস্থা নিয়েও তিনি ভুল কাজ করলেন। রাজা হওয়ার আগেই তিনি এক ব্রাম্মণ কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের মোগল শাসক দিলির খাঁর (Dilir Khan) আশ্রয়ে। ঔরংজেবের নির্দেশে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জেসুবাই মোগল শিবিরে যথেষ্ট স্বীকৃতি পান। সম্রাট স্বয়ং তাঁকে 'রাজা' উপাধি দান করেন এবং তাঁকে সাত হাজার জাট-এর মর্যাদা দেন। কিছুদিন বাদে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন ভোঁসলা দরবারে তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা ও অস্থিরমতিত্বের খবর মোগলদের জানা ছিল। ঔরংজেব তখন দাক্ষিণাত্যে এলেন তখন শম্ভুজীর বয়স উনিশের একটু বেশি। বয়সের অনভিজ্ঞতার সাথে মিশে ছিল পিতৃগুণ ক্ষিপ্রতার অভাব। যথেষ্ট সতর্কতা আর প্রয়োনীয় খবরও (intelligence) রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেননি। রত্নগিরির ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করতে লাগলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে সম্রাট তাঁকে ধরার জন্য কি জাল চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। শম্ভূজীর এই গোপন আস্তানার খবর অচিরেই মোগল শিবিরে পৌঁছে যায় (১৬৮৮ খ্রিঃ)। ২৫,০০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মোগল সেনাপতি মকররাব খান এক দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন শম্ভুজীর গোপন আস্তানায়। মারাঠা রাজা ও তাঁর ব্রাম্মণ প্রধানমন্ত্রীকে বন্দী করা হয়। কিছুদিন বাদে তাঁদের নিমর্মভাবে হত্যা করে তাদের দেহ কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো হয়। বিজাপুর, গোলকোণ্ডা আর মারাঠা-রাজ্য সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে চলে এল—অধিকৃত হল ২,২১,২০৭ বর্গমাইল এলাকা। এইটিই হল মোগল সাম্রাজ্যের বৃহত্তম সম্প্রসারণ। মোগল সাম্রাজ্যে চারটি নতুন প্রদেশ তৈরি হল—বিজাপুর, বিজাপুর কর্ণটিক, হায়াদ্রাবাদ, কর্ণাটক। ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে বিদত কয়েকশত বছরে মুসলিম আধিপত্য যতদূর বিস্তৃত হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্য তার সমস্ত কিছুই নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস সাম্রাজ্য-নির্মাণ প্রক্রিয়া তার চরমে পৌঁছাল।

অনুশীলনী ৩

৩। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক (✓) বা কোন্‌টি ভুল (✗) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) শিবাজী পারসিক আদব-কায়দায় মানুষ হয়েছিলেন।

(খ) মাওয়ালিরা ছিল এক অলস জাতি।

(গ) শিবাজী ছিলেন মোগলদের দ্রুতগামী শত্রু।

(ঘ) মারাঠারা ছিল সম্মুখযুদ্ধে পারদর্শী।

(ঙ) শিবাজীর দক্ষিণভারত অভিযানকে গ্রাণ্ট ডাফ তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বলে ব্যক্ত করেছিলেন।

২। উদীয়মান রাজ্যবিজেতা শিবাজীর কাজ যে তিনটি কারণে সহজ হয়েছিল সেই কারণ তিনটি লিখুন।

(ক) ____________________

(খ) ____________________

(গ) ____________________

____

৩। শিবাজীকে দমন করার জন্য জয়সিংহ কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করুণ :**

(ক) শিবাজীর পর তাঁর পুত্র——মারাঠাদের শাসক হন।

(খ) সম্ভুজীর বুরহানপুর লুণ্ঠন একটি——উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।

৫। মোগলদের বিরুদ্ধে শম্ভুজী কি ধরনের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছিলেন? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

১খ.৭ রাষ্ট্র ও ধর্ম

ঔরংজেবের সময়ে রাষ্ট্র ও ধর্ম অনেকটাই একাকার হয়ে গেছিল। আকবর থেকে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে সময় তাতে মোগল রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম রাজনীতিকে প্রভাবিত করার উপাদান-রূপে তার ভূমিকাকে অনেকটাই হারিয়েছিল। ঔরংজেবের সময়ে ধর্ম আবার রাজনীতির পরিচালিকা শক্তিরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। ঔরংজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান, ইসলামীয় দর্শণের **হানাফি** ধারায় বিশ্বাসী। সম্রাট হওয়ার পর সাত বছর ধরে শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের পর তিনি **কোরআন** মুখস্ত করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও রাষ্ট্রিক অবস্থানের মধ্যে ইসলামীয় নৈতিকতার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করাই ছিল তাঁর প্রথম লক্ষ্য। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তাঁর প্রতি যে ব্যবহার তিনি করেছিলেন তাতে যেমন মুসলিম **শরিয়ার** (Sharia) নৈতিকতা ব্যাহত হয়েছিল সেইরকম পিতাপুত্রের সম্পর্কের যে ধর্মীয় পবিত্রতা ('filial piety') তাও বিনষ্ট হয়েছিল।

অতএব সম্রাট হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ হল নিজের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরা। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে হিজাজের (Hijaz) পবিত্র শহরগুলোর শাসক শরিফ জায়েদ (Sherif Zaid)-এর কাছে বিরাট মিশন প্রেরণ করেন। অনেক ঐশ্বর্য উপঢৌকন দিয়ে তিনি শরিফ জায়েদ-এর মন জয় করতে চেয়েছিলেন। এই মিশন সফল হয়নি। এর পরে অনুরূপভাবে তিনি একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন। সাফী মুস্তাদ খাঁ তাঁর **মাসির-ই অলমগীরি**-তে বলেছেন যে, এর পর থেকে ঔরংজেব মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার নানা পবিত্র স্থানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি নিজের হাতে **কোরআনের** প্রতিলিপি রচনা করে মদিনা শহরে দান করেছিলেন। এইভাবে পবিত্র ধর্মীয় সমাজে ঔরংজেব নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

এর পরে ঔরংজেবের কাজ হল মোঘল সম্রাজ্যের মধ্যে শুদ্ধ ইসলামীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। **শারিয়া** ভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির নতুন উদ্বোধন হল—এর ফলে নিমজ্জিত হল আকবরের উদার নৈতিক সর্বসমন্বয়ের নীতি যা বিবিধের অবয়বে ঐক্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এতদিন ধরে মোগল রাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দর্শক চালু ছিল তাকে ঐতিহাসিকরা একটি 'inclusive political culture' —সবাইকে গ্রহণ করে বিকশিত হওয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই রাষ্ট্রদর্শন এবার মার খেল। ‘স্থির হল ইসলামীয় আদর্শের নতুন লক্ষ্য : মোগল সাম্রাজ্যকে নিশ্চিতভাবে হতে হবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র যা শারিয়ার নিয়মে শাসিত হবে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের স্বার্থে।’’ এই রকম ধর্মরাষ্ট্র কাফের জনগণকে ধর্মান্তরিত করার কাজকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। এটি ছিল কাফের জনগণের ধর্মান্তকরেণের ('Conversion of the infidel population') রাজনীতি। এই নীতির নতুন প্রবর্তন ঘটল মোগল সাম্রাজ্যে। যদি এই নীতির অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর কঠোর শাসন বলবৎ করা হবে। এইটিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আসলে ঔরংজেব চেয়েছিলেন যে, মোগল সাম্রাজ্য হবে রক্ষণশীল সুন্নী ইসলামের রাজ্য যেখানে আদি খলিফাদের প্রদর্শিত নীতি চালু থাকবে। অক্সফোর্ড হিস্টরি অফ ইন্ডিয়ার ঐতিহাসিক হলেছেন যে, সম্রাট বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে এ আদর্শকে বেছে নিয়েছিলেন এবং যে কোনও রাজনৈতিক বিপদের ঝুকি বা রাজস্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাকে অনায়াসে স্বীকার করে নিয়েও তিনি তাঁর নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ধর্মবোধকে আড়াল রেখে তিনি নির্বিকারভাবেই এমন নৃশংসতার পরিচয় দিতেন যা মানুষের বোধকে রক্তাক্ত করে তোলে, কিন্তু হিংসার এই অনুষ্ঠান রাষ্ট্রকে সংহত ও স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রযুক্ত হত এবং রে দ্বারা সুন্নীশাসকের ধর্মবোধ বিনষ্ট হত বলে তিনি মনে করতেন না। অন্য যে কোনও স্বৈরাচারি শাসকের মতই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী—নৈতিকতার নিয়মকে তিনি রাষ্ট্রশাসনের বাইরে রেখেছিলেন। তার ফলেই ধর্মীয় শাসন ও রাজনৈতিক শাসনের উপাদানকে পরস্পরের বিনিময়যোগ্য উপাদান হিসাবে তাঁর পক্ষে ধরে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। ঔরংজেব নিজেকে মুসলিম রাজ্যবিজেতাদের উত্তরসূরী বলে ভাবতেন, ফলে এ বোধকে কখনোই তিনি প্রশ্রয় দেননি যে তিনি ঐশী প্রেরণায় সমুজ্জল প্রজ্ঞার উত্তাধিকারী। ফলে আকবর প্রবর্তিত সম্রাটদর্শনের ঐতিহ্যকে অ-ইসলামিক বলে তিনি বন্ধ করে দেন। সূর্যোদয়ের ভোরে সম্রাট এসে প্রাসাদের সু-উচ্চ অলিন্দে দাঁড়াবেন আর দূর থেকে প্রাজার রাজদর্শনের পর জানতে হবে। এই প্রথা আকবরের সময় থেকে চালু ছিল। ঔরংজেব তা বন্ধ করেন। ইতিহাস রচনা, রাজবিবরণ প্রস্তুত করা, পুস্তক-চিত্রাঙ্কন (illustration) ইত্যাদিও তিনি বন্ধ করে দেন। তাঁর নিজ রাজত্বের দশম বছরে পর **আলমগীরনামা**-র রচনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে গোপনে ব্যক্তিগতভাবে রচিত ইতিহাসই তাঁর রাজত্বকালের সাক্ষ্য বহন করে রয়ে গেছে। এতদিনে ধরে মোগল-সভায় চিত্রকররা থাকতেন। এবার তাদের বিদায় করে দেওয়া হল। ঔরংজেব তাঁর সময়ে কোনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে দেননি। জাহাঙ্গীরের সময় যে বাগান কিংবা আকবর ও শাহজাহানের সময়ে যে সৌধরাশি নির্মিত হয়েছিল তা আর ঔরংজেবের সময়ে দেখা গেল না।

এর ফলে সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল এবং মোগল বৈভবের অভিজ্ঞানগুলির আর কোনও নতুন প্রকাশ ঘটল না। এতদিন ধরে যে মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিকে তা ছিল eclectic বা মিশ্রিত, **অন্যদিকে inclusive** বা সমাহৃত। ইসলামের দ্বারা সমর্থিত নয় এইরকম প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মোগল রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই মিশ্রিত ও সমাহৃত চরিত্র নষ্ট হল। নিজের দ্বিতীয় অভিষেকের পর ইরানীয় নববর্ষ বা **নওরোজ** অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল। সৌরবর্ষের (solar year) শুরুতে এই অনুষ্ঠান হত। ইসলাম যেহেতু চান্দ্রবর্ষের (lunar year) অনুসারী সেহেতু এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই বছর সম্রাট দরবারের সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদ্যকারদের বরখাস্ত করে দিলেন—সাম্রাজ্যে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হল। এইভাবে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের বিকাশশীল ধারাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল। মদ ও আফিং সেবনও বন্ধ করার জন্য আইন করা হল। সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে সম্ভ্রান্তদের এবং সম্রাটের সঙ্গে অভিজাতদের দেখাসাক্ষাৎ ও মেলামেশা কমিয়ে দেওয়া হল। একমাত্র সম্রাটের ঘনিষ্ঠ পদস্থারাই তাঁর চারপাশে রইলেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রশাসন-ব্যবস্থায় একটা বড় ব্যাপার ছিল 'সম্রাট-সম্ভ্রান্ত যোগাযোগ' ('emperor-nobleink')। তা এবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঔরংজেবের ইসলামিক রাষ্ট্রসাধনার সবচেয়ে বড় ফসল হল **ফতাওয়া-ই-আলমগীরী**-র (Fatawa-i-Alamgiri) সংকলন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রথা ছিল এই যে, রাজ্যশাসন ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনও গুরুতর প্রশ্নে স্বাধীন আইনবিদ্, প্রশাসক, বিচারবিদ্ ও বিচারকদের মতামত নেওয়া হত। তাঁরা যে মতামত দিতেন তাকে বলা হত **ফতাওয়া**। এই ফতাওয়াগুলি ছিল নানা ধরনের। তাদের মধ্যে ইসলামীয় আইন সমন্ধে অস্পষ্টতা থাকত এবং অনেক সময়ে তা পরস্পর বিরোধী হত। এই সমস্ত ফতাওয়াগুলির মধ্যে যেগুলি **হানাফি** মতের সেইগুলিকে একত্রিত করে মুসলিম শাসক ও জনগণ উভয়ের স্বার্থে উলেমাদের দিয়ে প্রত্যেকটি **ফতাওয়া** পর্যালোচনা করিয়ে তাঁদের সংকলিত করা হয়। এইটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত আইনের সংকলন।

এইভাবে ধ্যানে আর চিন্তায় যিনি সর্বক্ষণের রক্ষণশীল সুন্নী মুসলমান তাঁর পক্ষে মুসলমান-ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বার্থ দেখা সম্ভব নয়। ঔরংজেব দেখেনওনি। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দশম বছরে তিনি টাট্টা, মুলতান ও বারাণসীতে ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম প্রচার করেছে জেনে তাদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন। মথুরার কেশবদেবের ও বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন। **মাসির-ই আলমগীরীতে** কেশবদেবের মন্দির ভাঙ্গার যে বর্ণনা আছে তা এইরকম : 'আল্লাহর গৌরব হোক [ঐতিহাসিকের উচ্ছ্বাস]—কারণ তিনি আমাদের ধর্মমত দিয়েছেন, কারণ ঝুটো ঠাকুরের সংহারকের রাজত্বকালে এমন একটি দুঃসাধ্য কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে [কেশবদেবের মন্দির ধ্বংস হয়েছে]। সঠিক ধর্মবিশ্বাসকে [অর্থাৎ ইসলামকে] এইরকম শক্তিশালি মদত দেওয়ার ফলে রাজাদের ঔদ্ধত্যকে আঘাত হানা গিয়েছিল এবং মূর্তিগুলির মত তারা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন বিপন্নভাবে। মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত মূর্তিগুলি আগ্রায় নিয়ে আসা হয় এবং নবাব বেগম সাহেব মসজিদের সোপানরাজির তলায় তাদের বসানো হয় যাতে সত্যবিশ্বাসীরা [ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা] প্রতিনিয়ত পায়ের তলায় তা দাবাতে পারে। মথুরার নাম বদলে রাখা হয় ইসলামাবাদ এবং এই নামেই নথিপত্রে ও জনগণের কথায় তা উল্লিখিত হয়।''

এই বিপজ্জনক ধ্বংসলীলার ফল কী তা ঔরংজেব জানতেন। হিন্দু রাজা ও হিন্দু জনগণের ওপর এর রাজনৈতিক প্রভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করেও ঔরংজেব যে এই পথ থেকে বিচ্যুত হননি তার কারণ তাঁর ধর্মবিশ্বাসে তিনি ছিলেন সৎ ও সঙ্কল্পবদ্ধ। শুধু তিনি বুঝতে পারেননি যে, যতই সততা থাকুক না কেন বিশ্বাস ও বিশ্বাসের গর্ভ থেকে উঠে আসা আবেগ যদি অন্যের বিশ্বাসকে আঘাত করে তা কখনোই সাধারণ্যে পালনীয় নীতি হওয়া উচিত নয়। ধর্মান্ধ হওয়াতে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ তাঁর ছিল না। তাই হিন্দু ও ভিন্ন

ধর্মাবলম্বীদের ওপর তিনি **জিজিয়া কর** স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। হয়ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যে ধনক্ষয় তিনি ঘটিয়েছিলেন তার জন্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তার জন্য বিধর্মী বলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর স্বতন্ত্র কর বসানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। হিন্দুরা সহজে এই করকে মেনে নেয়নি। স্টিউয়ার্ট লিখেছেন যে, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলো এই কর দিতে অস্বীকার করে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করে সম্রাটকে চিঠিও দিয়েছিল। এ চিঠিতে তারা সম্রাটকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁর পূর্বপুরুষরা হিন্দুদের প্রতি কি সহৃদয় ব্যবহার করতেন যার ফলে তাঁরা বহু দুর্গ ও জনপদ দখল করতে পেরেছিলেন। আর সম্রাট ঔরংজেবের সময়ে? হিন্দুরা সম্রাটকে লিখল : "আপনার রাজত্বকালে অনেকে সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপ হয়েছে, এর পরে নিশ্চিতভাবে আরও রাজ্যক্ষয় হবে কারণ লুঠতরাজ ও ধ্বংসলীলা সর্বত্র অবাধ ও সর্বজনীন হয়ে পড়েছে।" সম্রাট জানতেন যে, সাম্রজ্যের অন্তসংহতি কিরকমভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। তা সত্ত্বেও ধর্মান্ধ শাসক শোষণের রূঢ় হাত দিয়ে অ-মুসলমানদের কণ্ঠ চেপে ধরেছিলেন। ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তাদের মন্দির—সর্বত্র এবং প্রায় সারাজীবন ধরে। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে যোধপুরে অংসখ্য মন্দির ভাঙ্গার জন্য খান জাহান বাহাদুরকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন সম্রাট। ১৬৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে ভেঙ্গেছিলেন ১২৩টি মন্দির, চিতোরে ৬৩টি এবং অম্বরে (জয়পুর) ৬৬টি। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন নতুন মন্দির গড়া চলবে না। কিন্তু তিনি যা ভেঙ্গেছিলেন তা শুধু নতুন মন্দির নয়—অসংখ্য পুরানো কাঠামো যার মধ্যে নিদর্শন ছিল বিস্ময়কর হিন্দুশিল্পের।

বিধর্মীদের প্রতি যখন তিনি নির্মম তখন উলেমারদের প্রতি তিনি মুক্তহস্ত, উদার। পুরানো মসজিদের সংস্কার ও নতুন মসজিদ নির্মাণ এই দুই কাজের জন্যেই তিনি অর্থ ও নিষ্কর জমি দান করতেন। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দুদের সমস্ত নিষ্কর জমি কেড়ে নেন। হিন্দুদের সম্পত্তিচ্যুত করার এই আইন অবশ্য সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি। কিন্তু সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার আইন যে হয়েছিল এইটিই **উলেমারদের** সবচেয়ে বড় জয়, কারণ হিন্দুদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা বহু জমি এই উলেমা ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। এই পৃষ্টপোষকতার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের এক বিরাট ধর্মান্ধ **উলেমা** সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এইসব **উলেমা, কাজী, শারিয়া** পণ্ডিতদের অভ্যুদয় রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। এইসব মানুষেরা ছিল সঙ্কীর্ণ, যুদ্ধ আর প্রাশাসনে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। তদুপরি তারা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভী। যোল বছর ধরে আব্দুল ওয়াহাব (Abdul Wahhab Bohra) ছিলেন প্রধান **কাজী**। তাঁর মতন দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যের অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আতহার আলি বলেছেন যে, একজন পারসিক আমীর মীর্জা লহরাসপ্ মহাবত খান চড়ুই পাখির মত ক্ষুদ্র জীবকে শিকারী ব্যাধে পরিণত করার নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। ঔরংজেব এই প্রতিবাদকে গাহ্য করেননি। প্রথম থেকেই ধর্মান্ধতায় তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় অভিষেকের পরই তিনি **মুহতাসিব** (Muhtasib) নামে নৈতিকতার নজরদারদের একটি পদ সৃষ্টি করেন। শুধুমাত্র **উলেমারদের** মধ্যে থেকেই এই পদে নিয়োগ করা হত। শহরের বাজারগুলিতে যাতে জনগণের ওপর কোনও জুয়াচুরি বা মিথ্যাচার না চলে, সেখানে যেতে কোনও গোলযোগ সৃষ্টি না হয় তা দেখার দায়িত্ব ছিল এই নজরদারদের। কোনও স্থানে ধর্মের বিরোধিতা (blasphemy), মদ্যপান জুয়াখেলা, পুতুলপূজা ইত্যাদি যাতে না হয় এবং সবর্ত্র যাতে শারিয়ার আইন বলবৎ থাকে তা দেখার জন্যে **মুহতাসিবদের** নিয়োগ করা হয়েছিল। এর আগে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনে কোনদিন যা হয়নি এবার তাই হল। **মুহতাসিবরা কোতয়ালের** দায়িত্ব গ্রহণ করল। মোগল সাম্রাজ্যে ঐহিক (Sewlar) প্রশাসন ও ধর্মীয় প্রশাসন এক হয়ে গেল।

১খ.৮ সারাংশ

ওপরে যে আলোচনা আপনারা পড়লেন তার থেকে দুটি ধারণা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হবে। এক, ঔরংজেব ছিলেন শেষ শক্তিশালী মোগল সম্রাট যিনি সাম্রাজ্যের সম্প্রসাহণ যেমন ঘটিয়েছিলেন সেইরকম ভাবে সাম্রাজ্যের সীমানা-সংরক্ষণেও সফল হয়েছিলেন। অর্থাৎ, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের যে মোগল ধারা আকবর তৈরি করে গিয়েছিলেন সে ধারা ঔরংজেবের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ঔরংজেব মারা যান ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে তাই মোগল সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। দুই, ঔরংজেবের রাজত্বকালেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংহতি ভেঙ্গে যায়। আফগান ও রাজপুত শক্তিকে আঘাত করে, ঔরংজেব সাম্রাজ্যের দুটি বড় ও নির্ভরযোগ্য যোদ্ধৃজাতিকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন, যার ফলে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আফগানদের আর মারাঠাদের সঙ্গে লড়াইয়ে রাজপুতদের পূর্ণ সহযোগিতা তিনি পাননি। আফগানদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ে দক্ষিণভারতকে অবহেলা করতে হয়েছিল যার সুযোগ নিয়ে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাজাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আবার যখন তিনি দক্ষিণভারতে গেলেন তখন উত্তরভারত অবহেলার মধ্যে ডুবে গেল। বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দখলের পর তাঁর উত্তরভারতে ফিরে আসার সুযোগ ছিল কিন্তু তিনি ফেরেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা তাঁকে ফেরার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেননি। এতে সাম্রাজ্যের মঙ্গল হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে 'দক্ষিণী ক্ষত' A Deccan ulcer—তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। আসলে গোলকোণ্ডা আর বিজাপুর জয় করে বিপুল ঐশ্বর্য এবং বিরাট রাজ্যাংশ মোগলদের দখলে এসেছিল। দক্ষিণে মোগল সাম্রাজ্যের চারটি প্রদেশ নতুন করে যোগ হয়েছিল। কিন্তু হলে কি হবে, অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মোগল সম্ভ্রান্তদের মধ্যে দক্ষিণী অভিজাতদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। এতে **মানসবদারদের** প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছিল। এমনিতেই **মনসবদাররূপে** রাজপুতদের সংখ্যা কম ছিল। তার ওপর এল নতুন করে মারাঠা, দক্ষিণী মুসলমান এবং কিছু কিছু আফগানরাও। রাজপুত **মনসবদাররা** তা পছন্দ করেনি। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ-বিজয়ের পর আত্মসন্তুষ্টির সময় পেয়েছিলেন কারণ শুধু গোলকুণ্ডার বিজয়ের পরই রাজস্ব বেড়েছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। আর এসেছিল বিপুল সোনা-রূপা-মণি-মাণিক্য। অর্থ আর রাজ্যাংশ লাভ করলেও মোগল সাম্রাজ্যের মানবমিশ্রণ বদলে গিয়েছিল। ঔরংজেব যখন দক্ষিণে এসেছিলেন তখন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় বাহিনী (central army) এবং সমস্ত বড় বড় দক্ষ-অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য সেনাপতিদের নিয়ে তিনি এসেছিলেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে সৈন্যের সুষম বণ্টন হয়নি। অন্যদিকে রাঠোর ও শিশোদিয়া রাজপুতরা উত্তরে আর শিবাজীর অধীনে মারাঠারা দক্ষিণে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল। গোরিলা যুদ্ধ আর পাহাড়ে যুদ্ধ—এই দুই ব্যাপারেই মোগলবাহিনী ছিল অদক্ষ। তাই উত্তর—পশ্চিমে আফগানদের সঙ্গে এবং দক্ষিণে মা রাঠাদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সাফল্য মোগলরা লাভ করতে পারেনি। মোগল সৈনবাহিনীর ভিতরে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট যতদিন উত্তরে ছিলেন তখন দক্ষিণের মোগল সেনাপতিরা আলস্যে নিমগ্ন হয়েছিল এবং অকারণে যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করে চালু রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ থাকলেই সৈনিকদের উপার্জন বাড়ে এই ধারণা বহু ক্ষেত্রে মোগল সীমান্তে যুদ্ধকে থামতে দেয়নি। সম্রাট নিজেই মনে করতেন যে, মোগলবাহিনীর মধ্যে অসাবধানতা আর বিশ্বাসহীনতা বাড়ছিল। আগ্রা থেকে শিবাজীর পলায়ন এবং শেষপর্যন্ত তাঁর নিজের রাজ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করেছিল যে, মোগল অভ্যন্তরীণ পাহারাদারি ও নজরদারি ব্যবস্থা অনেক কমে গেছে, যেমন কমে গেছে রাষ্ট্র পর্যায়ে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা। আগ্রা থেকে শিবাজীর পলায়ন করার পর শেষ অবধি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করা মোগলদের সম্ভব হয়নি। নজরদারি ও সংবাদ সরবরাহ ঘাটতি ছিল তা না হলে শায়েস্তা খান মারাঠাদের হাতে পরাজিত হবেন কেন? সম্রাট সন্দেহ করতেন যে, যশোবন্ত সিংহ বা যুবরাজ মুয়াজ্জমের মত উচ্চ

পর্যায়ের মানুষরা মারাঠাদের প্রতি দুর্বলতা দেখাচ্ছেন, হয়ত বা মারাঠাদের কাছ থেকে বিপুল উপঢৌকনও তাঁরা লাভ করেছেন। সন্দেহপ্রবণ সম্রাট তাঁর সন্দেহ নিরসনের কোন উপায় খুঁজে পাননি। শিবাজীর দ্বারা দুবার সুরাট লুণ্ঠন, শায়েস্তা খানের পরাজয়, যুবরাজ আকবরের বিদ্রোহ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরতে না পারা মোগল সাম্রাজ্যের মর্যাদাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। পূর্বদিকে শায়েস্তা খান মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা সম্প্রসারণের কাজ যেমন অব্যাহত রেখেছিলেন সেইরকম পশ্চিম দিকে ঘটছিল তার বিপরীত ঘটনা। যেখানে সুরাট বন্দরের চারপাশে—মোগল প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। পশ্চিমদিকে মোগল স্থিতিশীলতা যখন কমে আসছিল তখন পূর্বদিকে মোগল প্রতাপ বাড়ছিল। একইরকমভাবে দক্ষিণে যখন মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও সংহত হচ্ছিল তখন উত্তরদিকে তার সুস্থিতি কমছিল। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মথুর জেলার গোকুলের নেতৃত্বে জাঠরা এবং ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে পাতিয়ালার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সৎনামীরা বিদ্রোহ করে। এর সাথে সাথে হিন্দুদের মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়। মন্দির ভাঙ্গার কলঙ্কজনক রাজনীতির সাথে মিশেছিল জিজিয়া কর স্থাপনের মধ্যে দিয়ে অ-মুসলমান প্রজাবর্গ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের অর্থনৈতিক শোষণের নীতি। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করার পর শিখরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা সম্রাটের যে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে জড়িয়েছিল রাজপুত ও মারাঠারা। সাম্রজ্যের সর্বাধিক সম্প্রাসরণের মুহূর্তেই এই ভাবে সাম্রাজ্যের সংহতি ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ধর্মন্ধতা আর পররাজ্যলোলুপতা এই দুই-ই সম্রাটের জীবদ্দশাতেই তাঁকে এক হিংস্র নিয়তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। দক্ষিণের মুসলিম রাজ্যগুলি আক্রমণ করার জন্য ধর্মপ্রাণ ইসলাম-বিশ্বাসীরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। **উলেমারদের** সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধার ফলে প্রগতিশীল উদারনৈতিক মুসলমানরা তাঁর থেকে দূরে সরে গেছিল। অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে শিখ-জাঠ-সৎনামীরা কঠোর হয়েছিল। ধ্বংস আসন্ন জেনে হিন্দুরাও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আত্মজের বিদ্রোহ সম্রাটের পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করেছিল। আর রাজপুত-মারাঠা ও আকবরের নেতৃত্বে বিদ্রোহী মোগলরা অন্তরাল থেকে বিজাপুর সুলতানদের মদত পেয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল যে, মোগল সাম্রাজ্য তার শান্তি আর সুস্থিতি হারিয়েছে। এটি হল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। অষ্টাদশ শতাব্দী শুরু হওয়ার কিছুদিনের মোগল সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের কোলে ঢোলে পড়ল।

১খ.৯ অনুশীলনী

১। নীচের উক্তিগুলি ঠিক (✓) বা (✗) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) ঔরংজেবের সময়ে ধর্ম-রাজনীতির পরিচালিকা শক্তিরূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

(খ) ঔরংজেব আকবরের উদারনৈতিক সর্বধর্মসমন্বয়ের নীতিকে বজায় রেখেছিলেন।

(গ) ঔরংজেবের ইসলামিক রাষ্ট্রসাধনার সবচেয়ে বড় ফসল হল আলমগীর-নামা।

(ঘ) হিন্দু ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর ঔরংজেব জিজিয়া করা স্থাপন করেছিলেন।

২। মোগল সাম্রাজ্যে কখন ও কিভাবে ঐহিক প্রশাসন ও ধর্মীয় প্রশাসন এক হয়ে গিয়েছিল? (দশ লাইনে উত্তর দিন)

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) —— নেতৃত্বে মারাঠাজাতি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

(খ) —— শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্য বিপর্যয়ের কোলে ঢলে পড়ল।

(গ) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় কি ভ্রান্ত হয়েছিল?

(ঘ) মোগল-মারাঠা দ্বন্দ্বে উত্তর-শিবাজী পর্যায় আলোচনা করুন।

১খ.১০ গ্রন্থপঞ্জি

1. Tod:Annals and Antiquities of Rajasthan.
2. Smith, V.A.: The Oxford History of India.
3. Sarkar, Jadunath: History of Aurangzib.
4. Sarkar, Jadunath : Sibaji and His times.
5. Ali, A. : Mughal Nobility:
6. S. R. Sarma : Mughal Empire in India.
7. Bhargava, V.S. : Marwas and the Mughal Emperors.
8. Holliseg, Robert e : The Rajput Rebellion against Auranjeb.

একক ২ ❑ মোগল সাম্রাজ্যের পতন

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ মোগল সাম্রাজ্যের পতন
২.৩ মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট : সম্ভ্রান্তদের পতন : ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবক্ষয়ের ধারণা
২.৪ মোগল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক সংকট : পূর্বকথা
২.৫ স্বল্প জাগির, দলীয় রাজনীতি ও ক্রমহ্রাসমান সম্পদের সমস্যাজনিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন
২.৬ সারাংশ
২.৭ অনুশীলনী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ
- মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট
- মোগল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক সংকট
- ক্রমহ্রাসমান সম্পদের সমস্যা প্রভৃতি

২.১ প্রস্তাবনা

ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে গড়ে উঠেছিল মোগল সাম্রাজ্য। আবার পরিবর্তনশীল সময় আর রূপান্তরশীল সমাজ এই দুইয়ের মধ্যে থেকে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে শুরু করে। অর্থনীতির পরিবর্তন সমাজের শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে আনে পরিবর্তন, আর এই পরিবর্তন মানুষের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে বস্তু ও বিষয়ের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। সামগ্রিকভাবে তখন দেখা দেয় মানবজীবনের রূপান্তর। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে বড় ধরনের যুগপরিবর্তনের ইশারা প্রতিফলিত হচ্ছিল। এই পরিবর্তনের ধারাকে যদি আমরা বুঝতে পারি তবেই আমরা বুঝতে পারব কেমন করে যখন সারা দুনিয়ায় বাণিজ্যিক রসদ নিয়েও কেন তলিয়ে গেলাম। এই তলিয়ে যাওয়ার পূর্ব-ইতিহাস লুকিয়ে আছে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসে। ইতিহাসের পুরাঘটিত আর ঘটমানতা কিভাবে জড়িয়ে থাকে তার কার্যকারণ বিন্যাসটা জানাই আমাদের উদ্দেশ্য।

একসময়ে মোগল সাম্রাজ্য-পতনের জন্য দায়ী করা হত ব্যক্তিকে, গোষ্ঠীকে, সম্প্রদায়কে। এখন গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে, নৈর্ব্যক্তিক শক্তি—সাম্রাজ্যের আর্থ—সামাজিক পরিবর্তন—অনেক দীর্ঘস্থায়ী অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। আমরা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের নৈর্ব্যক্তিক কারণগুলি জোর দিয়ে পড়ব। আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনও কোনও মুহূর্তে ব্যক্তি ইতিহাসের পরিচালক হলেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ব্যক্তি কখনই ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক নয়। ব্যক্তিকে নিয়ে ইতিহাস চলে আর চলমান ইতিহাসে সার্বভৌম হয়ে দাঁড়ায় শ্রেণী, শ্রেণী থেকে উদ্ভূত সমাজ আর সমাজপ্রসূত প্রতিষ্ঠান। মোগল সাম্রাজ্যের পতন এই শ্রেণী-সমাজ-সংগঠনের রূপান্তরের ফল।

২.২ মোগল সাম্রাজ্যের পতন

১৫২৬ [পনিপথের প্রথম যুদ্ধ] ও ১৭০৭ [ঔরংজেবের মৃত্যু]—এর মধ্যে প্রায় দুই শত বছর রাজত্ব করেছেন বাবার থেকে ঔরংজেব পর্যন্ত ছয়জন সম্রাট। তাদের Great Mughals বা Greater Mughals বলা হয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত সময় বা পঞ্চাশ বছরের কিঞ্চিৎ অধিককালের মধ্যে ১১ জন শাসক রাজত্ব করেছেন। ঔরংজেবের পরবর্তী মোগল শাসকদের Later Mughals বা Faineant Emperors বলা হয়।

জাহান্দার শাহ ও ফারুকশিয়রকে হত্যা করা হয়। রফি-উদ-দরাজাত ও নিকুসিয়র বন্দী অবস্থায় মারা যান। রফি-উদ-দৌলা মারা যান শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিতে। মহম্মদ শাহ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরাণতা ও আফিং সেবনে মৃত্যুর আগেই জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম কয়েকদিনের জন্য শাসক হয়েছিলেন। আহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে বন্দী করা হয় এবং শেষে তাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আলমগীরকে হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় শাহ আলম বারবার ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজধানী ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। এই বংশের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইংরাজদের হাতে পরাজিত হয়ে বন্দী হন এবং তাঁকে রেঙ্গুনে পাচার করে দেওয়া হয়।

প্রান্তলিপি

ঔরংজেবের পরবর্তী মোগল সম্রাটরা—

১. বাহাদুর শাহ (১৭০৭—১৭১২)
২. জাহান্দার শাহ (১৭১২—১৭১৩)
৩. ফারুকশিয়র (১৭১৩—১৭১৯)
৪. রফি-উদ-দরাজাত (১৭১৯)
৫. নিকুসিয়র (১৭১৯) } ১৮ ফেব্রুয়ারি—২৭ আগষ্ট, ১৭১৯
৬. রফি-উদ-দৌলা (১৭১৯) (দ্বিতীয় শাহাজাহান) } ১৮ ফেব্রুয়ারি—২৭ আগষ্ট, ১৭১৯
৭. ইব্রাহিম (১ অক্টোবর—৮ নভেম্বর, ১৭২০)
৮. মহম্মদ শাহ (১৭১৯—১৭৪৮)
৯. আহম্মদ শাহ (১৭৪৮—১৭৫৪)
১০. দ্বিতীয় আলমগীক (১৭৫৪—১৭৫৯)
১১. দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯—১৭০৬)
১২. দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬—১৮০৬)
১৩. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭—১৮৫৭)

ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষ পর্বকে জনৈক ঐতিহাসিক মোগল সাম্রাজ্যের 'অতিক্রান্ত মধ্যাহ্ন বেলা' (Post-Meridiem) বলে বর্ণনা করেছেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকাল তাঁর মতে সাম্রাজ্যের 'সূর্যাস্তকাল (Sunset of the Empire)। তারপরের সমস্ত দুর্বল শাসকদের রাজত্বকালকে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যের 'নিশাকাল' (Night-fall of the Empire)। ঐতিহাসিকরা এইরকম নানাভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক মেকলে (T. B. Macaulay) একবার বলেছিলেন যে, ঔরংজেবের পরবর্তী শাসকদের "ইতিহাস হল ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও অলস শাসকদের কাহিনী যাঁরা ছিলেন সুরায় সিক্ত ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত' ("The story of a succession of weak and indolent sovereigns soaked in wine and sunk in debanchery")। শাসকের অধঃপতন রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন। দীর্ঘদিন ধরে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমানকালে ঐতিহাসিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অবশ্য রাজনৈতিক সংকটকে তাঁরা অস্বীকার করেন না। যেমন একটি সাম্প্রতিক লেখায় সমস্যাটির আলোচনা এইভাবে শুরু হয়েছে—"প্রতিভাবান সম্রাট ঔরংজেবের চোখের সামনেই তাঁর সাধের মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর উত্তরসূরীদের আমলে সেই পক্রিয়া আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ভারতীয় রাজনৈতিক সমাজের অবক্ষয়ই মুঘল সাম্রাজ্যের এই সঙ্কটের জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করা হয়।" একটি সাম্রাজ্য প্রাথমিকভাবে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। অতএব তার স্থিতি ও বিনাশকে রাজনৈতিকভাবেই প্রথমে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে জড়িয়ে উঠে আসে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নগুলি। এতদিন ধরে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিত থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে ভাবা হত। এখন আর্থ-সামাজিকতার পরিকাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে যে, মোগল সাম্রাজ্যের পতন কোনও একটি কারণে হয়নি বা হঠাৎ হয়নি। ঐতিহাসিক লেনপল লিখেছিলেন যে, ঔরংজেব যদি তাঁর মতন শক্তিশালী আরও একজনকে উত্তরসুরী রূপে রেখে যেতেন তাহলেও মোগল পতনকে রোধ করা যেত না। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিকার অনেকদিন ধরেই শুরু হয়েছিল। কোনও দুর্ধর্ষ শল্যচিকিৎসাতেও তার নিরাময় ঘটত না। এমনই জটিল যে পতনের ধারা তাকে শুধু রাজনৈতিক বা শুধু আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সমস্ত দিক থেকে তার একটা সামগ্রিক পর্যালোচনা দরকার। পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আমরা সেই পর্যালোচনাকেই উপস্থাপিত করব। শুধু মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত সমস্যার মধ্যেই মূল কথাটি হল 'সংকট' (crisis)। আগেকার দিনের ঐতিহাসিকরা সচরাচর 'সংকট' কথাটিকে ব্যবহার করতেন না। করলেও খুব লঘু অর্থে ব্যবহার করতেন, কোনও গূঢ় অর্থে নয়। তাঁরা শাসকদের অপদার্থতা, সম্ভ্রান্তদের অযোগ্যতা কিংবা কোনও ব্যবস্থার ব্যর্থতা এইভাবে সমস্যাগুলিকে বুঝবার চেষ্টা করতেন। আজকালকার ঐতিহাসিকরা যখন কোনও ব্যক্তির অযোগ্যতাকে বুঝবার চেষ্টা করেন তখন তাকে কোনও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অবস্থানগত স্থিতি বা অস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখেন এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের যুগ্ম অস্তিত্বকে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা, সংগতি ও অসংগতির পরিমণ্ডলে বুঝবার চেষ্টা করেন। এইভাবে তৈরি হয় একটি বৃহত্তর, সম্পৃক্ত ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ। এ দৃষ্টিকোণ রাজনীতি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ নয়। এমনকি তা সমাজ-অর্থনীতি-নিবিড় দৃষ্টিকোণও নয়। তা ঐক্যবদ্ধ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ।

২.৩ মোগল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংকট : সম্ভ্রান্তদের পতনতত্ত্ব : ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবক্ষয়ের ধারণা

মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে দুভাবে বুঝবার চেষ্টা হয়েছে। একটি হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুকৃতি-দুষ্কৃতি, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, কৃতিত্ব-অকৃতিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। ভিন্টসেন্ট স্মিথ, লেনপুল কীনি (Keene), আরভিন (Irvine), যদুনাথ সরকার, কুরেশি (Qureshi) এস. আর. শর্মা ইত্যাদি ঐতিহাসিকরা—যাঁরা সবাই পুরনো দিনের ঐতিহাসিক— তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মোগল সম্রাটদের চরিত্রগত অবক্ষয় হচ্ছিল, যার ফলে দুর্বলতা তাঁদের গ্রাস করে। অতিরিক্তভাবে হারেমে নারীসংসর্গে কালযাপন করা, বিপজ্জনক মাত্রায় মদ্যপান, মোসাহেব ও চাটুকারদের দ্বারা নিরন্তর পরিবৃত্ত থাকা ইত্যাদির ফলে অনেক সম্রাটই নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ মাত্রাতিরিক্ত আফিং সেবন করতেন। ফলে ঔরংজেবের মতন শাসকরা যে কর্মদক্ষতা দেখিয়েছিলেন তা আর পরবর্তী শাসকদের মধ্যে দেখা যায়নি। শাসনের রশি তাঁদের হাত থেকে স্খলিত হয়ে শেষপর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতন কুচক্রীদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। প্রতিভাবান মোগলরা তাঁদের সন্তানদের সক্ষম রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু পরবর্তী যুবরাজরা হয়ে উঠেছিলেন নিঃসীমভাবে আরামপ্রিয়। যেমন বাহাদুর শাহের তৃতীয় পুত্র রফি-উস-সান সম্বন্ধে ইরাদাত খান লিখেছেন যে, ‘‘তাঁর ছিল একজন সভাসদের মতন হৃদয় যিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করতেন নিজের শরীরকে সদাসর্বদা সাজিয়ে রাখতে এবং পোশাক ও মূল্যবান মণিমুক্তা ক্রয় করতে’ (‘the heart of a courtesan, devoting all his energy to the adornment of his person and purchase of clothes and high-priced jewels...’’) তাঁর সম্বন্ধে এই ছড়াটি চালু ছিল।

আয়না ও শানা গিরিফতা বা দস্ত।
চুম জান-ই-রাণা, সুদা গেসু-পরাস্ত।।

—‘‘তিনি হাতে আয়না ও চিরুনি ধরে সুন্দরী নারীর মতো নিজের কেশবিন্যাস করেন।’’ আরভিন তাঁর গ্রন্থে এই উদ্ধৃতিটি তুলে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যুবরাজের পৌরুষ নিঃসীম নারীসঙ্গে কি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। মহম্মদ শাহ—শেষ মোগল সম্রাট যিনি শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কীন লিখেছেন—‘‘মহম্মদ শাহ একেবারেই তৈমুরবংশের উপাদান ছিলেন—ঢিলেঢোলা, ব্যক্তিগতভাবে সাহসী কিন্তু নৈতিকভাবে নড়বড়ে। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এক মোগল বন্ধু বলেছিলেন যে, তাঁর হৃদয় ছিল সরোবরের জলের মতন, ঝড়ো বাতাসে সহজে উদ্বেলিত হয়, আবার ঝড় প্রশমিত হলে শান্ত হয়ে যায়। বুবেনের অভিশাপ।’’ ইবাদাত খান মৈজদ্দিন জাহান্দার শাহ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন : ‘মৈজদ্দিন জাহান্দার শাহ, [বাহাদুর শাহের] জ্যেষ্ঠ পুত্র, ছিলেন একজন দুর্বল চরিত্রের মানুষ—বিলাসে ঢলে পড়া—যিনি শাসনকাজে মাথা ঘামাতেন না বা অভিজাতদের আনুগত্য পাওয়ার চেষ্টা করতেন না।’’

যদুনাথ সরকার, কুরেশি, এস. আর. শর্মা প্রমুখ ঐতিহাসিকরা যে ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলেছেন তা শুধু সম্রাট, যুবরাজ, শাসকদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে তা নয়। তাঁদের কথা এই ব্যক্তির নির্বীর্যতা, অভিজাত মানুষ, সেনাপতি, সম্ভ্রান্ত প্রশাসক সকলকেই গ্রাস করেছিল। আসলে সাম্রাজ্যব্যাপী সর্বত্র এক মানবিক উপাদানের অবনমন ঘটছিল। আর এই অবনমন নেতৃত্ব পর্যায়ের ব্যক্তি মানুষদের অপরিসীম ক্ষয়ের মুখে, অকল্পনীয় অদক্ষতার মধ্যে ও অপ্রতিরোধ্য মানসিক বৈগুণ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারের যে উক্তি একটি সমাদৃত বক্তব্যরূপে উদ্ধৃত হয় তা এখানে আলোচনার স্বার্থে আবার দেওয়া হল। তিনি লিখেছেন : ‘‘মোগল ইতিহাসের চিন্তাশীল পাঠকের কাছে অভিজাতদের পতনের থেকে বিস্ময়কর আর

কিছুই ছিল না। মহানায়কেরা এক প্রজন্মকালই মঞ্চে অধিষ্ঠান করতেন। তাঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে তাঁদের ঔরসজাত কোনও সন্তানকে রেখে যেতে পারতেন না। আবদুর রহিম এবং মহাবত, শা'দুল্লাহ এবং মীরজুমলা, ইব্রাহিম এবং ইসলাম খান রুসি—যাঁরা সপ্তদশ শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রচনা করেছেন—তাঁদের পরে তাঁদের যোগ্যতার অর্ধেক নিয়েও তাঁদের কোনও পুত্র এবং নিশ্চিতভাবে কোনও পৌত্র আত্মপ্রকাশ করেননি।" কালীকিঙ্কর দত্ত মনে করেন, এর জন্য অযোগ্য শাসকরাই দায়ী। তাঁরা নীচ চাটুকারদের দ্বারা পরিবৃত থেকে স্বার্থসন্ধানী মানুষদের পরামর্শে চলতেন। ফলে কখনও সঙ্কল্পবদ্ধ হতে পারেননি। এই সমস্ত কিছুর ফলে ঠিক মানুষকে চিনে নেওয়ার চোখ তাঁরা কখনও গড়ে তুলতে পারেননি। ঠিক মানুষকে ঠিক জায়গায় বসাতে পারেননি। যদুনাথ সরকার শাসক ও সম্ভ্রান্তদের যৌথ অবনমনের কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। সম্রাট যখন অলস ও নির্বোধ তখন তিনি সম্ভ্রান্তদের প্রভু হতে পারেন না, তাদের পরিচালিত করার শক্তিও তাদের থাকে না। তখন তারা শক্তি অর্জনের জন্য, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেন না—আত্মসমর্পণ করেন সভাসদদের কাছে, নতজানু হন প্রদেশগুলির কাছে। এইভাবে সভাসদরা ক্ষমতাবান হয়, প্রদেশগুলি মাথা তোলে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিমজ্জন ঘটে।

শাসকদের অবমনন একটি ক্রমিক ঘটনা এবং তা যে প্রতিভাবান সম্রাটদের সময় থেকে আরম্ভ হয়নি একথা বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, সম্রাট জাহাঙ্গীর আফিং খেতেন এবং সকল মোগল সম্রাটই হারেমে আশক্ত ছিলেন। পরবর্তী শাসকদের থেকে শাহজাহান কম বিলাসী ছিলেন না। এ সমস্ত সত্ত্বেও তাঁরা রাষ্ট্রশাসনে, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে ও রাজ্য-সংরক্ষণে নিশ্চিত ভূমিকা পালন করে এসেছিলেন যে ভূমিকার মধ্যে একটা ইতিবাচক দিক ছিল। যদুনাথ সরকারের মতে, ঔরংজেবই ছিলেন প্রথম প্রতিভাবান মোগল শাসক যাঁর সময়ে এই ভূমিকা নেতিবাচক হয়ে গিয়েছিল। তিনি লিখেছেন যে, "যে সাম্রাজ্য নানাজাতি ও ধর্ম, বিচিত্র স্বার্থ ও জীবনবোধ ও চিন্তা নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেই সাম্রাজ্যে ঔরংজেব ছিলেন নকৃষ্ঠতম সম্রাট যাঁকে কল্পনা করা যায়" the worst ruler imaginable of an empire composed of many creeds and rules, of diverse interests and way of life and thought."—ঔরংজেবকে নিকৃষ্ঠ বলা হয়েছে কারণ তাঁর প্রবল ধর্মান্ধ সুন্নীনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমান মানুষদের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এবং তার ফলে সাম্রাজ্যের মানবিক বনিয়াদ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এই 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক পূর্বপ্রজন্মের ঐতিহাসিকদের'—মুজাফ্‌ফর আলম ও সঞ্জয় সুব্রহ্মণ্যমের ভাষায় "personalityoriented historians of an earlier generation"—মতকে সরিয়ে দিয়ে বিগত প্রায় চারদশক ধরে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চায় মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওপরে উল্লিখিত মতটির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এই বোধ থেকে যে ইতিহাসের প্রকৃত পরিচালিকা শক্তি ব্যক্তিমানুষ নয়—বরং যূথবদ্ধ মানুষ, সমষ্টিবদ্ধ মানবতা—প্রতিষ্ঠান। পূর্বপ্রজন্মের ঐতিহাসিকরা মোগল-বিনাশের ধারাকে যতখানি 'সংকট' (crisis) রূপে দেখেছেন তার থেকে অনেক বেশি তাকে দেখেছেন একটি 'পতন' (Decline), একটি সরল অবনমনরূপে। একটি প্রতিষ্ঠান যখন ভেঙ্গে যায় তখন তার ভেতরে দেখা যায় নানা সমস্যার জাল। এগুলি সঙ্কটের জাল যা ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়, কণ্ঠ রোধ করে সাম্রাজ্যের অদৃশ্য প্রাণশক্তির। পূর্বপ্রজন্মের ঐতিহাসিকরা তাঁদের কষ্টসাধ্য গবেষণার আলো আমাদের দিয়েছিলেন। সেই আলোর মশাল হাতে নিয়ে পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হয়ে অনালোকিত আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির উন্মোচন ঘটাতে পেরেছিলেন। তাদের মত হল মোগল সাম্রাজ্য বিনাশের দ্বিতীয় মত। তা' আর্থ-সামাজিক মত। নীচে আমরা তার আলোচনা করব।

২.৪ মোগল সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক সংকট : পূর্বকথা

ব্যক্তিকেন্দ্রিক মোগল পতনের ধারণার থেকে সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকরা সরে এসেছেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে ঐতিহাসিকরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলি, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ সংগঠনকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে আছেন সৈয়দ নুরুল হাসান, ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, নোমান আহম্মদ সিদ্দিকি, ইখতেদার আলম, আতহার আলি, জে. এফ. রিচার্ডস, শিরিণ মুজভি, মুজাফ্ফর আলম, এস. এস. এ. এ. রিজভি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই—যেমন ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, আতহার আলি ইত্যাদি ঐতিহাসিকরা—মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ তেকে মোগল সমস্যার বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওযার চেষ্টা করেছেন। সতীশচন্দ্র বুঝবার চেষ্টা করেছেন প্রতিষ্ঠান হিসাবে **জাগির** ব্যবস্থার মধ্যে কি পরিবর্তন আসছিল এবং তার ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কি ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যাচ্ছিল। ইরফান হাবিব বুঝবার চেষ্টা করেছেন কিভাবে কৃষকসমাজ শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। আতহার আলি দেখার চেষ্টা করেছেন কিভাবে মোগল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত মিশ্রণ ও তাদের দ্বারা মোগল রাজস্বের আত্মসাৎ করার ঘটনা রাষ্ট্রের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করছিল। এককথায় এইসব ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয় ছিল কৃষিজগৎ, যেখান থেকে তৈরি হত রাজস্ব—মার্ক্সীয় পরিভাষায় সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus)—যা আত্মসাৎ করে শাসকশ্রেণী বেঁচে থাকত। মোগল যুগের 'সংকট' (crisis) বলতে তাঁরা এই 'কৃষি জগতের সংকটকেই ('Agrarian crisis') বুঝিয়ে থাকেন। এই কৃষি-সংকটের মধ্যে এই ঐতিহাসিকরা তিনটি সংকটকে দেখতে পেয়েছিলেন—তা হল **জাগির** বণ্টনের সমস্যা ও তৎজনিত সংকট, জাগির থেকে উত্থিত রাজস্ব বা সামাজিক উদ্বৃত্তের ক্রমহ্রাসমানতা জনিত সমস্যা ও সংকট— অর্থাৎ সম্পদ বিতরণের সংকট এবং শেষপর্যন্ত সামাজিক উদ্বৃত্ত কমে যাওয়ার ফলে ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে অভিজাতদের জীবনধারণ উপযোগী ঐশ্বর্যে টান পড়ায় কৃষক শোষণের মাত্রাবৃদ্ধি ও তৎজনিত সংকট। এই সমস্ত আলোচনার আদি সূচনা যিনি করেছিলেন তিনি কোন মার্ক্সবাদী নন। তিনি একজন ইংরাজ প্রশাসক। ঐতিহাসিক ডব্লু. এইচ্. মোরল্যাণ্ড (W.H. Moreland) দেখিয়েছিলেন যে, মোগল রাষ্ট্র ছিল অত্যন্ত স্বৈরাচারী এবং তার শাসন ছিল অতিশয় শোষণধর্মী। ইরফান হাবিব এবং নোমান আহম্মদ সিদ্দিকি এই ধারণাকে আলোচনার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে ধরে নিয়ে মোগল পতনের জন্য রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী শোষণ কাঠামোকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। হাবিবের আদর্শগত একই শিবিরের ঐতিহাসিক আতহার আলি দেখিয়েছেন যে, পতনের আসল কারণ একটা ভারসাম্যহীনতা (imbalance)। **মনসবদারদের** ক্রমকাঠামো (hierarchy) জায়গা করে নিয়েছেন বা নিতে চাইছেন এমন অভিজাতরা রাজস্ব বা সামাজিক উদ্বৃত্তের দাবীদার হিসাবে একটা কায়েমী স্বার্থ রচনা করেছিল। তাদের সংখ্যা যত বাড়ছিল সেই হারে **পাইবকি** (Paibaqi) বা 'বিতরণযোগ্য জমি' ('land to be assigned') না পাওয়ার ফলে দেশের শোষণযোগ্য প্রাপ্য সামাজিক উদ্বৃত্ত সম্পদ যা ছিল তার থেকে সেই উদ্বৃত্তের দাবীদারের সংখ্যা বাড়ছিল। এই সামাজিক উদ্বৃত্তের উৎপাদন ও শোষণ যে শুধু কৃষক ও **জাগিরদার** এই দুই শ্রেণীর মানুষের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করত তা' নয়। ঐতিহাসিক নুরুল হাসান দেখিয়েছেন যে, মোগল রসদ বন্টন কাঠামোয় বড়, মাঝারি ছোট ইত্যাদি নানা ধরনের জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা ছিল। সতীশচন্দ্র স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সংকট তৈরির ব্যাপারে **জাগিরদার,** জমিদার ও কৃষকদের ত্রিপাক্ষিক ভূমিকা ছিল। মুজাফ্ফর আলম আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে, অযোধ্যা, পাঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, সংকট সৃষ্টির ব্যাপারে **মাদাদ-ই-মাস** নামে নিষ্কর জমির দখলদার মালিক ও কর্তারাও অনেকখানি দায়ী ছিল।

ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আধুনিক কালের এই প্রগতিশীল ভারতীয় ঐতিহাসিকদের রচনার তিনটি দিক আছে। প্রথমত, এর ঝোঁক কৃষি-অর্থনীতির দিকে। দ্বিতীয়ত, এর দৃষ্টিকোণ স্পষ্টভাবেই মার্ক্সীয় শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ এবং তৃতীয়ত, এর অভ্যন্তরীণ যুক্তি হল একমাত্রিক সরল যুক্তি—ওপরের শোষণ আর নীচের ভাঙ্গন—এই দুইয়ের অভিঘাতে উৎপন্ন সঙ্কট থেকে একটি নিরন্তর ঘটমান বিস্ফোরণ যার থেকে সাধিত হল মোগল ব্যবস্থার উৎখাত। এই কারণে আজকালকার কোনও কোনও অ-মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক—যেমন, মুজাফ্ফর আলম ও সঞ্জয় সুব্রহ্মণ্যম্ এই মোগল পতনের তত্ত্বকে "মার্ক্সবাদ-সুরভিত ইতিহাস" ("Marxist-flavoured history") বলে বর্ণনা করেছেন এবং তার মধ্যে কেবল "এক যুক্তির অবস্থানকে' ("existence single of logic") নিন্দা করেছেন।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বিশেষভাবে দাঁড়িয়ে আছে দুটি জিনিসের বিশ্লেষণের ওপর—এক, প্রতিষ্ঠান হিসাবে **জাগির** ব্যবস্থা সংকট এবং দুই, ক্রমবর্ধমান শোষণের মুখে কৃষকদের প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আরেকটি সংকট। এই দুই সংকটকে আবিষ্কার এবং তাদের একটি গভীর যুক্তিশীল বিষয়মুখী আলোচনার মধ্যে আটকে ফেলার সাথে সাথে বোঝা গেল যে, পূর্বপ্রজন্মের ঐতিহাসিকদের কথিত সপ্তদশ শতাব্দী শুধুমাত্র মহানায়কদের শতাব্দী নয়, কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দী শুধুমাত্র ভাঙ্গনের শতাব্দী নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন একদিকে মহানায়কদের উদ্ভাস তখন অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানজনিত বিশৃঙ্খলার সূচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মোগল কেন্দ্রীয় পরাক্রম অস্তায়মান তখনই অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে মোগল শৌর্যের উত্তরাধিকারী আঞ্চলিক রাষ্ট্র। টি. জি. পি. স্পিয়ার বলেছিলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দী শুধু দুর্বল, ক্ষয়িষ্ণু মানুষের শতাব্দী নয়, তা ক্ষমতালিপ্সু, প্রবল ভাগ্যন্বেষীদের শতাব্দীও বটে। আসলে কোনও যুগেই শক্তিশালী মানুষের অভাব হয় না। আঠারো শতকেও হয়নি।—উদাহরণস্বরূপ, সেই শতকের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সঈদ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল্-মূলক, আবদুস সামাদ খান, জাকারিয়া খান, সাদাত খান, সফদার জং, মুরশিদকুলি খান এবং জয়সিংহ সওয়াই-এর মত যোগ্য প্রশাসক ও প্রতিভাধর সামরিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এঁরা জন্মেছিলেন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যখন বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসছিল, যখন প্রতীচ্য শক্তিগুলির বাণিজ্যিক লালসা ও লুণ্ঠনবৃত্তি তুঙ্গে উঠেছিল আর যখন কেন্দ্রীয় শাসকদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সদিচ্ছা প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ফলে এই সমস্ত প্রতিভাবান, কুশলী নেতৃবর্গের ক্ষমতা ব্যয়িত হয়েছিল রাষ্ট্রের স্বার্থে নয়, নিজের বা নিজের দলের স্বার্থে। মোগল শিবিরে তখন দলবাজি হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বড় ঘটনা।

মোগল শিবিরে অভিজাতরা দুটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল। যারা এই দেশের মাটিতে জন্মেছিলেন কিংবা দীর্ঘদিন ধরে এখানে ছিলেন তাঁরা ছিলেন **হিন্দুস্তানী** দল, যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্মের মানুষ ছিল। এই দলের মধ্যে ছিলেন বরহা-র (Barha) সঈদ ভ্রাতৃদ্বয় খান-ই-দৌরান [তাঁর পূর্বপুরুষরা বদখশান থেকে এসেছিলেন], ও আফগান অভিজাতরা। এই দলের মধ্যে যে মুসলমান অভিজাতরা ছিলেন তাঁর নির্ভর করতেন তাঁদের দলভুক্ত হিন্দু সহকর্মীদের ওপর। এঁদের বিপরীত দিকে অবস্থান করতেন এক বিরাট সমাহৃত সম্ভ্রান্ত মানুষ যাদের মধ্যে ছিল পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার থেকে আগত মুসলমান অভিজাতবৃন্দ যাদের সাধারণভাবে বলা হত মোগল। তারা আবার যে যে দেশ থেকে আসতেন কিছুটা সেই সেই দেশের ভিত্তিতে, কিছুটা আবার শিয়া-সুন্নীর বিভাগের ভিত্তিতে দুটি দলে বিভক্ত হতেন। যাঁরা মধ্য-এশিয়ার পরপার থেকে এসেছিলেন এবং সুন্নী ধর্মের মানুষ ছিলেন তাঁদের একটি দল ছিল যাকে বলা হত **তুরানী** (Turani)। এই দলে ছিলেন মহম্মদ আমিন খান ও তাঁর জ্ঞাতিভাই চিন্ কিলিচ্ খান (যিনি নিজাম-উল-মূলক নামে পরিচিত)। এঁদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেন আরেকটি দল যাদের বলা হত **ইরানী** (Irani) দল। এঁরা এসেছিলেন পারস্য থেকে ; ধর্মের দিক

থেকে ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী এবং এঁদের নেতা ছিলেন আসাদ খান ও জুলফিকার খান। এই দলগুলিকে রাজনৈতিক দল ভাবলে ভুল হবে। এদের কোনও সাধারণ আদর্শ ছিল না। এদের লক্ষ্য ছিল স্বার্থসিদ্ধি, বন্ধন ছিল শিয়া-সুন্নী এই ধর্মীয়-ভিত্তিক আনুগত্য এবং তাদের কর্মসূচী ছিল রাজস্ব ও ক্ষমতা অধিকতর আত্মসাৎ করা। বাহাদুর শাহ ও জাহান্দার শাহের সময়ে **ইরানী** দল ক্ষমতায় ছিল। তখন তাদের নেতা ছিলেন জুলফিকার খান। ফারুকশিয়রের রাজত্বের সময় থেকে **হিন্দুস্তানী** দল **তুরানী** দলের সঙ্গে সমঝোতা করে ক্ষমতায় ছিল। তারপরে তুরানী আর **ইরানীরা** হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিল। এইরকম দলবাজি ও দলীয় কোন্দল মোগল শাসনের ওপর-কাঠামোর গঠনতন্ত্রকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। যেহেতু মোগল রাষ্ট্রব্যবস্থা জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না সেইহেতু তাকে নির্ভর করতে হত একদিকে সামরিক বাহিনী আর অন্যদিকে অভিজাতদের ওপর। যেহেতু **জাগিরদারি** ও **মনসবদারি** প্রথার মধ্যে গভীর সংযোগ ছিল সেহেতু এই দলীয় কোন্দল সাম্রাজ্যের সামর্থ্যকে কমিয়ে দিয়েছিল, সামরিক বানিহীকে করেছিল হীনবল। তার ওপর সারা পৃথিবীতে যখন যুদ্ধের কৌশল বদলে গেছে, যখন নতুন ধরনের বিস্ফোরক হাতিয়ার এসে গেছে সেই সময়ে মোগল অভিজাতরা দলীয় বিবাদে মত্ত থেকে পরিবর্তনশীল যুগের হাওয়াকে বুঝতে পারেননি। স্বার্থনিমগ্ন অভিজাতদের এই অপদার্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯) ও বারবার আহম্মদ শাহ আবদালির ভারত অভিযানের ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, উপদলীয় রেষারেষি একসময়ে মোগল দরবারে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যের দুর্দিনে অভিজাতরা কেউই শক্ত হাতে সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারেনি। অথচ নিজেদের স্বার্থ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

২.৫ স্বল্প জাগির, দলীয় রাজনীতি ও ক্রমহ্রাসমান সম্পদের সমস্যাজনিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন

প্রতিভাবান মোগল সম্রাটরা—আকবর থেকে ঔরংজেব পর্যন্ত সকলেই—একটি আত্তিকরণের নীতিকে (policy of assimilation) অনুসরণ করতেন। সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিরন্তর তাঁরা মিত্রশক্তি খুঁজতেন। যখনই তাঁরা দেখতেন যে কোথাও কোনও আঞ্চলিক শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাকে আর দমন করা যাচ্ছে না, কিংবা কোথাও কোনও জাতি বা গোষ্ঠী এত ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে যার ফলে তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না তখনই সেই জাতি বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীর নেতাদের উচ্চ **মনসব** দিয়ে মোগল গঠনতন্ত্রের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা তাঁরা করতেন। এর ফলে নতুন **জাগির** ও নতুন **মনসব**-এর প্রয়োজন হত সবসময়ে, কারণ মোগল সম্ভ্রান্তরূপে যারা দলে আসতেন তাদের দিতে হত **জাগির** ও **মনসব**। নতুন **জাগিরের** জন্য প্রয়োজন হত আরও রাজ্যাংশ, আরও রাজস্ব। তার জন্য সাম্রাজ্যকে সবসময়ে সম্প্রসারণ করতে হত। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য দরকার হত সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ আর সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য দরকার হত আরও প্রশাসক ও সেনানায়কের। এইটিই ছিল মোগল সাম্রাজ্যবাদের অপ্রতিরোধ্য অভ্যন্তরীণ গতি। এই গতির নিরঙ্কুশ তাড়নায় সাম্রাজ্য যত বেড়েছে ততই বেড়েছে **জাগিরদারদের** ও **মনসবদারদের** সংখ্যা। সম্রাট স্বয়ং ছিলেন **মনসবদার** নিয়োগের ও **জাগির** প্রদানের একমাত্র কর্তা। **জাগির** কেড়ে নেওয়ার, **জাগিরদারকে** স্থানান্তরিত করার ও **জাগিরের** পরিমাণ বৃদ্ধির এবং **মনসবদারদের** পদ বৃদ্ধি, **মনসবদারদের** উন্নতি ও **মনসবদারদের** পদচ্যুতির চরম অধিকর্তা ছিলেন সম্রাট। ফলে **মনসবদারদের** আনুগত্য ছিল শুধু সম্রাটের কাছে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার ফলস্বরূপ তাঁরা পেতেন **জাগির**। এই ধরনের সম্পর্ককে পাশ্চাত্যের

ঐতিহাসিকরা—যেমন, এম. এন. পিয়ারসন—পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক (Patron-Client Relations) বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের সম্পর্ক দলীয় প্রাধান্য, ধর্মীয় বন্ধন, জাতিগত আনুগত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করত। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে সম্রাট ও মনসবদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠত দুটি জিনিষের ওপর—দান ও প্রাপ্তি। সম্রাটের দান ও **মনসবদারদের** প্রাপ্তির আকাঙক্ষা এই দুইয়ের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য সাম্রাজ্য ও সম্পদের নিয়ত বিস্তার ঘটাতে হত। যতদিন সম্রাটরা ছিলেন কঠিন, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়শীল ততদিন কোনও বড় মাপের সমস্যা দেখা দেয়নি। আকবরের মত সম্রাটদের যদি ব্যক্তিগত গুণাবলী থাকত, কিংবা প্রতিভাবান সম্রাটদের মতন যদি সম্রাটরা যুদ্ধক্ষেত্রে, রাজ্যজয়ের ব্যাপারে অসামান্য দক্ষতা দেখাতে পারতেন তাহলে সহজেই তাঁরা **মনসবদারদের** আনুগত্যলাভ করতেন। এর ফলে আকবর থেকে ঔরংজেব পর্যন্ত সম্রাটরা রাজ্যবিজয়ের নীতিকে অবারিত রেখেছেন।

এইরকম ব্যবস্থার তিনটি অসুবিধা ছিল। এক, নিরন্তর রাজ্যজয় মানে নিরন্তর যুদ্ধ—আর তার ফল হল ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার ও ক্রমশূন্যায়মান রাজকোষ। আকবর তাঁর অসামান্যতার দ্বারা শাসকশ্রেণীর আনুগত্যলাভ করেছিলেন। শাহজাহানের সময়ের সাময়িক অসাফল্য সেই আনুগত্যের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঔরংজেব তাই ক্ষমতায় আরোহণ করেই দুর্বার রাজ্যজয়ের নীতি গ্রহণ করে নিজেকে পিতার চেয়ে যোগ্যতার প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। সাময়িকভাবে হয়ত তিনি শাসকবর্গের আনুগত্য পেয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণভারতে তাঁরা ব্যর্থতা পুনরায় শাসকশ্রেণীর আনুগত্যের ভিতকে টলিয়ে দিয়েছিল। তাঁর সময় ব্যয়ভার বেড়েছিল, রাজকোষও শূন্য হয়ে গিয়েছিল। দুই, শাসকশ্রেণী যাতে খুব শক্তিশালী না হয়ে পড়ে তার জন্য সম্রাটরা নিজেরাই শাসকশ্রেণীর জাতি-বৈষম্য ও গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। একদল আমীরকে অন্যদলের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। তিন, বিভিন্ন দলভুক্ত অভিজাতরা জানতেন যে, মোগল শাসনব্যবস্থা বেশি সুদৃঢ় হয়ে উঠলে তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, দলীয় প্রাধান্য ও রসদের আত্মসাৎ করা (appropriation) কমে আসবে। ফলে তাঁরা সর্বদা তাঁদের ধর্মীয়, আঞ্চলিক ও ভাষাগত বিভেদগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেন। এই সমস্ত কিছুর টানাপোড়েনে মোগল রাষ্ট্রশক্তির অন্তরপটে একটা চিরস্থায়ী দুর্বলতা বাসা বেঁধেছিল।

মনসবদারদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ছিল সবথেকে বিপজ্জনক। **মনসবদাররা** সমস্ত আদায়কৃত রাজস্বের সিংহভাগ আত্মসাৎ করত। শিরিণ মুজভি লিখেছেন যে, আকবরের সময়ে **মনসবদারদের** সমস্ত **জমার** (Jumma) নির্ধারিত রাজস্বের [রাজস্বের যে অংশ আদায় হত তাকে বলা হত **হাসিল,** আর যে অংশ হত না তাকে বলা হত **বাকী**।] ৮২ শতাংশ আত্মসাৎ করত। তখন **মনসবদারদের** সংখ্যা ছিল ১,৬৭১। শিরিণ মুজভির মতে, এই স্বল্পসংখ্যক মানুষ সাম্রাজ্যের নীট (Net) রাজস্বের ৮২ শতাংশ গ্রাস করত। তাঁর দেওয়া একটি পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল। ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ **মনসবের** অধিকারী ছিলেন ১২ জন। তাঁরা আত্মসাৎ করতেন রাজস্বের ১৮.৫৯০ শতাংশ। ১৩ জন ছিলেন ২,৫০০ থেকে ৪,৫০০ মাপের **মনসবদার**। তাঁরা গ্রাস করতেন ১১.৭২৪ শতাংশ রাজস্ব। এর পরেই ছিলেন ৯৭ জন ৫০০ থেকে ২,০০০ মাপের **মনসবদার**। তাঁদের করায়ত্ত ছিল ২১.৫৭৯ শতাংশ রাজস্ব। এই তিন স্তরের **মনসবদাররা** ছিলেন প্রথম পর্বের উঁচু মাপের **মনসবদার**। এর পরের **মনসবদাররা** ছিলেন ক্রমকাঠামোর সবচেয়ে নীচুস্তরের **মনসবদার**। এঁদের মধ্যে ৩৬৫ জনের মনসব ছিল ১০০ থেকে ৪০০ মাপের, আর তাঁদের দখলে ছিল ১৩.৮১২ শতাংশ রাজস্ব। এঁদের পরেই ছিলেন ১,১৮৪ জন ৮০ থেকে ১০০ মাপের **মনসবদার**। তাঁরা ভোগ করতেন মোট রাজস্বের ১৬.৪৬৪ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, মাত্র ১২ টি পরিবার দেশের উদ্বৃত্ত আর্থিক সম্পদের ১৮ শতাংশের বেশি গ্রাস করে নিত। ২৫টি পরিবার ভোগ করত ৩০ শতাংশের মত সম্পদ। ১২২টি পরিবার লুঠ করে নিত দেশের উদ্বৃত্ত সম্পদের অর্ধাংশ। আকবরের সময়ে শাসকশ্রেণীর একেবারের ভেতরের কি মুষ্ঠিমেয়

সামান্য কয়েকজন মানুষ দেশের উদ্বৃত্ত সম্পদকে কুক্ষিগত করত তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। ঐতিহাসিক লাহোরির (Lahori) **বাদশানামা** থেকে আমরা শাহজাহানের রাজত্বকালের ১০ম ও ২০তম বছরের পরিসংখ্যান পেয়ে থাকি। [আকবরের সময়কার তথ্য আমরা পাই আবুল ফজলের **আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা** থেকে] তাঁর তিরিশতম বছরের পরিসংখ্যান পাই মহম্মদ ওয়ারিশ-এর (Mohamed Waris) **বাদশাহনামা** থেকে। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে ৫০০ বা ততোধিক **জাট মনসবের** অধিকারী অভিজাতরা রাষ্ট্রের মোট জমার ৬১.৫৪ শতাংশ রাজস্ব আত্মসাৎ করত। শুধু শীর্ষ ২৫ জন **মনসবদার** ও তাদের পরিবার গ্রাস করে নিত ২৪.৩ শতাংশ **জমা**। লক্ষণীয় যে, আকবরের রাজত্বকালে শীর্ষ ২৫ জন গ্রাস করত ৩০.২৯ শতাংশ **জমা**। যত দিন যাচ্ছিল তত সর্বোচ্চ **মনসবদারের** রাজস্ব আত্মসাৎ করার ঘটনা সামান্য কমছিল ঠিকই, কিন্তু **মনসবদারদের** সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছিল যে, তাদের আত্মসাতের পরিমাণও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একদিকে যুদ্ধের খরচ বাড়ছিল, অন্যদিকে **মনসবদারদের** আত্মসাৎও বাড়ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজস্ব বাড়ছিল না। রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদের ক্রমহ্রাসমানতা রোধ করার কোনও উপায় ছিল না। ঔরংজেব সমস্ত বিলাসিতা বর্জন করে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার কমাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণের বিরামহীন যুদ্ধ আর উত্তরের ক্রমবর্ধমান অরাজকতা সম্মিলিতভাবে বিপর্যয়ের পরিমণ্ডলকে ঘনিয়ে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়েছিল। জাগিরদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি আর রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদের হ্রাসপ্রাপ্তি এই দুই ঘটনা ঘটেছিল একটি বড়মাপের অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ভারতবর্ষে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বাড়ার ফলে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমের বাজারে পণ্যসামগ্রী চলে যেতে থাকে। ফলে ইরাণ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এইসব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা বিলাসী দ্রব্যে আসক্ত ছিল। নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। একে মুদ্রামূল্য হ্রাস পেল, তার ওপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল—অর্থাৎ তাদের প্রকৃত আয় (real income) কমে গেল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র লিখেছেন যে, অভিজাতদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের আয় বাড়ছিল না। রাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় কমে যাওয়ায় তাদের ঘাটতি যোগানের আর কোনও উপায় রইল না। সামাজিক উদ্বৃত্ত যা ছিল তা প্রশাসন, যুদ্ধ আর বিলাসী জীবন কোনটার চাহিদাই আর মেটাতে পারল না—".....the available social surplus was insufficient to defray the cost of administration, pay for wars of one type or another and to give the ruling class a standard of life in keeping with is expectations"। ভারতবর্ষের সমকালীন অর্থনীতির ভিত্তিই ছিল কৃষিকাজ। দুর্ভাগ্যবশত কৃষির উৎপাদনও বাড়েনি, কৃষিপণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পায়নি। ফলে কৃষিসম্পদ থেকে সামাজিক উদ্বৃত্ত (social surplus) গড়ে তোলার সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। এর ফলে রাষ্ট্রপর্যায়ে 'জমা' বা প্রতিবছরের নির্ধারিত রাজস্বের বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়াল প্রান্তিক। নির্ধারিত রাজস্ব বৃদ্ধির হার যখন ক্রমহ্রাসমান তখন 'হাসিল' বা আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণও ক্রমশ কমে যেতে লাগল।

এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে দেখা দিল সামাজিক সংকট। **জাগিরদাররা** আরও উৎকৃষ্ট **জাগিরের** সন্ধান করতে লাগলেন—এমন জাগির যার থেকে আরও অনেক বেশি রাজস্ব পাওয়া যায়। অন্তত রাজস্ব পূর্ণমাত্রায় আদায় হয় এমন **জাগিরের** জন্যও কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কিন্তু বণ্টনযোগ্য উৎকৃষ্ট **জাগির** আর ছিল না। ফলে জাগিরদারদের মধ্যে দেখা দিল প্রতিযোগিতা আর দলবাজি। "...এই দ্বন্দ্বকে আরো তীব্রতর করল জায়গিরের অসম বণ্টন ও মুষ্টিমেয় মনসবদারদের হাতে সম্পদের অসম বণ্টন।"

ওপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি বোঝা গেল তা' হল যে, সম্পদের ঘাটতি থেকে জাগির সংকটের

সৃষ্টি। সম্প্রতি জে. এফ. রিচার্ডস দেখিয়েছেন যে, **মনসবদারদের** সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জায়গিরের যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তা' সম্পূর্ণভাবে ঔরংজেবের অনুসৃত নীতির ফল। তাঁর সময় দাক্ষিণাত্যের বিরাট অঞ্চল মোগলদের অধিকারে এসেছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার বিরাট ভূ-সম্পত্তিকে যদি তিনি যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন তাহলে হয়ত জাগির সংকটকে এড়িয়ে যাওয়া যেত। সেখানে মোগল শাসনব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করে, আহৃত এই অতিরিক্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তিনি পুরনো মনসবদারদের **জাগির** দিতে পারতেন। তা'না করে সবচেয়ে উর্বর আর উৎকৃষ্ট জমিগুলিকে তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেললেন। উর্বর জমিকে **খালসা** জমি বলে চিহ্নিত করে তিনি সেখানে কর্তব্যরত **মনসবদারদের** জাগির দিলেন এবং যুদ্ধরত সৈন্যদের বেতনদানের কাজে ব্যবহার করলেন। বণ্টন করার জন্য তাঁর রইল শুধু **'পাইবাকী'** জমি যা ছিল একান্তভাবেই অনুর্বর এবং অত্যন্ত অরাজক অঞ্চলে অবস্থিত। অশান্ত অঞ্চলে রাজস্ব আদায় ছিল দুরূহ কাজ। যে সমস্ত মনসবদাররা সেখানে যেতেন তাঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেতেন না। এইভাবে **জাগির** সমস্যা বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে অর্থের নিদারুণ প্রয়োজনে ১৬৯৫ ও ১৬৯৭ সনে ঔরংজেব **'পাইবাকী'** জমি নিয়ে হায়দ্রাবাদে **খালসা** জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন কারণ **খালসা** জমির রাজস্ব সরাসরিভাবে পুরোটাই সরকার পেতেন। **জাগির** হিসাবে যে অতিরিক্ত জমি বণ্টন করা যেত তার পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ টাকা। রাষ্ট্র এই পুরো অর্থ শোষণ করে নেয়। এই দিক থেকে বিচার করে রিচার্ডস বলেছেন যে, **জাগির** সমস্যা কৃত্রিম—তা ঔরংজেবের ভ্রান্ত নীতির ফল।

মোগল সাম্রাজ্যে সম্পদের ঘাটতির বড় কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় শোষণ। মোরল্যাণ্ড, ইরফান হাবিব প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, মোগল রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী—রাজস্বের নিঃসীম শোষণের ওপর তা বেঁচে ছিল। হাবিব লিখেছেন যে, যত দিন যাচ্ছিল ততই রাজস্বের দাবী বাড়ছিল আর কৃষকরা উত্তরোত্তর খাজনার চাপে জর্জরিত হচ্ছিল। যেহেতু মনসবদারদের সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার তাদের **জাগিরের** রাজস্ব থেকে বহন করা হত সেইহেতু রাজস্বের দাবী ছিল ক্রমবর্ধমান। কৃষকদের সমস্ত উদ্বৃত্তটুকু রাজস্ব হিসাবে নিয়ে নেওয়া হত—তাদের হাতে থাকত বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম রসদ। ক্রমশ খাজনার হার এত বাড়ছিল যে, এই ন্যূনতম এবং অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় রসদটুকুর ওপর টান পড়ছিল। এর ফলে কোনও জায়গায় এমন হল যে, তাদের বেঁচে থাকার সামান্যতম রসদটুকুও আর রইল না (''under these conditions, it must have been inevitable that the actual bruden on the peasantry should become so heavy in some areas as to amount to depriving them of their means of survival.'')। প্রতিকারহীন এই শোষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য কৃষকরা তাদের জমিজমা ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। যতই দিন যাচ্ছিল ততই কৃষকদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছিল—''...the fight of peasant was a common phenomenon and that it was apparently growing in momentum with the passage of years''. দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারী এসবের জন্য কৃষকমৃত্যু, কৃষকদের প্রস্থান ও কৃষিকাজের সংহার ছিল সাধারণ ঘটনা। কিন্তু হাবিবের মতে, এই ''মনুষ্য-সৃষ্ট ব্যবস্থা'' ('man-made system') মানুষের এই শোষণ যে কোনও প্রাকৃতিক কারণ থেকে অনেক বড় কৃষক-নিধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে কৃষকরা কখনো কখনো ঘুরে দাঁড়াতে লাগল। আরম্ভ হল গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীসংঘাত। অনশন ও দাসত্ব একদিকে এবং অন্যদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহ এই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে কৃষকদের আর কোনও অবস্থান রইল না—''Beyond a point there was no choice left to the peasant but between starvation or slavery and armed resistance.''

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, **জাগির**-সংকট ও কৃষক-বিদ্রোহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঘটনা, আর দুই-ই একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংকটের ফল। রাষ্ট্রসংরক্ষণে মনসবদারদের ওপর নির্ভরশীলতা, সৈন্য পোষণের জন্য মনসবদারদের

জাগিরদান, জাগির থেকে আহৃত রাজস্বের ক্রমহ্রাসমানতা, মুদ্রামূল্যের হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সম্পদের বিষম বণ্টন, **জাগিরের** জন্য প্রতিযোগিতা ও কৃষক-পীড়ন এবং সর্বশেষে কৃষকদের পলায়ন এবং তাদের বিদ্রোহ—এই সমস্ত ঘটনাই মোগল রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে নিহিত বিষচক্রের অবশ্যম্ভাবী ফল। আধুনিককালের এই আর্থসামাজিক ব্যাখ্যা মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়কে একটি সংকট (crisis) রূপে দেখেছে। অনেক আগের প্রজন্মের ঐতিহাসিকরা—আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা—মোগল অবক্ষয়কে একটি পতন (decline) রূপে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে তাঁরা এই পতনকে প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়রূপে না দেখে শ্রেণীগত বিপন্নতারূপে দেখেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, মোগল ইতিহাসের চিন্তাশীল ছাত্রছাত্রীর কাছে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পতনের থেকে বিস্ময়কর ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। শুধু এক প্রজন্মের নায়করাই ইতিহাসের মঞ্চ দখল করে থাকে। তাদের ঔরস থেকে জন্ম হয় না দ্বিতীয় প্রজন্মের নায়ক। হয়ত মোগলদের হারেম ব্যবস্থা—সম্ভ্রান্তশ্রেণীর বিলাস আর নারীলোলুপতা সাম্রাজ্যের নেতৃত্বের পর্যায়ে অবনমন এনে দিয়েছিল। সম্রাট ঔরংজেবের ধর্মান্ধতাও যে সংকটের পরিমণ্ডলকে ঘনীভূত করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর বিপর্যয় যত গাঢ় হতে লাগল তার সুযোগ নিয়ে বিদেশি বণিকরা ততই রাষ্ট্রকাঠামোর ভিতরে শক্তির কেন্দ্রীয় অধিষ্ঠানের জায়গাটিতে ঢুকে পড়তে লাগল। মোগল সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নৌবহর ছিল না। তাই উপকূলের সুরক্ষা তারা করতে পারেননি। প্রথমে উপকূলের বাণিজ্যে এবং পরে উপকূলের রাজনীতিতে বিদেশী বণিকরা প্রবেশ করে পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। অভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিত মোগল সাম্রাজ্য এই প্রায় নীরব, গোপন, কখনো প্রকাশ্য—অথচ সবসময়ে চতুর বিদেশিদের চক্রান্ত ও অভিসন্ধিমূলক তৎপরতাকে ঠেকাতে পরেনি। মোগল সাম্রাজ্যের ব্যর্থতা তার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২.৬ সারাংশ

মোগল সাম্রাজ্যের পতন কোনও অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। ব্যক্তির ব্যর্থতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সংকট। সবকিছুই পূর্বাপর ঘটনার সঙ্গে পরম্পরা বজায় রেখেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্পদের বিষম বণ্টন **জাগিরদারদের** মধ্যে চক্রান্ত আর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে থাকে, তবে **জাগিরদারদের** শোষণ ও কৃষক-নিপীড়নও কৃষকবিদ্রোহের কারণ হয়েছিল। রাষ্ট্রশীর্ষে ঔরংজেবের মতন শাসকের উপস্থিতি শেষপর্যন্ত সম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। একদিকে সুন্নী শাসকরূপে তার ধর্মান্ধতা, অন্যদিকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর সেখানকার **জাগির** ও সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকে বিনষ্ট করেছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পতন ও ব্যর্থতাও সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মোগল দরবারে দলব্যবস্থা, দলীয় কোন্দল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে মুদ্রামূল্য হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিবেশে নিরবচ্ছিন্ন এবং অধোগামী দল ও উপদলের দ্বন্দ্ব আর চক্রান্ত শেষপর্যন্ত মোগল শাসনের দৃপ্ত কাঠামোকে অসার করে তুলেছিল। শেষপর্বে—ঔরংজেবের সময় থেকেই—মোগলদের অনুসৃত রাজপুতনীতির ফল হয়েছিল এই যে, মোগল দরবারে ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আয়তনের মধ্যে রাজপুতরা ক্রমশই প্রান্তিক হয়ে আসছিল। মোগলদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতির ফলে আফগানরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে দেখা গেল যে, যতই দিন যাচ্ছে ততই রাজপুত আর আফগানরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার কাজ থেকে সরে আসছে। এইভাবে সাম্রাজ্য-প্রতিরক্ষায় দুটি যোদ্ধৃজাতির ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে যাওয়ার ঘটনা মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়েছিল আফগান-রাজপুতদের প্রান্তিক হওয়ার বিষময় ফল। সেখানে নিরন্তর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসা মোগলবাহিনীকে পুনরায় শক্তি যোগানোর

মত নতুন কোনও সামরিক মানবসম্পদের (Military manpower) সঞ্চয় আর মোগলদের ছিল না। এই পরিবেশেই দুর্দান্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল শিখ, সৎনামি ইত্যাদিদের বিদ্রোহ। ঘনায়মান মোগল দুর্বিপাকের এই পরিবেশের মধ্যেই সপ্তদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন শিবাজী। দক্ষিণে মারাঠা আর উত্তরে শিখ, সৎনামি ও জাঠদের বিদ্রোহ যখন দুদিক থেকে সাম্রাজ্যকে পিষে মারছে তখনই দেখা দিচ্ছে মোগল শাসক শিবিরে যুবরাজ আকবরের মতন শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ দাবীদারের বিদ্রোহ যা শাসক শিবিরের অনৈক্যকে প্রতিপন্ন করেছিল। অনৈক্য যখন প্রকট তখনই দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে সম্রাটরা অকর্মণ্য, হারেমের প্রভাবে নিস্তেজ এবং বিলিসিতায় বিধুর ও 'বেখবর'। বিদেশি আক্রমণ এই পরিবেশেই সম্ভব। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের এবং তারপরে আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণ যখন ঘটল তখন অভ্যন্তরীণ সংকটে মোগল সাম্রাজ্য এতটাই হীনবল যে তার পক্ষে আর প্রতিরোধ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভাবতেও অবাক লাগে যে ঔরংজেবের সময়ে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড় আয়তন ও সবচেয়ে বেশি রাজস্ব ও রসদের অধিকারী হয়েছিল। অথচ ঠিক সেই সময়েই কি নেতৃত্ব পর্যায়ে, কি আরও নীচের স্তরে মোগল সাম্রাজ্য মানবশক্তি সঞ্চালনের ক্ষমতা উপাদানগুলি লুকিয়ে ছিল। সেই নীতি থেকে সরে এসে পরবর্তীকালের সম্রাটরা মোগল স্থায়িত্বের সম্ভাবনাটিকে বিলীন করে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে আমরা মোগল সাম্রাজ্যে একটা ক্রমিক বিলীয়মানতার ধারাকে লক্ষ্য করি যার থেকে মোগল সাম্রাজ্যের আর পরিত্রাণ ছিল না।

২.৭ অনুশীলনী

১। পরবর্তী মোগল শাসকদের পর পরিণতি কি হয়েছিল? (দশ লাইনের মধ্যে উত্তর দিন)।

২। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবক্ষয়ের কথা বলতে ঐতিহাসিকেরা কি বলতে চেয়েছেন? (পাঁচ লাইনে উত্তর দিন)

৩। নীচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ভুল? (✓) অথবা (✗) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

(ক) ইতিহাসের প্রকৃত পরিচালিকা শক্তি ব্যক্তিমানুষ নয়—বরং যূথবন্ধ মানুষ, সমষ্টিবন্ধ মানবতা—প্রতিষ্ঠান।

(খ) সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিকেরা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ব্যক্তিকেই দায়ী করেছেন।

(গ) কোনও কোনও ঐতিহাসিক মোগল যুগের সংকট বুঝতে কৃষিজগতের সংকটকেই বোঝান।

(ঘ) মোগল অভিজাতদের মধ্যে দলবাজী একেবারেই ছিল না।

(ঙ) যেহেতু মোগল রাষ্ট্রব্যবস্থা জনসমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না সেইহেতু তাকে নির্ভর করতে হত একদিকে সামরিক বাহিনী আর অন্যদিকে অভিজাতদের ওপর।

৪। **একটি বাক্যে উত্তর দিন :**

(ক) তুরানী দলের মানুষেরা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

(খ) ইরানী দলের মানুষেরা কোথা থেকে এসেছিলেন?

(গ) নাদির শাহ ভারতবর্ষ কবে আক্রমণ করেছিলেন?

(ঘ) মনসবদার নিয়োগ ও জাগির প্রদানের একমাত্র কর্তা কে ছিলেন?

(ঙ) হাসিল কাকে বলা হত?

৫। **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) সম্পদের ঘাটতি থেকে—সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) খালসা জমির রাজস্ব সরাসরিভাবে পুরোটাই——পেতেন।

(গ) ঐতিহাসিক রিচার্ডস বলেছেন যে, জাগির সমস্যা——ভ্রান্ত নীতির ফল।

(ঘ) আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা মোগল অবক্ষয়কে একটি——বা——রূপে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন।

(ঙ) আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়কে একটি——বা——রূপে দেখেছেন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

1. Sharma S. R. : Mughal Empire in India.
2. Keene : The Turks in India.
3. Irvine : The Later Mughals.
4. Qureshi : India under the Mughals.
5. Alam. Muzzafar & Subramanium, Sanjay : (ed) The Mughal State. 1526-1750.
6. Habib, Irfan : Agrarian System of Mughal India.
7. Moreland, W. H. : From Akbar to Aurangazeb–A Study in Indian History.
8. Chandra, Satish : Medieval India–Society, the Jagirdar classes and the village
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর : অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা।

একক ৩ ❑ মনসবদারি ব্যবস্থা

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ মনসব : মুঘল শাসকশ্রেণীর সংগঠন

৩.২.১ আকবরের আমলে মনসবদারী ব্যবস্থা

৩.২.২ মনসবদার : জাট ও সওয়ার

৩.২.৩ মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতা

৩.৩ মনসবদারি ও জাগির ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক

৩.৩.১ মানসবদারদের নিয়োগ ব্যবস্থা

৩.৩.২ মনসবদারি ব্যবস্থা : দাগ ও চেহরার অর্থ

৩.৩.৩ মানসবদারি অর্থ : উত্তরাধিকারের প্রশ্ন

৩.৪ রাজস্বব্যবস্থা ও কৃষি

৩.৪.১ মুঘল রাষ্ট্র ও উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা

৩.৪.২ বিভিন্ন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক

৩.৪.৩ মুঘল রাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহের কারণ ও বিদ্রোহের চরিত্র

৩.৫ মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কট নিয়ে বিতর্ক

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

মুঘল শাসনাধীন ভারতকে জানতে হলে কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার, ধর্মনীতি বা রাজপুত নীতির আধারে তাকে সম্যকভাবে চেনা যাবে না। মুঘলরা ভারতবর্ষের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে এক শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে এই রাজবংশের একটা বড় কৃতিত্ব। সেইজন্য সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক দিকটি সম্পর্কেও আপনাদের জানতে হবে। দেখতে হবে কিভাবে অভিজাত আমির-ওমরাহরা মুঘল শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে মনসব এবং জাগির ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাহলে আপনারা দেখবেন। কিভাবে মনসব এবং জাগির যুগপৎ মুঘল শাসনের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল, আবার পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ সাম্রাজ্যের পতনের পথও প্রস্তুত করেছিল। সেই সঙ্গে এই ব্যবস্থার সাথে কৃষি-অর্থনীতির সম্পর্কের কথাও আপনাদের জেনে রাখতে হবে। কারণ কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে এই সকল ব্যবস্থার যোগাযোগ ছিল গভীর।

৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন মমসবদারি ব্যবস্থাটি কি ও কেমনভাবে তা মূলত সম্রাট আকবরের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। মনসবদারি ব্যবস্থার কি সম্পর্ক ছিল। আকবরের ও তাঁর পরবর্তী সময়ে মনসবদার ব্যবস্থার চরিত্র জটিল হয়ে পড়ে। মনসবদারি ব্যবস্থায় দুর্নীতি আটকানোর জন্য সম্রাটগণ চেহরা ও দাগের মতো কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা জানা যাবে। জানতে পারবেন জাট ও সওয়ার বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি। আগেই বলা হয়েছে মনসবদারি ব্যবস্থার সঙ্গে জায়গিরদারি ব্যবস্থা ছিল গভীরভাবে সংযুক্ত। মুঘল কৃষি-ব্যবস্থার সঙ্গে আবার জায়গিরদারি ব্যবস্থা ছিল তেমনিভাবে যুক্ত।

জায়গিরদানের মাধ্যমে মনসবদারদের বেতন দেওয়া হত। এই জায়গিরদানের মাধ্যমে কৃষি-উদ্বৃত্ত আদায় করা হত। কৃষি-উদ্বৃত্ত কৃষিকার্য পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করা হত ভাগচাষ, কানকুত, জবৎ ইত্যাদি। রাজস্ব অত্যন্ত কড়াভাবে আদায় হত, না দেওয়া ছিল বিদ্রোহের সমান। রাজস্ব আদায় নিয়ে মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষকদের শোষক-শোষিতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও মুঘল রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল কৃষকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। ঔরঙ্গজেব কেমন করে শেষ জীবনে কৃষকদের ধ্বংসের পথে না ঠেলে দেবার জন্য হাহাকার করেছিলেন তাও জানতে পারা যাবে। আবার কেন মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছিল, তাও এই এককটি পাঠ করলে জানা যাবে।

৩.২ মনসব : মুঘল শাসকশ্রেণীর সংগঠন

ঐতিহাসিকদের মতে, মনসবদারি ব্যবস্থা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণীর সংগঠন। আবুল ফজলের সাক্ষ্য অনুযায়ী (আইন-ই-আকবরী) আকবর এই ব্যবস্থার সাংগঠনিক-রাজনৈতিক চরিত্র নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মনসবদারি ব্যবস্থার কিছু কিছু অস্তিত্ব তুর্কিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দশ এককের সংখ্যায় ঘোড়াসওয়ারের হিসেব রাখা হত। একজন 'খাস' ১০,০০০ ঘোড়াসওয়ারের কর্তৃত্ব করত, একজন মালিক ১০০০ জন ঘোড়াসওয়ারের ও একজন আমীর ১০০ জন ঘোড়াসওয়ারের কর্তৃত্ব করত। এই ব্যবস্থায় যুগপৎ দশ এককের হিসেব ও ধাপ (rank) যুক্ত ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ব্যবস্থা তৈমুরলঙের আমলে সঠিকভাবে কার্যকরী ছিল কিন্তু ১৪০৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙে পড়ে। দারিদ্রের জন্য সঠিক সংখ্যার ঘোড়াসওয়ার রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যদিও ধাপের সঙ্গে যুক্ত সম্মান আগের মতনই থাকে। এর ফলে উঁচু সম্মানযুক্ত অফিসাররা কমসংখ্যক ঘোড়াসওয়ার রাখতে পারত। দিল্লির সুলতানদের আমল এইএকই ব্যবস্থার রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক বরনীর মতে; এক বিরাট সৈন্যসংখ্যার যে অস্তিত্ব সুলতানি আমলে দেখা যায় তার প্রকৃত অস্তিত্ব ছিল না।

৩.২.১ আকবরের আমলে মানসবদারি ব্যবস্থা

আকবর এই সমস্ত উপাদান নিয়েই তাঁর ধাপযুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সুলতানি যুগের ব্যবস্থা থেকে তিনি বিভিন্ন সংখ্যার ধাপের অনুকৃতি (model)-টি গ্রহন করেন। এর সঙ্গে যুক্ত করেন বিভিন্ন ধাপের সংখ্যা ও নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য হাজির করার দাসত্ব ও মনসবদারদের সম্পূর্ণভাবে খরচ চালাবার জন্য সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা। আকবর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় একজন পাঁচ হাজারি মনসবদার অথবা অন্য যে

কোনও সংখ্যার মনসবদার নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য হাজির করার দায়িত্ব বহন করত। সৈন্যসংখ্যার, সময় বিশেষ পর্যবেক্ষণ হত, ঘোড়াগুলির গায়ে সরকারি ছাপ মারা হত। নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য ও ঘোড়া ঠিক সময় হাজির করতে না পারলে শাস্তি হত। আকবরের প্রবর্তিত ব্যবস্থার আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারি ব্যবস্থার ওপর মনসবদাদের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। আকবর কিছুকাল অর্থে বেতন দান করেন। এর জন্য সরকারি প্রশাসক বা কারোরিরা সরকারি ভূমি-রাজস্ব আদায় করেছিল। আকবরের পরবর্তীকালের সম্রাটগণ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন ও অর্থের পুরবর্তে ভূমির মাধ্যমে বেতনদান করার প্রথা চালু করেন। একজন মনসবদারের বেতন ঠিক হত তার ধাপ ও সামরিক দায়িত্বের হিসেব-নিকেশের মাধ্যমে। বেতন একবার ঠিক হলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূমি-রাজস্বের বরাত (assignment) দেওয়া হত। তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক ভাবে এই বরাত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জমিদারি ছিল না; অর্থে বেতনের পরিবর্তে ভূমি-রাজস্ব ভোগ করার অধিকার ছিল। একজন মনসবদারের বরখাস্ত অথবা মৃত্যু হলে বরাত সম্রাটের খাসজমিতে পরিণত হতো। সম্রাটের তোষাখানা থেকে কোনও ধার নেওয়া থাকলে তার কড়া হিসেবনিকেশ হত। মনসবদারের মৃত্যুর পর তার পরিবারবর্গ ভরণপোষণের বাবদ অল্প পরিমাণে রাজস্বমুক্ত জমি পেত। মনসবদাররা তত্ত্বগত দিক থেকে এবং বাস্তবে সরকারি কার্যকালে একই জমির বরাত পেত না। বরাত পেত না। বরাত নিয়মিত বদল করা হত। এর ফলে কোনও বিশেষ এলাকায় মনসবদারের ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে উঠতে পারত না। জমির সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মনসবদারের সম্পর্ক ছিল অর্থভিত্তিক (cash mexus), জমিদার-প্রজাভিত্তিক নয়।

মানসবদাররা নিঃসন্দেহে ছিল রাজকীয় প্রশাসক (Imperial official)। আবুল ফজলের মতে, সম্রাট আকবর ধাপের সংখ্যা নির্ণয় করেছিলেন। দশ সংখ্যার কমাণ্ডার থেকে দশ হাজার সংখ্যার কমাণ্ডার ছিল। একমাত্র রাজপরিবারের সদ্যসরা পাঁচ হাজারের বেশি সংখ্যার ধাপের অধিকারী হতে পারত। সাধারণ প্রজা সংখ্যা এবং ধাপের ব্যাপারে পাঁচ হাজার মনসবের বেশি উঁচুতে যেতে পারত না। একথা মনে রাখতে হবে যে, মনসবের সঙ্গে যুক্ত সংখ্যা অনুযায়ী মনসবদারকে সৈন্যসংখ্যা রাখতে হত এবং তাকে সেই পরিমাণে অর্থ দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটি ছিল ধাপের ও সম্মানের ইঙ্গিতবাচক।

৩.২.২ মানসবদার : জাট ও সওয়ার

একজন মনসবদার যে ব্যক্তিগত ধাপের অধিকারী হত তা জাট বলে পরিগণিত হত। এছাড়া মনসবদার আর একটি সংখ্যার অধিকারী হত তাকে বলা হত সওয়ার অথবা ঘোড়াসওয়ার। সওয়ার সংখ্যা কখনই জাটের বেশি হত না বরং কম হত। খুব কম ক্ষেত্রে সওয়ার সংখ্যার অস্তিত্ব থাকত না। সওয়ার ধাপ অনুযায়ী একজন অফিসারকে ঘোড়াসওয়ার রাখতে হত, যদিও এটিতে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যার ইঙ্গিত থাকত না। সওয়ার ছিল একটি ধাপের মধ্যে আর একটি ধাপ। সাধারণত সওয়ার ধাপের সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ঘোড়সওয়ার রাখতে হত। সম্রাট শাহজাহান পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। শাহাজাহান এই ব্যবস্থার বদল করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন হাজার সওয়ার ধাপের মনসবদারকে দুইশত (২০০) ঘোড়সওয়ার রাখতে হত ও এইভাবে বলা যায় একজন মনসবদার যে চার হাজার (৪০০০) জাটের অধিকারী ও তিন হাজার (৩০০০) সওয়ার ধাপের অধিকারী তাকে প্রকৃতপক্ষে ছয়শত (৬০০) ঘোড়সওয়ার রাখতে হত।

৩.২.৩ মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতা

মনসবদারি ব্যবস্থার আর অকটি জটিল দিক হল একজন মনসবদারের ব্যবস্থা অনুযায়ী বারো মাসের

মাইনে পাবার কথা, কিন্তু সবসময় তা হতা না। অনেকসময় বেতন মাত্র পাঁচ মাসের দেওয়া হত। বেতনের কম-বেশি অনুযায়ী সওয়ার ধাপও কম-বেশি হত। যেমন একজন মনসবদারের সওয়ার ধাপ অনুযায়ী ১০০০ ঘোড়সওয়ার রাখার কথা, সে মাত্র নয় মাসের বেতন পেত। সেক্ষেত্রে ৭৫০ জন ঘোড়সওয়ার রাখলেণ চলত, এবং ১৬৫০টি ঘোড়া রাখার দায়িত্ব বর্তাত। সুতরাং সওয়ার ধাপের মধ্যে দায়িত্বের নানারকম পরিবর্তন হত বেতনের পরিবর্তনের ফলে। অনুরূপভাবে, জাট ধাপের ক্ষেত্রে সওয়ার ধাপের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। এই সমস্ত পরিবর্তন ধাপ ও সম্মানের (status) পরিবর্তন ঘটাত। এসব নানা পরিবর্তন মনসবদারি ব্যবস্থার জটিলতার ইঙ্গিতবাহক। সমস্ত ব্যবস্থাটি ছিল আভ্যন্তরীণ বিরোধগুলিকে একটি মাননীয় উপাধির ঘেরাটোপে ঢেকে রাখা। জাতিগত, সংস্কৃতি, ধর্মীয় প্রভৃতি সত্তার বিরোধ ব্যাপৃত অশান্ত শাসকশ্রেণীকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, মোরল্যান্ড দেখিয়েছেন, আকবর থেকে শাহাজাহানের আমলে কিভাবে জাট এবং সওয়ার সংখ্যার ধাপের জন্য প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। এবিষয়ে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ যা মোরল্যান্ড ব্যবহার করতে পারেননি তার মতের পক্ষে যায়।

৩.৩ মনসবদারি ও জাগির ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কে

শাহজাহানের আমলে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রথম লক্ষ্য করা যায় তা হল মাসিক হারের অথবা অনুপাতের প্রথাটি। এই প্রথাটির উদ্ভভ ঘটে জাগিরের জমার সরকারি হিসেব ও প্রকৃত রাজস্ব আদায় বা হাসিলের পার্থক্যের জন্য। যখন কেই জাগির পেত যার সরকারি হিসেব অনুযায়ী জমা ছিল তার বাৎসরিক সমান। মনে রাখতে হবে, এসব ক্ষেত্রে জাগিরের প্রকৃত আয় ছিল অর্ধেক বা একের চার অংশ। এসব ক্ষেত্রে জাগির শাস্‌মাহা (ছয় মাসের) বা সিহ্ মাহা (তিন মাসের) নামে পরিগণিত হতে থাকে। শাহজাহানের রাজত্বের শেষের দিকে দক্ষিণ-ভারতের হাসিলের পরিমাণ হয় জমার একের চার অংশ (অর্থাৎ সিহ্-মাহা)। তুলনায় উত্তরভারতের অবস্থা ভাল ছিল। অনুরূপ অবস্থা অর্থে প্রদেয় বেতনের ক্ষেত্রেও চালু ছিল। যে জাগিরের হাসিল ছিল পাঁচ মাসের তার মাসিক যখন নগদি (নগদে প্রাপ্ত বেতন) হত তখন সে পুরো বারো মাসের মাইনে পেতে পারত না। শাহজাহান তাঁর এক ফারমানে (রাজত্বের সাতাশ বৎসরে) আদেশ দেন যে, অর্থে দেয় বেতনও সর্বোচ্চ আট মাসের ওপরে অথবা চার মাসের নীচে ঠিক করা হবে না। এই আদেশ একমাত্র সাম্রাজ্যের দুইজন উঁচু পদের অভিজাত ও রক্তের সম্পর্কে রাজপরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে কার্যকরী ন হবার ঘোষণা করা হয়। জমা ও হাসিলের ক্রমবর্ধমান পার্থক্য মনসবদারি তথা জাগির ব্যবস্থা সঙ্কট ডেকে আনে।

৩.৩.১ মনসবদারদের নিয়োগ ব্যবস্থা

মনসবদারদের নিয়োগ ব্যবস্থাও ক্রমশ এক ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। তত্ত্বগত দিক থেকে মনসবদারদের নিয়োগ করতেন স্বয়ং সম্রাট। তিনি কাউকে মনসব দিতে বা নিতে পারতেন, মানসবের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারতেন। আবুল ফজলের মতে মনসব প্রার্থীরা অনেক সময় স্বয়ং সম্রাট দ্বারা পরীক্ষিত হতেন। মীর বক্‌শী সম্রাটের সামনে ইরানি, তুরানী, রুমি, ফেরাঙ্গী, হিন্দী, কাশ্মীরিদের ঔগচ্ছিত করতেন। দ্বিতীয় প্রথাটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কোনও বড় অভিজাত প্রদেশের প্রশাসক অথবা অভিযানের নেতা সম্রাটের কাছে নাম সুপারিশ করে পাঠাতেন এবং সাধারণত তাদের নাম গৃহীত হত। রাজ-পরিবারের কেউ নাম সুপারিশ করলেও তা গৃহীত হত। পদোন্নতির পথও ছিল প্রধানত সুপারিশ। মনসব দেবার সময় যা সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেত

তা হল উত্তরাধিকার। খামামজাদ বা মনসবদারদের উত্তরাধিকারীদের দাবি ছিল সবথেকে বেশি। এদের পর যারা মনসব পেত তারা ছিল সাম্রাজ্যভুক্ত জমিদার অথবা প্রধানরা (chiefs) । আকবর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের মনসব দেওয়ার ওপর জোর দেন এবং বিশাল সংখ্যক জমিদার ও তাদের উত্তাধিকারীদের মনসব দেন। এইসব জমিদাররা তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী 'ওয়াতন' জাগির হিসাবে ভোগ করতেন, আবার সরকারি প্রশাসক হিসেবে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সাধারণ জাগিরের মালিক হতেন।

মুঘল রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অভিজাতরা ক্রমশ ঢুকে পড়ে। এই ব্যবস্থা ছিল কিছুটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফল, কিছুটা বাদশাহী নীতি। আকবরের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করে প্রশাসনে নিয়োগ করা। আকবর তাঁর 'সুলেহ-কুল' এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করেন যে বিভিন্ন জাতির লোক তাদের ক্ষমতাকে কার্যকরী রূপ দিতে পারবে ও সম্রাটের প্রতি তাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

৩.৩.২ মনসবদারি ব্যবস্থা : দাগ ও চেহরার অর্থ

মুঘল সাম্রাজ্যের মূল শক্তি ছিল ঘোড়সওয়ার বাহিনী। ভালো জাতের ঘোড়া দিয়ে ঘোড়সওয়ার তৈরি রাখা ছিল মনসবদারদের প্রধান দায়িত্ব। এইজন্যই মনসবদারদের সওয়ার সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তারা সম্রাটের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের ঘোড়সওয়ার নিয়ে প্রয়োজনীয় স্থানে পৌঁছতে বাধ্য থাকত। সওয়ারের সংখ্যা সেই জন্য মুঘল মনসবদারের কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আকবরের আমল থেকেই ঘোড়া রাখার ব্যাপারে অভিজাতদের মধ্যে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং তার ফলে সম্রাট ঘোড়ার ক্ষেত্রে দাগ (ছাপা মারা) ও ঘোড়াসওয়ারের ক্ষেত্রে "চেহরা" (পরিচয় পত্র) প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। এই নিয়ম অনুযায়ী একজন মনসবদারকে সওয়ার সংখ্যা অনুযায়ী ঘোড়সওয়ার হাজির করতে হত এভং তা না করতে পারলে শাস্তি পেতে হত। মনসবদারদের নির্দিষ্ট সংখ্যার ঘোড়সওয়ার শুধু নয় নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘোড়াও হাজির রাখতে হত।

জাহাঙ্গীরের সময় এই নিয়ম দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শাহজাহান পুরো ব্যবস্থা ঢেলে সাজান। লাহোরীর পাদশাহনামা থেকে জানা যায়, যে সব মনসবদার নিজের জায়গায় জাগির ভোগ করত তারা সওয়ার সংখ্যার একের-তিন অংশ ঘোড়া উপস্থিত করতে বাধ্য ছিল। জাগির ও নিয়োগের জায়গা আলাদা হলে একের-চার অংশ ও নিয়োগ যদি বলা বা দেখানোর মতো জায়গায় হত তাহলে একের-পাঁচ অংশ ঘোড়া হাজির করতে বাধ্য ছিল।

৩.৩.৩ মনসবদারি অর্থ : উত্তরাধিকারের প্রশ্ন

মনসবদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হয় না যদি না অভিজাতদের সংগৃহীত বিপুল অর্থ তাদের উত্তরাধিকারীরা কি ভাবে পেত তা না আলোচনা করা হয়। বিশেষ কোনও অন্যায় করলে শাস্তি হওয়া ছাড়া অভিজাতরা তাদের সঞ্চিত সম্পদ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকত, কিন্তু যে বিষয়ে মতবিরোধ আছে তা হল এই সম্পত্তি আইনত উত্তরাধিকারী পেত কি না। এবিষয়ে কিছু প্রমাণ আছে যা ইঙ্গিত করে সম্রাট মৃত অভিজাতদের সম্পত্তি দাবি করেছেন।

মুসলমান রাজতন্ত্রে রাজা তার অফিসারদের সঞ্চিত অর্থ দাবি করছেন এমন উদাহরণ বহু প্রাচীনকাল থেকে পাওয়া যায়। ভৃত্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে আব্বাসিড খলিফার দোহাই দিয়ে তাদের প্রশাসকদের সম্পত্তি অধিকার করতে আরম্ভ করে। বিধি অনুযায়ী একজন ভৃত্যের অর্থ সবসময় তার প্রভুর আয়ত্তাধীন। দিল্লির সুলতানদের বহু ভৃত্য ছিল এবং ফিরোজ তুঘলক তার এক (অফিসার) ভৃত্যের সম্পত্তি নিয়ে ফিরেছিলেন।

ভারতীয় মুঘলরা দিল্লির সুলতানদের মতন প্রকৃত অর্থে অফিসারদের ভৃত্যের পরিবর্তে স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দিলেও মুসলমান আইনে ভৃত্যদের প্রতি যে ব্যবহার করা যায় তাই করতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে যে দাবি মুঘলরা করতেন তা নিয়ে আইন-ই-আকবরীতে বিশেষ কিছু বলা না হলেও আকবরের সময় থেকে ইউরোপীয় পর্যটকরা এ বিষয়ে নীরব থাকেননি। এদের সাক্ষ্য অনুযায়ী সম্রাট একজন অভিজাতদের সম্পত্তি নিয়ে আবার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বণ্টন করতেন। সাধারণত কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে সম্রাট বাকি অংশ অভিজাতের উত্তরাধিকারীকে তা দিতেন। আকবর ও শাহজাহানের আমলে এরকম দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যায় যে, অভিজাতরা এ নিয়ে নিঃসন্দেহ ছিল যে সম্রাট তাঁর অংশ রেখে (মতুালিক) বাকি অংশ তার উত্তরাধিকারদের পুনর্বণ্টন করবেন এই কারণে অভিজাতরা তাদের জীবদ্দশায় প্রচুর পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করতে দ্বিধাবোধ করত না।

৩.৪ রাজস্বব্যবস্থা ও কৃষি

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, মনসবদারদের বেতন দেওয়া হত হয় নগতে নয় জাগিরের মাধ্যমে; যে জমি সম্রাটের নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা হত তাকে বলা হত খালিফা-ই-শরিফা বা খালিসা। যে জমি বণ্টনের জন্য হলেও সাময়িকভাবে সম্রাটের তত্ত্বাবধানে রাখা হত তাকে বলা হত **'পাইকাবাবী'**।

সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশ জাগির হিসাবে বণ্টনের জন্য রাখা হত। জাগিরের প্রাপককে বলা হত জাগিরদার। জাগির ছিল মুঘল রাজস্বব্যবস্থার স্তম্ভস্বরূপ। মনসবদাররা হত জাগিরদার। জাগিদাররা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিল। কৃষকরা যা উৎপাদন করত তার উদ্বৃত্ত অংশ (কৃষকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অংশের বাকি অংশ) আদায় করে রাষ্ট্রের হাতে জমা করা ছিল জাগিরদারের কাজ। রাজস্ব ছিল প্রধানত ভূমিরাজস্ব, তবু এছাড়া নানারকম উপকার ও খুচরো করও থাকত, যা দূরতম গ্রামাঞ্চল থেকেও আদায় করা হত। বড় বড় নগর ও বন্দরের বাজার নিয়ে হত আলাদা মহাল এবং এগুলিও এলাকার মতোই প্রায়ই জাগিব হিসেবে বিলি করা হত।

কয়েক বছর পর পর জাগিরের হাতবদল হত; এ ছিল আকবরের সৃষ্ট নিয়ম। জাগির বেতনের বদলে দেওয়া হত বলে প্রত্যেক জাগিরের একটি স্থায়ী জমা ও আয় নির্ধারণ করা হত, যাতে মনসবদারদের বেতনের পরিমাণ ও জাগিরের জমার পরিমাণ সমান হয়। আবার জমার পরিমাণ হাসিল (প্রকৃত আদায়) যাতে মোটামুটি এক হয় তার দিকেও নজর রাখা হত। আবুল ফজলের মতে, এই ধরনের জমা বার করাই ছিল আকবরের রাজস্বনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

১৭ শতক থেকে জমা 'জমাদামী' হিসাবে পরিচিত হয়। এই সময় থেকে জমা পরিসংখ্যানে লেখা হতে থাকে। এই জাতীয় পরিসংখ্যান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এই পরিসংখ্যানের হেরফের হত, স্থায়ী জমাও কিছু ছিল না। জমাদামী কি হবে তাই নিয়ে জাগিরদার প্রশাসনের সঙ্গে দর-কষাকষি করত। পরবর্তীকালে মাসের হিসাবে জমাদামী ঠিক করা হতে থাকে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রশাসন জমাদামীর হিসেবের ঝুঁকি জাগিরদারের ওপর চাপাত, হাসিল কম হলে জায়গিরদারকে তার দায়িত্ব নিতে হত, হাসিল বেশি হলে প্রশাসন তা আদায় করে নিতে চাইত। এই নিয়ে অত্যধিক টানাপোড়েন চলায় টোডরমল ঠিক করে দিয়েছিলেন যে, সমস্তরকম রাজস্ব আদায় হবে সরকারের ঠিক দেওয়া হারে, তার বেশি আদায় করলে জরিমানা সমেত বাড়তি অংশ কেড়ে নেওয়া হবে। প্রশাসন জাগিরগুলি থেকে রাজস্ব আদায়ের বিল বা 'হাল-এ-হাসিল' চেয়ে পাঠাত। স্থায়ী জমা ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য এলাকার ও রাজস্বের দশ বছরের হিসাবের নথিপত্র দরবারে রাখা

থাকত। শাহজাহানের আমল থেকে হাসিল ও জমাদামীকে এক করার চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমাদামী ও হাসিল এক হত না, হাসিল কম হত। ঔরঙ্গজেবের আমলে শেষের দিকে জাগির ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা যায়। ঔরঙ্গজেব দক্ষিণে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করলে এক বিরাট সংখ্যক দক্ষিণী বা দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রশাসকরা মনসবদার রূপে মুঘল-রাষ্ট্রে জায়গা করে নেয়। মারাঠারাও এসময়ে প্রচুর মনসব পায় কারণ মুঘল-রাষ্ট্রের জয়ের জন্য তাদের কিনে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এই উভয় কারণে মনসবদারদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে এদের মাইনে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় জাগির আর ছিল না, (বে-জাগির) যাদের একের পর এক মনসবদার করা হচ্ছিল তারা বছরের পর বছর জাগিরহীন অবস্থায় কাটাচ্ছিল, আর কারোর জাগির একবার হস্তান্তরিত হলে আর একটি জাগির সে নাও পেতে পারত।

অন্যদিকে মনসবদাররা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হবার ফলে কৃষকদের কাছ থেকে চড়া হারে রাজস্ব আদায় করতে চাইত। তারা তাদের জাগিরগুলির অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভাবত না। সমকালীন পর্যবেক্ষকেরা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে অন্যায়-অত্যাচার চলত সে বিষয়ে অনেক তথ্য রেখে গেছেন। মনসবদাররা আবার অনেক সময় রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করত, যারা আরও অনেক বেশি অত্যাচার করে রাজস্ব আদায় করত। এদের অস্থায়ী চরিত্রের ফলে কৃষকদের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে।

তুলনামূলকভাবে হিন্দু-রাজারা তাদের ওয়াতন জাগিরে অনেক কম অত্যাচার করত কারণ সেখানে জমিনদারের সঙ্গে কৃষকদের অনেক বেশি স্থায়ী সম্পর্ক ছিল। জমিনদারি ছিল কৃষককে বাদ দিয়ে তার ওপরতলার এক গ্রামীণ শ্রেণীর। জমির উৎপন্নের ওপর অধিকার জমিনদারি গ্রাম ও রাইয়তি গ্রামে ছিল আলাদা। সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই দুই ধরনের গ্রামের পার্থক্য 'সুনির্দিষ্ট না হলেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল' কোথাও কোথাও গ্রামের জমিকে 'খুদকাস্তা-এ-জমিনদারান' বলা হয়েছে। জমিদারদের নিজের কর্ষিত জমি ও রাইয়তি এইভাবে ভাগ করা হয়েছে আবার কোথাও তাল্লুক হিসাবে ভাগ হয়েছে। তালুকদার সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্ব সংক্রান্ত পরিচয় আমরা পাই, যা সমস্ত জায়গায় ব্যবহার করা হত। যেমন তালুক ও তালুকদার জমিদার ও জমিদারি কথাটির বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে। তাল্লুক কথাটির অর্থ ছিল যোগাযোগ। আকবরের আমলে প্রথম জমিনদার কথাটি ব্যবহার হয় যদিও 'আইন' অথবা রসিকাদাসের প্রতি ঔরঙ্গজেবের ফরমানে কোথাও জমিদার কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। তবে শেরশাহ যখন তাঁর বাবার আমলে বিহারের শাসনকাজ চালাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে জমিদাররা রাজস্ব যা রাজকোষে জমা দেবার কথা তার থেকে অনেক বেশি অর্থ দুর্বল প্রজাদের থেকে আদায় করবে। সুতরাং মনে করতে হবে, জমিদার অথবা তালুকদার উভয় পরিভাষাই ক্রমবিবর্তনশীল রাজস্ব সংক্রান্ত পরিভাষা মাত্র। কৃষকদের জমি দেওয়া বা ফিরিয়ে নেবার অধিকার জমিদারদের ছিল বলে মনে হয়। জমিনদাররা চাইত কৃষকদের ধরে রাখতে। তবে আইনত জোর করে কৃষকদের ধরে রাখতে পারত কিনা তা বলা যায় না। কিন্তু বাদশাহী কর্তৃপক্ষ—যার মধ্যে জমিনদার ও তার কর্মচারীরা পড়ত—এ কাজ করতে পারত। জমিনদাররা গ্রামের রাজস্ব বাদশাহী কর্তৃপক্ষকে দিত এখটা বাঁধা অঙ্কে, তারপর 'প্রথামত বা নিজস্ব নির্দিষ্ট হারে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত'। এই প্রথা বাংলায় চালু ছিল। গুজরাটে জমিনদারদের জমি দু ভাগে ভাগ হত। এর তিনের চারভাগকে 'তলপদ' বলা হত আর একের চার ভাগকে বলা হত 'জাট'। প্রথমটি থেকে রাজস্ব নিত কর্তৃপক্ষ আর বাকিটা ছেড়ে দেওয়া হত জমিনদারদের হাতে। জমিনদাররা তাদের প্রধান আর্থিক দাবি ছাড়াও ছোটখাট উপরি কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করত। তারা বেগার খাটাত তবে কৃষিকাজের সময় এই বেগার খাটান হত না।

জমিদারি সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে। একটি বা কয়েকটি গোষ্ঠী (কওম) বিভিন্ন এলাকায় জোতজমি একচেটিয়াভাবে দখলে রেখেছিল। জমিনদার শ্রেণী এই গোষ্ঠীগুলি নিয়ে গঠিত। চার্লস এলিয়ট

বলেছেন, যখন কোনও গোষ্ঠী অন্য কোনও গোষ্ঠীর অঞ্চল জয় করত কিন্তু আগের গোষ্ঠীর সবাইকে তাড়িয়ে দিতে পারত না আগের পুরোন গোষ্ঠীর কেউ কেউ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত, তারাই জমিদারি স্বত্তের অধিকারী হয়ে উঠত।

৩.৪.১ মুঘল রাষ্ট্র ও উদ্বৃত্ত আদায়ের ব্যবস্থা

যাই হোক, জাগিরদার ও ওয়াতন জাগিরদারদের মাধ্যমে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত (surplus) মুঘল রাষ্ট্র আদায় করে নিত।* একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, রাজস্ব দাবি এতটাই চড়া হারে বাঁধা ছিল যে তা আর বাড়ানোর উপায় থাকত না। কৃষকদের ওপর অন্য যে সব কর চাপান হত, কর্মচারী ও অন্যান্যরা নিয়ম-বেনিয়মে আরও যে অর্থ আদায় করত তার বোঝা কৃষকদের ওপর এতটাই ছিল যে, কৃষকরা প্রায়শই তাদের বেঁচে থাকার অপরিহার্য অংশটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

মুঘল আমলে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ হত বিভিন্ন পদ্ধতিতে, যেমন 'হস্ত-এ-বুদ', 'কানকৃত' বা 'দানাবন্দি', 'জাবত' (Zabt) প্রভৃতি। এই বিভিন্ন পদ্ধতির কারণ ছিল উৎপাদনের হার সব জায়গায় একরকম ছিল না। সাধারণত উদ্বৃত্ত বেশি হত না বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং উদ্বৃত্ত ঠিক করে তার অংশবিশেষ নেবার পদ্ধতিই ছিল ভূমি-রাজস্ব ঠিক করারও পদ্ধতি।

আবুল ফজল মন্তব্য করেছিল যে, শেরশাহ তিন রকমের শস্যহার বেঁধে দিয়েছিলেন। তার নীতি ছিল আদায়ের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া। এই সমস্ত শস্যহারগুলির গড়ে এক-তৃতীয়াংশ আদায় করার নিয়ম প্রত্যেকটি শস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই ব্যবস্থা জাবত ব্যবস্থারই অঙ্গ ছিল। লাহোর থেকে অযোধ্যা লাহোর থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। আকবরের রাজত্বকালের প্রথম দিকে জোর করে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়; পরবর্তীকালে অঞ্চল অনুযায়ী এই ব্যবস্থা চালু করার ফলে তা অনেক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের উৎপাদনের গড় অনুযায়ী আদায় স্থির করা হয়। ভূমি-রাজস্ব অবশ্য শস্যের বদলে অর্থে নেওয়া হতে থাকে।

জুবাৎ ব্যবস্থায় রাজস্ব দাবির ভিত্তি ছিল প্রথমে অপরিবর্তিত শস্যহার ও সবশেষে অপরিবর্তিত নগদ হার। হিন্দুস্তানে এই ব্যবস্থায় গড়ে এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত শস্য ছিল রাজস্ব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে সরকার অর্ধাংশ দাবি করত। ফসল তোলার সময় অর্থাৎ শস্যের দাম যখন কম সেই হারে ফসল বিক্রি করে কৃষক যে অর্থ রাজস্ব হিসাবে দিত তা ছিল তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অনেক বেশি এছাড়া ফসলের অনিশ্চয়তার ঝুঁকিও কৃষককে নিতে হত।

দ্বিতীয় যে ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব নেওয়া হত তা ছিল 'কানকৃত'। যে পদ্ধতিটি থেকে কানকৃতের জন্ম তা হল ভাগচাষ, ফার্সিতে 'গল্ল-বখ্‌শী', হিন্দিতে 'বটাঙ্গা' এবং 'ভাওলি'। তিন ধরনের ভাগচাষ হত। প্রথমটি অনুযায়ী কৃষক ও প্রশাসনের উপস্থিতিতে চুক্তি অনুযায়ী ফসল ভাগ করা; দ্বিতীয়টি অনুযায়ী ক্ষেত কটাঈ বা ক্ষেত ভাগ করার আগে মাঠের ফসল ভাগ; তৃতীয়টি অনুযায়ী ফসল কাটার পর তা স্তূপাকারে রেখে ফসল ভাগ। সরকারিনিয়ম অনুযায়ী এটি ছিল রাজস্ব আদায়ের সবথেকে ভাল পদ্ধতি। কৃষকরা এটি পছন্দ করত কারণ এখানে চাষের ঝুঁকির সবটা কৃষককে বহন করতে হত না। সরকারকে অবশ্য শস্য পাহারা দেবার জন্য বিরাট খরচের মধ্যে পড়তে হত।

---

* উদ্বৃত্ত বলতে বোঝায় ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উৎপাদন।

'হস্ত-এ-বুদ' পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রাম পরিদর্শন করে ভালমন্দ দু'ধরনের জমি দেখা হত। এর ভিত্তিতে মোট উৎপাদনের একটা মোট হিসেব করা হত ও তার ওপর রাজস্ব বেঁধে দেওয়া হত।

এই দুটি রীতির ত্রুটিগুলি বাদ দিয়ে একটি পদ্ধতি চালু করা হয়, তাই হল 'কানকূত'। আইন-এ-আকবরীতে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। সম্ভবত এই ব্যবস্থার দু'টি দপ্তর ছিল। প্রথমে জমি মাপা হত ও সেই জমির বিভিন্ন ধরনের শস্যের ফলনের হিসেব নিয়ে শস্যহার ঠিক করা হত। যে জায়গায় সে শস্য উৎপাদিত হত সেই জায়গায় গড় শস্যহার প্রয়োগ করা হত। আবু ফজলের মতে, কানকূত পদ্ধতিতে রাজস্ব ঠিক হত শস্যে, নগদে নয়। প্রথমে পুরো শস্যের ওপর শস্যহারের ভিত্তিতে রাজস্ব ধার্য করা হত। তারপর কৃষকের ভাগের অংশ সেখান থেকে বাদ দিয়ে যা থাকত তা ছিল রাজস্বের সূচক। শস্যের দামের তালিকা অনুযায়ী রাজস্ব নগদে পরিণত করা হত। কানকূত ব্যবস্থা ছিল একদিকে কম ব্যয়সাপেক্ষ অন্যদিকে এর কার্যকারিতা ছিল অনেক বেশি।

জাবত-এর কতকগুলি অসুবিধা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবুল ফজল লিখেছেন যে সাম্রাজ্যের সীমানা এতদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে দরবারে স্থানীয় দামের তালিকা পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত। প্রত্যেক বছর তা মঞ্জুর করতে আরও দেরি হয়ে যেত। কৃষকরা অভিযোগ করত মজুরের চেয়ে বেশি আদায় করা হত বলে। অন্যদিকে জাগিরদার অভিযোগ করত অনুমোদিত হার হাতে পেতে দেরি হয়ে যাওয়ায় রাজস্ব অনাদায়ী থেকে গেছে বলে। এরপর যারা দামের খবর দরবারে পাঠাত তারা অনেকেই অসাধু হয়ে উঠেছিল। এইসব অবস্থাকে ঠিক করার জন্য এক নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা জমা-এ-দহশালা নামে পরিচিত,। মোরল্যান্ডের মতে, আগের দশ বৎসরে কৃষকদের ওপর ধার্য মোট রাজস্ব দাবির গড় হিসেব করে জমা-এ-দহশালা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন, ফসলের শ্রেণী ও দামের স্তর অনুযায়ী প্রতি পরগণার দশ বছরের অবস্থা বিচার করে বার্ষিক রাজস্বের এক-দশমাংশ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সতেরশ শতকে মূলত একই ধারায় জাবৎ ব্যবস্থার কাজ চলেছিল। প্রশাসনিক দিক থেকে দেখলে জাবৎ ব্যবস্থার কিছু সুবিধা ছিল। পরিমাপগুলি আবার পরীক্ষা করে দেখা যেত। তবে এ ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এ ব্যবস্থা খরচাসাপেক্ষ বলেও নীচের দিকে জমি নথিভুক্ত করার ব্যাপারে অসাধুতা চলত।

রাজস্ব আদায়ের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায় সহজ করা ও সর্বাধিক করা। কৃষিভূমির বিস্তার ঘটানোও ছিল আর একটি অন্যতম লক্ষ্য। অজন্মার বৎসরে রাজস্ব শস্যে দেওয়া হত। জাবত ব্যবস্থায় রাজস্ব ঠিক করার সময় যেখানে শস্য হয়নি সেসব অঞ্চল হিসাব বহির্ভূত রাখা হত। শস্য না হওয়া অঞ্চলকে না-বূদ বলা হত এবং এই মা-বূদ্- ১২$^{১}/_{২}$ শতাংশের বেশি হতে পারত না। এসব এলাকায় কৃষকদের তাকাভি বা ধার দেওয়া হত। এই দিয়ে কৃষকরা বীজধান কেনা এবং চাষ-আবাদ ইত্যাদি করতে পারত। ফসল তোলবার সময় এই ধার শোধ দিতে হত। কৃষককে চাষের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য বিশেষত পতিত জমি উদ্ধারের জন্য কম হারে রাজস্ব দেবার বন্দোবস্ত দেওয়া হত। পাঁচ বছরের হিসাবে প্রতি বছর কিছু কিছু রাজস্ব বাড়িয়ে পাঁচ বছরে পুরো রাজস্ব নেওয়া হত।

৩.৪.২ বিভিন্ন শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক

মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় যে সমস্যাটি সমাধানের বাইরে ছিল তা হল ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের ওপর রাজস্ব চাপানোর প্রচেষ্টা। অন্যদিকে ছিল কিছু মধ্যবর্তীদের মাধ্যমে (জমিনদার, তালুকদার, মুকদ্দম/প্যাটেল প্রভৃতি) রাজস্ব আদায় করা। প্রথম ব্যবস্থাটি ছিল কাম্য কারণ এর মাধ্যমে প্রশাসন প্রত্যেকের বিষয়ে সঠিকভাবে

হিসাব রাখতে পারত, একসঙ্গে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাজস্বের হিসাব ঠিক রাখা কঠিন ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে দুঃস্থ কৃষকের ওপর চাপ বেশি পড়ত না। একসঙ্গে রাজস্ব দিলে মধ্যবর্তীরা নিজেদের গা বাঁচিয়ে রাজস্বের ভার গরিব কৃষকের ওপর চাপিয়ে দিত। প্রাপ্ত তথ্য অবশ্য ইঙ্গিত করে যে, রাজস্ব আদায় হত গ্রামকে একটি একক ধরে। মধ্যবর্তীদের রাজস্ববিহীন জমি দেওয়া হত অথবা যে হারে রাজস্ব দিতে হত তার পরিমাণ ছিল নগণ্য।

রাজস্ব অত্যন্ত কড়াভাবে আদায় করা হত। রাজস্ব না দেওয়া ছিল বিদ্রোহের সামিল। জমি থেকে বিতাড়ন ছিল স্বাভাবিক শাস্তি। তাছাড়া গ্রামীণ প্রধানকে বন্দি বা হত্যা করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

মুঘল আমলে ভূমি-রাজস্ব ঠিক করা ও আদায়ের ব্যাপারে দু'টি দিক ছিল। প্রতাগত জাগিরের রাজস্ব থেকে যেহেতু মনসবদারে সামরিক বাহিনীর ভরণপোষণ করতে হত সেহেতু তাদের উদ্দেশ্য হ'ত যথাসম্ভব চড়া হারে রাজস্ব দাবি করার দিকে। এর ফলে সাম্রাজ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হত। কিন্তু অন্যদিকে আর একটি বিষয় তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, রাজস্বের হার অত্যন্ত বেশি হলে কৃষকদের জীবনযাপনের পক্ষে অবশিষ্ট কিছু থাকবে না তাহলে মোট রাজস্ব আদায় শেষ হিসেবে কম হবে। এই কারণেই কৃষকের ন্যূনতম প্রয়োজন বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ও বাদশাহী প্রশাসনের নির্ধারিক রাজস্ব দাবি এক হত।

এত্দ সত্ত্বেও বলা যায়, রাজস্বের পরিমাণ বেড়েই চলেছিল। জাগির ব্যবস্থার মধ্যেই এই ঝোঁক ছিল। যদিও এর ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে প্রশাসন অবহিত ছিল এবং রাজস্ব-দাবি বেঁধে দেবার চেষ্টা করত। বাদশাহী প্রশাসনের সঙ্গে জাগিরদারের স্বার্থের কিছু কিছু বিরোধ ছিল। যেহেতু যে কোনও সময়ে জাগিরের হাতবদল হত ও তিন/চার বছরের মাথায় এই হাতবদল হয়ে থাকত; জাগিরদার যথাসম্ভব অত্যাচার করে তার ক্ষতি পুষিয়ে নিত। এর ফলে জাগিরের এলাকায় কৃষকদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা লোপ পেলেও জাগিরদারের কিছু এসে যেত না। সমকালীন পর্যবেক্ষকরা এবিষয়ে নানা সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এদের মতে, জাগিরদার যখন নিজে কর্মচারী না রেখে ইজারা দিত তখন অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠত। বাদশাহী প্রশাসন এবিষয়ে সজাগ ছিল কিন্তু কিছু করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বাদশাহী নিয়ম-কানুনই জাগিরদারদের ইচ্ছেমতো চলার রাস্তা করে দিত। অজন্মার বছরে কর মকুব, আগাম ঋণ দেওয়া তারা করতে পারত, নাও করতে পারত। নিয়ম-কানুন একেবারেই মানা হয়নি এমন প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। কর চাপান মানা করে ঔরঙ্গজেবের আদেশনামা মানা গুয়নি এমনও উদাহরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালা যে, গ্রাম-সমাজের বিভাজীকরণ ছিল এবং ওপর-তলার লোকেরা তাদের ওপর চাপ নীচের তলায় চাপিয়ে দিত। চাপ বাড়ার ফলে কৃষির প্রসার বন্ধ হয় এর ফল শেষকালে মুঘল শাসকশ্রেণীকেই আঘাত করেছিল; শুধু তাই নয় কৃষির সঙ্গে যুক্ত অপর দুই শ্রেণী, জমিদার ও কৃষকশ্রেণীকেও এই চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। অনেক আধা-স্বাধীন জমিদার মনসবদার হিসাবে মুঘল শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল (মনসবহীন জমিদারও অবশ্য ছিল)। এই ধরনের জমিদাররা অনেক সময় কৃষকদের সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহ করেছিল।

কৃষকদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ছিল বৈচিত্র। জমিদাররা কৃষকদের ওপর অত্যাচার করলে কৃষকরা 'জোর তলব' জমিদারদের দলে যোগ দিত। এই সব জমিদাররা কম শক্তিশালী জমিদার ও দুঃস্থ মনসবদারদের পয়সায় ফুলে-ফেঁপে উঠত। জোর তলব জমিদার ও তাদের কৃষকরা উৎপাদনের সবটাই রাজস্ব হিসেবে দিয়ে দিত এমন বলা যায় না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ভূমি-রাজস্ব এমনভাবেই ঠিক করা হত যায় ফলে যাদের কিছু ছিল না তাদের ওপরই চাপ সবচেয়ে বেশি পড়ত। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কৃষেকেরা জমি ছেড়ে চলে যাবার বদলে মোটা মানের ধান (খাদ্যশস্য) উৎপাদন করত, যারা ছিল স্বচ্ছল তারা বাণিজ্যিক ফসল

ফলাত। নগদ অর্থে রাজস্ব দেওয়া বাধ্যতামূলক হবার ফলে গরিব কৃষকের পক্ষে চাপের পথ এড়ান ছিল কঠিন। মহাজনের কাছ থেকে ধার করে রাজস্ব মিটিয়ে দুঃস্থ কৃষেকের পক্ষে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোনও ব্যয় করা সম্ভব হত না। অথচ, জমিচাষ করা বাধ্যতামূলক ছিল বলে চাষ করতে তারা বাধ্য হত। এসকল সত্ত্বেও একথা ভাবলে ভুল হবে না, মুঘল রাষ্ট্র কৃষকদের জীবনের রক্ত শোষণ করে নিত। কৃষকদের ভাগ করা ছিল রাষ্ট্রের আদর্শ যদিও এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া ছিল শাসকশ্রেণীর জন্মগত অধিকার। বৃদ্ধবয়সে ঔরঙ্গজেব হতাশা প্রকাশ করেছিলেন কৃষকদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবার জন্য। তিনি বারংবার অভিজাত শ্রেণীকে সমাধান করেছিলেন অগণিত কৃষক সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেবার জন্য। এসব নির্দেশ ছিল দিল্লির আশপাশের অভিজাতদের উদ্দেশ্যে। জমিদারদের ওপর কড়া আইন জারি করা হয় কৃষকের জমি ভাড়া করা কৃষক-শ্রমিককে দিয়ে চাষ না করানোর জন্য। একথা সত্য যে, মুঘল আমলে বার্ণিয়ে কথিত সর্বহারা কৃষক যেমন ছিল তেমনি লাভের ভাগিদার বিভিন্ন শ্রেণীও গ্রামীণ সমাজে ছিল। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কিছুটা অংশ জমিদার, মহাজন গ্রামীণ প্রধানরা এবং কিছু ক্ষমতাসর্বস্ব কৃষকদের (agricultural castes with superior right in land) হাতে থেকে যেত।

৩.৪.৩ মুঘল রাষ্ট্রে কৃষক বিদ্রোহের কারণ ও বিদ্রোহের চরিত্র

মুঘল রাজত্বের শেষে জাট ও শিখ বিদ্রোহের নেতা ছিল গ্রামীণ সমাজের এই শ্রেণী। ক্রমবর্ধমান রাজস্বের চাপ গ্রামীণ সমাজের সবল ও দুর্বল উভয়ের ওপরেই পড়েছিল। জমিদারদের প্রথাগত অধিকারে হাত পড়েছিল ফলে এরাও বিদ্রোহের সামিল হয়। তবে একথাও স্বীকার করে নেওয়া ভাল এইসব বিদ্রোহ শুধু কৃষক সঙ্কটেরই কারণ ছিল না। আকবরের সময়ে কৃষির যে অবস্থা ছিল আঠারশ শতকে কৃষির অবস্থা এর চেয়ে বেশি খারাপ ছিল বলে মনে হয় না। কারোর কারোর মতে, জাগির সঙ্কটও প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রশাসনিক ব্যর্থতা। ইরফান হাবিব কৃষিসঙ্কটকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান সঙ্কট হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। গৌতম ভদ্র আবার হাবিব কৃত কৃষিসঙ্কটের চরিত্র বিচার করতে গিয়ে বলেছেন, এ ব্যাখ্যা একমাত্রিক। কোথাও কৃষক জমিদারদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আবার কোথাও নতুন জমিদাররা পুরোন জমিদারদের এলাকা জবরদখল করেছে; সেখানে কৃষকরা উদাসীন থেকেছে। কৃষক আন্দোলন এলাকা অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্র নিয়েছে যা ইরফান হাবিবের লেখায় অনুপস্থিত। শোষণ, অত্যাচার, বিদ্রোহ এইভাবে হাবিব এক সরলীকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। কৃষকরা কিভাবে বিদ্রোহের সময় একত্রিত হত, তাদের চৈতন্য, বিদ্রোহ গুজবের ভূমিকা এসব কিছুই হাবিব দেখাননি বলে শ্রীভদ্র অভিযোগ করেছেন।

৩.৫ মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্কট নিয়ে বিতর্ক

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আর অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে ভিন্ন একধরনের আলোচনা করেছেন মুজাফ্ফর আলম, বেইলি, আন্দ্রে উইক প্রভৃতিরা। মুজাফ্ফর আলম ও বেইলির ধারণা অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক অবক্ষয় সার্বিক ছিল না, চরিত্র অনুযায়ী স্থানীয় বলে বলাই ভাল। অষ্টাদশ শতকে দেখা যায় অযোধ্যা বা পাঞ্জাবে উৎপাদন ও হাসিল দুই-ই বেড়েছিল। জমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছিল। পূর্বভারত, রোহিলখণ্ডের মতো জায়গায় নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার ঘটেছিল। অন্যদিকে দিল্লির সন্নিহিত অঞ্চল অথবা গুজরাটে পতন ঘটেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্ককে মুজাফ্ফর আলম কেন্দ্র ও সুবার মধ্য বিরোধের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। দিল্লির দরবারে পুরানো ও নতুন আমিরদের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ ঘনীভূত হবার ফলে বহু আমির দরবার ছেড়ে স্থানীয় সুবার রাজনীতিতে জায়গা করে নেয়। এইসব নতুন গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মুর্শিদকুলি খানের মতো ব্যক্তিরা সম্পর্ক স্থাপন করে ও বিভিন্ন সুবায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যের নীতি আর নবাবি নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের নীতি অনুযায়ী ইজারা ছিল খারাপ অথচ এই ইজারার মাধ্যমেই নবাবরা স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে একধরনের সমঝোতায় আসে ও নিয়মিত রাজস্ব পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির মাধ্যমে নবাবরা এইভাবে নিজেদের রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলেন ও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজনীতি ক্রমশ আলাদা হয়ে যায়। আঞ্চলিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শক্তি হারিয়ে ফেলে।

৩.৬ সারাংশ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘলরা সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ কাঠামো গড়ে তোলে। শাসনের বুনিয়াদ ছিল মনসবদারি ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে যুক্ত জাগির ব্যবস্থা। মনসবদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার বাহিনী গড়ে তোলা হয়। অভিজাতদের মনসব দেবার মাধ্যমে একদিকে প্রশাসনিক সংগঠন তৈরি করা হয় অন্যদিকে বিভিন্ন জাতির অভিজাতদের কার্যক্ষমতাকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে কাজে লাগান হয়। জাগির ব্যবস্থা ছিল ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের একটি কার্যকরী মাধ্যম। জাগির ব্যবস্থা ত্রুটিশুন্য ছিল না এবং এর ফলে একসময় এর মধ্যে সঙ্কট তৈরি হয়। কৃষিব্যবস্থার মধ্যেও সঙ্কট তৈরি হয়, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

৩.৭ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। মনসবদারি ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায়? মনসবদারি প্রথার সঙ্গে জাগির প্রথা কিভাবে যুক্ত ছিল?

২। মুঘল রাজস্বব্যবস্থা কেমন ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। জাগির সঙ্কট কি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল?

৪। **ছোট প্রশ্ন**

(ক) বে-জাগির কি?

(খ) 'কানকূত' মানে কি?

(গ) কারা এবং কিভাবে মনসবদার হত?

(ঘ) 'ওয়াতন জাগির' বলতে কি বোঝায়?

(ঙ) আবুল ফজলের লিখিত একটি বইয়ের নাম করুন।

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করুণ :**

(ক) মনসবদারি ব্যবস্থা—— প্রচলন করেন।

(খ) জাট মানে, সওয়ার মানে——।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। ইরফান হাবিব : *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ১৫৫৬-১৭০৭*

২। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ : *মধ্যযুগের ভারত*

৩। এম. আতাহার আলি : *The Mughal Nobility under Aurangzeb, 1970*

৪। Tapan Roychoudhury & Irfan Habib : *The Cambridge Economic History of India,* Vol. I

একক ৪ ❑ ধর্মীয় সমন্বয়বাদ—ভক্তিসংস্কৃতি—মুঘল ভারতে শিল্প-স্থাপত্য

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ রাজদরবার, চিত্রকারখানা ও মুঘল চিত্র
  ৪.২.১ সম্রাটের ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষণা
  ৪.২.২ দরবারি শিল্পী
  ৪.২.৩ চিত্রকারখানা
৪.৩ কাব্য থেকে ইতিহাস
৪.৪ মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাত
  ৪.৪.১ মুঘল দরবারি প্রতিকৃতি
৪.৫ প্রাদেশিক বিস্তার : রাজস্থান
  ৪.৫.১ শেষ পর্যায়
৪.৬ অনুশীলনী
৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- মুঘল চিত্রকলার মূলচরিত্র কি ছিল?
- মুঘল বাদশাহরা এবং অভিজাতরা এই চিত্রকলার বিকাশে কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- মুঘল দরবারে শিল্পীদের স্থান কোথায় ছিল?
- শিল্পীদের সামাজিক অবস্থান কি ছিল?
- চিত্র-কারখানা বলতে কি বোঝায়?
- মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাতের চরিত্র কি ছিল?

৪.১ প্রস্তাবনা

মুঘল চিত্রকলাকে সাধারণত বলা হয় মিনিয়েচর বা অনুচিত্র। এর কারণ মুঘল চিত্রগুলি মূলত পুঁথিচিত্রণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য ভারতবর্ষে মুঘলরা আসার অনেক আগেই পুঁথিচিত্রণ শুরু হয়। একদিকে বৌদ্ধ অন্যদিকে জৈন বিহারগুলিতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন চিত্র আঙ্গিক।

ভারতীয় চিত্রকলায় মধ্যযুগীয় কথাটির ব্যবহার হয় আঙ্গিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। যে সব চিত্ররীতিতে শিল্পীরা ভাস্কর্যের বিন্যাস অনুসরণ করতেন সেগুলিকে বলা হয় বর্তনা রীতি। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে চিত্ররচনার

সূত্রগুলিতে বিপরীত রীতি হিসাবে তীক্ষ্ণ কোণযুক্ত রেখার স্থলভাগকে আখ্যা দেওয়া হয় বিভক্তক। এইসব প্রয়োগগুলি লক্ষ করে শিল্প-ঐতিহাসিকরা এই দুই রীতির সংজ্ঞাগত ভাগ করেছেন ক্ল্যাসিকাল ও মধ্যযুগীয়। পালযুগের চিত্রকলায় অনেক সময় এই দুই রীতিরই অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই সময় বৌদ্ধ বিহারের মধ্যেও গড়ে ওঠে এক শিল্পপরম্পরা।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত অধিকাংশ পুঁথি ছিল তালপাতায় রচিত। এই সময়কার অধিকাংশ চিত্রকলাই আখ্যানধর্মী। ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধ শ্রমণরা চলে যান তিব্বতে ও নেপালে। গুজরাট ও রাজস্থানের জৈন ভাণ্ডারগুলিতে অবশ্য এইসব অঞ্চলের বণিক ও রজান্যবর্গের আনুকূল্যে পশ্চিমভারতীয় পুঁথিচিত্রণের কাজ চলতে থাকে। পরবর্তীকালে এই ছবিগুলির ওপর পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠার পর শুরু হয় ভারতীয় চিত্রকলার আরেক পর্ব। মধ্য এশিয়া থেকে আগত শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনমতো নিয়ে আসেন পোশাক, অস্ত্র, আতর ও তার সঙ্গে পারসিক শিল্পকলার নান্দনিক আদর্শ। এর মধ্যে স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকে তালপাতার বদলে কাগজের ব্যবহার পুঁথি রচনার আকেরটি অধ্যায় সূচিত করে। চতুর্দশ শতকের মধ্যে গ্রামীণ শিল্পী ও দরবারি শিল্পী উভয়েই কাগজে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন।

পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকেই সুলতানি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একাধিক প্রায় স্বাধীন সুলতানি রাজ্য গড়ে ওঠে। এদের রাজধানীগুলি হয়ে ওঠে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র। মাণ্ডু, জৌনপুর ও গৌড়ে এসে ভিড় করেন মধ্য এশিয়ার বহু বিদ্বান ও শিল্পী।

যেহেতু সুলতানি চিত্রোৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু তথ্য পাওয়া যায় না, অনুমান করা যায় যে, পারসিক দরবারি প্রথা অনুযায়ী অভিজাতরা নিজেদের গৃহসংলগ্ন চিত্রকারখানায় ছবি প্রস্তুত করতেন। উত্তরভারত ছাড়াও পারসিক চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলিতে। আহমেদনগর-বিজাপুরে একধরনের চিত্র-আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায় পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, যা মূলত ধ্রুপদী পারসিক চিত্রকলার প্রভাবে সমৃদ্ধ।

এখানে মনে রাখা ভালো যে, এইসব দরবারি চিত্রকলার বাইরে যে সাধারণের শিল্পজগৎ ছিল তার কিছুটা আভাস পেলেও এইসব লোকচিত্র-আঙ্গিক ও তাদের রচয়িতাদের খুব কম পরিচয় আমরা পাই। শুধু যখন এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে দরবারি শিল্প হারিয়ে ফেলে তার প্রতিষ্ঠা, তখনই নজরে পড়ে বিচিত্র সেইসব লোকশিল্পের সূত্র। সেগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের সমসাময়িক লোকশিল্প লক্ষ্য করেই অনুমান করতে পারি প্রাচীন লোকশিল্পের গতি।

৪.২ রাজদরবার, চিত্রকারখানা ও মুঘল চিত্র

মুঘল চিত্রকলার জন্ম রাজদরবারে। এক হিসাবে এই বিশেষ শৈলীর অন্তর্গত প্রতিটি ছবিই নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের নিদর্শন। কারণ প্রতিটি ছবির রচনার বা উৎপাদনের একদিকে ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি রঙ, তুলি বা কাগজের জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন, যাঁকে বলা হয় পৃষ্ঠপোষক বা পেট্রন; অন্যদিকে ছিলেন শিল্পী যিনি তাঁর শ্রম বিনিয়োগ করে সৃষ্টি করেছেন মূল্যবান ছবি।

মুঘল প্রাসাদের যে নির্দিষ্ট স্থানে শিল্পীর কাজের জায়গা করে দেওয়া হত, তাকে বলা হত কারখানা।

অন্যান্য উৎপন্ন বস্তুর মতো স্বাভাবিকভাবে ছবিতেও প্রতিফলিত হত পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর যুগ্ম চাহিদা। এই ছবিগুলি তাই দরবারি মুঘল চিত্র বলে পরিচিত। এগুলি ছাড়া সম্রাট ও অন্যান্য অভিজাতদের গৃহে অবস্থিত কারখানাগুলির বাইরে যে সব কারিগরি বস্তু উৎপন্ন হত তা ছিল সাধারণ বাজারের পণ্য। শিল্প-ঐতিহাসিকরা এই ছবিগুলিকে বাজারি মুঘল বা মুঘল লোকচিত্র আখ্যা দিয়েছেন।

৪.২.১ সম্রাটের ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষণা

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই প্রথম যিনি চিত্রকারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও বাবার শিল্পকলায় উৎসাহী ছিলেন—তাঁর আমলের কোনও ছবি পাওয়া যায়নি। হুমানুনের আমলে দু'জন বিখ্যাত পারসিক শিল্পী আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলি পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন। এঁরাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন সম্রাটের নির্দেশে তাঁর চিত্রকারখানা। যে ছবিগুলি সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় দরবারি মুঘল চিত্রকলা।

আকবরের ভারতীয়করণের নীতির ফলে বহু হিন্দু শিল্পী স্থান-পান তাঁর চিত্রকারখানায়। যে নান্দনিক মাত্রা এই কারখানায় সৃষ্ট শিল্পকর্মে সৃষ্টি হয় তাতে মুঘল শাসকগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে খুঁজে পান তাঁদের মতাদর্শের প্রতিফলন। রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত অভিজাতরা সম্রাটের প্রতিটি ভঙ্গি অনুকরণ করতেন। ফলে জীবনযাত্রার মানও তাঁর মুঘল দরবার থেকেই গ্রহণ করেন। শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ তাই শুধু সম্রাটদের নয় প্রতিটি অভিজাত মুঘলের বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হত।

এই শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই সামাজিক উদ্বৃত্তের মূল অংশ বন্টন করা হত। মুঘল রাষ্ট্রে কৃষকদের শ্রমজাত উদ্বৃত্তের কর হিসাবে আত্মসাৎ করতেন এই শাসকরা। আকবরের আমলের মূল জমার ১৮.৫৯ ভাগ গ্রহণ করতেন মাত্র বারোজন মনসবদার এবং করের ৮২ ভাগ ভোগ করতেন ১০৭১ জন ব্যক্তি। এই অল্পসংখ্যক মানুষ অভিজাতদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়াতে এঁরাই ছিলেন দরবারি শিল্পীদের সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষক। মুঘল শাসকগোষ্ঠীর মূল ভূমিকাই ছিল শোষকের। এদের কাছে ছবিও ছিল এই বিলাসিতার দ্রব্যতালিকাভুক্ত।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা শুধুমাত্র শোষক ও সংগ্রহকারীর ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিল সমঝদারের। মুঘল পৃষ্ঠপোষকের এই অন্য চেহারা স্পষ্ট হয় তাঁদের নিজস্ব জীবনীকার ও শিল্পীদের রচনায়।

আকবরের আমল থেকে যে নান্দনিক মাত্রা মুঘল শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষক উভয়ের কাছে গ্রাহ্য ছিল তার বিধান আসত সম্রাটের কাছ থেকে। আবুল ফজলের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আকবর প্রতি সপ্তাহে তাঁর চিত্রশিল্পীদের কাজ পরিদর্শন করতেন। তাঁর দারোগারা তাঁর সামনে উপস্থিত করতেন চিত্রকারখানার সাপ্তাহিক উৎপাদন।

যেহেতু উৎকৃষ্ট শিল্পোৎপাদন ছিল পৃষ্ঠপোষকের এক বিশেষ দায়িত্ব, তাই রঙ, তুলি ও উচ্চমানের কাগজ সুলভ মূল্যে ক্রয় করে যোগান দেওয়া হত শিল্পীদের। এই চিত্রোৎপাদন ব্যবস্থা শুধুমাত্র সম্রাটের নয় অভিজাতদের গৃহসংলগ্ন কারখানাগুলিতেও চালু ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'মাসির-ই-রহিমি'র মতো অভিজাতদের জীবনীগ্রন্থ থেকে। 'বিয়াজি-ই-খুশবুই' নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে অভিজাতদের গৃহসংলগ্ন কারখানার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই ব্যবস্থা বর্তমান ছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত।

মুঘল পৃষ্ঠপোষকদের সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল শিল্প সম্পর্কে তাদের উদার মনোভাব। প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন রুচিবান বিদগ্ধ পুরুষ। এঁদের মধ্যে আকবর নিজেই শিল্পশিক্ষা করেছিলেন আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলির কাছ থেকে। গোঁড়া উলেমাপন্থীদের চিত্রকলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আকবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে আকবরের রুচিপরিবর্তনও জড়িত। আকবরের রাজসভায় গ্রন্থচিত্রণ প্রাধান্য পায়। একাধিক পারসিক কাব্যগ্রন্থের মতো হিন্দু মহাকাব্যগুলি অনুবাদ হয় ও এদের মধ্যে 'রমম্‌নামা' (মহাভারতের পারসিক অনুবাদ), 'হরিবংশ', 'রামায়ণ' প্রভৃতি চিত্রিত হয়। আকবর নিজে এই গ্রন্থচিত্রণের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। 'হামজানামার' মতোই এইসব বীরগাথা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত।

যদিও গ্রন্থচিত্রণ আকবরের কারখানার মূল বিষয়রূপে গণ্য হয়, প্রতিকৃতি চিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা আবুল ফজল বারবার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতিসদৃশ রূপায়ণ, যার মাধ্যমে ছবিতে বিষয়ের কাব্যগুণ অক্ষুণ্ণ থাকবে অথচ মানুষ, জীবজন্তু, নিসর্গদৃশ্য সবকিছুকে চিহ্নিত করা যাবে—এই পাঠ মুঘল শিল্পীরা গ্রহণ করেন ইয়োরোপীয় চিত্রকলা থেকে এবং এখানেও এঁদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। শুধুমাত্র গোঁড়া মুসলমান নয়, হিন্দু জাতিভেদ প্রথার যে কট্টর বিধিনিষেধ জীবিকা বদল অসম্ভব করে তুলেছিল, আকবর তাকেও অস্বীকার করেন।

জাহাঙ্গীর, যিনি সমসাময়িক সাক্ষ্যে আকবরের রাজনৈতিক প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হতেন না, তাঁর প্রধান উল্লেখযোগ্য সামাজিক ভূমিকা ছিল শিল্পের পৃষ্ঠপোষণ। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালে এলাহাবাদে যে স্বাধীন দরবার জাহাঙ্গীর বসান সেখানে পূর্ণ উদ্যমে গড়ে তোলেন এক চিত্রকারখানা। সেখানে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে শিল্পীরা এসে যোগ দেন।

জাহাঙ্গীরের আমল থেকে শুরু হয় শিল্পীদের ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশ। জাহাঙ্গীর নিজে পুঁথিচিত্রণে আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও একক ছবি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর আমলে রচিত বিশাল সব এ্যালবাম বা মুরাক্কা পাওয়া গেছে যাতে রয়েছে ইয়োরোপীয় ছবির অনুকরণ, ওস্তাদ মনসুরের করা জীবজন্তুদের ছবি, আবুল হাসানের আঁকা প্রতিকৃতি।

জাহাঙ্গীর যে শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় ছবি পছন্দ করতেন তা নয়, তাঁর আমলে বেহজাদের ছবির অনুকরণ পাওয়া গেছে শিল্পী নানহার করা। এছাড়া তাঁর চিত্রকারখানায় কাজ নিয়ে আসেন আকা রিজা। এঁর কাজের ধরন ছিল সম্পূর্ণভাবে পারসিক। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের আমলেই সবথেকে বেশি ইয়োরোপীয় নিসর্গদৃশ্য, প্রতীক ও প্রতিকৃতির প্রভাব পড়েছে মুঘল শিল্পকলায়। এক হিসাবে জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই গড়ে উঠেছে সেই মিশ্র আঙ্গিক যা মুঘল চিত্রকলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহানকে ধরা হয় মূলত স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ওঁর আমলেই বিশাল কিছু অ্যালবাম এবং 'শাহজাহান—নামার' চিত্রিত সংস্করণ শেষ করা হয়। একদিকে অনুপুঙ্খের ওপর নজর, অন্যদিকে সোনা ও জমকালো চিত্রকলার জন্ম দেয় যা শাহজাহানের রুচিকে চিহ্নিত করে।

মুঘল দরবারি শিল্পের আরো বেশকিছু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যাদের কথা বিশেষ জানা যায় না, যেমন হারেমের মহিলারা। বহুবার উল্লেখ পাওয়া গেছে যে, আকবর বা জাহাঙ্গীর ইয়োরোপীয় ছবি নিয়ে গেছেন অন্দরমহলে। কিছু কিছু মহিলা শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, যাঁদেরকে শিল্প-ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন হারেমের বাসিন্দা বলে।

নান্দনিক উপভোগ ছাড়াও চিত্রকলার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল মুঘল শাসকগোষ্ঠীর কাছে। প্রথাগতভাবে তাঁরা শিল্পের মাধ্যমে প্রচার করতে চেয়েছিলেন নিজেদের মতাদর্শ। অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে যে বিশাল অর্থ বন্টন হত, সেটা যে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য তা শাসকশ্রেণী প্রমাণ করতেন নানা উপায়ে। এই বৈধকরণের একটা উপায় ছিল শিল্প। জীবনযাত্রা যে বিশাল ফারাক কৃষক ও শহরের গরিব কারিগরদের দূরে রাখত অভিজাতদের থেকে, তাঁরা এইসব শিল্পকর্মকে মেনে নিতেন শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে। এক্ষেত্রে চিত্রকলার কাজ ছিল একটু অন্যরকম। দেওয়ালচিত্র যেভাবে স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবে মানুষের কাছে রাজমহিমা প্রচার

করতে পারে, দুটো কাগজে আঁকা অনুচিত্র তা পারে না, কারণ তা সীমাবদ্ধ থাকে অল্পসংখ্যক দর্শকের মধ্যে। অবশ্য মুঘল দরবারে এই সীমিত দর্শকমণ্ডলী ছিলেন সম্রাটের অন্তরঙ্গ ও প্রধান সামরিক সহায়। ফলে এদের মধ্যে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়।

মুঘল চিত্রকলার আর একটি কার্যকর দিক ছিল। ফোটোগ্রাফি আবিষ্কার হবার আগে মূলত ছবি এবং বিশেষভাবে প্রতিকৃতিচিত্র দৃশ্যগ্রাহ্য রূপে ধরে রাখত ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিকে। কিন্তু দলিল হিসাবেও মুঘল সম্রাটরা সচেতন ছিলেন এর আঙ্গিক সম্পর্কে। যেভাবে ইতিহাস রচিত হত সভাস্থ পণ্ডিতকে দিয়ে সেভাবেই প্রতিকৃতিও রচিত হত দরবারি শিল্পীদের দিয়ে। এখানে মনে রাখা ভালো যে, মতাদর্শগত বিশেষ কোনও বিরোধ দরবারি শিল্পী ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে না থাকার ফলে মুঘল চিত্রকলার মাধ্যমে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের যুগ্ম মতাদর্শই দর্শকের সামনে উপস্থিত হত।

৪.২.২ দরবারি শিল্পী

মুঘল দরবারে শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ক ছিল প্রভু ও ভৃত্যের। মুঘল শিল্পীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য পাওয়া গেছে আবুল ফজলের লেখায়। আবুল ফজল লিখেছিলেন যে, শতাধিক শিল্পী সম্রাটের চিত্রকারখানায় কাজ করছিলেন। এঁরা সবাই নাকি পারসিক ধ্রুপদী শিল্পী, সবাই বেহজাদের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অবশ্য যে নামের তালিকা তিনি পেশ করেছিলেন তার মধ্যে একশো জনকে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে খালি সতেরো জনের নাম। এদের মধ্যেও আবার উল্লেখযোগ্য মীর সৈয়দ আলি, আবদুস সামাদ (শিরিন কলম্‌), দশবন্ত ও বসাওয়ান। হুমানুনের আমলেও দরবারে শিল্পীরা ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর আমলে লেখা 'বিয়াজিৎ বিয়া'-তে।

আকবরের আমলেই বিভিন্ন ধরনের শিল্পীরা চিত্রকারখানায় কাজ নেন। এখানে কাজ হত সম্মিলিত উপায়ে। আকবরের শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন মীর সৈয়দ আলি ও আবদুস সমাদ। মুঘল দরবারি শিল্পীদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাঁরা শুধু চিত্রকর ছিলেন না, অনেকেই দক্ষ লিপিকার, এমনকি রত্ন খোদাইকরও ছিলেন। আবদুস 'সামাদ এদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য। আকবরের দরবারের অন্যতম খ্যাতনামা শিল্পী যিনি চিত্রকারখানার তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি হলেন মীর সৈয়দ আলি।

আকবরের আমলে চিত্রকারখানায় বহু হিন্দু শিল্পীর আগমন হয়। এস পি ভার্মার মতে, শিল্পীদের মধ্যে ১৪৫ জন ছিলেন হিন্দু ও ১১৫ জন ছিলেন মুসলমান। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের আমলে এদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৩ জন হিন্দু ও ৪১ জন মুসলমান শিল্পীতে। যদিও জাহাঙ্গীরকে সবাই বলেন মুঘল পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সবচেয়ে সমঝদার, তবু দেখা যায় যে, আকবরই ছিলেন ত্রিকলার প্রধান প্রতিষ্ঠতা।

আকবরের হিন্দু শিল্পীরা কিন্তু কেউই জাতিতে পটুয়া ছিলেন না। পেশাগত বিভাজন তখনও হিন্দু সমাজে বিদ্যমান। অর্ধকথনকের সাক্ষ্য অনুযায়ী চিত্রকররা ছিলেন শূদ্র ও জাতিতে নিম্ন বর্ণের। আকবর যে এই নীতি মানেননি তার বিশেষ দৃষ্টান্ত দশবন্ত। যে অল্প কয়েকজন শিল্পীর প্রশংসায় আবুল ফজল পঞ্চমুখ, তাঁদের মধ্যে আর একজন বসাওয়ান।

আকবরের আমলে যে দরবারি চিত্রকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে সমষ্টিগত প্রয়াসে কাজ হলেও, শিল্পীরা যে নিজেদের মৌলিক শিল্পভাষা গড়ে তুলতে পারছিলেন তা ওপরের আলোচিত শিল্পীদের কাজ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। একদিকে ধ্রুপদী পারসিক রীতি, অন্যদিকে ভারতীয়করণের প্রচেষ্টা, দুই ভাবধারাই মুঘল শিল্পীদের কিছু স্বাধীনতা দেয়। ১৬৮০-র পর যখন ইয়োরোপীয় শিল্প-আঙ্গিক মুঘল শিল্পীদের

সামনে আরো নতুন শৈল্পিক পাঠের সন্ধান দেয় তখন তারা তা সাগ্রহে গ্রহণ করেন। এই আগ্রহ জাহাঙ্গীরের আমলে প্রকাশ প্রায় শিল্পীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের প্রচেষ্টায়। জাহাঙ্গীরের আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত দুই শিল্পী হলেন—আবুল হাসান ও ওস্তাদ মনসুর। আবুল হাসানের মতো আর যে সব শিল্পী সম্রাটদের দরবারে ছোটো থেকে শিক্ষানবিসের সুযোগ পেতেন তাঁদের বলা হত খানজাদা। এঁরা অন্যদের চেয়ে আরো সাম্মানিক বলে গণ্য হতেন।

এখানে যে প্রশ্নটা ওঠে তা এই : মুঘল শিল্পীদের কতটা স্বাধীনতা ছিল বৃত্তি বদলের? বা পৃষ্ঠপোষকের আওতা থেকে বেরিয়ে নিজেদের ছবি বিক্রয় করে জীবনধারণ করবার? যেহেতু পঞ্চদশ শতকের ভারতবর্ষে রেনেসাঁস ইয়োরোপের মতো কোনও 'শিল্পের বাজার' গড়ে ওঠেনি, তাই মুঘল শিল্পীরা কখনই সমসাময়িক ইয়োরোপীয় শিল্পীদের মতো শুধুমাত্র দক্ষতার জোরে স্বাধীন জীবিকা অর্জন করতে পারেননি। পৃষ্ঠপোষকের দাক্ষিণ্যের বাইরে যাওয়া মানেই ছিল বাজারে আশ্রয় নেওয়া, ফলে অন্য যে কোনও প্রতিষ্ঠানিক শিল্পীর মতো রাজকীয় কারখানাগুলিই ছিল তাঁদের শৈল্পিক বিকাশের একমাত্র ক্ষেত্র।

যে সব শিল্পীরা শহরের বাজারে সওদা সাজিয়ে বসতেন তাঁদের সম্পর্কে এত অল্প জানা যায় যে, তাঁদের সামাজিক স্থান নির্ণয় করা আরো শক্ত। একমাত্র অভিজাতদের ক্রোধ উদ্রেকের সময় ছাড়া তাদের অস্তিত্বের কোনো সাক্ষ্য মেলে না। ফলে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায় যে, এঁরা ছিলেন গ্রামীণ ও শহরের কারিগর শ্রেণীর সমপর্যায়ভুক্ত এবং এঁদের সামাজিক অবস্থান ছিল দরবারি শিল্পীদের বিপরীত মেরুতে।

৪.২.৩ চিত্রকারখানা

রাজকীয় কারখানাগুলি ছিল অভিজাত পৃষ্ঠপোষক ও মুঘল শিল্পীদের মিলবার ক্ষেত্র। চিত্রকারখানায় শিল্পী ছাড়াও থাকতেন লিপিকার, যাঁর মর্যাদা অনেকাংশে ছিল চিত্রকরের থেকে বেশি। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য দেখো যায় যে, চিত্রররাও লিপি রচনায় দক্ষ ছিলেন।

মুঘল ছবির পদ্ধতি বা মিডিয়াম ছিল তেল ও জল রঙের মিশ্রণ। একে বলা হয় গুয়াশ। এর ফলে জলরঙটা আর স্বচ্ছ থাকে না। মুঘল চিত্রকলার অধিকাংশ রঙ তৈরি হত পাথরচুর্ণ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে। খালি সোনা বা রূপো ধাতু গলিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা হত। অনেক সময় জমকালো পোশাক বা অলংকারকে স্পষ্ট করতে সোনা বা রূপোর ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এর ব্যবহার পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়।

রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমদিকে ছবিতে রঙের ব্যবহার ছিল দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে আবদ্ধ। পরবর্তীকালে যখন উপস্থাপিত বিষয়কে দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের আরো কাছাকাছি আনার চেষ্টা হয় তখন ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে শেডিং চালু করা হয় মুঘল চিত্রে। অবশ্য এটাও করা হয় মুঘল শিল্পীদের নিজস্ব মেজাজ অনুসারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবি শেষ হলে তার চারধারে একটি মার্জিন কাটা হয়, তারপর সেই ছবিকেই আর একটি অলংকৃত কাগজের ওপর আটকানো হত। ছবির এই বাইরের অংশকে বলা হয় হাসিয়া। যে কোনও গ্রন্থের শেষ অংশে যে জায়গা ছেড়ে রাখা হয় তাকে বলা হয় 'তিওমা'। এই অংশেই লেখা থাকে শিল্পীদের নাম, পৃষ্ঠপোষক ও কারখানার পরিচয়।

১৫৫৫ থেকে ১৫৫৮ সাল ছিল মুঘল রাজকীয় চিত্রকারখানার সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়। এই সময়ই

শিল্পীরা মুঘল দরবারকে দর্শকের সামনে শুধু একটি সুশাসিত রাষ্ট্রের কেন্দ্র নয়, উপস্থাপিত করে ভবিষ্যতের সব রাজতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে।

৪.৩ কাব্য থেকে ইতিহাস

হুমায়ুনের যথাযথ দৃশ্যগ্রাহ্য দলিলের চাহিদা ও বাবরের প্রচারধর্মী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী শিল্পের ধারণা মুঘল দরবারি চিত্রকলার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। অনেকে মনে করেন, মুঘল চিত্রকারখানার প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন। কিন্তু আঙ্গিকের ঐতিহাসিক বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, স্বকীয় একটি শিল্পশৈলী হিসাবে মুঘল চিত্রকলা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে আকবরের রাজসভায়।

আকবরের চিত্রকারখানার প্রথম দিকের কাজে পারসিক কাব্যের রূপকথার জগৎ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু যকন থেকে প্রাক্ -মুসলমান চিত্রপদ্ধতিতে দক্ষ শিল্পীরা মুঘল দরবারে জাগয়া পেতে থাকেন তখন তাঁরা এই পারসিক রীতিকে শিক্ষার বিষয় করলেও তাঁদের পুরনো শিক্ষাকে একেবারে ভুলতে পারলেন না, ফলে পৃথক রীতিতে সংমিশ্রণে এক নতুন শৈলীর জন্ম হল যাকে ঠিক প্রাদেশিক পারসিক চিত্রকলা বলা যায় না। বরং এর প্রভাবে মুঘল ছবির নিজস্ব রূপও ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে।

আকবরের কারখানার সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হল 'হামজানামা'র অলংকরণ। আনুমানিক ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থচিত্রণ আরম্ভ হয় এবং সমসাময়িক সাক্ষ্যে জানা যায় যে, পনেরো বছর লেগেছিল এই কাজ শেষ হতে। অবশ্যই অন্য গ্রন্থচিত্রণ এই সময় থেমে থাকেনি। ১৫৬৭ থেকে ১৫৭০-এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের অলংকরণ করা হয় যাতে পারসিক প্রভাবের পাশে ফুটে ওঠে শিল্পীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ছাপ। প্রথম দৃষ্টান্ত চিত্রিত 'গুলিস্তান'-এর একটি খণ্ড। বিখ্যাত পারসিক সাহিত্যিক সাদি রচিত নীতিমূলক কাহিনীর এই সংকলন গ্রন্থটি অনুলিখিত হয় বুখারায়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল 'দুবল রানী—খিজির খান'—আমীর খসরু রচিত একটি রোম্যানটিক কাব্য। তৃতীয়টি হল 'আনওয়ার-ই-সুহেলি'। হুসেন-ই-ভয়েজ কাপফী রচিত এই কাহিনী মুঘল দরবারে খুব জনপ্রিয় ছিল।

'হামজানামা'র বিষয় হল হজরৎ মহম্মদের আত্মীয় হামজার অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তাঁর এই ক্ষমতার প্রয়োগের বিবরণ। এহেন 'হামজানামা'র চৌদ্দটি খণ্ডের কোনও সম্পূর্ণ খণ্ড এমনকী মলাট বা মুখবন্ধও পাওয়া যায়নি। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা মাত্র শ দেড়েক ছবির হদিশ পাওয়া গেছে, তাদের কারুর নিচে কোনও শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। আঙ্গিকগত বিবর্তনের দিক থেকে লক্ষ করলে 'হামজানামা'র চিত্রগুলি মুঘল চিত্রশৈলীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাথমিক পর্যায়ের পারসিক আলংকারিক রীতি, যা আবদুস সামাদ ও মীর সৈয়দ আলির ছবিতে স্পষ্ট, পরে তা প্রাকৃতিক বস্তুর অনুচিত্রণে রূপান্তরিত হয়। মানুষের মুখ, অবয়ব, গায়ের রঙ বহুলাংশেই শিল্পীর বাস্তবে দেখা জগতের সদৃশ।

'খানদান-ই-তিমুরিয়া'র মারফৎ আকবর তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মুঘল রাজবংশের বীরত্বের কাহিনী। একই সঙ্গে বংশমর্যাদা ও ঐতিহ্যের বিবরণ তাঁর ক্ষমতার বৈধকরণ-প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলে। পিতা থেকে পুত্রে ক্ষমতালাভের এই যে চিরাচরিত পথ, তাকে নানাভাবে সমসাময়িক পাঠক ও দর্শকের কাছে বৈধ করে তোলাই ছিল দরবারি কবি ও শিল্পীর কাজ। আকবরের সভাস্থ লেখক ও শিল্পীদের কাছে এটা খুব স্পষ্ট। 'বাবরনামা' ও 'আকবরনামা' উভয় গ্রন্থচিত্রে এই সত্যই শিল্পীদের মূল প্রেরণা জোগায়। এই জীবনীচিত্রণে লক্ষ্য করা যায় যথাযথ দৃশ্য উপস্থাপনে মুঘল শিল্পীদের প্রচেষ্টা। একই সঙ্গে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের পরিবর্তন ও

ছবিতে উপস্থিত করা চিত্রশৈলীর গতি কিভাবে মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় আবুল ফজলের 'আকবরনামা'র চিত্রিত খণ্ডগুলি।

১৫৯০ সালে 'আকবরনামা' লেখা শেষ হলে সম্রাটরে হুকুমে তা চিত্রিত করা শুরু হয়। এই সময় থেকেই মুঘল পুঁথি চিত্রণরীতিতে নতুন আঙ্গিকের উন্মেষ লক্ষণীয়। একই সঙ্গে বাস্তব ঘটনার চিত্রণ এবং সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসে সেই ঘটনাকে স্থান করে দেবার দাবি রাখা হয় শিল্পীদের কাছে। রাজ্যের বিস্তারিত করা হয় একাধিক যুদ্ধের দৃশ্যে। সম্রাটের 'চেহারা' অর্থাৎ প্রতিকৃতি আর শুধুমাত্র জমকালো পোশাক পরা একটি 'টাইপ' হিসাবে উপস্থিত থাকে না। ছবিতে যখন আকবরের মুখের আদল স্পষ্ট, তখনই তাঁকে আর যে কোনও রাজপুরুষ নন, সম্রাট আকবর বলেই চিহ্নিত করা যায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আকবরের পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের প্রতিকৃতিচিত্রে ব্যক্তিদের আলাদা করা যেত না। ফলে ১৫৮০-র পরবর্তী সময় প্রতিকৃতিচিত্রণ মুঘল দরবারে একটি বিশেষ চিত্রধারা হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

রীতিগতভাবে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, মুঘল শিল্পীরা তাঁদের প্রাথমিক যে শিক্ষা অর্থাৎ পারসিক ও প্রাক্‌মুঘল ভারতীয় চিত্রণপদ্ধতি—তা থেকে ক্রমশ সরে আসছিলেন ও যথাযথ দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্ররীতির দিকে ঝুঁকছিলেন। এই পাঠ তাঁরা গ্রহণ করেন ইয়োরোপীয় চিত্রকলা থেকে। কিন্তু একই সঙ্গে পারসিক চিত্রকলার উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ, গাঢ় ও হালকা রঙের পাশাপশি অবস্থানে নাটকীয় আমেজ সৃষ্টি ও দ্বিমাত্রিক রেখাবহুল অঙ্কনরীতি মুঘল শিল্পীদের প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও কাহিনীকে বিবৃত করার জন্য ও স্থানভেদের চিহ্নগুলি তাঁরা চিত্রভূমির বিভাজনের পরিচিত ছকেই আবদ্ধ রাখেন।

মুঘল চিত্রশৈলীর প্রাথমিক পর্যায়ে পারসিক রীতির প্রাধান্য ক্রমশ ১৫৮০-র থেকে সীমিতি হয়ে পড়ে। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় চিত্রভূমির বিভাজনের ক্ষেত্রে। ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় সামনের বস্তুর প্রাধান্য ও দূরের বস্তুর আয়তন হ্রাসকে বলা হয় পার্সপেকটিভ। মুঘল চিত্রকলায় দেখা যায় শিল্পীরা এই পার্সপেকটিভ নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই ছবিতে দর্শক একবার চিত্রিত ঘটনাকে লক্ষ্য করছেন ওপর থেকে, একবার পাশ থেকে, একবার দেওয়ালের আড়াল উড়িয়ে দিয়ে সামনে থেকে। এই বহু দৃশ্যের ধারণা মুঘল শিল্পীরা কিছুটা ধ্রুপদী পারসিক শিল্পকলা থেকে গ্রহণ করলেও বাকিটা করেছিলেন লোকশিল্প থেকে। সমসাময়িক রাজস্থানী চিত্রকলায় লোককথা, পুরাণ আর গাথাকাব্য বিষয় হিসাবে সমান মর্যাদা পাওয়ায় সেখানে মুঘল দরবারি শিল্পধারণা অনেকটাই লোকশিল্পের প্রভাবে চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে মুঘল শিল্পীরাও কিছুটা প্রভাবিত হন এই চিত্রপদ্ধতি দ্বারা।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, মুঘল চিত্রকলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই সময় থেকে প্রকট হয় বিষয় ও আঙ্গিকের মিলিত অভিব্যক্তির ফলে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুঘল শিল্পীরা রূপকথার কল্পলোক থেকে স্থানান্তরিত হয়ে পৌঁছেছেন ইতিহাস ও জীবনী চিত্রণে।

মুঘল শিল্পীরা আকবরকে তাই দেবতার প্রতিভূ হিসাবে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থিত করতেন তাঁদের দর্শকমণ্ডলীর কাছে। মেযন, সম্রাটের মুখমণ্ডলের চারধারে রচনা করা হয় আলোকময় বৃত্ত। এখানে তাঁরা দুটো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন—প্রথমটি হল, যে নিজস্ব ঐতিহ্য তাঁরা পেরেছিলেন দেবরাজ শিল্প ও পারসিক চিত্ররীতির মিশ্র আঙ্গিকে তাকে রক্ষা করা, একই সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের যথাযথ প্রকাশ চিত্রে রূপায়িত করা। দ্বিতীয়ত, অভিজাতদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে সম্রাটকে সর্বশক্তির আধার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। শাকশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যত বেড়েছে শিল্পকলার ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরভেদকে চিহ্নিত করা ততই কঠিন হয়ে উঠেছে।

মুঘল দরবারি চিত্রকলায় তাই গড়ে উঠল আকবরের রাজত্বকালে ইতিহাসকে নির্ভর করে স্ব-মতাদর্শ অনুযায়ী এক চিত্রজগৎ, যেখানে সম্রাটের একক মহিমা ধরে রাখে বিশ্বকে এবং যেখানে শিল্পীর স্বকীয় শিল্পসত্তার প্রকাশ সম্ভব হয় পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশে।

৪.৪ মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাত

ধর্মপ্রচারের একটি বিশেষ উপায় ছিল ভারতবর্ষে খ্রিস্টানধর্মীয় চিত্র ও মূর্তির আমদানি। প্রথম থেকেই ক্যাথলিক চার্চ এ বিষয়ে সচেতন থাকায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত গির্জাগুলিতে অলংকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যিশু ও সন্তদের জীবনের ঘটনা ছাড়াও প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা তৈলচিত্র ইউরোপ থেকে আনানো হয়। সেই সঙ্গে সাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য মজুত করা হয় এনগ্রেভিং—ছাপাই করা অনুচিত্র। এর ফলে ভারতীয় চিত্রকলার কিছু আঙ্গিকগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, শিল্প-ঐতিহাসিকরা যাকে আখ্যা দেন ‘ন্যাচারালিস্ট’—যার চেষ্টা মূলত শিল্পে প্রকৃতির প্রতিরূপ রচনা। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর জের লক্ষ্য করা যায়।

মুঘল দরবারে ইয়োরোপীয়দের আগমনের সূচনা হয় ফতেপুরসিক্রির ইবাদতখানায়। ১৫৮০-র পরে, আকবরের চিত্রকারখানায় অঙ্কিত কেশব দাসের ছবিতে ইয়োরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট। আরো পরে বসাওয়ান, মুশ্‌কিন ও সাওঁলার ছবিতে ধরা পড়ে পাশ্চাত্য আঙ্গিকের ছাপ। এঁদের মধ্যে কেশব দাসই সবচেয়ে বেশি সংখ্যার ইয়োরোপীয় চিত্র অনুকরণ করেন আকবরের আদেশে।

সমসাময়িক তথ্য অনুসারে জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন সমঝদার শিল্পরসিক ব্যক্তি। খ্রিস্টানধর্মীয় শিল্প সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সেই আকর্ষণেই গড়ে ওঠে। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকরা কিন্তু তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেন এক আধ্যাত্মিক দিক। তাঁরা বারবার লেখেন, যুবরাজ খ্রিস্টিয় চিত্রগুলির একটি সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। তিনি প্রতিটি এনগ্রেভিং খুঁটিতে দেখেন, কিভাবে তাতে রঙ লাগানো যায় তার পরিকল্পনা করেন। সর্বোপরি ছবিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীকের তাৎপর্য জানতে চান। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকরা মুঘল দরবারে ভিড় জমান ও মূল্যবান সামগ্রীর বদলে নজরানা হিসাবে ছবি দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করার চেষ্টা চালাতেন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুঘল শিল্পীরা প্রধানত তিনটি উপায় অনুসরণ করেছিলেন। প্রথমত অনুকরণ; দ্বিতীয়ত, ভাবগ্রহণ এবং তৃতীয়ত, বিভিন্ন বিষয়ের ছবিতে ইয়োরোপীয় চিত্র থেকে পুরুষ ও নারীর টাইপের উপস্থাপনা।

১৫৯৮ সালে সেলিমের (পরে জাহাঙ্গীর) নির্দেশে লাহোরের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে কিছু খ্রিস্টান চিত্র রচনা করা হয়। এবং তাঁর সময়ই মুঘল শিল্পীরা ইয়োরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে পুরোপুরি দক্ষ হয়ে ওঠেন। মুঘল চিত্ররচনার বহুক্ষেত্রে দেখা যায় দু'টি আঙ্গিকের স্বচ্ছন্দ অবস্থান। এটাও মূলত প্রাধান্যলাভ করে ১৫৮০-র পর থেকেই। ইয়োরোপীয় চিত্র থেকে কিছু কিছু অংশ দিয়ে মুঘল শিল্পীরা তার ওপর তাঁদের ইচ্ছামতো নক্‌শা রচনা করেন। যেমন ইয়োরোপীয় চিত্রের নিসর্গদৃশ্য থেকে পটভূমি রচনা করে তারই প্রেক্ষার রচিত হয় পারসিক কাহিনীর চিত্ররূপ।

কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় যে, মুঘল আমলে ভারতীয় শিল্প ও সমসাময়িক ইয়োরোপীয় শিল্পের নান্দনিক চাহিদা কোথাও মিলে যাচ্ছিল। অথচ তথ্যসূত্রে যা জানা যায় তাতে স্পষ্ট যে, মুঘল ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের চিন্তার আদান-প্রদানের কোনও পথই ছিল না। মুঘল শিল্পীদের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকের রুচিই প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। এর ফলে ইয়োরোপীয় চিত্রকলার প্রযুক্তিগত বিবর্তন সম্পর্কে তাঁরা যা জানতেন তা আসত পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ ও আদেশ হিসাবে। তেলরঙের ব্যবহার যখন পাশ্চাত্য দর্শক ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন

আনছে, তখন স্যার টমাস রো তাঁর ডিরেকটরদের জানাচ্ছেন যে, জাহাঙ্গীরকে কিছু বড়ো তেলরঙের চবি উপহার দিলে তিনি তা ফেরত দিয়ে দেন, কারণ তিনি তেলরঙের আঁকা ছবি পছন্দ করেন না।

মুঘল শিল্পীরা ইয়োরোপীয় চিত্রে অনুশীলনের ফলে দু'টি আঙ্গিকগত পাঠ গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন— প্রথম, পরিপ্রেক্ষিত ও দুই, কিয়ারসকুরো বা আলো-আঁধারের খেলা। মনে রাখা দরকার যে-কোনও শিল্পেই আঙ্গিকগত পরিবর্তন অনেকটাই নির্ভর করে ক্রেতা-দর্শকের রুচির ওপর। মুঘল দরবারে একটি দর্শকগোষ্ঠী থাকলেও তাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। শাসকশ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ায় তাঁদের মতাদর্শই শিল্প-উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করত। মুঘল চিত্র আঙ্গিকে ইয়োরোপীয় প্রভাবের ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তার পিছনে ছিল এঁদের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন।

৪.৪.১ মুঘল দরবারি প্রতিকৃতি

মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও নান্দনিক চাহিদার এক আশ্চর্য সমন্বয়। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় এখানে প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর সামাজিক প্রেক্ষায়। সাহিত্যে প্রচুর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও প্রাক্-মুঘল চিত্রকলায় প্রতিকৃতির কোনও নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যে ব্যক্তির যথাযথ প্রতিকৃতি, যার দ্বারা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়, তার দৃষ্টান্ত বিরল; নেই বললেই চলে। এ থেকে শিল্প-ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, মুঘলদের প্রতিকৃতি রচনায় আগ্রহের কারণ তাঁদের মোঙ্গল উত্তরাধিকারের মধ্যেই নিহিত।

মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে, একই ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্র যদি কয়েক বছর পর পর মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে শুধু যে তাঁদের চিনতে পারা যায় তা নয়, তাদের শারীরিক পরিবর্তনও সহজে চোখে পড়ে। 'আকবরনামা' ও 'জাহাঙ্গীরনামার' যে সব রাজপুত্র, সভাসদ ও রাজকর্মচারীদের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে তাদের সবার ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয়।

শিকারযাত্রা, সাধু-সন্ত ও পীরদের সঙ্গে সম্রাট ও রাজপুত্রদের সাক্ষাৎকার প্রায় সবই ছিল শিল্পীদের বিষয়। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে প্রতিকৃতি চিত্রগুলি হয়ে ওঠে রূপকধর্মী। সম্রাট নিজেই এই প্রতিকৃতিগুলির বিষয় সম্পর্কে শিল্পীদের অবহিত করেন। জাহাঙ্গীরনামার অলঙ্করণে এই ছবিগুলি ব্যবহার হয়। এর ফলে ছবিগুলি শুধুমাত্র নান্দনিক মূল্যে চিহ্নিত না হয়ে বিশেষ একটি মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

মুঘল শিল্পীরা ধর্মীয় প্রতিমা না গড়লেও একই প্রতীক ব্যবহার করে সম্রাটদের যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তাতে তাঁদের দেখানো হয় একই সঙ্গে জাগতিক ক্ষমতার অধিকারী ও দৈব অনুগ্রহপুষ্ট এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বরূপে। জাহাঙ্গীরের রূপকধর্মী প্রতিকৃতিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় মুঘল শিল্পীদের মৌলিক প্রয়াসের বিভিন্ন রূপ।

মুঘল শিল্পীরা তেমন কোনও ধর্মীয় কাহিনীকে অবলম্বন করতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নির্ভর করেছেন নিজেদের দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ওপর। এইভাবে দরবারে আজীবন সম্রাটকে দেখানো হয়েছে দেবমূর্তির মতো নিশ্চয় স্থির। অন্যদিকে সম্রাটের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাতে আরোপ করা হয়েছে নতুন তাৎপর্য। এর ফলে সম্রাটের জীবনী হয়ে দাঁড়িয়েছে একই সঙ্গে বাস্তব ক্ষমতার প্রকাশ ও নৈতিক মতাদর্শ প্রচারের আশ্চর্য কাহিনী।

সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই মুঘল দরবারি চিত্রের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং

রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন প্রদেশে। এক ধরনের প্রাদেশিক মুঘল চিত্রকলা গড়ে ওঠে যার মাধ্যমে দরবারি প্রতিকৃতি চিত্রগুলি নতুনভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

৪.৫ প্রাদেশিক বিস্তার : রাজস্থান

মুঘল সম্রাটদের রাজপুত নীতি গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদে। মিত্র সন্ধানে ব্যাপৃত মুঘলরা প্রথমে মুসলমান অভিজাত 'খানদান' ও পরে 'রাজপুত রাণাদের' দলে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এর ফলে মুঘল রাজনৈতিক সার্থকতার মধ্যে পড়ে রাজপুতদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ। উপহার, খেলাৎ ও আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আকবর গড়ে তুলেছিলেন এক দরবারি সংস্কৃতি যার নিয়ামক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং।

রাজস্থানী চিত্রকলার যে মিশ্র আঙ্গিক গড়ে ওঠে তা মুঘল দরবারি শিল্পের প্রভাবে বিনষ্ট হয়নি; বরং জোরদার হয়েছিল। যে চিত্রকল্প সমস্ত রজাস্থানী চিত্রগুলিতে এক ধরনের সমতা আনে, তা নতুন মাত্রা পেয়েছিল মুঘল চিত্র আঙ্গিকের প্রভাবে। এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু পৃষ্ঠপোষকের চাহিদায় নয়, শিল্পী ও সমসাময়িক দর্শকদের নান্দনিক চাহিদাতেও।

রাজস্থানী চিত্র-আঙ্গিকের উৎসস্থলে আছে তিনটি ভিন্ন চিত্ররীতি। একদিকে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রণ রীতি, যা মূলত অলংকৃত জৈনধর্মীয় গ্রন্থগুলির মাধ্যমে জৈনভাণ্ডারগুলিতে রক্ষিত ছিল। অন্যদিকে ছিল রাজস্থানের সমৃদ্ধ লেকাশিল্প ঐতিহ্য। উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ ও স্পষ্ট রেখার বেষ্টনীর মাধ্যমে চিত্রকল্পকে উপস্থাপিত করা হত দর্শকের সামনে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় মুঘল দরবারি চিত্র-আঙ্গিক যা একদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে স্থান করে দেয় চিত্রভূমিতে। অন্যদিকে বিবৃত কাহিনীর প্রয়োজনমতো সৃষ্টি করে এক বিশেষ কল্পলোক। এই মিশ্র আঙ্গিকে যখন প্রাচীন মহাকাব্যগুলি চিত্রিত হয়, নায়ক-নায়িকারা রূপান্তরিত হন মুঘল অভিজাত পুরুষ ও নারীতে।

সপ্তদশ শতক থেকেই রজাস্থানী চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষ থীম লক্ষ্য করা যায়—নায়ক-নায়িকাভেদ, বারোমাস্যা, রাগমালা ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ঢোলা মারু, লোর চন্দানির মতো লৌকিক গাথা। এই বিষয়গত সমতা রাজস্থানী চিত্রকলায় সামঞ্জস্য আনে। তবু আঞ্চলিক কিছু বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়, যার থেকে রাজস্থানের ভিন্ন প্রাদেশিক আঙ্গিকগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যদিও রাজস্থানী চিত্রকলায় শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিভার ছাপ কমই থাকে, তবু এখানেও পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পীর যুগ্ম চাহিদা থেকেই গড়ে ওঠে নান্দনিক মাত্রা। যে নিরন্তর আঙ্গিকের পরীক্ষা মুঘল দরবারি শিল্পীকে ব্যাপৃত রাখে, প্রাদেশিক চিত্রকলায় তার উদাহরণ কমই লক্ষ্য করা যায়, এখানেই মুঘল দরবারি শিল্পের সঙ্গে আঞ্চলিক শিল্পের প্রভেদ।

মানুষ ও প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণের যে প্রচেষ্টা সপ্তদশ শতকের মুঘল দরবারি চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য, রাজস্থানী চিত্রকলায় তার প্রায় বিপরীত ঝোঁকই লক্ষ করা যায়। তার কারণ পাওয়া যায় টড সাহেবের লেখা সপ্তদশ শতকে রাজস্থানী রাণাদের জীবনযাত্রার বর্ণনায়—'প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানের বিরাট বিরাট গাছগুলির ছায়ায় বসে রানারা চারণের কথা শুনতেন আর সেই বৃহৎ জলাশয়ের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁদের স্নায়ু তৃপ্ত হত। ফুলের গন্ধে তাঁরা দ্বিপ্রহরের নিদ্রা ও সুখস্বপ্নে ডুবে যেতেন। এইভাবে রাজপুত রাণারা যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করে বিলাসিতার অফুরন্ত সুখস্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে থাকলেন।'

এই মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভক্তিবাদের প্রেরণা। বল্লভাচার্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ষোড়শ শতক থেকেই রাজস্থানে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সুরদাস ও বিহারীলালের মতো কবিরা, কাব্য রচনার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন এক চিত্রময় জগৎ, যেখানে

দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় কথা ও ভাবের প্রকাশে কয়েকটি বিশেষ রূপকল্পে। এর ফলে রসের যে অফুরন্ত লীলা ধর্মীয় জনতাকে সামাজিক স্তরভেদ ভুলিয়ে এক শিল্পজগতে উত্তরণের সুযোগ করে দিয়েছিল, সেই রসবোধই বহুদিন পর্যন্ত রাজস্থানী শিল্পী ও পৃষ্ঠপোষককে আবদ্ধ রাখে মোহময় এক কল্পলোকে, যেখানে মুঘল চিত্রের প্রকৃতিসদৃশ দৃশ্যজগৎ শুধুমাত্র পটভূমি রচনা করে। যে কাহিনী বিবৃত হতে থাকে তা ভক্তি, প্রেম ও লীলার বর্ণনা। তার দ্বারা ইতিহাসচিত্রণ অসম্ভব হয়ে ওঠে।

৪.৫.১ শেষ পর্যায়

মুঘল দরবারে যে শিল্প আঙ্গিকের জন্ম তার শেষ হয় অষ্টাদশ শতকে। মুঘল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে শুরু করে ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই। শিল্পীরা আশ্রয় খোঁজেন বিভিন্ন রাজ্যে।

এর মধ্যে অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও বাংলায় মুঘল শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামোটি বজায় থাকে। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে যে শিল্প ঘরানা গড়ে ওঠে তা লক্ষ করলে আমরা মুঘল দরবারি শিল্পের শেষ অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি।

বাংলার নবাবরা ছিলেন শিল্পের বড়ো পৃষ্ঠপোষক। ইন্দো-পারসিক সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদের নবাবরা বহন করতেন, সেই হিসাবেই তাঁরা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতার যে বৈধকরণ হত, সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন।

শেষে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর যে নতুন শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়, তাতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ে, সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ে বেশকিছু শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা। মুঘল দরবারি শিল্পীরা সাহেবদের দরজায় দরজায় ছবি কাঁধে ফিরি করে বেড়ান এবং ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পর যখন সাম্রাজ্যের সস্তা স্মারকচিহ্ন হিসাবেও প্রাক্তন দরবারি শিল্পীদের কাজের আর কোনও দাম থাকে না, তখন তাঁরা মিলিয়ে যান দেশের আরও বহু শিল্পীর মতো বিস্মৃতির অন্ধকারে।

৪.৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। মুঘল আমলে সম্রাট ও অভিজাতবর্গ কিভাবে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষণা করতেন?

২। মুঘল দরবারি শিল্পীরা সমাজের কোন্ বর্গ থেকে আসতেন? তাদের সামাজিক অবস্থা কি ছিল ও স্বাধীনতা কতটা ছিল?

৩। মুঘল চিত্রকলায় পারসিক ও ভারতীয় কাব্য এবং মুঘল ইতিহাস কিভাবে বিম্বিত হয়েছে?

৪। মুঘল চিত্রকলায় ইউরোপীয় অভিঘাত কিভাবে অনুভূত হয়?

৫। রাজস্থানে মুঘল চিত্রকলার বিস্তার কতটা ঘটেছিল?

ছোট প্রশ্ন :

৬। মুঘল দরবারি শিল্পের অবক্ষয় কখন শুরু হয়?

৭। মুঘল প্রতিকৃতি চিত্রে বিভিন্ন চাহিদার সমন্বয় কিভাবে ঘটেছিল?

৮। নান্দনিক উপভোগ ছাড়াও মুঘল চিত্রকলার অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি?

বিষয়ানুগ প্রশ্ন :

৯। চিত্র-কারখানা কি? কোন্ কোন্ গ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায়?

১০। আকবরের আমলে কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান শিল্পী কাজ করতেন?

১১। জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রধান চিত্রকর কারা ছিলেন?

১২। 'হামজানামা' কি? কখন এর অলংকরণ শুরু হয়?

১৩। 'খানদান-ই-তিমুরিয়া' কি?

১৪। মুঘল চিত্রশিলেপ পারসিক রীতির প্রাধান্য কখন কমতে থাকে?

১৫। মুঘল চিত্রশিল্পীরা কোন্ কোন্ তিনটি প্রধান পদ্ধতি অনুসরণ করতেন?

১৬। মুঘল দরবারি প্রতিকৃতির প্রধান বিষয় কি ছিল?

১৭। রাজস্থানী চিত্রশিল্পের প্রধান উৎসগুলি কি কি?

১৮। রাজস্থানে চিত্রশিল্পে ভক্তিবাদের প্রেরণা কাদের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল?

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1। Satish Chandra : History of Medieval India.

2। Beach, Milo C. : Mughal Painting.